সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা

দেবেশ রায়ের উপন্যাস, যযাতি

করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা চলচ্চিত্র

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ : বিনয় ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-সমস্যা : শ্যামল চক্রবর্তী

পুস্তক-পরিচয়, সংস্কৃতি-সংবাদ ইত্যাদি

বর্ষ ৩৪ । সংখ্যা ৭
মাঘ, ১৩৭১

পরিচয়

সূচীপত্র

প্রচ্ছদপট : সত্যজিৎ রায়

সম্পাদক

গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

পরিচয় (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত

পরিচয়
বর্ষ ৩৩ । সংখ্যা ৭

বিনয় ঘোষ

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সনতারিখগুলিকে ইতিহাসের মাইলস্টোন বলা যায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনে এরকম কয়েকটি মাইলস্টোন নির্দেশ করা যেতে পারে। তাঁর সুদীর্ঘ কর্মজীবনের প্রবাহপথে অনেক আবর্ত ও বাঁক দেখা যায়, কিন্তু তার সবগুলি আপাতত আমাদের আলোচ্য নয়। যে মৌল ব্যক্তিত্বটি ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত ও রূপায়িত করেছে, প্রধানত সেই ব্যক্তিত্বের ক্রমিক অভিব্যক্তির সহায়ক যে-মাইলস্টোনগুলি তাদেরই কথা আমরা বলব। ইতিহাসের সেই মাইল-স্টোনগুলি এই :

১৮২৫-২৬, ১৮৩১, ১৮৩৮-৩৯, ১৮৪৩, ১৮৫০-৫১

অর্থাৎ উনিশ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যেই দেখা যায় যে দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের প্রায় পূর্ণবিকাশ হয়েছে। সমগ্র উনিশ শতক তিনি জীবিত ছিলেন এবং তার দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার নবজাগরণের তরঙ্গের উত্থান-পতনের ভিতর দিয়ে তিনি তাঁর আদর্শের দীপশিখাটিকে অনির্বাণও রেখেছিলেন। উনিশ শতকের নবজাগরণের প্রথম পর্বকে যদি রামমোহনের যুগ বলা যায় এবং মধ্যপর্বকে বলা যায় বিদ্যাসাগরের যুগ, তাহলে দেবেন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক ভূমিকা নির্ণয় করতে হয় এই দুই যুগের সেতুবন্ধক হিসেবে। রামমোহনের যুগের নতুন প্রত্যয় ও নীতিবোধগুলিকে পরবর্তী উভয়মুখী প্রতিক্রিয়ার আঘাত থেকে রক্ষা করার ঐতিহাসিক গুরুদায়িত্ব পালন করেন দেবেন্দ্রনাথ। একদিকে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের অন্ধ কূপমণ্ডূকতা, আর একদিকে নব্যশিক্ষিত তরুণদের অত্যুগ্র প্রগতিবাদ, চাপল্য ও হঠকারিতা—এই দুই বিপরীতমুখী ঘূর্ণীবাত্যার মধ্যে পড়ে রামমোহন-প্রবর্তিত সামাজিক কল্যাণ ও অগ্রগতির সুস্থির-সুসমন্বিত

আদর্শটি যখন নিষ্প্রভ হয়ে এসেছিল, তখন রামমোহনেরই অন্তরঙ্গ বন্ধু ও অন্যতম সহকর্মী দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ তাকে পুনরুদ্ধার করে পুনরুদ্দীপিত করেন।

কালের দিক থেকে ১৮২৫-২৬ সালকে আমরা বলেছি দেবেন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম মাইলস্টোন। দেবেন্দ্রনাথের বয়স তখন আট-ন' বছর। এই সময় থেকে রামমোহনের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়। তার আগে রামমোহনকে নিশ্চয় তিনি দেখে থাকবেন, কিন্তু নিতান্ত শিশু থেকে বালক হবার আগে পর্যন্ত নিয়মিত সাহচর্য লাভের সুযোগ তাঁর হয় নি। বাল্যবয়সে রামমোহনের এই সাহচর্য তাঁর মনোভূমিতে যে-বীজ রোপণ করেছিল, পরবর্তীকালে পরিণত যৌবনে সেই বীজই অঙ্কুরিত হয়ে শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে উঠেছে। এই বীজ রোপণ হয়েছিল বলেই তিনি তাঁর মানস-জমিন নিজের চেষ্টায় আবাদ করে সোনা ফলাতে পেরেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন যে তখন রামমোহনের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের বিশেষ সুযোগ ছিল না, তবু তাঁর উপর রামমোহনের নিগূঢ় প্রভাব তিনি বালকচিত্তে অনুভব করতেন এবং পরিপার্শ্বের কথা ভুলে গিয়ে প্রায় তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ভাবে বিভোর হয়ে থাকতেন। কিসের 'ভাব', কিসেরই বা 'বিভোরতা', এসব বুঝবার মতো বুদ্ধি বা বয়স তখনও তাঁর হয় নি। তবু তিনি মনের নিভৃত কোণটিতে অনুভব করতেন যে রামমোহনের সঙ্গে তাঁর কোনো 'নিগূঢ় সম্বন্ধ' আছে। এই নিগূঢ় সম্বন্ধ কি? একে বলা যায়—একাত্মতার তেজস্ক্রিয়া। তার সঙ্গে এ কথাও বলা যায় যে দেবেন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন রামমোহনের সঙ্গে তাঁর বাল্যের এই নিগূঢ় সম্বন্ধের বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

দেবেন্দ্রনাথের জীবনে দ্বিতীয় মাইলস্টোন ১৮৩১ সাল—যে-বছর তিনি হিন্দুকলেজে ভর্তি হন। তখন তিনি কৈশোরে পদার্পণ করেছেন, বয়স ১৪ বছর। হিন্দুকলেজেরও বয়স তাই। দেবেন্দ্রনাথের জন্মের মাত্র চার মাস আগে, ১৮১৭ সালের জানুয়ারি মাসে, হিন্দুকলেজ স্থাপিত হয়। ইতিহাসের মধ্যে দুটি ঘটনা পাশাপাশি ঘটছে—হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠা এবং দেবেন্দ্রনাথের জন্ম। এর মধ্যে কোনো আধিভৌতিক ব্যাপার নেই, তবে ইতিহাসে অনেক সময় এরকম বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ হয় যার তাৎপর্য পরবর্তীকালের ইতিহাসের ধারায় উদ্‌ঘাটিত হয়। এও অনেকটা তাই। হিন্দুকলেজ এদেশের

প্রথম বিদ্যায়তন যার ভিতর দিয়ে পাশ্চাত্য আদর্শ ও ভাবধারা আমাদের দেশে শিক্ষাকে বাহন করে আমদানি হতে থাকে। নবাগত পাশ্চাত্য ভাবধারার সঙ্গে পুরাতন ভারতীয় ঐতিহ্যের ও আদর্শের সংঘাত এই সময় থেকে শুরু হয়, এবং তার প্রথম তরঙ্গোচ্ছ্বাস প্রায় শীর্ষদেশ স্পর্শ করে ১৮২৯-৩০ সালে, যখন শিক্ষা শেষ করে প্রথম তরুণ ছাত্রদল বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে সমাজজীবনে প্রবেশ করেন। ঠিক এই সময়, যখন হিন্দুকলেজকে কেন্দ্র করে হিন্দুসমাজে প্রচণ্ড ঝড় বইছে তখন দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুকলেজে ভর্তি হন। হিন্দুকলেজের Westernisation-এর প্রাথমিক জোয়ারের বিরুদ্ধে দেবেন্দ্রনাথ দৃঢ়মুষ্টিতে সমাজের হাল ধরার চেষ্টা করেছেন, অথচ এদেশের ঐতিহ্যবাদীদের গোঁড়ামিকেও কখনও সমর্থন করেন নি। বোধহয় হিন্দু-কলেজের Westernisation-এর অসংযত রশিটিকে টেনে ধরে সংযত করার জন্যেই দেবেন্দ্রনাথ কলেজ-প্রতিষ্ঠার অল্পদিনের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এবং তার ভাবসংঘাতের সংকটকালে নিজেই সেখানে ছাত্র হয়ে গিয়েছিলেন। ঘটনা-সমাবেশের দিক থেকে ভাবতে গেলে এই সময়টাকে শুধু দেবেন্দ্রনাথের বয়সের দিক থেকে নয়, তাঁর মানসতার বিকাশের দিক থেকেও সন্ধিক্ষণ বলা যায়।

কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই সময় দ্রুততালে ঘটে যায়। রামমোহন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন ১৮২৮ সালে, ১৮২৯ সালে সতীদাহ-নিবারণ আইন বিধিবদ্ধ হয়, তারই প্রতিক্রিয়ায় গোঁড়া হিন্দুরা ধর্মসভা স্থাপন করেন ১৮৩০ সালে জানুয়ারি মাসে এবং তার কয়েকদিনের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের নতুন গৃহপ্রবেশ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই বছরেই বিখ্যাত মিশনারী আলেকজাণ্ডার ডাফ কলকাতায় আসেন এবং এই ডাফই পরে ধর্মসংস্কারক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথের অন্যতম প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠেন। রামমোহন রায় এই বছরেরই শেষদিকে, নভেম্বর মাসে বিলাতযাত্রা করেন। যাত্রার আগে তিনি কিশোর দেবেন্দ্রনাথের করমর্দন করে যান। দেবেন্দ্রনাথ বলেছেন যে এই করমর্দনের "প্রভাব ও অর্থ তখন আমি বুঝিতে পারি নাই। বয়স অধিক হইলে উহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি।"

এই ঘটনাক্রমের ঘাতপ্রতিঘাত কিশোরচিত্তকে কতদূর মথিত করতে পারে তা কল্পনা করা কঠিন নয়। ঘূর্ণীর ভিতরে থেকে তিনি তার আঘাত অনুভব করেছেন। তখন হিন্দুকলেজের তরুণ শিক্ষক ইয়ং বেঙ্গলের

দীক্ষাগুরু ডিরোজিওকে কেন্দ্র করে সমগ্র হিন্দুসমাজে তুমুল আলোড়ন চলছে। সনাতনপন্থীরা প্রায় সংজ্ঞা হারিয়েছেন এবং তার প্রতিরোধসংগ্রামে তরুণরাও সর্বক্ষেত্রে চরমপন্থী হয়ে উঠেছেন। এর মধ্যে ডিরোজিও পদত্যাগ করলেন এবং কয়েক মাসের মধ্যে তাঁর মৃত্যুও হল। কিন্তু ইয়ং বেঙ্গল বনাম ধর্মসভার আন্দোলন ও বাক্‌যুদ্ধ তাতে থামল না, ক্রমে সেই বাক্‌যুদ্ধ উগ্র থেকে উগ্রতর রূপ ধারণ করল। এর মধ্যে রামমোহনের মৃত্যুতে তাঁর স্বদেশে ফিরে আসার সম্ভাবনাও বিলুপ্ত হল। দেবেন্দ্রনাথ এই সময় হিন্দুকলেজ ত্যাগ করলেন। তাঁর বয়স তখন ১৬।১৭ বছর।

উনিশ শতকের তৃতীয় দশকেই, ১৩।১৪ থেকে ২২।২৩ বছরের মধ্যে, যৌবনের প্রথম পর্বেই দেবেন্দ্রনাথের সমগ্র ব্যক্তিত্বের মৌল রূপায়ণ হয়ে যায়। অর্থাৎ তার আসল অবয়বটি গঠিত হয়ে যায়। তারপর ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুর গতিপথে মতবিরোধ ও প্রিয়জনবিচ্ছেদবেদনায় এবং বিদ্যাসাগরযুগের সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের ঘাতপ্রতিঘাতে এই ব্যক্তিত্বের অবয়বে হয়তো টোল পড়েছে, কিন্তু কোনো আঘাতে বা বেদনায় তার আদত ডৌলটি বদলায় নি। অথচ ভাবলে অবাক্‌ হতে হয় যে রামমোহনের সহযোগী দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ১৮৩১ সালেও যখন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি থেকে গোলদীঘির হিন্দুকলেজে যাতায়াত করতেন, তখন যাবার পথে ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরী কালীকে প্রণাম করে যেতেন। পৌত্তলিকতার মোহাচ্ছন্নতা তখনও তাঁর কাটে নি, ঠাকুর-পরিবারেও তখন অবশ্য তার ঘোর বজায় ছিল। তবু এই নগরের নোংরা পথে, জোড়াসাঁকো থেকে ঠনঠনিয়া হয়ে যখন তিনি গোলদীঘি যেতেন তখন ঘিনজি শহরের অলিগলির ভিতর থেকে তিনি এই সময় একদিন নক্ষত্রখচিত অনন্ত আকাশের দিকে চেয়ে সর্বপ্রথম কিশোরচিত্তে বিশ্বভুবনের স্রষ্টা পরমেশ্বরের স্বরূপের অনন্ততা উপলব্ধি করেছিলেন। আত্মজীবনীতে এ কথার উল্লেখ আছে। এ কথার ইঙ্গিত গভীর। এইজন্য গভীর যে, ঈশ্বরের খণ্ডিত সত্তায় অর্থাৎ পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস যখন তাঁর টলে নি, তখন হঠাৎ মহানগরের পথ থেকে অনন্ত আকাশের দিকে চেয়ে স্রষ্টার স্বরূপের অনন্ততা উপলব্ধি করা, বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো হলেও বাস্তবিকই অভাবনীয়। আপাতত অভাবনীয় বা অলৌকিক বলে মনে হলেও, আসলে এর মধ্যে অলৌকিক ব্যাপার কিছু নেই। বাস্তব সত্য যেটুকু এর মধ্যে আছে তা এই : দেবেন্দ্রনাথের মনটি যে-ধাতুতে তৈরি

ছিল তার মধ্যে কোনো খাদ ছিল না, তা খাঁটি সোনার মন। পৌত্তলিকতার পঙ্ককুণ্ডে দাঁড়িয়েও তাই তিনি কিশোর বয়সে অনন্ত আকাশের দিকে চেয়ে বিশ্বস্রষ্টার অনন্ততার আভাস পেয়েছিলেন এবং কোনোদিন সেই আভাসের কথা বিস্মৃত হন নি। এই বৈদ্যুতিক আভাসের ৭।৮ বছরের মধ্যেই দেখতে পাই, যে-সত্যকে তিনি আভাসে উপলব্ধি করেছিলেন কৈশোরের সূচনায়, তাকে চরম সত্যরূপে গ্রহণ করতে উন্মুখ হয়েছেন পূর্ণযৌবনের প্রারম্ভে।

এবার আমরা কালের যাত্রাপথে দেবেন্দ্রনাথের জীবনের তৃতীয় মাইলস্টোনটিতে পৌঁছেচি—১৮৩৮-৩৯ সালে। তাঁর বয়স তখন ২১।২২ বছর। হিন্দুকলেজের তরুণ ছাত্ররা 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' নামে বিতর্কসভা প্রতিষ্ঠা করেন ১৮২৮ সালে এবং ডিরোজিওর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই ১৮৩২-৩৩ সালে এই সভা ম্লান হয়ে যায়। দেবেন্দ্রনাথের হিন্দুকলেজের ছাত্রজীবনে এই সভা সোরগোল তুলেছিল কলকাতা শহরে। দূর থেকেই তখন তিনি এই সভার কার্যকলাপ লক্ষ করছিলেন। রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যেকেই প্রতিভাবান তরুণ—তাঁদের ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা ও বিতর্কের খ্যাতি তখন শহরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। কিশোর দেবেন্দ্রনাথ বেদনা বোধ করলেন দেশের শিক্ষিত তরুণদের পাশ্চাত্ত্য-প্রবণতার জন্যে। তাঁদের প্রতিভা, বিদ্যাবুদ্ধি কোনো কিছুর প্রতিই তাঁর অশ্রদ্ধা ছিল না, কেবল একটি ব্যাপারই তাঁর কিশোর মনে কোনো সাড়া জাগাতে পারে নি—সেটি হল নব্য শিক্ষিতদের পাশ্চাত্ত্যপ্রিয়তা ও ইংরেজি-বিলাস। এই সময় ১৮৩২ সালে 'সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা' প্রতিষ্ঠার তিনি পরিকল্পনা করলেন, পাশ্চাত্ত্য-ভারতীয় সকল বিষয়ের আলোচনা সেখানে হবে, কিন্তু ইংরেজিতে নয়, বাংলা ভাষায় আলোচনা করতে হবে। এই সর্বতত্ত্বদীপিকা সভাকে আমরা অদূর ভবিষ্যতের 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র প্রাথমিক মডেল বলতে পারি। এরপর ইয়ং বেঙ্গলের কয়েকজন মিলে ১৮৩৮ সালে যখন 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' স্থাপন করেন, তখন তাঁদের ইংরেজিয়ানার বা Anglicism-এর মনোভাব কিছুটা কেটে গিয়েছিল মনে হয়। কারণ ১৮৩৮ সালেই উক্ত সভায় দেখা যায় 'বাংলা ভাষায় উত্তমরূপে শিক্ষার আবশ্যকতা' সম্বন্ধে প্রবন্ধ পঠিত হচ্ছে এবং তাতে প্রবন্ধ রচয়িতা উদয়চাঁদ আঢ্য বলছেন যে নিজের দেশের ভাষায় শিক্ষাকর্ম সম্পন্ন করতে পারলে বিদেশীর

দাসত্ববন্ধন থেকে মুক্ত হবার সম্ভাবনা থাকে এবং পৃথিবীর সমস্ত বড় বড় জাতি, যাঁরা স্বাধীন, তাঁরা নিজেদের জাতীয় ভাষারই উন্নতিসাধনে মনোযোগী হন, কোনো বিদেশী রাজার ভাষাকে মাথায় তুলে রাখেন না। দেবেন্দ্রনাথ 'সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন এবং ইয়ং বেঙ্গলের অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যাঁর কোনো সংস্রব ছিল না, তিনি পরে সেই ইয়ং বেঙ্গলের মুখপাত্রদের প্রতিষ্ঠিত 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার' সঙ্গে গোড়া থেকেই দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, এমনকি 'তত্ত্ববোধিনী সভা' স্থাপনের পরেও তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন নি। তার কারণ মাতৃভাষায় শিক্ষা, জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনা, পাশ্চাত্ত্যপ্রবণতার পরিবর্তে প্রকৃত জাতীয় সংস্কৃতির ভিত্তির উপর পাশ্চাত্ত্য-ভারতীয় ভাব-সমীকরণে নব্যসংস্কৃতির নতুন বনিয়াদ গড়ে তোলা—এই ছিল দেবেন্দ্রনাথের চিন্তাধারা এবং এই চিন্তাধারা তাঁর যৌবনের প্রথম দিকেই, ২০।২১ বছর বয়সের মধ্যেই বেশ পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিল। পরিপুষ্টিতে সাহায্য করেছিল তাঁর নিজের শিক্ষাদীক্ষা ছাড়া, সবচেয়ে বেশি, তাঁর সমসাময়িক নব্যশিক্ষিত প্রতিভাদীপ্ত চরিত্রবান ইয়ং বেঙ্গল দলের পাশ্চাত্ত্যপ্রবণ, উন্মার্গ চিন্তাধারা। কৈশোর থেকে যৌবনের দিকে অগ্রসর হতে হতে তাঁর চিন্তাধারা যত পরিণত হতে থাকল, তত তিনি বুঝতে পারলেন যে দেশের নব্যশিক্ষিত নতুন মধ্যশ্রেণীকে যদি স্বজাতিপ্রীতির সুস্থ সবল আত্মনির্ভর চিন্তা ও ধ্যানধারণার পথে এনে না দাঁড় করানো যায়, যদি সেই স্বাধীন পথে সর্ববিষয়ে—ধর্মসাধনা জ্ঞানসাধনা ইত্যাদি বিষয়ে—স্বাবলম্বী করে না তোলা যায়, তাহলে দেশের ও সমাজের প্রকৃত কল্যাণও হবে না, এমনকি নবজাগরণের যে তরঙ্গ-কল্লোলে আমরা চমৎকৃত হচ্ছি তাও অবশেষে স্তব্ধ হয়ে যাবে, সমস্ত উচ্ছ্বাসের ফেনিল বুদ্‌বুদ্‌গুলি একদিন বিলীন হয়ে যাবে—সমাজ আবার নিস্তরঙ্গ বদ্ধডোবায় পরিণত হবে—মেকলের আশাকল্পনা আশাকুসুমে পরিণত হবে—মৃত প্রথা ও কুসংস্কার আবার বিষাক্ত বীজাণুর মতো সেই বদ্ধডোবায় গজিয়ে উঠবে। দেবেন্দ্রনাথের, এবং যুবক দেবেন্দ্রনাথের, এই চিন্তাধারা যে কতখানি সত্য, তা আজও আমরা শতাধিক বছর পরে, বিজ্ঞানের জয়যাত্রা-ঘোষিত বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পৌঁছেও মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি।

১৮৩৫ সালে মেকলে যখন ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করেন এবং Bell-Lancaster পদ্ধতির অনুকরণে শিক্ষাক্ষেত্রে

filtration theory সমর্থন করেন, তখন তিনি এমন একটি English-educated middleclass এদেশে গড়ে তোলার কল্পনা করেছিলেন যাঁরা তাঁর ভাষায়, "Who may be interpreters between us and the millions whom we govern,—a class of persons Indian in colour and blood, but English in tastes and opinions, in morals, and in intellect." মেকলের এই কল্পনা অবশ্য কতকাংশে সত্য হয়েছিল। কিন্তু নতুন শিক্ষানীতি প্রবর্তনের পর ১৮৩৬ সালে উৎফুল্ল হয়ে তিনি তাঁর পিতা জ্যাকেরি মেকলেকে যে লিখেছিলেন, "There would not be a single idolater among the respectable classes in Bengal thirty years hence" যদি ইংরেজির মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রচলন হয়—সেকথা অনেকাংশেই মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে। ত্রিশ বছর পরে ১৮৬৫-৬৬ সাল থেকেই দেখা যায়—বাংলার সামাজিক জীবনে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের গণ্ডী যখন প্রসারিত হয়েছে এবং তাঁদের সংখ্যাও বেড়েছে, ঠিক তখন থেকেই প্রায় পৌত্তলিকতা-সহ হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে। মেকলের এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয় নি এবং যে-রীতিতে পাশ্চাত্ত্যশিক্ষা এদেশের মানসভূমিতে চাষ করার তিনি ব্যবস্থা করেছিলেন তাতে আর যাই ফলুক একেবারে যে নিখাদ সোনা ফলেছে এমন কথা বলা যায় না।

মেকলের সমকালে, এদেশের প্রবীণরা নন, নবীনদের মধ্যেও সকলে নন—দুই-একজন নবীন যাঁরা এই মেকলে-নীতির অসারতা ও অন্তর্বরতা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন তাঁদের মধ্যে চিন্তাশীল যুবক দেবেন্দ্রনাথ অন্যতম। এই মেকলে-নীতির কুফলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্যই তিনি ১৮৩৯ সালে, তাঁর জীবনের অন্যতম কীর্তি 'তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রতিষ্ঠার সংকল্প গ্রহণ করেন। একটু আগেই আমরা বলেছি যে মেকলের নিজের ভাষায় এই কুফলটি হল—এদেশে এমন এক শ্রেণীর লোক তৈরি করা—ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত—যাঁরা গায়ের রং ও দেহের রক্তে শুধু ভারতীয় বলে পরিচিত হবেন, কিন্তু রুচির দিক থেকে, মতামতের দিক থেকে, নীতিবোধের দিক থেকে এবং বিদ্যাবুদ্ধির দিক থেকে ইংরেজ বলেই তাঁদের মনে হবে। এই কুফলটিকে সমূলে বৃন্তচ্যুত করতে চেয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। তিনি বুঝেছিলেন, এদেশের সমাজ-জীবনে এই কুফলের প্রতিক্রিয়া কতদূর ভয়াবহ হতে পারে।

১৮৩৯ সালে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' যখন প্রতিষ্ঠিত হল তখন 'ব্রহ্মজ্ঞান লাভ'

করা সভার প্রধান উদ্দেশ্য বলে ব্যক্ত করা হল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলা হল যে সভাতে "ইংলণ্ডীয়, বঙ্গ ও সংস্কৃত ভাষাতে উপযুক্ত মতো বৈষয়িক বিদ্যা, বিজ্ঞানশাস্ত্র এবং ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ" প্রদান করা হবে। অন্ধ ইংরেজিয়ানা ও পাশ্চাত্ত্য-প্রবণতা বর্জন করা হল, অথচ পাশ্চাত্ত্যের প্রতি বা ইংরেজির প্রতি কোনো অযৌক্তিক বিরাগও প্রকাশ করা হল না। শুধু সমস্ত বিদ্যার—তা ব্রহ্মবিদ্যাই হোক, বৈষয়িক বিদ্যাই হোক আর বৈজ্ঞানিক বিদ্যাই হোক—ভিত্তি হবে জাতীয় ভাষা এবং অনুশীলনের মাধ্যমও হবে মাতৃভাষা—এই নীতিটাই জোর দিয়ে প্রচার করা হল। ডিরোজিওর শিষ্যদের অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের ইংরেজিয়ানার আতিশয্যের আবহাওয়া তখন কিছুটা কেটে যাচ্ছিল—সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার ভিতরে থেকে তিনি তা কিছুটা অনুভব করতেও পেরেছিলেন। তাই ঠিক এই সময় 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র প্রতিষ্ঠার সংকল্প করার কারণ হল—সভার ভিতর দিয়ে দেশের এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে ঠিক পথে নিয়ে আসা এবং সেই পথে পরিচালিত করা। পথটি কি ?

প্রথম হল ধর্মের পথ। প্রথম এইজন্য যে তখন উনিশ শতকের তিরিশে, এদেশের জাতীয় ধর্ম দুই দিক থেকে ঘোর সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল। প্রথম সংকট হল—পাশ্চাত্ত্যশিক্ষার প্রথম উল্লাস-প্রণোদিত নস্ত্যাৎবাদী মনোভাব থেকে উদ্ভূত নাস্তিক্যবাদ, দ্বিতীয় সংকট হল, স্বধর্মের প্রতি অবজ্ঞা থেকে বিদেশী খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি অনুরাগের ঝোঁক। এই ঝোঁক নব্যশিক্ষিতদের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে উনিশ শতকের তিরিশে, ডাফ, ডিয়েলট্রি প্রমুখ মিশনারিদের প্রচারের গুণে। সুতরাং ধর্মের পথ নব্যশিক্ষিতদের সামনে কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে উঠল। কাজেই 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র কাজ হল ধর্মের পথটি কুয়াশামুক্ত করা। পৌত্তলিকতার প্রতিপত্তি তো আছেই, তার সঙ্গে নাস্তিক্যবাদ ও খ্রীষ্টধর্ম পাশাপাশি মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। এই ত্রিমুখী সংকট থেকে জাতীয় ধর্মকে রক্ষা করার জন্যই ব্রহ্মবিদ্যা দান করা 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র প্রধান উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করা হল।

দ্বিতীয় পথ হল শিক্ষা ও সংস্কৃতির পথ। বৈষয়িক ও বৈজ্ঞানিক বিদ্যায় পাশ্চাত্ত্যের অগ্রগতি অনস্বীকার্য। কাজেই পাশ্চাত্ত্যবিমুখ হলে চলবে না। তার কাছ থেকে যা কিছু শিক্ষণীয় সবই গ্রহণ করতে হবে, ইংরেজির মাধ্যমে হলেও বাধা নেই। কিন্তু তার ফল যদি বিসদৃশ ইংরেজিয়ানা ও পাশ্চাত্ত্য-

উন্মত্ততা হয়, তাহলে তা বর্জনীয়, কারণ তা স্বাজাত্যবোধ-বিরোধী এবং সেই বোধ উন্মেষের পরিপন্থী।

তৃতীয় পথ মাতৃভাষায় বিদ্যানুশীলনের পথ। তার জন্য আমাদের মাতৃভাষা বাংলা এবং ভারতীয় ভাষার উৎস-স্বরূপ ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃত ভাষার সশ্রদ্ধ অনুশীলন আবশ্যক। যতদূর সম্ভব আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলনও মাতৃভাষার মাধ্যমে করা কর্তব্য।

'তত্ত্ববোধিনী সভা' এই সব কঠোর কর্তব্য সাধনে ব্রতী হল। প্রথমে দেবেন্দ্রনাথের নিজের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধব মিলিয়ে যে-সভার মাত্র ১০ জন সভ্য ছিল, তিন বছরে তার সভ্যসংখ্যা হল ১৩৮ জন, এবং আরও কয়েক বছরের মধ্যে দ্রুতহারে এই সভ্যসংখ্যা বেড়ে ৫০০ থেকে ৮০০ পর্যন্ত হল। বাংলাদেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অধিকাংশই 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র প্রাঙ্গনে, দেবেন্দ্রনাথের আহ্বানে সমবেত হয়েছিলেন। ডিরোজিয়ানরাও শেষ পর্যন্ত এই সভার আশ্রয়ে মনে হয় স্বস্তিবোধ করেছিলেন এবং সম্বিত্‌ও ফিরে পেয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের প্রতিভা ও মানসতা এই 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র অনুকূল পরিবেশেই প্রতিপালিত ও পরিপুষ্ট হয়েছে। এমনকি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মতো স্বভাবকবি, হিন্দুধর্মের প্রতি যথেষ্ট গোঁড়ামি থাকা সত্ত্বেও, জাতীয় ভাষা ও জাতীয় আচারাদি অনুশীলনের আকর্ষণে 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র অন্যতম অনুরাগী হয়েছিলেন। এই দৃষ্টান্তগুলি থেকে 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র প্রভাবের ব্যাপকতা খানিকটা অনুমান করা যায়। দেবেন্দ্রনাথের কীর্তির ঐতিহাসিক গুরুত্ব যে কতখানি তাও এই দৃষ্টান্ত থেকে কিছুটা অন্তত বিচার করা সম্ভব।

দেবেন্দ্রনাথের জীবনে চতুর্থ মাইলস্টোন হল ১৮৪৩ সাল। এই বছরে আগস্ট মাসে তিনি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ করেন এবং ডিসেম্বর মাসে (২১ ডিসেম্বর, ৭ পৌষ) তিনি কুড়ি জন বন্ধুসহ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর জীবনের পর্বান্তর হয়। ব্রাহ্মসমাজের জীবনেও একটা নতুন অধ্যায় উন্মুক্ত হয়। দেবেন্দ্রনাথের ভাষায় "পূর্বে ব্রাহ্মসমাজ ছিল, এখন ব্রাহ্মধর্ম হইল।" বিদ্যাবাগীশ বলেছেন, "রামমোহন রায়ের এইরূপ উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু তিনি তাহা কর্মে পরিণত করিতে পারেন নাই। এতদিন পরে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল।" আগে যে-ব্রাহ্মসমাজ ছিল

তাতে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্যধর্মের ব্যাখ্যান দেওয়া হত, নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনাও হত, কিন্তু ব্রাহ্মধর্মের কোনো বিশিষ্ট রূপ ধ্যান করে তাতে দীক্ষা দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তাতে ব্রাহ্ম বলে পরিচিত অনেকের ধর্মের সঙ্গে আচরণের কোনো সামঞ্জস্য থাকত না এবং 'ব্রাহ্ম' নামে পরিচয়ের মধ্যেও কোনো গুরুত্ব কেউ বিশেষ আরোপ করত না। সমস্ত ব্যাপারটাই ছিল শিথিল ও বন্ধনহীন। তার ফলে ব্রাহ্মসমাজের অবনতিও হয়েছিল যথেষ্ট। দেবেন্দ্রনাথ তাই প্রথমে 'ব্রাহ্ম' নামে পরিচয়টিকে যথোচিত মর্যাদা দেবার সংকল্প করেন। এই মর্যাদা দেবার জন্য ব্রাহ্মধর্মের রূপ কল্পনা, প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা এবং দীক্ষার ব্যবস্থা করা হল। ব্রাহ্মসমাজের ভিতরের শৈথিল্যকে দূর করে, ব্রাহ্মদের একধর্মের বন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ করার জন্য দীক্ষার প্রচলন করেন দেবেন্দ্রনাথ এবং তিনি নিজেই প্রথমে সেই দীক্ষা গ্রহণ করেন। এইজন্যই বলা যায় যে এরপর থেকে ব্রাহ্মসমাজের জীবনেও এক নতুন পর্বের সূচনা হয়, যেমন হয় দেবেন্দ্রনাথের নিজের জীবনে।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশের উদ্দেশ্য হল—তত্ত্ববোধিনী সভার আদর্শগুলিকে বাংলাভাষার ভিতর দিয়ে দেশবাসীর কাছে প্রচার করা। বাংলাভাষা ও বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' যে স্থায়ী আসন লাভ করেছে, তা থেকে বোঝা যায় দেবেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য কতদূর সার্থক হয়েছিল। বাংলা গদ্যভাষার বিকাশে এবং বিচিত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাবপ্রকাশে মাতৃভাষাকে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দান অতুলনীয়। দেবেন্দ্রনাথের নিজের গদ্যরচনাও প্রসাদগুণে সমুজ্জ্বল। তাঁর আত্মজীবনী ও পত্রাবলী থেকেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি শুধু গদ্যভাষার স্রষ্টা ছিলেন যে তা নয়, বাংলা গদ্যের কৈশোরকালে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র ভিতর দিয়ে তার অভিভাবকের কর্তব্যও পালন করেছেন।

দেবেন্দ্রনাথের জীবনে পঞ্চম মাইলস্টোন আমরা বলেছি ১৮৫০-৫১ সাল। তখন তাঁর ৩৩-৩৪ বছর বয়েস—যৌবনপ্রান্ত। এর দুই-এক বছর আগে তাঁর 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে, ১৮৫০ সালে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা করা হয়েছে এবং ১৮৫১ সালে British Indian Association স্থাপিত হলে তিনি তার সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছেন।

তখনকার মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রেও তিনি গুরুদায়িত্ব নিয়ে প্রবেশ করেন। তাঁর কর্মজীবনকে অনেক সময় ধর্মজীবন বলা হয়ে থাকে। কিন্তু তাঁর কর্মজীবনের বৈচিত্র্য ও গতি কেবল ধর্মের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ ছিল না, সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রেও প্রসারিত ছিল। ধর্ম স্বভাবতই ছিল প্রধান পথ এবং কেন ছিল তা আগে আমরা বলেছি। কিন্তু সামাজিক কল্যাণ ও প্রগতির অনুকূল নানাবিধ কর্মের পথে তিনি অগ্রসর হয়েছেন এবং সমস্ত পথগুলি ধাপে ধাপে তাঁর সামনে বহুদূর পর্যন্ত উন্মুক্ত হয়ে গেছে। ১৮৫০-৫১ সালের পরেও তিনি দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন এবং তাঁর ধর্ম-কর্ম-জীবনের স্রোতে জোয়ারের পর ভাঁটাও এসেছে স্বাভাবিক কারণে। সে ইতিহাস ঘটনা ও কাহিনীপ্রধান। তার আবৃত্তি এখানে আজ করব না। আজ শুধু মানুষ ও ব্যক্তি দেবেন্দ্রনাথের বিকাশের কথা এবং তাঁর নীতি ও আদর্শের প্রকৃত স্বরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আমরা চেষ্টা করেছি। তাতে দেখেছি দেবেন্দ্রনাথের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্ব ও ব্যক্তি-সত্তাটি কিভাবে—জাতীয় ঐতিহ্যমূলে প্রোথিত হয়ে, পশ্চিমে ও পুবে দুই দিকেই উদার বাহু প্রসারিত করেছে—ধর্ম সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে নতুন ভাবসমন্বয়ের জন্য। আজকের দিনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের এই ব্যক্তিত্বটিকেই আমরা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করব এবং নানা আদর্শ-সংকটে বিভ্রান্ত দেশবাসীর সামনে তুলে ধরব।

'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ'গৃহে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতিসভা'য় (৬ মাঘ ১৩৭১) প্রদত্ত ভাষণ।

জ্যোৎস্নাময় ঘোষ

সংহিতার বিবর্তন ও গৃহস্থ রমাকান্তের গৃহ

সদর থেকে পা বাড়াতেই রমাকান্ত দেখলেন, তিলিদের বাড়ন্ত মেয়েটা রাস্তার কলে গা ছড়িয়ে জল ঢালছে। বেরোবার মুখে প্রথমত তিলিবংশজাত মেয়েটিকে দেখে এবং দ্বিতীয়ত তার বেহায়াপনায় অপ্রসন্ন হয়ে উঠলেন রমাকান্ত। শরীরে মনে ঘিন্-ঘিন্-করে-ওঠা অনুভূতিটা আশ্রয় পাবার আগেই মুখ ঘুরিয়ে জায়গাটা পার হলেন তিনি এবং সেই সঙ্গে তিলিগোষ্ঠীর সবাইকে তার প্রতিপক্ষরূপে দাঁড় করিয়ে এক সংঘাতমুখর রণক্ষেত্রে একক বীরত্ব প্রদর্শন করতে লাগলেন। শত্রুপক্ষের সবাই যখন নিরস্ত্র এবং ক্ষমাপ্রার্থনায় নতজানু, আর যখন তিনি স্বীয় গুম্ফযুগলের তলদেশে বিজয়ীর ক্ষীণ হাস্য-ভঙ্গিমাটির চর্চায় অভিনিবিষ্ট, ঠিক তখনই তার অনতিদূরে অষ্টাদশবর্ষীয় এক বালখিল্যের আচরণে তিনি নিজেকে উত্তপ্ত অনুভব করার সংগত কারণ খুঁজে পেলেন। চক্রবর্তীদের খোলা জানালায় হেলান দিয়ে ছেলেটি কারো সাথে আলাপনে ব্যস্ত। যেহেতু সময়টা দুপুর এবং রাস্তাটা নির্জন, আর ছেলেটির কণ্ঠে তারল্য, অতএব রমাকান্ত ধরে নিলেন যে, জানালার অন্তরালবর্তী নিশ্চিতই মেয়ে। চক্রবর্তীদের মেয়ের এহেন নির্লজ্জতায় তাঁর উত্তাপ ক্রমশ বেগবান হতে থাকল। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মনে হল, চক্রবর্তীরা ব্রাহ্মণ হলেও বরেন্দ্র গোত্রীয়, আর বরেন্দ্র ব্রাহ্মণদের নীতি এবং শালীনতাবোধ যে··· । এ-সব ভাবতে ভাবতে জানালার পাশ কাটাতে গিয়ে তার দৃপ্ত সম্মুখ-প্রসারিত দৃষ্টির বক্ষিম লেন্সে তিনি দেখলেন, চক্রবর্তী-বাড়ির সেজ ছেলে ও-পাশে দাঁড়িয়ে। তার ধারণাটি মিথ্যে প্রমাণিত হল বলে যে তিনি অপ্রস্তুত হলেন, তা নয়; অধিকন্তু পরাশর চক্রবর্তীকে তিরস্কার করার উৎসাহ আরো প্রবলভাবে অনুভব করলেন তিনি। কারণ, শাসনের বল্গা সে এতই ঢিলে করে দিয়েছে যে, রমাকান্ত ভাবলেন, তার ছেলে ভর দুপুরে প্রায় ঘরের ভিতরই আড্ডা জমানোর সাহস পায়। আর আড্ডাবাজ ছেলেমাত্রই যে ধূম্রপায়ী এবং সিনেমাবিলাসী, এ-সত্য তো

দিবালোকের স্থায়ই স্বচ্ছ। অতএব ব্যক্তিত্বহীন পরাশর চক্রবর্তীকে ক্ষমা করার কোনো সংগত কারণ তিনি খুঁজে পেলেন না।

যুক্তিশৃঙ্খলটিকে অত্যন্ত সতর্কতাবে লালন করতে করতে বড়ো সড়কের মুখে অন্যমনস্কে পা বাড়াতেই স্তূপীকৃত বাসি আবর্জনার মুখোমুখী হয়ে নিজেকে খুব অসহায় মনে হল রমাকান্তর। ময়লারাখার পাত্রটা আবর্জনা-সকরে পৌরসভার কর্তব্যজ্ঞানের বিজ্ঞাপন হয়ে একপাশে গড়াগড়ি যাচ্ছে। আনাজের পরিত্যক্ত অংশ, ছেঁড়া কাগজের টুকরো, কাপড়ের ফালি, মাটির ভাঁড়, কাগজ এবং পাতার রকমারি ঠোঙা, পোড়া বিড়ির শেষাংশ, বেড়ালের শবদেহ, শরীরে কয়েক পুরুষের ব্যবহারের চিহ্ন-আঁকা সম্প্রতি-বরখাস্ত-করা একটি ছাতা, কয়েক পাটি তালিসমাকীর্ণ জুতো, বিষ্ঠালোভী একজোড়া মাদী শুয়োর, রোঁয়া-চটে-যাওয়া একটা কুকুর এবং আরো নানাবিধ আবর্জনা দেখতে দেখতে রমাকান্তর মনে হল, সমস্ত শহরটা যেন একটা ডাস্টবিন হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে পৌরসভার, বিশেষ করে চেয়ারম্যানের প্রতি তীব্র আক্রোশ তাঁর মনে এক সূচীমুখ যন্ত্রণার সৃষ্টি করল। একটা ভণ্ড কুলিনকে যখন সবাই মিলে চেয়ারম্যান সাব্যস্ত করেছিল, তিনি তখনই জানতেন শহর এর হাতে নিরাপদ থাকতে পারে না। ইতিমধ্যে তাঁর ট্যাক্স তিরিশ থেকে পঁচাত্তরে পৌঁচেছে থার্ড ডিভিশনে পাশ করেছে, এই অজুহাতে তাঁর সেজ মেয়ে লতিকার পৌরসভার প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকাপদের দরখাস্তখানাকে নাকচ করা হয়েছে, এবং আরো একাধিক অনাচার আগত বলে রমাকান্ত প্রায়শই এক ধরনের আতঙ্ক বোধ করেন। কেননা, তিনি জানেন বিষ্ঠা-কমিটির সদস্যদের স্থায়বোধের কোনো বালাই নেই (সম্প্রতি রমাকান্ত পৌরসভাকে বিষ্ঠাকমিটি বলে অভিহিত করেছেন)।

কিন্তু আপাতত জঞ্জাল-পরিবৃত রমাকান্ত তীব্র অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন, কারণ, রাস্তাটি তাঁকে পার হতে হবে। তাঁর যাতায়াতের রাস্তার উপর সম্পূর্ণ ইচ্ছা করেই যেন বিষ্ঠাকমিটি এই দুষ্কর্মটি করে রেখেছে, এরকম একটা চিন্তা তার মনে যে প্রশ্রয় না পেল তা নয়, এবং ধাঙড়দের মাইনের বখরা যে কমিশনারবাবুরা পায়, এই অস্বচ্ছ সন্দেহটাও তার মনে প্রবল আকারে যে দেখা না দিল তা-ও নয়, কিন্তু আশু কর্তব্যের তাড়নায় বিষয়টিকে তিনি মুলতুবী রাখতে বাধ্য হলেন। রাস্তায় আবর্জনার বিস্তারটি গভীর। মনোযোগে

পর্যবেক্ষণ করলেন রমাকান্ত, কিন্তু ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে রাস্তা পেরোনোর কোনো ভব্য কৌশল তিনি ভাবতে পারলেন না।

ঠিক এই সময়ই চারদিকের মনুষ্যহীন নির্জনতার বুকে তীব্র শব্দের একটা তরঙ্গ উঠল আর রমাকান্ত আবিষ্কার করলেন বিহারী ধোপার ডিগ্‌ডিগে গাধাটা তার পাশেই দাঁড়িয়ে। প্রথমেই গাধাটিকে সমস্ত শহরের প্রতীক বলে মনে হল তাঁর; তারপরই তাঁর মনে এল যে, ভারবাহী জন্তু হিসেবে এই অশ্বেতর প্রাণীর দাবি সুপ্রতিষ্ঠ। কথাটা মনে আসতেই রমাকান্ত গাধার কানদুটো চেপে ধরলেন। গাধাটা চিৎকার করে উঠল, মাথা ঝাঁকোতে থাকল। বার কয়েকের প্রচেষ্টায় গাধাটার পিঠে চেপে বসলেন তিনি। এমতাবস্থায় চলাই যে তার কর্তব্য, প্রাণীটি গর্দভ বলেই তা বেশ কিছুক্ষণ বুঝতে পারল না; পা ছুঁড়তে লাগল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এবং চিৎকার জুড়ে দিল। শেষ পর্যন্ত হাঁটু দিয়ে গুঁতোতে গুঁতোতে রমাকান্ত ওর ভিতর চলার উৎসাহ সঞ্চার করতে পারলেন; প্রাণীটি তার নিজের মতো চলতে লাগল, রমাকান্ত কিছুতেই গাধাটিকে তার ঈপ্সিত লক্ষ্যে পরিচালনা করতে পারলেন না। অতএব, যেখানে তিনি নামবেন বলে স্থির করেছিলেন, তার থেকে বেশ খানিকটা দূরে তাঁকে নামতে হল। কানদুটো চেপে লাফ দিলেন তিনি, এবং মাটিতে তাকে পড়তেই হল; খাড়া হয়েই গাধাটির পিছনে সজোরে এক লাথি মারলেন, প্রাণীটি চিৎকার করে উঠল এবং এঁকেবেঁকে ছুটতে লাগল। ছুটন্ত প্রাণীটির পালিয়ে যাওয়ার ভঙ্গিমাটি তাঁর ভালো লাগল, সে-দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন তিনি।

রাস্তার কলটায় হাত-পা ধুয়ে মিস্তিরদের ঘেরামাঠে ঢুকে কাপড়টা উল্টে-পাল্টে পরতে পরতে এবং প্রাক্তন শুচিবোধে তা দিতে দিতে খুব একচোট হাসি পেল তাঁর। কেননা, তাঁর মনে হল, বিষ্ঠাকমিটির আবর্জনা-সঞ্চয়ের রসিকতাটার একটা জুৎসই জবাব দিতে পেরেছেন তিনি। কিন্তু অচিরাৎ তাঁর হাসি বন্ধ হল; তার কাপড় পরাটাকে যেন অনুমোদন করতে না পেরে শম্ভু তেড়ে এল তাঁর দিকে আর তিনি মুক্তকচ্ছ হয়ে ছুটলেন।

ছুটতে ছুটতে শম্ভু এবং সেই সঙ্গে হ্যানিম্যান-শাবক পরেশ ডাক্তারের বাপ-বাপান্ত করতে লাগলেন। কারণ, শম্ভু যদিচ বেওয়ারিশ ষাঁড়, শুধু

পরেশ ডাক্তারের ডিস্‌পেনসারিতে তার দুবেলার আহার বাঁধা। তাই শম্ভুর আচরণঘটিত ত্রুটির জন্ত সেই হানিমান-শাবক দায়ী হতে বাধ্য। তা ছাড়া, এমনিতেই পরেশ ডাক্তার সম্পর্কে তাঁর ধারণা বিরূপ। কারণ, প্রথমত, বাহার বছর বয়েসেও লোকটা মক্তদার। তার মানেই হচ্ছে, রমাকান্ত মনে করেন, অন্যত্র তাঁর কোনো 'ব্যবস্থা' আছে। দ্বিতীয়ত, সেবার যখন তাঁর পঞ্চম সন্তানের হামজ্বর হয়েছিল, তখন তাঁর প্রজাকুলের গর্ভধারিণীর তাড়নায় পরেশ ডাক্তারকে ডাকতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। সাত সাত দিন ভুগিয়ে ছেলেটাকে ভাল করে তুলেছিল বলে রটনা করেছিল পরেশ। তাতেও তিনি বিশেষ কিছু মনে করেন নি; কিন্তু আট দিনের মাথায় তিন টাকা দশ পয়সার একটি বিল যখন তাঁর কাছে পৌছল, তখন স্বভাবতই রমাকান্তের পক্ষে তার এই বেয়াদপিকে সহ্য করা সম্ভব হয় নি। কারণ, ছেলেটি যে তার খড়িমাটির গুঁড়োয় আরোগ্যলাভ করে নি, তার প্রমাণ পুরো সাত সাতটি দিন তাকে ভুগতে হয়েছে। এবং এ-সত্য জেনেও যে-লোক সুস্থ মস্তিষ্কে বিল তৈরি করতে পারে, ব্রাহ্মণ্যশ্রেণীর সেই প্রাক্তন তেজ আয়ত্তে থাকলে তিনি তার প্রতি চরম দণ্ডেরই ব্যবস্থা করতেন।

এ-সব এবং আরো নানাবিধ অস্পষ্ট কারণে রমাকান্তর উষ্মা শম্ভুকে ছেড়ে পরেশ ডাক্তারকে আশ্রয় করল।

খানিকদূর ছুটে এসে নিজেকে ভীষণ পরিশ্রান্ত মনে হল তাঁর, তিনি হাঁপাতে লাগলেন। শম্ভু পথের পাশের একফালি ন্যাকড়া গলাধঃকরণে মনোযোগী হয়ে পড়ায় তার দিক থেকে তিনি আপাতত আর কোনো আশঙ্কা বোধ করলেন না। চারদিক দেখে নিয়ে পলকে লুটন্ত কাপড়ের অংশটাকে কাছা বানিয়ে ফেললেন তিনি। আর ঠিক সেই সময়েই উচ্চকিত একটা হাসির কণ্ঠ তাকে বিব্রত করল। বেশ কিছুটা অনুসন্ধান করে লক্ষণ বোসের মেজো ছেলেটিকে জামরুল গাছের মগডালে আবিষ্কার করলেন তিনি। ছেলেটা তিলে খচ্চরের মতো হাসছে তাঁর দিকে তাকিয়ে। আর টেনে টেনে ছড়ার সুরে চেঁচাচ্ছে, বুড়ো বামুন ষাঁড়টা হয়েছিল, দুয়ো, দুয়ো ··। দেহ-মনে অসহায়তার এক তীব্র জ্বালা অনুভব করলেন রমাকান্ত, অক্ষম আক্রোশে নিচের ঠোঁটটিকে পীড়ন করতে লাগলেন।

এমন সময় পায়ের কাছের ইঁটের টুকরোটি তাঁর নজরে এল, ষাট বছরের অপটু শরীরটিকে অদ্ভুত ক্ষীপ্রতায় নুইয়ে ফেললেন তিনি, ইঁটের টুকরোটি কুড়িয়ে নিলেন, তারপর সার্কাসের ক্লাউনের মতো পেছনদিকে ঝোঁকৃতা দিয়ে সবেগে উঠে দাঁড়ালেন এবং পোড়া মাটির চ্যালাটাকে ছুঁড়ে মারলেন। কিন্তু অতিরিক্ত উত্তেজনা অথবা যে-কোনো কারণেই হোক তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেন। ছেলেটির কানের পাশ ঘেঁষে ঢিলটা চলে গেল। মুহূর্তখানেক স্তম্ভিত হয়ে থাকল ছেলেটি, তারপর তীব্র আর্তনাদ তুলে গাছ থেকে লাফ দিল এবং ঘুরন্ত লাট্টুর মতো বন্ বন্ করে পালিয়ে গেল। মুহূর্তেই উত্তেজনা প্রশমিত হল রমাকান্তর। কাপড়ের খুটে মুখ মুছে তিনি ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলেন।

হাঁটতে হাঁটতেই লক্ষণ বোসের কথা ভাবতে লাগলেন তিনি। এই সেদিনও বাদুড়পটির আমতলায় তেলেভাজার দোকান ছিল লক্ষণের। কিন্তু চোখের সামনেই ম্যাজিক দেখালে লক্ষণ, ভাখ-না-ভাখ করে আঙুল ফুলে কলাগাছ হল সে। এখন সে এ-তল্লাটে চালের হোলসেল ডীলার অর্থাৎ হোলসেল চোরাকারবারি। সেদিন মণখানেক ভাল চাল শস্তায় কেনার আশায় লক্ষণের কাছে গিয়েছিলেন রমাকান্ত। লক্ষণ বেশ প্রশস্ত করে হেসে বলেছিল, ভেঙে বিক্রি তো আমি করি নে। তা বাড়ির গরুর জন্য মণকয়েক সরানো আছে, ইচ্ছে হলে নিতে পার। বেশ শস্তাও হবে, আর ধর গে এত বড়ো প্রাণী যখন ও-চাল খেয়ে বাঁচে, তখন ওতে উৎকৃষ্ট ভিটামিন আছে বলতেই হবে। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন রমাকান্ত, পেচ্ছাব করি তোর চালে। লক্ষণ আশ্চর্য অনুত্তেজিত কণ্ঠে হাসতে হাসতে বলেছিল, মিছা পয়সা ফেলে শুধু পেচ্ছাব ক্যানো, আরো বড়ো কিছুও করতে পার ইচ্ছে হলে। রমাকান্তর ইচ্ছে হয়েছিল, একদলা থুথু ওর মুখে ছিটিয়ে দেন কিংবা পেচ্ছাব করে ফেলেন অথবা নিজের শরীর থেকে দলা দলা মাংস কামড়ে তুলে ফেলেন।

কথাটা ভাবতে এখনো শরীর তেতে ওঠে তাঁর। অবিশ্যি রমাকান্তর একমাত্র সান্ত্বনা হল, তিনি নিশ্চিত মনে করেন, লক্ষণকে নরকে পচতেই হবে। লোভ এবং পাপের আগুনে লক্ষণ পুড়ছে, নরকের প্রহরীদের তপ্ত শলাকায় বিদ্ধ হচ্ছে, চিৎকার করছে এবং রাশি রাশি বিষাক্ত সাপের ছোবলে নীল হয়ে উঠছে…। রমাকান্ত আরো দেখতে পেলেন, শূক

গর্ভে জন্মের অপেক্ষায় লক্ষণ শুয়ে আছে। ঘটনাটি ভাবতেই মনোরম এক তৃপ্তির স্বাদ পেলেন তিনি।

এই সময় সাইকেলের বেলের শব্দে সামনে তাকাতেই রমাকান্ত দেখলেন, শহরের ছোকরা এম. বি. ডাক্তার আশিস ভট্টাচার্য তাঁর দিকে চেয়ে মুচকি হেসে প্যাডেল ঘোরাতে ঘোরাতে চলে গেল। তাকে দেখেই আবার পিত্তি জ্বলে উঠল রমাকান্তর। ছোকরা একের নম্বরের বদমাস। সেবার তাঁর প্রজাকূলের গর্ভধারিণী কিঞ্চিৎ অসুস্থা হওয়ায় ছোকরাটাকে ডেকেছিলেন তিনি। অবিশ্যি পয়সার খাকতি নেই বলেই তিনি ওকে ডেকেছিলেন। কিন্তু ভট্চাযের ছার লঘু-গুরু জ্ঞান নেই। বলে কিনা, অনেক তো হল, এবার অপরেশন করিয়ে নিন ঠাকুরমশাই। ম্লেচ্ছ শাস্ত্র পড়ে পৈত্রিক ধর্মটাকে হারিয়ে ফেলেছে ছোকরা; তাই পাপাচারে প্রলুব্ধ করার ওর এই উৎসাহ দেখে ফুঁসে উঠেছিলেন তিনি, আমরা যদি ও-কাজটা করিয়েই রাখতাম, তাহলে তুমি কোন্ গন্ডভো থেকে বেরুতে মানিক! ডাক্তার শাইতেই বিব্রত হয়েছিল; খানিক বাদে শয়তানের যন্তোরটা কানে থেকে খুলে ব্যাগের গর্ভে ঢুকোতে ঢুকোতে বলেছিল, যে দিনকাল তাতে সংখ্যা বৃদ্ধি করাটা কী সংগত। কোনো সময় হয়তো ওদের কাছে আপনারা অশ্রদ্ধেয় হয়েও যেতে পারেন এ-জন্মে। ইঙ্গিতটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট বলেই রমাকান্ত মুহূর্তখানেক স্তব্ধ হয়ে থাকলেন; তারপর তীব্র স্বরে হুংকার ছাড়লেন, এই শোরের পালরা, সব ইদিকে আয়। দুদ্দাড় করে রমাকান্তের প্রজামণ্ডলী ছুটে এসেছিল। নানা বয়সের ছটি সন্তানের দিকে তাকিয়ে তিনি চিৎকার করে উঠেছিলেন, তোরা আমাকে শ্রদ্ধা করিস না! রমাকান্তর শোরের পাল তার দিকে বোবা বোবা দৃষ্টি মেলে তাকিয়েছিল শুধু। মেজো মেয়ে লতিকা যেন প্রশ্নটাকে শুনতে পায় নি, এমনি ভাব দেখিয়ে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করেছিল, কেমন দেখলেন। তীব্র ক্রোধের শিখায় রমাকান্তর অস্তিত্ব যেন ঝলসে গিয়েছিল, আবার গর্জে উঠেছিলেন তিনি, জিগ্গেস করলাম কী, রা কাটছিস নে কেউ! -মার মাথায় হাত রেখে লতিকা ঠাণ্ডা গলায় বলেছিল, রুগীর ঘরে চেঁচিও না। এবং আশ্চর্য, রমাকান্ত আর চেঁচাতে পারেন নি, ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। আশিস ডাক্তার চলে যাওয়ার মুখে ওর সাইকেলের হাতলটা চেপে ধরে ফিস্ ফিস্ করে শুনিয়ে দিয়েছিলেন

শুধু, কক্‌খনো আর এ-বাড়ির ছাদের ভিতর পা রাখবে না। নবীন চাটুয্যের বেতো ঘোড়ার মতো যদি সাড়ে তিন পায়ে চলার ইচ্ছে না থাকে, তবে কথাটা মনে রেখ। ডাক্তার গোঁফের সমান্তরালে হাসির রেখা টেনে বলেছিল, ডাকলেই আসব, আমার পেশাই তো এই।

পেশা, শয়তানের বাদশা কোথাকার। আশিস ডাক্তারের উদ্দেশ্যে মনে মনে গালাগাল দিলেন তিনি। এই সময় পৌরসভার জলের ট্যাঙ্কের ছায়ায় তিনি দাঁড়ালেন, যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। উড়ানিতে মুখের ঘাম মুছলেন, জোরে জোরে শ্বাস নিলেন।

আষাঢ়ের আকাশ বিষণ্ণ, ভেজা ভেজা। সকালের মুখপাতে দু-এক পশলা ইলশে গুঁড়ি হয়েছে, তারপর থেকেই গুমোট। তাদের শহরের উপরের এই ভিখারুতি আকাশের দিকে তাকিয়ে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে রমাকান্ত বুঝতে চাইলেন, বৃষ্টি আদৌ আর হবে কিনা। ঠিক এই সময়ই সাইকেল রিক্‌সোর কান-ফাটানো হর্নে তার মনোযোগটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল আর রমাকান্ত দেখলেন একজন আসামী বেশ সুখী-সুখী চেহারা নিয়ে আয়েসী চঙে তাঁর নাকের উপর দিয়ে রিক্‌সা চেপে চলে গেল। তার উদ্দেশ্যে একদলা থুথু ছেটালেন রমাকান্ত।

যে-লোকটার জেলে থাকার কথা, সে যখন প্রকাশ্যেই রিক্‌শা দাবড়িয়ে বেড়ায়, রমাকান্ত ভাবেন, যে-কোনো সৎ লোকেরই উত্তেজিত হওয়ার কারণ সেখানে বর্তমান। আসামী অর্থাৎ স্থানীয় হাইস্কুলের হেড্‌মাস্টারের প্রতি তাই তাঁর এই উত্তেজনাকে তিনি সম্পূর্ণ সংগত বলেই মনে করলেন। স্কুলবাড়ি সম্প্রসারণের সঙ্গে সমতা রেখে তার নিজের বাড়িটিও যখন এক অদৃশ্য যোগাযোগে রমাকান্তর চোখের সামনেই তিনতলা পর্যন্ত উন্নত হল, তখনই ডেকে ডেকে তিনি তাঁর সন্দেহের কথাটা বলেছিলেন সবাইকে। হেডমাস্টার প্রাণহরি তাঁর প্রতিবেশী; এবং তিনি জানেন, চার কাঠা জমির উপর দুখানা টালির ঘরকে তিনতলা দালানে রূপান্তরিত করতে হলে যে-পরিমাণ অর্থ-স্বাচ্ছল্য থাকা প্রয়োজন, প্রাণহরির কখনো তা ছিল না। সুতরাং, এর থেকে প্রমাণিত হয়, স্কুলের বিল্ডিং গ্র্যান্টের টাকাটা কখনোই সৎভাবে খরচ হয় নি। সে-কারণেই, প্রাণহরির সাম্প্রতিক সামাজিক প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও রমাকান্ত তাকে আসামী ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন না। সেই সঙ্গে তাঁর আরো মনে হল যে, লক্ষণ এবং প্রাণহরিদের যখন জেলের ভিতর থাকা

উচিত ছিল, তখন অকল্পনীয়ভাবে তারা এই শহর এবং শহরের সমাজের কর্তা হয়ে বসেছে; এর থেকে এ-ই প্রমাণিত হয় যে, সমাজ বিত্তবান এবং লম্পটের দাস। এ-কথা ভাবার সাথে সাথে রমাকান্তর মনে এক উষ্ণ প্রক্ষোভের সৃষ্টি হল; সে-প্রক্ষোভ ক্রমশ এই সমাজ, সমাজের অধিকর্তা এবং মানুষের প্রতি তীব্র ঘৃণায় রূপান্তরিত, আর রমাকান্ত ভাবতে চাইলেন, দেশে কী এ আইন রচিত হতে পারে না, যার বলে চোরাকারবারিদের নৃশংসতম শাস্তি দেয়া যেতে পারে, খাদ্য এবং ঔষধপথ্যাদিতে ভেজাল দেয়ার অপরাধে মানুষকে শ্বাসরোধী প্রকোষ্ঠে তিলে তিলে মারা যায়, পদ এবং প্রতিষ্ঠার সুযোগ নিয়ে যারা ব্যভিচার করে তাদের তালু ফুটো করে তপ্ত লোহার শিক ঢুকিয়ে দেয়া যায়। (রমাকান্তর মনে হল, ভেজালদারদের শাস্তি কিঞ্চিৎ লঘু হল যেন। ভেজাল হচ্ছে মনুষ্যসমাজের জঘন্যতম অপরাধ। খাদ্যে কাঁকর, স্টোনডাস্ট, শেয়ালকাঁটা, মৃত জানোয়ারের চর্বি প্রভৃতি মিশিয়ে যারা মানুষের পরমায়ু অপহরণ করার এবং গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, [হে ঈশ্বর, আমাদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন; আমাদের বংশপঞ্জীর আগামী তালিকায় দীর্ঘায়ু আর কেউ জন্মাবে না।] তাদের শাস্তি আরো গুরুতর হওয়া উচিত: কাঁচের একটা প্রকোষ্ঠে এদের রাখা হল; সেই প্রকোষ্ঠের বাইরে চারধারে রাশি রাশি কালকেউটে ছেড়ে দেওয়া হল; ওরা সেই স্বচ্ছ দেওয়ালে এক তীব্র ক্রুদ্ধতায় ছোবলের পর ছোবল দিয়ে চলল, আর ভিতরের কালকেউটের চাইতেও ভয়াবহ সেই লোকগুলি প্রতি মুহূর্তের মৃত্যুর আশঙ্কায় ভয়ে নীল হয়ে যেতে থাকল, ঘামতে থাকল, হিম হয়ে আসতে লাগল এবং তীব্র আর্তনাদ করতে লাগল। প্রতি মুহূর্তের মৃত্যুর আশঙ্কায় এই যে জীবনধারণের যন্ত্রণা, এই শাস্তি আমৃত্যু ওদের জন্য নির্ধারিত করার পরিকল্পনায় রমাকান্ত এক অনাবিল আনন্দ লাভ করলেন।)

এই সময় আকণ্ঠ এক শুষ্ক অনুভূতি তাঁকে পীড়িত করল। তাঁর মনে হল, তিনি যেন কতদিন জল খান নি, অথবা আদৌ কিছুই খান নি। কথাটা মনে হতেই নিজেকে দুর্বল কাহিল-কাহিল ঠেকল তার। একটা ঝিমধরা অনুভূতির আবেশে রমাকান্ত কতক্ষণ চলচ্ছক্তিরহিত হয়ে থাকলেন। সূর্য যদিও মেঘের অন্তরালে, চারধারে যদিও ছায়াচ্ছন্নতা এবং প্রাক্-বর্ষণের

পরিবেশ, তবু গ্রীষ্মোত্তর ঋতুর উষ্ণতায় তিনি লবণাক্ত হয়ে উঠলেন। ডাকবাক্সের গড়নের জলকলটার দিকে নজর পড়তেই জল খাওয়ার এক প্রগাঢ় ইচ্ছা তাঁর চেতনায় সঞ্চারিত হল; কিন্তু তাঁর ব্রাহ্মণ্য সংস্কার তাঁর সে-ইচ্ছাকে হাত ধরে ফিরিয়ে নিয়ে এল, মা যেমন করে দুরন্ত সন্তানকে ঘরে টানেন। জলকলের ধারার নিচে অঞ্জলীবদ্ধ হয়ে তিনি দাঁড়ালেন, চোখে জলের ছিটে দিলেন বার বার, কুলকুচি করলেন, হাত-পা ধুলেন, ঘাড়ে ভিজে হাত রাখলেন; তারপর ডানহাতের তর্জনী এবং বুড়ো আঙুল দিয়ে দুচোখের সন্ধিস্থলের নাকের হাড়টিকে সজোরে টিপে ধরলেন এবং চোখ বন্ধ করে থাকলেন। খানিকটা যেন আরাম বোধ করলেন রমাকান্ত; আঙুল-জোড়া তুলে নিলেন, তাকালেন এবং রেলের রক্তবর্ণ দেওয়ালে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হল। রমাকান্ত প্রথমেই দেখলেন, ঋতুবন্ধের এবং গর্ভনিরোধক ঔষধের বিজ্ঞাপন; তারপর ক্রমশ তাঁর দৃষ্টির পরিধিতে ধরা পড়ল সিনেমার সচিত্র রঙিন পোস্টার (পোস্টারের মেয়েটি হাঁটু মুড়ে বসে আছে এবং তার ফ্রকটিকে যেন বাহুল্যবোধেই ঊর্ধ্বাংশের দিকে টেনে তুলছে), হাতুড়ে অষুধ, স্বপ্নাদ্য কবচের বিবরণী-সংবলিত হ্যাণ্ডবিল, টিউটোরিয়াল হোমের বিজ্ঞাপন। অতঃপর তাঁর নজরে এল দেয়ালের নিম্নাংশ জুড়ে আলকাতরা দিয়ে বড়ো বড়ো হরফে লেখা—বিধান সভায় যশোদাজীবন ঘোষ এবং লোকসভায় চঞ্চল ভট্টাচার্যকে ভোট দিন, তার উপর চক দিয়ে অনভ্যস্ত হাতে দাগা বুলোনোর মতো করে লেখা, কবির—রমাকান্তর মনে হল, তাঁর পা যেন হড়কে যাচ্ছে, তিনি যেন পড়ে যাচ্ছেন, জলকলের মাথায় হাত রেখে এক অনিবার্য পতনের বেগকে তিনি সামলে নিলেন। এই সময় তিনি ভাবতে চাইলেন, যদি তাঁর অক্ষর-পরিচয় না থাকত, কিংবা যদি তিনি দৃষ্টিমান না হতেন, তবে নিজেকে এই মুহূর্তে তিনি সৌভাগ্যবান বলে মনে করতেন। কুঞ্চিত-নাসা রমাকান্ত দেখতে পেলেন, শহরময় নিদারুণ নোংরামির এক মড়ক ছড়িয়ে পড়েছে, এ-শহর আর তাঁর আবাল্যের সেই পরিচিত পরিচ্ছন্ন শহর নেই, তাঁর সন্তানেরা ড্যালা ড্যালা খড়িমাটি দিয়ে তাঁর বাড়ির দেয়ালে তীব্র দুর্গন্ধ ছড়িয়ে দিচ্ছে। এমন সময় পিছন থেকে কেউ বলল, পণ্ডিতমশাই, এখানে দাঁড়িয়ে ক্যানো? ঘুরতেই সুরজিতের মুখোমুখী হলেন তিনি এবং গর্জন করে উঠলেন, এ-সভ্যতার নিশ্চিত কলেরা হবে। বলেই হন্ হন্ করে হাঁটতে লাগলেন। বিস্মিত সুরজিৎ তবু বলল, কী হল, পণ্ডিতমশাই—

সুরজিৎকে ক্রোধের বর্শার শিকার করে উত্তপ্ত রমাকান্ত পথ সংহার করতে লাগলেন। অবিশ্যি সুরজিৎকে তিনি যে একেবারে অপছন্দ করেন তা নয়। ও মাঝে মাঝে তাঁর কাছে কালিদাস ভবভূতি মাঘ বুঝতে আসে। এজন্যে সুরজিতের প্রতি একটা সস্নেহ প্রসন্নতা তিনি মাঝে মাঝে অনুভব করেন। কিন্তু ছোকরা রাজনীতির সাথে জড়িত। আর রমাকান্তর স্থির বিশ্বাস, মতলববাজ লোক ছাড়া রাজনীতিতে অপর কারো আসক্তি থাকতে পারে না। সুরজিতের প্রতি এ-কারণে তিনি অপ্রসন্ন। তা ছাড়া, সে বাঙাল, আর বাঙালদের প্রতি রমাকান্তর তীব্র বিদ্বেষ। কারণ তাঁর ধারণা, তাঁদের জীবনের সর্বব্যাপী অসামঞ্জস্যতার জন্য এই উদ্‌বৃত্ত মানুষগুলো দায়ী। এদের জন্যেই ভোগ্যদ্রব্যের দাম বেড়েছে, জীবিকার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা তীব্রতর হয়েছে, তাঁরা তাঁদের নিজের দেশেই পরবাসী হয়ে গেছেন। তাঁর আবাল্যের সেই শহরটি রমাকান্তর চোখের সামনেই পালটে গেছে। রাস্তায় এখন কদাচিৎ চেনা মুখের সাক্ষাৎ পান তিনি। তাঁর তাই মাঝে মাঝে মনে হয়, তিনি যেন কোনো নতুন শহরে এসেছেন; এ-শহরের মানুষকে তিনি চেনেন না, এদের ভাষা এবং জীবনবোধের সাথে তাঁর কোনো পরিচয় নেই। অবিশ্যি সুরজিৎ যদিও বাঙাল এবং প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সাথে জড়িত, তবু তার সম্পর্কে রমাকান্তর মতামত খুব উগ্র নয়। তাঁর মনে হয়, কিছুটা কাটছাঁট করে নিলে সুরজিৎকে চলনসই ভদ্রসন্তান বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

খানিক বাদে নিকটবর্তী এক কোলাহল তাঁকে আকৃষ্ট করল। অদূরের সিনেমা ঘরের সামনে মুখ্যত বালখিল্যদের জটলা তাঁর নজরে এল, দ্রুত পথটুকু পেরোলেন তিনি। কিন্তু অচিরাৎ তাঁকে বেগ সংবরণ করে একপাশে সরে দাঁড়াতে হল। হাওয়ায় কিছু গন্ধ ছড়িয়ে এক আধুনিক দ্রৌপদী খুরের আওয়াজ তুলে চলে গেল, আর রমাকান্তর মনে এ-ইচ্ছে শরীরি হয়ে উঠল যে, মেয়েটিকে আগাপাস্তোলা চাবকে দেন তিনি, রমাকান্ত ইদানিং দেখেছেন, এই আধুনিক দ্রৌপদীরা বস্ত্র পরিত্যাগের নির্লজ্জ প্রতিযোগিতায় সদা ব্যস্ত। অবিশ্যি তিনি জানেন, এ-শহরে গৃহস্থের সংখ্যা নিতান্তই সীমিত, চরিত্রের শুচিতা এ-শহরে প্রায় কারোরই নেই। তাই নিজের বাড়ির সামনে বড়ো বড়ো হরফে লিখে রেখেছেন তিনি, গৃহস্থের বাড়ি। অর্থাৎ এ-বাড়ি আর দশটা বাড়ির মতো বেচাল নয়। রমাকান্ত বুঝেছেন, সামনের বল্‌গা কখনো ঢিলে করতে নেই; কারণ, যৌবন কয়েক হর্স পাওয়ারের চাইতেও শক্তিশালী।

এটা বুঝেছেন বলেই এ-শহরের সংক্রামক ব্যভিচারের হাত থেকে গৃহস্থ রমাকান্ত তাঁর গৃহকে রক্ষা করতে পেরেছেন। কথাটা ভাবার সাথে সাথেই নিজের প্রতি তিনি প্রসন্ন হয়ে উঠলেন।

এই সময় আকাশ থেকে বৃষ্টির দানা ঝরতে লাগল, রমাকান্ত পথের পাশের একটি দোকানের রকে উঠে দাঁড়ালেন। দেখতে দেখতে জায়গাটা পথচলতি মানুষের ভিড়ে ভরে উঠল। সামনের ছেলেগুলো হঠাৎ রমাকান্তর মনোযোগ আকর্ষণ করল। ফু-পা ফাঁক করে সিগ্রেট টানছে ওরা; মেয়েরা ইদানিং যে-ব্লাউজ পরিত্যাগ করেছে, সে-ধরনের ব্লাউজ ওদের গায়। ওরা নিজেদের ভিতর কথা বলছে, হো-হো করে হেসে উঠছে, সার্কাসের ক্লাউনের মতো শরীর দোলাচ্ছে। ওদের কথা শুনে রমাকান্তর শরীর হিম হয়ে এল :

খাসা মাল, মাইরি।

[রমাকান্ত দেখলেন, ও-ফুটের জুয়েলারি দোকানের বারান্দায় সুশ্রী একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে।]

লয়া আমদানি।

বিলুদের পাড়ায় ভাড়া এসেছে।

বিলু.স্লা ভপেটিস করে না দেয়।

অত সোজা লয় বে।

কি সোজা লয়। বল স্লা এখানেই চুমু খেয়ে নি।

হো যায় রুস্তম।

বাঘি ক্যাল।

এক শো 'দীপ জেকে দেখো'।

হাওয়ার মুখে যেমন করে পল্‌কা শরীরের লাউডগা দোল খায়, এক নিদারুণ উদ্‌বেগের দোলায় রমাকান্তর মন তেমনি করে দুলতে লাগল। প্যান্টের পকেট থেকে ছুরি বের করে ফলাটা বার কয়েক দেখে নিল ছেলেটি, তারপর কোমরে গুঁজে ফেলল এবং কাঁধ দুটোয় ঝাঁকানি দিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল। আর ঠিক তখনই, এবং এমনি সব ঘটনাই প্রমাণ করে যে ঈশ্বর আছেন—রমাকান্ত ভাবলেন, পেঁচো পাগলা পাশের রক থেকে নেমে মেয়েটির কাছে গিয়ে পরিচিত স্বরে বলে উঠল, বিয়ে করবে খুকুমনি! মুহূর্ত কয়েক এই আকস্মিকতার ঘোরে মেয়েটি তার স্বাভাবিক শক্তির ভগ্নাংশকেও খুঁজে পেল না; কিন্তু ছেলেটি যখন পেঁচোর নাকে

ঘুষি বসিয়ে দিয়ে চিৎকার করে উঠল, দা, ভদ্রলোকের মেয়েছেলেদের যা-তা বলা, লজ্জা এবং ভয়ের তাড়নায় তখনই জুয়েলারি দোকানের ভিতর ঢুকে পড়ল সে। কারা যেন এই সময়ই বলে উঠল, বেশ কস্তে দু-ঘা দাও তো ভাই। ব্যাটা পাগল বলে যা-তা করবে। পেঁচোর আর্তনাদের সুরে রমাকান্তর প্রসিদ্ধ বিবেকে এক তীব্র যন্ত্রণাকর অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল, তিনি চিৎকার করে উঠলেন, এই জানোয়ারের বাচ্চারা—এবং লাফিয়ে পড়লেন রাস্তায়। আর রমাকান্তকে বিস্মিত করে পাশের গলিপথ দিয়ে পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল ছেলেটি এবং পেছন পেছন সাঙ্গাতরাও। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটি পুলিশ-ভ্যান এসে দাঁড়াল। টাউন দারোগা নেমে এল ভ্যান থেকে। পেঁচোর দু-কষ বেয়ে তখন রক্ত গড়াচ্ছে। জুয়েলারি দোকানের মালিক এগিয়ে এসে দু-হাতের চেটো পরস্পর একসাথে ঘষল এবং যেন কোনো দাঁতের মাজনের বিজ্ঞাপন দিচ্ছে তেমনি ঢঙে তার ঝকঝকে দাঁতের মাড়ি বের করে বলল, নমস্কার স্যর। কথা দুটি বলার সাথে সাথেই তার উপরের পাটির সামনের দিকের বাঁধানো চারটি দাঁত খুলে গেল আর জিভটাকে অতি দ্রুত সামনের দিকে প্রসারিত করে ঠেলে ঠেলে দাঁতকটি যথাস্থানে বসিয়ে দিল সে। তারপর গলায় সরু সোনার চেনটাকে আদর করতে করতে বলল, পেঁচোকে স্যর আপনারা যদি শায়েস্তা না করেন, তবে তো মেয়েদের বাড়ির বার হওয়াই মুস্কিল। ওর পাগলামো একটা ভান, পুরোপুরি খাদ মেশানো জানবেন স্যর। রমাকান্ত এগিয়ে এসে বললেন, গোড়াগুড়িই এই নকল দাঁত এবং সরু চেনের লোকটিকে অপছন্দ করেন নি, পেঁচো আজ ঈশ্বর-প্রেরিত, ওঁকে আপনাদের ডাক্তারখানায় নিয়ে যাওয়া উচিত। দারোগা বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, ব্যাপার কী। পাশের ছেলেটি বলে উঠল, ওঁর ওইরকমই সব তেড়াবাঁকা কথা, এতে কান দেবেন না স্যর। ছেলেটিকে এক নজরে দেখে নিয়ে তার হাতে তীব্র ঝাঁকুনি দিয়ে রমাকান্ত অসহিষ্ণু কণ্ঠে প্রশ্ন জিগ্‌গেস করলেন, তুমি শোন নি, তুমি তো আমার পাশেই ছিলে। ছেলেটি বিব্রতভাবে ফিস্‌ফিসিয়ে উঠল, তার চোখের তারায় অস্বস্তির ছাপ, ওদের তো চেনেন না, ওরা সাংঘাতিক ছেলে মুহূর্তেই রমাকান্তর মাথায় যেন আগুন জলে উঠল, উন্মত্তের মতো ছেলেটি জামা ফালা ফালা করে দিয়ে তিনি চিৎকার করতে লাগলেন, ভদ্রলোকদের ভ নেই না? শালা বেজন্মার বাচ্চা—

বহুজনের সম্মিলিত গম্ গম্ শব্দের তরঙ্গ কানে পৌঁছতেই রমাকান্ত দেখলেন, তিনি মেলার কাছাকাছি এসে গেছেন। ভিড়ের মাঝে পথ করে করে গঙ্গার উঁচু তীরভূমিতে এলেন একসময়। নিচে গঙ্গার গা-লাগোয়া বিশাল মাঠে মেলা বসেছে। মেলার শেষপ্রান্তে সন্ত-রঙ-করা জীর্ণ একটি রথ, আপাতত চতুর্দিককার কোলাহল-মুখরতার প্রধান উপলক্ষরূপে গৃহীত এবং স্বীকৃত। মেলার জমায়েতটা এক নজর দেখে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে থাকলেন তিনি। ফুচকা, বাদামভাজা, পাঁপর এবং রকমারি মিষ্টির দোকান, মনোহারি দোকান, ফটো তোলার স্টুডিও, গাছ-গাছড়া ফুলের নার্সারি, কাগজ এবং প্লাষ্টিকের কৃত্রিম ফুলের সম্ভার, ম্যাজিকের তাঁবু। তাঁবুর সামনে রঙ-করা এবং বিচিত্র সাজের এক ছোকরা মাইকে ক্রমাগত চেঁচাচ্ছে, জানবার ঔর আদমীকা নম্বরী খেল···তিন আনা, (উন্নিশ পইসা···), গোলকধাম, নাগরদোলা, জরি-বুটির দাওয়াই বিক্রির দোকান (···উপরে ভগোয়ান, নিচে ধরিত্রীমাতা ঔর গঙ্গামাই, বিশওয়াস করে লিয়ে যান। কিম্মৎ—কুস্ নেহি, সিরফ পাঁচানা পাঁচানা পাঁচানা···ইত্যাদি ঘোষণা শুনতেই হল), রাজনৈতিক কর্মীদের কৌটো নাচানোর মুদ্রা প্রভৃতি দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে (এবং অনেক কিছুই না দেখে এবং না শুনে) বহুজনের নিশ্বাসের উত্তাপে ঘামতে ঘামতে ভিড়ের চাপে চাপে শিবমন্দিরের সামনে খিতোলেন তিনি। যদিও রথযাত্রা উপলক্ষে এই মেলা, তবু বাবার মাথায় জল ঢেলে ফাউ পুণ্যার্জনের লোভ কেউই এড়াতে পারে না, মেয়েরা তো নয়ই। এই শিবমন্দিরের একদা পূজারী ছিলেন রমাকান্ত। কিন্তু তাঁর ব্রহ্মতেজ সহ্য করতে না পেরে ট্রাস্টি বোর্ড তাঁকে সে-দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে। রমাকান্ত জানেন, দেবতা নিয়ে বাণিজ্য করতে এদের উৎসাহ খুব তীব্র। তাই এই একটি দিন ছাড়া বছরভর আর এ-মুখো হন না তিনি। লিখিত কোনো বিধান না থাকলেও পুরাতন ঘনিষ্ঠতার দাবিতে এ-দিনটিতে তাঁর কিছু প্রাপ্তি ঘটে।

চাপ চাপ ভিড়ে মন্দিরের সিঁড়ি অব্দি এসেই থামতে হল তাকে। বিশৃঙ্খল ভিড় এখানে গ্রন্থিবদ্ধ হয়েছে; এ-গিঁট বুঝি আর খুলবে না, রমাকান্তর মনে হল। সেই জমাট চাপ থেকে একাধিক বিজ্ঞ কৌশলে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে সিঁড়ির পাশ ঘেঁষে দাঁড়ালেন তিনি। তারপর বহুজনের পা মাড়িয়ে কনুয়ের গুঁতোয় অনেককে বিধ্বস্ত করে সম্মিলিত

গালাগাল আর কোলাহলের ভিতর মন্দিরের বারান্দার উঠে পড়লেন তিনি এবং খ্যাপা মোষের মতো জোরে জোরে শ্বাস ফেলতে লাগলেন। সেখান থেকেই একসময় ভলানটিয়ারদের ভিড় নিয়ন্ত্রণের অক্ষমতা তাঁর চোখে পড়ল। কোলাহল চিৎকার ধস্তাধস্তিতে জায়গাটা কার্য হয়ে উঠেছে। এর ভিতরই কারো গয়না খোয়া গেল, কারো বুকে কেউ হাত ধরল, কেউ অজ্ঞান হয়ে গেল। কিছু একটা ভেবে অথবা আদৌ কিছু না ভেবে রমাকান্ত হঠাৎ প্রাণপণ শক্তিতে চিৎকার করে উঠলেন, পকেটমার পকেটমার। ভিড়ের কণ্ঠ উচ্চকিত হয়ে উঠল, কোথায় দাদা, কোথায়। রমাকান্ত হাত উঁচিয়ে কাউকে দেখালেন আর মুহূর্তেই হালকা হয়ে এল ভিড়ের শরীর ; নতুন এক মজার নেশায় লোকগুলো ছুটল এবং কিছুক্ষণের ভিতরই একজনের আর্তনাদের সুর ভেসে এল। রমাকান্ত তাঁর আচরণকে এই সময় বিশ্লেষণ করতে চাইলেন ; যদিও তিনি জানেন না লোকটি পকেটমার কিনা, শুধু এদের মনোযোগটা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় এখানকার অবস্থাটা সহজ হয়ে এসেছে এবং এর আশু প্রয়োজন ছিল। সুতরাং লোকটির জন্য তার কোনো অনুকম্পা হল না বা তাঁর আচরণের জন্যে নিজেকে কোনো দিক দিয়েই অপরাধী ভাবার কোনো সংগত কারণ তাঁর মনে এল না।

হালকা ভিড়ে মন্দিরের পিছনকার ঘরে ঢুকে পড়তে তাঁর বিশেষ বেগ পেতে হল না। দারোয়ানটা একবার অভ্যেসবশে বাধা দিতে গিয়েছিল, কিন্তু তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই সভয়ে সে দরজা ছেড়ে দিয়েছিল। সেই পরিচিত চৌকোণো স্যাঁতসেতে এবং অন্ধকার ঘরে ঢুকে কয়েকমুহূর্ত কিছুই নজরে এল না তাঁর। চোখ বুজে কতক্ষণ অন্ধ হয়ে থাকলেন, একসময় সব কিছুই ঠাউরে এল। স্তূপীকৃত ফলমূল, ডাবের পাহাড় এবং ডাঁই-দেয়া খুচরো পয়সা বেশ স্পষ্টভাবেই দেখতে পেলেন তিনি। তীব্র উত্তেজনায় দু-খাবলা পয়সা উঠিয়ে ফতুয়ার পকেটে রাখলেন, তারপর গামছা পেতে ফলমূল তুলতে লাগলেন রমাকান্ত। তাঁর শরীর এই সময় ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। কোনো অপরাধবোধ যে তাঁকে পীড়িত করছিল তা নয়, অঢেল খাবার আর অগুণতি পয়সার সান্নিধ্যে এক ধরনের শারীরিক উত্তেজনা অনুভব করেন রমাকান্ত। তিনি জানেন, এর পরই বিন্দু বিন্দু ঘাম তাঁর দেহকে পরিস্রুত করে বেরিয়ে আসবে। এমন সময় অর্থাৎ রমাকান্ত যখন

তাঁর এই মানসিক দুর্বলতায় অভিভূত, তখন দরজার মুখ থেকে কেউ চেঁচিয়ে উঠল। যদিও লোকটিকে তিনি চিনলেন না, তবু তিনি আন্দাজ করতে পারলেন লোকটি মন্দিরের নতুন কর্মচারী। সে চেপে ধরল তাঁকে, তারপর, পোদ্দারদের মোটরগাড়ি বিকল হয়ে যাবার আগে ধমকের স্বরে যেমন গর্জে ওঠে, তেমনি করেই ফ্যাসফেসে গলায় গর্জে উঠল, দেবস্থানে চুরি করতে এয়েছ শালা, অ্যা। রমাকান্ত তাকে এক ঝটকায় স্তূপাকার ডাবের উপর ফেলে দিয়ে ভেংচিকাটার মতো করে বললেন, এ কী তোর বাপের সম্পত্তি নাকি রে বানচোৎ, এবং অত্যন্ত আত্মস্থ হয়ে ফলমূল গোছাতে লাগলেন। ডাবের স্তূপ থেকে দীর্ঘ প্রচেষ্টায় নিজেকে উঠিয়ে এনে লোকটি রমাকান্তর হাত চেপে ধরল এবং চেঁচিয়ে উঠল, চোর চোর। রমাকান্ত স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠে বললেন, খুব খারাপ হচ্ছে হে, দেবতার পুরুতপুত্তুর। লোকটি তার গলায় জমে-থাকা কাশির দলাটা বের করতে গিয়ে কতক্ষণ খক্‌খক্‌ করে আওয়াজ করল, তারপর দম ফুরিয়ে গেলে মানুষ যেমন চাপা চাপা কথা বলে, তেমনি সুরে খানিকটা ফিসফিসানির ঢঙে বলল, হাত দুটো তোর কুষ্ঠ হয়ে পচবে, মন্দিরে চুরি করিস। রমাকান্ত অধৈর্যের ভঙ্গিতে এবার চেঁচিয়ে উঠলেন, দুবেলা ভাতিজ্বো না খেয়ে আছি আর আমাকে দেবতার ভয় দেখাচ্ছিস। কি তোর দেবতার আমি ইয়ে করি। বলে লোকটির মণিবন্ধে দাঁত বসিয়ে দিলেন তিনি, আর্তনাদ তুলে পিছিয়ে গেল সে আর ঠিক তখনই একটা ডাব তুলে তার মাথায় বসিয়ে দিলেন, লোকটি ঘুমোতে লাগল।

খানিক বাদেই ফলমূলের পুঁটলিটা বাঁ হাতে নিয়ে, ডান হাতে গোটা পাঁচ-ছয় ডাব ঝুলিয়ে মন্থরগতিতে মন্দির ছেড়ে বেরিয়ে এলেন রমাকান্ত।

ডাবের দোকানের সামনে তিনি থামলেন। হাতের ডাব-কটা মাটিতে রেখে উবু হয়ে বসলেন, উড়ুনীতে ঘাম মুছলেন, তারপর দোকানীর সাথে দর করতে লাগলেন। শেষপর্যন্ত দেড়টাকায় ডাব-কটি বেচে দিলেন তিনি বার কয়েক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, আকাশের দিকে মেলে ধরে ভুরু কুঁচকে পরীক্ষা করে নোটটির অকৃত্রিমতায় যখন তাঁর মনে ধীরে ধীরে একটা প্রত্যয়ের জন্ম হচ্ছে, ঠিক তখনই কারো ডাকে পিছন ফিরতে হল তাঁকে। বলিষ্ঠ কাঠামোর একজন প্রৌঢ় তাঁর মুখে দৃষ্টি ধরে রেখে মিটমিটিয়ে হেসে

বলল, কি হে, চিনতে পারলে না আমাকে। আমি রমণী। তাকে চিনতে পারলেন রমাকান্ত এবং সেজন্যেই বিস্মিত হয়ে বললেন, তুমি কবে এলে। রমণী তার দামী চুরুটের ছাই ঝেড়ে ফেলে বলল, গতকাল। দু-যুগ বাদে কেন জানি মনে হল দেশটা দেখে আসি। সঙ্গে ছেলেকেও এনেছি; দেশটা, বাপ-ঠাকুর্দার ভিটেটা অন্তত একবার দেখা হয়ে থাক। প্রণব, প্রণাম কর এঁকে। রমণীর পিছন থেকে স্বাস্থ্যবান সুশ্রী প্রণব এগিয়ে এল, প্রণাম করল রমাকান্তকে, দেবভাষায় তাকে আশীর্বাদ করলেন তিনি। রমণী প্রণবের দিকে প্রসন্ন হয়ে তাকিয়ে বলল, এই আমার একমাত্র ছেলে, এন্‌জিনিয়ারিং পড়ছে। মেয়েটিকে মোটামুটি সংপাত্রের হাতেই দিতে পেরেছি। আরো কিছু বলবে বলেই রমণী এখানটায় থামল, প্রণবকে এগিয়ে যেতে বলল; প্রণব চলে যেতেই গলায় সহানুভূতির সুর তুলে সে বলল, আমি এসেই তোমার খোঁজ নিয়েছি। এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি, রমা। তোমাকে নিয়ে আমাদের কত গর্ব ছিল। এ-গাঁয়ে প্রথম এন্‌ট্রান্স পাশ করেছিলে তুমি, স্কলারশিপ পেয়েছিলে। মনে আছে, তোমাকে কাঁধে নিয়ে সারা গাঁ ঘুরেছিলাম আমরা। আমরা সবাই জানতাম, তুমি একটা বড়ো কিছু হবে। তোমার এ-রকম হল ক্যানো, রমা। রমণীর এই নিরীহ বিবৃতি রমাকান্তের মনে এক যন্ত্রণা ছড়িয়ে দিল। আকণ্ঠ বেদনার উচ্ছ্বাস নিয়ে রমণীর মুখের দিকে খানিকক্ষণ অভিভূতের মতো তাকিয়ে থাকলেন, তারপর দীর্ঘ প্রচেষ্টায় বললেন, কাল তোমার ওখানে যাব।

হাঁটতে হাঁটতে নিজেকে খুব দুর্বল মনে হল তাঁর। বহুকাল বাদে সহানুভূতির উত্তাপ পেয়েছেন তিনি। বিদ্রূপ এবং করুণায় অভ্যস্ত রমাকান্তের কাছে এ এক নতুন স্বাদ! চোখের কোলে জল জমেছে তাঁর, কতকাল, আঃ, কতকাল আমি কাঁদি নি, রমাকান্ত দু-চোখের রমণীর যন্ত্রণাকে উপভোগ করতে করতে ভাবতে চাইলেন। এই সময় তাঁর মনে হল, রমণীকে বলতে পারতেন তিনি, রমণী, এই বৈশ্যযুগে অর্থের পরিমাপেই মানুষকে বিচার করা হয়। জ্ঞান বল, বিদ্যা বল, সমস্ত কিছুকেই পুরাতন অভ্যাস বলে এ-যুগে বাতিল করে দিয়েছে। আর এখানেই আমি পরাজিত। এ-শহরে আমার তাই কোনো পার্শ্বচরিত্রের ভূমিকাও নেই। এই একই কারণে আমার

সংসারেও আমি পরাজিত, রমণী। সন্তানের অশ্রদ্ধার গ্লানিতে প্রতিনিয়ত আমি দগ্ধ হচ্ছি।

ঠিক এই সময়ই অর্থাৎ যখন এই বহুজনের ভিড়ে রমাকান্ত তাঁর আপন অস্তিত্বের ভারে বিব্রত এবং সে-কারণেই এই মেলার কোনো ভগ্নাংশও যখন আর তাঁর রেটিনায় প্রতিবিম্বিত নয়, সেই সময় একটি চেনা মুখের অস্পষ্ট আভাস যেন তিনি দেখতে পেলেন। ভিড়ের মাঝখানেও মুখটিকে ধরতে চাইলেন রমাকান্ত এবং তার পরবর্তী দৃষ্টিতেই তিনি দেখলেন, তাঁর মেজো মেয়ে লতিকা মিত্তিরদের কলেজ-পড়া ছেলেটির গায়ে গা ঠেকিয়ে হাঁটছে। তিনি আরো দেখলেন, ওরা মিষ্টির দোকানের দিকে এগোল। ঠিক এ-সময়ই লতিকার সাথে চোখাচোখি হল তাঁর আর রমাকান্তর মনে হল তাঁর দিকে একরাশ তাচ্ছিল্য ছুঁড়ে দিয়ে ছেলেটির হাত ধরে দোকানে ঢুকে পড়ল লতিকা। কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল হয়ে থাকলেন তিনি; তাঁর এখন কি করা উচিত রমাকান্ত কিছুতেই তা ঠিক করতে পারলেন না, পা দুটো তাঁর অবশ হয়ে এল। এ-সময়ই আর-একটি দোকানের খুঁটিকে চেপে ধরে ধীরে ধীরে বসে পড়লেন, উড়ুনীর প্রান্তভাগ দিয়ে মুখ ঢাকলেন, যেন এ-মুখ আর কাউকে দেখাবেন না তিনি। এমনি করেই বসে রইলেন কতক্ষণ, কিন্তু ক্রমশ তাঁর মনে পুরাতন এক প্রক্ষোভের উত্তেজনা অনুভব করলেন তিনি এবং সেই সঙ্গে অধিকারবোধের মোহ তাঁর মনে শক্তির সঞ্চার করল। সুতরাং, সেই খাবারের দোকানের দিকে পা বাড়ালেন রমাকান্ত। দূর থেকে দেখলেন, পরম তৃপ্তিতে দুবেলার ক্ষুধার তাড়নায় গোগ্রাসে খাচ্ছে লতিকা। সঙ্গে সঙ্গে মনের সেই অধিকারবোধ এবং উত্তেজনাকে হারিয়ে ফেললেন তিনি, এই মুহূর্তে লতিকাকে কিছু বলার সাহস হল না তাঁর। শুধু তাঁর মনে হল, দু-বেলা তার সংসারটা উপোস করে আছে, হাতের পুঁটলিটা ভীষণ ভারি ঠেকল তাঁর।

শেষ আষাঢ়ের কান্না মাথায় নিয়ে বড়ো শড়কের সেই বাসী জঞ্জালের সামনে থমকে দাঁড়ালেন রমাকান্ত। চারদিকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে আবর্জনার শরীরটা এখন গলছে। সমস্ত রাস্তাময় থিকি থিকি ময়লার তরল বিস্তার। মুহূর্তখানিক ভেবে নিয়ে সেই তরলিত দুর্গন্ধে পা ফেললেন তিনি। এই সময়ই তাঁর মনে হল, বাড়ির সামনে 'গৃহস্থের বাড়ি' লেখাটিকে লালন করার আর কোনো মানে হয় না। দু-পায়ে গলিত দুর্গন্ধ মেখে রমাকান্ত এই সময়ই দেখতে পেলেন, চোখের সামনেই তাঁর বিড়ম্বিত সংসার, এই শহর এবং এই পৃথিবী ক্ষুধার আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছে, সে-আগুনে সরস্বতী এবং দৃশদ্বতী নদীর পরিসীমার ভূখণ্ডের সদাচার, নীতিবোধ, শুচিতা পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। রমাকান্ত নিজেও পুড়ছেন। সে-আগুনের উত্তাপ গায়ে নিয়ে তাঁর দগ্ধ বাড়ির দিকে এক নির্বোধ মমতায় পা বাড়ালেন রমাকান্ত।

দেবেশ রায়

যযাতি

গিরিজামোহন

ছেলে যখন আমার-ই যার ইচ্ছে সে-ই ছুঁতে পারে আমাকে। এই চারতলা বাড়ির একজন লোকও কি আমাকে মনে মনে অভিযুক্ত করছে না? করলেও তারা বা সে আমার সম্মুখে কথা বলবে না। এতদিন আমি-ই রেণুকে বলে এসেছি যে আদরে আদরে খোকার মাথা সেই-ই খেয়েছে। এবার থেকে রেণু খোকার নাম-ও আমার সামনে করবে না। সিধু আর খুকু তো তাদের দাদাকে এবার মেরে-ই-ছে, সুতরাং ওদের সম্বন্ধে আর ভাবনার কিছু নেই, খোকাকে ওরা প্রতিপক্ষ হিসেবে-ই চিনে নিয়েচে। তাহলে কি খোকা এ-বাড়িতে তার মায়েরই মনে একমাত্র থাকবে, আর তার মায়ের নীরবতা দেখে-দেখে হঠাৎ হঠাৎ আমার মনে পড়ে যাবে। খোকার উপর রাগ হবে। আমার সেই রাগ—আত্মপ্রতিষ্ঠার যেটা আমার একমাত্র অস্ত্র।

খোকার সঙ্গে কি কোনোদিনই আমার ভালো সম্পর্ক ছিল, এমন সম্পর্ক, যেখানে একপক্ষ থেকে আনুগত্য আর দাসত্ব, অপরপক্ষ থেকে আদেশ ও প্রভুত্ব। কোনোদিনই ছিল না বোধহয়। মাঝখানে,—খোকার যখন বছরখানেক বয়স, তখন থেকে খোকার বছর চার বয়স পর্যন্ত,—আমি-ই একটু বদলে গিয়েছিলাম। খোকার সঙ্গে খেলতাম, খোকাকে নিয়ে বেড়াতে যেতাম, খোকার আবোল-তাবোল কথা শুনতাম। খোকা যখন প্রথম কথা শিখেছিল সব উল্টো বলত, অদ্ভুত একটা স্বভাব ছিল ওর, গোরুকে বলত রোগু, গাছকে বলত ছাগ,—সে উল্টো করে দেখার স্বভাব এর এখনো গেল না। ওর একমাত্র অসুবিধা যে-'বাবা'-কে ও একেবারে উল্টে দিতে চাইত, সেটা উল্টোলেও 'বাবা'-ই থাকবে। তারপর কখন এক সময়, ঠিক মনে নেই, খোকার প্রতি আমার মনোনিবেশ শিথিল হয়ে এসেছিল। অফিসে যাবার আগে খাওয়ার আসনের পাশে খোকা তখনো একটা পিঁড়ি পেতে বসত আর আমার থালা থেকে তুলে-তুলে খেত।

একদিন আলমারি থেকে একটা কাগজ বের করে দেবার জন্য অনেকক্ষণ ধরে রেণুকে ডাকাডাকি করছিলাম। তখন আমরা ঐ ভাড়াবাসাটিতে ছিলাম, এই জমিটা বোধহয় কেনা হয়েছিল, বাড়ি যে হবে ভাবতেও পারি নি। খোকা কী একটা আব্দার ধরে ভীষণ কাঁদছিল, এত যে পাশের ঘর থেকে চেঁচিয়ে কথা বললেও রেণু শুনতে পায় নি। শেষে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দেখি খোকা দু-পা ছড়িয়ে কাঁদছে তারস্বরে আর রেণু দু-হাতে মুখ ঢেকে হাসছে, পায়ের শব্দ পাওয়া মাত্র আমার দিকে তাকিয়ে বলল "দেখ কাণ্ড, বলছে—" এই পর্যন্ত বলামাত্রই আমি প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়েছিলাম, জলডোবা মানুষের মতো খোকা কান্না থামিয়ে খাবি খেয়েছিল আর রেণুর মুখের হাসি গোল হয়ে গিয়েছিল—"তাহলে তোমার ছেলে নিয়েই তুমি থাক, আমার কাজকর্ম করার জন্য পাড়ার লোক ডেকে আনি—।" সেদিন থেকে খোকাকে আমার সামনে রেণু আদর করত না, আমার খাওয়ার আগেই খোকাকে খেলায় ব্যস্ত করে দিত; খোকা কান্না জুড়লে আমি যাতে শুনতে না পাই এমন জায়গায় নিয়ে যেত এবং তার দু-এক মাসের মধ্যেই রেণু চার বছর পরে দ্বিতীয়বার অন্তঃসত্ত্বা হল। খুকু।

সেইজন্যই কি খুকুকে রেণু কোনোদিন-ই তেমন ভালোবাসতে পারল না? এমনিতে অবিশ্যি বোঝার উপায় নেই। বাড়িতে দ্বিতীয় লোক ছিল না, একা মানুষ সবদিক সামলাত, দু-দুটো বাচ্চাকে আগলাত। তবু, যেন মনে হয় খোকার কথা বলা, হাসি-কান্না, গল্প-গুজব, খেলা, নিদ্রা-জাগরণ—সব কিছুর সঙ্গেই যেমন রেণু জড়িত ছিল, তেমন করে খুকুর সঙ্গে সে ছিল না। আমিও তো ছিলাম না। সেদিক থেকে প্রথমজাত-ই নন্দন, আর সব-ই সন্তান। কিন্তু সেই সময় এক-একদিন দেখতাম, খুকুকে হয়তো তেল মাখিয়ে রোদে শুইয়ে দিয়েছে ওর মা, খোকা খুকুর পাশে বসে-বসে তারস্বরে পড়ছে আর মাঝে মাঝে খুকুকে আদর করছে গম্ভীর। খোকা যা-ই করে তাই-ই গম্ভীর।

রেণু যে খোকাকে আমার কাছ থেকে আলাদা করে নিল তার ফলেই কি পরবর্তীকালে খোকার সঙ্গে আমার ব্যবধান ক্রমাগত বেড়ে গেল। প্রথমদিকে হয়তো, প্রথমদিকে কেন, সেদিন পর্যন্ত-ও, এই সেদিন-ও, যেদিন তার বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে খোকা আমাকে নির্মমভাবে ঘা দিতে লাগল, যেদিন প্রথম খোকা বিদ্রোহ করল, যেদিন খোকাকে প্রথম

আশ্চর্য দেখলাম,—খোকার সঙ্গে আমার কোনো ব্যবধান আছে দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারি নি—অথচ আজ খোকা আর আমি যে একেবারে আলাদা হয়ে গেছি তার বীজ বোনা হয়েছিল সেদিন, সেই সকালে খোকা-রেণু যেদিন তাদের জগৎ নিয়ে নীরবে আলাদা হয়ে গিয়েছিল।

সে-যে খোকার মা-ই নয়, আমার-ই স্ত্রী, সেটা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করতেই কি, ইচ্ছে করে, চেষ্টা করে, রেণু খুকুকে জন্ম দিল। নাকি এ-সমস্তটাই আমার চিন্তা।

রেণু যে আমার স্ত্রী—এ-কথাটাই রেণু কোনোদিন মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারে নি। কারণ, হয়তো, আমি ভুলতে দেই নি। রেণু তো আমার স্ত্রী-ই, তবে, আর এ পরিচয়টা সে ভোলে কি করে, ভোলার দরকারটাই বা কোথায়। প্রথম দরকারটা বোধহয় এখানে দেখা দিয়েছিল যে আমি রেণুর বাপের বাড়িকে সহ্য করতে পারতাম না। "তোমরা আসলে সম্পন্ন চাষা ছাড়া কিছু নও।" রেণুর বাবা-জ্যাঠামশাইয়ের বিরাট জোত ছিল। রেণুর বাবা ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত পড়েছিলেন। সেই কৃষিকাজের দৌলতেই আমার মতো এম্-এ পাশ পাত্র যোগাড় করতে পেরেছিলেন। এত যেখানে গরমিল সেখানে রেণুকে একটি পক্ষ বেছে নিতে হতই। হয় আমার পক্ষ, নয় তার বাপের বাড়ির পক্ষ। আমার শ্বশুরবাড়ির লোক কিন্তু কোনোদিনই আমাকে কোনো প্রকার অযত্ন তো করে-ই নি, সবসময় একটা সম্মান দিয়ে এসেছে। সে সম্মানটা-ও আমি আমার প্রাপ্য হিসেবেই নিয়েছি। শ্বশুর-বাড়ির সঙ্গে আমার গরমিলটা কোথায় ছিল? দু-পক্ষের স্বার্থের কোনো মিলনক্ষেত্র ছিল না। প্রাপ্যের চাইতে অনেক বেশি-ই তাদের কাছ থেকে আমি পেয়েছি। আসলে গরমিলটা ছিল জীবন সম্পর্কে ধারণার মধ্যে। শ্বশুরবাড়িতে বাইরের কাছারি বাড়ি, তার বাঁশের মাচা, তার সামনে গোয়ালঘরে আট-দশটা গোরু, পাশে খড়ের তিন-চারটা গাদা, ধানের বস্তা রাখবার বিরাট গোলা, চার ভিটেয় চারটে বড়-বড় ঘর—এই সব দেখে আমার গা ঘিন ঘিন করত, আর রেণুকে এ-বাড়ির সঙ্গে মিশিয়ে দেখলেই তার উপর আমার কেমন রাগ হত, কিন্তু রেণু বেশে-বাসে বা চলনে-বলনে কোনোদিক থেকেই আমার শ্বশুরবাড়ির প্রতিনিধিত্ব করত না। তখন কলকাতায় শিশিরবাবুর স্টেজ জমজমাট। আমি কঙ্কাবতীর নানা ভঙ্গির ছবি এনে দিতাম, সেই দেখে-দেখে রেণু শাড়ি পরত, চুল আঁচড়াত। শাড়ি-পরাটা আর নেই, চুল আঁচড়ানো এখনো রয়ে গেছে।

আরো অনেক কারণ থাকতে পারে যেগুলো আমাদের সমাজে-পরিবারে নিহিত। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর জন্মজন্মান্তরের দাসী-মনোভাব, পরিবারের প্রধানকে একটা উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার রীতি ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু রেণুর সঙ্গে আমার সম্পর্ককে শুধু সমাজ-পরিবার ইত্যাদি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। তাছাড়া সমাজ-পরিবার ইত্যাদি আমার সামনে চিন্তাগ্রাহ্য বস্তু হিসেবে কোনোদিনই উপস্থিত হয় নি। আজ হচ্ছে। রেণুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কোনো ব্যাখ্যার অপেক্ষা না-রেখেই সহজ, স্বাভাবিক ও স্বীকৃত হয়ে এসেছিল। আজ যে-প্রশ্নগুলো আমার নিজের কাছে এসেছে তার কারণ এ নয় যে আমার আর রেণুর সম্পর্ক কোনো নতুন পর্যায় এসেছে। আসলে আমি আর রেণু দুজন-ই বয়সের আর সম্পর্কের এমন কোঠায় পৌঁছিয়েছি যেখানে নতুন কিছু ঘটে না,—পুরনো ঘটনা শুধু নতুন অর্থ পায়—তাও নয়, ঘটনাকে তার সত্যিকার অর্থে দেখা যায়—তাও নয়, ঘটনার উপর থেকে সাময়িকতার খোলস খুলে শুধু দীপ্তিটুকু দেখা যায়—কয়েকশ বছরের ধ্বংসস্তূপ থেকে কুড়িয়ে পাওয়া সোনার মুদ্রা যেমন। ধ্বংসস্তূপটা যে আকস্মিক আবিষ্কার হল, আমার আর রেণুর আর খোকার আর এই চারতলা বাড়ির আর সবাইকে ঘিরে, তার কারণও আবার খোকার বিদ্রোহ। খোকা যদি এই চারতলা বাড়ির, ও আমার নিয়মকানুন রীতি-নীতিগুলিকে স্বীকার করে নিয়ে নিজেকে শান্ত ও স্থির রাখত তাহলে দিব্যি হেসে-খেলে—নেচে-বেড়িয়ে সময় চলে যেত, কার সঙ্গে কার কী সম্পর্ক, সে-সবের কোনো খোঁজই পড়ত না। কিন্তু খোকা হাসতে-হাসতে খেলতে-খেলতে যে-মাটির ঢিবির উপর গিয়ে বসেছিল তার নিচেই বত্রিশটি পুতুলের সিংহাসন, খোকা না জেনেই সে সিংহাসনের অধিকারী হয়ে পড়েছিল। আর তাতেই, খোকাব বিচার থেকেই, তো আজ এত অসম্ভব প্রশ্ন-ও মাথায় উঠছে রেণুর আর আমার সম্পর্কের স্রোত গত একত্রিশ বৎসর কোন্ খাতে বয়েছে। পুত্র—যে পুৎ নামক নরক থেকে ত্রাণ করে। আর আমার জ্যেষ্ঠপুত্র, আমার শ্রাদ্ধাধিকারী, মৃত্যুর পর যে শেষবারের মতো আগুন ছোঁয়াবে, আর প্রেতশিলায় যার দেওয়া পিণ্ড বায়ুভূত দেহে গ্রহণ করে ত্রিকালের ক্ষুধা আমাকে মেটাতে হবে—সেই পুত্র তার সাতান্ন বৎসর বয়স্ক বাবাকে আর আটচল্লিশ বৎসরের মাকে পুৎ নামক নরকে নিমজ্জিত করল।

এ-সংসারটা যে আমার-ই, তার প্রমাণ সিধু-খুকু—এই বাড়িটা—আমার এতবড় সম্পত্তি। আর এ-সংসারটায় রেণু যে সপ্তপদী করেই এসেছিল তার প্রমাণ খোকা। আছেই একটা বেনারসী, ঘরেও পরি, বাইরেও পরি। খোকা জন্মাবার আগের দিনগুলোতে, বিয়ের পর বছরখানেক রেণু অন্তরকম ছিল কি। এতদিন পর মনে রাখা মুশকিল। হয়তো তেমন কিছু প্রকাশও করে নি। হয়তো রেণুর ভিতরে ভিতরে আশা ছিল, প্রকাশ করার সুযোগও হয়তো ঘটে নি। হয়তো সেগুলো প্রকাশযোগ্যই নয়, আমি সেগুলো লালন করি নি। আর লালন না করলে সে-আশাগুলো হয়তো ঝরে যায়। সে-আশাগুলো হয়তো মুক্তার মতো, কেউ পেল তো পেয়ে গেল, না পেল তো ঝিনুক-ঝিনুকের সঙ্গে এক হয়েই থাকল। আমি দেখি নি, আমি পাই নি।

আমার চোখ ছিল শুধু নিজের দিকে, আমার হয়তো ছিল শুধু গ্রাস। রেণুর নতুন শরীরকে আমি ভোগ করেছিলাম ভোগীর মতো। আমি দু হাতের গ্রাস ভরে মুখ পুরে আস্বাদ নিয়েছিলাম। সে ভোগে আমি তৃপ্তি পেয়েছি প্রচুর, কারণ রেণু আমার স্পর্শে উদ্দীপিত হয়ে উঠত না, সে শুধু বিবশ হয়ে পড়ত, উদ্দীপনার তো আবার একটা স্বাতন্ত্র্য থাকে, বিবশ আত্মসমর্পণের মধ্যে সে স্বাতন্ত্র্যের বিরক্তিকরতা-ও নেই।

আমি রেণুকে বলেছিলাম—নোংরামি আমার দু চোখের বিষ, বেশ সেজেগুজে থাকবে। আজ পর্যন্তও বাড়ির কাজ করবার সময়ও রেণু বেশ ধপধপে শাড়ি পরে। আর তখন ভুলেও রেণু রাত্রিতে যে-শাড়ি পরে ঘুমোত, সে-শাড়ি পরে সকালে ঘর থেকে বেরত না, দুপুরে যে-শাড়ি পরত, সে-শাড়ি পরে বিকেলে আমার চা নিয়ে আসত না। আজ মনে হয় এতে তো তার শাড়ি বেশি লাগবার কথা, অথচ আমি খেয়াল-খুশিতে বছরে দু-চারটে শাড়ি কিনে দিয়েছি। রেণুর হাতে টাকা-পয়সা থাকত, কিন্তু কোনোদিনই আমার কাছে জিজ্ঞাসা না করে সে এক পয়সা খরচ করে নি; হয়তো তখন শাড়ি কেনার দরকার হত না, নতুন বিয়ের পর শাড়ি তো থাকেই, নতুবা ঐ একটা ব্যাপারেই হয়তো রেণু গোপনতা রক্ষা করত, তাও নিশ্চয় এই ভেবে যে সাধারণ শাড়ি-কাড়ি কেনার কথা আমাকে বলে বিরক্ত করা উচিত হবে না, অথবা এই ভেবে যে তার তো আর অত শাড়ি লাগে না, আমার খারাপ লাগবে বলেই…।

আমি রেণুকে বলেছিলাম—পান খেয়ে দাঁত নষ্ট করো না, বরঞ্চ এলাচ খেয়ো, গন্ধটি বেশ—। আজও পর্যন্ত রেণু পান খায় না, অথচ আমি পান খাওয়া ধরেছি। এখনো রেণু নিজের সারা গায়ে এলাচের গন্ধ ছড়িয়ে রাখে। তখন আমার মনে হত, আলো নেবামাত্র আমার মনে হত, আমি কোনো গন্ধতপ্ত এলাচের বনে হারিয়ে যাচ্ছি। রেণুতে আমি যে বিরক্ত হই নি তার একমাত্র কারণ বোধহয় এই যে আমি কী চাই সেটা আমার চাইতেও বেশি বুঝে রেণু তাকে এমন অভাবিত উপস্থিত করে, কিছু বিস্ময়, কিছু প্রস্তুতি ও কিছু বিবেচনার সঙ্গে। সকালবেলার সুন্দর কোনো স্বপ্ন ফলে যাওয়ার মতো মনে হয়। কী আশ্চিক নিয়মে আজও রেণু নিয়মিত অন্ধকারে এলাচের বনের গন্ধ আনে।

আমি রেণুকে বলেছিলাম—তোমার বাপের বাড়ির চাষাড়ে অভ্যাস ছাড়, একটু সভ্যভদ্র হয়ো। কথাটা আমার নিজের কাছে খুব পরিষ্কার ছিল না যে কোন্‌টাকে আমি চাষাড়ে আর কোন্‌টাকে সভ্যতা-ভদ্রতা বলছি। আমার শ্বশুরবাড়ির লোকজনের মাটির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক, গ্রাম-গ্রাম ভাব, আচার-অনুষ্ঠানে গোঁড়ামি—এগুলোই চাষাড়ে মনে হয়েছিল বোধহয়। আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, একটু ভেবেচিন্তে আস্তে আস্তে কথা বলা, সবকিছু খুলেমেলে উদোম না করে একটু সূক্ষ্মতা ও ব্যক্তিগত অভ্যাসের চর্চা—এগুলোই সভ্যতা-ভদ্রতা মনে হয়েছিল বোধহয়। রেণুকে আমি পরিষ্কার বোঝাতে পারি নি, বোঝাবার চেষ্টা করি নি। কিন্তু রেণু বুঝে গিয়েছিল আমি কি চাই। অথবা রেণুও বোঝে নি। হয়তো আমিও বুঝি নি। কিন্তু রেণুকে দেখে বা রেণুর ব্যবহারে কোনোদিন আমার শ্বশুরবাড়ির সেই খারাপ দিকগুলোর কথা মনে আসে নি। রেণু কোনোদিন নিজ মুখে তার বাপের বাড়ি যেতে চায় নি। রেণুর বাপের বাড়ি থেকেও সাধারণত তাকে নিয়ে যাবার প্রস্তাব সচরাচর আসে নি। যদি বা গেছে তাও অতি অল্প দিনের জন্য। আর বাপের বাড়ি কিছুদিন কাটিয়ে আসার পর রেণু সেই এলাচের গন্ধ নিয়ে আসত, মুহূর্তের জন্যও মনে হত না রেণু অন্য কোথাও ভিন্ন পরিবেশে কাটিয়ে এসেছে।

বাধ্যতা রেণুর মজ্জাগত। অথচ রেণু কখনো বুঝতে দেবে না যে সে অনুগত হচ্ছে বা বাধ্য হচ্ছে বা আদেশ পালন করছে। আমার যে-কোনো ইচ্ছা বা আদেশ সে এমন অকৃত্রিমভাবে নিজের স্বভাবে করে নিত যে,

পরে আমি যখন পেতাম সেটা আমারই একটা অভাবিত ইচ্ছাপূরণের মতো আশ্চর্যজনক লাগত। এটা সবচেয়ে পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল যখন আমি ভাড়াবাড়ি ছেড়ে এই চারতলা বাড়ি বানিয়ে উঠে এলাম। আমি নিজের মনে মনে বুঝতে পারছিলাম যে আমার ঐ অবস্থান্তরে সবচেয়ে বেশি বিরক্তিকর ঠেকবে যদি কেউ উচ্চ অবস্থায় নিম্ন অবস্থার স্বভাব বা অভ্যাস নিয়ে আসে। পৈতৃক কিছু সম্পত্তি আর শ দেড়েক টাকার মাসিক উপার্জন থেকে আমি যে নিজেই একটা ভালো পরিমাণ নগদ টাকার মালিক হয়ে উঠেছিলাম—যে-টাকা যে-কোনো কাজে তখন বিনিয়োগ করা যেতে পারত এবং মাসিক প্রায় পাঁচ-ছ শ' টাকায় উপার্জনে পৌঁছেছিলাম সেটা খুবই অল্প সময়ের মধ্যে, খুব বেশি হলেও মাত্র বছর চারেক। সুতরাং ধীরে ধীরে শ্রেণী-পরিবর্তন হলে নিজেদের স্বভাব পরিবর্তনের যে-সুযোগ পাওয়া যায়, তেমন কোনো অবকাশ ছিল না। অথচ রেণু যেদিন টের পেল আমি নগদ টাকা পাওয়ার একটা চমৎকার পথ আবিষ্কার করেছি, হয়তো সেই মুহূর্ত থেকেই, রেণু নিজেকে সেই নগদ টাকার সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছিল। আসলে রেণু টের পেয়ে গিয়েছিল: আমি মনেমনে চাইছি সে নিজেই আমার পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিক। আর দেখে আমার এমন চমৎকার লেগেছিল যদিও অনেকদিন পর্যন্ত সেই অবস্থান্তরের কথাটা বা নগদ টাকা থাকার কথাটা আমাকে প্রাণপণে গোপন রাখতে হয়েছে, তারপর নানা কৌশলে প্রকাশ করতে হয়েছে, তারপর সেই নগদ টাকা খাটাতে পেরেছি,—তবু আমাদের পারিবারিক জীবনে, আমাদের ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে কত অনায়াসে রেণু এমন একজন মহিলা হয়ে উঠল যে—প্রচুর স্বাভাবিক সম্পত্তির মালিকের প্রাকৃতিক স্ত্রী।

রেণুর এই অনায়াসনিপুণতা বা স্বভাব আমার আত্মকেন্দ্রিক, আদেশকর্তা, স্বেচ্ছাচারী, ও ভোগী স্বভাবকে প্রশ্রয় দিয়েছিল বললেও কম বলা হয়, লালন করেছিল। এমনও হতে পারে রেণু যেহেতু কোনো বিরোধিতা করা দূরে থাকুক আমার সঙ্গে সংগতি রেখে নিজেকে অহরহ বদলাত, সেইহেতু আমি নিজেকে লালন করবার একটা সুযোগ পেয়েছিলাম। মনের ইচ্ছা এক কথা, আর একটা সম্পূর্ণ মানুষের উপর সেই ইচ্ছা রূপায়িত হতে দেখা আর-এক কথা। আমি রেণুর মধ্যে নিজের ইচ্ছা ও ক্ষমতাকে এমন সাফল্যের সঙ্গে বিনিয়োজিত দেখেছিলাম আর রেণু এত দ্রুত, এত নীরবে, এত সহজে,

এতদূর পর্যন্ত আমার ইচ্ছা নিজেতে প্রতিফলন করত যে ক্ষমতার প্রয়োগ-নৈপুণ্যে আমার স্থির বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে খুব সার্থক বিনিয়োগকারী বলে আমার যে গুড্-উইল প্রতিষ্ঠা হয়েছে তার আসল কারখানা আমার শোবার ঘরে ছিল। রেণু হয়তো স্বপ্নে ভাবতেও পারে না তাকে দেখে আমি নিজের এত বড়ো ক্ষমতা আবিষ্কার করেছি।

নগদ টাকা, হিসাব, বিনিয়োগ, লাভ-ক্ষতির সূক্ষ্ম টানা-পোড়েনে তৈরি আমার জীবনের যে-গ্রন্থিকে অটুট মনে হয়েছিল, এই বৃদ্ধবয়সে, তাকে এত দুর্বল বোধ হচ্ছে কেন। পুত্র তো শত্রুই, পত্নীকেও অনাত্মীয় ঠাহর হয়। অথচ কী অধ্যবসায়ের সঙ্গে রেণু আজো গত একত্রিশ বৎসরের অভ্যাসে তৈরি এলাচের গন্ধ নিয়ে আমার প্রায় ষাট বৎসরের অন্ধকার সুরভিত করে। এখন রক্তচাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। রাত্রিতে ঘুম কম হয়। শেষ-রাত্তে ঘুম ভেঙে যায়। পায়ের কাছের জানলা দিয়ে আমার সাধের পামের মাথা ছায়া দেখায়। নানা কথা মনে আসে। কিন্তু চেষ্টা করেও মনে আনতে পারি না খোকার বড় হওয়ার ঘটনা। কথা আমি চিরকালই কম বলি। সুতরাং খোকার সঙ্গে কথা বলারও প্রশ্ন আসে না। ছেলেটা যে আড়ালে-আড়ালে বড় হয়ে গেল সে কি নিজের শক্তি আর যৌবন আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে? শত্রুকে আপন শক্তি দেখিয়ো না। তারপর অজ্ঞাত মুহূর্তটিতে প্রচণ্ডতম আঘাত করতে? অথচ কী আশ্চর্য, আমাকে এত জোর আঘাত করার পরও আমি অপরিবর্তিতই আছি, খোকাই পাগল হয়ে পথে-পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার নিজের ভিতরে যদি তাকাই কুত্রাপি অনুতাপ খুঁজে পাই না। আমার পথ ঠিক পথ-ই ছিল। মনে হয় খোকারই ভুল, খোকারই। ও হতভাগ্য কোত্থেকে সম্পদ আর ঐশ্বর্যকে এত হেলা করতে শিখল, সহজপ্রাপ্য সুখের পথ ছেড়ে এত অসুখের পথ ও কেন বেছে নিল। খোকা যদি নিজের বুকে হাত দিয়ে কথা বলে, তবে ও কি অস্বীকার করতে পারবে আমার এই "চুরি করা টাকা" ও-ও প্রচুর ভোগ করেছে। যৌবন না হয় আমি অনেকদিন পেরিয়ে এসেছি তাই বলে কি বুঝি না ডাক্তারি পড়ার সময় খোকার এত-এত টাকার প্রয়োজন ছিল কেন। জীবনযাত্রার পদ্ধতি না-হয় অনেক বদলেছে; তাই বলে কি আমি বুঝতে পারি না খোকা কোন্ ভোগের তাড়নায় এত অস্থির হয়ে উঠত? অনুতপ্ত হয়তো আমি ওদিক থেকে হতাম যে এত সম্পদের জ্যেষ্ঠ অধিকারীই

যখন এর একটি কণা ভোগ করতে চায় না, তখন এ-সম্পদ কেন। বুদ্ধদেবের পিতার মতো। হায় রে। বুদ্ধদেব। আমার সে অনুতাপ একটুও হচ্ছে না, হবে না, তার কারণ, খোকা নেহাত কম ভোগ করে নি, আর কে জানে, হয়তো আরো ভোগের প্রশ্রয় পাচ্ছিল না বলেই খোকা অমন বেয়াড়া হয়ে বাড়ি-ঘর মা-বাবা ত্যাগ করল।

আমাকে তো কেউ অভিযুক্ত করছে না তবে মিছিমিছি আমি কেন খোকার ঘাড়ে সব দোষ-আরোপ করতে চাই। আর আমাকে অভিযুক্ত করার শাস্তিস্বরূপ খোকার মাথার উপরে আর কোনো স্থায়ী ছাত নেই, খোকার দৈনন্দিন আহার নিশ্চিত নয়। খোকাকে যদি কোনোদিন বাড়ি ফিরে আসতে হয় তবে সিধু-খুকুর সামনে মাথা নুইয়ে এই কথার প্রতিটি অক্ষর স্বীকার করে নিয়ে আসতে হবে যে—এ-বাড়ির কোনো একটি ইটেও কোনো পাপ, এ-বাড়ির কোনো একটি স্মৃদেও কোনো অপরাধ নেই। খুকু-সিধু যথার্থ-ই এ-বাড়ির সন্তান হয়ে উঠেছে।

কেননা শেষবারের মতো আমার সম্মুখীন হয়ে খোকা তার হৃৎপিণ্ড প্রায় উন্মুক্ত করে দেখিয়েছে যে আমার অস্তিত্বের মধ্যেই বিষ, ফলে আমি যাকে ভেবেছি অস্তিত্বের দাবি, খোকা বলেছে পাপ, পাপ। শেষে যে খোকা তার মায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দুই হাতে মায়ের গলা টিপে ধরেছিল—সেকি নিজের জন্মকেই পাপ বলে ঘোষণা করতে? আর সেই সময়ই খুকু আর সিধু পর্দার লাঠি খুলে নিয়ে খোকার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সে কি নিজেদের জীবনের নিরাপত্তাকে আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে?

(ক্রমশ)

শ্যামল চক্রবর্তী

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা-সমস্যার কয়েকটি দিক

কলকাতার মিছিল

গত ১৯শে জানুয়ারি দশ সহস্রাধিক শিক্ষক দু'ঘন্টা ধরে মৌনমিছিলে কলকাতার পথ-পরিক্রমা করলেন। বাংলাদেশে এর আগে এমন ঘটনা আর ঘটে নি; ভারতবর্ষেও কখনো ঘটেছে বলে আমার জানা নেই। মিছিল সংগঠিত করেন পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতি, নিখিল ভারত শিক্ষক সংস্থা। এ মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন অন্যান্য শিক্ষক সমিতি; যোগ দিয়েছিলেন প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজের শিক্ষকেরা; আরও ছিলেন কলকাতা, বর্ধমান, যাদবপুর, রবীন্দ্রভারতী প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু সংখ্যক শিক্ষক; সদলে এসেছিলেন পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন পলিটেকনিকের শিক্ষকবৃন্দ। এত বিভিন্ন স্তরের এত সংখ্যক শিক্ষক একসঙ্গে আর কখনও সমবেত হন নি, একই মিছিলে পা মেলান নি।

মিছিলটির গুরুত্ব আরও এইজন্যে যে কিছু কিছু প্রতিদ্বন্দ্বী শিক্ষকসংস্থা,—যাঁরা সচরাচর পরস্পরের মতামত বা কর্মপদ্ধতি পছন্দ করেন না বা একসঙ্গে চলেন না, এই দিন অন্যান্য মতপার্থক্য উপেক্ষা করে পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

এ ছাড়াও সর্বাধিক গুরুত্ব এ মিছিলকে দিতে হবে এইজন্যে যে শিক্ষকদের জীবনধারণের মানোন্নয়নের দাবিই এ সমাবেশের একমাত্র দাবি ছিল না; সমাবেশের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থায় বিভিন্ন সংকটের লক্ষণের দিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা। সংকট সমাধানের প্রয়োজনের জন্য তাঁরা এগারো দফা দাবিও উপস্থিত করেছেন।

এরকম অবস্থায় শিক্ষিত বাঙালি মাত্রেই পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার অবস্থা সম্বন্ধে একটু ভেবে দেখবেন,—তা আশা করা যায়। ভেবে দেখা দরকার অবশ্য

অন্য কারণেও। তৃতীয় পরিকল্পনা শেষ হয়ে এল; চতুর্থ পরিকল্পনা রচনা করা হচ্ছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার কী পরিমাণ খরচ করবেন তার ইঙ্গিতও খবরের কাগজে বের হচ্ছে। তার উপর সর্বভারতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে দেশবিদেশের বিশেষজ্ঞ ও উপদেষ্টা নিয়ে। তাঁরাও অনুসন্ধান করছেন, সাক্ষ্য নিচ্ছেন, মতামত সংগ্রহ করছেন। ছেষট্টি সালে তাঁদের রিপোর্টও হয়তো সর্বসমক্ষে হাজির হবে। কাজেই বাস্তব অবস্থাটা খতিয়ে দেখবার চেষ্টা নিশ্চয়ই প্রাসঙ্গিক।

নিরক্ষরতার ভার

মিছিলের উদ্যোক্তারা সক্ষোভে উল্লেখ করেছেন: "সাক্ষর সংখ্যার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ স্থানে নেমে এসেছে।" অবস্থাটা নিম্নরূপ:

তালিকা ১

		সাল ১৯৬১			সাল ১৯৫১		
		সাক্ষরের শতকরা অনুপাত					
		মোট	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী
১।	কেরল	৪৬৮	৫৫'০	৩৮'৯	৪০'৭	৫০'২	৩১'৫
২।	মাদ্রাজ	৩১'৪	৪৪'৫	১৮'২	২০৮	৩১'৭	১০'০
৩।	গুজরাট	৩০'৫	৪১'১	১৯'১	২৩'১	৩২'৩	১৩'৫
৪।	মহারাষ্ট্র	২৯৮	৪২'০	১৬৮	২০'৯	৩১'৪	৯'৭
৫।	পশ্চিমবঙ্গ	২৯'৩	৪০'১	১৭'০	২৪'০	৩৪'২	১২'২
	সারাভারত	২৪'০	৩৪'৪	১২'৯	১৬'৬	২৪'৯	৭'৯

(উৎস—1961 Census)

এর অর্থ, দশ বছরে সারা ভারতবর্ষে সাক্ষরের সংখ্যা যেখানে বেড়েছে শতকরা ৭'৪ ভাগ, পশ্চিমবঙ্গে সেখানে বেড়েছে মাত্র শতকরা ৫'৩ ভাগ। ভারতজোড়া সাক্ষর সংখ্যাবৃদ্ধির হার পশ্চিমবাংলায় বজায় রাখতে পারা যায় নি। ১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ছিল কেরলের পরেই; কিন্তু দশ বছরে মাদ্রাজ, গুজরাট ও মহারাষ্ট্র পশ্চিমবঙ্গকে ডিঙিয়ে গেছে; পশ্চিমবঙ্গে শতকরা ৫'৩-এর তুলনায় সাক্ষরের শতকরা হার বৃদ্ধি ঘটেছে মাদ্রাজে ১০'৬, গুজরাটে ৭'৪ ও মহারাষ্ট্রে ৮'৭।

অবশ্য এর সঙ্গে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির কথাও মনে রাখতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মশায় তো এর আখ্যা দিয়েছেন "জন-বিস্ফোরণ" বা Population Explosion। তুলনায় দেখা যাচ্ছে যে গত দশ বছরে গড়-পড়তা প্রতি বৎসর শতকরা জন-বৃদ্ধির হার হচ্ছে কেরলে ২·৪৭, মাদ্রাজে ১·১৮, গুজরাটে ২·৬৮, মহারাষ্ট্রে ২·৩৬, পশ্চিমবঙ্গে ৩·২৭ এবং সারা ভারতে ২·১৫। জনসংখ্যা-বৃদ্ধির এই হারকে ঠিক "বিস্ফোরণ" বলা যায় কিনা তা বিশেষজ্ঞরা বিচার করুন। কিন্তু এটা ঠিক যে জনবৃদ্ধির এই হারের সামনে শিক্ষাব্যবস্থা বেতাল। হয়ে যাচ্ছে।

অবস্থাটা আর এক দিক থেকে দেখা দরকার।

তালিকা ২

পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার তুলনায় সাক্ষর জনসংখ্যার শতকরা হার

	পুরুষ		নারী		মোট	
	১৯৫১	১৯৬১	১৯৫১	১৯৬১	১৯৫১	১৯৬১
গ্রামবাসী	২৮·১	৩২·৮	৬·৭	৯·৭	১৭·৭	২১·৬
নগরবাসী	৫১·৮	৫৯·৫	৩৫·১	৪৩·৩	৪৫·২	৫২·৭
মোট	৩৪·২	৪০·১	১২·২	১৭·০	২৪·০	২৯·৩

(উৎস : Census of India, 1961, vol. xvi
Census of India, 1951, vol. vi)

সকলেরই মোটামুটি ধারণা আছে যে শহরের লোকেরা গ্রামের লোকের চেয়ে বেশি শিক্ষিত, যেমন পুরুষেরা মেয়েদের চেয়ে বেশি। সুতরাং দ্বিতীয় তালিকায় নতুন কথা কিছু নেই। যা আছে তা হল এই পার্থক্যের পরিমাণের প্রতি নির্দেশ। ১৯৬১ সালে পশ্চিম বাংলায় শহরে লোকেদের অর্ধেকের বেশি সাক্ষর; তুলনায় গ্রামের মানুষের পুরো সিকি ভাগও সাক্ষর নয়, বড়ো জোর বলা যায় এক-পঞ্চমাংশের কিছু বেশি। সাক্ষর মেয়েদের অনুপাত শহরে অনেক বেশি, শতকরা ৪৩·৩ ভাগ; তুলনায় গ্রামের মেয়েরা পড়ে রয়েছেন বহু পিছনে, শতকরা পুরো ১০ জনেরও অক্ষর-পরিচয় হয় নি।

বৃদ্ধির হিসাব ধরলেও দেখা যাবে যে শহরবাসীদের মধ্যে সাক্ষর জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটেছে শতকরা ৭·৬ ভাগ, গ্রামবাসীদের মধ্যে মোটে ৩·৯ ভাগ। সব থেকে কম বৃদ্ধি ঘটেছে গ্রামের মেয়েদের মধ্যে, শতকরা

৩ ভাগ মাত্র। অন্যদের তুলনায় সব থেকে বেশি হারে বেড়েছে শহরের সাক্ষর মেয়েদের অনুপাত, শতকরা ৮·২ ভাগ। এর থেকে দুটো জিনিস চোখে পড়ে: (১) গ্রামের সাক্ষর লোকের সংখ্যাই শুধু কম নয়, সাক্ষর সংখ্যা বৃদ্ধির হারও নগণ্য; (২) শহরের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ ও সুযোগের পরিমাণ অন্যদের তুলনায় কিছুটা বেড়েছে।

বিষয়টিকে আরও একটু খুঁটিয়ে দেখা যেতে পারে।

তালিকা ৩

পশ্চিমবঙ্গে জেলাভিত্তিতে সাক্ষর জনসংখ্যার ও নগরবাসী ও গ্রামবাসীর অনুপাত

সাক্ষর জনসংখ্যার শতকরা অনুপাত, মোট জনসংখ্যার শতকরা অনুপাত

এলাকা	মোট	পুরুষ	নারী	গ্রামবাসী	নগরবাসী
পশ্চিমবঙ্গ	২৯·৩	৪০·১	১৯·০	৭৫·৫	২৪·৫
দার্জিলিং	২৮·৭	৪০·১	১৫·৫	৭৬·৮	২৩·২
জলপাইগুড়ি	১৯·২	২৭·১	১০·০	৯০·৯	৯·১
কুচবিহার	২১·০	৩১·৪	৯·৩	৯৩·০	৭·০
পশ্চিম দিনাজপুর	১৭·১	২৬·০	৭·২	৯২·৫	৭·৫
মালদহ	১৩·৮	২১·৫	৫·৮	৯৫·৮	৪·২
মুর্শিদাবাদ	১৬·০	২৩·৫	৮·৪	৯১·৫	৮·৫
নদীয়া	২৭·২	৩৫·৮	১৮·২	৮১·৬	১৮·৪
২৪ পরগণা	৫২·৫	৪৩·৯	১৯·৩	৬৮·২	৩১·৮
কলকাতা	৫৯·৩	৬৩·৬	৫২·৩		১০০·০
হাওড়া	৩৬·৯	৪৮·৪	২২·৭	৫৯·৫	৪০·৫
হুগলী	৩৪·৭	৪৬·১	২১·৮	৭৪·০	২৬·০
বর্ধমান	২৯·৬	৩৯·৪	১৮·১	৮১·৮	১৪·২
বীরভূম	২২·১	৩২·৪	১১·৫	৯৩·০	৭·০
বাঁকুড়া	২৩·১	৩৬·২	৯·৭	৯২·৭	৭·৩
মেদিনীপুর	২৭·৩	৪১·৭	১২·২	৯২·৩	৭·৭
পুরুলিয়া	১৭·৮	৩০·২	৫·০	৯৩·২	৬·৮

(উৎস: Census of India—Paper No 1 of 1962)

শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির কেন্দ্র কলকাতা অনন্যা ; তার কথা স্বতন্ত্র বিচার্য। কলকাতাকে বাদ দিলে দেখা যায় সারা পশ্চিমবঙ্গের গড়পড়তা অনুপাতের চেয়ে সাক্ষরের অনুপাতে এগিয়ে আছে যথাক্রমে হাওড়া (৩৬'৯%), হুগলী (৩৪'৭%), ২৪ পরগণা (৩২'৫%) এবং বর্ধমান (২৯'৬%), পুরুষদের মধ্যে মেদিনীপুর পশ্চিমবাংলার গড়ের অনুপাত ছাপিয়ে গেছে (৪১'৭%) এবং দার্জিলিং ঠিক ছুঁয়ে রয়েছে (৪০'১%) ; মেয়েদের মধ্যে এ সম্মানের অধিকারী শুধুই হাওড়া, হুগলী ও ২৪ পরগণা জেলা। লক্ষণীয় যে নগরবাসীর অনুপাতও এই তিনটি জেলায় সবচেয়ে বেশি, যথাক্রমে হাওড়া শতকরা ৪০'৫ ভাগ, ২৪ পরগণা ৩১'৮ ভাগ ও হুগলী ২৬'০ ভাগ। শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা ও শাসনব্যবস্থার কেন্দ্র হিসেবে শহর গড়ে ওঠে। সাক্ষর ও শিক্ষিত লোকের টানও পড়ে সেইজন্যে এইসব অঞ্চলে। কলকাতার চারদিক ঘিরে হাওড়া-হুগলী-২৪ পরগণা অঞ্চল যে পশ্চিম বাংলার সবচেয়ে উন্নতিশীল অঞ্চল তাতে কোন সন্দেহই নেই। সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের বিচার নিশ্চয়ই খুব আগ্রহোদ্দীপক আলোচনা হতো। তবে বর্তমান প্রবন্ধের চতুঃসীমায় তাকে খাপ খাওয়ানো যাবে না।

সাক্ষরের আনুপাতিক হিসেবে সব থেকে অবনত অবস্থা মালদহ জেলায় (১৩'৮%) ; সেখান থেকে যথাক্রমে স্থান হচ্ছে মুর্শিদাবাদ (১৬'০%) পশ্চিম দিনাজপুর (১৭'১%), পুরুলিয়া (১৭'৮%), জলপাইগুড়ি (১৯'২%) ও কুচবিহার (২১'০%) জেলায়। সমগ্র অঞ্চল হিসাবে বিচার করলে উত্তর-বঙ্গের পশ্চাৎপদতা অনস্বীকার্য। মেয়েদের মধ্যে সাক্ষরের অনুপাত বিচার করলে দেখা যাবে মারাত্মক অবস্থা পশ্চিম দিনাজপুরের (১'২%) ; তারপরে নীচের দিক থেকে যথাক্রমে স্থান পুরুলিয়া (৫'০%), মালদহ (৫'৮%), মুর্শিদাবাদ (৮'৪%), কুচবিহার (৯'৩%), বাঁকুড়া (৯'৭%) ও জলপাইগুড়ি (১০'০%) জেলায়।

এত সব তথ্য থেকে আমরা বোধ হয় নীচের সিদ্ধান্তগুলিতে পৌঁছতে পারি :

১। সারা পশ্চিম বাংলার মোট জনসংখ্যার প্রতি দশজনে সাত জনেরও বেশি নিরক্ষর। ২। সারা পশ্চিম বাংলার মেয়েদের মধ্যে প্রতি পাঁচজনের মধ্যে চারজনেরও বেশি নিরক্ষর। ৩। পশ্চিম বাংলার গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রতি পাঁচজনের মধ্যে প্রায় প্রতি চারজনই নিরক্ষর। ৪। অসমহারে

শিক্ষা-বিস্তারের ফলে কতকগুলি অঞ্চলের উপর নিরক্ষরতার বোঝা জগদ্দল পাথরের মতোই চেপে রয়েছে।

পশ্চিম বাংলার শিক্ষিত বাঙালিরা খুব স্বভাবতঃই বাংলার শিক্ষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে গর্ববোধ করে থাকেন। খুব ন্যায্যতঃই তা করে থাকেন। তবু এ কথা ভুললে চলবে না যে দেশের শতকরা সত্তরজনের বেশি মানুষ এ-শিক্ষা থেকে বঞ্চিত, এ সাহিত্যের পাঠক তারা নয়, এ সংস্কৃতিতে তাদের অবদান পরোক্ষ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ডিজরেলি ইংরেজ সমাজ ও সভ্যতা সম্পর্কে যে 'দুই জাতি ও দুই সংস্কৃতির' কথা উল্লেখ করেছিলেন, ১৯৬১ সালের পশ্চিম বাংলাতেও তা পরিপূর্ণরূপে বর্তমান।

এই বিরাট ব্যবধান উত্তরণের কথা আজকের শিক্ষিত বাঙালি ভাবছেন নিশ্চয়।

কিন্তু সমস্যা তো শুধু সংস্কৃতির নয়, তা অর্থনীতি ও রাজনীতিরও বটে।

গ্রামাঞ্চলে যে শতকরা ৭৮·৪ জন, অথবা, আরও নির্দিষ্টভাবে পুরুষদের যে ৬৭·২% লোক নিরক্ষর, সমাজের কোন অংশে তাঁদের স্থান? দৈনন্দিন রোজগারের কোন প্রক্রিয়ায় তাঁরা ব্যাপৃত? প্রামাণ্য দলিলের উদ্ধৃতি হাজির করতে না পারলেও, এ কথা বলা বোধ হয় ভুল হবে না যে তাঁরা প্রধানত চাষী, গরীব চাষী, ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক। অর্থাৎ, এঁদের উপরেই কিন্তু ফসল ফলানোর ভার। আর, বর্তমানে কৃষিবিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ বা পরিকল্পনাকার সকলেই একমত যে কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দুটি প্রয়োজন মেটাতেই হবে। প্রথমত, চাই ভূমি সংস্কার। অর্থাৎ, চাষী হবে জমির মালিক; উৎপন্ন শস্য হবে তারই সম্পত্তি। অধিক উৎপাদনে থাকবে তার প্রত্যক্ষ স্বার্থ, তার উদগ্র আগ্রহ। দ্বিতীয়ত, পুরোনো পদ্ধতিতে চাষের মারফত উৎপাদন আর বেশি বাড়িয়ে তোলা সম্ভব হবে না। তাই প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক কৃষি-পদ্ধতির। চাই জল, চাই সার, ভালো বীজ, উন্নত ধরণের লাঙল, যন্ত্রশক্তি ও নতুন প্রক্রিয়া। কিন্তু প্রশ্ন এই: এই দুটো সমাধানকেই অশিক্ষার পাহাড় ঠেকিয়ে রাখছে না কি? ভূমি-সংস্কার আইনের নানা ত্রুটী সত্ত্বেও, প্রয়োগের সময়ে আইনের সুফল থেকে কৃষকেরা যে অনেকখানিই বঞ্চিত হয়ে রইল, জমিদার, জোতদাররা যে অনেক জমিই বেনামা করে দখলে রাখতে পারল, তার জন্যে বেশ খানিকটা দায়ী নয় কি কৃষকের অশিক্ষা এবং তার যোগ্য সংগঠনের অভাব? গরীব চাষীর সেটুকু লেখাপড়ার যোগ্যতা যদি থাকত,

যদি আইন, দলিল, খবরের কাগজ পড়তে পারত, যদি হিসেব-নিকেশটা নিজের ক্ষমতাতেই বুঝতে পারত, তাহলে নিজের স্বার্থেই সে সংগঠন গড়ে তুলত, আইনকে কাজে লাগাতে পারত। কিন্তু তা হলো না, তা হচ্ছে না। অপর দিকে নতুন ধরনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষও বিফল হবে, যদি চাষী নিজে কার্য-কারণ না বোঝে, যদি নিজের বিশেষ পরিবেশে নিজস্ব বুদ্ধি-বিচার ও উদ্যোগ খাটাতে না পারে, যদি কেন্দ্র থেকে বিশেষজ্ঞ-প্রেরিত সার্কুলারের নিরাসক্ত ও নিস্পৃহ আমলা কর্মচারীর ব্যাখ্যামূলক বক্তৃতামালার দ্বারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষির প্রচলন করার চেষ্টা না করা হয়।

এক কথায় কৃষকের শিক্ষার সঙ্গে কৃষি-উৎপাদনের উন্নতি, তথা পশ্চিম বাংলার অর্থনৈতিক ভাগ্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

রাজনীতির দিক থেকে এ কথা আজ কেউই বলেন না যে সঠিক ভোট দেবার ক্ষমতা সাক্ষর হবার উপরই নির্ভর করে। বস্তুত, শিক্ষিত সমাজের মধ্যেও জেদ, জবরদস্তি, সাম্প্রদায়িকতা বা প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রবণতার অঢেল প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও লেখাপড়া বাদ দিয়েই গণতন্ত্র ও প্রগতিশীলতা আয়ত্ত করা যাবে, সে দাবিও কেউ করবেন না। সবার উপরে যে-বিষয়টা নিশ্চিতভাবে স্থান পাবে, তা' হচ্ছে অশিক্ষিতের শিক্ষার জন্যে উদগ্র কামনা। বাচ্চা ছেলেমেয়ে পড়তে চায় না, খেলতে চায়,—এই অভিজ্ঞতা এ ক্ষেত্রে প্রামাণ্য নয়। নিরক্ষর জানে যে তার অজ্ঞতার সুযোগেই অপর পক্ষ করে খাচ্ছে এবং সে বঞ্চিত হচ্ছে; আধুনিক জগতে আত্মপ্রতিষ্ঠার এই হলো হাতিয়ার। এ কল্পকথা নয়। নিরক্ষর চাষী মজুরের সঙ্গে যাঁরা কাছে এসে কথা বলেছেন, তাঁরাই এ আবেগের স্পর্শ পেয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রেই হয়তো রয়েছে নিজের সম্বন্ধে ভরসার অভাব; কিন্তু আগ্রহ তীব্র হয়েছে এই দাবিতে যে তার নিজের জীবনের বঞ্চনা যেন তার সন্তানকে ঘিরে না থাকে। এ চাহিদা কোন গণতন্ত্রী অস্বীকার করবেন?

ভারত সরকার অবশ্য সঠিকভাবেই সিদ্ধান্ত করেছেন যে মানুষকে শুধু সাক্ষর করলেই চলবে না, তাকে নানা বিষয়ে নানা দিক থেকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। সেই জন্যে তাঁরা কমিউনিটি প্রোজেক্ট বিভাগের হাতে গ্রামাঞ্চলে প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষাদানের ভার তুলে দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে এ বিষয়ে বিশদ তথ্য সংগ্রহ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। সামান্য যেটুকু হস্তগত হয়েছে, তাই উপস্থিত করছি।

তালিকা ৪

পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্ট ও ন্যাশন্যাল এক্সটেনশন ব্লক

	ব্লকের সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট গ্রামের সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট জনসংখ্যা	মোট গ্রামীন জনসংখ্যার অনুপাত
১৯৫৮, মার্চ	১২১	১৬,৩১৪	৮,৮৯০,২৫৬	৪৪'৪১%
১৯৫৯, মার্চ	১৫৮	২০,১৯৪	১০,৮৩২,৮৫৯	৫৪'১১%

(উৎস : Statistical Abstract, West Bengal, 1959)

১৯৬২, মার্চ	৩৩৪	৪১,৯৩৫	২২,৬৪৬,৪৮০	৮৫'৮৩%

•(উৎস : Statistical Hand Book, 1963, Government of West Bengal)

স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে যে ১৯৫৯ থেকে ১৯৬২ এই তিন বছরের মধ্যে একটা বৃহৎ উল্লম্ফন ঘটেছে। খুবই আনন্দের কথা। সংগৃহীত তথ্যে কোনো ভুল না থাকলে সুখীই হবো। কিন্তু ঐ সূত্রে প্রাপ্ত অপর সংবাদে খুব উৎসাহিত হতে পারলাম না। তথ্যটি নীচে পরিবেশন করা গেল।

তালিকা ৫

প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষার প্রসার কমিউনিটি প্রোজেক্টের মারফত্ ১৯৬২, মার্চ

	১৯৬০-৬১	১৯৬১-৬২
প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষাকেন্দ্র	৬৯৯	৬৮৯
প্রাপ্তবয়স্কের সাক্ষরীকরণ	৩২,৩৫৮	২৮,৫৮২

(উৎস : Statistical Hand Book, 1963)

দুটি মন্তব্য করা যেতে পারে : (১) ২৮ বা ৩২ হাজার সংখ্যাটি মোটেই আশাপ্রদ নয় ; এই হারে চললে কত বছর লাগতে পারে সে হিসেব ভীতিপ্রদ। (২) শিক্ষাকেন্দ্র ও সাক্ষরীকৃত প্রাপ্তবয়স্কের সংখ্যা দুইই যে কমেছে, আশা করি এটা দীর্ঘস্থায়ী লক্ষণ নয়। অবশ্য ১৯৬৪-৬৫ সালের বাজেট বক্তৃতায় তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন যে ৪৫০০ প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে, তাতে তিন লক্ষ লোক পড়াশুনা করছেন, এবং বছরে ৯০ হাজার

প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষর হিসাবে উত্তীর্ণ হচ্ছেন। সমস্যার তুলনায় অবস্থাটি যথেষ্ট আশাপ্রদ কিনা তা পাঠকই বিচার করবেন।

কিন্তু এতো গেল আজকের কথা, বর্তমান! বর্তমানটা ভালো নয়। এবার আসুন ভবিষ্যতের কথায়। কারণ, বর্তমানের শিক্ষা-ব্যবস্থাটা হচ্ছে আসলে ভবিষ্যতের বনিয়াদ! আজকের যে শিশু বা তরুণকে স্কুলে-কলেজে শিক্ষিত করে তোলা হচ্ছে, ভবিষ্যতের দায়ভার তারাই তুলে নেবে তাদের কাঁধে। তাই বর্তমানের শিক্ষা-ব্যবস্থার গতিধারাটিকে অনুধাবন করলে বুঝতে পারা যাবে, আগামী দিনের দুর্বার সাহসিকতায় ভরা নতুন দুনিয়া আমরা পশ্চিম বাংলার মাটিতে কী পদ্ধতিতে গড়ছি।

শিক্ষা-ব্যবস্থা

স্বাধীন ভারতের সংবিধানে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের উপর নির্দেশনামা জারি করা হয়েছে যে সংবিধান চালু হবার দশ বছরের মধ্যে দেশের প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত বিনা খরচে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হবে। স্বাধীনতার পর স্বাধীন ভারতের শিক্ষাপদ্ধতি কী ধরনের হওয়া উচিত তা নিয়ে কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করা হয়েছে; একাধিক অনুসন্ধানী কমিশন গঠিত হয়েছে, যার মধ্যে "বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষা কমিশন" ও "মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন" সমধিক প্রসিদ্ধ। বিভিন্ন কমিশনের রিপোর্ট, সম্মেলনের আলোচনা, কর্তৃপক্ষীয় সিদ্ধান্ত প্রভৃতি থেকে শিক্ষা-ব্যবস্থা বর্তমানে যা দাঁড়িয়েছে তা হলো এই :

প্রত্যেকটি ছেলে মেয়েকে ছয় থেকে এগারো বছর পর্যন্ত প্রাথমিক স্কুলের প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়তে হবে, তারপর বারো থেকে চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মধ্য স্কুলের পাঠ সাঙ্গ করতে হবে। চৌদ্দ বছর পর্যন্ত এই আট বছরের প্রারম্ভিক শিক্ষা সকলের পক্ষেই আবশ্যিক হবে। এর পরের স্তর হচ্ছে সাধারণ শিক্ষার জন্য উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুল, যেখানে নবম থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হবে। এই পর্যায়েই সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধারার প্রবর্তন করা হবে; অর্থাৎ, কয়েকটি বিষয় সকলেরই পাঠ্য থাকলেও, প্রধানত স্বতন্ত্র ও বিশেষ ধারায় শিক্ষাকে পরিচালিত করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন এই রকম সাতটি ধারাকে অনুমোদন করেছেন; যথা, (১) হিউম্যানিটিজ্ বা

কলা-বিভাগ (২) বিজ্ঞান, (৩) কারিগরি, (৪) বাণিজ্য, (৫) কৃষি, (৬) চারু-শিল্প, (৭) গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান। উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষার পর্যায়কে বিভিন্ন ধারায় ভাগ করে দেওয়ার যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না। কারণ, সমাজের বিভিন্নমুখী প্রয়োজন মেটানো এবং ছাত্রদেরও বিভিন্নমুখী প্রবণতা-অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থা গঠন করা উচিত। এ কথাও মনে রাখতে হবে যে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর পার হয়ে ছাত্রদের বেশ একটা অংশ প্রত্যক্ষ জীবন-সংগ্রামে নেমে পড়ে। কাজেই এই শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে তারা খানিকটা প্রস্তুত হয়ে উঠতে পারে। সে দিকটাও নজর রাখা দরকার। সুতরাং তিন বছরের উচ্চ মাধ্যমিক বিভিন্নমুখী শিক্ষাক্রম। এর পাশাপাশি জুনিয়ার টেক্‌নিক্যাল স্কুল থাকছে, যেখান থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের অনুরূপ, অথচ মূলত শ্রম-শিল্পের বিভিন্ন পদ্ধতিতে শিক্ষিত হয়ে উঠবে ছাত্ররা। উচ্চ-মাধ্যমিক স্কুলের পরে সাধারণ শিক্ষার কলা ও বিজ্ঞান কলেজ থাকছে—ত্রিবার্ষিক ডিগ্রী কোর্স নিয়ে। এই পাঠক্রমের অন্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডিগ্রী দেওয়া হয় বি. এ. বা বি. এস্. সি.। এঞ্জিনিয়ারিং, মেডিক্যাল, কমার্স প্রভৃতি অন্যান্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডিগ্রীর সীমা পর্যন্ত। তাছাড়া 'পলিটেক্‌নিক্' প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা হচ্ছে টেক্‌নিক্যাল শিক্ষণের জন্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী না হলেও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের উচ্চতর শিক্ষাক্রমের জন্য। এর পর প্রত্যক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর জন্য শিক্ষা ও পরবর্তী গবেষণা-কার্য পরিচালনা।

এই ব্যবস্থায় কাজ কেমন চলেছে মোটামুটি সেটাই এখন বুঝতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা

১৯৬৪-৬৫ সালের বাজেট বক্তৃতায় রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় উল্লেখ করেছিলেন যে ছয় থেকে এগারো বছরের ছেলেমেয়েদের শতকরা ৮০ ভাগেরও যে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না, তার জন্য দায়ী "জনসংখ্যার বিস্ফোরণ"। ঠিক কতখানি করা যাচ্ছে, তার উল্লেখ অবশ্য তিনি করেন নি। অন্যান্য সূত্র থেকে যতখানি সংবাদ সংগ্রহ করা গেছে, তা' এখানে হাজির করছি।

তালিকা ৬

৬ থেকে ১১ বছরের ছেলেমেয়েদের ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠরত ছাত্রের অনুপাত

রাজ্য	১৯৬০-৬১	১৯৬৫-৬৬
কেরল	১০৮৮%	১০৮৭%
মাদ্রাজ	৭৮৯%	১০০০%
মহারাষ্ট্র	৭৩৩%	৯০৫%
মহীশূর	৬৭৪%	৮৮২%
অন্ধ্র	৬০৩%	৮৪৫%
গুজরাট	৭২০%	৮৪২%
আসাম	৬১৭%	৭৭৪%
পাঞ্জাব	৬১৮%	৭৪৬%
পশ্চিমবঙ্গ	৬৫৬%	৭৩৪%
সারাভারত	৬১১%	৭৬৪%

(উৎস: A Review of Education in India, 1947-61)

মন্ত্রীমহাশয়ের বক্তৃতা ও উপরোক্ত তথ্য মিলিয়ে দেখা যাবে যে তৃতীয় পরিকল্পনার পরিশেষে, সংবিধান চালু হবার ষোল বছর পরে শতকরা ২৬৬ ভাগ ছেলেমেয়ের ভাগ্যে প্রাথমিক স্কুলের মুখ দেখাও ঘটবে না। দশ বছর পরে এরাই প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী হয়ে দাঁড়াবে। তখন নিরক্ষরতার পুরোনো বোঝার সঙ্গে নতুন বোঝা যোগ হয়ে মোট অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা আন্দাজ করতে কষ্ট হয় না। বর্তমানে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় সাক্ষরের হিসাবে আমাদের স্থান পঞ্চম, কিন্তু ভবিষ্যৎ গড়ার দিক থেকে আমাদের স্থান নবমে নেমেছে। সারা ভারতের গড় হিসেবের চেয়েও আমাদের স্থান নীচে। শুধু তাই নয়, ১৯৬০-৬১ সালে প্রকাশিত উপরি-উক্ত year book-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রাথমিক স্কুলে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা হলো ২৮৫২ লক্ষ; অথচ রাজ্য বিধান-পরিষদে শিক্ষামন্ত্রী কর্তৃক উপস্থাপিত বিবরণী থেকে দেখা যাচ্ছে ঐ বছর পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক স্কুলে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা হলো ২৬,৩৪,৯৮৯। (উৎস: পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা সমাচার—নভেম্বর, ১৯৬৩)।

এই সংখ্যাতাত্ত্বিক বিরোধের ব্যাখ্যা দু'রকম হতে পারে। প্রথমত, ভারত

সরকার প্রকাশিত বিবরণীতে যে-তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে তা Provisional, খানিকটা আন্দাজ মিশ্রিত। পরবর্তী পর্যায়ে মন্ত্রীমহাশয় রাজ্য বিধান-পরিষদে সঠিক তথ্য পরিবেশন করেছেন। তাই যদি হয়, তবে চিন্তার কথা। কারণ, ১৯৬০-৬১ সালের লক্ষ্যই যদি পূরণ করা সম্ভব না হয়ে থাকে, তবে সেই ভিত্তিতে গঠিত পরবর্তীকালের পাঁচশালা পরিকল্পনার লক্ষ্যই যে পূরণ হতে চলেছে তার নিশ্চয়তা কি? মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন, শতকরা আশী ভাগ ছেলেমেয়ের পড়ার ব্যবস্থা করতে পারেন নি। তার চেয়ে কত কম তা তো বলেন নি।

কিন্তু আর-একটা ব্যাখ্যাও আছে। সর্ব-ভারতীয় রিপোর্টে কোথাও এ কথা বলা হয় নি যে পশ্চিম বাংলায় বুনিয়াদি স্কুল ও কলকাতা কর্পোরেশন পরিচালিত স্কুল ছাড়া, সরকার পরিচালিত প্রাথমিক স্কুলে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয় না; পড়ানো হয় ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত। ৬ বছর থেকে ১১ বছর নয়, ৬ থেকে ১০ বছর পর্যন্ত। মধ্য স্কুলের পাঠক্রম সুরু হয় ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে নয়, ৫ম শ্রেণী থেকে। সুতরাং ভারত সরকার যখন ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র ভর্তি সংখ্যা চেয়েছেন, তখন মধ্যস্কুল পর্যায় থেকে ৫ম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা যোগ করে দিয়ে তাই সরবরাহ করা হয়েছে। আবার বিধান-পরিষদে প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা সরবরাহ করার সময়ে ১ম থেকে ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী সংখ্যা গুণে হাজির করা হয়েছে।

বিষয়টার গুরুত্ব বিশেষভাবে লক্ষ করা দরকার। অন্যান্য রাজ্যে যখন ১১ বছর পর্যন্ত পড়ানোর ব্যবস্থা হয়েছে, তখন এখানে তার থেকে আরও এক বছর কেটে নেওয়া হচ্ছে। প্রথম পাঁচ বছরে যতটুকু শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেত তাও হচ্ছে না। এর সঙ্গে wastage বা অপচয়ের হিসেবটাও ধরা দরকার। পূর্বে উল্লিখিত year book-এ বলা হয়েছে যে ভারতে ১ম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া প্রতি ১০০টি ছাত্রের মধ্যে মোট ৩৫টিকে পাঁচ বছর পরে ৫ম শ্রেণীতে দেখা যায়। অর্থাৎ, শতকরা ৬৫টি ছেলে হয় 'ফেল' করছে, নয় পড়া ছেড়ে দিচ্ছে। বাংলা দেশে 'অপচয়ে'র বিশেষ হিসেব পাওয়া সম্ভব হয় নি। কিন্তু অপচয়ের পরিমাণ খুব পৃথক হবে তার কোনো ভরসাও তো নেই।

আরও উল্লেখযোগ্য যে শহর এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব মিউনিসিপ্যালিটির। কিছুদিন আগে সি. এম. পি. ও.-র অনুসন্ধানের যে-তথ্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল তাতে জানা যায় যে কলকাতায় ৬ থেকে ১১

বছরের ছেলেমেয়েদের শতকরা ৬০ জন ১ম থেকে ৫ম শ্রেণীতে পড়ে। তুলনায় মাদ্রাজের সংখ্যা হচ্ছে ৯৪%। এ পর্যন্ত মোটে জঙ্গিপুর, খড়দহ ও আসানসোল এই তিনটি মিউনিসিপ্যালিটি আবশ্যিক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব নিতে সম্মত হয়েছে।

মিলিয়ে দেখা যাক মধ্য স্কুল পর্যায়ের, অর্থাৎ ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর অবস্থা।

তালিকা ৭

১১ থেকে ১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠরত ছাত্রের অনুপাত

	রাজ্য	১৯৬০-৬১	১৯৬৫-৬৬
১।	কেরল	৫০.৩%	৪৫.৩%
২।	হিমাচল প্রদেশ	২৮.৬%	৩৬.৬%
৩।	মহারাষ্ট্র	২৮.৫%	৩৬.২%
৪।	মাদ্রাজ	৩০.১%	৩৫.৯%
৫।	আসাম	২৭.৪%	৩৫.৩%
৬।	গুজরাট	২৬.৮%	৩৪.৯%
৭।	পাঞ্জাব	২৮.৩%	৩৩.৪%
৮।	জম্মু ও কাশ্মীর	২৭.৮%	৩৩.৫%
৯।	পশ্চিমবঙ্গ	২১.১%	৩৩.৩%
	সারাভারত	২২.৮%	২৮.৬%

(উৎস : A Review of Education in India)

উপরের তালিকা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, যে-বয়সের ছেলেমেয়েদের ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত আবশ্যিক অবৈতনিক শিক্ষা পাবার কথা ছিলো, তাদের শতকরা ৬৬.৭ অংশ স্কুলের বাইরে থেকে যাচ্ছে। প্রথমত, পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের এক-চতুর্থাংশেরও বেশি অংশ প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে না; দ্বিতীয়ত, দুই-তৃতীয়াংশ মধ্যশিক্ষার পর্যায়ে উন্নত হচ্ছে না। যে নিরক্ষরতা, অশিক্ষার ভার আজকের দেশকে পিছনে টেনে রাখছে, তার জের চলবে আরও কত বছর? লক্ষ্যণীয় যে এখানেও পশ্চিমবঙ্গের স্থান নবম। অবশ্য এক্ষেত্রে সারা ভারতের গড় হিসেবের চেয়ে পশ্চিমবঙ্গ এগোবে

বলে আশা করা যাচ্ছে। অবশ্য বৃদ্ধির হারও তুলনায় ভালো। কিন্তু তবু ভুললে চলবে না যে প্রারম্ভিক শিক্ষা ৬ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত, ১ম থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক ও আবশ্যিক করতে হবে। নিতান্তই সংবিধানের নির্দেশ বলে নয়, জাতির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজনের খাতিরেই তা করতে হবে। কিন্তু তা হবে কবে ?

উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা

এবার উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষার কথায় আসা যাক।

তালিকা ৮

১৪ থেকে ১৭ বছরের ছেলেমেয়েদের ৯ম থেকে ১১শ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠরত ছাত্রের অনুপাত

	রাজ্য	১৯৬০-৬১	১৯৬৫-৬৬
১।	কেরল	২১·৬%	২৪·২%
২।	আসাম	১৭·৫%	২২·৯%
৩।	পশ্চিমবঙ্গ	১১·২%	২১·৯%
	সারাভারত	১১·৫%	১৫·৬%

উল্লেখযোগ্য যে এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের স্থান তৃতীয়, কেরল ও আসামের পরেই। শিক্ষাবৃদ্ধির হার লক্ষণীয়; সারা ভারতের গড়পড়তা হারের চেয়ে বেশি। এটাও নজরে পড়ে যে প্রাথমিক থেকে মধ্যস্কুল পর্যায়ের ক্ষেত্রে পাঠরত ছাত্রদের শতাংশ যেখানে শতকরা ৭৩·৪ থেকে ৩৩·৩-এ অর্থাৎ ৪০·১%-এ নেমেছে, সেখানে মধ্যস্কুল থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক স্কুল-পর্যায়ে নেমেছে মাত্র ১১·৪%। তবু ভুললে চলবে না যে ১৯৬৫-৬৬ সালেও ১৪-১৭ বছরের ছেলেমেয়েদের প্রতি পাঁচজনের প্রায় চারজনই স্কুল-শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকবে।

এ ছাড়া সমস্যা আরও রয়েছে। আগেই বলা হয়েছে যে বর্তমানে উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে ছেলেমেয়েদের ১১শ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো। তার ফলে, আগে যত ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত উচ্চ-মাধ্যমিক স্কুল ছিল, সেগুলিকে সব ১১শ শ্রেণী পর্যন্ত এবং বিভিন্ন ধারায় পাঠক্রম সংবলিত উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলে রূপান্তরিত করার দায়িত্ব পড়লো। কিন্তু এখনো প্রায় অর্ধেক স্কুলই

রয়েছে পুরোনো দিনের উচ্চ-মাধ্যমিক স্কুলের স্তরে। ১৯৬৪-৬৫ সালের বাজেট বক্তৃতায় শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন যে ১৯৬২-৬৩ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ছিলো যথাক্রমে ১১২৭ ও ১১৩৭। তবে এও লক্ষ করতে হবে যে ১৯৫৯-৬০ সালে ঐ সংখ্যা ছিলো যথাক্রমে ১৩৬৮ ও ৬১২। এই তিন বছরে মোট স্কুলের সংখ্যা বেড়েছে ২৮৪, উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা বেড়েছে ৫২৫, এবং উচ্চ-মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা কমেছে ২৪১। এই হারে চললে সমস্ত উচ্চ-মাধ্যমিক স্কুলকে উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলে পরিণত করতে অন্তত আরও ১৪ বছর লেগে যাবে। সমস্যাটা শুধু এ নয় যে ছাত্রছাত্রীরা এক বছর কম পড়ছে। আসলে বিভিন্ন ধারায় তিন বছরের সম্পূর্ণ পাঠক্রমে শিক্ষার সুযোগ থেকে এত বিরাট অংশ ছাত্রছাত্রী বঞ্চিত থাকছে। ১৯৫৪ সালে 'মুদালিয়র কমিশন' যে সংস্কারসাধনের কথা বলেছিলেন বর্তমান হারে চললে তাকে কার্যে পরিণত করতে ১৯৭৭ সালে পৌছতে হবে।

শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেছেন যে এই ১১৩৭টি উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলে ২৩৩৮টি ভিন্নমুখী পাঠক্রম চালু আছে। গড়-পড়তা হায় দাঁড়ায় স্কুলপিছু ২'০৫টি পাঠক্রম। অর্থাৎ, যে ৭টি বিভিন্নমুখী পাঠক্রম চালু করার কথা ছিল তা চালু করা যায় নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মোটে দুই ধরনের পাঠক্রম চালু করা গেছে। তবে এমনও হতে পারে, ১১শ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো চালু হলেও, কোথাও কোথাও একটিমাত্র পাঠক্রমই চালু রাখা হয়েছে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্নমুখী কর্মপ্রতিভা স্ফুরণের যে-সুযোগ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, তাও কার্যে পরিণত করা যাচ্ছে না।

যে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি তিনি বলেন নি, তা' হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষকতা করবার উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না। ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত উপাচার্য সম্মেলনে ভারতবর্ষের প্রায় সব এলাকা থেকেই এ অভিযোগ ওঠে যে স্কুলের উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না, বিশেষ করে ইংরেজি, অঙ্ক ও বিজ্ঞান-বিষয়গুলিতে। এ সমস্যা পশ্চিম বাংলারও। স্কুল-শিক্ষকদের যে-মাইনে দেওয়া হয় তাতে কলকাতা শহরে কিছুটা, কিন্তু মফঃস্বলে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে যথোপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ফলে, হয় সেইসব বিষয় পড়ানো বন্ধ থাকছে, নয়তো অন্য বিষয়ের ডিগ্রী-প্রাপ্ত শিক্ষককে ঠেকিয়ে রেখে কাজ চালানো হচ্ছে। প্রয়োজন, পরিকল্পনা ও অর্থব্যয়,—এগুলির আর পারস্পরিক সংগতি থাকছে না।

এবারে শিক্ষা-ব্যবস্থার অঞ্চলগত পরিমাপটি লক্ষ করুন।

তালিকা ৯

পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির আয়তন ও তদনুযায়ী বিভিন্নস্তরের স্কুলের সংখ্যা (১৯৫৯-৬০)

জেলা	বর্গমাইল	প্রাঃ স্কুল সংখ্যা	বর্গমাইলে একটি স্কুল	মধ্য স্কুল সংখ্যা	বর্গমাইলে ১টি স্কুল	উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সংখ্যা	বর্গমাইলে ১টি স্কুল	উচ্চতর মাধ্যমিক ও বহুমুখী স্কুল সংখ্যা	বর্গমাইলে ১টি স্কুল
পশ্চিমবঙ্গ	৩৪,১৯৪.১	২৭,২৭১	১.২৫	২০৬৯	১৬.৫	১,৩৬৮	২৫.০	৬১২	৫৫.৮
বর্ধমান	২,৭০৫.৫	২,১৯৭	১.২৩	১৭১	১৫.৮	১৩০	২০.৮	৪৯	৫৫.২
বীরভূম	১,৭৪৩.০	১,৩৪৩	১.২৯	৯১	১৯.১	৫১	৩৪.১	২১	৮৩.০
বাঁকুড়া	২,৬৪৭.০	২,১০৮	১.২৫	১০৬	২৪.৯	৬৫	৪০.৭	২৮	৯৪.৫
মেদিনীপুর	৫,২৫৩.৪	৫,১৮০	১.০১	৩৪৩	১৫.৩	১৭০	৩০.৯	৬৩	৪৬.৬
হাওড়া	৫৬০.১	১,৪৪৪	৫.৩৮	১১৮	৪.৭	৮৯	৬.২	৪৬	১২.১
হুগলী	১,২১২.১	১,৬৭৭	৫.৭২	১৩৪	৯.০	১১২	১০.৮	৫২	২৩.৩
২৪ পরগণা	৫,৬৩৭.৭	৪,০৮২	১.৩৮	৪১২	১৩.৬	২৮৬	১৯.৭	৯৩	৬০.৬
কলকাতা	৩৯৮	৭৭২	৫.০৫	৬৬	৫.৬	১৭১	০.২	৯৯	০.৪
নদীয়া	১,৫০৯.১	১,৩৭১	১.১০	১০৮	১৩.৯	৬৫	২৩.২	২৮	৫৩.৯
মুর্শিদাবাদ	২,০৭২.২	১,৪৫৭	১.৪২০	১০০	২০.৭	৫৫	৩৭.৬	২৫	৮২.৮
পঃ দিনাজপুর	২,০৫১.৯	১,০৬৯	১.৯২	৮৫	২৪.২	২৪	৮৫.৯	৮	২৫৭.৭
মালদহ	১,৩৯১.৯	৮৫৮	১.৬২	৫২	২৬.৭	২২	৬৩.২	১৪	৯৯.৪
জলপাইগুড়ি	২,৩৮২.৯	৯৬৫	২.৪৬	৫৫	৪৩.৩	২৬	৯১.৬	১৬	১৪৮.৯
দার্জিলিং	১,২৫৩.৬	৪৬০	২.৭৩	৩৩	৩৮.০	১৯	৬৬.১	১২	১০৪.৭
কুচবিহার	১,৩১৩.৯	৭৬৪	১.৭২	১০১	১৩.০	১২	১০৯.৪	১০	১৩১.৩
পুরুলিয়া	২,৪০৭.৫	১,৫১১	১.৫৯	৮৬	২৭.৯	৭১	৩৩.৯	১০	২৪০.৭
অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান স্কুল		১৩		৮		—		৩৮	

(উৎস : Census of India 1961. Vol. XVI এবং Statistical Abstract, West Bengal, 1960)

তালিকা ১০

পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির জনসংখ্যা ও তদনুযায়ী বিভিন্নস্তরের স্কুলের ছাত্রসংখ্যা (১৯৫৯-৬০)

জেলা	জনসংখ্যা (হাজার)	প্রা: স্কুল ছাত্র সংখ্যা	প্রতি হাজার জনে	মধ্য স্কুল ছাত্র সংখ্যা	প্রতি হাজারজনে	উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল ছাত্র সংখ্যা	প্রতি হাজার জনে	উচ্চতর মাধ্যমিক ও বহুমুখী স্কুল ছাত্র সংখ্যা
পশ্চিমবঙ্গ	৩৪,৯২৬	২,৫৫৪,১০৫	৭৩'১	১৮২,৭৯১	৫'২	৩৭২,১৭৮	১১'২	২৯৪,৭১৫
বর্ধমান	৩,০৮২	২২৩,০১২	৭২'৩	১৪,৯৮৪	৪'৮	৩২,১৪১	১০'৪	২২,৫২২
বীরভূম	১,৪৪৬	১০২,১৬২	৭০'৬	৭,৪১২	৫'১	১০,৭৭৮	৭'৪	৯,৩৩৩
বাঁকুড়া	১,৬৬৪	১২৬,৩৫১	৭৫'৯	৯,০ ৫	৫'৪	১৩,৮৫১	৮'৩	৯,৭২২
মেদিনীপুর	৪,৩৪১	৪৩২,৭৪৬	৯৭'৬	৩০,৯০৭	৭'১	৪১,৫৪০	৯'৫	২৪,৪৪৫
হাওড়া	২,০৩৮	১৯১,৬০০	৯৪'১	১০,৬৫৮	৫'২	২৪,৬৬০	১২'১	২১,৩৮৮
হুগলী	২,২৩১	১৮৮,৯২৩	৮৪'৬	১৩,৭০৫	৬'১	২৯,৬৩৬	১৩'২	২২,৭০৯
২৪ পরগণা	৬,২৮০	৪৬০,২৭২	৭৩'২	৩৪,৮৮৪	৫'৫	৮৬'৬৯১	১৩৮	৪৭,৭৮৪
কলকাতা	২,৯২৭	১৭৫,৭৫২	৪৯'৭	৬,৭০৪	২'২	৭৮,২০৬	২৬'৭	৬৩,৪১৬
নদীয়া	১,৭১৩	১৫০,৬২১	৮৭'৯	১০,৫৪৮	৬'১	২৬,৪৫২	১৫'৪	১১,৭৩৭
মুর্শিদাবাদ	২,২৯০	১১৭,৪৭২	৫১'৭	৭,৪৭২	৩'২	১১,৯৬৯	৫'২	১০,৭০৮
পঃ দিনাজপুর	৬:৪	৮২,৮৫৯	১২৬'৬	৫,৮৩১	৮'৯	৫,৮৮৮	৯'০	৪,০৩৪
মালদহ	৩০৬	৭৮,৫৩৯	২৫৬'৬	৩,০০৫	৯৮	৪,০৫৮	১৩'২	৪,৯৭২
জলপাইগুড়ি	৪৮৫	৭৩,৪৮১	১৫১'৫	৩,৪৮৮	৭'১	৭,২০৬	১৪'৮	৭,৮৯০
দার্জিলিং	৬২৪	৪৪,১২৭	৭০'৭	২,০৯০	৩'৩	৪,৯১৯	৭'৮	৪,৭৬৭
কুচবিহার	১,০১৯	৫৭,৬৪০	৫৬'৫	১০,৮২৭	১০'৬	৩,৪১৩	৩'৩	৫,১৭৪
পুরুলিয়া	১,৩৬০	৮৪,২৪৬	৬১'৯	৮,৬৯৪	৬'৩	১০,৭৭০	৭'৯	৫,২৭৫
অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান স্কুল		৩,২৯৮		২,৫১৭				১৮,৮৩৯

(উৎস : Census of India, 1961, Vol. XVI
Statistical Abstract, West Bengal, 19

উপরের দুটি তালিকায় পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলার তুলনামূলক পরিস্থিতিটা খানিক বোঝা যাবে। Statistical Abstract-এ প্রদত্ত সংখ্যার সঙ্গে Census-এর তথ্য মিলিয়ে কত বর্গমাইলে একটি স্কুল ও প্রতি হাজার জনসংখ্যায় কত ছাত্র, সে হিসেবটা আমি নিজেই করে নিয়েছি। জনসংখ্যার হিসেব হাজারের পরে একক-দশক-শতকের কোঠার সংখ্যা আমি উপেক্ষা করেছি। ফলে দশমিকের ঘরের হিসেবে কিছু প্রভেদ থাকবে। তাতে তুলনার কাজে ক্ষতি হবে না।

প্রথমে আমরা সাক্ষরের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, তখনই দেখা গিয়েছিল যে এদিকে বিশেষ অবনত হলো মালদহ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর, পুরুলিয়া, জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলা। সমগ্র জনসংখ্যার তুলনায় বিভিন্ন স্তরের ছাত্র-সংখ্যার হিসেব নিলে দেখা যায় যে মালদহ, জলপাইগুড়ি বা পশ্চিম দিনাজপুর অন্যান্য অংশের তুলনায় পিছিয়ে নেই, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এগিয়েই আছে। কিন্তু কুচবিহার, মুর্শিদাবাদ ও পুরুলিয়ার অবস্থা রীতিমত দুশ্চিন্তাজনক। এদের বর্তমানই যে নৈরাশ্যজনক তাই নয়, ভবিষ্যৎও আশাপ্রদ নয়। সুতরাং শিক্ষাবিস্তারের পরিকল্পনাকালে এদের কথা বিশেষভাবে ভাবতেই হবে। তবে প্রায় সারা উত্তরবঙ্গেই বহু-বিস্তীর্ণ এলাকায় একটি করে উচ্চ-মাধ্যমিক স্কুল। জনসংখ্যার ঘনত্বও অবশ্য কম। তবু এত দীর্ঘবিস্তৃত এলাকায় একটি করে স্কুল থাকলে ছাত্রদের পক্ষে বাড়ি থেকে পড়তে আসা দুঃসাধ্য। সুতরাং যথোপযুক্ত ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা থাকা দরকার, বিনা খরচে বা সস্তায়। সে ব্যবস্থা কতদূর হয়েছে সে তথ্য সংগ্রহ করতে পারি নি; সুতরাং মতামত দেওয়া সম্ভব নয়।

উচ্চশিক্ষা

এবার উচ্চশিক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার আলোচনায় আসা যেতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় হলো,—কলকাতা, যাদবপুর, কল্যাণী, বর্ধমান, উত্তরবঙ্গ ও রবীন্দ্রভারতী—রাজ্যসরকারের অধিকারে; এ ছাড়া বিশ্বভারতী ও খড়্গপুর ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট অব টেক্‌নলজি ভারত সরকারের পরিচালনাধীন। যাদবপুর, কল্যাণী, বিশ্বভারতী ও খড়্গপুরের ইন্‌স্টিটিউট আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। শিল্পবিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা খড়্গপুর ইন্‌স্টিটিউটের লক্ষ্য;

যাদবপুরেরও তাই ; তবে এখানে সাধারণ কলাবিজ্ঞানীয় পাঠক্রমও আছে। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় মূলত কৃষিবিজ্ঞান-সম্পর্কিত। রবীন্দ্রভারতী শিল্পচর্চা-কেন্দ্রিক। সাধারণ কলা ও বিজ্ঞান শিক্ষার দায়িত্ব কলকাতা, বর্ধমান ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের। এঁদের পরিচালনাধীনে ও স্বীকৃতিতে বিভিন্ন কলেজে ছাত্রদের কলা ও বিজ্ঞান পাঠক্রমে শিক্ষা দেওয়া হয় ; এক কথায় সাধারণ শিক্ষার উচ্চ-পর্যায়ের কাজ চলে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কলেজ কলকাতায় ৫৯টি ও মফঃস্বলে ৬৬টি ; বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত কলেজ মোট ৩২টি ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃত কলেজ ১৯টি। পশ্চিমবঙ্গে এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'এফিলিয়েটেড' কলেজের সংখ্যা মোট ১৭৬টি।

এবারে ছাত্রভর্তি সংখ্যার হিসাবটি দেখা যাক।

তালিকা ১১

(১৯৬০-৬১)

প্রতিষ্ঠান	ছাত্র সংখ্যা
বিশ্ববিদ্যালয়	১২,২১০
গবেষণা প্রতিষ্ঠান	৩৩৩
'কলা' ও 'বিজ্ঞান' কলেজ	১১৩,৫১৮
বৃত্তি ও শিল্পবিজ্ঞান কলেজ	১৩,০৫৮
বিশেষ শিক্ষার কলেজ	৩,৪৫৩

(উৎস : Statistical Hand Book—1963 W. B. Govt.)

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব হিসেব বিশদতর।

তালিকা ১২

বিশ্ববিদ্যালয়-অন্তর্গত ছাত্র সংখ্যা (১৯৬২-৬৩)

বিষয়	ছাত্র	ছাত্রী	মোট
কলা	৩১,০০৬	২৫,৩৪১	৫৬,৩৪৭
চারুশিল্প ও সংগীত	...	৪২	৪২

বিষয়	ছাত্র	ছাত্রী	মোট
বিজ্ঞান	২৫,২৮৬	৪,০৩২	২৯,৩১৮
কৃষি	২৩	...	২৩
বাণিজ্য	১৯,৬২৫	১৪০	১৯,৭৬৫
শিক্ষণ	৯৪৯	৫১৮	১,৪৬৭
এঞ্জিনিয়ারিং	২,১২৯	১৬	২,১৪৫
সাংবাদিকতা	১১৪	২৬	১৪০
আইন	৩,৫৭৩	২০৫	৩,৭৭৮
চিকিৎসা	৩,০৩১	৬৫৪	৩,৬৮৫
শিল্পবিজ্ঞান	৩১৯	...	৩১৯
পশুচিকিৎসা বিজ্ঞান	৪২	১	৪৩
মোট	৮৬,০৯৭	৩০,৯৭৫	১,১৭,০৭২

(উৎস : Draft Annual Report—1962-63, University of Calcutta)

উপরোক্ত তথ্য থেকে বোঝা যায় যে দু'বছরে বিভিন্ন বিভাগে ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা অনেক বেড়েছে। দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞান পাঠরত ছাত্রের সংখ্যা কলাবিভাগীয় ছাত্রদের তুলনায় খুব কম নয়। প্রমাণ হচ্ছে, বিজ্ঞান-শিক্ষা ছাত্রদের মধ্যে যথেষ্ট জনপ্রিয় এবং কলকাতার বাইরেও এখন বিজ্ঞান-শিক্ষার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। তৃতীয়ত ছাত্রীদের দু'ভাগের পাঁচভাগই প্রায় কলা বিভাগে প্রবেশ করছেন। এর ফলে মেয়েদের শিক্ষা একপেশে হচ্ছে। কর্মজগতে একদিকেই ভিড় বাড়ছে। অথচ, এ অবস্থা না পাল্টালে বেকারির ভিড়ে শিক্ষার অনেকখানি অপচিত হচ্ছে বা আরও হবে। এ অবস্থা বদলাবার জন্য স্কুল শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের মধ্যে অঙ্ক ও বিজ্ঞান শিক্ষার মান বাড়ানো অবশ্য প্রয়োজনীয়, যাতে শিক্ষার অন্যান্য শাখাও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের মধ্যে সমান জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। অবশ্য এ সূত্রে স্মরণ রাখতে হবে যে মেয়েদের বহু কলেজেই বিজ্ঞান বা বাণিজ্য বা অন্যান্য শাখায় শিক্ষার ব্যবস্থা নেই।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চিম বাংলার অবস্থা বিচার করে দেখা যাক।

তালিকা ১৩

বিভিন্ন রাজ্যে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা (১৯৬১-৬২)

রাজ্য	কলা ও বিজ্ঞান কলেজ	বৃত্তিবিষয়ক কলেজ	বিশেষ শিক্ষার কলেজ
অন্ধ্রপ্রদেশ	৬৫	৩৬	২৬
আসাম	৩৮	১২	১
বিহার	১১২	৩৪	৭
গুজরাট	৫৬	৪৫	৯
জম্মু ও কাশ্মীর	১৬	৭	১০
কেরল	৪৭	৩৫	৭
মধ্যপ্রদেশ	৮০	১১০	৩৭
মাদ্রাজ	৫৯	১৬২	২০
মহারাষ্ট্র	১০৫	১৯৭	১৭
মহীশূর	৫৮	১০২	৭
নাগাল্যাণ্ড	২	—	—
উড়িষ্যা	৩৩	২৩	৬
পাঞ্জাব	৯৭	৪৮	৫
রাজস্থান	৫৬	২৪	১৮
উত্তরপ্রদেশ	১৪২	৫৪	১২
পশ্চিমবঙ্গ	১৩৬	৫৬	১৪

(উৎস : India 1964)

উল্লেখযোগ্য যে কলা ও বিজ্ঞান কলেজের সংখ্যার দিক থেকে ভারতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের স্থান দ্বিতীয়, উত্তরপ্রদেশের পরেই। কিন্তু বৃত্তিবিষয়ক কলেজে মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশ পশ্চিমবঙ্গকে অনেকগুণ ছাড়িয়ে গেছে। ছাত্রসংখ্যার অনুপাত হিসেব করলে আর-একটা জিনিস নজরে পড়বে।

তালিকা ১৪

(১৯৬২-৬৩)

	রাজ্য	প্রতি ১০ লক্ষ লোক পিছু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা
	সারা ভারত	২,৭৮৫
১।	অন্ধ্রপ্রদেশ	১,৮০৩
২।	আসাম	২,৮৩৫
৩।	বিহার	২,১৯৯
৪।	গুজরাট	২,৯৫৬
৫।	জম্মু ও কাশ্মীর	৩,০০৮
৬।	কেরল	৩,১৮৭
৭।	মধ্যপ্রদেশ	২,২১১
৮।	মাদ্রাজ	১,৯২০
৯।	মহারাষ্ট্র	৩,৩৮০
১০।	মহীশূর	২,৩২৯
১১।	উড়িষ্যা	১,০২০
১২।	পাঞ্জাব	৩,২৬৪
১৩।	রাজস্থান	২,৬০৩
১৪।	উত্তরপ্রদেশ	৩,৬১৫
১৫।	পশ্চিমবঙ্গ	৪,১৫১
১৬।	দিল্লী	৯,০৯২

(উৎস : Fact Book on Manpower, Part II)

দিল্লী অঙ্গ রাজ্য নয়। উচ্চশিক্ষারত ছাত্রদের তুলনায় রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান সর্বাগ্রগণ্য; সারা ভারতের গড়পড়তা হিসেবের অনেক বেশি। লক্ষণীয় যে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গ তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। এর থেকে একটা সন্দেহ মনে জাগে। বৃটিশের বাণিজ্য ও শাসনের প্রধান ঘাঁটি কলকাতা হবার জন্তে এবং জাতীয়তাবাদের প্রভাবে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ অন্তান্ত রাজ্যের তুলনায় অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিল। সৃষ্টি হয়েছিল বাঙালি "ভদ্রলোক" শ্রেণী। স্বাধীনতার পর "ভদ্রলোক"দের দলবৃদ্ধি ঘটেছে। কিন্তু গুণগত পরিবর্তন ঘটে নি; গণতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টি হয় নি। "শিক্ষিত ভদ্রলোক" ও "অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত" কায়িক পরিশ্রমরত বাঙালির মধ্যে পার্থক্য এখনও বিশাল। এর

পাশাপাশি আর-একটি সমস্যা প্রবল হচ্ছে। তা' হচ্ছে শিক্ষিত বেকার-সমস্যা। শিক্ষিত বেকারদের নিয়ে যেটুকু অনুসন্ধান ও আলোচনা হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষিত বেকারের চাপ প্রধানত কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের ডিগ্রীপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে। এবং পশ্চিম বাংলায় ছাত্রদের ভিড় এই তিনটি বিভাগেই। শুধু ভিড় নয়, এর সঙ্গে অপচয়ের হিসেবটাও নেওয়া দরকার।

তালিকা ১৫

পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রার্থী ও উত্তীর্ণের সংখ্যা (১৯৫৮-৫৯)

পরীক্ষা		প্রার্থী	উত্তীর্ণ
স্কুল ফাইন্যাল		১,০১,৭০৪	৫৮,৪৭০
ইণ্টারমিডিয়েট		৫৩,৬৮১	২৩,৫৫৮
স্নাতক :	১। কলা	১৩,৫৪৮	৫,৪৫৬
	২। বিজ্ঞান	৬,১২৭	৩,০৪৪
	৩। বাণিজ্য	৭,৬৫৯	৩,২৮৩
	৪। আইন	৫২০	৩৯২
	৫। এঞ্জিনিয়ারিং	৫০৮	৪৩৪
	৬। চিকিৎসাবিজ্ঞান	১,২৭৫	৬২৮
	৭। অন্যান্য	১,৬২৪	১,৫৫৩
স্নাতকোত্তর :	১। কলা	১,৫৬৩	১,১২৪
	২। বিজ্ঞান	৪৮৩	৩০৫
	৩। বাণিজ্য	৪৪৭	৩২৫
	৪। অন্যান্য	৪৪৬	৩২৩

(উৎস : Statistical Hand Book, 1963, W. B. Govt.)

১৫নং তালিকা অপচয়ের এক বিরাট খতিয়ান তুলে ধরেছে : শ্রম, অর্থ ও সময়ের অপচয়। লক্ষণীয় যে স্কুল ফাইন্যাল, ইণ্টারমিডিয়েট ও স্নাতক পরীক্ষার স্তরেই অসাফল্যের অনুপাত বেশি। আবার স্নাতকদের মধ্যে কলাবিভাগে ভর্তির ভিড় যেমন বেশি, 'ফেলে'র ভিড়ও তেমনি। পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হবার নানা কারণ আছে। তবে তার অন্যতম কারণ এটাও যে এমন কিছু ছেলেমেয়ে পড়ছে এবং পরীক্ষা দিচ্ছে যারা ঠিক এই বিভাগের পক্ষে অনুপযুক্ত। তার মানে এ নয় যে এরা সবরকম শিক্ষারই অনুপযুক্ত। আসলে উচ্চ মাইনের চাকরীর পাসপোর্টের জন্য এবং সামাজিক মর্যাদার খাতিরে এরা কলাবিভাগে এসে ভিড় করছে।

আমি এ কথা বলছি না যে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অতিবিস্তার ঘটেছে; অনুপযুক্ত ছাত্রছাত্রীকে বাদ দাও, শিক্ষা সংকোচন করে আনো। মোটেই না; বরং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে আরও বাড়ানো দরকার। কিন্তু সেটা তলা থেকে আনুপাতিক বৃদ্ধির পটভূমিকায় করতে হবে; উচ্চ-শিক্ষা শুধু শ্রেণীগত সুযোগ হিসেবে থাকবে না। যেসব যোগ্য ছাত্রছাত্রী আজ বহু আগে থেকে পড়াশুনো বন্ধ রাখতে বাধ্য হচ্ছে, তাদের সে সুযোগ দিতে হবে। অপরদিকে টেক্‌নিক্যাল স্কুল, পলিটেক্‌নিক্‌, টেকনলজিক্যাল কলেজ, বিশেষ শিক্ষার স্কুল ও কলেজের মারফত্ নানাখাতে শিক্ষাকে আরও অনেক বিস্তৃত করতে হবে।

উদ্দেশ্য দুটো: প্রথমত, গণতন্ত্রের দাবি হলো,—সর্বশ্রেণীর মানুষই আত্মোন্নতির সমান সুযোগ পাবে। দ্বিতীয়ত, সব ছাত্রছাত্রীর কর্মক্ষমতা এক ধরনের নয়; সুতরাং বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপ্তি ঘটাতে না পারলে ফেলের সংখ্যা বেশিই থাকবে। প্রচণ্ড অপচয় রয়েছে এতে; আবার, সকলের সমান সুযোগের গণতান্ত্রিক নীতিও এর দ্বারা ব্যাহত হচ্ছে। তৃতীয়ত, এটা স্বীকৃত যে আজকের দিনের অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভর করছে শিল্পায়নের উপর। শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজন শিল্পবিজ্ঞানে শিক্ষিত নতুন মানুষ। সুতরাং এদিকে নজর সবচেয়ে বেশি পড়া দরকার ছিল; অথচ এখানেই বৃহত্তম ব্যর্থতা।

কারিগরি শিক্ষা

শিক্ষামন্ত্রী বলছেন:

"দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ পর্যন্ত কারিগরি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিলো নিম্নরূপ: (ক) এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সংখ্যা—৪; (খ) পলিটেক্‌নিকের সংখ্যা—২১; (গ) জুনিয়র টেক্‌নিক্যাল স্কুলের সংখ্যা—১২। বর্তমান পরিকল্পনায় আর-একটি এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, উত্তর কলকাতা এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। চারটি নতুন পলিটেক্‌নিক খোলা হয়েছে, তার মধ্যে একটি শুধু মেয়েদের; আরও দুটি পলিটেকনিকের অনুমোদন দেওয়া হবে আগামী বছরে।...তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ১৫টি নতুন জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুলের নক্সা করা হয়েছে। তার মধ্যে ৮টির অনুমোদন ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে।"

(উৎস: প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর ১৯৬৪-৬৫ সালের বাজেট বক্তৃতা)

অবস্থাটা ভেবে দেখুন। পরিকল্পনা ঠিক ঠিক কার্যকর হলেও ১৯৬৬ সালের মার্চ মাস নাগাদ সংখ্যা দাঁড়াবে এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ—৫টি, পলিটেকনিক—২৯টি এবং জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল—২৭টি। যন্ত্রশিল্পমুখী শিক্ষার প্রয়োজনের তুলনায় এ ব্যবস্থা কত সামান্য! কটি ছেলেমেয়েকে সাধারণ শিক্ষার দরজায় ভিড় না করে টেক্‌নিক্যাল শিক্ষায় শিক্ষিত হতে এ ব্যবস্থা সাহায্য করবে? শিল্পায়নের খাতিরে যখন দরকার ছিল কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকেরা নিজেদের উদ্যোগে, ব্যক্তিগত মালিকানায় অথবা সমবায়প্রথায় শতশত ছোট-বড়ো কারখানা গড়ে তুলবে, সেখানে তার সামান্য ভগ্নাংশটুকুই শিক্ষিত হয়ে উঠছে না। অথচ, এই বক্তৃতাতেই প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন: 'কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন পশ্চিম বাংলায় অনেক বেশি। পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নত রাজ্য; ভারতের ভারি শিল্পের প্রায় শতকরা ষাট ভাগ কলকাতা ও তার আশেপাশে কেন্দ্রীভূত।'

তবে কেন আরও প্রতিষ্ঠান গড়া হয় না? প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন,—টাকা নেই। প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও সর্বজনীন করা যাচ্ছে না,—টাকা নেই। ১৪ বছরের বয়স পর্যন্ত আবশ্যিক অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন করা যাচ্ছে না,—টাকা নেই। স্কুল ও কলেজে যে-মাইনে দিলে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের টানা যায় ও ধরে রাখা যায় তা দেওয়া হচ্ছে না। শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না; Flight of Talents ঘটছে। তবু মাইনে বাড়ানো যাবে না,—টাকা নেই। সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে যে চতুর্থ পরিকল্পনায় শিক্ষাবাবদ যে ব্যয়ের প্রস্তাব রাখা হয়েছিলো, মুখ্যমন্ত্রীর ব্যয়-সংকোচের তাগিদে তাকে ছেঁটে তৃতীয় পরিকল্পনার ৫০ কোটি টাকার জায়গায় মোট ৪৯ কোটি টাকাতে দাঁড় করানো হয়েছিল। পরে অবশ্য অনেক টানাপোড়েন, ধস্তাধস্তির মারফত্‌ তাকে বাড়িয়ে ফের নাকি ৭৫ কোটি টাকায় রক্ষা হয়েছে। এই অনাগতবিধাতাদের পরিচালনায় শিক্ষার হাল কি হবে?

শিক্ষার তাবৎ সমস্যা নিয়ে আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ছিলো না। কিন্তু গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনে শিক্ষার ব্যাপ্তি ও বহুমুখীন বিস্তৃতির কয়েকটি সমস্যা নিয়ে আলোচনার যে-সূত্রপাত করা হলো, আশা করি, সেটাকে অন্যান্যরা আরও বাড়িয়ে নিয়ে যাবেন। কারণ, শিক্ষার সমস্যাটা শুধু ছাত্র ও শিক্ষক এবং শিক্ষাবিদদের সমস্যা নয়, এটা সর্বসাধারণের।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

কাছের লোক

দরোজা খোলো,
ফিরে এসেছি—
ফিরে এসেছি, দেখ।

দূরে গিয়েছি
দূরে থাকি নি
ফিরে এসেছি, দেখ।

কাছে থাকব
দূরে গেলেও
কাছে থাকব
দূরে গেলেও

ফিরে এসেছি, দেখ।

দরোজা খোলো,
ফিরে এসেছি—
দরোজা খোলো,
ফিরে এসেছি

দরোজা খুলে ডাকো ॥

আবুবকর সিদ্দিক

দাঁতাল নীতির বলি

মাটিতে হাড়ের সার বাতাসে কথা
চাপড়া ঘাসের জটে খুনের ঝাঁঝ
রক্তে জমাট বাসি শোষক মশা
দুপুরে নেমেছে কটু কাকের সাঁঝ।

বিদায়! বিদায়! প্রিয় বিমুখ মাটি!
কী দোষে ছিনিয়ে নিলি সাবেকী ঠাঁই
জানি নে কোথায় কোন্ অনামী ঘাঁটি
আমায় ফিরিয়ে দেবে মা বোন ভাই।

সূর্য! চন্দ্র! তারা! সাক্ষী থেকো!
বৈরী হলেম আমি আপনা মাসে
বক্ষে ছোবল দিল কুটিল সেঁকো
কলিজা আহত। দূরে শকুনী হাসে।

দু-পারে নারকী হোলি। সীমানা মাঝে।
দাঁতাল নীতির বলি আমরা যত
সাধুর ভোজালী বেঁধা মঠের খাঁজে
ঘাতক স্বয়ং প্রভু গরজ মতো।

পিতা ও নেতারা কবে কালান্তরে
নায়ক হবেন তাই তাঁদের তরে
আমরা হীনায়ু হত পথের পরে
প্রাচ্য ত্যাগের খ্যাত মহিমা ধ'রে।

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

রাজহাঁস

জলের বাগানে রোজ খেলা করে সন্ধ্যারতিখানি।
যখন শঙ্খের ডাক উঠোন পেরিয়ে চলে যায়
পুকুরের জল ভেঙে ও-পাড়ায় সুপুরিবনের
অন্ধকারে, তুমি জলাভূমি ছেড়ে উঠে আসো, আমি
বুকের দুয়ারে পাই জলে ভেজা আমার ঈশ্বরী
এমন সায়াহ্নে কারা চতুর্দিকে হাঁক দিয়ে ফেরে।

এখন দুপুর রাতে লন্ঠনের আলো মাঠ দিয়ে
শ্রাবণের আল বেয়ে চলে যায় দূরের শহরে,
এখন আয়ত্তাধীন খুলে রেখে চলে যেতে পারি,
কেবল জলের দিকে অতি দ্রুত লুন্ঠনের ঘোর।
চারদিকে নীল জল পালকে পালকে ফুঁসে ওঠে
কোথাও যাবার মতো উদ্যম জাগে না কোনোদিন
কারণ তোমাকে ছাড়া উচাটন নশ্বরতাখানি
কী করে ফুরাই বলো, বিশেষত সায়াহ্নবেলায়।

সত্য গুহ

আমার যাবার কোথাও জায়গা নেই

যাবার জায়গা নেই আমার কোথাও।
নিজের ভেতরে একটা নিরম্বু উট
এবং অস্বস্তিকর পতিত অঞ্চল
হুহু করে।

তাঁবু যারা ফেলেছিলো যে-যার মতন
চলে গেছে।
কোথায় কে জানে।
মনে পড়ে,
সারেগামা বিহানের গবাদি পশু ও পাখি
তাদের সঙ্গে ছিলো। যাদুকরী
প্রদীপ, খেলার সরঞ্জাম, ঢাক ঢোল
পরন কথার গল্পে তুলে রেখে
যে-যার মতন
চলে গেছে।

যাবার জায়গা নেই আমার কোথাও
অসময়ে অযাচিত যমের বাড়িও
যাওয়া যায় না মনও ওঠে না
তার চেয়ে অবনীর বাড়ি
জীবন সমর আর সবিতার সঙ্গে বরং
অসম্ভব আড্ডা দেয়া চলে।

গোপাল হালদার

রূপনারানের কূলে

(পূর্বানুবৃত্তি)

নাম-না-করা মানুষ

মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় আরম্ভ নোয়াখালিতে—সেই বাল্যে-কৈশোরে। যৌবনেও তা বিস্তারিত। বার্ধক্যের এ পারেও সেদিনকার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হয়ে পড়ে নি। ব্যাপক হয়েছে, পূর্ণতর হয়েছে মানুষের সঙ্গে পরিচয়। তবু মহাপুরুষ থাক, অসাধারণ মানুষও সেখানে কাউকে দেখেছি মনে হয় না। শৈশবে নয়, বাল্যে নয়, যৌবনেও নয়। বার্ধক্যের মোহভঙ্গে এ কথা বলছি না। কারণ, মোহ ভাঙে নি। আমাদের যৌবন ও-শহরে পেয়েছিল রাজটীকা। তখনো সে-যুগে কতকটা স্পর্ধায়, কতকটা খেদে স্বীকার করতে বাধ্য হতাম—'নাম-করার মতো একটা মানুষও নেই এ জেলায়।'

বাঙলা দেশে নাম-করা মানুষ গত দেড় শত বৎসরে কম জন্মেন নি। আর-কোনো দেড় শত বৎসরে এত সংখ্যায় ওরূপ মানুষ সারা ভারতবর্ষেও জন্মেছেন কিনা সন্দেহ। অবশ্য সেই বাঙালিরা জন্মেছিলেন অনেকেই কলকাতায়, কেউ-কেউ নিকটবর্তী অঞ্চলে। আধুনিক শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ পূর্ব-বাঙলায় বিলম্বিত হয়, সীমাবদ্ধ থাকে। সুযোগ না থাকলে মানুষের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ অসম্ভব। উনিশ শতকে 'বাঙালরা' বাধ্য হয়েই 'ঘটী'দের অনুগামী—বৎসর পঞ্চাশ পিছনে-পিছনে। বিংশ শতকে পৌছতে-পৌছতে পদ্মা-মেঘনা উজান বইল—বাঙালের প্রাণস্রোত কলকাতা পর্যন্ত ছাপিয়ে এসে পড়ল। অবশ্য মারোয়াড়ী-হিন্দুস্থানীর মতো কলকাতাকে তারা চেপে ধরতে পারে নি। স্বদেশীর সময় থেকে তাই পূর্ব-বাঙলায়ও নাম-করা মানুষের উদয় অব্যাহত। ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, ত্রিপুরা তেমন দু'চারজন মানুষের গর্ব করতে পারে। কিন্তু নোয়াখালিতে কার নাম করব আমরা?

বাবা নাম করতেন—মহামহোপাধ্যায় অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি মশায়ের।

তাঁর সম্বন্ধে আমার স্মৃতি অস্পষ্ট। বাদামতলার সামনেকার সদর রাস্তায় যাচ্ছেন চটিপায়ে ব্রাহ্মণ—গৌরবর্ণ, একহারা, দীর্ঘকান্তি। তিনি তখন কাশীবাসী হবেন। বাবা তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে পথের উপরে মাথা নিচু করে তাঁর পদধূলি নিচ্ছেন—এই মাত্র মনে পড়ে।

তর্কচূড়ামণি মহাশয় মেহেরের সর্ববিদ্যা সন্তান। শাক্তমাত্রই জানেন—তাঁরা সাধকগোষ্ঠী, গুরুবংশ। আমাদের প্রণাম সে বংশের সকলেরই প্রাপ্য। কিন্তু তর্কচূড়ামণি মশায়ের কাছে মাথা নিচু করতেন বিশেষ করে তাঁর মনীষার জন্য, তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য, চারিত্রশক্তির জন্য, প্রবল ব্যক্তিত্বের ও গভীর ধর্মবোধের জন্য। আমার শিশুকর্ণেও সে ব্যক্তিত্বের খ্যাতি পৌঁছত। বিরাট পাণ্ডিত্য নিয়ে তিনি তখন করতেন জুবিলী স্কুলের হেডপণ্ডিতের কাজ। সে স্কুলটা তখনো ও-শহরের একমাত্র বেসরকারী হাই স্কুল। উকিল ও কেরানিরা মিলে একজন মানী রায়বাহাদুরকে ধরে স্কুলটা স্থাপন করেন। পরিচালকও ছিলেন তাঁরা। স্কুলটার না ছিল টাকার জোর, না সরকারী স্কুলের মতো গৌরব। তার গৌরব তবু অতুলনীয়—'তর্কচূড়ামণি' তার হেডপণ্ডিত। তিনি সর্বপূজ্য। এ স্কুলে বাবাও ক'বৎসর শিক্ষকতা করেছেন, তাঁর সহকর্মী ছিলেন। কিন্তু হেডমাস্টার গিরিজাবাবুই বা কি, সেক্রেটারি তেজস্বী উকিল তারক রাজাই বা কি, কিম্বা স্কুলের মালিক রায়বাহাদুরই বা কি, সে স্কুলে যাঁর কথা এঁদের সকলের কাছেই আইন তিনি হেডপণ্ডিত তর্কচূড়ামণি মশায়।

এমন একটা অখ্যাত স্কুলে ছেলেদের শব্দরূপ ধাতুরূপ মুখস্থ করিয়ে পঁচিশ টাকা মাইনের তর্কচূড়ামণি মহাশয় মাস-বৎসর কাটিয়েছেন। কারণ, গ্রামের গৃহ-সংসারের দায়িত্ব তাঁর উপর। তা যতক্ষণ তাঁর, ততক্ষণ যথাসম্ভব নিকটের শহরে থাকা প্রয়োজন। শহরের টোলেও করতেন কিছু অধ্যাপনা। অবশ্য তাও সব নয়। বাবার বই-এর আলমিরাতেই দেখেছি তাঁর রচিত সংস্কৃত মহাকাব্য। খান তিন মহাকাব্য মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। কৌতূহলে তা খুলে না বসেছি এমন নয়, সুন্দর কাগজ, সুন্দর ছাপা। কিন্তু রসগ্রহণ দূরের কথা, মর্মগ্রহণও ছিল আমাদের সাধ্যাতীত। এ যুগে এ শহরে বসে তিনি লিখেছিলেন মহাকাব্য। কিন্তু কাব্যচর্চাও তাঁর আসল কাজ নয়। ষড়্দর্শনে ছিল তাঁর স্বচ্ছন্দ অধিকার, ধর্মাচরণে প্রবল আকর্ষণ। গ্রামের বাড়ি-ঘরের একটা সুস্থির ব্যবস্থা করা মাত্র তিনি সপরিবারে কাশীবাসী

হলেন। সেখানেই বিদ্যাদান, শাস্ত্রচর্চা ও ধর্মানুশীলনে বাকী জীবন যাপন করেন। হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের শাস্ত্র বিভাগে অধ্যাপনা করতেন। পণ্ডিত সমাজে মহামহোপাধ্যায় ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ সমাজে ধর্মপরায়ণ। পাণ্ডিত্যের দীপ্ত খ্যাতির সঙ্গে মিলিত হয়েছিল ধর্মবোধের শান্ত জ্যোতিঃ—বাবা তা দেখেছিলেন ১৯৩০-এও।

এ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য একেবারে না বুঝতাম তা নয়। শুনেছি—তখনো তিনি জুবিলী স্কুলের পণ্ডিত—ক্লাশে বসে পড়াচ্ছেন। হঠাৎ গ্রামের বাড়ি থেকে দুঃসংবাদ নিয়ে ছুটে এল তাঁর পরিচারক—'সর্বনাশ হয়েছে', 'সর্বনাশ হয়েছে।' তর্কচূড়ামণি ক্লাশের বাইরে এসে দাঁড়ালেন, 'কী হয়েছে?'

বোঝা গেল পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়ি আগুনে পুড়ে গিয়েছে। তর্কচূড়ামণি মহাশয় জিজ্ঞাসা করলেন: দেববিগ্রহ রক্ষা পেয়েছে?

পরিচারক বললে: হাঁ।

গোরুবাছুর?

হ্যাঁ।

শিশু বালক মেয়েরা?

ঠিক আছেন।

তর্কচূড়ামণি মশায় বললেন: যা, বসগে। আমি ক্লাশ নিয়ে আসছি, পরে শুনব। তুই লাইব্রেরির বারান্দায় বসে বিশ্রাম কর।

ক্লাশে ফিরে গেলেন। সেই শব্দরূপ-ধাতুরূপের পাঠ নিতে বসলেন।

অসাধারণ নিশ্চয়ই এ মানুষ।

এই সঙ্গেই তবু মনে করতে হয় ১৯২৯-৩০-এ তাঁর কথা, যা শুনেছি। এককালে তাঁর সেই শব্দরূপ ধাতুরূপ ক্লাশের ছাত্র ক্ষিতীশ রায়চৌধুরী তখন গেছলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। ক্ষিতীশদা তখন স্বদেশীতে অগ্রণী, কংগ্রেসের সর্বক্ষণের পরিচালক। আর, অস্পৃশ্যতা-পরিহার, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি প্রশ্নে আমাদের মতোই দুর্দান্ত উৎসাহী। জেলার সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'দেশের বাণী'র তিনি সম্পাদক—জোর কলমেই তার পৃষ্ঠায় আমরা দেশোদ্ধার ও সমাজ-সংস্কারের জেহাদ চালাই। তর্কচূড়ামণি মশায় তখন হোম করছেন। ক্ষিতীশদাকে দেখে বললেন: বোস। খেয়ে যাবি।

বৈদিক বিধি-নিয়মে চালিত তাঁর জীবনযাত্রা। ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ, বানপ্রস্থ আশ্রমে উত্তীর্ণ। ত্রিসন্ধ্যার সঙ্গে চলে বেদবিহিত হোম যজ্ঞ আচার নিয়ম।

সে এক দীর্ঘ কর্মকাণ্ড। মধ্যাহ্ন পার হয়ে অপরাহ্নে ঠেকে। তারপর আহার বিশ্রাম অধ্যয়ন অধ্যাপনা ইত্যাদি। ছাত্রকে আহার করিয়ে বিশ্রাম করতে করতে সস্নেহে বললেন: হাঁ, 'দেশের বাণী' পাঠাস, পাই। পড়িও। এক সময়ে বিধবা-বিবাহের সমর্থনে আমিও শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করেছিলাম। কিছু লিখেছিলামও। কিন্তু ছাপতে দিতে গিয়ে দ্বিধা হল। পুড়িয়ে ফেললাম— মনের মধ্যে সমর্থন পেলাম না।

এই মনকে সংস্কারবদ্ধ মন না বলে আমাদের উপায় নেই। অথচ অসামান্য মনীষা, অসাধারণ তাঁর সত্যনিষ্ঠা, তাও জানি। তাঁদের সর্ববিদ্যাবংশের ধারাটা তান্ত্রিক সাধনার ধারা। বৈদিক কর্মকাণ্ডের পরোয়া না করেই চলে। তারও মধ্যে কেউ-কেউ ছিলেন তর্কচূড়ামণি মশায়ের মতো স্বতন্ত্র। বৈদিক কর্মকাণ্ডও মানতেন; সম্পূর্ণ সদাচারী ব্রাহ্মণ। অথচ মনুসংহিতার নামে মানুষকে অবজ্ঞা করতেও অনিচ্ছুক। বৃদ্ধ নবচন্দ্র তর্কপঞ্চাননকেও তাই মনে হত। সিদ্ধপুরুষ বলে তখন তাঁর নাম। শান্ত, স্বল্পভাষী, শুদ্ধব্রত। তাঁর কাছে বাবা পরে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাঁর কাছেই আমার উপনয়ন হয়। গায়ত্রী মন্ত্রটা তিনি ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। বাবার আশা ছিল এমন গুরুর কৃপায় আমিও সদ্‌ব্রাহ্মণ হব, প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধালাভ করব। ফল যা হয়েছে তা আজ অজ্ঞাত নয়। কিন্তু গুরু কী করবেন! কাল যে মহাগুরু। আমি তর্কপঞ্চানন মশায়কে কিন্তু শ্রদ্ধাই করি। তন্ত্রের বিসদৃশ আচার-বিচার তাঁর কাছে অগ্রাহ্য ছিল। সর্বদিকেই তিনি সদাচারী, মিতাচারী। অথচ. চিরাগত আচারনিয়মও তিনি সব মানতেন না। ত্রিপুর রাজগোষ্ঠীর কাকে দীক্ষা দিয়েচিলেন বলে একবার তাঁকে গোঁড়া ব্রাহ্মণসমাজ একঘরেও করেছিল। তাঁদের বিচারে 'টিপরাইয়া' নাকি অনাচরণীয়। কিন্তু তন্ত্রের বিচার সেরূপ নয়, মানুষ সেখানে মানুষ; তর্কপঞ্চাননেরও তাই বিচার।

আরও দু-চারজন সাধুসন্ত মানুষকে দেখেছি নোয়াখালিতে। যেমন, রামভাই, শা সাহেব। একটা কথা এঁরা জানতেন—জীবনপথটা ধর্মপথ। নিশ্চয়ই কথাটা বড়ো কথা। কিন্তু 'ধর্ম' শব্দটা চিরদিনের সংস্কারের দ্বারা চিহ্নিত। স্থিতিই তার স্বভাব। অথচ কাল যায় এগিয়ে। গতিই তার স্বভাব। আমাদের কাল আমাদের এই পূর্বজদের বিশেষ ধর্মবোধ হারিয়ে ফেলেছে—তা ছাড়িয়ে এসেছে বলেই। ছাড়িয়ে না এলে এ-কালটা

'সেকাল' হয়ে থাকত। নিঃসন্দেহ মহাকাল তাহলে কপালে করাঘাত করতেন।

মোটের উপর, এ-কাল চায় সেই মানুষদের যাঁদের দিয়ে কালের দাবি মিটবে। ধর্মজগতে এ-যুগে এমনই তো শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের বিস্তৃত প্রভাব। কালের প্রয়োজন যাঁদের দিয়ে যতটা মিটে কালও তাঁদের ততটা স্বীকার করে। অবশ্য পরে মহাকাল আবার তা ঝাড়াই-বাছাই করে ঘরে তোলে। তেমন রবীন্দ্রনাথ-গান্ধী আর ক'জন জন্মে একই সঙ্গে একই দেশে? কালের রথ যাঁরা টেনে নিয়ে চলেছেন তাঁরা সাধারণ মানুষই। জেনে না-জেনে আমরা যে-পরিমাণে তাঁদের জন্য বাঁচি সেই পরিমাণে পাই অসাধারণদের আশীর্বাদ। কেউ-কেউ হই নাম-করা মানুষ, অধিকাংশেই থাকি নামহারা। নাম-করাদেরও নাম ক্রমেই আবার হারিয়ে যেতে থাকে। কর্পোরেশনের জোরে রাস্তার নাম-ফলকে জীইয়ে রাখলে হবে কি? আমাদের চোখের সামনেই তো কত এমন নাম-করা মানুষের নাম হারিয়ে যাবার পথে। সুরেন্দ্রনাথের কথাও তো প্রায় ভুলে যেতে বসেছে তাঁর দেশের লোক। পূর্ব বাঙলার তো আরও দুর্ভাগ্য। দেশ বিভাগের সঙ্গে অনেক নামই এখন উদ্বাস্তু। সকলের পুনর্বাসন পশ্চিম বাঙলায়ও সম্ভব নয়। নোয়াখালিরও সকলেই উদ্বাস্তু। বিস্মরণের দণ্ডকারণ্যের শরণার্থী।

রায়বাহাদুরের কথাই ধরা যাক। 'রায়বাহাদুর' বলতে নোয়াখালিতে সকলে জানত রাজকুমার দত্তকে। সম্পন্ন লোক, কিন্তু ধনী তাঁকে বলা চলত না। তিনি জমিদারও নন, ভুলুয়ার বড়ো পত্তনিদার, সম্মানিত তালুকদার। নিজে ইংরেজিও জানতেন না, কিন্তু শহরের একমাত্র বেসরকারী ইংরেজি স্কুলের তিনিই আশ্রয়। সে স্কুলেরই নাম 'আর. কে. জুবিলী স্কুল'। আমরাও তার ছাত্র। অবশ্য আমাদের কালে তা প্রকাণ্ড বড়ো ইস্কুল হয়ে দাঁড়ায়। বেশ দু-পয়সা আয়। স্কুল-ব্যবসায় তখনো দেশে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। অন্তত রায়-বাহাদুর তা জানতেন না। সে স্কুলের উপর তিনি নিজের স্বত্বস্বামিত্বও খাটাতে চান নি। উপস্বত্ব তো দূরের কথা। যখন অভাবে তিনি জড়িয়ে পড়েছেন তখনো এ কথা ছিল তাঁর কল্পনাতীত। অথচ রায়বাহাদুরের যা আয় তার থেকে ব্যয় ক্রমেই বেড়ে চলে। ওটা সামন্তব্যাধি। জমিদার না হোন, জমিদারীর ব্যাধি দুর্নিবার্য। দুরারোগ্যও। রায়বাহাদুরের বিলাস ছিল, একটু ব্যসনও ছিল। তাতে উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল না। কিন্তু চাল কমাতে

পারতেন না, নাম ও ভদ্রতায় বাধত। তার উপরে বিত্ত যতটা তার অপেক্ষা চিত্তের প্রসার ছিল বেশি—তাও খর্ব করতে চাইতেন না। শহরের বাইরে মাইল চারেক দূরে তাঁর পৈতৃক গৃহ। মস্ত বড়ো বাড়ি। শহরে আসতেন সযত্ন মার্জিত একটি সুন্দর গাড়িতে। বলিষ্ঠ অশ্ব, সজ্জিত সহিস গাড়োয়ান,—দেখতাম গাড়ি এসে দাঁড়াল স্কুলের সামনেকার পথে, কখনো বা আমাদেরই বাদামতলায়। রায়বাহাদুর গাড়ি থেকে নামতেন—গৌরবর্ণ, একহারা দীর্ঘদেহ, সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় পুরুষ। পরিধানে দামী আচকান-পাজামা, মাথায় তাজ, নিখুঁত রুচির বেশবাস। পিছনে ছাতা ধরত উর্দীপরা বেয়ারা, রায়বাহাদুর ধীর পদে এসে বসতেন। বিলাস আছে, কিন্তু বাহুল্য নেই কোথাও—পোশাক-পরিচ্ছদে, ধীর গতিতে, অনুচ্চ কণ্ঠের সদালাপে। স্বাভাবিক মর্যাদায় তিনি শান্ত। স্কুলের শিক্ষা সামান্য, কিন্তু গ্রাম্যতার নামগন্ধ নেই—কথাবার্তা শিষ্ট, শান্ত। সাহেবসুবার সঙ্গে স্বল্প হিন্দীতে তাঁর সম্ভ্রম অম্লান থাকত। পারিষদ-গোষ্ঠীতেও তাঁর মর্যাদাবোধ থাকত অক্ষুণ্ণ। বড়োদিনে কলকাতা যেতেন দু-চারজন পারিষদ ও বন্ধু নিয়ে, বড়লাটের সঙ্গে রাজা-রাজড়াদের তখন কলকাতায় উৎসব। রায়বাহাদুরও সে সময়ে ঋণ বাড়িয়ে বাড়ি ফিরতেন। পুজোয় গ্রামের বাড়িতে থাকতেন—বাইরে যেতেন না। শহরের ছোট-বড়ো সকল ভদ্রলোকদের তাঁর গৃহে পুজোর নিমন্ত্রণ হত। সেখানকার ব্যবস্থায়ও বাহুল্য নেই, কিন্তু শ্রী ও স্বাচ্ছন্দ্য আছে। ভদ্রতার সঙ্গে আছে শৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থা। অতিথি-অভ্যাগতদের আপ্যায়নে অস্থির করেন না, শিষ্টাচারের সঙ্গে নিজে দেখেন তাদের সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য। সাধারণত তিনি পরিশ্রমে পরাঙ্মুখ, কিন্তু কোনো কোনো দিকে অভিজাত রীতিতে মনোযোগী, যত্নশীল, নিয়মপরায়ণ। নিজে দাঁড়িয়ে ঘোড়াকে দানি-পানি দেওয়াবেন, সহিসকে দিয়ে ডলাই-মলাই করবেন, গাড়ির ধোয়া-মোছা দেখবেন। স্বাস্থ্য সুন্দর সেই ঘোড়া, সেই গাড়ি পাকা সাহেবদেরও মনে হিংসা জাগাবার মতো। অথচ বৈষয়িক ব্যাপারে পূর্বাপর তিনি অমনোযোগী, অপটু। তাঁর জীবিতকালেই সে স্কুলেও তাঁর মালিকানা চলে যায়। সরকারী স্কুলের বাড়ি নদীতে ভাঙলে 'জুবিলী স্কুলকেই' সরকার আত্মসাৎ করে নিলেন, তবে নামকরণ করলেন 'আর. কে. জিলা স্কুল'। আমরা তখন কলেজে পড়ি। এই নামের চিহ্নটুকুও নিশ্চয়ই ১৯৪৭-এর পরে আর টিঁকে নেই। তার অনেক আগেই কাশীবাসী রায়বাহাদুর যথাকালে শিবত্ব লাভ করেছেন।

নামহারা হলেই বা তাঁর আর কি ক্ষতি? একজন নাতিশিক্ষিত পরিমিতবিত্ত ভদ্রলোক নিজের মার্জিত রুচিতে, চালচলনে, বিদ্যোৎসাহিতায় যে বিশিষ্ট মনের পরিচয় দেন, তা একটু অসাধারণ। তবু তাঁকে অসাধারণ মানুষ বলা অসম্ভব, নাম-করা মানুষও না। কিন্তু বিশিষ্ট।

বিশিষ্ট মানুষ বলে মনে হয়েছে আরও দু-চারজনকে—সেই বাল্যে-কৈশোরে যাঁদের দেখেছি। ব্যক্তিত্বের বিশেষ সম্পদে তাঁরা স্বপ্রকাশ। তা হলেও সকলে এক ধরনের নন। সেদিনের 'সিংহের মতো' পুরুষ 'উকিল সরকার' তারকচন্দ্র গুহ রায়কে দেখেছি—ধূ ধূ মনে পড়ে। পূর্ব প্রান্তের কুমুদিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় আমার বন্ধু চারুলাল মুখোপাধ্যায়ের পিতা—প্রথম বি. এল. প্রিয়দর্শন পুরুষ, বুদ্ধিমান মানুষ, ভাগ্যবান বিত্তে পুত্রে। 'পশ্চিম প্রান্ত কুটীরের' রাজকুমার সেনগুপ্ত মহাশয়কে দেখেছি একটু কম। বাবার মুখে শুনেছি তাঁর বাঙলা রচনার হাত ওকালতির মুসাবিদায়ও চাপা পড়ত না। তাঁরও শ্রেষ্ঠ দান তাঁর পুত্ররা—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রভৃতি। গোবিন্দ চাটুজ্জে মহাশয় ছিলেন আমাদের নিকট কুটুম্ব, স্নেহশীল সজ্জন, সেদিনের ইংরেজি জানা উকিল। টাউন হলের তিনি ছিলেন সেক্রেটারি—পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় খরদৃষ্টি, বাগানের মধ্যে বাড়িটি দেখাত তাঁর আমলে ছবির মতো। লাইব্রেরীর ইংরেজি বাংলা নানা বিষয়ের বই পড়তে তিনি উৎসাহী, বলতেও কুশল। এমনি আরও অনেকে বয়সে বাবারও বড়ো। তাঁরা পাল্কিতে চেপে কাছারিতে যেতেন—গোবিন্দবাবুর বৈঠকখানায় একদিকে সেই পুরনো পাল্কি-জীর্ণ হতে দেখেছি। হাকিমদেরও থেকে বেশি ছিল তাঁদের গর্ব, তাঁরা কারও চাকর নন। অবশ্য কাল পাল্‌টাতে থাকে। পাল্কির মতোই অনেক জিনিস বাতিল হয়। আম্‌লা চাপকান ইজেরও ক্রমেই পরে কোট পাৎলুনের কাছে হার মানে। আমলাতন্ত্রের দেশে চাকরেদেরও রাজার সমান প্রতিপত্তি হবারই কথা—নন-কো-অপারেশন পর্যন্ত তবু উকিলতন্ত্রও মানে-সম্রমে ছিল স্বচ্ছন্দ, সুপ্রতিষ্ঠিত। উকিল সরকার বঙ্কিম বসু—স্থূলকায় বুদ্ধিমান্, এই পিতৃবন্ধু ছিলেন আমাদের স্কুলের সেক্রেটারি। ভুলুয়ার স্থানীয় ম্যানেজার বসন্ত সেনগুপ্ত মশায়—শ্যামবর্ণ দীর্ঘদেহ রাশভারী পুরুষ। কড়া মেজাজের, এমন কি, রূঢ়ভাষী বলেও তাঁর পরিচয় ছিল। মেজাজে, কর্মকুশলতায়, স্পষ্ট ভাষণে তিনি বঙ্কিমবাবুর বিপরীত। আমরাও তা খানিকটা বুঝতাম। কিন্তু বাবার বৈঠকখানায় দুজনাকেই আবার দেখতাম অনেকটা এক রকম—স্নেহশীল, আলাপে আড্ডায়

স্বচ্ছন্দ, হাসি গল্পে উৎসুক। বসন্তবাবুকে আমরা হাসতে দেখেছি, এ কথা তাঁর ও আমাদের প্রতিবেশীরাও অনেকে বিশ্বাস করতেন না, শহরের লোকে ত করতেনই না। এঁদের দুজনারই পঞ্চাশের কাছাকাছি পৌছতেই মৃত্যু হয়—আমাদের বৈঠকখানার খানিকটা জায়গা খালি হয়ে পড়ে। এরূপ মানুষ আরও ছিলেন ;—শিক্ষিত সমাজের জীবনযাত্রায় তখনো সমস্যা ছিল, কিন্তু সংকট দেখা দেয় নি। এঁরা অলস ছিলেন না কেউ, কিন্তু অবকাশ ভোগ করতে জানতেন। পরে যতই দিন গিয়েছে ততই মধ্যবিত্তের সংকট কঠিন হয়েছে—চড়া সুর ও কড়া কথার দিন এসেছে। বিশিষ্ট মানুষের পরিচয় তখনো পেয়েছে—আমাদের পর্বেরই মানুষ তাঁরা, সে পর্বেরই কথায় তাঁদের স্থান। কিন্তু সবশুদ্ধ পিছনে তাকিয়ে আজ ভাবতে বাধ্য হই—নাম-করা মানুষ নোয়াখালিতে আমরা দেখেছি কোথায় ?

আমার বিচারে দু-তিনজন তবু উল্লেখযোগ্য। একজন সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র—প্রায় বিশ বৎসর তিনি গত হয়েছেন। আরও দু-একজনও নেই। মাত্র এক-আধজন এখনো ভাগ্যক্রমে জীবিত। অন্য অনেককে ছাড়িয়ে আমার কাছে এঁরাই যে বিশিষ্ট হয়ে উঠলেন তার কারণ রাজনীতির ঝোঁক। তার গোপন পথেই আমি তাঁদের সংস্পর্শে এসে গিয়েছিলাম। তার বাইরে একমাত্র সাহিত্য ও নানা সাংস্কৃতিক দুর্বায়ুর বশে দু-একজনাকে পেয়েছি সসম্মান সান্নিধ্যে —তার মধ্যে সুসাহিত্যিক ৺বসন্তকুমার সেনগুপ্ত (অচিন্ত্যকুমারের দাদা) মশায় অগ্রগণ্য, সুরেশ চক্রবর্তী মশায় পুরোধা। রাজনীতিতে যাঁরা উদ্যোগী তাঁদের প্রতি এঁরা কিন্তু আমার মতো শ্রদ্ধাবান্ হতে পারতেন না। কারণ আছে। রাজনীতির কণ্ঠস্বর যত উচ্চ তত সুশ্রাব্য নয়। আমিও যে সব সময়েই রাজনৈতিক অগ্রজদের সঙ্গে একমত হতে পারতাম, তা নয়। অনেক বিষয়ে তর্ক করতাম। তাঁদের বিরক্ত করতে ছাড়তাম না। কিন্তু মনে মনে বুঝতাম বিংশ শতকের প্রথমার্ধে রাজনীতির আগুনেই আমাদের দেশের মানুষের মূল্য প্রত্যক্ষ হয়েছে—শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রাজনীতির চোরাকারবারে এখন হচ্ছে আবার তাঁদের মূল্য বিপর্যয়। তাই বলে বিস্মৃত হব কেন—স্বদেশীর সময় থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনটাই আমাদের জাতীয় ইতিহাসের প্রধান সত্য। সে পরীক্ষা যাঁদের হয়েছে তাঁরা তখনকার মতো ছিলেন ইতিহাসের মুখপাত্র। সে হিসাবেই তাঁদের এখনো মূল্য—না হোন তাঁরা এখন আর ইতিহাসের পথিকৃৎ।

(ক্রমশ)

করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা চলচ্চিত্র : দৈন্যের পটভূমি ও সম্ভাবনা

বাংলা সিনেমায় যেসব পরিচালক উল্লেখযোগ্য অবদান আনছেন, সমাজসচেতন বলেই তাঁদের কাজ সৃষ্টিধর্মী। বেশির ভাগ বাংলা ছবিই ছোটগল্প বা বড় নভেলের চিত্ররূপ। বাংলা সাহিত্য চিরকালই সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবি ও মানব সম্পর্কের উপরে সামাজিক আন্দোলনের ঘাত-প্রতিঘাতের ছবি। তাই ভাল বাংলা ছবিতে চিরকালই জীবনের প্রতিফলন, কোনও দিনই শুধু গান, শুধু নাচ, শুধু অঙ্গভঙ্গি দিয়ে সে দর্শকের মনোরঞ্জন করতে যায় নি।

স্বাধীনতার পরে আমাদের দেশের অর্থনীতি বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত। ফলে বহু সামাজিক সমস্যা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। পুরোনো জীবন ও নতুন জীবনধারার মধ্যে একটা ক্রমবর্ধমান লড়াই চলছে। নব নব বৈপরীত্য ব্যক্তিগত সম্পর্ককে আরও জটিল করে তুলছে। সম্প্রতিকালের কয়েকজন পরিচালকের মধ্যে এই ধরনের বিষয়বস্তুতে আগ্রহ দেখা দিয়েছে,—যেমন মৃণাল সেন "প্রতিনিধি"তে আলোচনা করেছেন বিধবা-বিবাহ, সন্তান ও পিতা-মাতার সম্পর্কের সমস্যা ও স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের উপরে এই সমস্যার প্রভাব সম্বন্ধে। হরিদাস ভট্টাচার্যের "সন্ধ্যাদীপের শিখা"র বিষয়বস্তু চীনা-আক্রমণে নিহত ভারতীয় যোদ্ধার বিধবা স্ত্রী; তপন সিংহের "আরোহী"তে আছে অশিক্ষিত কৃষকের শিক্ষার ভিতর দিয়ে উন্নততর জীবনে পৌছানর সংগ্রাম; "মহানগর"-এ বাঙালি মধ্যবিত্ত ঘরের ঐতিহ্য ভেঙে বেরিয়ে আসা চাকুরীজীবি বধূর গৃহ-বিরোধ; "অনুষ্টুপ-ছন্দ"-তে প্রেম ও বিবাহের সঙ্গে প্রাচীনপন্থী ধর্ম ও জাতিভেদ সংস্কারের বিরোধ।

নতুন কর্মক্ষেত্র

কিন্তু বর্তমান ভারতের বিভিন্ন অবস্থার একটি বিরাট ক্ষেত্রকে আমাদের ফিল্ম-নির্মাতারা একেবারেই স্পর্শ করেন নি। দ্রুতবর্ধমান অর্থনীতি একটা বৃহৎ

সমাজবিপ্লবকে সত্যে পরিণত করতে চলেছে। মৃত গ্রাম-জীবনে এক নতুন প্রাণের স্পন্দন দেখা দিয়েছে। শিল্প (industry) ও শিল্প-জাত দ্রব্য দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে। আরো বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে শিক্ষার আলো পৌছচ্ছে। নতুন অর্থনৈতিক জীবন মধ্যবিত্তজীবনের গৃহকোণপ্রীতির চিরপুরাতন ধারাকে ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে। একটা নতুন ধনী সমাজ গড়ে উঠছে, যে জীবনের স্বাদ ক্রমশ হারিয়ে ফেলছে, নিত্য নতুনের আকর্ষণ ছাড়া যে বাঁচতে পারে না। অপর পক্ষে আছে 'ক্রুদ্ধ তরুণের দল', যাদের মন বিদ্রোহ করছে সমস্ত অসংগতির বিরুদ্ধে। ইয়োরোপে যা দুই শতাব্দী ধরে পরিণতিলাভ করেছে, ভারতবর্ষে তাই ঘটেছে কয়েক দশকের ভিতরে। এ অবস্থায় বহু জটিল সম্পর্ক গড়ে উঠতে বাধ্য।

এই পটভূমিতেই ভারতের সহরে ও গ্রামে নতুন মেয়ে পুরুষ গড়ে উঠছে। যে-কৃষক লাঙল দিয়ে চাষ করে, ও যে-কৃষক 'ট্রাক্টর' চালায় তাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য। যে-লোক তাঁত চালায় ও যে-লোক 'হেভি মেশিন' নিয়ে নাড়াচাড়া করে তারা আলাদা। প্রচণ্ড ভীড়ের মধ্যে যে-মেয়েকে বাসে চড়ে অফিস যেতে হয় ও বহু অচেনা লোকের মধ্যে কাজ করতে হয়, সে আর তার মা এক লোক নয়। তেমনি ভূমি থেকে উচ্ছিন্ন যে-তরুণ কারখানায় কাজ করতে বাধ্য হয়, বিরাট বাঁধ বা বিশাল ইস্পাত মিল তাকে বদলে দেয়।

এরাই ভারতের নতুন মানুষ। নতুন আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এদের সংঘাত যুগযুগান্তের পুরোনো সংস্কারের সঙ্গে। এই সংঘাতের থেকেই জন্ম নিচ্ছে মানুষের ব্যক্তিগত সম্পর্কের সমস্যা। এর মধ্যে নিহিত আছে নাটকীয়তা, 'রোমান্স', অপ্রত্যাশিতের চমক, জটিল মানব মনের হাজারো রকম আলোছায়া। এদের কাহিনী শুধু মন ভোলাবে না, আমাদের ভাবাবে। তার কারণ এই নতুন জীবনে যেমন হাসিও আছে, তেমনি কান্নাও আছে।

ইয়োরোপে মানব সম্পর্কের উপর যুদ্ধের প্রভাব প্রচুর ছবির বিষয়বস্তু। আমাদের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু স্বাধীনতার জন্য আমাদের জাতীয় আন্দোলন আমাদের উপরে আরো গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। স্বাধীনতা আন্দোলন আমাদের চিন্তাশক্তিকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে যে, পরবর্তী যুগে নতুন ধরনের সামাজিক আন্দোলন, অর্থাৎ সেই স্বাধীনতাকে রক্ষা ও নতুন জীবনধারা গড়ে তোলার দায়িত্ব সম্যক উপলব্ধি করার ক্ষমতাও আমাদের হ্রাস পেয়েছে। খুবই আশ্চর্য যে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন দিককে

কেন্দ্র করে খুব কম ছবিই তৈরি হয়েছে। সে ফিল্মগুলিও শুধু ঘটনা অবলম্বন করে ('৪২, ভুলি নাই), ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপরে এই সব ঘটনার প্রভাব সম্বন্ধে নয়। যে-দেশে ঔপনিবেশিকতা এখনও নতুন চেহারায় বিরাজ করছে, সেখানে শাসক ও শাসিত উভয়পক্ষের ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উপরে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার প্রভাব সম্পর্কে ফিল্ম তৈরি হলে আমার মনে হয় সেটাই হবে ঔপনিবেশিকতার সবচেয়ে সার্থক সামাজিক সমালোচনা। নতুন জীবন গড়তে গেলে কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ও চির পুরাতন ব্যবহার-বিধির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে হয়। বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামের মধ্যেই অবশ্যম্ভাবীভাবে যে-দুর্বলতা গড়ে উঠেছিল তার সম্যক উপলব্ধি প্রয়োজন বর্তমান যুগের লড়াইয়ের নতুন হাতিয়ার শাণাবার জন্য। একমাত্র চলচ্চিত্রেই সেই ছবি আঁকা যায়, চোখ দিয়ে যা আমাদের মনের দরজায় দুন্দুভি বাজাতে পারে।

ব্যর্থতার কারণ

আমাদের দেশের ফিল্ম্ নির্মাতারা যে কেন জাতীয় জীবনের এই বাস্তবতার ছবি পর্দায় তুলে ধরেন না, তার পিছনে একটা মস্ত বড় কারণ আছে। স্বাধীনতা তাঁদের মনে নতুন সম্ভাবনা, নতুন সুযোগের অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে পারে নি। ইয়োরোপে যেমন 'ফ্যাসীবাদ'-এর পরাজয়ের পরে, আমাদের দেশে তেমনি, স্বাধীনতার পরে সংবেদনশীল বুদ্ধিজীবী মানুষ তার স্বপ্ন ও বাস্তবের মধ্যে বিরাট গহ্বরটাকে মেনে নিতে পারছে না। যে-কথা সে বুঝতে অপারগ তা হল এই যে, ইতিহাসে যে-প্রত্যাশাগুলি তাৎপর্যপূর্ণ সামাজিক আন্দোলনের প্রেরণা যোগায়, সেসব প্রত্যাশার সম্পূর্ণভাবে পূরণ হয় না। সংগ্রাম চলতেই থাকে—অন্য স্তরে। বুদ্ধিজীবির এই বাস্তবতাকে গ্রহণ করার অক্ষমতাই তাকে নৈরাশ্য ও আস্থাহীনতায় (cynicism) ঠেলে দেয়। তখন সামাজিক অবিচার অনুভব করার গভীরতর ক্ষমতাও তার লোপ পায়। এই অবস্থাটা আরও ঘনীভূত হয় এই কারণে যে স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনে জাতীয় জীবন যে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় সংস্কৃতির দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল, সেই ঐক্যবদ্ধ সংস্কৃতি এখন বিক্ষিপ্ত। স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌছানর যে-কেন্দ্রীভূত আগ্রহ সমস্ত ব্যবধানের সেতু রচনা করেছিল, স্বাধীনতা অর্জনের পর সেই ব্যবধানের পুনরাবির্ভাব ঘটল। আমাদের বুদ্ধিজীবী-জীবনে তাই নানা দ্বন্দ্ব ও

ঔদাসীন্যের (alienation) পর্দার আড়াল। শিক্ষা, তাও বিদেশী ভাষার মাধ্যমে, শহরের বুদ্ধিজীবীদের ও সাধারণ মানুষের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে। নতুন কৃষক, নতুন শ্রমিককে আমরা চিনি না। দেশের মাটি থেকে উচ্ছিন্ন, আধুনিক শহরের অরণ্যে নিক্ষিপ্ত রেফিউজি ছেলেমেয়েদের চিন্তা কী আমরা জানি না। আমাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অভাব। আধুনিক বিজ্ঞানের বিকাশ মানুষের সামনে কী বিরাট সম্ভাবনার দুয়ার খুলে ধরতে পারে তা বুঝবার ক্ষমতা আমাদের নেই। আধুনিক যন্ত্রশিল্পের জীবনকে আমরা বুঝতে অক্ষম। ভারতে নানা ভাষার দরুণ দূরত্ব পরস্পরের অভিজ্ঞতা-বিনিময়ের পথে বাধা সৃষ্টি করে। পাঞ্জাবের যে তরুণ কৃষক ট্রাক্টর চালায় তার মনের ভাব বাঙালি লেখক বা ফিল্ম-নির্মাতা কি করে বুঝবেন? আর তা না বুঝলে বাঙালি কৃষককে নতুন জীবনের পথে এগোবার প্রেরণাই বা জোগাবেন কি করে?

আস্থার এই অভাবের দরুণই আমাদের দেশের অধিকাংশ চলচ্চিত্র-নির্মাতা চলচ্চিত্রকে সমাজের সমালোচনার দায়িত্বে নিয়োগ করার কথা ভাবতে পারেন না। যতই অপ্রিয় ও চরম মতবাদ মনে হোক, এ কথা জোর দিয়ে বলা দরকার যে, তাৎপর্যপূর্ণ সামাজিক পরিবর্তনের সময়ে জনমানসের সঙ্গে যোগস্থাপনের শক্তিশালী মাধ্যম এই চলচ্চিত্রকে জীবনের সাথে সমালোচকের দৃষ্টিতে জড়িত হতে হবে, সামাজিক পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করতে হবে। এখনও আমাদের দেশে শিক্ষিত চাকুরে ছেলে বিবাহের উদ্দেশ্যে একটির পর একটি কন্যা পরিদর্শন ও প্রত্যাখ্যান করে, (কখনও নিজে, কখনও আত্মীয়স্বজন) যতক্ষণ না পছন্দসই (রূপে এবং রূপায়) পাত্রী মেলে। এদেশে যৌতুক প্রথা, নগদ টাকায় আজও বর্তমান। অন্য দিকে শিক্ষিতা মেয়েরা নীরবে এই প্রথা মেনে নেয়। এদেশে বৈধব্য একটা অপরাধ, বিধবার খাদ্য স্বতন্ত্র, বস্ত্র স্বতন্ত্র, বিধবা-বিবাহ এখনও সংখ্যায় নগণ্য। এদেশে জাত দিয়ে মানুষের বিচার, রাজনীতির বিচার, মানবিক সম্পর্কের বিচার। একদিকে নতুন সমাজের আলোড়ন, অন্য দিকে পুরোনো সমাজের পিছটান। এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে উল্লেখ করতে চাই "দেবী"র মতো আরও ছবির প্রয়োজন—ধর্মীয় কুসংস্কারের প্রতি সুতীব্র কশাঘাত। রাজশেখর বসুর 'বিরিঞ্চিবাবা' (সত্যজিৎ রায়ের "মহাপুরুষ") 'গুরুবাদের' নির্মম মুখোশ উন্মোচন। এইখানে আসছে লেখকের দায়িত্ব। চলচ্চিত্র যখন আজ বুদ্ধিজীবী-উন্নাসিকতায়

প্রাচীর ভাঙতে পেরেছে তখন কিছু সমাজচেতন দায়িত্বশীল লেখক যদি সামাজিক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের উপর চলচ্চিত্রের উপযোগী করে লেখেন, অনেক উপকার হয়। অবশ্য বাংলাদেশের কিছু লেখক সিনেমার দিকে চোখ রেখেই লিখছেন। দুর্ভাগ্যবশত সে লেখা চিরাচরিত তথাকথিত ব্যবসায়ী বক্স অফিস ফরমুলামাফিক।

দর্শক

যে-দেশ নানা আলোড়নের মধ্য দিয়ে নতুন সমাজজীবনে পৌঁছচ্ছে, সে দেশের দর্শক যে একই জায়গায় স্থির হয়ে বসে আছেন, এ ধারণা স্বভাবতই ভুল। তবে, এ কথা উভয়ত সত্যি যে ভাল ছবি যেমন ভাল দর্শক তৈরি করে, ভাল দর্শক তেমনি ভাল ছবি তৈরি করাতে বাধ্য করে। কিন্তু দর্শক তো আপনি তৈরি হয় না।

তেল, রেশন, মাছ, ডালের 'কিউ'তে দাঁড়িয়ে বাঙালি দর্শকের যদি যদি চলচ্চিত্র-শিল্পের উৎকর্ষের মানদণ্ড নিয়ে মাথা ঘামানোর অবসর না থাকে, তাকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু এত 'কিউ' সত্ত্বেও বাঙালি দর্শক যখন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-উৎসবের টিকিটের 'কিউ'তেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়েছেন, তখন সে সম্পর্কে কিছু বলা যেতে পারে।

চলচ্চিত্র-উৎসব ও ফিল্ম সোসাইটি

কলকাতায় চলচ্চিত্র-উৎসব শেষ হল খানিকটা বিশৃঙ্খলার সঙ্গে। প্রতিযোগিতায় ভাল ছবি আসে নি, প্রতিযোগিতার বাইরে কিছু ভাল ছবি এসেছিল। 'আনসেন্সরড্' ছবি দেখবার জন্য যারা সত্তর-আশি-একশ' দিয়ে টিকিট কিনেছে তাদের আমি সুস্থ, স্বাভাবিক, সাধারণ দর্শক মনে করি না। সাধারণভাবে দর্শকবৃন্দ চলচ্চিত্র-উৎসবের ছবি (যে-কটাই দেখতে পেয়ে থাকুন) কতটা উপভোগ করেছেন জানি না। শুধু ছবির নাম বা দেশের নাম দেখে সাধারণ দর্শকের পক্ষে বোঝা মুস্কিল কোন ছবি ভাল লাগবে বা লাগবে না। আমার মতে এ দায়িত্ব ছিল ফিল্ম সোসাইটিগুলির। কলিকাতা ফিল্ম্ সোসাইটি সভ্যদের কাছে চব্বিশটি ভাল ছবির নাম পাঠিয়েছিলেন। এই নামগুলি দর্শকসাধারণের জন্যে যদি তাঁরা খবরের কাগজে ছাপাতেন, অনেক উপকার হত। আশা করি পরবর্তী চলচ্চিত্র-উৎসবের আগে তাঁরা

কয়েকটি সভা আহ্বান করে যাঁদের ছবি আসছে এবং দেখার যোগ্য, সেই সব ডিরেক্টরদের সম্পর্কে ব্যাখ্যামূলক বক্তৃতামালার ব্যবস্থা করবেন।

শুধু আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-উৎসবের সময়ই নয়, সাধারণভাবেই ফিল্ম-সোসাইটিগুলির দায়িত্ব নিছক সভ্যবৃন্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ব্যাপকভাবে সাধারণ দর্শক পর্যন্ত বিস্তৃত করা উচিত। কাগজে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে একটি বিশেষ ছবি (দেশী অথবা বিদেশী) ধরে আলোচনা-সভা করা দরকার, যেখানে খ্যাতিমান পরিচালক সেই সম্পর্কে বিশ্লেষণী বক্তৃতা দেবেন, প্রশ্ন আহ্বান করবেন, জবাব দেবার চেষ্টা করবেন। এই রকম পরিচিতির সঙ্গে যদি বিদেশী ছবিকে একটা দুটো 'পাবলিক শো'তেও উপস্থাপিত করা যায়, অতিপরিমিত ভাবে হলেও সাধারণ দর্শক উপকৃত হবেন। এ ছাড়া চাই ফিল্ম্ সোসাইটির নিয়মিতভাবে প্রকাশিত একটি মাসিক পত্র। চাই একটি লাইব্রেরি যেখানে দেশ-বিদেশের ফিল্মের ইতিহাস ও সমালোচনা থাকবে, লোকে যার সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে। ভালো সমালোচনা, শুধু ভালো ফিল্মের নয়, খারাপ ফিল্মেরও, দর্শকের রসোপলব্ধির ক্ষমতাকে পরিণত করে। তিনি যদি একমত হন, নতুন কথা শিখবেন; যদি ভিন্নমত পোষণ করেন, ভাববেন। সংসারভার-জর্জরিত আমাদের দেশের দর্শক চান হালকা ছবির মারফৎ মনটাকে একটু ছুটি দিতে। সেরকম ছবি তাঁরা নিশ্চয় দেখবেন, যে-ছবি দেখে ভুলে যাওয়া যায়। কিন্তু এমন ছবিও আমাদের দেশে তৈরি হওয়া দরকার যা তাঁর দৃষ্টি ফেরাবে নতুন সংঘাতের দিকে, নতুন সামাজিক সত্যের দিকে। নতুন মানবিক সম্পর্কের দিকে। সমাজ একদিনে বদলায় না, মানুষও একদিনে বদলায় না। কিন্তু তার পরিবর্তনের চিহ্নগুলো ধীরে ধীরে প্রকট হতে হতে একদিন পূর্ণরূপে বিকশিত হয়। নতুনের সঙ্গে পুরাতনের বারংবার সংঘাতকে আমরা সহানুভূতির সঙ্গে বুঝবার চেষ্টা করব। যা ভালো তাকে স্বীকৃতি দেব, যা খারাপ তাকে বর্জন করব। সংবেদনশীল পরিচালক সেই ছবি তুলে ধরবেন আমাদের চোখের সামনে। আমরা সমস্যার মুখোমুখী দাঁড়াব, তার অস্তিত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হব। পরিচালক সমাজ-সংস্কারক নন, নীতিবিদ্ নন। সমস্যার সমাধান তিনি না-ও খুঁজে পেতে পারেন, যদি খুঁজতে যান, তাঁর ভুলও হতে পারে। আমাদের সামাজিক জীবনে আজ মৃণাল সেনের 'প্রতিনিধি'র মতো ছবির মূল্য এইজন্তেই এত বেশি যে তিনি সমস্তাটাকে তুলে ধরেছেন। তাঁর সমাধানের প্রচেষ্টা না থাকলে

আরও ভালো হত, কারণ সব এক ধরনের সমস্যারও এক সমাধান হতে পারে না।

বাংলাদেশে ফিল্‌ম্ সোসাইটি মাত্র দুটি। 'কলিকাতা ফিল্‌ম্ সোসাইটি' ও 'সিনে ক্লাব'। সুখের বিষয় 'সিনে ক্লাব' কলকাতা শহরকেই তিনটে অঞ্চলে ভাগ করে ছবি দেখানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এ ছাড়া তাঁদের নতুন কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে হাওড়া, নৈহাটি ও বহরমপুরে। ফলে আশা করা যাচ্ছে আরও বেশ কিছু নতুন দর্শক তাঁদের পরিধির মধ্যে আসছেন। তবু পরিধি-বহির্ভূত আরও বিরাট সংখ্যক দর্শকের কথা তাঁরা আশা করি মনে রাখবেন ও তাঁদের বর্তমান পত্রিকাটিকে বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠীর সামনে এগিয়ে আনবেন।

চলচ্চিত্র-সমালোচনা

এ কথা আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে ভালো, বিশ্লেষণী চলচ্চিত্র-সমালোচনা দর্শকের চিন্তাকে সজীব রাখে, চোখকে তৎপর রাখে, উৎকর্ষের চাহিদা বাড়ায়। দর্শকের রসোপলব্ধি গভীর হয়, ব্যাপক হয়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের দর্শক বা পাঠক যে ধরনের সমালোচনার সাথে পরিচিত, তার চরিত্র অন্ত। (ব্যতিক্রম আছে। কিন্তু তা এত স্বল্প যে তাদের বাদ দিয়েই বলছি।) এ সম্পর্কে একটি সুন্দর তথ্য-চিত্র পাওয়া যাচ্ছে "চলচ্চিত্র"—বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭১ সংখ্যায় অসীম সোম লিখিত "চলচ্চিত্র-বিচার ও দেশ পত্রিকায় চিত্র-সমালোচনা" নামক প্রবন্ধে। পাঠকবর্গ পড়ে দেখলে উপকৃত হবেন।

২২শে জানুয়ারি, ১৯৬৫ সালের 'অমৃত' সাপ্তাহিক পত্রিকায় "চলচ্চিত্র-উৎসবের চিত্রসমাবেশ" নামে যে-কয়েকটি বিদেশী ছবির চিত্রপরিচিতি আছে, 'কনিষ্ক' তাতে অসংখ্য হাস্যকর ভুলের 'সমাবেশ' করেছেন। এত ভুল তিনি যোগাড় করলেন কোত্থেকে? 'লাইফ্ অব ওহারু' হয়েছে 'লাইফ্ অব্ চারু'। 'ইনোসেন্ট সরসারার্স' চলচ্চিত্রটির পরিচিতি দেখুন······ "এই ডাক্তার হল এক অর্কেস্ট্রা ক্লাবের সভ্য। এই ক্লাবে শহরের বহু যুবক-যুবতী এসে থাকে। এখানে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হল তার এক বান্ধবীর। তাদের কাছে তখন আর কেউ নেই। মেয়েটি ডাক্তারের সঙ্গে স্টেশনে গেল। শেষ গাড়ি চলে গেল। নির্জন প্লাটফর্মে বেড়াল। নির্জন রাস্তা দিয়ে ফিরল। লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরল এ-পথে সে-পথে। শেষ অবধি দেখা

গেল নায়ক আর তার বান্ধবী এসেছে নায়কের ফ্ল্যাটে। এখানে কিছুক্ষণ কথা বলল তারা। ভালো লাগল না। একটু নাচার চেষ্টা করল, চুমু খেল। কিন্তু কিছুই যেন গভীর নয়, সিরিয়াস নয়। সবই যেন ঠাট্টা। খুব হাল্কা। ওরা দুজনেই যেন জানে যে কোনো কিছুর মধ্যে জড়িয়ে পড়া চলবে না। শুধু রাত কর্সা হওয়া অবধি অপেক্ষা করতে হবে তাদের। মেয়েটি ঘুমিয়ে পড়ল। ছেলেটি তার অন্য বন্ধুদের আড্ডায় গেল। ওরাও সারারাত লক্ষ্যহীন ভাবে শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

নায়ক বাড়ি ফিরে এসে দেখল যে নায়িকা ঘরে নেই। সে তার জন্যে রাস্তায় ঘুরল। খুঁজল স্টেশনে গিয়ে। তাকে যেন খুঁজে পেতেই হবে। তখুনি নায়কের মনে হল যে সে নায়িকাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কথা বলে নি; অথচ বলা তার খুবই দরকার।

খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়ে ব্যর্থ নায়ক বাড়ি ফিরে দেখল যে নায়িকা যায় নি। সে বাইরে গিয়েছিল ফুল কিনতে। কিন্তু নায়িকাকে দেখে নিভে গেল নায়ক। বরং নিজের দুর্বলতার জন্য নিজের উপর রাগ হল তার। তাই সে নায়িকাকে জানতে দিল না যে তার জন্যে সে হয়রাণ হয়েছে কতখানি; হয়তো প্রেমও অনুভব করেছে। কিন্তু কিছুই জানতে দিল না নায়িকাকে। নায়িকাও কিছু বলল না তাকে। সেও জানাল না তার অনুভবের কথা। দুজনে দুদিকে চলে গেল আবার। আবার সেই জীবন। তাদের যেন কিছুই হয় নি।"

উদাহরণ একটাই যথেষ্ট।

৫ই ফেব্রুয়ারি 'অমৃত'-তে পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের 'কি দেখলুম'—চলচ্চিত্র-সমালোচনা। তেতাল্লিশটি ছবির মধ্যে ভদ্রলোক একুশটি ছবি দেখেছেন। "টম্ জোন্‌স্" সম্পর্কে তিনি বলছেন:

> "শুচিবায়ুগ্রস্ত ভারতীয় মনের কাছে কাহিনীর বহু জিনিসই বিতৃষ্ণার সৃষ্টি করবে; কিন্তু বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন উদার আধুনিক মন ছবিখানির মধ্যে এক-আধটি সংলাপ ব্যতীত বিশেষ কিছুই আপত্তিকর দেখতে পাবেন না।"

তিনি আরও বলছেন:

> "ইতালির বিখ্যাত পরিচালক মিকেলেঞ্জেলো আন্তোনিয়োনির "এ" মার্কা ছবি "দি অ্যাডভেঞ্চার" অপ্রয়োজনীয় যৌন-আকুতির দৃশ্যে

ভরা।…ছবির শেষাংশে নায়কের একটি সস্তা মেয়ের সাথে যৌন-সম্ভোগের ইঙ্গিত ইতালীয় জীবন ও সাহিত্যে কতদূর স্বাভাবিক তা জানি না, কিন্তু আমাদের চোখে এবং সভ্যজগতের মহৎ সাহিত্যের মানদণ্ডে অবাঞ্ছিত ত্রুটি বলেই গণ্য।"

পাঠককে আমি এ-প্রসঙ্গে পিয়ের লেপ্রোহন-এর 'মিকেলেঞ্জেলো আন্তোনিয়োনি' বইটি পড়ে দেখতে অনুরোধ করি।

"ওয়েডিং—সুইডিশ স্টাইল" সম্বন্ধে পশুপতিবাবু বলছেন :—

"চিত্রাঙ্কন-জগতে মডেল হিসাবে নগ্ন যুবতীর প্রয়োজন হয়। কিন্তু চলচ্চিত্র-নির্মাণের ব্যাপারেও কোনও দেশ যে যুবতী শিল্পীদের সম্পূর্ণ নগ্ন দেহে ক্যামেরার সম্মুখীন হওয়াকে অত্যন্ত স্বাভাবিক ও শিল্পসৃষ্টির জন্যে অবশ্যপ্রয়োজনীয় বলে মনে করতে পারে, এ তথ্য আমাদের জানা ছিল না।"

এই ধরনের আরও অনেক তথ্যের রসাল ছবি দিয়ে পশুপতিবাবু ছবিটির সমালোচনা-কার্য সমাধা করেছেন।

এ-প্রসঙ্গে নয়াদিল্লীর আলোচনা-চক্রে পঠিত সুইডিশ চলচ্চিত্র-সমালোচক ইঙ্গেস্টাম আল্‌মকুইস্ট-এর লিখিত বক্তব্য থেকে একটু অংশ তুলে না দিয়ে পারছি না।

"ফিল্মটি ('ওয়েডিং—সুইডিশ স্টাইল') বোঝাতে চায় যে পৃথিবী সম্পর্কে অজ্ঞ, উনিশ শতকের নৈতিক নিয়মাবলী গ্রামাঞ্চলে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হত। আধুনিক যন্ত্রশিল্পের যুগের সমাজে এই নৈতিক নিয়মাবলী অবশ্য একেবারেই অচল। এখনই উপযুক্ত সময় এ নৈতিক বিধির বিলোপসাধন করে, পৃথিবী সম্পর্কে কম অজ্ঞ এক নতুন নৈতিক নিয়মকে সেই জায়গায় স্থান দেওয়া, যাতে মানুষের পক্ষে সেই নীতি মেনে চলা সম্ভব হয়। এই পটভূমিতেই ছবির কুখ্যাত সুইডিশ নীতিহীনতা ও নির্লজ্জ দৃশ্যগুলিকে দেখা দরকার। সুইডেনের তরুণ জানতে চায় সত্যিকারের বাস্তবতা কী, যাতে সে একটা বৈধ নীতির নিয়মকানুন গড়ে তুলতে পারে। সম্প্রতি যে তথাকথিত নীতিহীনতার চিত্র বহু সুইডিশ ছবিতে প্রতিফলিত হয়েছে, সেটা আসলে নৈতিক মানদণ্ডের অন্বেষণ"…

পশুপতিবাবু বহু আশা নিয়ে ইঙ্গমার বার্গম্যানের "উইন্টার লাইট" দেখতে

গেছলেন। "কিন্তু যাঁর কাছ থেকে "ভার্জিন স্প্রিং"-এর মতো ছবি পেয়েছি, এ-ছবিতে তিনি আমাদের নিরাশ করেছেন।"

ইভেন্টাম্ আল্‌মকুইস্ট বলছেন :

"উইণ্টার লাইট—যা দিল্লীতে চলচ্চিত্র-উৎসবে দেখান হচ্ছে—তাতে কোনো 'সেক্স' নেই···"

পশুপতিবাবু বলছেন পোল্যাণ্ডের ছবি 'কাফে ফ্রম দি পাস্ট' সম্পর্কে। তাঁর শেষ মন্তব্য :

"সুন্দর ছবি, সুন্দর অভিনয়, সুন্দর পরিবেশ, সুন্দর মিউজিক।"

কী সুন্দর সমালোচনা!

এবার 'ইনোসেণ্ট সরসারার্স'-এর পালা। পশুপতিবাবু বলছেন : .

"জীবনে আমরা বহু প্রেমের ছবি দেখেছি : বৈষ্ণব কবিতাও পড়েছি : রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, গুণে প্রাণ ভোর। কিন্তু এমন নিষ্কলুষ প্রেমের স্বর্গীয় ছবি কখনও দেখেছি বলে মনে করতে পারছি না।···ভেবে অবাক হই, যে-ওয়াইদাকে কঠিন বাস্তব ছবি "কানাল" "অ্যাসেস অ্যাণ্ড ডায়ামণ্ডস্" প্রভৃতির পরিচালক বলে জানতুম, তিনি আমাদের এমন স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত প্রেমের ছবি উপহার দিলেন কি করে।"

কণিষ্ক আর পশুপতিবাবু এক লোক নন এটুকু বুঝতে অন্তত কষ্ট হচ্ছে না। শুধু দুঃখ এই যে এই জাতীয় সমালোচকদের চোখে বাজারে চালু নানাবিধ ফিল্‌ম্ পত্রিকাগুলির ইতরতা কিছুতেই ধরা পড়ে না। তারা যে-ধরনের ছবি ছাপে, যে-ধরনের 'ক্যাপশন' লেখে, যে-ধরনের রসিকতা করে তার চেয়ে নিম্নস্তরের যৌন-আবেদনসম্পন্ন ছবি এই উৎসবে একটাও আসে নি। ছাপানো হরপের অস্ত্র হাতে নিয়ে তারা আমাদের শিল্পীদের প্রকাশ্যে 'ব্ল্যাকমেল' করে।

বিদেশী ছবিকে বিচার করতে গেলে সে দেশের ইতিহাস, পটভূমি ও সমাজকে না জেনে সে ছবির রসগ্রহণ কখনও সঠিকভাবে করা সম্ভব নয়। আমাদের দেশের চিত্র-সমালোচনার ধারা থেকে দর্শক-সমাজের যদি এই ধারণা হয় যে, ওদেশে "এ" মার্কা ছবির অর্থ দুঃসাহসিক যৌন-আকুতির প্রদর্শনী, সেখানে আর কোনো প্রশ্ন নেই, বিশ্লেষণ নেই, অন্বেষণ নেই, তার চেয়ে ক্ষতিকর আর কিছু হতে পারে না। আন্তোনিওনির 'লা ভেন্তুরা'-তে যে জীবন-জিজ্ঞাসা আছে, দৈহিক মিলন-তৃষ্ণা সেখানে বার বার পরাজয়ের গ্লানিতে বিলুপ্ত। আন্তোনিওনি সে জীবন-জিজ্ঞাসার জবাব দিতে পারেন নি।

তাই চিরাচরিত দাক্ষিণ্যে, অসীম ক্ষমায় নায়িকা নায়কের দুর্বলতাকে স্বীকার করে, মেনে নেয়। কারণ আর কিছু বাকী নেই জীবনে।

ফিরে আসছি আমরা সেই পুরনো প্রশ্নে। আমরা চাই সমাজচেতন পরিচালক, আমরা চাই নতুনের সঙ্গে পুরাতন সমাজের সংঘাতজাত মানব-সম্পর্কের প্রতিফলন। আমরা চাই দর্শকের প্রস্তুতি, তার নির্বাচন-শক্তি, তার গ্রহণ করবার ও বর্জন করবার দুঃসাহস। তার সক্রিয় সহযোগিতা। এই সঙ্গে আমরা সরকারের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তাঁদের দায়িত্ব 'প্রোডিউসার ও পরিবেশক'দের একচেটিয়া শৃঙ্খল ভেঙে ভালো ছবিকে মুক্তি দেওয়া। "লাল পাথরে"র মতো নিরর্থক ছবি বছর ধরে 'হাউস' আটকে রাখে, অথচ বারীন সাহার "তেরো নদীর পারে" আর ঋত্বিক ঘটকের "সুবর্ণ রেখা" ক্যানের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকে।

ভারতের মতো বিরাট দেশে চলচ্চিত্র একমাত্র শিল্প যা বৃহত্তম দর্শকগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছতে পারে। আমরা এক বৃহৎ সমাজ-বিপ্লবের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছি। এই যে সামাজিক বাস্তবতা ক্রমশ রূপ পরিগ্রহ করছে, তার আলো-ছায়া, জয়-পরাজয়, আনন্দ-বেদনার চিত্র নিয়ত আত্মপ্রকাশের দাবী ঘোষণা করছে। আমাদের একজন সত্যজিৎ রায় আছেন, আর আছেন কয়েকজন তরুণ, সজীব, সমাজসচেতন পরিচালক। বর্তমান সরকারও যথেষ্ট আগ্রহশীল আমাদের চলচ্চিত্র-উৎকর্ষ সম্পর্কে।

বহু বৎসরের বিদেশী শাসন-জাত যে-দূরত্ববোধ আমাদের দেশের মানুষের কাছ থেকে সরিয়ে রেখেছে, তাকে সচেতনভাবে ভাঙতে হবে, জীবনের সঙ্গে, সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে নতুন করে নিজেদের জড়াতে হবে। তবেই সেই প্রাণোচ্ছল চলচ্চিত্র জন্ম নেবে, যা সাম্প্রদায়িকতা, জাতিভেদ, ধর্মান্ধতাকে এড়িয়ে চলবে না, সামাজিক আক্রমণে তাদের পরাস্ত করার পবিত্র দায়িত্ব পালনে এগিয়ে যাবে।

নতুন দিল্লীতে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত আন্তর্জাতিক আলোচনা-চক্রের ১০ই জানুয়ারির অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ এই প্রবন্ধের ভিত্তিরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের কয়েকটি ছবি

ভারতের তৃতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের অঙ্গ হিসেবে কলকাতায় গত ২২শে থেকে ২৮শে জানুয়ারি 'চলচ্চিত্র সপ্তাহ' পালিত হল। এই উপলক্ষে স্থানীয় ছটি প্রেক্ষাগৃহে সাতদিনে বিয়াল্লিশটি ছবি, বিশেষ প্রদর্শনীতে এগুলি থেকে বাছাই করা কয়েকখানি ছবি এবং অতিরিক্ত আরো তিনটি ছবি দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ সাকুল্যে, সর্বসাধারণের জন্ত উৎসবের বিজ্ঞাপিত প্রদর্শনী এবং কয়েকটি প্রেক্ষাগৃহের বিশেষ প্রদর্শনী নিয়ে কলকাতায় উনিশটি দেশের মোট পঁয়তাল্লিশটি ছবি দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে ষোলটি ছবি ভারতে এসেছে উৎসবে প্রতিযোগী হিসেবে। বাকি উনত্রিশটি ছবি ছিল প্রতিযোগিতা-বহির্ভূত। প্রতিযোগিতার নিয়মকানুন মেনে যেসব ছবি বিদেশ থেকে পাঠান হয়েছে, সেগুলির মান আশানুরূপ নয়, এটা দিল্লীতে অনুষ্ঠিত উৎসবের পর মোটামুটি জানা ছিল। আবার, প্রতিযোগিতার বাইরে উৎসবে আনীত কয়েকটি ছবি ছিল বর্তমান বিশ্বের কয়েকজন খ্যাতিমান পরিচালকের সৃষ্টি। ছিল, দেশ-বিদেশের চলচ্চিত্র-গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকায় বিশেষভাবে আলোচিত কয়েকটি ছবি। সবকিছু মিলিয়ে কলকাতায় এই চলচ্চিত্র সপ্তাহের ছবিগুলি দেখবার জন্ত দর্শকদের উৎসাহের অন্ত ছিল না। বিশেষ প্রদর্শনী নিয়ে আট দিনের এই ছবির মেলায় টিকিট সংগ্রহ ছিল একটা বিরাট সমস্যা। অবশ্য এ-ক'দিনের মধ্যে এতগুলি ছবি দেখাই অসম্ভব— আমন্ত্রণপত্র বা টিকিট পাওয়ার কথা তো পরে।

বিখ্যাত পরিচালকদের ছবিগুলির টিকিট সংগ্রহের অসুবিধা, প্রাপ্তবয়স্কদের জন্ত নির্দিষ্ট ছবিগুলির টিকিট নিয়ে কালোবাজারি, ব্যবস্থাপনার ত্রুটিবিচ্যুতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা না করে উৎসবের ছবি কেমন দেখলাম, সাম্প্রতিক চলচ্চিত্র-বিশ্বের কয়েকটি নমুনা থেকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি বা শিল্পকৌশলের কী পরিচয় পেলাম, মনস্বী চিত্রস্রষ্টাদের ছবি থেকে চলচ্চিত্রকলার কোন সম্পদ আমাদের অভিজ্ঞতায় সঞ্চিত হল সেসব বিষয়েই আলোচনা করা শ্রেয়। প্রতিযোগিতার মধ্যে ও বাইরে বহু স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি ও প্রামাণিক ছবিও ছিল। সেগুলিও এখানে আমাদের আলোচ্য নয়।

পাঠকদের সুবিধার জন্য কলকাতায় প্রদর্শিত পূর্ণদৈর্ঘ্যের কাহিনীচিত্রের একটা তালিকা দিয়ে আমার দেখা বাছাই-করা কয়েকখানি ছবি নিয়ে আলোচনা করব। কলকাতায় প্রদর্শিত পঁয়তাল্লিশটি ছবির মধ্যে আটটি জাপানের। ছবিগুলি হল: হারাকিরি, সেভেন সামুরাই, দি থ্রোন অব ব্লাড, ওকাসান, লাইফ অব ওহারু, দি রিক্‌শম্যান, কুড আই বাট লিভ এবং শি অ্যাণ্ড হি। যুক্তরাজ্য ও চেকোস্লোভাকিয়ার ছিল চারখানি করে ছবি; ছবির নাম: যুক্তরাজ্যের গানস্ অ্যাট বাটাসি, টম জোন্স, দি সারভেণ্ট ও স্যাটারডে নাইট অ্যাণ্ড সানডে মর্নিং এবং চেকোস্লোভাকিয়ার আনোসিক, ড্যাট ক্যাট, দি হপ পিকার্স ও দি ডেথ কল্‌ড এঙ্গেলচেন। সোভিয়েত রাশিয়া পোলাণ্ড ও রুমানিয়ার ছিল তিনটি করে ছবি: সোভিয়েত রাশিয়া—হ্যামলেট, এ চেন অব দি ডন ও আই বট এ ড্যাডি; পোলাণ্ড—নাইফ ইন দি ওয়াটার, ইনোসেণ্ট সর্সারার্স ও কাফে ফ্রম দি পাস্ট; রুমানিয়া—দি হক্স্, টিউডর ও ওয়ান ইভনিংস লাভ। ইতালি, সুইডেন, যুগোস্লাভিয়া, পূর্ব জার্মানী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছিল দুটি করে ছবি; এগুলি হল: ইতালির দি অ্যাম্বুশকার ও ইয়ং নান; সুইডেনের উইণ্টার লাইট ও ওয়েডিং—সুইডিশ স্টাইল; যুগোস্লাভিয়ার ডোণ্ট ক্রাই পিটার ও স্যাটারডে ইভনিং; পূর্ব জার্মানির নেকেড অ্যামিড্‌স্ট উলভ্‌স্ ও বিলাভেড হোয়াইট মাউস; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আমেরিকা আমেরিকা ও দি স্যাডো অ্যাণ্ড দি সী। এ ছাড়া ছিল, আমব্রেলাজ অব শেরবুর্গ (ফ্রান্স), দি ভিজিট (পশ্চিম জার্মানি), শেফার্ড কিং (বুলগেরিয়া), কংকারার্স অব দি গোল্ডেন সিটি (তুরস্ক), ব্রাইড ফ্যাজ এ মারার (সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র), নোবডি ওয়েভ্‌ড গুডবাই (কানাডা), লাভার্স্ রক (হংকং), গামপেরালিয়া (সিংহল) এবং হকিকৎ (ভারত)।

'রশোমন' ছবির স্রষ্টা কুরোসয়ার আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভের সঙ্গে জাপানি ছবি দেশ-বিদেশে বিশেষ মর্যাদা পেয়ে আসছে গত এক দশকে। জাপানি পরিচালক মিজোগুচি ও ওজুর নামও চলচ্চিত্রশিল্পের আলোচনায় শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত। এই উৎসবে কুরোসয়ার 'সেভেন সামুরাই' ও ম্যাকবেথ অবলম্বনে তৈরি 'দি থ্রোন অব ব্লাড' এসেছে, এসেছে মিজোগুচির 'লাইফ অব ওহারু'। দস্যুর দল গ্রামের শস্যসম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়। সাতজন সামুরাই-এর সাহসিকতায় ও গ্রামবাসীদের সহায়তায় কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধের

মধ্যে দিয়ে বস্তুদল পর্যুদস্ত হল। সামুরাই নির্বাচন থেকে শুরু করে শত্রুনিপাতের পর নিহত চারজন সামুরাই-এর কবর ও ক্ষেতে কৃষকদের উৎসব পর্যন্ত এই কাহিনীর বর্ণনার মধ্যে কুরোসয়া এক অনবদ্য বলিষ্ঠ জীবনগাথা সৃষ্টি করেছেন। উপজীব্য বিষয়বস্তুর পুঙ্খানুপুঙ্খ অথচ সার্বিক বিশ্লেষণ, চরিত্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের শ্রেণী-সচেতনতা, রূঢ় পরিবেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষের আন্তর প্রকৃতি গভীর আন্তরিকতা ও বাস্তবতার সঙ্গে এই ছবিতে উদ্ঘাটিত। যুদ্ধদৃশ্যের বিরাটত্বের থেকে এখানে খণ্ড-সংগ্রামের নির্মমতা, তার মৌল তাৎপর্য, মানুষের মর্মমূলের ব্যঞ্জনার প্রতিই আলোকপাত করা হয়েছে। কুরোসয়া এখানে কোনো ক্ষেত্রেই ভাবালুতার আশ্রয় নেন নি; বৃষ্টি, কাদা, আগুন, অন্ধকার, রাত্রি, অনিশ্চয়তা ও আতঙ্কের মধ্যে গ্রামবাসী ও সামুরাইদের কুরোসয়া রেখেছেন, এবং এই পরিবেশের মধ্যে বীরত্ব ও বেদনা, প্রত্যয় ও মানবিকতার এক সার্থক নিদর্শন চলচ্চিত্র মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছেন। সামুরাই হওয়া যে জন্মগত অধিকার নয়, কিকুচিয়োর নির্বাচনে ও সাফল্যে কুরোসয়া তার সমর্থন রেখেছেন; কাৎসুশিরো ও গ্রাম্য ললনার প্রেম ও সংশয়ের দৃশ্যে তার শ্রেণী-সচেতন মানবিক সত্তার স্বাক্ষর রেখেছেন। কলাকৌশলের নৈপুণ্যে, ঘটনাবস্তুর কর্কশ বাস্তব রূপায়ণের সঙ্গে সম্ভাব্য প্রাণের সজীবতা ও আনন্দ-উচ্ছ্বাসের সার্থক মিশ্রণে 'সেভেন সামুরাই' একটি সংহত ও গতিসম্পন্ন চিত্রসৃষ্টি হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আর স্মরণীয় হয়ে থাকবেন কিকুচিয়োর ভূমিকায় তাশিরো মিফুনকে। মিজোগুচির 'লাইফ অব ওহারু' আমাদের আশা মেটাতে পারে নি। দীর্ঘায়ত চিত্রনাট্যের শ্লথগতি প্রকাশরীতি এবং ঘটনা-বৈচিত্র্যের অভাব এই ছবিটির দুর্বলতার মূল কারণ। অবশ্য, মানবচরিত্রের প্রবৃত্তি, সংস্কার, আকাঙ্ক্ষা, তার মুক্তির পথের নির্বন্ধ নিয়ে পরিচালকের শিল্পচর্চায় আন্তরিকতার স্পর্শ স্পষ্ট।

ঘনবদ্ধ চরিত্রনাট্যের গতিময় আকর্ষক চিত্ররূপ দেখেছি যুক্তরাজ্যের 'টম জোন্স' এবং 'স্যাটারডে নাইট অ্যাণ্ড সানডে মর্নিং'-এ। বৃটেনের 'ফ্রী সিনেমা' আন্দোলনের দুই শরিক টনি রিচার্ডসন ও কারেল রীজ যথাক্রমে এই ছবি দুটির পরিচালক এবং রিচার্ডসন দ্বিতীয় ছবিটির প্রযোজকও। 'টম জোন্স' সম্পর্কে আমাদের ঔৎসুক্য ছিল নানা কারণে। হেনরি ফিল্ডিং-রচিত মধ্য-অষ্টাদশ শতকের ইংলণ্ডের এই ঘটনাবহুল উপন্যাসটিকে সমরসেট মম

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে চিহ্নিত করেছেন। চলচ্চিত্রের জন্য এই কাহিনীর চিত্রনাট্য লিখেছেন জন ওসবোর্ন। ছবির মুখবন্ধে টম জোন্সের পরিচিতি দেবার পর্ব চমকপ্রদ; কয়েকটি ক্ষেত্রে সময়োচিত নেপথ্যভাষণের টীকাটিপ্পনী কিংবা চরিত্রগুলির ক্যামেরার দিকে চেয়ে অর্থাৎ দর্শকদের দিকে চেয়ে কথা বলা ইত্যাদিতে পরিচালক তার টেকনিকের সার্থক প্রয়োগ দেখিয়েছেন। সোফিয়া, মলি, মিসেস ওয়াটার্স, লেডি বেলাস্টন প্রভৃতির সঙ্গে নায়কের নানা ঘটনাবলীর টানা-পোড়েনে নারী-পুরুষের সম্পর্কের নানা অভিব্যক্তি, মিঃ ওয়েস্টার্ন, মিস্ ওয়েস্টার্ন প্রভৃতি বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে দিয়ে যুগের স্বরূপ প্রকাশ—এ সমস্ত ছবির বিশেষ গুণের দিক। টম জোন্সের ভূমিকায় অ্যালবার্ট ফিনে মাঝে মাঝে যথেষ্ট দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। অ্যালবার্ট ফিনে 'স্যাটারডে নাইট অ্যাণ্ড সানডে মর্নিং' ছবিতেও নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ। নায়ক আর্থার সীটন কারখানার কর্মী;—কারখানা, বাড়ি, শনিবার রাত্রির আনন্দ-উল্লাস-উন্মত্ততা এবং রবিবার সকালের শান্ত নদীতীরে মাছধরা—এই পরিবেশের কাঠামোর মধ্যে একটা বিশেষ শ্রেণীর আধুনিক যুবককে, তার মানসিকতা, বিক্ষোভ ও বিভ্রান্তিকে লেখক অ্যালান সিলিটো ধরতে চেয়েছেন। চিত্র-পরিচালক রীজ অত্যন্ত বাস্তবানুগভাবে শনিবার-রাত্রির বিলাসের অবসানে রবিবারের হিসাবনিকাশ ঘটিয়েছেন; মানসিক ও শারীরিক আঘাতে হয়েছে নায়কের চৈতন্যোদয়। ছবিটির সমাপ্তি-দৃশ্যের ইঙ্গিতময় পরিবেশন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভোজটেচ জাসনি পরিচালিত চেকোস্লোভাকিয়ার 'ছাট ক্যাট' রিয়ালিটি ও ফ্যান্টাসির মিলিত আধারে রূপায়িত একটি আকর্ষণীয় ছবি। শিশুর নিষ্পাপ মনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রতীকী ব্যঞ্জনায় মানুষের বিচার করেছেন পরিচালক বেড়ালের চোখে আঁটা কালো চশমা খুলে ইন্দ্রজালের মাধ্যমে বর্ণবৈচিত্র্যে শহরের লোকেদের আসল চরিত্র প্রকাশ করা হয়েছে। বক্তব্য প্রকাশে ছবিতে কিছুটা পরিমিতিবোধের অভাব প্রকট; কিন্তু ফ্যান্টাসি পরিবেশনে রঙ ও সংগীতের নিপুণ ব্যবহারে এ ছবি যে-কোনো কলাকুশলী ও চিত্ররসিকের কাছে বিশেষ মূল্যবান মনে হবে।

এবারকার চলচ্চিত্র-উৎসবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি সোভিয়েত রাশিয়ার 'হ্যামলেট'। শেক্সপীয়রীয় কাহিনীর যত চলচ্চিত্ররূপ আমরা এযাবৎ দেখেছি, তার মধ্যে কোজিনৎসেভ পরিচালিত এই ছবি নিঃসন্দেহে উচ্চাসন দাবি

করতে পারে। প্যাস্টেরনাকের অনুবাদ থেকে চিত্রনাট্য পরিচালক নিজেই তৈরি করেছেন। আমরা অবশ্য শেক্সপীয়রের মূল ইংরেজি কথাগুলিকে সাবটাইটেল হিসেবে এ ছবিতে পেয়েছি। চিত্রভাষা ও গতি এবং ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ থেকে নাট্যকাহিনীকে আশ্চর্য নিষ্ঠা, শিল্পবোধ ও প্রসাধন-পারিপাট্যে কোজিনৎসেভ ছায়াছবিতে রূপান্তরিত করেছেন। কতটুকু বাদ গেল, কিভাবে পরিবর্তন সাধিত হল, কিংবা লরেন্স অলিভিয়ের-এর 'হ্যামলেট'-এর সঙ্গে ট্রিটমেন্ট-এ মিল বা গরমিল কোথায়, স্বল্পপরিসরে তার আলোচনা করা সম্ভব নয়। বর্তমান ছবির বহু দৃশ্য, যেমন, হ্যামলেটের পিতার আত্মার আবির্ভাব, কবর খোঁড়ার সময়ে হ্যামলেট ও মড়ার খুলি, দুর্গস্থিত একঘর লোকের মধ্যে হ্যামলেটের ধীরে ধীরে হেঁটে যাওয়ার সময় তার প্রথম স্বগতোক্তি-প্রয়োগ (ছবিতে নেপথ্যভাষণে পরিবেশিত), সমুদ্র, দুর্গ-প্রাকার এ সবের পরিবেশে পিতার আত্মার চলমান দৃশ্যের মধ্যে ক্লডিয়াস ও গার্ট্রুডের অবৈধ আসক্তের আভাস, পোলোনিয়সের মৃত্যুর পর ওফেলিয়াকে পোশাক-পরানোর অসামান্য প্রতীকী ব্যঞ্জনা, ওফেলিয়ার মৃত্যু ও অন্তিমশয্যা—এমন বহু দৃশ্যের পরিকল্পনা ও প্রয়োগশৈলী কোজিনৎসেভের বৈদগ্ধ্য ও শিল্পদৃষ্টির পরিচায়ক। এর সঙ্গে শস্তাকোভিচের সংগীত, অভিনয়শিল্পীগণের সাফল্য, বিশেষ করে হ্যামলেটের ভূমিকায় ইনোকেন্তি স্মোকৃতুনোভস্কির রূপদান অভিভূত করবার মতো। হ্যামলেট চরিত্রের বেদনা ও হিংস্রতা, চিন্তাশীলতা ও গভীরতা, উন্মাদনা ও উন্মন আকুতি, ঘটনা-বিভঙ্গে দ্বৈতসত্তার সংশয় ও বিবর্তন কোজিনৎসেভের পরিচালনায় ও স্মোকৃতুনোভস্কির অভিনয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে।

পোলাণ্ডের আন্দ্রেই ওয়াইদার নবতম চিত্রসৃষ্টি 'ইনোসেণ্ট সর্সারার্স' চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু ও প্রকাশরীতির এক সূক্ষ্ম রসসম্পৃক্ত নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবার মতো ছবি। আধুনিক তরুণ-তরুণীর মানসিক অবসাদ, নিঃসঙ্গতা, ক্লান্তিকর জীবনের সমস্যার দুই প্রতিভূকে নিয়ে এবং মূল চরিত্র দুটির প্রস্তুতিপর্বে আরো কয়েকটি চরিত্রের অবতারণা করে, কয়েক ঘণ্টার ঘটনাবলীর এক আশ্চর্য পরিমিত বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। চুক্তিবদ্ধ মজাব খেলা থেকে তাদের অনুভূতি, অনাবিল মধুর রসে জারিত হয়ে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, এবং ছবিটি এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এক কাব্যিক সত্তায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। একেকটি দৃশ্যের কম্পোজিশন, দৃশ্যের সংলাপ ও গতির অন্তর্নিহিত হাস্যরস ও স্নিগ্ধতা, নেতিমূলক অন্তরঙ্গতার সূত্র থেকে

কার্যপরম্পরায় তাদের সম্পর্কের প্রেমে উত্তরণ—এ সমস্ত ওয়াইদার অনবদ্য প্রয়োগকৌশলে সার্থক রূপ নিয়েছে। উইনিউইয়ের আলোকচিত্র, লোমুনিকি ও টিপুল্‌কোয়াস্কার অভিনয় এ ছবির বিশেষ সম্পদ। উপলব্ধির গভীরতা, স্বল্পকথনের ব্যঞ্জনা, অভিব্যক্তির ইঙ্গিত—এরা যেন সমবেত প্রচেষ্টায় সফল করে তুলেছেন। প্রতিযোগিতার অন্তর্গত পোলাণ্ডের ছবি রিবকাওস্কি পরিচালিত 'কাফে ফ্রম দি পাস্ট' স্বল্প ও সুবিন্ত প্রকাশরীতিতে রচিত একটি দর্শনীয় ছবি। ছবিটির কোনো কোনো অংশ একটু নিরেস মনে হলেও, ছবির বক্তব্য উপস্থাপনের হার্দ্য সুর, বিশেষ করে এর শেষাংশের সংযত সংবেদনশীলতা আকৃষ্ট করে।

ইতালির 'দি অ্যাডভেঞ্চার' বা 'লা আভেন্তুরা' আধুনিক চলচ্চিত্রের একটি বিশেষ আলোচিত ছবি যা আমরা এই উৎসবে দেখবার সুযোগ পেয়েছি। এর স্রষ্টা অ্যান্তোনিয়নি মানুষের অতীতের মূল্যবোধ, বিশ্বাসভঙ্গের পটভূমিতে তার নৈতিক অবস্থিতি, ব্যক্তিক মানসিকতার অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার গণ্ডী পেরিয়ে তার পারস্পরিক যোগসূত্র সন্ধানের সমস্যা, মানুষের আত্মিক সত্তার মূল্যায়ণ করতে চেয়েছেন এই ছবিতে। বিশ্বাসভঙ্গের এক ভাব-রূপে তিনি দেখেছেন সান্দ্রো ও ক্লদিয়াকে; কিন্তু পরিশেষে জৈবপ্রবৃত্তি-তাড়িত সান্দ্রোকে তিনি মানবিক জীবনবোধে মুক্তি দিয়েছেন,—সান্দ্রোর অনুশোচনায় ক্লদিয়া তার কাছে এসেছে যাকে অ্যান্তোনিয়নি বলেছেন 'a kind of shared pity'। চরিত্রের মানসিকতার স্বরূপ-উন্মোচনে বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে তার আশ্চর্য সাজুয্য ঘটিয়ে এ ছবির একেকটি ইমেজে যেন বহিরঙ্গ ও অন্তর্নাট্যের যৌথ দ্যোতনা। বিশেষ করে, দ্বীপের ভিতরে আন্নার অনুসন্ধান-পর্বে, বিভিন্ন চরিত্রের আনাগোনা, তার সঙ্গে পাহাড়, সমুদ্র, নির্জন ঘরের পরিবেশ, হেলিকপ্টার ও লঞ্চের দৃশ্য ও শব্দ, বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর সংলাপ ও অভিব্যক্তি, কিংবা সান্দ্রোর প্রতি ক্লদিয়ার অনুরাগ উপলব্ধির প্রস্তুতি ও প্রথম প্রকাশ চিত্রভাষা, দৃশ্য-সংস্থাপনা, শিল্পরীতির অসামান্য সার্থকতার স্বাক্ষরবাহী। ছবির কাহিনীগত সূত্রের বিস্তারে কিছুটা মুক্তি ও পরিমিতির অভাব ঘটেছে; মনে হয় এর কারণ, চরিত্রগুলির সত্তা, অনুভূতি ও আবেগের একেকটি অবস্থার বিশ্লেষণের প্রতি পরিচালকের আসক্তি। এবং এই অতি-সচেতন রচনারীতির জন্য ছবিটিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দীর্ঘায়ত, কখনো বা স্বতঃস্ফূর্ততার অভাবে কিছুটা ক্লান্তিকর মনে হয়।

অ্যান্তোনিয়নির প্রাতিস্বিকতা চলচ্চিত্র-মাধ্যমে তাঁর নিজস্ব চিন্তাভাবনার পরিণতির পাশাপাশি বেয়ারিম্যানের সমস্যা, জটিলতা ও বিশ্বাসের পরীক্ষা 'উইন্টার লাইট' আধুনিক চলচ্চিত্রের আরেক ধারার নিদর্শন। কাহিনী নয়, একাকী মানুষের জীবন-ভাবনা, আত্মিক সংশয়, ঈশ্বরানুসন্ধানের এক চিত্ররূপ সুইডেনের এই ছবি। এ ছবি বেয়ারিম্যানের এক চিত্র-ত্রয়ীর অংশ বিশেষ (প্রথম অংশ 'থ্রু এ গ্লাস, ডার্কলি' এবং শেষাংশ 'সাইলেন্স')। মৃতদার প্রৌঢ় ধর্মযাজক বিশ্বাস হারিয়ে ঈশ্বরের নীরবতাব জন্য সংশয়াচ্ছন্ন। তার কাছে শরণাগত ধীবর চীনাদের হাতে পরমাণু-বোমা থাকার আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে শেষপর্যন্ত আত্মহত্যা করে। ধর্মযাজকের প্রতি প্রণয়াসক্তা শিক্ষিকা অবিচলচিত্তে গির্জার অপেক্ষা করছে আত্মস্থিতির আশায়। তত্ত্বকথার ক্রমিক পর্যালোচনার মধ্যে শেষপর্যন্ত বেয়ারিম্যানের দার্শনিক চিন্তার প্রবক্তা সংশয় থেকে বিশ্বাসে উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রত্যয়লাভের এই ধারা বিশ্বাসজনক পথ ধরে অগ্রসর হয় নি বলে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আবার ধীবরের আতঙ্ক সৃষ্টির পিছনে বেয়ারিম্যানের দার্শনিক বিশ্ববীক্ষা অনুপস্থিত। পরমাণু বোমা পৃথিবীতে এর আগেই তৈরি হয়েছে। রাজনীতিকের একচক্ষু মনোভাব কি বেয়ারিম্যানের ক্ষেত্রে এখানে সক্রিয় নয়? সমস্যা উপস্থাপনে ও তার নিরসন-প্রয়াসে বেয়ারিম্যান তাঁর 'সেভেন্থ সীল' বা 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরীজ' ছবিগুলিতে আরো সার্থক ছিলেন এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। তবে পরিবেশ এবং অর্থময় দৃশ্যরচনায় বেয়ারিম্যানের কল্পনাশক্তি ও আঙ্গিক-কুশলতা এ ছবিতেও অম্লান।

প্রতিযোগিতার অন্তর্গত সুইডেনের ছবি 'ওয়েডিং—সুইডিশ স্টাইল'-এ একটি মেয়ের বিয়ের দিনে তার ও অন্যান্য কয়েকটি লোকের চরিত্র, তাদের সমস্যা (যেটা অনেকের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র জৈবপ্রবৃত্তির তাড়না) পরিচালক কাব্যিক বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটি হবরল হয়ে শেষপর্যন্ত অবসাদ, বিষণ্ণতা এবং যৌন-ব্যভিচারের (তাও আবার দুঃসাহসিক-ভাবে নিরাবরণ) প্রতিচ্ছবি হয়েছে। ছবির কোনো দৃশ্যকল্পের বা ঘটনার মাধ্যমে না পেরে পরিচালক নিদ্রামগ্ন অসুস্থ মানুষগুলির নেপথ্যে একটা বক্তব্য প্রকাশ করতে চেয়েছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'আমেরিকা আমেরিকা' যশস্বী পরিচালক এলিয়া কাজানের নতুন ধরনের সৃষ্টি হলেও, ছবিটি রসোত্তীর্ণ হয়েছে এমন দাবি

করা চলে না। ঘটনাবহুল অতিদীর্ঘ চিত্রকাহিনী মাঝে মাঝে ক্লান্তিকর মনে হয়েছে। তুরস্ক থেকে আমেরিকা গিয়ে পৌছনো পর্যন্ত নানা অবস্থার মধ্যে কোনো কোনো দৃশ্য ও চরিত্র-উদ্‌ঘাটন মর্মস্পর্শী হলেও, পুরো ছবিটিতে কোনো গভীর ব্যঞ্জনা, সুসংহত চিত্রশৈলীর পরিচয় পাই নি, যা কাজানের পূর্বেকার কয়েকখানি ছবিতে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি।

ফ্রান্সের জ্যাক দেমি পরিচালিত 'আম্‌ব্রেলাজ অব শেরবুর্গ' আগাগোড়া সংগীতে রূপায়িত ও বর্ণবৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ একটি বিশিষ্ট ভঙ্গিমা ও রুচির উল্লেখযোগ্য ছবি। চলচ্চিত্রে গীতিনাট্য পরিবেশনের জন্য একটি সাধারণ কাহিনীসূত্র পরিচালক গ্রহণ করেছেন এবং একটি বিশেষ শ্রেণীর জীবনের কয়েকটি দিক—প্রেম, বিরহ, জারজ সন্তান, সামাজিক বিবাহের স্বীকৃতি, পতিতাবৃত্তি, যুদ্ধ, মৃত্যু নিয়ে আপাত অবাস্তব আঙ্গিকে মানসিকবোধের সঙ্গে বিচার করতে চেয়েছেন। সুরের মূর্ছনার অন্তরালে যে বাস্তব জীবনের স্রোত, তার প্রতীতী ও প্রত্যয়ের মধ্যে ছবির বক্তব্য নিহিত এবং সেখানেই ছবিটির রসসৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। বার্নহার্ড ভিকি পরিচালিত পশ্চিম জার্মানির 'দি ভিজিট' বিষয়বৈচিত্র্যে, কৌতূহলোদ্দীপক নাটকীয় পরিস্থিতি রচনায়, ও ইংগ্রিড বেয়ারিম্যানের অভিনয়সমৃদ্ধ একটি উপভোগ্য ছবি। মানুষের সৎবুদ্ধি ও নিষ্ঠা যে কত ঠুন্‌কো, অবস্থার চাপে বা অর্থের প্রলোভনে তা যে বিকিয়ে যায়, এই ছবিতে যেন তারই ইঙ্গিত।

প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত তুরস্কের ছবি 'কংকারার্স অব দি গোল্ডেন সিটি'র কাহিনী ও বক্তব্য সুষ্ঠু হলেও আঙ্গিকগত ত্রুটি এ ছবি কাটিয়ে উঠতে পারে নি। উচ্চাশা নিয়ে যে-পরিবার গোল্ডেন সিটি বা ইস্তানবুলে এল, তার আশাভঙ্গ ও ব্যর্থতা, কয়েকটি চরিত্রের স্খলনের পরিণতি অবশ্য মনে কিছুটা দাগ কেটে যায়। নরনারীর দেহ-সম্পর্কের সমস্ত দৃশ্য কিংবা পার্টিতে স্ট্রিপটিজের ব্যবহার ঘটনার বিস্তারে বা চরিত্র-বিশ্লেষণে অতি প্রয়োজনীয় মনে হয় নি। হংকং-এর 'লাভারস্ রক' ছবিতে কিছু মনোরম দৃশ্যাবলী রয়েছে। যুক্তিপারম্পর্য-হীন, অতিনাটকীয় বহু ঘটনার সঙ্গে সস্তা সেন্টিমেন্ট-এর পথ ধরে তৈরি অত্যন্ত সাদামাটা এই ছবিটিতে মুন্সীয়ানার কোনো ছাপ নেই।

প্রতিযোগিতায় স্বর্ণময়ূরবিজয়ী সিংহলের 'গামপেরালিয়া' (এ ফ্যামিলি ক্রনিক্‌ল্) পরিমিতি রেখে সহজভাবে বলা একটি ঘরোয়া কাহিনী। বংশ-সংশয়ের অনেক সমস্যা অপরিণত অবস্থায়, কিংবা অকপট গ্রহণের

সহজ পন্থায় পরিচালক পেরিজ পরিবেশন করে ছবিটিকে অনেক স্থানে দুর্বল করে ফেলেছেন। দৃশ্য-পরিকল্পনায় তিনি বাস্তববাদী এবং কিছুটা রসসৃষ্টি করতে পারলেও, গ্রন্থনায় এবং আঙ্গিক ও কলাকৌশলগত ত্রুটির জন্য ছবিটিকে তিনি রসোত্তীর্ণ করে তুলতে পারেন নি।

চলচ্চিত্র সপ্তাহে আমার দেখা কয়েকটি ছবি নিয়ে এখানে আলোচনা করলাম। মাত্র কয়েকটি দিনের মধ্যে এতগুলি ছবির সমাবেশে সেগুলির রসগ্রহণ ও বিচারের কিছুটা অসুবিধা থাকে। ভোজ্যবস্তুর স্বাদ ধীরে ধীরে গ্রহণ করলে আস্বাদনে যে উপলব্ধি ও সংগতিবোধ থাকে, চলচ্চিত্র সপ্তাহে এভাবে ছবি দেখায় তার হয়তো খানিকটা ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ ছাড়া প্রথম দর্শনের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিই এখানে লেখা হল।

এই উৎসবে বেয়ারিম্যান, কুরোসয়া, অ্যান্তোনিয়নি, ওয়াইদা, মিজোগুচির মতো মৌলিক শিল্পীর সৃষ্টি, কোজিনৎসেভ, দেসি, রিচার্ডসন, কারেল রীজ-এর শিল্পকৃতিত্বের নিদর্শন দেখবার দুর্লভ সুযোগ আমরা পেয়েছি। আধুনিক চলচ্চিত্রকলার কয়েকটি বিশিষ্ট নিদর্শনের মধ্যে তার গতিপ্রকৃতির খানিকটা আভাসও প্রতিভাত। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে চলচ্চিত্ররীতি ও বিষয়বস্তুর যে বিবর্তন ঘটেছে, তার স্বরূপ ও প্রবণতার খণ্ড-পরিচয় এই উৎসবের মধ্য দিয়ে আমরা পেয়েছি। সামাজিক প্রতিবাদে সোচ্চার, কিংবা সমাজমানস থেকে যে শিল্পবোধের উদ্বোধন তার স্বাক্ষর 'নিও-রিয়ালিজ্‌ম' ধারায় প্রবল ছিল; অ্যান্তোনিয়নির ব্যক্তিমানস নিয়ে বিশ্লেষণের মধ্যে সমাজসচেতনতা আভাসে থাকে মাত্র। বেয়ারিম্যান আত্মিক সংকটকে সমাজমানসে বিবৃত না করে অধ্যাত্মচিন্তা দিয়ে ঐশ্বরিক শক্তির কাছে আশ্রয় পেতে চান। জাপানি চলচ্চিত্রকলা ও জীবনদর্শন মানবিকতার স্পর্শে সমৃদ্ধ। রসোত্তীর্ণ, বিশিষ্ট যে-ক'টি ছবি দেখেছি, তার মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি শিল্পতন্ময়তার সঙ্গে আঙ্গিকপ্রসাধন, রসদৃষ্টির সঙ্গে বিষয়গভীরতা, আবেগতপ্ত জীবনচর্চার সঙ্গে বুদ্ধিমার্জিত বর্ণনাভঙ্গির প্রকাশ। কোনো কোনো ছবিতে আবার দেখেছি ব্যক্তিগত সমস্যা, জীবনের বাসনা-প্রকৃতির জটিলতা, দেহ-মনের বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ছবিতে ক্ষেত্রবিশেষে যৌন-আবেদন পরিবেশনের প্রবণতা। জীবনের সমস্যা ও সংশয় নরনারীর দেহকে কেন্দ্র করেই কি শুধু উৎসারিত— দু-একটি ছবি দেখে এই প্রশ্ন মনে জাগা অস্বাভাবিক নয়। এ সব ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রে আধুনিক যুগলক্ষণ কতটা প্রতিফলিত? সমাজসত্তার চেয়ে ব্যক্তি—

কেন্দ্রিক মনস্তত্ত্ব ও বিকার, অর্থনৈতিক এবং বৃহত্তর মানবিক চেতনার চেয়ে মর্ষিত চিত্তবৈকল্য কারোর প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। চিন্তা ও মননের দৈন্য, সমাজজীবনের বিশ্লেষণে সংবেদনশীল শিল্পীমনের অভাব বোধহয় এই অবস্থার জন্য খানিকটা দায়ী। আবার যুগলরূপের নির্ভুল প্রতিভূকে যে জীবনের নিয়মে আস্থাবান করা যায়, তার নিটোল প্রকাশ দেখিয়েছেন ওয়াইদা। পক্ষান্তরে, প্রকাশরীতির বৈচিত্র্য—ডি-ড্রামাটাইজেশন, কিংবা অ্যাব্‌স্ট্র্যাকশনের স্বাক্ষর কয়েকটি ছবিতে সার্থকভাবে উদ্ভাসিত। ক্লাসিক সৃষ্টি কিভাবে চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করা যায় তার সার্থক নিদর্শন 'হ্যামলেটে' আমরা দেখেছি। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ঘটনাবলী নিয়ে চলচ্চিত্রকে যে রূপদী শিল্পের পর্যায়ে উত্তীর্ণ করা যায়, তার পরিচয় পাওয়া যাবে কুরোসয়ার বিশিষ্ট জীবনচর্চায় ও প্রয়োগচাতুর্যে।

দেশ-বিদেশের চলচ্চিত্রশিল্পের ভালো-মন্দ মেশানো যে-পরিচয় এই উৎসব থেকে পাওয়া গেছে, তা বাংলা চলচ্চিত্রকর্মী ও চলচ্চিত্ররসিকদের অভিজ্ঞতাকে কিছুটা বাড়িয়ে দেবে, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে। অনেক ছবি দেখা হল না এবং এই আলোচনায় একত্রে ও সংক্ষেপে উচ্চশ্রেণীর কয়েকটি ছবির আলোচনা শেষ করতে হয়েছে স্থানাভাববশত, এজন্য আক্ষেপ থেকে গেল।

কুমার সোম

নিখিল বিশ্বাসের স্কেচ-প্রদর্শনী

সাম্প্রতিক চিত্রকলার নৈরাশ্যে শত আত্মবিরোধ ও বিশৃঙ্খলতার মধ্যেও দুটি সমান্তরাল-প্রবাহিত সুস্পষ্ট ধারা চোখে পড়ে। একটি একান্তই বিমূর্ত বা মানব-আকৃতি ও বাহ্যপ্রকৃতির স্বরূপতাকে স্বেচ্ছায় পরিহার করে চিত্রকলার যাবতীয় উপকরণ যথা রঙ ও রেখা (দাদাইস্ট বা পপ্-শিল্পীদের ক্ষেত্রে তার, কাঁটা, কাঁকর, বালি বা বিজ্ঞাপন-কাগজের টুকরো) ইত্যাদি সামগ্রীর রহস্যসন্ধানে তৎপর, অপর ধারাটি মানব-দেহাবয়বকে চিত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে গ্রহণ করে বিকৃতি, বিন্যাস, পুনর্গঠন, সংস্থাপন প্রভৃতি শিল্প-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নতুনতর রূপচ্ছবি রচনায় নিবিষ্ট। প্রথমটির উদ্দেশ্য দর্শকের হৃদয়ে ও স্নায়ুতে চমকসৃষ্টি বা রেখার সংঘাত ও রঙের বিস্ফোরণের দ্বারা গূঢ় আবেগ বা অনির্দিষ্ট সুদূর ভাবরাশির উদ্দীপন, অপরটি নির্দিষ্ট ও সৌন্দর্যপূর্ণ আকার (form) ও আকৃতির দ্বারা সৃজনী মানবকল্পনার আকৃতিদানশক্তিকে বিকশিত করে। বলা বাহুল্য, অধুনাসৃষ্ট শিল্পী-গোষ্ঠী 'ক্যালকাটা পেইন্টার্স' (রঞ্জন রুদ্র ব্যতিরেকে) দ্বিতীয় ধারাটির অন্তর্ভুক্ত। গত জানুয়ারিতে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে প্রদর্শিত এই গোষ্ঠীর অন্যতম শিল্পী নিখিল বিশ্বাসের স্কেচগুলি উপরোক্ত দ্বিতীয় ধারার অন্তর্গত শিল্পবোধ ও সর্বোপরি এক উন্নত মানবতাবোধে রসিকচিত্তকে অভিভূত করেছে।

'Exodus', *'Violence'*, *'Human Group'*, *'Clown Group'* ও *'Horses'* প্রভৃতি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত তেল-চারকোল্ ও কালি-কলমের বলিষ্ঠ রেখাঙ্কনে আধুনিক মনের নানান জটিলতা, আশা ও আশাহীনতা, ভয় ও সাহস, সংগ্রাম ও পরাক্রমকে শ্রীবিশ্বাস মূর্ত করে তুলেছেন। বস্তু-নির্বাচনে ও আঙ্গিকে, যেমন বিষণ্ন বিদূষক-শ্রেণী কল্পনায় ও আপাতবিশৃঙ্খল রেখার টানে, পিকাসোর স্পষ্ট প্রভাব সত্ত্বেও স্কেচগুলি মৌলিক এই অর্থে যে শিল্পী চিত্ররচনা করেছেন নিছক কর্তব্যের তাগিদে নয়, অর্থকামনায়ও নয়, অন্তরের প্রেরণায়। ছবি এঁকেছেন তিনি মনের আনন্দে। প্রতিটি রেখা শিল্পীর এই নিবিড় উপভোগের সাক্ষ্য বহন করছে। কিন্তু অজস্র রেখার

ঘূর্ণাবর্ত, কখনো বা বিপুল জলস্রোতের মতো রেখাপ্রবাহ এক অর্থে শক্তি, আবার দুর্বলতাও, কারণ সার্থক ড্রইংয়ের মধ্যে আমরা যে রেখার শুদ্ধতা (Purity of lines) আশা করি, তা এ ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। বিশুদ্ধ ড্রইংকে যদি আমরা গ্রাফিক-শিল্পের থেকে পৃথক ভাবি, তবে নিখিল বিশ্বাসের স্কেচগুলি সর্বতোভাবে সার্থক নয়। তাছাড়া যে উদ্দামতা ও অস্থিরতা স্কেচগুলিকে বলিষ্ঠ রচনার পর্যায়ে উন্নীত করেছে, তাতে তন্ময়তা ও পরিচ্ছন্নতার দৈন্য দর্শকমনকে পীড়িত করে। বলা বাহুল্য, আমার বক্তব্য এই নয় যে সূক্ষ্ম ও একক রেখাই পরিমিতিবোধের একমাত্র বাহক। রেখার পরিমিতির অর্থ রেখার তাৎপর্য। শ্রীবিশ্বাস মুখ্যত বিমূর্ত শিল্পী নন, তবুও স্কেচগুলিতে বাস্তবানুগ বস্তুর উপরিভাগে ও চতুষ্পার্শে যে সংখ্যাহীন ঘন রেখার আবর্ত রচিত হয়েছে সেগুলি মধ্যস্থিত চিত্রিত বস্তুর সঙ্গে সর্বক্ষেত্রে সম্পর্কযুক্ত নয় বলেই তাৎপর্যহীন বিমূর্ততায় পর্যবসিত। মূর্ত ও বিমূর্তের এই অসমঞ্জস সমন্বয় সত্ত্বেও নিখিল বিশ্বাসের স্কেচগুলি এক সৎ ও জাত শিল্পীর পরিচয় বহন করে। আধুনিক ভারতীয় শিল্প-জগৎ যখন নানা অযোগ্য শক্তিহীন শিল্পীর ঢক্কা-নিনাদে মুখর, যখন রঙের গোলকধাঁধায় শিল্প ও শিল্পহীনতার পার্থক্য নির্ণয়ের পথ লুপ্তপ্রায়, তখন একটি স্কেচের প্রদর্শনী সকল সার্থক চিত্রকলার ভিত্তি ড্রইংয়ের প্রতি রসিক দর্শকের মনোযোগ ফিরিয়ে আনে। একদা এক খ্যাতিমান প্রবীণ শিল্পী আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "In our days, the artist was expected to draw. Now he has become a designer. He plays with colour and creates new textures. He does not cannot draw." শিল্পী নিখিল বিশ্বাস এই উক্তিনিহিত সত্যের ব্যতিক্রম।

মণি জানা

সংস্কৃতি-সংবাদ

শ্রীমান্ সুভাষ মুখোপাধ্যায়

সুহৃদ্বরেষু—

জীবনে আজ একটি পরম আনন্দের দিন। সুহৃদ্ রূপে, সহযাত্রী রূপে, সাহিত্যের সহযোগী রূপে আপনাকে আমরা চিরদিন বুকভরা আলিঙ্গন ও প্রাণভরা অভিনন্দন জানিয়েছি—চিরদিনই আপনি আমাদের সকলের প্রিয়। আপনার প্রতিভার সম্মানে আমরাও আজ সম্মানিত। আপনি আমাদের সকলের গৌরব।

পঁচিশ বৎসর পূর্বে আপনি যখন সাহিত্যক্ষেত্রে 'পদাতিক'-পরিচয়ে প্রবেশ করেছিলেন, তখনো আপনার আবির্ভাব কারুর অলক্ষিত ছিল না। 'প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য'—শুনে সাহিত্যরসিকের আশা ও সংশয় একই কালে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। জীবনরসিকের উৎকর্ণ চেতনা খুঁজেছিল নতুন বাণী। আর মানুষের মুখ আপনার চোখের মধ্যে চাইছিল নতুন আশ্বাসের আলোক।

তারপর পঁচিশ বৎসরের মধ্য দিয়ে আপনি অনেক পথ পেরিয়ে এসেছেন—শপথ ছিল 'হতাশার কালো চক্রান্তকে ব্যর্থ করার'; 'স্বপ্ন একটি পৃথিবী গড়ার'; 'অগ্নিকোণের তল্লাট জুড়ে দুরন্ত ঝড়ে রক্তের দামে রক্তের ধার শুধবার।' আশায় ভরা নিরাশায় ছাওয়া সেই পথে কদাচিৎ পেয়েছেন ফুলের স্পর্শ, প্রতিপদে পেয়েছেন কাঁটার আঘাত। সেই মূল্যেই আপনি কিনেছেন কাব্যলক্ষ্মীকে, আর জীবনরসিকেরা আপনার কণ্ঠে শুনেছেন জীবনলক্ষ্মীর গান

'মৃত্যুটা যত বড়ই হোক্ না
জীবনের চেয়ে এমন কিছু সে
ঢ্যাঙা নয়।'

আপনার সহযাত্রীরা জেনেছে তাঁদের ধ্যান-মন্ত্র 'ফুল ফুটুক'—

'হিরণ্যগর্ভ দিন
হাতে লক্ষ্মীর ঝাঁপি নিয়ে আসছে।'

আপনার মুখ চেয়ে আমরাও পেয়েছি বিশ্বের অন্তরলক্ষ্মীর উদ্দেশ

'আমি যত দূরেই যাই।
আমার সঙ্গে যায়
ঢেউয়ের মালাগাঁথা
এক নদীর নাম—
আমি যত দূরেই যাই
আমার চোখের পাতায় লেগে থাকে
নিকোনো উঠোনে
সারি সারি লক্ষ্মীর পা
আমি যত দূরেই যাই।'

বাংলার পল্লীলক্ষ্মীর মধ্যে বিশ্বলক্ষ্মীর এই আভাস আপনার চোখের পাতায় লেগে থাকে। আপনার চোখে চোখ রেখে, হাতে হাত মিলিয়ে, বুকে বুক দিয়ে আমরাও বিশ্বাস করি, বিশ্বের এই অন্তরলক্ষ্মীর দিকেই, আপনার মতোই, আমাদেরও এই লক্ষ্মীহারা লক্ষ জীবনের অভিযান।

পঁচিশ বৎসর পূর্বেকার সংশয় আজ বিদূরিত। আশা সার্থক, বাণী বিজয়ী। আপনি সাহিত্যে নতুন চেতনা সঞ্চার করেছেন। জীবনকে দিয়েছেন নতুন মহিমা, মানুষকে নতুন বিশ্বাস।

'আশ্চর্য সুন্দর' সেই সত্যে আপনার মুখ মিছিলের সকলকার মুখে জোগায় নতুন আশ্বাস। সুতরাং, আপনি আপনার সহযাত্রীদের সকলকার ভালোবাসা গ্রহণ করুন—আপনার নিরাপদ হাতে সেই ভালোবাসাগুলো পৌছে যাক চিরদিনের মানুষের বলিষ্ঠ হাতে ॥ ইতি—

গোপাল হালদার
পরিচয়, সম্পাদকমণ্ডলী

এশিয়াটিক সোসাইটি ও গুণিজন-সম্মাননা

বালক রবীন্দ্রনাথের গান শুনে খুশি হয়ে পুরস্কার দেবার সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন যে দেশের রাজা দেশের ভাষা ও সাহিত্যের আদর বুঝলে তারাই কবিকে পুরস্কার দিত; কিন্তু রাজার দিক থেকে কোনো সম্ভাবনা না থাকায় সেদিন মহর্ষিদেবকেই সেই কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী জীবনে দেশের রাজায়

কাছে সম্মানিত হবার 'সৌভাগ্য' এসেছিল বটে, কিন্তু সে-সম্মাননার ব্যাপার যে সুখের হয় নি সে কথা সকলেই জানেন। বরং রাজপ্রদত্ত সম্মানচিহ্নটি ত্যাগ করেই রবীন্দ্রনাথের যথার্থ গৌরব বেড়েছিল। মহর্ষিদেব যদিও এ ঘটনা দেখে যান নি, তবু রাজার হাতের সম্মানে তিনি খুব খুশি হতেন বলে মনে হয় না। রাজার হাত থেকে পাওয়া সম্মান অধিকাংশ সময়েই যথার্থ গৌরবের বস্তু হয় না, এমনকি সাম্প্রতিক কালে রাষ্ট্রপ্রদত্ত সম্মানের ব্যাপারেও অনেকে অস্বস্তি প্রকাশ করেন দেখেছি, অনেকে এই সম্মাননাকে সন্দেহের চোখেও দেখে থাকেন। এ থেকে মনে হয় গুণিজন-সম্মাননার কাজটি রাষ্ট্রের হাতে বোধহয় না থাকাই ভালো। অন্ততপক্ষে বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠান থেকে এই সম্মান এলে যে এর মর্যাদা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায় তাতে সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথের জীবনে অনেক সম্মানের চেয়ে সাহিত্য-পরিষদ্-আয়োজিত সম্মাননা-সভা তাই অধিকতর উল্লেখযোগ্য।

সম্প্রতি এশিয়াটিক সোসাইটি শ্রীসর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণণকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেছেন। এমন বিদ্বৎ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রদত্ত সম্মানেই রাধাকৃষ্ণণের গুণ ও জ্ঞানের সম্যক স্বীকৃতি লাভ ঘটেছে, যা হয়তো রাষ্ট্রপ্রদত্ত ভারতরত্নেও হয় নি। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় যে সাহিত্য সংস্কৃতি বা ইতিহাসের বহু ছাত্রের কাছে এশিয়াটিক সোসাইটির ভূমিকা স্পষ্ট নয়। এমনও দেখেছি অনেকে এর খবরও রাখেন না।

ভারতের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্মের ঠিক ১০১ বৎসর আগে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা শহরের সুপ্রীম কোর্টের একটি ঘরে স্যর উইলিয়ম জোন্‌সের উদ্যোগে Asiatick Society প্রতিষ্ঠিত হয় শুধু য়ুরোপীয় সদস্যদের নিয়ে। গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসকে লিখিত পত্রে জোন্‌স্ এই সোসাইটির উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন: 'A society... for the purpose of enquiring into the history and antiquities, the arts, sciences and literature of Asia'. হেস্টিংস সভাপতিপদের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে সে পত্রে কোনো 'superior talent'-কে মনোনীত করতে বলেন। তার ফলে জোন্‌স্-ই প্রথম সভাপতি নিযুক্ত হন। প্রথম দিকে কোনো ভারতীয় সদস্য গ্রহণ করা হয় নি। যদিও ভারতীয়দের রচনা-পাঠের ব্যবস্থা হয়েছিল। ১৮২৯ সালে যাঁরা প্রথম ভারতীয় সদস্য নির্বাচিত

হন তাঁদের মধ্যে ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও রামকমল সেন। ১৮০৮ সালে সোসাইটি সরকার প্রদত্ত ভূখণ্ডে ১ নম্বর পার্ক স্ট্রীটে নিজস্ব ভবনে উঠে আসে। ১৫৭ বছর এই গৃহে অধিষ্ঠিত থাকার পর সম্প্রতি ওই ভবনেরই সামনে এক প্রশস্ততর গৃহে এশিয়াটিক সোসাইটি উঠে এসেছে। যদিও প্রয়োজন বিচারে নতুন ভবনের স্থানও যথেষ্ট বলে মনে হয় না।

এশিয়াটিক সোসাইটি প্রথম পর্বে যেসব উল্লেখযোগ্য কাজে হাত দিয়েছে তার মধ্যে ১৭৮৮ থেকে ১৭৯৭ সালের মধ্যে প্রকাশিত ৫ খণ্ড Asiatick Researches প্রধান। সোসাইটির জার্নালে নানা বিজ্ঞান-গবেষণা ও সমীক্ষা-বিষয়ক আলোচনা প্রকাশিত হয়। এর ফলেই এদেশে বহু সমীক্ষা প্রতিষ্ঠানেব আবির্ভাব ও সমৃদ্ধি ঘটে। বর্তমান ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের সূচনাও এশিয়াটিক সোসাইটির হাতে। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম তার নিজস্ব ভবনে উঠে আসে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে। সোসাইটির প্রত্নতাত্ত্বিক ও প্রাণিবিষয়ক সংগ্রহেই মিউজিয়াম সমৃদ্ধ। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ছাড়াও ইতিহাসে ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কতকগুলি মৌলিক গবেষণা এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগেই অনুষ্ঠিত হয়। যেমন অশোকের শিলালিপির পাঠোদ্ধারে প্রিন্সেপের প্রয়াস সোসাইটির জার্নালের আনুকূল্যেই বিদ্বজ্জনসমাজে প্রচারলাভ করে।

এশিয়াটিক সোসাইটির পূর্ণাঙ্গ বিবরণের অবকাশ এখানে নেই। তবে সোসাইটির নতুন ভবনে প্রবেশ উপলক্ষে সোসাইটির ১৮০ বছরেব গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস স্মরণ করা কর্তব্য। সেই প্রসঙ্গেই তার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করা হল।

এশিয়াটিক সোসাইটি ১৯৬১ সালে প্রথম 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মশতবর্ষ স্মারকচিহ্ন' প্রদান প্রবর্তন করেন। মানব-সংস্কৃতির যে-কোনো ধারায় যাঁদের বিশেষ কৃতিত্ব আছে এমন মনীষীকে প্রতি বৎসর এই পুরস্কার দেওয়া হবে এই রকম স্থির হয়। ১৯৬১ সালে পাঁচ জন বিশ্ববিখ্যাত পুরুষকে এই সম্মানে ভূষিত করা হয়। গ্রেট বৃটেনের বারট্রাণ্ড রাসেল ও টয়েন্‌বি, ডেনমার্কের নীল্‌স্‌ বোর, জাপানের দাইসেৎসু সুজুকি এবং ইউ. এ. আর-এর তাহা হোসেনকে সে বছর পুরস্কার দেওয়া হয়। তার পরের বছর থেকে প্রতি বছর এক একজনকে এই সম্মানে ভূষিত করা হয়। এই স্মারকচিহ্ন বিতরণ উপলক্ষে এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নামটিও যুক্ত হয়ে রইল এটাও সোসাইটির পক্ষে পরম গৌরবের কথা।

এবার সোসাইটি যে তিনজন গুণীপুরুষকে সম্মানিত করেছেন তা নানাদিক থেকেই উল্লেখযোগ্য। ১৩৬২, ১৩৬৩ ও ১৩৬৪ সালের জন্য 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মশতবার্ষিক স্মারকচিহ্ন' দেওয়া হয়েছে সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, আলবার্ট শোআইৎসার ও নন্দলাল বসুকে। এ-জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে গুণিজন-সম্মাননার গুরুত্ব ও মর্যাদা কতখানি তা আগেই বলা হয়েছে। পুরস্কৃত যাঁরা হয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই আপন-আপন কীর্তিতে সমুজ্জ্বল। প্রথম ও তৃতীয় জন ভারতবাসীর কাছে সুপরিচিত। সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ভারতীয় দর্শনের ব্যাখ্যাকার হিসাবে দর্শন জগতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভা নানাভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে—কখনো অধ্যাপকরূপে, কখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান হিসাবে। দর্শন ক্ষেত্রে ভারতবর্ষকে জগৎ সমক্ষে পরিচিত করাবার কৃতিত্বের স্বীকৃতিও ভারতরাষ্ট্র তাঁকে রাষ্ট্রপতিপদে বরণ করে দিয়েছে। এবার দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বজ্জনসমাজ রবীন্দ্র-স্মারক উপহারে তাঁর জ্ঞানের যথার্থ স্বীকৃতি দিলেন।

নন্দলাল বসু একদা তাঁর শিল্পপ্রতিভার যথাযোগ্য স্বীকৃতি পেয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই কাছে। ভারতীয় শিল্পধারা পুনঃপ্রবর্তনের মহান আন্দোলনের গুরু অবনীন্দ্রনাথের এই যোগ্যতম শিষ্যটি একদিন অজন্তা গুহাচিত্রাবলীর সংরক্ষণে ও প্রচারে যে-নিষ্ঠা দেখিয়েছিলেন তা এশিয়াটিক সোসাইটির মূল উদ্দেশ্যেরই অন্তর্ভুক্ত। তাই আজ রবীন্দ্র-স্নেহধন্য এই শিল্পী-তপস্বীকে এশিয়াটিক সোসাইটি সম্মানিত করে তিনটি অনুকূল নামের ত্রিবেণীসংগম ঘটিয়েছেন সন্দেহ নেই।

পুরস্কৃত ব্যক্তিত্রয়ের মধ্যে আলবার্ট শোআইৎসার এদেশে অপেক্ষাকৃত স্বল্পপরিচিত নাম, পৃথিবীতে নয়। এই নীরব কর্মীটি লোকচক্ষুর অন্তরালে পঞ্চাশ বছর ধরে পশ্চিম আফ্রিকার গাবন প্রদেশের লাম্বারেন অঞ্চলে রোগার্তের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত রেখেছেন। এঁর বিচিত্র জীবনকথা যেমনই বিস্ময়কর, এঁর সম্বন্ধে সভ্যসমাজের অজ্ঞতা তেমনই ক্ষোভের বিষয়। জন্মসূত্রে ইনি কিছুটা জার্মান ও কিছুটা ফরাসী, কারণ তাঁর জন্মপ্রদেশ আলসেস্ ফ্রান্স ও জার্মেনির সীমান্তে অবস্থিত হওয়ায় যুদ্ধে মাঝে-মাঝে সীমানা পরিবর্তন হয়। ফলে তাঁরও নাগরিকতা পরিবর্তিত হয়। এই বিচিত্র প্রতিভাধর পুরুষটি সংগীত-বিদ্যা, ধর্মশাস্ত্র ও চিকিৎসাশাস্ত্রে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেছেন। পাশ্চাত্য সংগীতশাস্ত্রবিদ্ হিসেবে ইউরোপে তাঁর বিশেষ প্রতিষ্ঠা আছে।

বাখ্ সম্বন্ধে তাঁর রচিত দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত। খৃষ্টধর্ম-বিষয়ক নানা গ্রন্থও বিদ্বৎসমাজে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ভারতীয় দর্শন-ইতিহাস সম্বন্ধে রচিত গ্রন্থে তিনি ভারতীয় চিন্তাধারা অনুধাবনে বিশেষ নিষ্ঠা দেখিয়েছেন। এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন সম্বন্ধে একটি পৃথক অধ্যায় রয়েছে। কিন্তু জ্ঞানমার্গের এই সাধনা শোআইৎসারের জীবনে 'এহো বাহ্য'। তাঁর প্রকৃত পরিচয় মানবপ্রেমিক হিসাবে। কেবল মানবপ্রেম সম্বন্ধে বক্তৃতা রচনা করে তিনি তাঁর দায়িত্ব সমাপ্ত করেন নি। সভ্যসমাজের সকল প্রতিষ্ঠা ও প্রলোভন ত্যাগ করে তিনি গত পঞ্চাশ বছর ধরে আফ্রিকার দুর্গম অরণ্য অঞ্চলে রোগার্তের সেবায় জীবনপাত করছেন। এর মাঝে সভ্যসমাজ থেকে তাঁর অনেক আহ্বান এসেছে, অনেক সম্মান বর্ষিত হয়েছে। কিন্তু এই তপস্বীকে সে-সব কিছু স্পর্শ করেছে বলে মনে হয় না। তিনি এই জীবন-সায়াহ্নে নব্বই বছর বয়সে আজও সেই লাম্বারেনের হাসপাতালে আপন কর্তব্য সাধনে অচঞ্চল রয়েছেন। জ্ঞানের সুউচ্চ শিখর থেকে নেমে এসে শোআইৎসার সেবা ও প্রেমের প্রশান্ত ভূমিতে আজ বাসা বেঁধেছেন। এশিয়াটিক সোসাইটির মতো বিদ্বজ্জনসমাজ আজ এই সেবাব্রতীকে পুরস্কৃত করে এই কথাই প্রমাণিত করলেন যে সকল জ্ঞানের শেষ লক্ষ্য মানব-কল্যাণ এবং সেই মানবকল্যাণে যেখানে কেউ জীবন উৎসর্গ করেন সেখানে বিদ্বজ্জনসমাজ শ্রদ্ধায় মাথা নিচু করে সম্মান জানায়।

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

চারুলতা-প্রসঙ্গ

সত্যজিৎ রায়ের চারুলতা-প্রসঙ্গে আমরা পাঠকদের কাছ থেকে অনেকগুলি চিঠিপত্র পেয়েছি। এ-সংখ্যায় স্থানাভাববশত তা প্রকাশ করা গেল না। আগামী চৈত্র সংখ্যায় সেগুলি প্রকাশ করা হবে।

—সম্পাদক পরিচয়

পুস্তক-পরিচয়

কবিতার আলোচনা

শ্রুতি ও প্রতিশ্রুতি। রঞ্জিত সিংহ। ক্লাসিক প্রেস, কলিকাতা-৯। পাঁচ টাকা।

আধুনিক বাংলা কবিতা সম্বন্ধে গ্রন্থপ্রকাশ নিঃসন্দেহে একটি সুলক্ষণ; কেননা শিল্প ও সাহিত্য সর্বদাই কোনো-না-কোনো ভাবে স্বদেশ ও স্বকালের প্রকাশ এবং সেজন্যে আধুনিক বাংলা কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সূত্রে আধুনিক বাংলার স্বরূপ অনুধাবনে পাঠককে সাহায্য করবে এমন আশা অসংগত নয়। তবে শিল্প-সাহিত্যের বিচারে সামাজিক তাৎপর্যের প্রসঙ্গ সর্বত্র বোধহয় অনিবার্য নয়; শ্রীরঞ্জিত সিংহের আলোচ্য গ্রন্থটিতে সে-বিচার প্রকরণ ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ, যেহেতু তাঁর বিশ্বাস কাব্যের বিচারে আধেয় ও আধারকে স্বতন্ত্র দুটি জিনিস হিসেবে গণ্য করা অবান্তর।

শুরুতেই বলে রাখা ভালো যে আধুনিক বাংলা কবিতায় মুখের ভাষা ও তার ছন্দের তাৎপর্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে এ-গ্রন্থে রঞ্জিতবাবু মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। আসলে তাঁর বিবেচনাতে কথ্যভাষা ও তার ছন্দের ভঙ্গিই আধুনিক বাংলা কবিতার সামান্য লক্ষণ। ভঙ্গি মানে কাব্যের বহিরঙ্গ নয়, ভঙ্গিটাই কাব্যের সারাৎসার। অর্থাৎ প্রচলিত অর্থে নয়, গূঢ়তর, এমনকি অলৌকিক, অর্থেই শ্রীসিংহ ভাষা ও ছন্দের ভঙ্গিকে গ্রহণ করেছেন।

গ্রন্থকারের বিশ্বাস পূর্ববর্তী কবিসমাজের কাব্যপ্রযুক্তির লক্ষণগুলিকে অস্বীকারেই রবীন্দ্রনাথের অমোঘ আবির্ভাব এবং একই চক্রাবর্তনের ফলে অর্থাৎ রাবীন্দ্রিক কাব্যের প্রযুক্তি-লক্ষণাদির বিরুদ্ধাচরণেই আধুনিক বাংলা কাব্যের পর্বপ্রক্রম। "কারণ সৎকবিমাত্রেরই একটি সামান্য লক্ষণ এই যে—পাঠকের অভ্যস্ত চৈতন্যকে তিনি তৃপ্তি দেন না। তিনি অন্বেষণ করেন সেই প্রকরণ যেখানে তাঁর নিজস্ব অনুভূতি সমানুপাতিক সম্বন্ধে সংযুক্ত।" কিন্তু ধাঁধা লাগে এ কথা ভেবে যে আধেয় ও আধার যদি একই বস্তু হয় তবে নিজস্ব অনুভূতি-ই বা কি আর প্রকরণ-ই বা কি? তবে কি দুটি স্বতন্ত্র বস্তু? এ-প্রশ্নের সুস্পষ্ট জবাব আলোচ্য গ্রন্থে নেই, উপরন্তু প্রথম প্রবন্ধটি পড়ে মনে

হয় যে পূর্ববর্তী কবি বা কবিসমাজের অনুভূতিকে অস্বীকারেই মেলে নিজস্ব অনুভূতির সাক্ষাৎ অর্থাৎ ইতিপূর্বে অভিব্যক্ত কোনও অনুভূতির প্রতিক্রিয়া-মাত্রই হল নিজস্ব অনুভূতি, নতুন সৃষ্ট কোনও ধ্বনি নয়, তা নিতান্তই একটা প্রতিহত ধ্বনি।

আশঙ্কা হচ্ছে যে লেখকের বক্তব্যকে আমি বিকৃত ব্যাখ্যা দিচ্ছি। কিন্তু "রবীন্দ্রনাথের লিরিক-আদর্শ সামনে আছে বলেই তার বিরুদ্ধতা সম্ভবপর হয়েছিল এই বিশ ও তিরিশ দশকের কবিদের পক্ষে" বাক্যটি পড়লে মনে হয় না যে রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রমের চেষ্টা তাঁরা করেন নি, বরং রবীন্দ্রনাথের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে তাঁর ভঙ্গিগুলো খুঁটিয়ে দেখেছেন ও তার বিপরীত ভঙ্গি করেছেন। "রোমান্টিকতা ও ক্লাসিসিজম একে অপরের প্রতি বিরুদ্ধতা জানিয়েই সাহিত্যের ইতিহাসকে আবহমানকাল এগিয়ে নিয়ে এসেছে"—এ-উক্তি নিতান্তই সরলীকরণ। তাই মনে হয় যে শিল্প-সাহিত্যের এক-একটি আন্দোলনের নিজস্বতা ও বৈশিষ্ট্য পূর্ববর্তী পর্যায়টির বৈপরীত্যে বিধৃত। বস্তুত পূর্ববর্তী ধারার অস্বীকারে পরবর্তী ধারা পথ খুঁজে পায় এই নঞর্থক চিন্তা সর্বৈব ভ্রান্ত নয়, কিন্তু তার মধ্যে সত্যের অংশ স্বল্প।

বিশ বা তিরিশ দশকের কবিদের মধ্যে যাঁরা সোচ্চারে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে, তাঁরা আজ কোথায় তলিয়ে গেছেন। এই কি তবে কাব্যে রবীন্দ্রবিরোধিতার যুক্তিসিদ্ধ পরিণাম? পক্ষান্তরে জীবনানন্দের "ঝরাপালকে" সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব প্রকট যা প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের প্রতিফলিত প্রভাব; সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও অমিয় চক্রবর্তীও কাব্যচর্চা শুরু করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করে; বিষ্ণু দে একেবারেই পাশ কাটিয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথকে এবং যেখানে তাঁর পদাবলী রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবহ সেখানে তা ঋণ হিসেবেই গ্রাহ্য; সমর সেনের কবিতাতে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের প্রতি কটাক্ষ আছে, কিন্তু তা সম্পূর্ণরূপে সামাজিক দৃশ্যপটের পরিপ্রেক্ষিতে অনুধাবনীয় এবং এই পরিপ্রেক্ষিতের গুরুত্ব আরও বেড়ে গেছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে।

যে-কথ্যছন্দকে রঞ্জিতবাবু বলেছেন আধুনিক কাব্যের সামান্য লক্ষণ তা কি 'ক্ষণিকা'-তে উজ্জ্বলরূপে প্রতিষ্ঠিত নয়, কিংবা পয়ারে লেখা "বাঁশি" কবিতাতে? অবশ্য রবীন্দ্রনাথই যে আমাদের প্রথম আধুনিক কবি তাতে আজ আর বিতর্ক নেই। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য অনেক আধুনিক কবিতার প্রতি

বিরূপতা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আধুনিক কবি বলে যাঁরা এ-গ্রন্থে স্বীকৃত তাঁরা সকলেই কি সকলের কবিতার প্রতি সমান স্নেহপ্রবণ? ভুললে চলবে না এলিয়টের কবিতা প্রথম বাংলা রূপ পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের হাতে। পাউণ্ডের অনেক কবিতাও তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। চীনা ও জাপানী কাব্যাদর্শ তাঁকে শেষ জীবনে বেশি আকৃষ্ট করেছিল, আশা করেছিলেন সে-আদর্শ আধুনিক কবিদের কাছে স্বীকৃতি পাবে এবং প্রকৃতই একালের পশ্চিমী কাব্যে ওই আদর্শের রূপায়ণ বিরল নয়। বিষ্ণু দে-র কবিতাকে রবীন্দ্রনাথ সুনজরে দেখেন নি বটে, কিন্তু অমিয় চক্রবর্তীর সাক্ষ্য হতে জানতে পাই সুভাষের "যে দিনের কবিতা" রবীন্দ্রনাথকে নাড়া দিয়েছিল।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধতাকে আধুনিক বাংলা কাব্যের সামান্যলক্ষণ ঘোষণা করার পরেও শ্রীসিংহ "রবীন্দ্রনাথের পরে প্রথম স্বতন্ত্র কবি" সুধীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলেছেন, "রবীন্দ্রোত্তর যুগে তিনিই বোধহয় প্রথম যিনি কবিতা লিখতে গিয়ে সর্বদা স্মরণে রেখেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে গেলে চলবে না, তাঁকে স্বীকার করতে হবে···।" ঠিক কথা। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থের প্রবন্ধগুলির মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত আলোচনাটি সর্বাপেক্ষা যুক্তিপূর্ণ ও সুলিখিত হওয়া সত্বেও গ্রন্থের 'সূচনা'র সঙ্গে বক্তব্যের সামঞ্জস্য আনুপূর্ব রক্ষা করতে রঞ্জিতবাবু পারেন নি।

তাছাড়া সুধীন্দ্রনাথের কবিতা কি সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিমুক্ত? "ওই" শব্দটিকে দু-মাত্রা দেওয়ার জন্যে রঞ্জিতবাবু প্রচুর ধিক্কার বর্ষণ করেছেন জীবনানন্দের প্রতি, অথচ সুধীন্দ্রনাথ যখন "নরক" কবিতাতে "অগ্নি" শব্দটিকে দু-মাত্রা দেন তখন গ্রন্থকার নীরব; 'ক্রন্দসী'র প্রথম সংস্করণে "মৃত্যু"-তে সুধীন্দ্রনাথ লিখেছেন "জন্মান্তরের খেয়া ঘাটে ভীড়ে", "পরাবর্ত"তে লিখেছেন "হিরণ্ময়ের ক্ষয়ে সীসকের পরমায়ু বাড়ে"—দু-জায়গাতেই পাঁচমাত্রার পদকে ছ-মাত্রা হিসেবে গণ্য করা হলেও শ্রীসিংহ সহিষ্ণুতার চরমোৎকর্ষ দেখান। যে-শ্রুতিদোষে জীবনানন্দের ভাষা ও ছন্দের প্রাণদণ্ড হয়ে যায় সেই একই দোষযুক্ত হওয়া সত্বেও সুধীন্দ্রনাথের ভাষা ও ছন্দ আধুনিক কাব্য-আন্দোলনের বিশিষ্ট সূচনা বলে রঞ্জিত সিংহ মহাশয় কর্তৃক ঘোষিত হয় কি করে?

সুধীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে গ্রন্থকার যা যা বলেছেন তাতে আপত্তি করার কিছু নেই, আমার শুধু বক্তব্য এই যে সুধীন্দ্রনাথকে যে-সম্মান তিনি দিয়েছেন তাতে জীবনানন্দ, অমিয় চক্রবর্তী ও বিষ্ণু দে-রও সমান অধিকার আছে।

বিশেষ করে জীবনানন্দের প্রতি রঞ্জিতবাবুর বিরূপতা মর্মান্তিক। হয়তো জীবনানন্দের কবিতা শ্রীসিংহের চিত্তে সত্যিই সাড়া জাগাতে পারে না, কিন্তু কারও কারও তো পারে, আমার চিত্তে তো পারেই। ফলে আমার মনে হয়েছে জীবনানন্দের প্রসঙ্গে পাণ্ডিত্যাভিমান ও ছিদ্রান্বেষণের আগ্রহ রঞ্জিতবাবুকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

নতুবা অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গে "অনুভূতিপুঞ্জের ঐক্যবোধ", "পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বিষয়" এবং ক্রিয়াপদ ও অব্যয়ের তথা কথ্যভঙ্গির প্রয়োগ নিয়ে রঞ্জিতবাবুর আলোচনা সত্যিই বাংলা কাব্যের সমালোচনায় একটি অভিনন্দনযোগ্য সৎ প্রয়াস। কিন্তু নতুন প্রয়াসে মাত্রাজ্ঞান রাখা সর্বদা সুসাধ্য নয় বলেই হয়তো তাঁর মনে হয়েছে সুধীন্দ্রনাথে যে-পরীক্ষার সূচনা তার পরিণতি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ে, যদিও গ্রন্থটিতে এ-বিবর্তনের সুষ্ঠু চিত্র বা ধারণা মেলে না। বইটিতে পুনরাবৃত্তির দোষ ঘটেছে; আশা করি, পরবর্তী সংস্করণে বইটি পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত হবে এবং পুনরাবৃত্তিবর্জিত হবে।

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

সাম্প্রতিক ছোটগল্প

ক্লান্ত ও অশান্ত গল্প। রমানাথ রায়। বিদিশা পত্রিকা প্রকাশনী। দু'টাকা।
তালপাতার বাঁশি। প্রণয় সেন। প্রতিমা পুস্তক। দু'টাকা।
বৃন্তান্তর। চিত্ত ভট্টাচার্য। পাল পাবলিশিং কনসার্ন। তিন টাকা পঞ্চাশ।

বাংলা ছোটগল্পে সাম্প্রতিককালে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। মাত্র দু-এক দশক আগেও ছোটগল্পের যে-রীতি ব্যবহৃত হত আজ তা হচ্ছে না। কাহিনী থেকে সরে এসে, মন-বিশ্লেষণের পথে আজকের ছোটগল্প অগ্রসর হচ্ছে। একটু ঝুঁকি নিয়ে এ কথাও বলা চলে—চেতনাপ্রবাহ অধুনাতন ছোটগল্পের কম-বেশি নিয়ন্ত্রক। এ সত্য অস্বীকার ও অর্থহীন! অথচ কাহিনীকে নির্বাসনে পাঠান হয়েছে এ-ও সত্য নয়। কাহিনীই এখন একমাত্র নয়। এ পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল। অত্যন্ত স্বাভাবিক গতিতে, পূর্ব প্রস্তুতি সহ, কাহিনীর উঁচু পাড় থেকে চেতনাপ্রবাহের গভীরতায় বাংলা ছোটগল্প ঝাঁপিয়ে পড়েছে কিনা এ বিতর্কে প্রবেশ অপ্রয়োজনীয়। তবে এই পথ

পরিবর্তন অনিবার্য ছিল। আজকের সাহিত্যে, ব্যাপকতর অর্থেই, পূর্বতন অনেক ধ্যানধারণা বা বিশ্বাসের রূপান্তর ঘটেছে। জীবন থেকে সরে এসে প্রায় ঐশ্বরিক নির্লিপ্ততাসহ মানবগোষ্ঠীর সুখ-দুঃখ জীবন-মৃত্যু ইত্যাদির সম্পর্কে চরম কথা বলার দিন শেষ হয়ে গেছে কারণ আজকে পৃথিবীর পটপরিবর্তন ঘটছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। জীবনের আদিমতম সত্য ব্যতিরেকে আর সব বিশ্বাস প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে প্রতি মুহূর্তে একাকার হয়ে যাচ্ছে। আর তাই জীবনসত্যের সঙ্গেই সাহিত্যিক সত্যেরও পরিবর্তন ঘটছে দ্রুততালে। সাহিত্যে শেষ কথা বলা যায় না। তাই নতুন চিন্তা, ভাবনা, জীবনের নতুন সমস্যা ইত্যাদি কেমন করে কোন রীতিতে সাহিত্যে আনা যাবে তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলবেই।

কুড়ি বছর আগে শেষ হয়ে যাওয়া যুদ্ধের ফলাফলের উপর আমরা এখনও দাঁড়িয়ে আছি। যুদ্ধ-পরবর্তীকালের পরিবর্তিত সামাজিক মূল্যবোধ, জীবন-সম্পর্কিত মূলগত প্রশ্ন, ভঙ্গুর অর্থনীতির বাঁশবনে ডোমকানার মতো পদচারনা আমাদের অনেক সময় হতাশ করেছে। অন্যদিক থেকে, স্বদেশে স্বাধীনতা-পরবর্তীকালের অবশ্যম্ভাবী সমস্যাসমূহের উপস্থিতি, অর্থনীতির ক্ষেত্রে অনিবার্য সংঘাত, নতুন শ্রমিকশ্রেণীর জন্ম ইত্যাকার বিভিন্ন ঘটনা যে-কোনো চিন্তাশীল মানুষকেই ভাবিয়েছে। জীবনে জটিলতা বেড়েছে। সে জটিলতার প্রতিচ্ছবি সাহিত্যে অবশ্যম্ভাবী। কারণ জীবনকে অগ্রাহ্য করে সাহিত্য রচনা করা সম্ভব নয়। বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও তাই এই পালাবদল ঘটেছে। এ পরিবর্তনের সার্থকতা বা অসার্থকতার বিচার বিশ্লেষণে না গিয়ে অন্তত এ কথা বলা চলে—এ পরিবর্তনে আমাদের সামনে নতুন আলো এনে দিচ্ছে। তবে এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন এ রীতিতে লেখা সব গল্পই গল্প নয়। সেটা এ রীতির দোষ নয়।

আজকের বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে। তর্ক-বিতর্কেরও শেষ নেই। মোটকথা এই মুহূর্তে ছোটগল্প নিয়ে আমরা ভাবছি। নতুন নতুন সমস্যাকে ছোটগল্পের সমস্যা করতে চাইছি। অর্থাৎ প্রতিদিনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত মানসিকতা ছোটগল্পে আসছে। এই নতুন চিন্তা-ভাবনার বাহক ছোট-বড় কয়েকটি ছোটগল্পের পত্রিকাও বের হয়েছে ও হচ্ছে। শুধু ছোটগল্পই অনেকগুলো পত্রিকার বিষয়। শুধু কবিতা-পত্রিকা নিয়মিত বের করা নিকট অতীতের বাংলাদেশেও অসম্ভবের পর্যায়ে ছিল।

ছোটগল্প সম্পর্কে—তাও নতুন রীতির—এ সত্য আংশিক হলেও সত্য। তবে এই রীতিই শেষ কথা নয়। এর পরেও কথা আছে। সেই নতুন ও অবাঞ্ছিত পথের সন্ধানেই আধুনিক ছোটগল্পকারদের পথ-পরিক্রমা।

যে তিনটি ছোটগল্পের সংকলন নিয়ে আলোচনা করতে হবে, সে তিনটি গল্প-গ্রন্থের প্রত্যেকটি অন্যটি থেকে স্বতন্ত্র। যেহেতু প্রত্যেক প্রথম মানুষ দ্বিতীয় থেকে আলাদা সেইহেতু এঁদের চিন্তা-ভাবনার মধ্যেও পার্থক্য। এঁদের তিনজনেই প্রাত্যহিক জীবন থেকে তাঁদের বক্তব্য সংগ্রহ করেছেন। প্রকাশভঙ্গিতেই আলাদা। "ক্ষত ও অন্যান্য গল্প"-এ রমানাথ রায় সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবনকে দেখছেন। 'ক্ষত' গল্পটিতেই তাঁর এই ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। হাজার ডাক্তারী পরীক্ষা ও চেষ্টাতেও না-সারা বুড়ো আঙুলের সেই ক্ষতটিই এর নায়ককে মনে করিয়ে দিয়েছে যে, সে বেঁচে আছে। কারণ বেঁচে থাকাটা তার কাছে একটা অভ্যেসে পরিণত হয়েছিল। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনেও এই অনুভূতি সত্য। এ গল্প-গ্রন্থে দশটি ছোটগল্প আছে। প্রায় প্রত্যেক ছোটগল্পেই কিছুটা আরোপিত দুর্বোধ্যতা আছে। কখন সমুদ্রের স্বপ্ন, কখন মেঘে মেঘে ভেসে আসা ময়ূরের স্বপ্ন দেখে হঠাৎ দুঃসাহসিক ভাবনা, পরমুহূর্তের বাস্তব উপলব্ধি পরাজয়। প্রাত্যহিকতা থেকে বেরিয়ে আসবার আপ্রাণ চেষ্টাও ব্যর্থ হচ্ছে। লেখকের সামনে এই মুহূর্তে কোনো আশ্রয়স্থল নেই বলে মনে হয়। তাই একদিন অফিসে না যাবার কথা ভেবে, বাড়ির সকলের চাপে, সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে বাধ্য-হওয়া 'আবর্তনের' সোমনাথ আয়নায় নিজের ম্লান চোখ, অবসন্ন যৌবনের প্রতিচ্ছবি দেখে। কিন্তু আমাদের কাছে এই শেষ কথা নয়। প্রাত্যহিকতার সঙ্গে যুদ্ধের পরিশ্রম কোথায়? এ চেষ্টা সংগ্রাম, কিন্তু অনুপস্থিত।

"তালপাতার বাঁশি"-তে প্রণয় সেন প্রথমেই বলে নিয়েছেন, গল্প-গ্রন্থের অধিকাংশ রচনাই তরুণ বয়সের। এবং 'নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে গভীর স্নেহবশত গল্পগুলিকে[১] গ্রন্থাকারে রূপ দেওয়া হল। বলা বাহুল্য 'তরুণ বয়সে' রচনার মধ্যে কিছু কিছু শিথিলতা থাকে। তবে প্রণয় সেনের বিষয়-নির্বাচনে নিজস্বতা আছে। তাঁর গল্পের অধিকাংশ চরিত্রই নিম্ন মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র; যাদের একমুঠো আহারের জন্য জীবনপণ করতে হয়। মধ্যবিত্ত নায়কের চিন্তাবিলাসের পথে না গিয়ে অত্যন্ত সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-স্বপ্ন-বাঁচবাঁচানের জন্য সংগ্রাম, দু-সের চালের জন্য চালের বস্তার নিচে চাপা পড়া

ইত্যাদি ঘটনাই তিনি গল্পে এনেছেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন তর্কাতীত ; যে অর্থনীতির ঘোরপ্যাঁচে এ দশকের মধ্যবিত্ত যুবকের ক্লান্তি, সেই একই অর্থনীতি শ্রমিক-কৃষকের জীবনধারণের সমস্যার জনক।

প্রণয় সেন চিত্রকল্প ব্যবহার করতে ভালোবাসেন। অনেক সময় পাঠকের মনে হতে পারে, যেন চিত্রকল্পগুলোর প্রতি অত্যধিক স্নেহবশতই তিনি ব্যবহার করেছেন। এর স্রোত ঠেলে গল্পে পৌছনো পরিশ্রমের ব্যাপার হয়ে পড়ে। একটিমাত্র গল্পে এতগুলো চিত্রকল্প বা উপমা-প্রয়োগ গল্পের গতিকেও বাধা দেয়। 'শবরী' গল্প এ-ব্যাপারে স্মরণযোগ্য। 'এলোকেশী সন্ধ্যা', 'জামবাটি আকাশ', 'এক হাঁটু অন্ধকার', 'কোজাগরী চোখ', 'হলদে আগুন শর্ষে ক্ষেত' ইত্যাদি চিত্রকল্প প্রায় পর পর ব্যবহারে গল্পের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা তা প্রশ্নসাপেক্ষ।

চিত্ত ভট্টাচার্যের "দৃশ্যান্তর" অন্য ধরনের লেখা। দুটো ভৌতিক গল্প (!) সহ তেরটি গল্পের সংকলন। লেখক গল্প বলতে ভালোবাসেন। অত্যন্ত সাবলীল ভঙ্গিতেই তা বলেন। ভাষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার চেষ্টাও তিনি করেন না। এবং এই গল্প তিনি সুনিপুণভাবেই বলেন। আমাদের প্রাত্যহিক পথ চলার আশেপাশে যে হাজার মানুষের উপস্থিতি, যাদের দিকে আমরা তাকাই মাত্র, কিন্তু যাদের নিয়ে ভাবি না—সেই মানুষদের কথা চিত্ত ভট্টাচার্য গল্পে এনেছেন। এর সহজ উপস্থাপনাই এর বৈশিষ্ট্য। জীবনের গভীরতম উপলব্ধিকে সাহিত্যে উপস্থিত করাই সাহিত্যিকের কর্তব্য ; এ কর্তব্য পালনে তিনি সার্থক। এই সাধারণ মানুষের আশা-স্বপ্ন-ভালোবাসার কথাই গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে ধ্বনিত হয়েছে। কারণ এই আশা ও বিশ্বাস লেখকের নিজের উপলব্ধি। তবে ভৌতিক গল্পদুটো এ গল্প-গ্রন্থে স্থান না পেলেই বোধহয় ভালো হত। কারণ তাতে গল্প-গ্রন্থের গাম্ভীর্য বজায় থাকত।

সমরেশ রায়

পাঠকগোষ্ঠী

বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ

পৌষ সংখ্যা পরিচয়ে "বিজ্ঞান প্রসঙ্গ—পরমাণু ও অতি পরমাণু" লেখাটিতে কয়েকটি গুরুতর অসংগতি ও অজ্ঞতা চোখে পড়ল; সেগুলিতে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। যথা :—

১। লেখাটিতে আছে—"পরমাণুর অভ্যন্তরে আবিষ্কৃত হয়েছিল তিনটি কণিকা, ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন"। অতঃপর আছে, "নতুন ভাবনার মশালচি"-দের নাম, "প্লাঙ্ক, রাদারফোর্ড, নীল্‌স্ বোর"। রাদারফোর্ডকে বলা হয়েছে "পরমাণুর জনক"

"মশালচি"র অর্থ কী এখানে?

রাদারফোর্ড "পরমাণুর জনক" নন, কে জনক কারুর তা জানা নেই।

প্লাঙ্ক কোয়াণ্টামের আবিষ্কারক; এবং quantum orbits ও quantum mechanics আধুনিক পরাণু-বিজ্ঞান নিয়ন্ত্রিত করে সত্য, কিন্তু প্লাঙ্ক নিজে পরাণুর আভ্যন্তরিক গড়ন সম্বন্ধে কোনো গবেষণা বা রূপায়ণ করেন নি। তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন তাপ-বিকীরণ নিরবচ্ছিন্ন প্রকৃতির নয়, মাত্রিক। অপরপক্ষে প্রোটনের "মশালচি" রাদারফোর্ডের নাম থাকলেও ইলেকট্রনের "মশালচি" স্যর জে. জে. টমসনের নাম নেই, নিউট্রনের আবিষ্কর্তা বোটে (Bothe) ও চ্যাডউইকের (Chadwick) নাম নেই। নতুন ভাবনার "মশালচি" অনেকে তার মধ্যে অন্তত মাদাম কুরীর নাম করা সংগত ছিল, তেজস্ক্রিয়তা পরাণুর গর্ভজাত ও তার ফলে নতুন মৌলিক পরাণু-কণিকা উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে, এই মত প্রথম উপস্থিত করেন তিনিই।

২। লেখায় আছে,—"একটির নেগেটিভ অপরটির পজিটিভের সঙ্গে কাটাকুটি হয়ে পরমাণুটি বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ।"

নেগেটিভ পজিটিভ কী বস্তু কাটাকুটি হয়, বলা দরকার।

৩। আছে—"কণিকাগুলি সবই স্বাভাবিক কণিকা নয়, কতকগুলো··· স্বাভাবিকের হুবহু বিপরীত"।

স্বাভাবিকের বিপরীত ত অস্বাভাবিক বা কৃত্রিম নয়। এই বিপরীত কণিকাগুলিও ত স্বাভাবিক।

৪। লেখাটিতে আছে—"যে হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়সে নিউট্রনের সংখ্যা দুই, তাকে বলা হয় হেভি হাইড্রোজেন"।

এটি নিতান্ত প্রমাদঘটিত। যে হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়সে একটি (দুটি নয়) নিউট্রন আছে—অপরটি প্রোটন, তাকেই বলা হয় হেভি হাইড্রোজেন, H^2। আর যাতে দুটি নিউট্রন আছে সে হাইড্রোজেনকে বলা হয় Tritium, H^3।

"নিউট্রনের সংখ্যা তিন হলে ডবল হেভি হাইড্রোজেন", এ কথা নিতান্ত কাল্পনিক। তিনটি নিউট্রন সম্পন্ন হাইড্রোজেন হয় না; যতদূর আমার জানা আছে।

৫। লেখাটিতে ইউরেনিয়াম আইসোট্রোপে মোট প্রোটন নিউট্রনের সংখ্যা দেওয়া হয়েছে "যথাক্রমে ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৮ ও ২৩৯"

প্রকৃতপক্ষে ইউরেনিয়ামের প্রাকৃতিক আইসোটোপ মাত্র ৩টি,—U-২৩৪, U-২৩৫ ও U-২৩৮। এর মধ্যে U-২৩৪ এর অংশ নগণ্য; U-২৩৫ হোল মাত্র ·৭ শতাংশ (দশমিক সাত শতাংশ), আর U-২৩৮ এর হোল ৯৯·৩ শতাংশ। U-২৩৩ ও U-২৩৯ কৃত্রিম আইসোটোপ। আরও দুটি কৃত্রিম আইসোটোপ হয়, U-২৩৬, U-২৩৭; লেখাটিতে তাদের উল্লেখ নেই।

৬। অতঃপর আছে—"এর মধ্যে ইউরেনিয়াম ২৩৫ আইসোটোপই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পরমাণু শক্তি উৎপাদনের জন্য একমাত্র এই আইসোটোপই কাজে লাগে"

একমাত্র U-২৩৫ শক্তি উৎপাদনে কাজে লাগে কথাটি লেখকের অজ্ঞতা-প্রসূত। U-২৩৩ ও U-২৩৮ দুইই শক্তি উৎপাদনের কাজে লাগে; বরং সমধিক। U-২৩৮ থেকে প্লুটোনিয়াম P. U-২৩৯ তৈরী হয় ও থোরিয়াম Th-২৩২ থেকে U-২৩৩ তৈরি হয়; আর U-২৩৩ ও Pu-২৩৯ দুইই নিউট্রন সংঘাতে ভেঙে গিয়ে শক্তি উৎপাদন করে, U-২৩৫ যেভাবে শক্তি উৎপাদন করে। এদিকে যেহেতু ইউরেনিয়ামে U-২৩৮ অংশ U-২৩৫ এর শতগুণ সেহেতু U-২৩৮ আইসোটোপেরই গুরুত্ব সমধিক। মাত্র কয়েকদিন হোল ট্রম্বেতে প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রী প্লুটোনিয়াম কারখানার দ্বারোদ্ঘাটন করেছেন—সেখানে U-২৩৮ থেকে প্লুটোনিয়াম Pu-২৩৯ তৈরি হবে। সেই Pu-২৩৯ দিয়ে থোরিয়াম থেকে U-২৩৩ তৈরী হবে। পরিশেষে U-২৩৩ থেকে শক্তি উৎপাদন হবে। সুতরাং U-২৩৩ ও U-২৩৮ উভয়েরই গুরুত্ব সমধিক।

৭। লেখাটিতে এক জায়গায় আছে,—"প্রোটন ও নিউট্রনের একটি যৌথ নাম আছে, নিউক্লিয়ন"। কথাটা ঠিক হোল না; নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রে আছে বটে প্রোটন ও নিউট্রন, কিন্তু তাদের বলা হয় নিউক্লিয়ন।

৮। আর এক স্থানে আছে,—"ইলেকট্রন ও ফোটনের মধ্যে যেমন ঠোকাঠুকির সম্পর্ক"—

ঠোকাঠুকির সম্পর্কটা কী তা অস্পষ্ট। তাছাড়া নিউক্লিয়াস, প্রোটন, নিউট্রনের সঙ্গেও ফোটনের (গামা রশ্মির) ঠোকাঠুকি হয়; গামা রশ্মির গ্রহণ বর্জন হয়, অন্যান্য কণিকার উদ্ভব হয়।

৯। ইলেকট্রন, প্রোটনের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ইলেকট্রনের ভরকে একক (Unit) ধরা হয়।

ভরের আসলে দু' রকম Unit আছে, atomic mass unit (amu)—যাতে অক্সিজেন ১৬ ও হাইড্রোজেন, প্রোটন, নিউট্রন—কিঞ্চিদধিক ১, এবং electron mass (em), যাতে ইলেকট্রন ১।

১০। লেখাটিতে আছে "প্রত্যেক পরমাণুর নিজস্ব স্পন্দনের একটি মাত্রা আছে"; পুনশ্চ "পরমাণুর বিশেষ মাত্রা স্পন্দনে বিশেষ একটি রঙ"। এর সবটুকু গোঁজামিলন।

আরও অনেক কিছু আছে, বাহুল্যবোধে উল্লেখ করলাম না।

বিনীত
গিরিজাপতি ভট্টাচার্য

লেখকের নিবেদন

শ্রীযুক্ত গিরিজাপতি ভট্টাচার্যের চিঠির জন্য আমি কৃতজ্ঞ। তাঁর কাছে আমার কিছু নিবেদন আছে। সংক্ষেপে বলছি।

আমি বিশেষজ্ঞ নই, গবেষকও নই, বিজ্ঞানের একজন আগ্রহী পাঠক মাত্র—ইংরেজি পপুলার সায়েন্সের বইয়ের উপরে যাকে অনেকাংশে নির্ভর করতে হয়। তবে লক্ষ করে দেখেছি, ইংরেজিতে যাঁরা পপুলার সায়েন্সের বই লিখে থাকেন তাঁরা প্রায় সকলেই দিক্‌পাল বিজ্ঞানী—আপন আপন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ও গবেষক। বাঙালি পাঠকদের দুর্ভাগ্য, বাংলাদেশে যাঁরা বিশেষজ্ঞ ও গবেষক তাঁরা সাধারণ পাঠকদের জন্যে বড়ো একটা কলম ধরেন না। ফলে আমাদের মতো অ-বিশেষজ্ঞ ও অ-গবেষকদেরই কলম ধরতে হচ্ছে। তবে

পাঠকদের পক্ষে তার ফল খারাপ হয়েছে বলা চলে না। অন্তত সাম্প্রতিকালে বাংলাসাহিত্যে বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থের কোনো অভাব নেই। খুঁটিয়ে ঝাড়াই-বাছাই করলে প্রত্যেকটি বই থেকেই হয়তো কিছু না কিছু ভুল ত্রুটি খুঁজে বার করা যাবে। এটা কোনো নতুন কথা নয়। রামেন্দ্রসুন্দর বা রবীন্দ্রনাথের মতো অ-বিজ্ঞানীদের কথা বাদ দিচ্ছি, এমনকি অধ্যাপক বার্নালের লেখাতেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভুলত্রুটির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। তা সত্ত্বেও বই লেখা হয়েছে। বই লেখা হচ্ছে। আর তা হচ্ছে বলেই ইংরেজি-না-জানা পাঠক এখন শুধু বাংলা বই পড়েই বিজ্ঞানের খবরাখবর রাখতে পারেন। আর মুশকিলও হয়েছে এইখানে। ওস্তাদের সাধা গলার সুর আর আগ্রহী শ্রোতার অনুকারী গলার সুর শুনতে একরকম মনে হলেও সূক্ষ্ম কারুকর্মের ক্ষেত্রে কিছুতেই সমান দরের নয়। তেমনি সমান দরের নয় বিশেষজ্ঞ-গবেষকের লেখা ও আগ্রহী পাঠকের লেখা। শেষোক্তজন ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দেবেই, সরলীকরণ বা অতিশয়োক্তিকেও অন্যায় মনে করবে না। অনেক সময়ে আবার বিজ্ঞানের নীরস বিষয়কে সরস করে তোলবার জন্যেও কিছুটা ভাবাবেগ ও সরলীকরণ বা অতিশয়োক্তির প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

এই কারণেই আমি কেন আমার লেখায় 'কাটাকুটি', 'ঠোকাঠুকি', 'মশালচি' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছি তার কোনো কৈফিয়ৎ দিতে রাজি নই। আসল কথা, এই শব্দগুলো ব্যবহার করে বিষয় সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি করা গিয়েছে কিনা। গিরিজাপতিবাবু যদিও শব্দগুলোর অর্থ জিজ্ঞেস করে আমাকে ধমক দিতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু তাঁর চিঠি পড়েই বোঝা যাচ্ছে (উদ্ধৃতি-চিহ্নের মধ্যে ব্যবহার করা সত্ত্বেও) শব্দগুলো তাঁর কাছে অস্পষ্ট থাকে নি। লেখক হিসেবে এইটুকুতেই আমি খুশি। তবে আমার এই লেখাটি যদি প্রসঙ্গকথা না হয়ে বিজ্ঞান-বিষয়ক থিসিস হত (আমার লেখাটি এমনকি একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধও নয়) তাহলে আমি হয়তো এই শব্দগুলো ব্যবহার করতাম না।

নাম বাদ গিয়েছে। অবশ্যই গিয়েছে, এমন কি আইনস্টাইনের নামও। তাতে কিছুই অপ্রমাণিত হয় নি। আমার এই প্রসঙ্গ কথায় ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। শুধু অবস্থানগত নিশানা দেবার জন্যে দু-একটি ফলক চিহ্নের উল্লেখ করেছি মাত্র। উল্লেখটা কোনো ক্ষেত্রেই বিবরণ নয়। একান্তভাবেই নিশানা। আগ্রহী পাঠক এই নিশানা ধরে অগ্রসর

হলে সবকটি ফলকচিহ্নের সন্ধান পেতে পারেন। কলকাতাকে উপস্থিত করার জন্য হাওড়া ব্রিজ বা মনুমেণ্ট চিহ্নিত করাই যথেষ্ট, তাতে কলকাতার অন্য কীর্তিগুলো বাতিল হয়ে যায় না।

গিরিজাপতিবাবু দফাওয়ারী অভিযোগ উপস্থিত করেছেন। প্রথম দফার জবাবে পরে আসছি। দ্বিতীয় দফার জবাব দেওয়া হয়ে গিয়েছে। তারপরে—

তিন নম্বর॥ গিরিজাপতিবাবু "বিপরীত" শব্দটিতে এসে উদ্ধৃতি শেষ করে দাড়ি দিয়েছেন। মূল লেখায় সম্পূর্ণ বাক্যটি এই: "আর সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, কণিকাগুলো সবই স্বাভাবিক কণিকা নয়, কতকগুলো আছে যা স্বাভাবিকের হুবহু বিপরীত—আয়নায় প্রতিফলিত প্রতিচ্ছায়ার মতো, যাদের নাম দেওয়া হয়েছে বিপরীত-কণিকা।" আমি দাবি করছি না যে এই সম্পূর্ণ বাক্যে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা গিয়েছে। স্বাভাবিকের বিপরীতও অবশ্যই স্বাভাবিক। কেন স্বাভাবিক তা এক লাইনে ব্যাখ্যা করা চলে না। তাই বিপরীত-কণিকা নিয়েই পৃথক একটি লেখা লিখব ঠিক করেছিলাম। আমার এই লেখার শেষ লাইনে সেই ঘোষণাও থেকে গিয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে জানিয়ে রাখি, এই লেখাটির একটু ইতিহাস আছে। সোভিয়েত সংবাদ দপ্তর থেকে আমাদের হাতে বিপরীত-বস্তু (anti-matter) সম্পর্কে একটি লেখা আসে। আমার উপরে ভার পড়ে লেখাটি বাংলায় উপস্থিত করার। আমার মনে হয়, বিপরীত-বস্তুকে বোধগম্যরূপে উপস্থিত করতে হলে পরমাণু ও অতি-পরমাণু সম্পর্কে বলে নেওয়া দরকার। আমার এই ভাবনারই ফল এই লেখাটি। আমার লেখার শেষ অনুচ্ছেদটি পড়লেই বোঝা যায় যে পরের লেখাটি বিপরীত-বস্তু সম্পর্কিত। গিরিজাপতিবাবুও নিশ্চয়ই তা বুঝেছেন।

চার নম্বর॥ এটি সত্যিই প্রমাদ। এমন প্রাথমিক ধরনের একটি তথ্য পরিবেশনে এই প্রমাদ কেন আমার হল বুঝতে পারছি না। খুব সম্ভবত সবচেয়ে সহজ কথা বলতে গিয়েই সবচেয়ে বড়ো ভুল হয়ে থাকে। তবে ছাপার অক্ষরে লেখাটি পড়ে এই প্রমাদ আমি নিজেই ধরতে পারতাম ও পরবর্তী সংখ্যায় সংশোধন করতাম।

পাঁচ নম্বর॥ উল্লেখ থাকা উচিত ছিল।

ছয় নম্বর॥ আমি বলতে চেয়েছিলাম, ইউরেনিয়ামের স্বাভাবিক আইসোটোপগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ইউরেনিয়াম ২৩৫,

কারণ "এখনো পর্যন্ত একমাত্র এই আইসোটোপটিতে চেইন রিঅ্যাকশন ঘটানো গিয়েছে।" (এই অংশটুকু গিরিজাপতিবাবু তাঁর উদ্ধৃতিতে বাদ দিয়েছেন।) পরমাণু-শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে secondary fuel নিয়ে আলোচনা তোলার কোনো উপলক্ষ আমার লেখায় নেই। তবুও স্বীকার করছি, আমি যেভাবে আলোচনা করেছি তার বিরুদ্ধে অস্পষ্টতার অভিযোগ আনা চলে, যদিও প্রসঙ্গটি আমার আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট নয়।

সাত নম্বর॥ এটি আমার ভুল নয়, ছাপার ভুল। আমি লিখেছিলাম 'নিউক্লিয়ন', কিন্তু নিউক্লিয়স শব্দ এর আগে এতবার আছে যে যিনি প্রুফ দেখেছেন তাঁর মনে হয়েছে যে শব্দটি হবে নিউক্লিয়স (গিরিজাপতিবাবু আরো একটি বাড়তি আ-কার জুড়ে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, পরিচয়-এর প্রুফ-রীডার এতটা ভুল করেন নি)। এই ভুলটিও নিশ্চয়ই ধরা পড়ত।

আট নম্বর॥ সম্পর্কটা আগেই অনেকখানি জায়গা নিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ঠোকাঠুকি শব্দতে যদি আপত্তি থাকে সে-কথা আলাদা। একই পৃষ্ঠায় একটু উপরের দিকে ঠোকাঠুকির বদলে ঘাতপ্রতিঘাত শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আপত্তিটা কিসে? পরবর্তী তথ্যটি অমন এক লাইনে যুক্ত করা চলে না বলেই বাদ দিয়েছি। তাতে মূল বিষয়টিকে উপস্থিত করার দিক থেকে কোনো ক্ষতি হয় নি।

নয় নম্বর॥ বেশ তো।

দশ নম্বর॥ প্রসঙ্গ কথায় লেখকের অবস্থা অনেকটা বেতারে যাঁরা খেলার ধারা-বিবরণী বলেন তাঁদের মতো। বলের উপরেই এতখানি নজর দিতে হয় যে খেলার মাঠের আরো অনেক ঘটনার আভাসমাত্র দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। তাকে যদি "গোঁজামিলন" বলতে হয়, তা হয়ে দাঁড়ায় প্রায় একটি অসন্তোষের বাতিক।

রাদারফোর্ডকে পরমাণুর জনক বলাতে আপত্তি উঠেছে। নীল্‌স্ বোরকেও তো পরমাণুর জনক বলা হয়ে থাকে (গিরিজাপতিবাবু বলেছেন, পরমাণুর কে জনক কারুর তা জানা নেই—তা সত্ত্বেও)। যে-অর্থে নীল্‌স্ বোর পরমাণুর জনক, সেই অর্থে যদি রাদারফোর্ডকেও পরমাণুর জনক বলি তাহলে গিরিজাপতিবাবু নিশ্চয়ই আপত্তি তুলবেন না।

তবুও আপত্তিটি মেনে নিতে পারি যদি গিরিজাপতিবাবু একটি পরম

শোনেন। গল্পটি আমার নয়, রবীন্দ্রনাথের। তাঁর ভাষাতেই বলি : "কোনো রাজপুত গোঁফে চাড়া দিয়া রাস্তায় চলিয়াছিল। একজন পাঠান আসিয়া বলিল, লড়াই করো। রাজপুত বলিল, খামকা লড়াই করিতে আসিলে, ঘরে কি স্ত্রী পুত্র নাই। পাঠান বলিল, আছে বটে, আচ্ছা তাহাদের একটা বন্দোবস্ত করিয়া আসি গে। বলিয়া বাড়ি গিয়া সব কটাকে কাটিয়াকুটিয়া নিঃশেষ করিয়া আসিল। পাঠান দ্বিতীয়বার লড়াইয়ের প্রস্তাব করিতেই রাজপুত জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা ভাই, তুমি যে লড়াই করিতে বলিতেছ, আমার অপরাধটা কী। পাঠান বলিল, তুমি যে আমার সামনে গোঁফ তুলিয়া আছ, সেই অপরাধ। রাজপুত তৎক্ষণাৎ গোঁফ নামাইয়া দিয়া কহিল, আচ্ছা ভাই, গোঁফ নামাইয়া দিতেছি।" আমিও গোঁফ নামিয়ে 'জনক' শব্দটি প্রত্যাহার করছি ও বিপরীত-বস্তু সম্পর্কিত লেখা থেকে নিবৃত্ত হচ্ছি। গিরিজাপতিবাবুকে অনুরোধ তিনি এবার পরিচয়-এর জন্যে বিপরীত-বস্তু সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখুন।

অমল দাশগুপ্ত

আন্তর্জাতিক গল্প সংখ্যা

সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, জাপান

আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স

ইন্দোনেশিয়া, যুগোস্লাভিয়া, জার্মানি

জেপা নদীর সেতু : ইভো আন্দ্রিচ

চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গারি,

ইতালী, তুরস্ক, বর্মা, ইজিপ্ট,

বুলগেরিয়া, নাইজেরিয়া

পরিচয়

আন্তর্জাতিক গল্প সংখ্যা

বর্ষ ৩৪ । সংখ্যা ৮

ফাল্গুন, ১৩৭১

সূচীপত্র

প্রচ্ছদপট : সুবোধ দাশগুপ্ত

সম্পাদক

গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

পরিচয় (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত

পরিচয়

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের
৮ ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

১। প্রকাশের স্থান—৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

২। প্রকাশের সময়-ব্যবধান—মাসিক

৩। মুদ্রক—অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, ভারতীয়, ৪০, রাধামাধব সাহা লেন, কলিকাতা-৭

৪। প্রকাশক— " " " "

৫। সম্পাদকদ্বয়—(ক) গোপাল হালদার ; ভারতীয়
(খ) মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ; ভারতীয়
২৮।৩ হিন্দুস্থান পার্ক, কলকাতা-২৯

৬। পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেডের যে সকল অংশীদার মূলধনের একশতাংশের অধিকারী তাঁদের নাম ও ঠিকানা :

১। গোপাল হালদার, ফ্লাট নং ১৯ ; ব্লক "এইচ", সি. আই. টি. বিল্‌ডিংস্, ক্রিস্টোফার রোড, কলিকাতা-১৪। ২। সুনীলকুমার বসু, ৭৩।এল, মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা-২৯। ৩। অশোক মুখোপাধ্যায়, ৭ ওল্ড বালিগঞ্জ রোড, কলিকাতা-১৯। ৪। হিরণকুমার সান্যাল, ৮ একডালিয়া রোড, কলিকাতা-১৯। ৫। সাধনচন্দ্র গুপ্ত, ২৩ সার্কাস এভিনিউ, কলিকাতা-১৭। ৬। স্নেহাংশুকান্ত আচার্য, ২৭ বেকার রোড, কলিকাতা-২৭। ৭। সুপ্রিয়া আচার্য, ২৭ বেকার রোড, কলকাতা-২৭। ৮। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ৫বি ডাঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯। ৯। সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ১।৩ ফার্ন রোড, কলকাতা-১৯। ১০। শীতাংশু মৈত্র, ১।১।১ নীলমনি দত্ত লেন, কলকাতা-১২। ১১। বিনয় ঘোষ, ৪৭।৪ যাদবপুর সেন্ট্রাল রোড, কলকাতা-৩২। ১২। সত্যজিৎ রায়, ৩ লেক টেম্পল রোড, কলকাতা-২৯। ১৩। নীরেন্দ্রনাথ রায়, ৪৮।৭এ বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১৯। ১৪। হরিদাস নন্দী, ২৯এ কবির রোড, কলকাতা-২৬। ১৫। ধ্রুব মিত্র, ২২ বি সাদার্ন এভিনিউ, কলকাতা-১৯। ১৬। শান্তিময় রায়, ৯৭ বালিগঞ্জ গার্ডেনস, কলকাতা-১৯। ১৭। শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, ৭ ভোতার লেন, কলকাতা-১৯। ১৮। স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য। ১৯। নিবেদিতা দাশ, ৫৩বি গড়চা রোড, কলকাতা-১৯। ২০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ৯০।১ বৈঠকখানা রোড, কলকাতা-৯। ২১। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ৩ শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট,

যুগোস্লাভ

ইভো আন্দ্রিচ

জেপা নদীর সেতু

১৯৬১ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারের সম্মান লাভ করে ডক্টর ইভো আন্দ্রিচ যুগোস্লাভিয়ার সাহিত্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আন্দ্রিচ জাতিতে সার্ব ও বসনিয়ান, জন্ম ১৮৯২ সালে। গরীব কারিগরের ছেলে আন্দ্রিচ ছাত্রাবস্থায় জাতীয় বিপ্লবী যুব সংগঠনের আন্দোলনে যোগ দেন, সেই কারণে নানা নির্যাতন সহ্য করতে হয়, কয়েকবার জেলেও যেতে হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর আন্দ্রিচ দেশের কূটনৈতিক বাহিনীতে যোগ দেন, বহু দেশে কাজ করার পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভের পূর্ব মুহূর্তে তিনি বার্লিনে যুগোস্লাভ কূটনৈতিক প্রতিনিধি ছিলেন। নাৎসী পদানত বেলগ্রেডে বসেই আন্দ্রিচ তাঁর বিখ্যাত বসনিয়ান উপন্যাসত্রয়ী রচনা করেন। এই উপন্যাসগুলির মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত 'দ ব্রিজ্ অন্ দ দ্রিনা'।

উজীর-এ-আজম্ ইউসুফ তখ্ত্-এ অধিষ্ঠিত হবার চার বছর বাদে এমন এক গুনহা করলেন যে বিরুদ্ধ পক্ষ কোপ বুঝে কোপ মারল। ফলে তাঁর মুখ দেখাবার জো রইল না, সুলতানের চোখে তিনি খাটো হয়ে গেলেন। শীত গেল, বসন্ত এল—কিন্তু কারাগারের কপাট আর খোলে না। খোদাবন্দ্-এর কাছ থেকে দরখাস্ত না-মঞ্জুর হয়ে ঘুরে আসে। এমন অদ্ভুত বিশ্রী রকমের একটা বসন্ত সচরাচর দেখা যায় না। শীতে ভেজা স্যাঁতসেঁতে আকাশ যেন সূর্যের চোখ টিপে ধরেছে। অবশেষে মুহরম-এর মাস এলে পর ইউসুফ বেকসুর খালাস হয়ে জেলখানা থেকে বেরোলেন। জীবন আবার চলতে লাগল অভ্যস্ত খাতে—সে জীবন যেমন জমকালো তেমনি একঘেয়ে রকমের নির্বঞ্ঝাট।

কিন্তু সেই যে শীতের মাসগুলির স্মৃতি কি চট করে মন থেকে মুছে ফেলা যায়? জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে, মান-অপমানের মাঝখানে সে সময় ছিল এক-চুল মাত্র ব্যবধান। সেই দুর্দিনের স্মৃতি এখনও যেন উজীর এ আজম্-এর বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে আছে। তাই তাঁর কপালের চিন্তার বলিরেখা ও মেজাজ নরম। দুঃখের ধিকি ধিকি আগুনে একবার যারা জ্বলেছে, তাদের চোখে মুখে চলনে বলনে একটা কেমন যেন চিহ্ন থেকে যায়। নির্জন কারাগারে যখন তাঁর লাঞ্ছিত জীবনযাপনের পালা চলেছে, সে সময় উজীরের মনে যে-ছবি সব সময় ভেসে উঠত সে হল তাঁর জন্মস্থান ও শৈশবের ছবি। যখন বর্তমান কালের বোঝা আমাদের পক্ষে দুর্বহ হয়ে ওঠে, আমরা অতীতের সুখস্মৃতি শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরি। উজীরের মনে পড়ত তাঁর বাপমায়ের কথা। বেচারিরা কখনও সুখের মুখ দেখে যেতে পারে নি। যখন তারা মারা গেল তখন তাদের ছেলে সুলতানের ঘোড়াশালে সামান্য কর্মচারী মাত্র। তাদের মৃত্যুর বহুকাল বাদে উজীর অবশ্য মর্মর পাথরে তাদের কবর বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন। হ্যাঁ, জন্মস্থান বসনিয়া জেলায় জেপা নামধেয় একটি গণ্ডগ্রামের কথা তাঁর থেকে থেকে মনে পড়ত যদিচ জীবিকার ধান্ধা তাঁকে দেশছাড়া করেছিল মাত্র নয় বছর বয়সে।

দুঃখে দুর্দিনে উজীরের ভাবতে ভালো লাগত সুদূর বসনিয়ার সেই জেপা নামধেয় গণ্ডগ্রামের কথা। সেখানে প্রতি ঘরে ঘরে তাঁর নাম নিয়ে নিত্য গুণকীর্তন। কনস্তান্তিনোপল্-এ এই গাঁয়েরই ছেলে হয়ে তিনি যে প্রচুর মান সম্ভ্রমের অধিকারী হয়ে সুখে বসবাস করছেন—সেই প্রতিফলিত গৌরবে প্রত্যেকটি গ্রামবাসী গৌরবান্বিত। আহা, তারা তা জানে না, সম্ভবত অনুমানও করতে পারে না কত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে কত কাঁটা পায়ে দলে তবে না তিনি সম্মানের উচ্চচূড়ায় প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছেন।

যে মহরমের সময় জেল থেকে উজীর ছাড়া পেলেন, বসনিয়ার কিছু বাসিন্দা সে সময় কনস্তান্তিনোপল এল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। উজীরের প্রশ্ন জিজ্ঞাসার যেন অন্ত নেই—তারাও সাধ্যমতো জবাব দিল। ইনকিলাবের মুখে যুদ্ধবিগ্রহ হয়ে গেলে পর সারা দেশে যে অরাজকতা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রকট হয়ে ছিল, সেই সব কথা তারা সবিস্তারে বলল। উজীর ফরমান দিলেন জেপায় তাঁর যেসব আত্মীয় কুটুম্ব এখনও বেঁচে আছে তাদের জন্য যেন প্রভূত পরিমাণে অর্থ ও রসদ পাঠানো হয়। সেই সঙ্গে তিনি জানতে চাইলেন জেপায়

কোনো বারোয়ারি ইমারত গড়ে তোলার প্রয়োজন আছে কিনা—এমন কোনো ঘরবাড়ি, যা নাকি পাঁচজনের কাজে লাগে। উজীরকে বলা হল শেতকীচদের চারটে বাড়ি যদিচ দাঁড়িয়ে আছে, ওই খানদানী পরিবারের এখন নিতান্তই দুরবস্থা। কেবল ঝেপা গাঁয়ে নয়, সমগ্র জেলায় এখন নিদারুণ দৈন্যদশা; মসজিদ পরিণত হয়েছে জীর্ণ ভগ্নস্তূপে, তবে সবচেয়ে শোচনীয় ব্যাপার হল এই যে নদী-পারাপারের জন্য একটা সাঁকো পর্যন্ত নেই।

ঝেপা গ্রামটা একটা পাহাড়ের কোল ঘেঁষে। সামনেই ঝেপা নদী মিশেছে ক্ষুরধার ত্রীণা নদীর সঙ্গে। এই দুই নদীর সংগম হয়েছে যেখানে তারই পঞ্চাশ বিঘৎ পরিমাণ উপর দিয়ে পার হয়ে গেলে পর ভিসেগ্রাড্ যাবার একমাত্র সদর রাস্তায় পা দেওয়া যায়। যত শক্ত কাঠের সাঁকোই তৈরি করা যাক না কেন, দুদিন যেতে না যেতে জলের তোড়ে সে-সাঁকো ভেসে যায়। পার্বত্য নদী ঝেপার স্বভাব বোঝা ভার। হঠাৎ কোনো একদিন ফুলে ফেঁপে রেগে মেগে বড়ো বড়ো কাঠের গুঁড়ি ও তক্তা অবলীলায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল। আবার ঝেপা যদি বা শান্ত থাকে তো ত্রীণা ওঠে ফোঁস করে। আচমকা ত্রীণার জলের ধাক্কা খেয়ে ঝেপার মেজাজ যায় বিগড়ে। এ রকম অবস্থায় তার গতি রোধ করে ইঁট-কাঠের সে সাধ্য কই? শীতের মরসুমে আবার অন্য রকম সমস্যা—হোলদা নদীর স্রোত স্তব্ধ, সাঁকোর উপরটা বরফ জমে এমন পিছল হয়ে যায় যে মানুষে পশুতে পিছলে পড়ে ক্রমাগত আছাড় খায়।

সুতরাং কেউ যদি একটা শক্ত ও স্থায়ী রকমের সেতু তৈরি করে দিতে পারে, তাহলে ঝেপার পক্ষে, জেলার পক্ষে তার বড়ো উপকার আর কিছু হতে পারে না।

উজীর মসজিদে নমাজ পড়ার জন্য ছটি গালিচা উপহার দিলেন আর মসজিদের সামনে তিন মুখো একটা ফোয়ারা তৈরি করার জন্য প্রচুর দিনার চাললেন। সেই সঙ্গে কথা দিলেন ঝেপা-ত্রীণার সংগম-স্থলের উপর দিয়ে তিনি একটি পাকা পাথরের সেতু তৈরি করিয়ে দেবেন।

সে-সময় কনস্তান্তিনোপল শহরে একজন ইতালীয় স্থপতির বেজায় নামডাক—ওরকম দক্ষ স্থপতি নাকি সচরাচর দেখা যায় না। রাজধানীর উপকণ্ঠে একাধিক সেতু তৈরি করে তিনি প্রচুর সুনাম অর্জন করেছেন। উজীরের খাজাঞ্চি এই স্থপতিকে তলব করে পাঠালেন এবং দু-জন সিপাহী-শলাহর সঙ্গে তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন বসনিয়ায়। ভিসেগ্রাড্-এর কৌতূহলী জনতা দেখতে

এল এই বিখ্যাত ইতালীয় স্থপতিকে। দেখল বয়সের ভারে পিঠ নুয়ে পড়েছে, মাথার চুল শাদা, কিন্তু চোখে মুখে কেমন যেন একটা তারুণ্যের আভা। স্থপতি এসে ঝুঁকে পড়ে—সাঁকোর তলার বিরাট বিরাট পাথর টিপেটুপে দেখতে লাগল, কখনও বা একখণ্ড সুরকি খসিয়ে হাতের তেলোয় গুঁড়িয়ে নিল, এক টিপ সেই গুঁড়ো মশলা জিবে ফেলে বেশ যেন তারিয়ে চেখে দেখল, পা ফেলে ফেলে আন্দাজ মতন মাপ নিতে লাগল সাঁকোর উপরকার তক্তাগুলোর।

অতঃপর কিছু দিনের মতো স্থপতি উধাও। শোনা গেল তিনি গেছেন বানজা—সেখানে আছে চুনাপাথরের খাত। ভিসেগ্রাড-এর সাঁকোর ভিত্তি এইসব চুনাপাথর দিয়ে তৈরি। বহুকাল অব্যবহারের ফলে খনির অবস্থা শোচনীয়; খোকরে খোকরে জলধোওয়া মাটি পুরু হয়ে জমেছে, তারই মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে যত রাজ্যের আগাছা। স্থপতি একদল দিনমজুর নিয়ে এলেন খাত থেকে পাথর তুলে নেবার উদ্দেশে। বেশ কিছুদিন খোঁড়াখুঁড়ির পালা চলল। অবশেষে এমন একটা স্তরে গিয়ে পৌছানো গেল যেখানে পাথরের পরত যেমন চৌড়া তেমনি শক্ত; যেমন মসৃণ তেমনি শাদা ধবধবে। সাঁকোর ভিত্তিতে যে-পাথর লাগানো হয়েছিল তার সঙ্গে এর তুলনাই হয় না।

এবার স্থপতি দ্রীণার ধারা বেয়ে চললেন জেপা নদীর দিকে—একটা জায়গা বেছে নিলেন ঘাট বাঁধার জন্য। এই ঘাটে কাটা পাথর এনে ফেলা যাবে। এই সব প্রস্তুতির পর দুজনের মধ্যে একজন সিপাহী-শলার হিসাব ও নক্সার কাগজপত্র নিয়ে কনস্তান্তিনোপল-এ ফিরে গেল উজীরের কাছে।

স্থপতি রয়ে গেলেন। ভিসেগ্রাড ও জেপায় যেসব সম্পন্ন খ্রীষ্টীয় পরিবার ছিল তারা খুব সাধ্যসাধনা করল, কিন্তু তিনি কিছুতেই অতিথি হয়ে তাদের বাসায় থাকতে রাজি হলেন না। উজীরের সিপাহি একজন ছিল তাঁর সঙ্গে, আর ছিল ভিসেগ্রাড-এর একজন দোভাষী কেরানী। এই দুজনের সাহায্যে তিনি দ্রীণা ও জেপার সংগম-স্থলের কিঞ্চিৎ উপরে একটি টিলার উপর কাঠের একটা কুটীর বানালেন। এই কুটীরে তিনি বসবাস করেন, নিজের রান্নাবান্না নিজেই করেন। স্থানীয় কিষাণদের কাছ থেকে তিনি ডিম কেনেন, ননীমাখন পনীর কেনেন, পেঁয়াজ কেনেন, আর কেনেন আখরোট বাদাম কিসমিস খোবানী। মাংস তিনি নাকি আদৌ কিনতেন না। সারাদিন বসে বসে হয় নক্সা আঁকছেন নয় তো ভিন্ন ভিন্ন ধরনের চুনাপাথর ভেঙে ভেঙে পরীক্ষা

করে দেখছেন। কখনো আবার সারাদিন কেটে যেত মেপা নদীর গতি ও ঢেউ দেখে দেখে।

উজীরের সিপাহী অবশেষে ফিরে এল তাঁর পরোয়ানা নিয়ে। সেতু বাঁধার কাজ শুরু করার জন্য তিনি হুকুম পাঠিয়েছেন ও সেই সঙ্গে পাঠিয়েছেন স্থপতির হিসেবমাফিক বরাদ্দ টাকার এক-তৃতীয়াংশ। কাজ শুরু হল, কিন্তু স্থপতির কাজের মাথামুণ্ডু স্থানীয় লোকেরা বিন্দুমাত্র বুঝে উঠতে পারে না। অদ্ভুত তাঁর কাজের রীতি-পদ্ধতি, আর যে-ব্যাপারটা গড়ে তোলা হতে লাগল তার সঙ্গে সেতুর চেহারার একটুও মিল নেই। সর্বপ্রথম প্রকাণ্ড ভারি ভারি দেবদারু গাছের গুঁড়ি এনে তির্যকভাবে পর পর খাড়া পুঁতে ফেলা হল নদীগর্ভে। তারপর দুই সারি এই রকম খুঁটির মধ্যে ফেলা হল আঁটি বাঁধা তক্তার উপর তক্তা। ফাঁক যাতে না থাকে সেজন্য এইসব আঁটির মধ্যেকার ফাঁক ভরে দেওয়া হল মাটি থেকে। এই ভাবে একটা বাঁধের সৃষ্টি হওয়ায় নদীর জলের ধারা ভিন্ খাতে বইতে শুরু করল এবং নদীগর্ভের অর্ধেক অংশ প্রায় শুকোতে শুরু করল। এই কাজ সবে শেষ হয়েছে এমন সময় পাহাড়ের মাথায় ঝেঁপে বৃষ্টি নামল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মেপা নদী ফুলে ফেঁপে উঠল। সেই রাত্রেই বাঁধের মধ্যখান ভেদ করে, তোড়ের মাথায় মেপা ভাসিয়ে নিল খুঁটি তক্তা সব কিছু। পরের দিন নদীর চেহারা আবার শান্ত শিষ্ট—যদিচ বাঁধ গেছে ভেঙে ও ভাসিয়ে নেবার বস্তু ভেসে গেছে। গাঁয়ের লোক ও মজুরেরা বলাবলি করতে লাগল এ-নদীকে কি কখনো সেতু দিয়ে বাঁধা যায়! কিন্তু তিন দিন যেতে না যেতেই স্থপতি হুকুম দিলেন আবার খুঁটি পোঁতা হোক নদীর গর্ভে। এবার পুঁততে হবে আরো গভীরে। আবার আঁটি আঁটি তক্তা ফেলা হল, বাঁধ লেপা হল সুন্দর পরিপাটি করে। এবার জল বাঁধা পড়ল। বালি খুঁড়ে খুঁড়ে মজুরেরা মেপা নদীর পাথরের তলটুকু খুঁজে পেল। এবার সে পাথরে সমানতালে ঘা পড়ল ছেনি ও হাতুড়ির। মোটা মোটা পাথরের খণ্ড সরিয়ে মশলার আস্তর লাগানোর ব্যবস্থা হল। এই সব পরিখায় সেতুর ভিত্তিস্থাপন করা হবে।

সব ব্যবস্থা যখন তৈরি, তখন বানজা থেকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের তাল এসে পৌছুল ঘাটে, আর এল হার্জেগোভিনিয়া ও ডালমেশিয়া থেকে একদল রাজমিস্ত্রি। এরা এসে বাসা বাঁধল নদীর ধারে। বাসার সামনে বসে বাটালি দিয়ে ছুলতে লাগল এই সব পাথরের তাল। ময়দাপেষা মজুরদের

মতো তাদের গায়ে মাথায় গুঁড়ো পাথরের ধুলো লেগে শাদা ধবধবে হয়ে উঠল। স্থপতি সর্বক্ষণ তাদের ধারে কাছে ঘুর ঘুর করে বেড়ায়, পালিশ করা কাটা পাথরগুলো একবার আড়াআড়ি মেপে দেখে, আবার সবুজ সুতোর প্রান্তে সীসের গোলক বাঁধা ওলনদড়ির সাহায্যে দেখে নেয় লম্বালম্বি মাপটা কেমন হল।

দেপা নদীর দুই ধারেই খাড়া পাহাড় সোজা উঠেছে। মিস্ত্রিরা প্রচুর অধ্যবসায়ে এই দুই পারেব পাথর কেটে কেটে ভিৎ গাঁথার ব্যবস্থা করল। এত শত তোড়জোড় করার পর দেখা গেল টাকা গেছে ফুরিয়ে। রাজমিস্ত্রি ও মজুরদের মেজাজ বিগড়ে গেল, গাঁয়ের লোক মাথা নেড়ে বলল যে ও-সেতু কখনো তৈরি হবার নয়। কনস্তান্তিনোপল-ফেরতা কেউ কেউ বলল রাজধানীতে জোর গুজব নাকি উজীরের কপাল আবার ভেঙেছে, আবার নাকি রদবদল হবে। আসলে খাস খবরটা এই যে উজীরের মনে মনে তখন একটা ঋতু বদলের পালা চলেছে। তিনি একা একা খাস দরবারে বসে বসে কী যে ভাবেন কেউ জানে না, কেউ তাঁর নাগাল পায় না। দেপার কথা দূরে থাক, খোদ কনস্তান্তিনোপল-এর রাজকার্যে পর্যন্ত তাঁর যেন মন নেই। তথাচ দেখা গেল কিছু দিন বাদে উজীরের সিপাহী-শান্ত্রী এসে পৌঁছুল টাকার থলি নিয়ে। আবার কাজ শুরু হল।

সন্ত দিমিত্রিয়ে তিথির পক্ষকাল আগে, পুরানো সাঁকোর উপর দিয়ে সন্তর্পণে যারা দেপা নদীর এপার থেকে ওপার গেল, তারা সর্বপ্রথম দেখতে পেল নদীর দু-ধারের কালো পাথরের কোল ঘেঁষে উঠছে পালিশ করা শাদা পাথরের মসৃণ দেয়াল—চারদিকে তার ভারা বাঁধা যেন মাকড়সার জাল। তারপর থেকে সেতু প্রস্তুতের কাজ শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে যেতে লাগল। এর কিছুদিন বাদে দেপা অঞ্চলে হল প্রথম তুষারপাত। কাজে ছেদ পড়ল, মিস্ত্রি মজুরেরা শীতের সমাগমে আপন আপন দেশে চলে গেল। রয়ে গেল কেবল সেই স্থপতি। তাঁব মুখ বড় একটা দেখা গেল না, তিনি তাঁর কুটিরে বসে ক্রমাগত আঁক কষছেন, নক্সা আঁকছেন। ঘরের বাইরে তিনি পা দিতেন না যে এমন নয়—প্রায় তাঁকে দেখা যেত সেই প্রাচীরের ধারে কাছে—ঝুঁকে পড়ে তিনি দেখছেন রাজমিস্ত্রিরা ঠিকমতো কাজ করেছে কি না। বসন্ত যখন আগতপ্রায়, বরফ যখন ফাটতে গলতে শুরু করেছে, সে সময়টা তো তিনি একপ্রকার বাইরে বাইরেই কাটাতেন—কখনো ভারা দেখছেন, কখনো সাঁকোর

দিকে তাকাচ্ছেন চিন্তিত মুখে। রাতের অন্ধকারেও তাঁকে কেউ কেউ দূর থেকে দেখেছে—হাতে একটা জলন্ত মশাল নিয়ে তিনি ঘুরে ঘুরে কী জানি কি সব দেখছেন।

সন্ত জর্জ তিথির কিছুদিন বাদে মিস্ত্রি মজুরেরা সব ফিরে এল। আবার শুরু হল কাজ। কাজ শেষ হল যখন তখন গ্রীষ্মের মাঝামাঝি। মাকড়সার জাল গুটিয়ে নেয়া হল, খুঁটো তক্তার জঞ্জালের মধ্য থেকে বেরিয়ে এল এপার ওপারের পাহাড় যুক্ত করা এক পান্নার সেতু—শুভ্র, সুকুমার, তম্বঙ্গী।

এই অরণ্যসংকুল জনবিরল অঞ্চলে এমন একটি আশ্চর্য সৃষ্টি ঘটতে পারে—এ যেন কল্পনারও অতীত। এ-সেতু যেন ইটকাঠে গড়া মানুষের হাতের কাজ নয়, যেন নদীর দু কূল থেকে ফুলে ওঠা আবর্তের ফেনা দুপাশ থেকে উচ্ছ্রিত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে আকাশপথে মিশেছে—সিত শুভ্র কোনো আশ্চর্য রামধনুর মতো, যেন পরস্পরের সঙ্গে মিলে গিয়ে ক্ষণকালের মতো তুষ্ণীভূত হয়ে শূন্যে প্রলম্বিত হয়ে আছে। সেতুর খিলানে দাঁড়িয়ে অনেক নীচে তাকালে সুদূর দিগন্তে ক্ষীণধার লালচে রঙের জলের ধারা একটু যেন দেখা যায়। আরও নীচে সেতুর ঠিক তলায় বিজিত জেপা নদীর ফেনিল আবর্ত যেন গুরু গুরু গর্জনে বিক্ষোভ জানাচ্ছে। সেতুখানি যেন কতকগুলো ঋজু রেখার সমন্বয়ে এক শিল্পিত সৃষ্টি। যেন লতাগুল্মে আচ্ছাদিত দু-পারের নিকষ কালো প্রস্তর পাথরে ডানার প্রান্ত ভর দিয়ে মুহূর্তেকের জন্য জিরিয়ে নিচ্ছে কোনো পাহাড়ী পাখি —পর মুহূর্তেই হয়তো দৃষ্টির অগোচরে উড়ে যাবে। বেশ কিছু দিন ধরে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করার পর লোকে যেন বুঝতে পারল সেতুটি বাস্তব ব্যাপার—স্বপ্ন নয়।

প্রতিবেশী গ্রামের লোকেরা দলে দলে এল সেতু দেখতে। ভিসেগ্রাড ও রোগাতিচা থেকে শহুরে মানুষও এল অনেক। তারা সেতুর নির্মাণ-কৌশলের প্রশংসা করল খুব। সেই সঙ্গে আক্ষেপও জানাল যে এমন সুন্দর স্থাপত্যের নিদর্শনটি তাদের শহরে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে হল কি না পাহাড়ে জঙ্গলে, বনে বাদাড়ে। জেপা গাঁয়ের লোকেরা রগড় করে বলল 'আগে একজন উজীর-এ-আজম হোক তোমাদের শহরে, তারপর কথা বলতে এসো।' হাতের তেলো দিয়ে পাথরের দেয়ালে তারা তাল ঠুকে বলে 'দেখেছো যেমন খাড়া তেমনি মসৃণ। এ যেন খোদাই-করা পাথর নয়, যেন ছুরি দিয়ে কাটা পনির।'

প্রথম যাত্রীরা সেতু পারাপার করতে গিয়ে অবাক বিস্ময়ে থমকে দাঁড়ায়।

দাঁড়ায় না কেবল একটিমাত্র লোক—তিনি হলেন সেই ইতালির স্থপতি। মিস্ত্রি মজুরদের পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে, মস্ত মস্ত সিন্দুকে তিনি তাঁর কাগজপত্র ও যন্ত্রপাতি পুরে দিলেন এবং কালবিলম্ব না করে উজীরের সিপাহী-শলাহর সঙ্গে কনস্তান্তিনোপল-এর পথে রওনা হয়ে গেলেন।

বসনিয়া ছেড়ে যাবার পর স্থপতির বিষয়ে জেলার শহরে গাঁয়ে নানা কথা রটতে লাগল। ভিসেগ্রাড থেকে ওর জিনিসপত্র ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে এনেছিল সেলিম নামে বেদে জাতের একটা লোক। একমাত্র সেলিমই নাকি স্থপতির কুটিরের ভিতর কাজে কর্মে মাঝে মাঝে গেছে। রওকা বুঝে সেলিম এবার কফির দোকানে জাঁকিয়ে বসল। শ্রোতার কোনো অভাব ছিল না। সেলিমের শততম জবানীতে স্থপতির বিষয়ে যে-কাহিনী রটিত হল তা মোটামুটি এই প্রকার দাঁড়াচ্ছে :

'মানুষটা ছিল আর পাঁচজনার মতো নয়—ভিন্ন জাতের মানুষ। শীতের মরসুমে বরফ পড়ার জন্য কাজকর্ম যখন বন্ধ, তখন ওঁর ওখানে কখনো যেতাম সপ্তাহান্তে কখনো বা দু-হপ্তা বাদে। যখনই যাই না কেন দেখতাম ঘরদোর ঠিক সেই আগেকার মতোই লণ্ডভণ্ড। আগুনের চুল্লী নেই, ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে সেই ঠাণ্ডা ঘরে লোকটা একা বসে। মাথা ও কান ঢাকা একটা ভালুকের চামড়ার টুপি পরা, পা থেকে বগল পর্যন্ত ঢাকা থাকত একটা কম্বলে। কেবল হাত দুটো থাকত বাইরে—হাতের আঙুল সব শীতে নীল। কখনো বা পাথর তুলছে, কখনো কাগজে কী সব হিজিবিজি লিখছে। ঘোড়ার পিঠ থেকে মাল ও রসদ নামিয়ে আমি যখন সামনে এসে দাঁড়াতাম, আমার দিকে তাকাত ধূসর চোখে, মোটা মোটা ছাইরঙা ভুরু পাকিয়ে আমার দিকে এমন ভাবে চাইত যে ভয় হত বুঝি গিলে খাবে। মুখ দিয়ে একটাও রা বেরোত না। এরকম মানুষ আমি আর দেখিনি কোথাও। তারপর, ভাইসায়েবরা তো সবাই জানেন দেড়টা বছর ঘোড়ার মতো খেটে কাজটা যখন সারা হল, লোকটা তো রওনা হল ইস্তাম্বুল। ঘোড়া ও মালপত্তর সমেত আমিও তো ওকে ওপারে পৌঁছে দিলাম আমার নৌকোয়। ওপারের মাটিতে পা দেওয়া মাত্র ঘোড়ায় চেপে বসল। একটি বারের জন্য তাকিয়ে কি দেখল আমাদের দিকে কিংবা সেতুটার দিকে? এ-মানুষ তেমন পাত্রই নয়।'

দোকানের মালিকেরা স্থপতির বিষয়ে যত শোনে তত যেন তাদের আরও শোনার জন্য রোখ চাপে। সেলিমের গল্প ওরা অবাক বিস্ময়ে গলাধঃকরণ

করে ও মনে মনে হাত কামড়ায় ভিসেগ্রাদ শহরে যখন লোকটা ঘুরে ফিরে বেড়াত তখন কেন যে ওরা মানুষটাকে নজর করে দেখেনি।

এদিকে স্থপতি তো চলেছেন এগিয়ে। ইস্তাম্বুল পৌঁছুতে দু-দিন বাকি থাকতে উনি প্লেগ রোগে আক্রান্ত হলেন। শহরে যখন পৌঁছুলেন—জ্বরে সারা গা পুড়ে যাচ্ছে, কোনোমতে ঘোড়ায় চেপে রয়েছেন। শহরে পৌঁছেই স্থপতি সোজা চলে গেলেন সন্ত ফ্রান্সিস সম্প্রদায়ের ধর্মযাজকদের দ্বারা পরিচালিত এক হাসপাতালে। সেইখানে চব্বিশ ঘণ্টা যেতে না যেতে একজন ধর্মযাজকের কোলে মাথা রেখে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

পরদিন সিপাহী-শলাররা উজীরকে স্থপতির মৃত্যুসংবাদ জানাল এবং তাঁর হাতে হিসাবপত্রের খাতা, সেতুর নক্সা ইত্যাদি ন্যস্ত করে দিল। স্থপতি যে-দক্ষিণাটুকু পেয়েছিলেন সে তাঁর প্রাপ্যের সিকি অংশ মাত্র। মারা তো গেলেন, পিছনে না রেখে গেলেন ধার দেনা কিংবা কোনো ওয়ারিশান। অনেক ভেবেচিন্তে উজীর হুকুম দিলেন স্থপতির প্রাপ্য তিন-চতুর্থাংশের একটা অংশ যাবে হাসপাতালে এবং বাদবাকি দরিদ্র ভোজনের জন্য কোনো একটা দুর্গত-নিবারণী কোষে।

ফারমান যেদিন বেরোল, সেদিনটা ছিল গ্রীষ্মের শান্ত মধুর এক সকালবেলা। ঠিক সেইদিনই উজীরের হাতে এসে পৌঁছল একটা আর্জিপত্র। লিখেছেন কনস্তান্তিনোপল-এর একজন উচ্চশিক্ষিত তরুণ কবি। এঁর ভাষা ও ছন্দ মার্জিত এবং বসনিয়ায় এঁর আদি নিবাস বিধায় উজীর কবিকে কখনো বা ইনাম দিতেন, কখনো বা টাকাকড়ি দিয়ে সাহায্য করতেন। কবি তাঁর চিঠিতে লিখলেন: "লোকমুখে শুনেছি হুজুর আমাদের দেশগাঁয়ে একটি সেতু তৈরি করিয়ে দিয়েছেন। অন্যান্য জনহিতকর কীর্তির বেলা যেমন হয়, এই সেতুর বেলাতেও তেমনি শিলাপটে দাতার নাম ধাম বিবরণ উৎকীর্ণ করে রাখা দরকার। ইতিপূর্বে এইপ্রকার কাজে তো হুজুর বহুবার বান্দার সেবা গ্রহণ করেছেন। এবারও যদি বহু আয়াসে রচিত সংলগ্ন মুসাবিদা হুজুরের মনঃপূত হয়, তাহলে দাসানুদাস কৃতার্থ হয়।"

পুরু কাগজের উপর লাল ও সোনালি রঙের সুছাঁদ অক্ষরে কবি যে-বয়েৎ লিখে পাঠিছেন তার মোদ্দা কথাটা:

'সুশাসক হাত মেলালেন
শিল্পীশ্রেষ্ঠর হাতে।

রচিত হল এই চমৎকার সেতু
লোকের হিতকল্পে
ইউসুফের কল্যাণে,
—ইহকালে ও পরকালে।'

এই বয়েৎ-এর নীচে উজীরের শিলমোহর তাতে দুই ছত্র লেখা :

'খোদাতালার দাসানুদাস ইউসুফ ইব্রাহিম'

আর উজীরের বীজমন্ত্র :

'শান্ত্ রহো তো শান্তি রহে।'

কবির আর্জিপত্র আর স্থপতির হিসাবপত্র ও নক্সা হাতে নিয়ে উজীর বিমূঢ়ের মতো অনেকক্ষণ বসে রইলেন। কয়েদ হবার পর থেকে উজীর কোনো বিষয়ে যেন ঠিক মনস্থির করতে পারেন না।

গদিচ্যুতি ও কয়েদ হবার পর উজীর আবার স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন বছর দুই হল। ক্ষমতা ফিরে পাবার পর প্রথম প্রথম তাঁর স্বভাবে কোনো বৈলক্ষণ্য দেখা যায় নি। কয়েদ থেকে যখন খালাস হয়ে বেরোলেন তখন তাঁর দোর্দণ্ড প্রতাপ, রক্ত গরম, বিরুদ্ধ পক্ষের চক্রান্ত ভেদ করে তিনি তখন বিজয় গৌরবে পুনরধিষ্ঠিত। দুশমনকে ঘায়েল করে তিনি তখন নিজের শক্তিমত্তা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল তত তার মনে পড়তে লাগল নির্জন কারাবাসের লাঞ্ছিত দিনগুলোর কথা। ভুলে থাকতে চাইলেও সেইসব দিন কি ভোলা যায়! জাগ্রত অবস্থায় যদি বা সে সব চিন্তা ঠেকিয়ে রাখা যায়, রাতের অন্ধকারে স্বপ্নের বিভীষিকা ঠেকিয়ে রাখবে কে? এমনি করে ক্রমে ক্রমে একটা অকারণ নামহীন ভয় উজীরের জীবন বিষময় করে তুলল।

এই ভয়ের একটা লক্ষণ হল ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো। আগে যেসব ব্যাপার তিনি অতি তুচ্ছ বলে মনে করতেন, এখন সে সব খুঁটিনাটি নিয়ে তাঁর ভাবনার অন্ত নেই। প্রাসাদে ভেলভেট যেখানে যেখানে ছিল খুলে ফেলা হল, সে সব জায়গায় লাগানো হল পশমের বনাত। ভেলভেট-এ হাত পড়লে উজীরের বুকের মাঝখানে ছাৎ করে ওঠে। মুক্তোর প্রতি তাঁর একটা গভীর বিতৃষ্ণা জন্মাল, মুক্তো দেখলেই নাকি তাঁর মনে পড়ে যায় ঠাণ্ডা স্যাঁৎসেঁতে কয়েদখানায় সেই তাঁর নির্জন কারাবাসের কথা। মুক্তো

দেখবামাত্র তাঁর দাঁত যেন শিরশির করে, সারা গায়ে কাঁটা দেয়। প্রাসাদের যেখানে যেখানে আসবাব অলংকারে মুক্তো ছিল সেখান থেকে সে সমস্ত সরিয়ে ফেলা হল।

উজীরকে সন্দেহবাতিক পেয়ে বসল, সকল বিষয়ে তাঁর সন্দেহ। সে সন্দেহ প্রচ্ছন্ন হলেও গভীর। তাঁর কেমন যেন ধারণা হল সকল মানুষের কাজে ও কথার পেছনে কী যেন একটা বিপদের সম্ভাবনা লুকিয়ে। চোখের দেখা, কানের শোনা, মনের চিন্তা—সব কিছু তার কাছে একটা অনির্দিষ্ট আতঙ্কের বিষয় হয়ে দাঁড়াল। শত্রু-বিজয়ী উজীর এবার প্রাণভয়ে ভীত হয়ে পড়লেন। এইভাবে, একপ্রকার নিজের অগোচরেই তিনি যেন মৃত্যুর প্রথম ধাপে পা দিলেন, ছায়া তাঁর কাছে কায়ার চেয়ে বড়ো হয়ে উঠল।

এই অনির্দেশ্য ভয় ও আতঙ্কের ফলে উজীরের পা থেকে যেন মাটি সরে যেতে লাগল, শরীর মনের দ্রুত অধোগতি শুরু হল। কিন্তু এই নিদারুণ দুরবস্থার কথা একটিবারের জন্য কাউকে তিনি মুখ ফুটে বলতে পারলেন না। অন্তর্বিষের কাজ যখন ভিতরে শেষ হয়ে গিয়ে বাইরে প্রকাশ পায়, লোকে তা ঠিকমতো বুঝতে পারে না। লোকে যাদের বড়ো বলে মনে করে, সেই সব খ্যাতিমান শক্তিমান মহাপুরুষেরা এই ভাবে অন্যের অগোচরে ধীরে ধীরে অন্তরে অন্তরে ক্রমাগত মরতে থাকে।

বিগত রাত্রে অনিদ্রার ফলে গ্রীষ্মের এই সকালবেলায় উজীরের শরীর মনে একটা অবসাদ ছিল সত্যি। তৎসত্ত্বেও তাঁর চিত্ত ছিল শান্ত সমাহিত। সকালের ঠাণ্ডা হাওয়ায় তিনি বসে আছেন, তাঁর চোখ কেমন যেন ফোলা ফোলা, গণ্ডদেশ পাংশু। বসে বসে তিনি ভাবছেন পরলোকগত সেই স্থপতির কথা, আর সেই সব নিরন্নের কথা যারা স্থপতির দুর্গতিমোচন তহবিলের থেকে ক্ষুন্নিবৃত্তি করবে। আর তাঁর মনে পড়ছে জন্মভূমি বসনিয়া জেলার কথা, সেই পর্বতসংকুল, নিকষকালো বহু দূরের দেশ। বসনিয়ার কথা মনে পড়লেই তাঁর মনে একটা ছবি ভেসে ওঠে—কালিলেপা সেই ছবি, রুক্ষ সেই দেশ, দরিদ্র সেই দেশের মানুষ, সেখানকার জীবনে রসকষ নেই, মায়ামমতা নেই। সেই অন্ধকার দেশে পবিত্র ইসলামের আলো সামান্যই প্রবেশলাভ করেছে। আল্লাহর সৃষ্টি এই দুনিয়ায় না জানি কত দেশ আছে বসনিয়ার মতো, কত দুরন্ত পাহাড় নদী যার উপর কোনো সেতু নেই, পারাপারের ঘাট নেই, কত দেশ যেখানে পানীয় জল নেই, লতাপাতা-কাটা সুরম্য মসজিদ নেই। এই

দুনিয়ার কত ভয়, কত অভাব—যত রাজ্যের দুশ্চিন্তা এসে যেন ভর করল উজীরের মনে।

গুলবাগের মধ্যে উজীরের উদ্যানবাটিকার ছাদে সবুজ মসৃণ টালিগুলোর উপরে প্রভাত সূর্যের আলো যেন ঠিকরে পড়ছে। উজীর আর-একবার কবির সেই লেখার উপর চোখ বোলালেন, আস্তে আস্তে হাতের কলম উঠিয়ে কেটে দিলেন পংক্তিগুলো। আবার কলম তুলে কবির সৃষ্ট জগতটাকে যেন নাকচ করে দিলেন আর-এক আঁচড় দিয়ে। উজীর চুপ করে বসে রইলেন খানিকক্ষণ; তারপর শিলমোহরের উপরিভাগে যেখানে তাঁর নাম লেখা ছিল সেই অংশটুকু কেটে দিলেন। এখন কেবল বাকি রইল তাঁর বীজমন্ত্র—'শান্ত্ রহো তো শান্তি রহে।' উজীর ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগলেন এই কটি কথা। অতঃপর কলম তুলে শক্ত আঁচড়ে এই নীতির জগতটাকেও দিলেন নাকচ করে।

এরই ফলে জেপা নদীর সেতুর উপর কোনো নাম বা চিহ্ন উৎকীর্ণ হয় নি। সুদূর বলনিয়ায় এই সেতু সূর্যের আলোয় ঝলমল করে, চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত হয়। মানুষ গোরু ছাগল ভেড়া কুকুর এই সেতু দিয়ে পারাপার করে। ভিৎ গাঁথার জন্য যে-মাটি খোঁড়া হয়েছিল, সেই মাটির ঢিবি ক্রমে ক্রমে ক্ষয় পেয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। ভারা বাঁধার খুঁটো তক্তা গাঁয়ের লোক কিছু নিল, কিছু বা জেপা নদীর জলের তোড়ে ভেসে গেল। রাজমিস্ত্রি ও মজুরদের কাজের শেষ চিহ্ন যা কিছু ছিল সে সব ধুয়ে মুছে গেল পাহাড়ে বর্ষার অবিরাম বর্ষণে।

কিন্তু ওই অঞ্চলের লোক এই জেপা নদীর সেতুকে কেমন যেন কিছুতেই আপন করে নিতে পারল না। সেতুটিও কেমন যেন অতিথি আগন্তুক হয়েই রয়ে গেল—ওই দেশের ঠিক বাসিন্দা হতে পারল না। দূর থেকে পথিক যখন সেতুটাকে দেখে, অবাক হয়ে যায়। মনে হয় এক পাল্লায় এই শাদা ধবধবে চওড়া সেতুটা, ঘন জঙ্গল ঘেরা কালো পাহাড়ের রাজ্যে কেমন করে যেন প্রক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে, যেন এ এমন একটা ভাব যার ভাষা এদেশের ভাষা থেকে আলাদা।

বোধ করি এই গল্পের লেখকই সর্বপ্রথম এই সেতু রচনার ইতিহাস জানতে উৎসুক হন। পাহাড়-পর্বত ঘুরতে ঘুরতে একদা এক সন্ধেবেলা পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে লেখক এই সেতুর আলিসার তলায় বসে বিশ্রামে রত ছিলেন। সে সময়টা

ছিল দিনে গরম রাতে ঠাণ্ডার মরশুম। আলিসায় আড়ে, পাথরে হেলান দিয়ে তিনি অনুভব করলেন একটা কবোষ্ণ আরাম। সেতু যেন দিনের বেলাকার উত্তাপ কিছুটা সঞ্চয় করে রেখেছে ক্লান্ত পথিকের উদ্দেশে। লেখক তখনও পথশ্রমে স্বেদাক্ত। দ্রীণার দিক থেকে একটা ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে পালিশ করা পাথরের উত্তাপ যেমন সুখকর মনে হল, তেমনি অভূতপূর্ব। ওই একটু সময়ের মধ্যে ঝেপা নদীর সেতুর সঙ্গে লেখকের এমন একটা জানপহেচান হয়ে গেল যে লেখক স্থির করলেন এই ইতিহাস লিখে রাখতে হবে।

অনুবাদ : ক্ষিতীশ রায়

The Zepa Bridge by Ivo Andric

বরিস জাসেঙ্কো

সাক্ষাৎকার

বরিস জাসেঙ্কোর জীবন রোমাঞ্চকর। ১৯১৭ সালে রিগায় জন্মেছেন। ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা করায় স্কুল থেকে বিতাড়িত হন। ১৯৩৯ সালে একটা জাহাজে তাঁকে রোটারডামে পাঠান হয়। সেখান থেকে তিনি প্যারিসে আসেন। সেখানে রাজনৈতিক পুস্তিকা বিলি করার অপরাধে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়, নাৎসী সরকার তাঁকে ভার্নে বন্দীশিবির থেকে সরিয়ে অবশ্যকৃত্য শ্রমদানের জন্য জার্মানীতে পাঠান। সেখান থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি কখনো অভিনেতা, কখনো পাচক, কখনো বা হোটেলে খাদ্য-পরিবেশনকারী হিসেবে কাজ করেছেন। যুদ্ধের পর তিনি লালফৌজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি ছোট শহরে মেয়রের পদ পান। Heard And Ashes (১৯৫৫) নামে তাঁর একটি চমকপ্রদ গল্পে ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামে এক যোগসূত্রে বাঁধা শ্রমিক সমাজের গভীর সৌহার্দের বর্ণনা পাওয়া যায়। And yet They Loved One Another নামে একটি গল্প ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয়। তাছাড়া নানা দেশের জন-সমাজকে চিত্রিত করে একটি ছোটগল্পের সংকলনও প্রকাশ করেছেন। তিনি দুটি নাটকেরও লেখক। তার মধ্যে People on the Frontier লেখা হয় ১৯৫০-এ, Jungle লিখিত হয় ১৯৫১-য়।

ম্যাথিয়াস ভাইসভর্ন এল্‌ব্‌ নদীর ধারে ঘন্টাখানেক ধরে পায়চারি করছে। এপ্রিল মাস সবে শুরু হয়েছে, সে হিসেবে আবহাওয়া খুব শান্ত। নদীর উপরটা কুয়াশাচ্ছন্ন আর তার পাড়ে জাপানী প্রাসাদের পিছন থেকে চাঁদ উঠছে। আকাশের গায়ে পুরোনো শহরের কালো ছায়ার রেখা দেখা যাচ্ছে। এই দৃশ্য বছর পনেরো আগে যেমনটি, দেড়শো বছর আগেও তেমনই

দেখা যেত। ম্যাথিয়াসের মনে হল সেন্ট সোফিয়া গির্জা থেকে যে-কোনো সময় পুরাকালের মতোই ঘণ্টাধ্বনি শোনা যাবে। অথবা হঠাৎ দুর্গের জানলা থেকে অজস্র আলোর শিখা জ্বলে উঠবে, দলে দলে লোক এসে রিচার্ড স্ট্রাউস অথবা হ্বাগনারের সংগীত শোনার জন্ম সেম্পার অপেরায় গিয়ে ভিড় করবে।

কিন্তু অপেরার সামনের খোলা ময়দানে আজ আর কেউ এসে জড়ো হয় না। এখন সেটা একটা দগ্ধ গৃহের খোলস মাত্র। তার কোনো জানলায় আলো জ্বলে না। পুরোনো ড্রেসডেনের সময়টাই কেবল প্রেতপুরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। আর সবই গেছে। ম্যাথিয়াস ভাবে, এই শহরটির প্রাচীন জৌলুস আবার ফিরিয়ে আনতে বেশ কয়েক বছর সময় নেবে।

হঠাৎ সে লক্ষ করে এক কোণের বেঞ্চিতে একটি মেয়ে একা বসে আছে। বয়স তার কুড়ির বেশি নয়, বড় কোমল, মধুর, কচি মুখখানি সহজেই মন কেড়ে নেয়।

দ্বিতীয়বার সেই বেঞ্চের সামনের পথে যেতে দেখে, তখনও মেয়েটি একা বসে। সে তার পাশে বসে পড়ে। একটি সিগারেট ধরিয়ে দেশলাইয়ের আলোতে মেয়েটির মুখটি সে ভালো করে দেখে নেয়। ভারি ভালো লাগে চোখে। বেশি কিছু না ভেবেই মেয়েটির সঙ্গে আলাপ শুরু করে।

'বড় সুন্দর আজকের এই সন্ধ্যাটি'—কথা তোলে ম্যাথিয়াস।

মেয়েটি যেন চমকে উঠল, তবে নড়ল না একটুও। ম্যাথিয়াস কেস থেকে সিগারেট বের করে ওকে একটি দিতে গেল।

ধন্যবাদ জানিয়ে সে সেটি নিল।

আবার ম্যাথিয়াস বলে—'এপ্রিল মাসের পক্ষে এবার গরমটা বড্ড বেশি।'

'কিন্তু এখনও জল নিশ্চয় খুব ঠাণ্ডা'—বলে ফেলে মেয়েটি।

ম্যাথিয়াস ওকে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কি এখানে ড্রেসডেনে কাজ কর, না পড়াশোনা কর?'

মেয়েটি সিগারেটে একটি টান দিল, কিন্তু উত্তর কিছু দিল না।

'চল না আজকের সন্ধ্যাটি আমরা একসঙ্গে কাটাই। আমার জানা একটা ছোট কাফে আছে ছাত্রদের জন্য—তোমার হয়ত ভালো লাগবে'।—বললে ম্যাথিয়াস।

'এখানে বড্ড বেশি লোকজনের আনাগোনা'—বলে মেয়েটি উঠে দাঁড়ায়।

ওর আচরণ ম্যাথিয়াসের চোখে একটু অস্বাভাবিক লাগে। তবু সেও

উঠে, মেয়েটির পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। চোখে পড়ে, মেয়েটির গায়ের কাপড় বড় হালকা—এদিকে আবার নদীর তীরে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। নিশ্চয় ওর খুব শীত করছে। তাকিয়ে দেখে—সত্যিই শীতে কাঁপছে ও, একবার ভাবলে, ওর নিজের গায়ের জ্যাকেটটা দিয়ে মেয়েটিকে ঢেকে দেয়। তখনই মনে পড়ল জ্যাকেটের পকেটে দরকারী কাগজপত্র রয়েছে—তাই আর দেওয়া হল না।

একটু পরেই ম্যাথিয়াসের খেয়াল হয়, যে-বেঞ্চে ওরা বসেছিল, সেখানে সিগারেট কেসটি ফেলে এসেছে। মেয়েটিকে একটু অপেক্ষা করতে বলে ছুটে সেটা আনতে গেল। সেখান থেকে দৌড়ে ফিরে এসে, মাথা উঁচু করে চারদিক তাকিয়ে, হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে পড়ল···যেখানে নৌকাগুলো বাঁধা ছিল, তার থেকে একটু দূরে চাঁদের আলোয় দেখা গেল একটি মাথা আর একটি হাত জলের উপর ভাসছে। মেয়েটি তবে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

সে তাড়াতাড়ি গায়ের জ্যাকেটটি খুলে ছুঁড়ে ফেলল, কোনোমতে জুতো টেনে খুলে জলে লাফিয়ে পড়ল। ঠাণ্ডার প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠেই, চারিদিক হাতড়ে ওকে খুঁজল। স্রোতের টানে মেয়েটি যখন প্রায় তলিয়ে যাচ্ছে, তখনই তার চুল ধরে টেনে তাকে তীরের কাছে নিয়ে গিয়ে হাঁপাতে লাগল।

এরই মধ্যে কয়েকটি লোক এসে সেখানে জড়ো হয়েছে। মেয়েটিকে তীরে টেনে তুলতে ওরা ম্যাথিয়াসকে সাহায্য করল। যে-অ্যাম্বুলেন্স মেয়েটিকে হাসপাতালে নিয়ে গেল, তাতেই সেও বাড়ি ফিরল। ম্যাথিয়াস তখন এত কাঁপতে শুরু করেছে যে তাকে তৎক্ষণাৎ বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়তে হল।

পরের দিন সকাল। ক্যাথলীন জেগে উঠে আগের সন্ধ্যার কথা মনে আনার চেষ্টা করছে। সব খুঁটিনাটিগুলি মনে আনতে তাকে কিছুক্ষণ ভাবতে হল। হাসপাতালের একখানা ঘরে সে একাই শুয়ে আছে—তাই এখানে তাকে আর কেউ বিরক্ত করবে না।

গতকাল ফ্র্যাঙ্ক যখন তাকে ছেড়ে চলে গেল, সে অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিল। তার জীবনের প্রথম প্রেম যাকে নিবেদন করেছিল, সে যে গোড়া থেকেই মিথ্যে বলে তাকে প্রতারিত করেছে,—এ কথাটা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না। তার সন্তান-সম্ভাবনার কথা বলতে গিয়ে জানল যে ফ্র্যাঙ্ক বিবাহিত, অনেক বছর আগেই বিয়ে হয়েছে।

তারপর যে ফটোগ্রাফারের স্টুডিয়োয় সে কাজ করত, সেখানে আর সে গেল না। সমস্ত বিকেল কাটাল কাপড় ধোয়া, ইস্ত্রি করা—এসব কাজে। দেখাতে চাইল যেন ছুটিতে সে কোথাও বেড়াতে যাচ্ছে। অবশ্য আত্মহত্যার সংকল্প ও এর মধ্যেই স্থির করে ফেলেছিল।

সন্ধ্যায় নদীর ধারে গিয়ে বসেছিল। তখন একটি লোক এসে ওর পাশে বসল। লোকটি কী যেন সব বলছিল, সেও তার কিছু উত্তর দিয়েছে—তবে এখন আর কথাগুলো তার মনে নেই। লোকটিকে এড়িয়ে যাবার জন্য ও উঠে পড়ল, কিন্তু সেও সঙ্গে চলল। শেষ পর্যন্ত লোকটি যখন সরে গেল, তখনই সে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে…

অথচ এখনও সে বেঁচে আছে! কিন্তু গতকালও যেমন তার মুহূর্তমাত্র বাঁচতে ইচ্ছে করে নি—আজও ঠিক সেই মনের ভাবই আছে।

ডাক্তার এলেন পরীক্ষা করতে। ওর ক্ষোভ ভুলিয়ে মন ফেরাবার যথেষ্ট চেষ্টা করলেন তিনি। তাঁকে বাধা দিয়ে মেয়েটি বলে—'আমি জানি ডাক্তারবাবু, আপনি আমার ভালোর জন্যেই বলছেন—কিন্তু সত্যি বলছি, এখন এসব বলা বৃথা।'

তবু তিনি মেয়েটিকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে নানা কথা বলেই চললেন। অবশেষে টের পেলেন, সে কিছুই শুনছে না। জানলার ফাঁকে বাইরে তাকিয়ে আছে। নীচে রাস্তার শব্দ তেমন শোনা যায় না। ওর ঘরখানি পাঁচতলায়।

ডাক্তার বলেই ফেললেন, 'তুমি কিছুই শুনছ না ক্যাথলীন।'

'এই সন্তানধারণের ভার থেকে আপনি আমাকে মুক্ত করুন ডাক্তারবাবু। এখন আপনি আমাকে কেবল এই একটি সাহায্যই করতে পারেন'—বললে ক্যাথলীন।

ডাক্তার বললেন, 'তুমি কি সত্যিই তাই চাও?'

মেয়েটি বলে 'দিন্ দিন্, আমাকে মুক্ত করে দিন্ ডাক্তারবাবু। আমি জীবন সম্বন্ধে আর কোনো উপদেশবাণীই শুনতে চাই নে।'

ডাক্তার ভাবলেন—অবশ্য সেটাই সবচেয়ে সহজ পন্থা। কিন্তু আইনমতে তিনি তো তা পারেন না।

বললেন, 'আচ্ছা বেশ তো, এ বিষয়ে আর কিছু বলার আগে সত্যিই তোমার বাচ্চা হবে কিনা তাই দেখে নিই।'

ক্যাথলীন বলে, 'আপনার কি ধারণা যে আমার ভুল হতে পারে?'

'সে সম্ভাবনা তো সর্বদাই রয়েছে'—বলেন ডাক্তার।

কিন্তু পরের দিন ডাক্তার রোজমার্ক পরীক্ষা করে দেখলেন, সে সত্যিই সন্তান-সম্ভবা। তবু সে কথা এখনও তাকে জানাবার কিছু প্রয়োজন নেই।

তিনি কথাপ্রসঙ্গে সেদিন বললেন, 'কই—আমি তো তেমন কোনো লক্ষণ দেখছিনে।'

কিছুক্ষণ ডাক্তারের দিকে সে চেয়ে থাকে। বলে, 'এ কথা কি সত্যি ডাক্তারবাবু?'

ডাক্তার ধমকে উঠলেন, 'বোকার মতো কথা বোলো না ক্যাথলীন। রোগীর জীবন বাঁচাবার জন্যই মাত্র ডাক্তার মিথ্যে বলতে পারে। তোমার ক্ষেত্রে তো সে-প্রশ্ন আসেই না। জ্বর ছাড়লেই তুমি বাড়ি চলে যাও বাছা। সত্যিকারের অসুস্থ লোকদের জন্যে এখন আমাদের এই বেড দরকার।'

পরদিন সকালে একটি লোক তার ঘরে এল। তাকে আর কখনও না দেখলেই মেয়েটি যেন খুশি হত। লোকটির শীর্ণ মুখে লাজুক হাসি। নার্স কাঠখোট্টাভাবে বলে গেল—এই ভদ্রলোকই আপনাকে জল থেকে তুলে বাঁচিয়েছিলেন।

ওরা দুজনে একা হতেই ছেলেটি জিজ্ঞেস করে, 'আজ একটু ভালো বোধ করছেন কি? সেদিন আপনার মনের অবস্থা আমি কিছুই বুঝতে পারিনি, সেজন্যে আমি খুব দুঃখ বোধ করছি।'

মেয়েটি উত্তর দেয়, 'থাক সে কথা, ও ঠিক হয়ে যাবে।' ছেলেটি বুঝতে পেরে কথা ঘুরিয়ে বলে, 'আচ্ছা আমি কি কিছু সাহায্য করতে পারি? মানে…'

মেয়েটি মাথা নাড়ে।

'তবে এবার আমি যাই। আপনার হয়ত বিরক্ত লাগছে।'

'না না, আর একটু থাকুন।'

ছেলেটি ওর দিকে তাকিয়ে একটু ভাবে। বলে, 'দেখুন আমরা সবাই অনেক সময় ভাবি, বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না। আবার এক এক

সময় মনে করি, কী চমৎকার এই জীবন। চিরকাল বাঁচতে পারলে কত ভালো হত। অথচ এর কোনোটাই সত্য নয়।'

মেয়েটি প্রশ্ন করে, 'আপনি কি কাজ করেন ?'

ছেলেটি উত্তর দিল, 'এরোপ্লেন তৈরির নতুন কারখানায় আমি একজন এঞ্জিনীয়ার।'

মেয়েটি বলে, 'এত শান্ত আপনার গলার স্বর, আমার চোখেও ঘুম এনে দিচ্ছে। আমি বড় ক্লান্ত'...

ছেলেটি ওর হাত ধরে আশ্বাসভরে বললে, 'বেশ তো ঘুমিয়ে পড়ুন।'

মেয়েটি বলে, 'যদি নার্স এসে পড়ে ?'

'ডাক্তার রোডমার্কের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় আছে। নার্স এখন আসবে না'—উত্তর দেয় ছেলেটি।

'আমি নিজেকে সম্পূর্ণ সুখী মনে করতুম, সে বহুকালের কথা—সে বহুকাল' ...বলতে বলতে মেয়েটির বড় বড় চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল।

ম্যাথিয়াস যখন ওর কাছ থেকে বাড়ি ফিরে গেল, তার পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগেই হাসপাতালে দেখা করার সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত ক্যাথলীন ঘুমিয়ে পড়েছে।

এক মাস পরে। এল্‌ব্‌ নদীর ধার দিয়ে ওরা দুজনে হেঁটে চলেছে। ছেলেটি প্রায় রোজই দেখা করে মেয়েটির সঙ্গে। বসন্তকাল এসেছে, কচি সবুজের আভা ছড়িয়ে পড়েছে তরুগুল্মে। শান্ত সন্ধ্যায় পাপিয়ার গান শোনা যাচ্ছে, আকাশ যেন মখমলের মতো মসৃণ।

ক্যাথলীন বলে ওঠে, 'মাত্র একমাস আগেই যে আমি মরতে চেয়েছিলুম, ভাবতেই এখন আমার কেমন অসম্ভব ব্যাপার মনে হয়।'

ম্যাথিয়াস বললে, 'আর আমি যে একমাস আগে তোমাকে জানতুমই না, সে কথাও আমার অবিশ্বাস্য মনে হয়।'

দুজনে নদীর ধরে খোলা জায়গায় একটি বেঞ্চে বসে পড়ল।

'আমি একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছিলুম' বলে ক্যাথলীন। নদীর মৃদু কল্লোল ওরা শুনতে পায়। 'তুমি কী ভাবছ ?' ম্যাথিয়াসকে প্রশ্ন করে সে।

'এই আমাদেরই কথা। তুমি আমাকে বিয়ে করতে রাজী তো ?' একটুও দ্বিধা না করে ক্যাথলীন উত্তর দিলে, 'সে তো আমার সৌভাগ্য।'

ক্যাথলীনের বাড়ির সামনে এসে দুজনে দাঁড়ায়। ম্যাথিয়াস বলে, 'তোমাকে একা ছেড়ে যেতে এখন আর আমার ইচ্ছে করে না। কিন্তু আমার বোধহয় এবার যাওয়াই উচিত।' ক্যাথলীন ওর হাত ধরে বলে, 'উচিত বলে কোনো কথাই নেই। এসো, আমার সঙ্গে ঘরে চল।'

কিছুদিন পরেই ওদের বিয়ে হয়ে গেল। শহরতলীতে ম্যাথিয়াসের দুখানা ঘরওয়ালা বাড়িতে দুজনে গিয়ে উঠল।

ক্যাথলীনের জীবনে এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে। ম্যাথিয়াস যদি মাঝে মাঝে খুব মনমরা হয়ে না পড়ত, তবে তার সুখের মাত্রা পরিপূর্ণ হত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক এক দিন ম্যাথিয়াস কৌচে শুয়ে থাকে। একটা কথাও বলে না। কোনো কিছুতেই তখন তার আগ্রহ দেখা যায় না।

পরদিন সকালে কিন্তু আবার সে চানের ঘরে গিয়ে শিস দিয়ে গান গায়। ক্যাথলীন আপত্তি করা সত্ত্বেও বসবার ঘরে বালির থলে ঝুলিয়ে রেখে সে বক্সিং করে। আর মাঝে মাঝে যে ওর মন খারাপ হয় তা নিয়ে একটু মজাও করে।

একদিন সন্ধ্যায় ওর বাহুর বন্ধনে থেকে ক্যাথলীন বলে, 'তোমার সঙ্গে দেখা হবার আগে আমি যা ছিলুম, আর, যা করেছি—সবই এখন আমার স্বপ্নের মতো মনে হয়। পিছনে ফেলে আসা দিনগুলোর দিকে ফিরে তাকানোও এখন আমার পক্ষে কষ্টকর। শুনে তুমি হেসো না কিন্তু—এক এক সময় আমার মনে হয় আমি যখন জলে ঝাঁপ দিয়েছিলুম, তখন সত্যিই আমি ডুবে গিয়েছিলুম। এখন কিন্তু আমি আর সে ক্যাথলীন নই, অন্য মেয়ে।'

'হ্যাঁ, তুমি আমার আরো মন-ভোলানো সুন্দর হয়েছ।'

'যদি তুমি জানতে তোমায় আমি কত ভালোবাসি ম্যাথিয়াস। তাই এক এক সময় এমন ভয়ে কাঁপে মন আমার। যদি তোমায় হারাই...'

'একটি বাচ্চা হলেই তোমার সে ভয় কেটে যাবে।'

'আমাদের বিয়ে হয়েছে সবে একমাস, তাই আরো কিছুদিন তো অপেক্ষা করতে হবে।' ম্যাথিয়াস যে ওর কাছ থেকে একটি সন্তান কামনা করছে, এতে ও খুশি হয়। ছোট শিশুরা ওর কত প্রিয় ক্যাথলীন তা জানে।

সকালে কাজে যাবার সময় ম্যাথিয়াস যখন গ্যারাজ থেকে গাড়ি বের

করতে যায়, পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কয়েকজন ওর সঙ্গে গাড়িতে খানিকটা যাবে বলে অপেক্ষা করে। আবার যখন বাড়ি ফিরে আসে তখনও তারা ছুটে এসে জড়ো হয়। কী করে যেন জানতে পারে যে ও এসে পড়েছে। যেদিন ওর খুব কাজের তাড়া থাকে, সেদিন বাইরের বারান্দায় বসেই কিছুক্ষণ ওদের আদর করে। আর যেদিন হাতে সময় থাকে, সেদিন ওদের পার্কে নিয়ে গিয়ে হয়ত খেলে, না হয় বাদাম গাছের ছায়ায় বেঞ্চিতে বসে গল্প করে। এক এক দিন এত দেরি করে যে রাতের খাবার আগে ক্যাথলীন গিয়ে ওকে ডেকে আনে।

তাই বিয়ের পর দ্বিতীয় মাসেই যখন ক্যাথলীন ওর সন্তান-সম্ভাবনার খবরটি দিতে পারল তখন সে খুব খুশি হল। ডাক্তার রোজমার্ক এবার বিনা দ্বিধায় বলেছেন—সত্যিই ওর বাচ্চা হবে। ম্যাথিয়াসকে এ খবর জানাতেই সে ওকে জড়িয়ে ধরে কোলে তুলে সারা ঘর ঘুরে এল যতক্ষণ না হাঁপিয়ে পড়ল।

পরের কয়েকটি মাস ক্যাথলীন যেন সুখের সাগরে ভাসে। মনে সংশয় নেই যে ম্যাথিয়াস আর ওর অংশ হয়েই শিশুটি জন্মাবে। বাচ্চাটি হাঁটতে শিখলে বাপের কত আনন্দ হবে। এসব কথা ভাবলে ওর মনে আর উদ্বেগ বা ভয় কিছুই থাকে না। ম্যাথিয়াসের সস্নেহ যত্নে আদরে সে ক্রমশ পূর্ণবিকশিত হয়ে উঠল।

যখন সাতমাস চলছে, ওরা খবর পেল ম্যাথিয়াসকে প্রাগে একটি সম্মেলনে যোগ দিতে যেতে হবে। তিন সপ্তাহ সে সেখানে থাকবে। ক'দিন ধরে ম্যাথিয়াসের শরীরও ভালো যাচ্ছিল না। তাই স্টেশনে ওকে বিদায় দিতে গিয়ে ক্যাথলীনের মন অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে গেল। বিয়ের পর এই প্রথম তাদের সাময়িক বিচ্ছেদ। পাছে এই ভ্রমণের আনন্দ নষ্ট হয়, সে-ভয়ে ক্যাথলীন ওর শঙ্কিত ভাব প্রকাশ করল না।

পাঁচদিন পরে ও যখন ফ্ল্যাটটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করছে, তখন ব্যথা উঠল। প্রথমটা ও বুঝতেই পারে নি—কারণ ও ভাবছে, তখন সবে সাত মাস। কিন্তু খানিক পরে টের পেল ওকে খুব তাড়াতাড়িই হাসপাতালে যেতে হবে।

সেই সন্ধ্যায় ওর একটি মেয়ে হল। শিশুর ওজন দেখে বোঝা গেল সে অকালে জন্মায় নি। তবে তো সে ম্যাথিয়াসের সন্তান হতেই পারে না।

ক্যাথলীন একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। কী যে ঘটে গেল ও যেন বুঝতেই পারছে না। যে-সন্তানের জন্ত ওদের দুজনের অদম্য কামনা ছিল,

এখন বোঝা গেল সে সন্তান ম্যাথিয়াসের নয়, যে-লোকটিকে সে আজ মনেপ্রাণে ঘৃণা করে, তারই। ওর বুকের দুধ খাওয়াবে বলে শিশুটিকে যখন কাছে আনল তখন ওর এমন বিতৃষ্ণা এল—ইচ্ছে হল তাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়।

পরে অবশ্য এই অসহায় জীবটির প্রতি মন তার করুণায় ভরে গেল। আহা বেচারা! অবাঞ্ছিতভাবে এ পৃথিবীতে আসার ওর তো কোনো অপরাধ নেই। তবু ক্যাথলীন বোঝে, ম্যাথিয়াসের আর ওর মধ্যে এমন কিছু ভেঙে গেল, যা আর জোড়া লাগবে না। যা ঘটে গেল, ম্যাথিয়াস যে তা মেনে নেবে এতটা তো আশা করা যায় না। তাই তাদের পরস্পরের সম্পর্ক আগের মতো থাকতেই পারে না। ক্যাথলীনের মনে হয়, ম্যাথিয়াস ওকে খুব ভালোবাসে বলেই, আর, ওর নিজের সন্তানের জন্তে এত আশা করেছিল বলেই —এটা কিছুতেই সহজে নিতে পারবে না। ওর মন নিশ্চয় তিক্ততায় ভরে যাবে।

আবার ভাবে, আমি এক কাজ করলে পারি। ম্যাথিয়াসকে জানাবার দরকার কী যে এটি ওর সন্তান নয়। প্রাগ থেকে ফিরলে ওকে সত্যি ঘটনা জানাব না, তাহলেই আমরা যেমন ছিলুম, তেমনই থাকতে পারব···না, না, তা হয় না। ক্যাথলীন বোঝে এ ধরনের একটা মিথ্যার ভার বয়ে সে জীবন কাটাতে পারবে না।

অর্ধরাত্রি তার জেগেই কাটল। কেবল ভাবে, কী করলে এ সমস্তার সমাধান হয়। শেষে বুঝল, ম্যাথিয়াসকে সত্যি কথাই বলতে হবে— তাতে যদি ওদের যুগল সংসার ভেঙে যায় তাও।

একদিন দুদিন অন্তর ও ম্যাথিয়াসের চিঠি পায়। কিন্তু শিশুটির জন্মের খবর এখনই ওকে দিতে ক্যাথলীনের মন সরে নি।

যেদিন আসার কথা তার আগের দিনই ম্যাথিয়াস এসে পড়ল। সদর দরজার ঘণ্টার শব্দ যখন শোনা গেল, তখন সে শিশুটিকে খাওয়াতে যাচ্ছে। তাকে আবার দোলনায় রেখে দরজা খুলতে গেল ক্যাথলীন। ভাবল, বুঝি পিয়ন এসেছে। হঠাৎ ম্যাথিয়াসকে দেখে সে এতটা বিচলিত হয় যে দরজা ধরে নিজেকে সে সামলে নেয়। শিশুটি কাঁদতে থাকে।

'আরে, ইনি যে এরই মধ্যে এসে গেছেন দেখছি। আর তুমি আমাকে একটা টেলিগ্রামও করলে না?'—বলে ম্যাথিয়াস।

ক্যাথলীনকে জড়িয়ে ধরে সে ঘরে নিয়ে গেল শিশুটিকে দেখবে বলে। ক্যাথলীন যা বলবে ভেবেছিল—সব ওর গলায় আটকে গেল। কোনো কথাই সে বলতে পারল না। অঝোরে কাঁদতে শুরু করল।

'কি হল?' বলে ম্যাথিয়াস ওকে বসিয়ে নিজে পাশে বসল। তার পরে হাতখানা ঘুরিয়ে ওর কাঁধে রাখতেই সব কথা বেরিয়ে পড়ল—এ সন্তান ম্যাথিয়াসের নয়, এর বাপ হল ওর আগেকার বন্ধু, ক্যাথলীন আশা করেছিল এ শিশু বুঝি সূচনাতেই বিনষ্ট হয়ে গেছে…

ম্যাথিয়াস ওর দিকে পিছন ফিরে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, ক্যাথলীন ক্রমে শান্ত হল। বললে, 'আমি এর মধ্যে একখানা ঘরের খোঁজ করেছি, আর কাজও জোগাড় করেছি।. তুমি যদি বল আমি আজই চলে যাব। আমার মনে হয়, তাই সবচেয়ে ভালো হবে।'

'বোকার মতো কথা বোলো না ক্যাথলীন। এখন তোমার সবচেয়ে ভালো কাজ হবে বাচ্চাটিকে খাওয়ানো'—তখনও সে জানলার ধারে ফিরে দাঁড়িয়ে থাকে।

ক্যাথলীন যখন ওঠার কোনো চেষ্টাই করছে না, তখন ম্যাথিয়াস আবার বলে, 'আমি তো এ-ব্যাপার অনেক আগেই জানতুম। ডাক্তার রোজমার্ক আমাকে গোড়াতেই বলেছিলেন।'

ক্যাথলীন ফুঁপিয়ে উঠে বলে, 'অথচ এ কথা তো তুমি আমাকে একবারও জানাও নি।'

ম্যাথিয়াস উত্তর দেয়, 'জানিয়ে কিছু লাভ হত কি?'

অনুবাদ: মলিনা রায়

The Meeting by Boris Djacenko

লেসজেক কোলাকোস্কি

রাহাবের গল্প

লেসজেক কোলাকোস্কি ওয়ারশ বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক দর্শনের ইতিহাসের অধ্যাপক। বয়স ৩৭। কিন্তু দর্শন-চর্চা ছাড়াও তিনি সংবাদপত্রে গল্প, প্রবন্ধ, ফীচার ইত্যাদি লিখে থাকেন। বর্তমান গল্পটি তাঁর 'Tales and Parables' থেকে নেওয়া। যতদূর জানা আছে বাংলা ভাষায় এঁর গল্প আগে কখনও অনুবাদ হয়নি।

যশুয়ার বইয়ে কুখ্যাত গুপ্তচরবৃত্তি, সংগীত, হত্যাকাণ্ড এবং যেরিকোতে আর যা যা ঘটেছিল তার বিবরণ আছে। ঈশ্বর যশুয়াকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, তিনি যেরিকো ও অন্যান্য দেশ জয় করবেন। যশুয়া যে কেন এই প্রতিশ্রুতিতে আশ্বস্ত হন নি, যদিও এর ওপর ভরসা করে তিনি নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেতে পারতেন—তা পরিষ্কার নয়। যেরিকো অবরোধের পূর্বে, তিনি সেখানে কয়েকজন চর পাঠিয়েছিলেন, আর এক্ষেত্রে সচরাচর যা করা হয়, তাদের সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিলেন প্রচুর পরিমাণে সে দেশের মুদ্রা। যে ছোকরাদের তিনি পাঠিয়েছিলেন তারা ছিল যাকে বলা হয় হীরের টুকরো ছেলে, কিন্তু তারা ছিল একটু চপল মতি। শহরে ঢুকেই তারা স্থির করল, সামরিক বৃত্তিতে থাকার ফলে সভ্যতার যে সব আনন্দ থেকে দীর্ঘকাল তারা বঞ্চিত তা আস্বাদ করবে। তাদের পকেটে ছিল প্রচুর টাকা। তাই নিয়ে সেই সন্ধ্যায় তারা লাল লণ্ঠনওয়ালা বাড়ির সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। সংস্কৃতির জন্য খ্যাত সেই শহরে এই ধরনের অনেকগুলি বাড়ি ছিল। একটা অপার্থিব অনুভূতির দ্বারা চালিত হয়ে অনতিকাল অনুসন্ধানের পরই যা তারা খুঁজছিল তার সন্ধান পেল। সে এক মহিলা। নাম রাহাব। এই মহিলার দুর্নাম

ছিল, সে দৈহিক আকর্ষণ বিক্রি করে জীবিকা অর্জন করত। কিন্তু তার দৈহিক আকর্ষণ ফুরিয়ে আসছিল। মেষবহুলা রাহাবের বয়স বাড়ছিল। গরীব-গুর্বো খদ্দেরদের কাছ থেকে থেকে সে কম পয়সা নিত এবং তার আয় কমে আসছিল।

কিন্তু শিবির-জীবনের কৃচ্ছ্রতার পর এই ছোকরা দুটির অতশত বাছবিচারের মত অবস্থা ছিল না—ঐ শুকিয়ে আসা বুড়িতেই তারা খুশি হল। আর পেটে একটু মদ পড়তেই তারা নিজেদের বাহাদুরি দেখাবার জন্য বকবক শুরু করল—এবং অচিরেই যে গোপন মতলব নিয়ে তারা এসেছে মেয়েটির কাছে তা ফাঁস করে ফেলল। যখন তারা বুঝল কি তারা করে ফেলেছে—অপকর্মটি হয়ে গেছে তার ঢের আগেই। এখন তারা রাহাবের হাতের মুঠোয়। ছোকরা দুটি রাহাবের করুণা প্রার্থনা করল। কিন্তু রাহাব জীবনে কারো কাছ থেকে কখনো করুণা পায় নি কাজেই কাউকে দেবার মত করুণাও তার ছিল না। রাহাবের মস্তিষ্কে ত্বরিত চিন্তার তরঙ্গ উঠল: "শত্রুরা এই শহর দখল করবে তা একরকম নিশ্চিত, কেননা আমি জানি ঈশ্বর ওদের সহায়। এইটে হল গোড়ার কথা। এখন দুটো পথ খোলা আছে। গুপ্তচর বলে এই ছোকরা দুটোকে আমি পুলিসের হাতে সমর্পণ করতে পারি। তাতে আমি পাব রাজার কৃতজ্ঞতা আর প্রমাণিত হবে শহরের প্রতি আমার আনুগত্য। কিন্তু তা যদি আমি করি, শত্রু শহরে ঢোকবার পর আমার ধ্বংস অনিবার্য। আর আমি যদি এদের লুকিয়ে রাখি তাহলে দখলকারীদের কাছে আমি নিরাপত্তা প্রার্থনা করতে পারব। অবশ্য শত্রু না-আসা পর্যন্ত আমার জীবনাশঙ্কার ঝুঁকি থাকবে। এবং এও সত্য শত্রুকে লুকিয়ে রাখলে আমি রাজার প্রতি, আমার শহরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করব কিন্তু এতশত বিবেচনা করার আমার দরকার নেই। আমার জন্মের এই শহরের কাছে আমি কিছু ধারি না। এই শহর চিরকাল আমার মুখে থুথু দিয়েছে আর আজ যদি এই শহর ধ্বংসের হাত থেকে অব্যাহতি পায় তাহলে কয়েক বছরের মধ্যেই এই শহর আমাকে অনাহারে মরতে বাধ্য করবে। আমি এখানে একেবারে নিঃসঙ্গ। যেন শূন্য শহরে আমি একক বাসিন্দা। অতএব নীতিবাগীশের কল্পনাবিলাস দূর হোক, আমি মনস্থির করলাম। একদিকে রয়েছে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যুর ঝুঁকি, অন্যদিকে শহর দখলের পর নিশ্চিত মৃত্যু। এ-দুয়ের মধ্যে কোনো একটিকে বেছে নেওয়া সহজ কাজ নয়। নিশ্চিত মৃত্যুটা কিছুদিন পরের ব্যাপার কিন্তু বর্তমানে মৃত্যুর ঝুঁকিটা

সর্বক্ষণের। নিশ্চিত অশুভ ও অনিশ্চিত অশুভের মধ্যে যুক্তি দিয়ে কোনো একটিকে বেছে নেওয়া যায় না। কয়েকটা সপ্তাহ ভয়ের মধ্যে কাটবে—তারপর কী আশ্চর্য জীবন! ক্ষার, মণিমুক্তা, প্রতিদিন মিষ্টান্ন, অপেরায় যাওয়া। হয়তো বা ওদের কোনো সৈন্যাধ্যক্ষ আমাকে বিয়েই করে ফেলবে। এই বর্বরগুলির কাছে তো আমি এখনও আকর্ষণীয়।'

মনে মনে এই যুক্তি করে রাহাব গুপ্তচরদের সঙ্গে চুক্তি করল: সে তাদের লুকিয়ে রাখবে এবং পালিয়ে যেতে সাহায্য করবে। প্রতিদানে, যশুয়ার সৈন্যেরা যখন শহর দখল করবে তখন রাহাব ও তার পরিবার-পরিজনকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। এই ভাবে সংকেত দেবার ব্যবস্থা হল। গুপ্তচরের গল্পের এইখানেই সমাপ্তি।

এইবার গল্পের সংগীতাংশ। ঈশ্বর জেরিকো অবরোধের একটি নিখুঁত পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন। যশুয়া ঈশ্বরের পরিকল্পনা অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন। অর্থাৎ এ-ক্ষেত্রে যা করা উচিত তা মানে—কামান ইত্যাদি ব্যবহার না করে পুরোহিতদের নিয়ে একটি বাদ্যকরদল গঠন করলেন। তাদের আদেশ দিলেন, সামরিক বাজনা বাজিয়ে সারাক্ষণ নগর-প্রাচীরের চারপাশে ঘুরে বেড়াতে। পুরোহিতরা সাতদিন ধরে শিঙে বাজিয়ে ঘুরলেন। পরিশ্রমে তারা দুর্বল হয়ে পড়লেন, তাদের সকলের গলাও ধরে গেল—কেননা, পুরোহিতরাও মানুষ। সৈন্যরা ঘ্যান ঘ্যান করা শুরু করল। কেননা, তাদের ধারণা হল সেনাপতি তাদের বোকা বানাচ্ছে। জেরিকোর নাগরিকেরা প্রাচীরের উপর দাঁড়িয়ে শত্রুদের লক্ষ করে হেসে কুটোপাটি হল। তারা ভাবল শত্রুরা পাগল হয়ে গেছে। কিন্তু কথায়ই আছে তার হাসিই বেশ, যে হাসে সবার শেষ। সপ্তম দিনে বাদ্যকরদল তাদের সব শক্তি দিয়ে এমন জোরে শিঙে ফুঁকতে লাগল যে পুরোহিতদের চোখ ঠেলে কপালে উঠল। এই সময় সৈন্যদলের উপর আদেশ হল একযোগে চিৎকার করে ওঠার। আর সঙ্গে সঙ্গে নগরের প্রাচীর ধুলো হয়ে মাটিতে মিশে গেল।

এইবার হত্যাকাণ্ডের অধ্যায়। ঈশ্বরের আদেশে সৈন্যরা অতঃপর নগরে প্রবেশ করল এবং বাইবেল অনুসারে, "শহরে যা কিছু ছিল, মেয়ে-পুরুষ, যুবা-বৃদ্ধ, বলদ, ভেড়া, গাধা—তলোয়ারের ফলা দিয়ে সব কিছু কেটে খান খান করল।"

পুরোহিতরা রত্নভাণ্ডার দখল করল এবং একটি ছাড়া নগরের আর সব বাড়ি

পুড়িয়ে ছাই করল। যে বাড়িটি রক্ষে পেল সেটি রাহাবের বাড়ি। রাহাবকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল সৈন্যরা তা রক্ষা করল—তার বাড়ি, আসবাবপত্র এবং পরিবারকে অব্যাহতি দিল। কয়েকজন অফিসার রাহাবের উপর বলাৎকার করল কিন্তু রাহাব তাদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করল এবং অর্থ দাবি করল।

তারপর সৈন্যরা চলে গেল। রাহাব মাটিতে পড়ে কাঁদতে লাগল। পরিত্যক্ত শহরে রাহাব একাকী পড়ে রইল—একমাত্র একটি বাড়িতে যেটি অক্ষত আছে—ধ্বংসস্তূপ, মৃতদেহ, ধুলো এবং অঙ্গারের গন্ধ দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে। রাহাব এখন একেবারে নিঃসঙ্গ, নেই কোনো বন্ধু, রক্ষাকর্তা বা খদ্দের। কাজ নেই, মণিমুক্তো নেই, অপেরা নেই—কেউ নেই—সেনাপতি স্বামীও না। মরুভূমিতে শূন্য, উদ্দেশ্যহীন জীবন ছাড়া তার সামনে আর কোনো ভবিষ্যৎ নেই। গল্পের এই শেষ।

সমস্ত গল্পের মধ্যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার আছে একটা: পদার্থ বিদ্যার দিক থেকে দেখলে সাতটা ট্রাম্পেট এবং সৈন্যদের চিৎকারের শব্দে একটা নগর-প্রাচীর ভেঙে পড়তে পারে না। অতএব, এটা একটা অলৌকিক ঘটনা! কিন্তু ঈশ্বরকে যদি অলৌকিক ঘটনা ঘটাতেই হল তবে কেন তিনি সৈন্যদলকে সাতদিন ধরে খাটালেন এবং হাস্যাস্পদ করলেন? পুরোহিতদের কেন বাধ্য করলেন তাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে এবং জনসাধারণের উপর তাদের প্রভাব হানি করতে? পুরোহিতদের নিয়ে বাদ্যকরদল গঠন করলে কে তাদের সম্মান করবে? "কেন?" যদি জিজ্ঞাসা করি। এর দুটো সম্ভাব্য ব্যাখ্যা আছে।

সম্ভবত সামরিক বাদ্যের উপর ঈশ্বরের খুব একটা বড় রকমের দুর্বলতা আছে। তিনি এই সুযোগে প্রাণভরে সামরিক বাদ্য শুনে নিলেন। কিংবা হয়তো এটা একটা স্যুররিয়ালিস্ট রসিকতা, যা তিনি তাঁর প্রজাদের উপর করলেন। যদি দ্বিতীয়টা সত্য হয়ে থাকে তাহলে বলতে হবে ঈশ্বর ভদ্রলোকের পরিহাসবোধ আছে। কিন্তু তাঁর চরিত্র আমি যতটা জানি তাতে মনে হয় প্রথম ধারণাটাই সত্যি। কী দুর্ভাগ্য!…এই ধরনের রুচি এবং এই ধরনের অপ্রতিহত প্রতিপত্তি। বলতে কি, যখন-তখন সামরিক বাদ্য শোনবার জন্য ঈশ্বর ভদ্রলোক কি চেষ্টায় কোন ত্রুটি করছেন। আজও পর্যন্ত এতে তাঁর ক্লান্তি এল না!

এইবার দেখা যাক এই গল্পের শিক্ষা কি।

প্রথম শিক্ষা: রাহাবের অবস্থান। একটা মহাসংঘর্ষের মধ্যে নিজের মাথা বাঁচাবার জন্ত দৈহিক বেশ্যাবৃত্তি যথেষ্ট নয়।

দ্বিতীয় শিক্ষা: গুপ্তচরদের অবস্থান। নিয়তির হাত তোমাকে যে-কোনো সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে ঠেলে দিতে পারে কিন্তু তার মধ্যে সব সময়ই মানবকল্যাণের কোনো জরুরী গোপন উদ্দেশ্য থাকে।

তৃতীয় শিক্ষা: রাহাবের অবস্থান। এই সম্পর্কে চিন্তা করার পূর্বে আমাদের এই ভান করা উচিত নয় যে ভিড়ের মধ্যে আমরা নিঃসঙ্গ—একা। নিঃসঙ্গতার অর্থ কি তা আমরা তখনই বুঝতে পারব যখন আমরা সত্যিই একা পড়ব।

চতুর্থ শিক্ষা: সাধারণ অবস্থান। শিঙে ফুকতে থাকুন—অলৌকিক কাণ্ড ঘটলেও ঘটতে পারে।

অনুবাদ: প্রদ্যোৎ গুহ

Rahab or Real and Pretended Solitude by Leszek Kolakowsky

কারোলি কাকোনাই

বাসাবদল

কারোলি কাকোনাই একজন তরুণ লেখক। পেশা সাংবাদিকতা। ইতিমধ্যে বেশ কিছু ছোটগল্প তিনি লিখেছেন।

ব্রিটিশ ফিল্মে এ-ধরনের বাড়ি দেখা যায়। বিরাট, মজবুত। সদর দরজার দু পাশে দুই সাবেকী আমলের থাম। দরজার উপরে, চৌকাঠের এক কোণে স্ফটিক কাঁচে ৮—বাড়ির নম্বর। রাত্তিরে, রাস্তার আলোয়, বেড়ালের চোখ বলে মনে হয়।

ভ্যানটা আস্তে আস্তে এসে থামে। গাড়ির পিছনটা দরজার মুখে। ড্রাইভার নেমে জানতে চায় সাহায্য করবে কিনা। আমি মুখ খোলার আগেই ওরা বলে দেয়—না। 'কী দরকার!' ফিশফিশ করে নাওমী বলে, 'কে জানে বাবা হয়ত একশো ফোরিন্ট বকশিশ চেয়ে বসবে।'

লাফ দিয়ে আমরা রাস্তায় নামি। ড্রাইভারের পাশের আসন থেকে রেজিনা সোজা উপরে চলে যায়। ল্যাণ্ডলেডীকে আমাদের আসার খবর জানাতে।

গলিটা সরু। সোমবারের সকাল। উপরতলার জানালায় জানালায় শরতসূর্যের ঝিকিমিকি। আবহাওয়া ঠাণ্ডা-ই।

ভ্যানের পিছনদিকের ঢাকনাটা আমরা খুলে ফেলি। বিরাট ভারী ওয়ার্ডরোব আর কৌচটা এমুড়ো-ওমুড়ো দড়ি দিয়ে বাঁধা। আগে আমরা ওয়ার্ডরোবটা নামাই। নামিয়ে সদরের মুখে নিয়ে গিয়ে রাখি। তারপর কৌচটা। অর্থাৎ বড় মাল খালাস হয়ে গেল। বাকি রইল কয়েকটা ঝুড়ি, কার্ডবোর্ডের গুটিকয় বাক্স, তাস-খেলার একপেয়ে টেবিলটা, একটা স্যুটকেশ আর কম্বল দিয়ে বোচকা-বাঁধা সামান্য বিছানাপত্র।

পাছে দেরি হলে ড্রাইভার বাড়তি কিছু চেয়ে বসে, মারের ও নাণ্ডী চটপট হাত চালায়। যেন নিজেদেরই মালপত্র বইছে, বা ডিউটি তামিল করছে।

ভ্যান খালি হওয়ামাত্র নাণ্ডী বলে, 'যা, ওকে আগে মিটিয়ে দিয়ে আয়।'

স্টিয়ারিং হুইলের পিছনে ড্রাইভার গুম হয়ে। উপরি বেহাত হওয়ায় চটেছে আর-কি! ওকে তিরিশ ফ্লোরিণ্ট বকশিশ দিই।

মাত্র তিরিশ! ড্রাইভার মুখ বেজার করে। আমার খারাপ লাগে। তবে মনে কিছু করি না। বিড়বিড় করতে করতে ও গাড়ি হাঁকিয়ে চলে যায়। একটা ধন্যবাদও দিল না? আশ্চর্য!

নাণ্ডী বলে, 'এদের সম্পর্কে হুঁশিয়ার। ঠাণ্ডা মাথায় এরা গলা কাটে।' বলে বাড়িটার দিকে তাকায়। 'ভাখ ভাখ, একেবারে রাজপ্রাসাদ! শহরের মধ্যিখানে! এর চেয়ে সেরা জায়গা পেতিস না।'

ধূসর রঙের বিরাট বাড়িটায় বারেক চোখ বুলিয়ে জিজ্ঞেস করি, 'তোদের খুব ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে, নারে?'

নাণ্ডী বলে, 'তা কিছুটা হয়েছে বৈকি।'

নাণ্ডী আমারই বয়েসী। গাট্টাগোট্টা শরীর। কদমছাঁটা চুল। ফ্যাক্টরী টিমের সেণ্টার ফরওয়ার্ড। কী ফ্যাক্টরীতে কী পথেঘাটে সব জায়গায় সব সময় চড়কির মত ঘোরে। পায়ে বল নিয়ে বা বলের পিছনে ছোটে যেন।

রেজিনা ফিরে এসে দরজায় দাঁড়ায়। পরনে নীল-সবুজ ঝলমলে পোশাক। হাল আমলের ফ্যাশানমাফিক কোমরের নিচে বেল্ট। বিয়ের খোঁপা এখনও অটুট, শুধু কপালের এখানে ওখানে কয়েক গোছা চুল। এই-ই আমার পছন্দ। গলায় জড়ানো পাতলা একটা তুলোর স্কার্ফ। খাটো স্কার্ট আর কোট। দুই হাঁটু চকচক করছে। দারুণ দেখাচ্ছে!

রেজিনা বলে, 'মালপত্র নিয়ে চলো।'

আমি ওর গলা জড়িয়ে ধরি। ধরে কাছে টানি। তারপর, বন্ধুদের সামনেই, চুমো খাই।

সবাই হেসে ওঠে। হাসে মারেরও। এক চিলতে। ওর হাসিই অমি।

মারের হেসেছে দেখে আমার ভারি ভালো লাগে। কেননা গোড়ার দিকে রেজিনাকে ও আমল দিত না। শিফটের শেষে লিটল ডাইস কাফেতে রেজিনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, মারের ওর দিকে একবার তাকায় মাত্র, কথা বলে না। নাণ্ডী কিন্তু অন্য রকম। দিব্যি জমিয়ে ফেলে। ফষ্টিনষ্টি

অমি শুরু করে দেয়। সেজন্যে অবিশ্যি আমার ঈর্ষা জাগে নি। সে-কথা মনেও হয় নি। আমরা যে বন্ধু। গলায় গলায় ভাব আমাদের। বরং আমার ভালোবাসার মেয়েটিকে নাণ্ডীরও ভালো লেগেছে বলে খুশী হয়ে উঠেছি। মায়েরের গোমড়া মুখ দেখে ক্ষোভ জেগেছে।

পরের দিন ফ্যাক্টরীতে মায়েরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—কাল কেন ও শুম্ হয়ে ছিল? তিন-তিনবার প্রশ্নটা ওকে করতে হয়। তৃতীয় বার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে গলা ফাটিয়ে। ফ্যাক্টরীর মধ্যে অবিশ্যি এটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। মেশিনের যা আওয়াজ!

'সানিও', শেষ অমি মায়ের বলে, 'ও কি তোর সঙ্গে খাপ খাবে? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

ওর কথা শুনে আমি থমকে গিয়েছিলাম। কিন্তু 'তাতে তোর কি?' জাতীয় কোন জবাব দিতে পারিনি। কারণ মায়ের তো শুধু বন্ধু নয়, আমার বাবার মতো। ও আমাকে হাতে ধরে কাজ শিখিয়েছে। ও আর নাণ্ডী আমার বন্ধু বলে মেনে নিয়েছে। তিন বছর ধরে আমরা এক পরিবারের লোকের মতো বসবাস করছি। এক সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা। মায়েরের কথাটা তাই প্রাণে বড় বাজে, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারি নি। শুধু অবাক হয়ে ভেবেছি কেন ও রেজিনাকে পছন্দ করছে না! কত সুন্দর রেজিনা! কী মিষ্টি মেয়ে রেজিনা! আমরা দুজন দুজনকে কত ভালোবাসি! জেনেশুনেও কেন ও এমন করছে?

এ নিয়ে নাণ্ডী ওকে কিছু বলে থাকবে। কেন-না পরে একদিন মায়ের আমার টুপিটা এক হ্যাঁচকায় কপালে নামিয়ে দিয়ে ঠাট্টা করে বলেছিল, 'বুঝলি সানিও, প্রেমটা স্রেফ দুজনের ব্যাপার। আমাকে নিয়ে কেন মিথ্যে মাথা ঘামাস।'

একথা শুনেও আমার মন মানে নি। দস্তুরমত মুষড়ে পড়েছিলাম। কী বলতে চায় ও? ওকে নিয়ে মাথা ঘামাব না মানে? রেজিনা আমার সঙ্গে খাপ খাবে না কেন?

ব্যাপারটা আমি যাতে ভুলে যাই মায়ের সেজন্যে তৎপর হয়ে ওঠে। তারপর থেকে রেজিনার সঙ্গে দেখা হলে ভালো ব্যবহার শুরু করে। তবে ওরা কথাবার্তা বড় একটা বলত না।

মায়ের যাই বলুক, নিজে কিন্তু আমি ভালো করেই বুঝেছিলাম যে আমরা

দুজন দুজনের উপযুক্ত। আমি আর রেজিনা। সব বিষয়ে আমাদের মতের মিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা চুমো খেয়ে বা নিরালা পথের ধারে বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে দেখতে কাটিয়ে দিতে পারি।

এরপর, বিয়ের ঠিকঠাক হয়ে গেলে, মারের আর নাণ্ডী একটি ছাতা কিনে আনে। ফ্যাশন দুরস্ত লম্বা বাঁটওলা ছাতা। লিটল ডাইস কাফেতে মারের সেটা রেজিনাকে উপহার দেয়। আমাদের দামী আইসক্রীমও খাওয়ায়। মনে পড়ে।

মারেরকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলাম। রেজিনা সম্পর্কে ওর বিরূপতা কি কেটেছে? মনে হল যেন কেটেছে। আমাদের মিলনে ও খুশী হয়েছে।

মারের খুশী হয়েছে। মারের খুশী হয়েছে। 'তোরা কী ভালোরে। কী ভালো। কী ভালো।' বলতে বলতে আমি উথলে উঠি, দু চোখ আমার ছলছলিয়ে আসে। 'আমার বন্ধুরা খুউব ভালো, না রেজিনার কী চমৎকার একটা বাসা যোগাড় করে দিয়েছে বলো ত। তারপর এতসব মালপত্র—'

আমার হঠাৎ উচ্ছ্বাসে নাণ্ডী থতমত খেয়ে যায়। চাপা ধমক দিয়ে মারের বলে, 'বাজে কথা রেখে এগুলো ওপরে নিয়ে যাওয়া দরকার। বেলা হয়ে যাচ্ছে খেয়াল রাখিস।'

মারের আমাদের চেয়ে বয়েসে বড়। পাতলা শরীর। সব সময় একটা চেককাটা সুঁচলো টুপি পরে থাকে। চেরিকাঠের হোল্ডারে আধখানা করে সিগারেট খায়। বিবাহিত। দুটি সন্তান আছে। কিন্তু সেটা আমাদের বন্ধুত্বের পথে বাধা হয় নি।

'ঠিক ঠিক।' আমি সায় দিয়ে উঠি। 'দুটোয় তোদের আবার কাজে যেতে হবে। তা আমি বলি-কি, মালপত্র যেমন আছে থাক, আমি আর রেজিনা তুলে নেবখন। তোদের ওপর তো কম ধকল গেল না। তোরা বরং—'

'তুই আর রেজিনা!' নাণ্ডী ঠা ঠা করে হেসে ওঠে। 'বেড়ে ঠাট্টা শিখেছিস! যাকগে, আগে ওয়ার্ডরোবটা তুলব, না অন্যগুলো—তাই বল? হুকুম দে—তুইই এখন কর্তা।'

অগত্যা মালপত্র পাহারা দেওয়ার জন্যে রেজিনা সদরে থেকে যায়। ওয়ার্ডরোবটাকে আমরা তুলে ধরি।

ওরা আমাকে কাঁধ দিতে দেয় না। ওয়ার্ডরোব কাঁধে নিয়ে ওরা

চারতলার সিঁড়ি ভাঙে, আমি চলি পাশে পাশে, ধরে রেখে ব্যালান্স সামলাই। সেকেলে ভারী দশাসই আয়না-বসানো ওয়ার্ডরোব। সিঁড়ির প্রথম বাঁকে পৌঁছে নাণ্ডী সশব্দে হাঁফ ছাড়ে। চিৎকার করে রেজিনাকে বলে, 'তোমার বাবার এ রদ্দি মালটা পাথরের নয় ভাগ্যিশ! বাপস!'

নিছক ঠাট্টা। ওরা জানে যে শ্বশুরমশায় এটা আমাদের দিয়েছেন। মুখ-আলগা নাণ্ডীর কাছ থেকে এমন ঠাট্টায় সবাই অভ্যস্তও। কিন্তু মুখখানা রেজিনার থমথমে হয়ে ওঠে।

নাণ্ডীর ভ্রূক্ষেপ নেই। হাঁফাতে হাঁফাতে ফের সিঁড়ি ভাঙে।

'যত শিগগীর পারি আমি আরেকটা কিনব।'

'ততক্ষণে এটা আমরা চারতলায় তুলে ফেলব।'

মাল বওয়ার ধকলে সবাই ঘেমেনেয়ে যাই। বৃদ্ধা ল্যাণ্ডলেডী দালানে এসে দাঁড়ায়। গলায় শাল জড়ানো। ছাই-নীল পোশাক। মোটাসোটা শরীর।

'দেয়াল সামলে! দেয়াল সামলে!' ল্যাণ্ডলেডী হাঁ হাঁ করে ওঠে। 'মাত্র সেদিন কলি ফেরানো হয়েছে।' বলতে বলতে খুদে খুদে চোখ দুটি তার কেবলি ঘুরপাক খায়।

রান্নাঘরের ভিতর দিয়ে ও-ঘরে যাওয়ার দরজা। ঘরটা আমি এই প্রথম দেখছি। কারণ বিয়ের মজলিসে প্রথম ওরা ঘরটার কথা বলে। বলে, বিয়ের উপহার হিসেবে ঘরখানা জোগাড় করে দিয়েছে।

ছোটখাট হলেও দিব্যি ঘর। গাঢ় বাদামী রঙকরা মেঝে। জানালা দিয়ে উঠোন দেখা যায়।

ওয়ার্ডরোবটা ঠিকমত রাখা হলে নাণ্ডী ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাঁফায়। হাত দিয়ে কপালের ঘাম মোছে। তারপর উপহারদাতার সুখী-সুখী হাসি হেসে বলে, 'এ ঘরে চলে যাবে, নাকি বলিস?'

এতক্ষণে কিছুটা টের পেয়েছি। সত্যি বলতে কি, কিছুটা আঁচ আমি আগেই, বিয়েরও আগে, করতে পেরেছিলাম। কিন্তু এ নিয়ে ভাবতে চাই নি। যা হবে, যা অনিবার্য তা নিয়ে মাথা ঘামাতে আমি নারাজ। যখনই কথাটা মনে হয়েছে, মনকে বুঝিয়েছি: এখনও তো কিছু ঘটে নি। ঘটুক না। ঘটলে দেখা যাবে। যে করে হোক ঠিক সামলে নেব। কিন্তু আমি জানতাম যে-করে-হোক-ঠিক-সামলে-নেওয়া আমার দ্বারা হবে না। তাই ভাবনাটাকে পাত্তা দিই নি।

কিন্তু এখন, প্রান্তক্লান্ত নাণ্ডীর হাসিখুশি মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেকে কেমন অপরাধী অপরাধী মনে হয়।

'তোরা না আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু। তোদের ঋণ আমি জীবনেও—'

'ন্যাকামি! মারব পাছায় এক লাথি।' নাণ্ডী গম্ভীর হয়ে যায়। 'এটা অবিশ্যি দু-কামরার পুরোদস্তুর ফ্ল্যাট নয়, তা তোদের দুজনের—'

'দু-কামরার পুরোদস্তুর ফ্ল্যাট!' বাধা দিয়ে আমি বলে উঠি, 'দুনিয়ায় আছে নাকি?'

সবাই হাসি। নাণ্ডী আমার কাঁধে হাত রাখে। বাকি মালপত্র নিয়ে আসার জন্যে আমরা নামতে শুরু করি।

নতুন করে বুঝি কত অন্তরঙ্গ বন্ধু আমরা! কী আপন! ওদের কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা নেই। ওরাই আমার কাজ যোগাড় করে দিয়েছে, হাতে ধরে কাজ শিখিয়েছে। তিন-তিনটা বছর! সেই নানা রঙের দিনগুলি! মারেরই প্রথম আমাকে কেতাদুরস্ত এক দর্জির কাছে নিয়ে যায়। নিজের খুশিমত দর্জিকে দিয়ে সেই প্রথম আমি পোশাক তৈরি করাই।...জীবনে প্রথম বড়দিন ওদের সঙ্গে কাটাই। বড়দিনের আনন্দ কাকে বলে তার আগে আমি জানতাম না।...প্রতি রববার খেলার মাঠে। গলা ফাটিয়ে নাণ্ডীকে উৎসাহ দেওয়া।...বীয়ারের গ্লাস নিয়ে সন্ধ্যা কাটানো। কী মধুর সেই সব সন্ধ্যা।... তারপর এই বাসা খুঁজে দেওয়া। নতুন বাসা!

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বাসার কথাটা ফের বলতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ মনে পড়ে যায় আরেকটা কথা। গত কয়েকদিন ধরে, বিশেষ করে গত দুদিন যা আমায় অস্থির করে তুলেছে। কথাটা মনে হতেই দু পা অবশ হয়ে আসে। কে যেন আমার গলা টিপে ধরে। অকথ্য অস্বস্তিতে আমি ছটফটিয়ে উঠি।

'কী হল রে?' কয়েক ধাপ নিচে থেকে নাণ্ডী ফিরে তাকায়। 'আয়।'

এখনই ওদের, ওকে অন্তত কথাটা বলে ফেলা দরকার। না, শুধু ওকে নয়, মারেরকেও। যদি না বলি খারাপ হবে। যত বেশি দেরি তত বেশি খারাপ। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা বিচ্ছিরি হয়ে দাঁড়াবে।—নাণ্ডীর দিকে তাকাই। হাসছে। খেলার শেষে ড্রেসিং রুম থেকে এমনি হাসিহাসি মুখে বেরিয়ে আসে। আমি আর মারের তখন বলি: কী খেলাই দেখালি রে! তুই জাদু জানিস নাণ্ডী। জাদু ও জানে কিনা জানি না, কিন্তু বরাবর আমরা এই বলে ওকে তারিফ জানাই। এর মধ্যে কোন ভান নেই। পিঠ-

চাপড়ানির ভাব নেই। আমরা সত্যিই মনে করি নাণ্ডী ভালো খেলোয়াড়। আমাদের কথায় ও বলে: কেন বাজে বকিস! কিন্তু মিনিট কয়েক পরেই, স্যাক্টরি ক্লাবে এসে শুধোয়: খেলাটা বেশ হয়েছে, নারে?

নাণ্ডী ফের জিজ্ঞেস করে, 'কী হল রে তোর?'

'কিছু না। মনে হচ্ছিল ওপরে কে যেন চেঁচাচ্ছে।' কথাটা নিজের কানেই কট করে বাজে: মিছে কথা বললাম! কেন ওকে আমি মিথ্যে বললাম! কোথায় ওকে সেই কথাটা বলে ফেলব, তা নয়—ওকে কিনা ধাপ্পা দিলাম!

নাণ্ডীর মুখোমুখি তাকাতে পারি না। ঘাড় হেঁট করে ওকে পাশ কাটিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে যাই।

এরপর আমি বড় বেশি কথা বলতে শুরু করে দিই।···চেয়ারগুলো এখন থাক।···আরও দড়ি পেলে ভাল হত—এইটুকুতে কী হবে! উনোনের কাঠ ফুরিয়ে গেলে তাস-খেলার টেবিলটা ভেঙেচুরে গুঁজে দেব।—যা মুখে আসে বলে যাই। অনর্থক গলা চড়াই। মাত্রাছাড়া চটপটে হয়ে উঠি। আর, আড়ে আড়ে তাকাই। ওদের ভ্রূক্ষেপ নেই। কেন আমি হঠাৎ এমন বাক্যবাগীশ হয়ে উঠলাম যদি শুধিয়ে বসে, নির্ঘাত ঘাবড়ে যাব। সঙ্গে সঙ্গে খুশীও হব। কেননা সেই কথাটা বলার সুযোগ পাব। পেয়ে বর্তে যাব। নিজের ব্যবহারই নিজের কাছে খাপছাড়া লাগে।

মালপত্র তোলা শেষ হলে রেজিনা উপরে উঠে আসে।

নাণ্ডী ল্যাণ্ডলেডীর কাছে এগিয়ে যায়। সিগারেট ধরিয়ে বলে, 'উদ্বাস্তু দুই চখাচখিকে আপনার জিম্মায় রেখে গেলাম।' বলতে বলতে, সিগারেট অভ্যেস নেই বলে, কাশতে শুরু করে। খানিক পরে আবার বলে, 'এদের কথা যা বলেছিলাম—ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে কি না? এদের নিয়ে আপনাকে কোনো হাঙ্গামা পোয়াতে হবে না। চলি তাহলে?'

বৃদ্ধার মুখে হাসি ফোটে। প্রথমে আমার দিকে তাকায়। তারপর রেজিনার জমকালো কোট ও খোলা হাঁটুর উপর কয়েক মুহূর্ত অপলক তাকিয়ে থেকে শালটা ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে বলে, 'আসুন। কিচ্ছু ভাবতে হবে না। তিন মাসের ভাড়া আগাম দেওয়া আছে—'

'তিন মাসের ভাড়া ' আমি চমকে উঠি। 'কিন্তু আমি তো এখন অব্দি'—

'ইনি দিয়েছেন।'

'আমি নারে—আমরা।' দেশলাইয়ের বাক্সে সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে নাণ্ডী বলে, 'এটাও আমাদের বিয়ের উপহার।'

'তোরা—'

বাধা দিয়ে মাহের বলে, "কিরে, এবার যাবি, না, শিফটা এখানেই কাটবে?'

আমি বলি, 'তার আগে সবাই মিলে একটু গলা ভিজিয়ে নেওয়া যাক। এসো রেজিনা।'

'তোমরা যাও। আমি ততক্ষণে ওদিকে গোছগাছ করে ফেলি।' রেজিনার মুখ এখনো থমথমে।

কেন রেজিনা এমন করে? আমার বন্ধুদের সামনে কেন মাঝে মাঝে এমন গম্ভীর হয়ে পড়ে? রাগ হয়ে যায়। এ নিয়ে রেজিনার উপর এই প্রথম আমি রেগে উঠি।

শক্ত করে রেজিনার হাত ধরে বলি, 'চলো। গোছগাছ পরে হবে।'

মাহের এগিয়ে যায়। দালান পেরিয়ে সিঁড়ির মুখে।

'না। আমি যাব না।'

মাথাটা দপ করে ওঠে। আবার ওকে চটিয়ে দিতেও ভরসা পাই না। দুই চোখ ঝকঝক করছে। মুখ কঠিন। নিচের ঠোঁট সামান্য ঝুলে পড়েছে। 'আমি না গেলে নিশ্চয় ওঁরা রাগ করবেন না। করবেন?'

'পাগল!' নাণ্ডী চটপট জবাব দেয়, 'রাগ করতে যাব কেন!'

মুখে যাই বলুক, আমি কিন্তু জানি রেজিনা সঙ্গে গেলে নাণ্ডী খুশী হবে। রেজিনার সঙ্গে ও সব সময় বন্ধুর মত ব্যবহার করতে চায়। কিন্তু রেজিনা ওকে ঘেঁষতে দেয় না। রেজিনাকে সে-কথা একবার বলেও ছিলাম। জবাবে শুনেছি: আমি ঠিকই করি। তর্ক করি নি। লাভ? নাণ্ডীর মনটা ভীষণ স্পর্শকাতর। ও সব বোঝে, আমি জানি। তবু যে রেজিনার দেমাক সহ্য করে যায় সে আমারি মুখ চেয়ে।

রেজিনাকে কুর্নিশ করে নাণ্ডী বলে, 'এবার তবে বিদেয় হই, দেবি।' বলে মুচকি হাসে। স্বভাবসুলভ হাসি।

সিঁড়ির মুখ থেকে মাহের বিদায় জানায় রেজিনাকে।

রেজিনাকে চুমো খেয়ে বলি, 'যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসছি। চললাম?'

'এসো।'

আমি আর নাণ্ডী তড়বড় করে সিঁড়ি দিয়ে নামি। তিন তলায় মায়েরের সঙ্গে দেখা।

মায়ের বলে, 'তুই না এলেই পারতিস।'

'বটে! তেষ্টায় বলে আমার গলা ফেটে যাচ্ছে।'

একে একে সিঁড়িগুলি শেষ হয়। রাস্তায় নামি। আবার সেই কথাটা মনে পড়ে যায়। ফের সেই অস্বস্তি। নাঃ, কথাটা বলে ফেলতেই হবে। শুঁড়িখানায় অন্তত। নইলে বুকের এই দুর্বহ বোঝা বইতে পারব না। মায়েরের বউকে নিয়ে উধাও হওয়ার, নাণ্ডীর পকেট থেকে মনিব্যাগ গায়েব করে দেওয়ার চেয়েও জোরালো অপরাধবোধ আমায় কুরে কুরে খাবে।

কাছাকাছি একটা শুঁড়িখানার হদিশ মিলল। ক্যাশ ডেস্কে গিয়ে আমি তিন গেলাস মদের দাম দিয়ে এলাম।

ঘরটা বাজে, নোংরা। খোঁড়া একটা ভিখিরি দেওয়ালে হেলান দিয়ে মদ গিলছে। কাউন্টারের কাছে কয়েকজন রঙ্-মিস্ত্রি বীয়ার টানছে।

আমরা একটা টেবিলে গিয়ে বসি। নিজেদের গেলাস ঠোকাঠুকি করি।

মায়ের বলে, 'ফের বলছি—তোর বড়বাড়ন্ত হোক।'

সবাই চুমুক দিতে যাচ্ছি, হঠাৎ মায়ের মুখ থেকে গেলাস নামিয়ে রাখে। বলে, 'তুই তো জানিস সানিও, উপদেশটুপদেশ দেওয়া আমার পোষায় না। কিন্তু জীবনে আমি অনেক কিছু দেখলাম। বিস্তর অভিজ্ঞতা হয়েছে। আগে তুই যেমন ছিলি তেমনি আর থাকবি না। রেজিনার সঙ্গে ঘর করতে করতে সব বদলে যাবে।'

হঠাৎ আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। মনে হয়, মায়ের যেন আমার বুকের ভেতরটা স্পষ্ট দেখে ফেলেছে। আমার নাড়িনক্ষত্রের পরিচয় পেয়ে গেছে।

এটা অবিশ্যি আশ্চর্য না। গত তিন বছর ধরে পরস্পরকে আমরা গভীর ভাবে জানি তো।

তাড়াতাড়ি গেলাসটা তুলে ধরি। গেলাসের আড়ালে মুখ রেখে বলি, 'আমি জানি তুই কি ভাবছিস। কিন্তু বন্ধুরা চিরকাল বন্ধুই থাকবে।'

'জয় হোক আমাদের বন্ধুত্বের।' নাণ্ডী তার গেলাসে চুমুক দেয়, দিয়েই শিউরে ওঠে। 'কড়া মাল!'

'বন্ধুত্ব!' এক ঢোঁক খেয়ে মায়ের বলে, 'হ্যাঁ, বন্ধুত্ব।' বলে আরেক

চোঁক খায়। পকেট থেকে দোমড়ানো প্যাকেটটা বের করে সবাইকে সিগারেট দেয়। নিজেরটা আধখানা করে হোল্ডারে পোরে। আমি দেশলাই জ্বালিয়ে সামনে ধরি, ও সিগারেট ধরায় না। দুই আঙুলে হোল্ডার চেপে বলে, 'সানিও, তোরা ছুটিতে, তুই আর রেজিনা সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘরসংসার কর—এটাই এখন সবচেয়ে বেশি কাম্য।'

কাঠির আগুন আমার আঙুলে লাগে। যন্ত্রণায় 'ঊশ্!' করে উঠে কাঠিটা তাড়াতাড়ি ফেলে দিই।

আরেকটা কাঠি জ্বালাই। সিগারেট ধরিয়ে মায়ের দমভর টানে। বলে, 'সল্টেড বাদাম খেলে হত না। মালটা সত্যিই বড্ড কড়া। পেট জ্বলে যাচ্ছে।'

'নিয়ে আসি।' আমি উঠে কাউন্টারে যাই। কাউন্টারে ওদের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মনে হয়, ওরা যেন নিজেদের মধ্যে আমায় নিয়ে কী বলাবলি করছে। আচমকা ফিরে দাঁড়াই।

বেকুবের বেহদ্দ! মায়েরের চোখ দরজার দিকে। নাণ্ডী দেখছে খোঁড়া ভিখিরিটাকে। গ্লানিতে মন আমার ভরে যায়।

ওদের কাছে যদি সব খুলে না বলি তবে চিরটাকাল এই চলবে। এই সংশয়! অবিশ্বাস! জীবন আমার বিষিয়ে যাবে।

প্লেটটা এনে টেবিলে রাখতে মায়ের একটা বাদাম তুলে নিয়ে চিবোতে থাকে।

এবার। এখন। এই তো বলার সময়। সোজা হয়ে বসি। বুক ঢিবঢিব করে। রক্ত ছলাৎ ছলাৎ। সারা শরীরে চাপা উত্তেজনা। 'মায়ের!' মুখ খুলি। মায়ের তাকায় না। অর্থাৎ আমি শুধু মুখই খুলেছি, মুখ দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরোয়নি।

কেশে নিয়ে ফের আমি তৈরি হচ্ছিলাম, নাণ্ডী বলে, 'লোকজন চলে গেলে তোর শাশুড়ী আমাদের শ্রাদ্ধ করে নি?'

'কেন? আমার শাশুড়ী কেন তোদের—'

'খেতে বসে অমন হইহল্লা করছিলাম বলে?'

'অ! না, কিছুই বলে নি।'

শাশুড়ীর কথা কেন জিজ্ঞেস করল বুঝতে পারি না। চাইও না বুঝতে। সেই কথাটা এখন বলা দরকার। এখুনি। নইলে গালগল্প একবার শুরু হয়ে গেলে বলার সুযোগ পাব না। তারপর যে যার আস্তানায় ফিরে

যাব। পরে আর বলার সাহস হয়ে উঠবে না। কিন্তু আমি না বললেও ওরা জেনে যাবে। হপ্তাখানেকের মধ্যেই জেনে যাবে। নিজে থেকে আমি বলিনি, অথচ ওর জেনে গেছে—ভাবতেও খারাপ লাগে।

মায়ের বলে, 'তুই যা গান শুরু করেছিলি! একেবারে পাড়া জাগিয়ে—'

মুচকি হেসে নাণ্ডী বলে, 'গান গাইতে প্রাণ চাইছিল যে। তা হাঁরে, আমরা চলে আসার পর তোর শালারা কিছু বলেছে?'

'কী আবার বলবে!' নাণ্ডীর প্রশ্নটা মাথায় ঢোকে না। এবার বলো! এবার বলো! সেই কথাটা এবার বলে ফেল! মনকে আমি কেবলি বোঝাই।

'মায়ের সম্পর্কে?'

'কী?'

'মায়ের সম্পর্কে কিছু বলেনি? ও কিন্তু খুব ভদ্রলোক হয়ে ছিল।'

'নিশ্চয়।'

'হুঁ, গান আমি গেয়েছি বটে।' নাণ্ডী মুচকি মুচকি হাসে। চাঞ্চল্যকর একটা বাহাদুরি দেখিয়েছে, অথচ এখন হুবহু মনে করতে পারছে না। 'আমি কি রাতভর গেয়েছিরে? কী গান?'

'যত রাজ্যের মার্চিং সং।'

'মার্চিং সং।' মায়েরের কথায় হাসিতে নাণ্ডী ফেটে পড়ে। 'মার্চিং সং গেয়েছি? কী কাণ্ড!'

হাসে মায়েরও।

আমি দেখি। আমার সামনে যেন পুরু একটা কাচের দেওয়াল। তার আড়ালে বন্ধুরা। কী ভাবে ওরা নড়াচড়া করছে, কথার সময়, হাসির সময় ওদের মুখের ভাবভঙ্গি কেমন হচ্ছে—যাচাই করি। কিন্তু কোনো আওয়াজ শুনি না। না কথার, না হাসির। আর যেন আমি ওদের কেউ নই। ওরা দুজনে প্রাণের বন্ধু। নিজেদের মধ্যে ওদের গোপন কিছুই নেই। আমার সঙ্গে আলাপ হওয়ার আগে ওরা এমনি ছিল। তারপর আমাকেও কাছে টেনে নেয়। আমি ওদের একজন হয়ে উঠি। তিনজনে মিলে একজন। আর আজ—

কিন্তু আমিই বা কী করতে পারতাম? আমি কি জানতাম যে আমাদের

সম্পর্কে শ্বশুরমশায়ের অমন একটা প্ল্যান আছে? সেই প্ল্যানের কথা শোনার পর—

'এই সানিও!' আমার বুকে খোঁচা মেরে নাণ্ডী বলে, 'জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছিস? তা হ্যাঁরে, সত্যিই আমি মার্চিং সং গেয়েছিলাম। বিয়ের ভোজে মার্চিং সং—হাঃ হাঃ হাঃ! গেয়েছিলাম?'

'গেয়েছিলি।' হঠাৎ মনে পড়ে যায় ভোজ মজলিশের দৃশ্যটা। রেজিনাদের বাড়িতে আত্মীয়-স্বজন অনেক। আগে ওদের একটা কারখানা ছিল। নানান আসবাবে ঠাসা ঘর। লোকে গিশগিশ করছে। রেজিনার বাবা ভারভারিক্কি হয়ে বসে আছে। রেজিনার মা বাসন-কোসন নিজে আদেখ্‌লেপনা করছে। নাণ্ডী শ্রমিক আন্দোলনের গান গাইছে। মার্চিং সং চ গলা চিরে অনর্গল গেয়ে চলেছে।

নাণ্ডী বলে, 'তোর শাশুড়ীর কিন্তু তোকে তেমন পছন্দ হয় নি।'

'জানি।'

'কিন্তু শ্বশুরের?'

এইবার! এই সুযোগ! এবার ওদের বলে দেখি। আমি গা ঝাড়া দিয়ে বসি। কিন্তু গলা আমার শুকিয়ে আসে।

'শ্বশুরের খুব হয়েছে।' দুহাতে গেলাসে চেপে ধরে মারের হাতের তালুর তাতে গেলাসের মদটাকে যেন গরম করে নিতে চায়। 'তোর শ্বশুর নাকি তোকে ওদের কো-অপারেটিভে ঢুকিয়ে নিতে চাইছে?'

মারেরের দিকে তাকাই। নাণ্ডীর দিকে তাকাই। নাণ্ডী কথাটার মানে বোঝে নি। বোঝার গরজও আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু মারেরের চোখমুখ দেখে ভয় ভয় লাগে।

বিড়বিড় করে বলি, 'শ্বশুরমশায়ের একটা প্ল্যান অবিশ্যি—

'কথাটা তাহলে সত্যি?'

মুখে আমার কথা জোগায় না।

'আমি ভেবেছিলাম ভরপেটে বুড়োটা আবোলতাবোল বকছে। নইলে তুই কি আমাদের বলতিস না।'

'ব্যাপারটা হল গিয়ে—।' বলতে শুরু করেও থেমে যেতে হয়। কী লাভ আর বলে? আমার সব যুক্তির ধার উবে গেছে। আমার কোন কথাই কি আর ওরা বিশ্বাস করবে?

গেলাসটা একবার এদিকে আনি, একবার ওদিকে রাখি। গেলাস ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভেতরে মদের ঘূর্ণি তুলি। অনিমেষ তাই দেখি। হঠাৎ মুখ তুলে তাকাই। ওরা আমার দিকে চেয়ে আছে। আমার জবাবের প্রতীক্ষা করছে। 'ব্যাপারটা হল গিয়ে—'। ফের সব যায় গুলিয়ে। 'ব্যাপারটা হল গিয়ে—' দম নিয়ে, ভেবে ভেবে প্রতিটি কথা বলি, 'রেজিনার সঙ্গে ব্যাপারটা যখন দানা বেঁধে উঠল, বুড়ো তখন একদিন, একদিন রাত্তিরে আমায় বলল—বলল যে আমার জন্যে ও একটা প্ল্যান করেছে। হ্যাঁ, প্ল্যান করেছে। প্ল্যানটা হল গিয়ে আমায় ফ্যাক্টরীর কাজ ছাড়তে হবে, ছেড়ে ওদের কো-অপারেটিভে ঢুকতে হবে। ঘন্টায় সাড়ে ন শো, সেই সঙ্গে লাভের বখরা। আমি দেখলাম, তর্ক করে লাভ নেই। এখন চুপ করে থাকি। পরে আপসে সব চাপা পড়ে যাবে। ও-ই ভুলে যাবে। তোরা বিশ্বাস কর, কো-অপারেটিভে যাওয়ার, ফ্যাক্টরী ছেড়ে ওখানে ঢোকার কোনো ইচ্ছে আমার, বিশ্বাস কর ভাই, ছিল না। পরে রেজিনাও এই কথাটা বারকয়েক তোলে। গত শনিবারও রেজিনা—রেজিনাও চায় যে—'

'কী বলছিস তুই!' ব্যাপারটা নাণ্ডী ঠাওর করে উঠতে পারে না।

'বিশ্বাস কর—আসলে আমি নিজে কিন্তু—'

বাধা দিয়ে মারের বলে, 'ও চলে যাচ্ছে যে। আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে।'

'মানে?' নাণ্ডী হকচকিয়ে যায়।

'চলে যাচ্ছে।'

আমি মারেরের দিকে তাকাই। ধীর, স্থির। চোখে-মুখে কোনো উত্তেজনা নেই। সহজ, স্বাভাবিক।

'তুই তো আমাদের আগে কিছু বলিস নি!'

'আমি সত্যিই যেতে চাই নি। আমি—'

'তোর চাওয়া না-চাওয়ায় কিছু যায় আসে না।' বলে পোড়া সিগারেটের টুকরোটা হোল্ডার থেকে মারের ঝেড়ে ফেলে। 'মানুষ কি চায় না-চায় সেটা বড় কথা নয়, যা করে সেটাই আসল।'

'তোদের কাছে আমি কিছুই লুকোতে চাই নি। বিশ্বাস কর—' আবেগে আমার গলা কাঁপে। কথা জড়িয়ে যায়। বেশ বুঝতে পারি যে হিতে বিপরীত করে ফেলেছি 'তোরা কেবল ভাবিস যে—'

মায়ের বলে, 'আমরা কিছুই ভাবিনি, ভাবছিও না। তোকে ভালোভাবেই চিনি। তা এ ভালোই হল। সাত শো কুড়ি পাচ্ছিলি, সাড়ে ন শো পাবি—ঢের বেশি।'

'এ যে আমি ভাবতেও পারছি না!' নাণ্ডী বলে, 'তুই তাহলে আমাদের সাথে আর কাজ করবি না?'

'তবু আমাদের বন্ধুত্ব বজায় থাকবে। যেমনটি আছে। এক সাথে কাজ না করলেও।' যাক! সেই কথাটা বলা হয়ে গেছে। এবার আমি সহজ হয়ে উঠি। দমবন্ধ ভাবটা কেটে যেতে বুকটা হালকা হয়ে যায়। চমৎকার ঝরঝরে লাগে। কী হয়েছে আমাদের মধ্যে? কিছু না। কিছুই না। কিচ্ছু না। 'আমি কো-অপারেটিভে যাচ্ছি বলে আমাদের বন্ধুত্ব থাকবে না? ক্ষেপেছিস!'

'তাই।' মায়ের সায় দেয়।

'বাব্‌বাবা।' নাণ্ডী হাঁ হয়ে যায়। 'এ যে আমি ঘুণাক্ষরেও—'

'আমরা আগের মতই মেলামেশা করব। কি রববার তোর খেলা দেখতে যাব। তোরাও আমাদের বাসায়—'

'শালা!' নাণ্ডী কটমট করে তাকায়।

তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নিই। কথা কিন্তু থামাই না। 'আগের মতই সবকিছু চলবে। অবিকল আগের মত। শুধু একসাথে কাজ করব না—এই যা।' প্রথমে বড্ড ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু ভয়ের কিছুই ঘটল না দেখে স্বস্তি পাই।

মায়ের বলে, 'এবার উঠতে হয়।'

সে কথায় কান না দিয়ে পুরনো কথার জের টানি, 'সব আগের মত চলবে। কিছুই বদলাবে না। ঘরোয়া অশান্তি এড়াতে কাজটা নিতে হচ্ছে। হয়ত শিগগীরই আমি বাপ হব—আরে না না, যা ভাবছিস তা নয়—'

ওরা উঠে পড়ে। আমাকেও উঠতে হয়।

রাস্তার মোড়ে এসে তিনজনে মুখোমুখি দাঁড়াই।

'আমি কিন্তু তোদের, বিশ্বাস কর ভাই, আগেই বলতে চেয়েছিলাম।'

'হুঁ!'

'শালা!'

'আমার ওপর রাগ করেছিস ?'

নাণ্ডী বলে, 'ধেৎ !'

'করলে ঠিকই করেছিস।' রাস্তার ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে ওঠে। ফের সেই অস্বস্তি। ফের সেই অপরোধবোধ।

মারের বলে, 'তোর ওপর রাগ করব কেন। তুই তো নিজের জন্যে কিছু করছিস না। তাছাড়া, আগাগোড়া ভেবে দেখলে মনে হয়, ঠিকই করেছিস।'

'ঠিক করেছি ? তুই বলছিস আমি ঠিক করেছি ?'

'মনে হয়। আচ্ছা, চলি এবার।'

'যাবি ! আবার কবে দেখা হবে ?'

নাণ্ডী বলে, 'রববার খেলছি।' বলে মুচকি হেসে হাত বাড়িয়ে দেয়। 'বেলা তিনটে, ছোট ময়দান।'

'বেলা তিনটে।' মারেরও বলে।

আমরা হাতে হাত রাখি।

ওরা রওনা হয়ে যায়। কিছুটা গেছে, আমি চিৎকার করে উঠি, 'এই, দাঁড়া দাঁড়া।'

ওরা দাঁড়ায়। ফিরে তাকায়।

'সত্যি করে বল্—আমি খুব খারাপ, নারে ?'

নাণ্ডী বলে, 'তুমি একটি গাড়োল।'

'তোরা হয়ত ভেবেছিস—'

মারের বলে, 'এখনও কিছু ভাবিনি। ভাবলে বলবখন।'

হাত নেড়ে ওদের বিদায় দিয়ে বাসার দিকে পা বাড়াই।

বাড়িটার সামনে এসে বারেক থমকে দাঁড়াই : শেষ পর্যন্ত সামলে নিয়েছি। কিছুই ঘটে নি।

ব্রিটিশ আমলে এ-ধরনের বাড়ি দেখা যায়। বিরাট, মজবুত। সদর দরজার দু পাশে দুই সাবেকী আমলের থাম। দরজার ওপরে, চৌকাঠের এক কোণে স্ফটিক কাঁচে ৮—বাড়ির নম্বর। রাত্তিরে, রাস্তার আলোয়, বেড়ালের চোখ বলে মনে হয়।

ঠাণ্ডা পড়েছে। হাওয়া বইছে। হাওয়ায় ভেসে আসছে কাছাকাছি এক

রুটি-কারখানা থেকে টাটকা প্যাস্ট্রির গন্ধ। এইখানে আমরা সংসার পাতলাম, আমি আর রেজিনা। এই ৮ নম্বরের বাড়িতে আমরা থাকব। কথাটা ভেবে খুশী হতে চাইলাম। বিশেষ কিছুই ঘটেনি। মনকে প্রবোধ দিতে চাইলাম। তারপর সদর দরজার কাছে এগিয়ে গেলাম।

অদ্ভুত সিঁড়িগুলি। অদ্ভুত গোটা বাড়িটাই।

এই অদ্ভুতেও আমি অভ্যস্ত হয়ে যাব। একদিন মনে হবে চিরকাল আমি এখানেই আছি। চিরকাল! এখন অবিশ্যি তা সত্যি বলে ভাবতে পারছি না।

অনুবাদ : শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

In A Strange House by Karoly Szakonyi

ঝঁ ফেরি

কেতাদুরস্ত বাঘ

ঝঁ ফেরির জন্ম ১৯০৭ সালে। এঁর ছোটগল্পে রচনারীতির মুন্সীয়ানায় কাব্যগুণের দিকে এগোবার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। জন লেমান তাঁর লেখায় যে "মুক্তপক্ষ ফ্যান্টাসি" লক্ষ্য করেন, তা ইদানীংকালের ফরাসী ছোটগল্পের ক্ষেত্রে একটি সজীব ধারা।

সংগীতালয়ের (music-hall) যে সমস্ত অনুষ্ঠান দর্শক এবং প্রদর্শক উভয়ের পক্ষেই মারাত্মক রকম বিপজ্জনক, তার মধ্যে 'কেতাদুরস্ত বাঘ' নামে খ্যাত পুরোনো একটা অনুষ্ঠান আমায় যেমন একটা অশরীরী আতঙ্কে বিকল করে, এমন আর কোনোটা নয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে বৃহৎ সংগীতালয়গুলি কী ধরনের ছিল সে সম্পর্কে যেহেতু বর্তমান যুগের মানুষের কোনো ধারণা নেই, যারা তা দেখেনি তাদের জন্যে একটা অনুষ্ঠানের বর্ণনা দেব। কিন্তু আমার কাছে যা ব্যাখ্যার অতীত, যা কাউকে জানাবার চেষ্টাও করি না, তা হল, দৃশ্যটা আমায় একটা নিদারুণ ত্রাস ও দুঃসহ যন্ত্রণায় আচ্ছন্ন করে, আমাকে যেন হিমশীতল পঙ্কিল এক জলাশয়ে চুবিয়ে ধরে। এই অনুষ্ঠানটি যে-সব থিয়েটারের ক্রমপত্রের অন্তর্ভুক্ত, সেখানে আমার কখনও যাওয়া উচিত নয়, (আসলে এটা এখন কদাচিৎ দেখানো হয়)। কথাটা বলা সহজ; কিন্তু আমার বুদ্ধির অগোচর কোনো কারণে 'কেতাদুরস্ত বাঘ' কখনও আগে থেকে ঘোষণা করা হয় না। একটা অস্পষ্ট, অর্ধচেতন, অস্বস্তির অনুভূতি শুধু আমার সংগীতালয়ের আনন্দটাকে স্বচ্ছন্দভাবে উপভোগ করতে দেয় না, এ ছাড়া কোনোদিনই আগে থেকে সতর্ক হবার সুযোগ পাই না। অনুষ্ঠানসূচীর শেষ অনুষ্ঠান হয়ে যাওয়ার পরে যদি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি, তা এই জন্যেই পারি যে এই বিশেষ প্রদর্শনীটি শুরু হওয়ার আগে যে তুরীভেরী বেজে ওঠে, ও যে সব ক্রিয়াকলাপ শুরু হয়, তার

সঙ্গে আমি অত্যন্ত বেশিমাত্রায় পরিচিত। আগেই বলেছি এ অনুষ্ঠানটিকে সর্বদাই হঠাৎ পেশ করা হয়। ব্যাণ্ডে যেই সেই বিশেষ 'ওয়ালট্‌স্' বাজনা সুতীব্র ঝঙ্কারে রণিয়ে ওঠে, আমি জানি এর পরেই কি হবে। আমার বুকের উপর একটা প্রচণ্ড ভার চেপে বসে, আমার দাঁতে দাঁতে ঠকাঠকি লাগে, যেন নিম্নশক্তির বৈদ্যুতিক তরঙ্গ বয়। আমার এখন উঠে যাওয়া উচিত, কিন্তু সাহস হয় না। তাছাড়া, আর কেউ তো উঠছে না। আর আমি জানি জন্তুটা এতক্ষণে রওনা হয়ে গেছে, এসে পড়ল বলে। আমার চেয়ারের হাতলের দুর্বল আশ্রয়টাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরি···।

প্রথমে প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। তারপরে একটা আলোর বৃত্ত মঞ্চের সামনে এসে একটা ঘেরাও-করা শূন্য আসনের উপরে তার হাস্যকর রশ্মি বিকীরণ করে। সাধারণত আসনটা থাকে আমার বসবার জায়গার খুব কাছে। ভীষণ কাছে। অণ্ডাকার আলোকরশ্মিটা প্রেক্ষাগৃহের শেষপ্রান্তে সরে গিয়ে একটা দরজার উপরে দীপ্যমান হয়। তারপর, যখন একটা নাটকীয় আড়ম্বরে শিঙা বেজে ওঠার সঙ্গে ঐকতান "ওয়ালটসের প্রতি আহ্বান" এর সুরে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, ওরা প্রবেশ করে।

বাঘের মর্মহর্ত্রী এক রোমাঞ্চময়ী, রক্তকেশা রমণী—ঈষৎ মদালসা। তার একমাত্র অস্ত্র কালো উটপাখির পালকের তৈরী একটি হাতপাখা। প্রথমদিকে তার মুখের নিম্নাংশ সেই হাতপাখা দিয়ে সে আড়াল করে রাখে; শুধু তার বিশাল হরিৎ নয়ন দুটি কালো, কুঞ্চিত ঝালরের ঊর্ধ্বে জেগে থাকে। তার বাহুদুটি যেন শীতার্ত সন্ধ্যার কুয়াশাবৃত মর্মচ্ছটার দীপ্ত। তার পরিধানে অনাবৃত-কণ্ঠ অতি-পিনদ্ধ মোহিনী সান্ধ্য-পোশাক। সূক্ষ্মতম, কোমলতম পশুলোমে তৈরী কৃষ্ণ গাঢ়-তার আর প্রতিফলনের সমারোহে একটা রহস্যময় পোশাক। তার ঊর্ধ্বে ছড়িয়ে আছে তার সোনার তারা বসানে অগ্নিবরণ চুলের রাশ। সব মিলিয়ে ছবিটা যেমন মনকে ভারাক্রান্ত করে, তেমনি ঈষৎ হাস্যকর। কিন্তু হাসবার কথা তোমার স্বপ্নেও মনে আসবে না। হাতপাখা নিয়ে ছল ভরে খেলতে খেলতে অনড় হাসিতে স্থির বিম্বোষ্ঠ উন্মুক্ত করে রমণী এগিয়ে আসে বাঘের বাহুলগ্ন হয়ে—প্রায় তাই—আলোকবৃত্ত তাকে অনুসরণ করে।

পিছনের পা দুটোর ভর দিয়ে প্রায় মানুষের মতোই হেঁটে আসে বাঘটা। অতি-পরিপাটি ফুলবাবুর মতো তার সাজ। তার পোশাকের কাটছাঁট এমন নিখুঁত, যে ধূসরবর্ণ পাৎলুন ও জুতো, ফুলের নক্‌শা আঁকা আকটিলম্বিত জামা, ক্রটিহীন

জাঁদওয়ালা ঝকঝকে শাদা লেস্ ও নিপুণ দরজির তৈরি আচকানের নিচে তার পশুদেহ প্রায় অদৃশ্য। কিন্তু তার ভয়াবহ দন্তবিকাশ, রক্তিম অক্ষিকোটরে বিঘূর্ণিত অশান্ত চোখদুটো, প্রচণ্ড খাড়া খাড়া গোঁফ, বক্র ওষ্ঠের নীচে ঝলসে ওঠা হিংস্র দন্তমূল সহ মাথাটায় পশুত্ব প্রকট। বাঘটা হাঁটছে খুব আড়ষ্টভাবে, তার বাঁ হাতের বাঁকে একটা হালকা ধূসর রঙের টুপি। রমণী সুসম-পদক্ষেপে এগোয়; যদি তাকে পৃষ্ঠদেশ টান করতে দেখো, যদি তার নগ্নবাহু সহসা সামান্য কেঁপে ওঠে, আর তার হালকা বাদামীরঙের মখমলমসৃণ ত্বকের নীচে একটা অপ্রত্যাশিত শিরের আবির্ভাব হয়, জেনো এক অদৃশ্য প্রবল প্রচেষ্টায় পতনোন্মুখ সঙ্গীকে এক ঝাঁকানিতে সে সামলে নিয়েছে।

ওরা ঘেরাও-করা আসনের কাছে এসে পৌঁছয়। কেতাদুরস্ত বাঘ তার নখর দিয়ে দরজাটা ঠেলে খুলে দেয়, তারপরে মহিলাকে আগে ঢুকতে দেওয়ার জন্যে সরে দাঁড়ায়। মহিলা যখন আসন গ্রহণ করে ঔদাস্যভরে মলিন মখমলের আসনে হেলান দিয়ে বসে, বাঘ তার পাশের চেয়ারে বসে পড়ে। এই সময়টাতে দর্শক প্রচণ্ড উল্লাসে ফেটে পড়ে, আর আমি প্রায় কেঁদে ফেলে একদৃষ্টে বাঘটার দিকে চেয়ে থাকি, আর আমার সমস্ত মনটা অন্য কোথাও পালাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

বাঘের কর্ত্রী তার অগ্নিবরণ কেশরাশি দুইয়ে রাণীর মতো ভঙ্গীতে আমাদের অভিবাদন জানায়। ঘেরাও-আসনের সামনে রাখা মালপত্তর নেড়েচেড়ে বাঘ তার কেরামতি শুরু করে। একটা দূরবীণ দিয়ে সে দর্শকদের নিরীক্ষণ করার ভাণ করে; এক বাক্স মিঠাইয়ের ঢাকা খুলে তার সঙ্গিনীকে একটা নেবার অনুরোধের ভাণ করে। গন্ধভরা একটা রেশমের থলি বার করে শোঁকার ভাণ করে। অনুষ্ঠানের ক্রমপত্রটা (programme) দেখার ভাণ করে যখন, দর্শক মহা আনন্দ পায়। তারপর শুরু হয় তার প্রেমের ভাণ; মহিলাটির দিকে ঝুঁকে পড়ে সে যেন চুপি চুপি তার কানে কানে কত স্তুতিবচন শোনায়। মহিলা বিরক্ত হওয়ার ভাণ করে পালকের পাখাটি তার অপরূপ সাটিনের মতো মসৃণ পাণ্ডুর গণ্ডদেশ ও তলোয়ার-সূক্ষ্ম ধারালো দন্তমূলে শোভিত দুর্গন্ধ চোয়ালের মাঝখানে ভঙ্গুর পর্দার মতো রঙ্গভরে তুলে ধরে। তারপরে বাঘ যেন গভীর হতাশায় এলিয়ে পড়ে লোমশ থাবার পিছন দিয়ে চোখ মোছে। আর যতক্ষণ এই মারাত্মক মূক-অভিনয় চলে আমার বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা পাঁজরের উপরে আছড়ে পড়তে থাকে, কারণ একা আমিই দেখি আর বুঝতে পারি, যে এই

সমস্ত নিম্নস্তরের বিত্তা জাহিরগুলোকে একত্রে বেঁধে রেখেছে বলতে গেলে একটা অলৌকিক ইচ্ছা-শক্তি। আমরা সকলেই এমন একটা অনিশ্চিত ভারসাম্যের অবস্থায় আছি, যে একটা তুচ্ছ কারণে সেটা ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে পারে। ঐ যে বাঘের পাশের ঘেরাও আসনে এক পাণ্ডুর, শ্রান্ত-নয়ন ছোটখাট সামান্য কেরানির মতো চেহারার লোকটি ও যদি এক মুহূর্তের জন্যেও ওর ইচ্ছাশক্তিকে শিথিল করে, তখন কী হবে? কারণ ওই হচ্ছে বাঘের আসল শাসক। রক্তকেশা রমণী শুধু অতিরিক্ত সহকারী। সব কিছু নির্ভর করছে ঐ লোকটির উপরে। বাঘটি ওরই হাতের পুতুল, ইস্পাতের তৈরি দড়ির চেয়েও কঠিন বাঁধনে ও যন্ত্রটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

কিন্তু ধর যদি ঐ ছোট্ট মানুষটা হঠাৎ অন্য কিছু ভাবতে শুরু করে? ও যদি মরে যায়? সদা-আসন্ন বিপদের কথা কারো মনেও আসে না। আর আমি যে সব কিছু জানি, আর আমি কল্পনা করতে শুরু করি—কিন্তু না, কল্পনা না করাই ভালো পশুলোমে শোভিতা মহিলাকে কী রকম দেখাবে যদি……। তার চেয়ে শেষ অংশটা দেখা ভালো, এ অংশটা দর্শককে সদাসর্বদা নিশ্চিন্ত ও পরিতৃপ্ত করে। বাঘের কর্ত্রী জানতে চায় দর্শকদের ভেতর কেউ তাকে একটি ছোট্ট বাচ্চা ধার দেবে কিনা। এমন মনোহারিণীকে কি 'না' বলা যায়? তাই সর্বদাই কোনো এক নির্বোধ সেই শয়তানি ঘেরাও আসনের মধ্যে একটি হাস্যোজ্জ্বল শিশুকে এগিয়ে দেবার জন্যে তৈরি থাকে। বাঘটা তার ভাঁজ করা থাবায় শিশুটিকে মৃদুমন্দ দোলা দেয়, আর তার হাঙরের মতো চোখ দুটোয় একগ্রাস কচি মাংসের লোভ জ্বলতে থাকে। প্রচণ্ড উল্লাসধ্বনি ও হাততালির মধ্যে প্রেক্ষা-গৃহের বাতিগুলো জ্বলে ওঠে, বাচ্চাটিকে তার আসল মালিকের কাছে ফেরৎ দেওয়া হয়, আর সঙ্গী দুজন একইভাবে প্রত্যাবর্তনের পূর্বক্ষণে নত হয়ে অভিবাদন জানায়।

যে মুহূর্তে ওদের পিছনে দরজা বন্ধ হয়—ওরা কখনও আর একবার অভিবাদন করতে ফেরে না—ঐকতানবাদ্য উচ্চতম নিনাদে ফেটে পড়ে। তার একটু পরে ছোট্ট মানুষটা কপালের ঘাম মুছতে মুছতে কুঁকড়ে যায়, আর ঐকতানধ্বনি বাঘের গর্জনকে ডুবিয়ে দেবার জন্য উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে চড়ে। খাঁচার মধ্যে ঢোকামাত্র বাঘটা তার স্বাভাবিক পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। অভিশপ্তের মতো সে আর্ত-গর্জন করতে থাকে, তার সুন্দর পোশাকটাকে ফালি ফালি করে ছিঁড়ে সে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে থাকে, প্রত্যেক অনুষ্ঠানপর্বে তাই তার নতুন

করে পোশাক তৈরি করতে হয়। তার নিষ্ফল ক্রোধ বিদীর্ণ হয় শোকার্ত চিৎকারে আর অভিশাপে; তার উন্মত্ত লম্ফঝম্প খাঁচার দেওয়ালটাকে নির্দয়ভাবে আঘাত করে। দর্শকদের অন্ত পারে বেদি ব্যাঘ্র-পালিকা তখন যত তাড়াতাড়ি পারে পোশাক ছাড়ছে, যাতে বাড়ি ফেরার শেষ ট্রেনটা হাতছাড়া না হয়। স্টেশনের কাছে মদের দোকানে ছোটখাট মানুষটি তার জন্যে অপেক্ষা করছে, দোকানটার নাম 'নীল চাঁদ'।

ছেঁড়া পোশাকের ফাঁদে জড়ানো বাঘটার আর্তনাদের বড় দর্শকদের মনে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি করতে পারে, যতদূর থেকেই তা শোনা যাক। তাই ব্যাণ্ডের বাজনা সমস্ত শক্তি দিয়ে 'ফিডেলোর প্রতি সুরালাপ' বাজাতে আরম্ভ করে, আর মঞ্চের পার্শ্বদেশ থেকে মঞ্চাধ্যক্ষ ত্বরিৎগতিতে কৌশলী সাইকেল-খেলোয়াড়দের ঢুকিয়ে দেয়।

আমি 'কেতাদুরস্ত বাঘ' দু'চক্ষে দেখতে পারি না, আর লোকে যে এতে কী আনন্দ পায়, তা কোনোদিন আমার বুঝবার ক্ষমতা হবে না।

অনুবাদ : করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়

The Fashionable Tiger by Jean Ferri

জ অ্যামিয়ান

কার্তুজের খোল

অ. অ্যামিয়ানের জন্ম ১৯১৪ সালে, লিখতে শুরু করেন ১৯২৯ সালে।

চল্লিশ সালে ছাপান্ন বৎসর বয়সে আমার মা মারা গিয়েছেন। তিনি প্রায়ই উলান-উনদুর পাহাড় যেখানে দক্ষিণ দিকে ক্রমশ ঢালু হয়ে বেরুলেন নদীর দিকে নেমে গেছে সেদিকে তাকিয়ে থাকতেন। সেই পাহাড়ের শুঁড়িপথের ধারে, উলুখাগড়ায় ঢাকা একটা শিবিরের দিকে তাকিয়ে আমাকে বলতেন ওরই কোনখানে আমার জন্ম হয়েছিল। আমার বাবা যেখানে নিহত হয়েছিলেন সেই দারভালজিন্ পাহাড়ের দিকে জলভরা চোখে তাঁকে প্রায়ই তাকিয়ে থাকতে দেখেছি। মার মন থেকে সেই ভয়ংকর দৃশ্যগুলো কিছুতেই মোছেনি। সারাজীবন তিনি সেগুলো মনে রেখেছিলেন।

তিরিশ সালের কোনো এক শান্ত, নির্মল হেমন্তের সন্ধ্যায় আমি আর মা দারভালজিন পাহাড়ের বাঁ দিকের ঢালুতে শুকনো গোবর কুড়োচ্ছিলাম। কুয়াশায় আর্দ্র গোবরে কানায় কানায় ভর্তি ঝুড়িটা তুলতে মার কষ্ট হল। একটু হাঁফ ফেলার জন্য দাঁড়িয়েই, তিনি চিৎকার করে উত্তেজিত গলায় আমাকে ডাকলেন। আমি দৌড়ে গেলাম। মা একটা মরচে ধরা, কালোরঙের গুলির খোল হাতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। জাপানি কার্তুজের সেই পুরোন খোলটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে মা খুব আস্তে আস্তে বললেন: এটা তোর কাছে ভাল করে রেখে দিস।

মা আর কোনো কথা বলতে পারছিলেন না। ধীরে ধীরে তাঁর মুখের রঙ কালো হয়ে আসছিল। ঠোঁট কাঁপছিল। অনেক দূরের কোনো কিছুকে যেন তিনি চোখ দিয়ে ধরে রাখতে চাইছিলেন।

একটু পরেই মা নিজেকে সংযত করে নিয়ে, আমাকে আমার বাবার মৃত্যু-কাহিনী শোনালেন।

এই গুলির খোলটা গ্যামিন্দের (জাতীয়তাবাদী চীনা)। ঐ পাথরের

চিবির ওধারে তোর বাবাকে শেষবারের মতো দেখেছিলাম। তারপর কুড়ি বছর কেটে গেল, কিন্তু সেই ঘটনাগুলো এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে। আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। জ্ঞান হবার পর ধারে-কাছে কোনো অফিসার বা সৈন্যকেও দেখিনি। কালো আকাশে একটাও তারা ছিল না। পশ্চিমের কোনখান থেকে আমাদের বুড়ো কুকুর নয়ানগাড় চিৎকার করছিল। সেই আর্ত চিৎকারে মাঝে মাঝে রাত্রির নিস্তব্ধতা টুকরো টুকরো হচ্ছিল। কখনো রাত্রির পেঁচার ডাক শুনতে পাচ্ছিলাম।

তুই তখন একটুখানি। মাত্র হামাগুড়ি দিতে শিখেছিস। স্থানীয় অ্যারাটস্-দের সঙ্গে তোর বাবা ঘোড়াগুলো পাহাড়ের মধ্যে কোথাও লুকিয়ে রেখে গ্যামিনদের সঙ্গে যুদ্ধ করছিল। প্রায় তিরিশ জন শত্রুকে ওরা মেরেছিল। মাস-খানেক সে পাহাড়ে পাহাড়েই কাটিয়েছিল।

একদিন বিকেলের দিকে দু-তিনজন লোকের সঙ্গে তোর বাবা ফিরে এলো। সবেমাত্র পোশাক পাল্টান হয়েছে কি হয়নি, চারদিক থেকে গোলাগুলির শব্দ শোনা গেল। হঠাৎ গ্যামিনরা আমাদের চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলল। তোর বাবা আর তার সঙ্গী দুজনকে তারা বেঁধে মারতে মারতে টেনে বাইরে নিয়ে গেল। আমাকে কিছুতেই গের্ (বাসা) থেকে বের হতে দিল না। হাতের কাছে যা পেয়েছে তাই দিয়েই ওরা তোর বাবাকে মারছিল।

: বল ঘোড়াগুলো কোথায় রেখেছিস্ ?

: লাল কুত্তা এখানে লেজ নাড়তে এসেছিস কেন ?

আমি তাদের তীক্ষ্ণ ঘৃণ্য কণ্ঠস্বর আর অশ্লীল গালিগালাজ শুনতে পাচ্ছিলাম, গুম্ভসান লামার কণ্ঠস্বর চিনতে আমি ভুল করি না। সেই-ই গ্যামিনদের সব বুঝিয়ে দিচ্ছিল।

অত পিটিয়েও তোর বাবার মুখ থেকে একটা কথাও ওরা বের করতে পারেনি, একবার সে চেঁচিয়ে উঠেছিল।

: আমি কিছুতেই আমার ঘোড়া দেব না।

তোর বাবার কাছ থেকে কিছুতেই কিছু আদায় করতে পারবে না দেখে, ওরা তোর বাবাকে শেষ করে দেবে ঠিক করল। তাকে পাহাড়ের দিকে নিয়ে গেল। বাবার আগে চিৎকার করে আমাকে বলল।

: আমার ছেলেকে মানুষের মতো গড়ে তুলো। আমার ছেলেই এর প্রতিশোধ নেবে···। আমি আর কিছু শুনতে পাইনি।

তার গলা শুনে তুই চিৎকার করে কেঁদে উঠলি। যেন তুইও কিছু বুঝতে পেরেছিস্। আমি শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে দরজা খুললাম। তোকে গের-তে বেঁধে রেখে আমি বাইরে এলাম।

তোর বাবা আর একজন হাত বাঁধা অবস্থায় ছোট পাহাড়ের ওধারে দাঁড়িয়েছিল। ডুবন্ত সূর্যের আলোয় তোর বাবার দীর্ঘ ছায়া এই গ্রাম অবধি ছড়িয়ে পড়ল। তিনজন অফিসার সহ প্রায় কুড়িজন গ্যামিন দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম।

প্রথমে আমার ভয় করছিল। তারপরেই সাহসে ভর করে আমি তাদের দিকে দৌড়ে গেলাম। তোর বাবার পরনে একটা নীল রঙের পোশাক ছিল। ওটা আমি তার জন্ত তৈরি করেছিলাম। তোর বাবা খুব লম্বা ছিল। বাতাসে সেই নতুন পোশাক পত পত করছিল। তোর বাবার পাশে গ্যামিনদের খুব ছোট দেখাচ্ছিল।

একটা ছোট পাহাড়ের উপর উঠে একজন অফিসার সাদা একটা রুমাল নাড়ল। তোর বাবা চিৎকার করে ওদের কি যেন বলল। তারপরই প্রচণ্ড শব্দ।

আমি নিশ্চয়ই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। উঠতে গিয়েও পারলাম না। অনেক দূরে উত্তরের দিকে এলোমেলোভাবে গুলি চলছিল। গের-এর সামনে গরুটা বাছুরকে ডেকে ডেকে সারা হচ্ছিল। সারা রাত কী যে কষ্টের মধ্যে কাটিয়েছিলাম।

আমি এত দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম যে সকালে নিজে নিজে উঠে দাঁড়াতে পারছিলাম না। অবশেষে গাড়ির চাকা ধরে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম। সমস্ত গাঁ খাঁ-খাঁ করছে। একটু দূরে কাকতাড়ুয়ার মূর্তির কাছে, বুড়ো কুকুর নয়ানগাড় পেছনের পায়ের উপর বসে, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে তাকিয়ে কাঁদছিল। গরুটা কাতর স্বরে ডাকছিল। তার গলার দড়িটা গাড়ির চাকার সঙ্গে টান করে বাঁধা। এটা সেই লেজকাটা খয়েরি রঙের গরু—আমার বিয়ের পণ। বাছুরটা মাটির উপর নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে।

তোর কথা আমার মনেই ছিল না। হঠাৎ মনে হতেই আমার ভীষণ ভয় হল। দৌড়ে গের-এর মধ্যে ঢুকলাম। ঘরের দরজা থেকে টেবিল অবধি ঘরের সব কিছু এলোমেলো হয়ে আছে। বারখানের (ভগবান) মূর্তিটাও উল্টান। দুধের পাত্রটা উপুড় হয়ে আছে। সমস্ত জায়গাটায় দুধ ছড়িয়ে আছে। তোকে কোথাও খুঁজে পেলাম না। খয়েরি রঙের যে কাপড়ের টুকরো দিয়ে

তোকে খাটের পায়ায় বেঁধে রেখেছিলাম সেটা টান হয়ে আছে। চৌকির তলায় উঁকি দিয়ে দেখি তুই শান্ত হয়ে মুখে আঙুল দিয়ে ঘুমিয়ে আছিস। তোকে বুকের মধ্যে চেপে ধরলাম। তারপর গের্ থেকে বেড়িয়ে এলাম।

একটু সুস্থ হয়ে, গাড়িটার কাছে এসে দাঁড়ালাম। গরুটা মরা বাছুরের গা চাটছে। বাছুরটা কালো রঙের রক্তের মধ্যে পড়ে আছে। মাথায় বুলেটের ছোট গর্ত। সেখান থেকেই সমস্ত রক্ত বেরিয়ে এসেছে।

চারিদিকে একটা জনপ্রাণীও দেখতে পেলাম না। তোর বাবাকে যেখানে ওরা মেরেছিল, সেখানে একদল কাক ঘুরে ঘুরে উড়ছিল।

সন্ধ্যাবেলা গ্রামের সবাই পাহাড় থেকে ফিরে এলো। তোর বাবাকে সবাই মিলে দারভালজিন্ পাহাড়ের দক্ষিণ দিকের ঢালু জায়গায় কবর দিলাম। মৃত অবস্থাতেও তোর বাবাকে যেন জীবন্ত দেখাচ্ছিল। দাঁতে দাঁত চাপা; মুখে চোখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ।

"বাছা রে! এই গুলির খোলটা তুই ভাল করে রেখে দে। হয়তো এই গুলিটাই শত্রুর বন্দুক থেকে বেরিয়ে এসে তোর বাবাকে খুন করেছিল। এটাই তোকে তোর বাবার শেষ ইচ্ছার কথা মনে করিয়ে দেবে।" মা একবার চোখের জল মুছে নিয়ে আবার বলতে লাগলেন:

"তোদের জনগণতান্ত্রিক সরকার বেঁচে থাক। তোর বাবার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। আমি তার ছেলেকে মানুষের মতো মানুষ করেছি।—

"পরে জানতে পেরেছিলাম লুভসান লামা তোর বাবার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। সেই তোর বাবাকে শত্রুর কাছে ধরিয়ে দিয়েছিল। কুয়োমিনটাং দল আমাদের ঘিরে ফেলার আগে সে ঘোরজির উপরের দিকে ছিল। তোর বাবা বাড়িতে ফিরতেই সে দক্ষিণের দিকে ছুটে গিয়েছিল। কেউ-ই তাকে সন্দেহ করে নি। কিন্তু হঠাৎ গুলি চলা শুরু হোল, গ্যামিনরা এলো। আর আমাদের দুর্ভাগ্য শুরু হোল। কিন্তু জনসাধারণ লুভসানের উপর তোর বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়েছিল।"

মা সেই পাথরের স্তূপের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। যেন তাঁর জীবনের সব দুঃখ কষ্ট ওখানেই একত্র হয়েছে। একটু থেমে মা বলতে লাগলেন:

"জীবনের শেষদিন অবধি এই ভয়ংকর ঘটনা আমার মনে থাকবে। আমার সন্তানরা, এবং তাঁদের ভাবী সন্তানেরা ঘৃণার সঙ্গে এই ঘটনা স্মরণ করবে। এখন আবার হিটলারী দস্যুরা পৃথিবীর শান্তি ভেঙে ফেলার স্বপ্ন দেখছে। যে-দস্যুরা তোর বাবাকে খুন করেছিল এরা তাদের থেকেও অধম। কিন্তু পৃথিবীতে এমন শক্তি নেই, যা সত্য আর শান্তির জন্য লড়ায়ে থাকা মানুষদের হারাতে পারবে।"

অনুবাদ: সমরেশ রায়

Cartridge Case by Zh. Jamyan

এলিও ভিত্তোরিনি

যুদ্ধের দিনে লেখা আত্মচরিত

ছোট গল্পের চেয়ে ছোট উপন্যাস বা নভেল-ই ইতালির প্রিয় সাহিত্যরীতি। তাই ছোট গল্প বেছে স্থির করা রীতিমতো দুরূহ ব্যাপার। ভিত্তোরিনির গল্প তিনটিও 'ডায়েরি ইন্ পাব্লিক' নামে একটি বৃহত্তর রচনার স্বয়ংসম্পূর্ণ অংশ। এলিও ভিত্তোরিনির জন্ম ১৯০৯ সালে, সিসিলিতে, বর্তমানে মিলানের বাসিন্দা। বহু মার্কিন উপন্যাস অনুবাদ করতে গিয়ে মার্কিন সাহিত্যের আঙ্গিকের ছাপ তাঁর লেখায় কখনও কখনও এসেছে। কিন্তু তাঁর লিরিক রীতির গল্প বলার ধরন তাঁর স্বকীয়। তিনি যাঁদের লেখা অনুবাদ করেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য লরেন্স, হেমিংওয়ে, ফক্নর, ডিফো, অডেন ও ম্যাক্লীন। ১৯৩৬-৩৮এ লেখা 'সিসিলিতে কথোপকথন' আঙ্গিকের পরীক্ষায় একটি অসামান্য কীর্তি। ইতালীয় সাহিত্যে বাস্তবতার আন্দোলনে এলিও ভিত্তোরিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। তাঁর লেখায় অ্যাক্শনের চেয়ে কাব্যের ও চিত্রকল্পের ও ভাষার মূল্য বেশি।

১। মরুভূমি

"শহরের মধ্যিখানে মরুভূমি।"

আমরা তাস খেলতে খেলতে কথা বলছিলাম। চারজনে সিগারেট খাচ্ছিলাম। হাতে ধরা ছিল টেক্কা, রাজা, রানী—গোলামও ছিল।

"কি বললে? শহরের মধ্যে? একেবারে মধ্যিখানে?"

"হ্যাঁ, তাই-তো বললাম। উত্তরে শহর, পশ্চিমে শহর, পূর্বে শহর, দক্ষিণেও শহর। রাস্তার মোড়গুলো থেকে, রাস্তা থেকে বাতাস বইছিল।"

"দেখলে মরুভূমি?"

"মরুভূমি। পাথর আর ধুলো, এখানে ওখানে কখনও কখনও ওয়র্মউডের ঝাড়, অমনিই—জল নেই—আর কাক আছে।"

"আর টিকটিকি ?"

"আর টিকটিকি।"

"আর রাত্রে আলো নেই, তাই না ?"

"কোনো তারা ওঠে না।"

আমরা এর ওর মুখের দিকে তাকালাম। টেবিলে একটা তাস পড়ল। আরেকটা পড়ল, আরেকটা, আরেকটা, তারপর আর একটা। নেপ্‌লস্‌-এর লোকটা জিতল।

"খুব বড় নাকি ?"

"কেউ জানে না। চারিদিকে ছড়িয়ে ছিল পশুদের অস্থি। মাথার খুলি, শিঙ।"

"সত্যিকারের মরুভূমি।"

"আমি সেখানে ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখেছি।"

"মানুষের ঘরবাড়ি ?"

"মানুষের বাড়ি। ঘর।"

"কি করে পৌছলে সেখানে ?"

"ট্যাক্সিতে। সঙ্গে আমার মাল ছিল।"

"দেখলে মরুভূমি ?"

ক্রোয়েশিয়ার লোকটা হাতের তাসগুলো নামিয়ে রেখে দু'হাতে নিজের কপালটা চেপে ধরল। আমরা অন্যেরা হাতের তাসগুলো ধরেই রইলাম, কোনো তাস আর ফেলতে পারলাম না। টেবিলের উপর ইসকাপনের রানীটা পড়েই রইল।

ক্রোয়েশিয়ার লোকটা বলে চলল, "আমি দেখতে পাচ্ছি। ধ্বংসাবশেষ, গাছের গুঁড়ি, বিধ্বস্ত রেললাইন, সীসায়, ট্রেনগুলোর অস্থিবদ্ধ কঙ্কাল।"

আমরা আমাদের তাসগুলো ফেলে দিলাম।

"অন্য কোনো মরুভূমির কথা বলছ নাকি ?"

"না, একই।"

"পৃথিবীর তো একটাই হৃদয়।"

নেপল্‌স-এর লোকটা থুতু ফেলল। সে-ও খেলাটা বুঝে ফেলেছে। সে মাথা নাড়ল।

সে বলল, "আমার যেখানে দেশ, সেখানেও একটা আছে। তার চারিদিক ঘিরে একটা এবড়ো-খেবড়ো দেওয়াল। সেখানে একরত্তি ঘাসও গজায় না। যারা পাশ দিয়ে যায়, তারা ক্রুশের চিহ্ন করে। তারা একে বলে মরুভূমি। জায়গাটা অলিভ্ বনের মধ্যে।"

আমরা আবার সিগারেট জ্বালালাম।

ক্রোয়েশিয়ার লোকটা বলল, "আমি দেখতে পাচ্ছি। যেন এখনই আমার চোখের সামনে। সবটা মরুভূমি।"

একজন ছিল, আমাদের খেলায় যোগ দেয়নি। স্পেনের লোকটা। সে এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি। সে তামাক চিবিয়ে চিবিয়ে ছিবড়ে করে ফেলছিল।

"মরুভূমি গভীর।"

কি বলতে চায় লোকটা? আমরা তার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

সে বলে চলল, "আমাকে ঢেকে দেয়। আমি এখানে বসে আছি। তামাক চিবোচ্ছি। কিন্তু আমি কখনও তার হাত থেকে পালাতে পারব না।"

নেপল্‌স্-এর লোকটা বলল, "আরে ছাড়ো!"

সে হেসে উঠল—সে একাই, একাই শুনল। অন্যেরা উঠে দাঁড়াল।

সে বলল, "আহা, পুরনো অতীতের সেই মোহিনী মরুভূমি!"

অন্যেরা তার সঙ্গে সঙ্গে বলল :

"চিক্‌চিকে বালি।"

"প্রচণ্ড রৌদ্র।"

"রাস্তায় কাটানো দিন, দীর্ঘ দিন।"

"যেখানে পৌঁছব বলে বেরনো, সেইসব নাম।"

"আহা, মোহিনী মরুভূমি!"

২। পৃথিবীর যত শহর

সারা দিন ধরে পাথর আর বালি বোঝাই করেছি, তারপর একটু বিশ্রাম নিতে বসেছি। তখন রাত্রিবেলা।

আমরা বললাম, 'হুম্'।

পাহাড়তলীতে আলো জ্বলে উঠছে, সমুদ্রের বুকেও। আমরা এর ওর দিকে

তাকাচ্ছি। আরো উপর দিয়ে মেয়েরা যাচ্ছে। আমরা বলেই চলেছি, 'হম্।'

একবার লম্বা লোকটা বলল : "আলিসান্তে।" আমরাও শেষে মুখ খুললাম, "আলিসান্তে?"

"সিড্‌নি। আলিসান্তে।"

"সিড্‌নিও?"

"পৃথিবীর যত শহর।"

দুটি মেয়ে পাশ দিয়ে চলে গেল। তারপর থামল।

একজন আরেকজনকে জিজ্ঞেস করল, "কি হল?"

আমরা আঙুল দিয়ে আলোগুলো দেখিয়ে দিলাম।

"শহর।"

"পৃথিবীর যত শহর।"

ওরা হাসল, কিন্তু থেকে গেল। লম্বা লোকটা বলল, "ম্যানিলা।"

ওরা ধরা পড়ে গেছে। আমরা ওদের দেখালাম পাতার ফাঁকে ফাঁকে আলো, জলের উপরে আলো, পাতা, রাত্রি। "পৃথিবীর যত শহর।"

লম্বা লোকটা চেঁচিয়ে উঠল, "সান ফ্রান্‌সিস্‌কো।"

আমরা সকলে চেঁচাতে লাগলাম।

"লেগ্‌হর্ন।"

"আকাপুল্‌কো।"

বেঁটেখাটো একজন বলল : "আরপেয়ারটা ক্রিভিয়া।"

অল্পবয়সী ছেলেটা কাঁপছে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, জায়গাটা কোথায়?

বেঁটেখাটো ছেলেটা বলল, "আমি সেখানে ছিলাম। জায়গাটা পারস্যে।"

আমাদের নিচে দিয়ে মরা নৌকো ভেসে গেল। আমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে প্রবীণ, সে বলল : "আমি ছিলাম ব্যাবিলোনিয়ায়।"

"ব্যাবিলোনিয়ায়?"

"ব্যাবিলোনিয়ায়। ব্যাবিলোনিয়ায়।"

লম্বা লোকটা বলল, "সে তো এক প্রবীণ শহর।"

বৃদ্ধ বলল, "আমি কি যথেষ্ট প্রবীণ নই? আমি ওখানে ছিলাম আমার যৌবনে।"

লম্বা লোকটা বলল, "কিন্তু সে-তো এখন শেষ হয়ে গেছে।"

বৃদ্ধ জবাব দিল, "সবই তো শেষ হয়ে গেছে।"

লম্বা লোকটা বলল, "সে-তো এখন বালির তলায়। অনেক শতাব্দী ধরেই।"

বৃদ্ধ জবাব দিল, "হ্যাঁ। কিন্তু সে ছিল আশ্চর্য সুন্দর।" দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "সে কী আশ্চর্য আলো।"

৩। লেখক হওয়া

আমার তো মনে হয়, লেখক হতে গেলে অত্যন্ত বিনয়ী হতে হয়।

বাবাকে দেখে তা-ই মনে হয়েছে। বাবা ঘোড়ার খুরে নাল পরাতেন, আর ট্র্যাজেডি লিখতেন। ঘোড়ার খুরে নাল পরানোর চেয়ে ট্র্যাজেডি লেখাকে তিনি কিছু উঁচু ব্যাপার মনে করতেন না। ঘোড়ার খুরে নাল পরাবার সময়ে যদি কেউ বলত, "ওভাবে করো না, এইভাবে কর, তুমি ভুল করছ", বাবা কান দিতেন না। নীল চোখের দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে দেখতেন, হয় মুচকি হাসতেন নয় জোরেই হেসে উঠতেন, মাথা নাড়তেন। কিন্তু লিখবার সময়ে বাবা সব লোকের সব পরামর্শ—যে যাই হোক—শুনতেন।

কেউ কিছু বললেই মন দিয়ে শুনতেন, মাথা নাড়তেন না, মেনে নিতেন। লেখার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী। বলতেন, সবার কাছ থেকেই নিতে হয়। লেখাকে ভালোবাসতেন বলেই বাবা সব ব্যাপারেই নিচু হয়ে থাকবার চেষ্টা করতেন, সব ব্যাপারেই লোকের কাছ থেকে নেওয়ার চেষ্টা করতেন।

ঠাকুমা বাবার লেখা পড়ে হাসতেন। বলতেন, "বোকামি।"

মায়েরও সেই মত। বাবার লেখা পড়ে বাবাকে উপহাস করতেন।

শুধু আমার ভায়েরা আর আমি, আমরা হাসতাম না। আমরা দেখতাম, বাবা কেমন লাল হয়ে উঠতেন, সবিনয়ে মাথা হেঁট করতেন, আর সেই দেখেই আমরা শিখলাম। একবার শিখব বলেই বাবার সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম।

প্রায়ই বাবা এমনি করতেন, নিরিবিলিতে লিখবেন বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তেন। একবার পেছন পেছন গেলাম। আটদিন ধরে আমরা গেলাম উচ্ছল নাচের মাঠ বেয়ে, নৈঃসঙ্গের শাদা ফুলের রাশ পেরিয়ে; মাঝে

মাঝে কোনো পাহাড়ের ছায়ায় জিরিয়ে নিতাম। বাবা নীল চোখ মেলে লিখতেন, আমি লিখতাম। বাড়ি ফিরতেই মায়ের কাছে প্রচণ্ড মার খেলাম— দুজনের পাওনাটা আমি একাই সইলাম।

বাবা আমার কাছে ক্ষমা চাইলেন, ওঁর হয়ে যে-মারটা খেলাম, তার জন্যে। আমার এখনও মনে আছে। আমি কোনো উত্তর দিই নি।

আমি কি বলতে পারতাম, ক্ষমা করেছি?

ভয়ংকর এক গলায় বাবা আমায় বলেছিলেন: "উত্তর দাও! তুমি কি আমায় ক্ষমা করেছ?" বাবাকে মনে হয়েছিল যেন হ্যামলেটের পিতার প্রেতাত্মা, প্রতিশোধ দাবি করছেন। বাবা কিন্তু আসলে চান নি যে, আমি তাঁকে ক্ষমা করি।

কিন্তু অমনি করেই আমি শিখলাম, লেখা কী।

অনুবাদ: অমিতাভ ভট্টাচার্য

Stories from an Autobiography in Time of War by Elio Vittorini

মাহমুদ তেমুর

মৃত্যুর দূত

মাহমুদ তেমুর দেশ দেশ ইজিপ্ট। তাঁর লেখা গল্প, উপন্যাস ও নাটক সারা আরব দুনিয়া জুড়ে পঠিত হয়। সম্প্রতি তিনি ফুয়াদ আল্-আওয়াল আকাদেমির সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর বহু গল্প ইংরেজিতে অনুবাদ হয়েছে এবং বিভিন্ন সংকলনে স্থান পেয়েছে। যতদূর জানা আছে বাংলা ভাষায় তাঁর গল্প ইতিপূর্বে অনূদিত হয় নি।

ডাকলিয়া প্রদেশে আল্-নাশিনা গ্রামে শেখ যুনাইম বাস করত। তার কাজ ছিল কোরাণ আবৃত্তি আর মৃতের সৎকার। রোগা দুবলা লোকটা কথা বলত কম। তার চোখ দুটো ছিল অস্বাভাবিক ধরনের উজ্জ্বল, মুখটা ছিল লম্বাটে, ফ্যাকাশে, বলিরেখাবহুল।

চল্লিশ বছর ধরে মৃত্যু এবং মৃতের কাজ ছাড়া আর কোনো কাজ সে করে নি। মুমূর্ষুর শিয়রে দাঁড়িয়ে কোরাণ আবৃত্তি, আত্মার মুক্তিকে সুগম করা, মৃতের পাশে দাঁড়িয়ে তার জন্য খোদার করুণা ভিক্ষা করা, বাড়ি থেকে গোরস্থানে যাওয়া, মৃতদেহকে গোসল করানো, কবর দেওয়া—এই করেই তার দিন কাটে। তার পেশা তার মুখে মৃত্যুর ছাপ এঁকে দিয়েছে, তার চোখ কোঁচকান এবং প্রাণহীন, তার চলাফেরা কঙ্কালের মতো। তাকে দেখলে লোকের আতঙ্ক হত। মনে হত কোনো মৃত লোক বুঝি জীবিতের সঙ্গ খুঁজছে।

ছড়ির উপর ভর দিয়ে ধীর পদে সে রোগীর বাড়িতে ঢুকত, নিঃশব্দে তার মাথার কাছে পা-মুড়ে বসে জপের মালা বের করে আবৃত্তি শুরু করত। রোগীর অন্তিমকাল যখন এগিয়ে আসত, তার দেহ ঠাণ্ডা হয়ে আসত, শেখ যুনাইম ত্বরায় তার উপর কাজে লেগে যেত, কসাই যেমন তার সদ্য

জবাই-করা পশুর উপর কাজে লেগে যায়। সুস্থ লোকেদের পাশ দিয়ে সে যখন হেঁটে যেত, তারা হঠাৎ চুপ মেরে যেত, ভাবতে শুরু করত নিজেদের অন্তিম দিনের কথা।

সেই গ্রামেই বাস করত এক ছোকরা-ক্ষেতমজুর, নাম ওমর। লম্বা-চওড়া, দশাসই জোয়ান, পোষ-না-মানা বলদের মতো ছিল তার চেহারা। বুড়ো বটগাছের গুঁড়ির মতো চওড়া ছিল তার গর্দান, তার চওড়া-বুক গরমে পালিশ-করা কাঠের মতো চকচক করত। জীবনের আনন্দ ছাড়া আর কিছুই সে জানত না। এমন কি যখন তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হত, তখনও সরল হাসিটি তার মুখ থেকে কখনও মিলিয়ে যেত না। অবসর সময়টা তার কাটত খাল ধারে বসে, ছেলেমানুষি গল্পে এবং প্রাণখোলা হাসিতে মানুষকে আনন্দ দিয়ে। ছোকরা খেতেও পারত খুব, তার মুখ চালানোর কামাই যেত না। কখনও দেখা যেত সে সেঁকা ভুট্টার দানা চিবুচ্ছে, কখনও কড়াইশুটি ছাড়িয়ে মুখে পুরছে, কখনও শাক-পাতা তুলে তাই চিবুচ্ছে—জাবর-কাটা জন্তুর মতো দুপাশে যা পড়ত তাতেই সে কামড় বসাত।

ওমর ছোকরাই সম্ভবত গ্রামের একমাত্র লোক যে শেখ দুনাইমকে ভয় করত না। সে তাকে বিশ্বাস করত, ভালোবাসত, এমন কি ভক্তিও করত। তাদের দুজনকে প্রায়ই পাশাপাশি দেখা যেত: একজন শীর্ণকায়, ফ্যাকাশে, গম্ভীর, অন্যজন জোয়ান, ফুর্তিবাজ, বাচাল। ওদের দেখে লোকে অবাক হয়ে বলাবলি করত: 'কি অদ্ভুত মানিকজোড় দেখেছ! একে অপরের একেবারে বিপরীত। একজন মৃত্যুর দূত আর একজন জীবনের।' যত দিন যেতে লাগল এই বৃদ্ধ ও যুবকের বন্ধুত্বও তত দৃঢ় হতে লাগল—তাদের পারস্পরিক ভালোবাসা ও আনুগত্য প্রবচনে পরিণত হল।

সারা জীবনে ওমর একটি দিনের জন্যেও রোগে ভোগে নি। রোগা লোকেদের নিয়ে সে হাসি-তামাসা করত, তাদের 'দুবলা' বলে ঠাট্টা করত। মানুষরা যাকে মৃত্যু বলে তা নিয়ে সে কখনও মাথা ঘামায় নি। বলতে কি মৃতকে এবং মৃতের উল্লেখকে সে ঘৃণা করত। ভুলেও সে কোনোদিন গোরস্থানের পথ মাড়ায় নি। বন্ধু শেখ দুনাইমের সঙ্গে সে যে গল্প করত তার মধ্যে রোগ বা মৃত্যু সম্পর্কে কখনও কোনো ইঙ্গিত থাকত না। এই কথার মধ্যে শেখ কথা বলত কদাচিৎ, তার কাজ ছিল শুধু ওমরের মজার গল্পগুলি শুনে যাওয়া এবং তার উচ্ছল হাসির সংক্রমণে খুশি হয়ে ওঠা। আর এই বৃদ্ধের

পক্ষে, যে আর্তনাদ আর বিলাপ ছাড়া আর কিছুই শোনে না—এই হাসি, এই গল্পের যে কী ভীষণ প্রয়োজন ছিল তা না বললেও চলে।

দুই

একদিন ওমর যখন বাড়ি ফিরল তখন মাথাটা তার যেন ছিঁড়ে পড়ছে। এমনটা তার জীবনে কখনও হয় নি। স্টোভের উপর উঠতে না উঠতেই তার প্রচণ্ড কাঁপুনি ধরল; সারাটা রাত কাটল একটা বিশ্রী অস্থিরতার মধ্যে। অসুস্থতাটা সে কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারল না। তাতে সে ভয় পেল। জ্বরতপ্ত মস্তিষ্কে সে দেখতে পেল একটা প্রেত-শরীর তার ঘরে এসে ঢুকল। আঁকা-বাঁকা একটা লাঠিতে ভর করে কঙ্কালের মতো শীর্ণ সেই প্রেতটা এসে বসল তার মাথার কাছে এবং পেশাদার মহিলা শোককারীর মতো সুরে কোরাণের কয়েকটা বয়েৎ পাঠ করল। তার চোখ থেকে আগুনের হলকা এসে ওমরের রোগগ্রস্ত দেহটাকে যেন ঝলসে দিচ্ছিল। মোটের উপর, জ্বর, দুশ্চিন্তা ও অনিদ্রার শিকার হয়ে একটা বিভীষিকাময় রাত কাটল ওমরের।

সকালে ওমর যখন মাঠে গেল তখন সে খুবই ক্লান্ত, মাথা ঝুঁকে পড়েছে, দুশ্চিন্তায় সে নুয়ে গেছে। সারা দিনটা সে মাঠে কাজ করল ভারবাহী জন্তুর মতো। বাড়ি যখন ফিরল তখন দম ফুরিয়ে গেছে। বাড়ি ফিরে দরজায় ভালো করে তালা দিয়ে স্টোভের উপর উঠে হাত-পা ছড়িয়ে শুতে না শুতে সে গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল। ঘুম ভাঙল পরদিন বেশ বেলা করে। সে অনুভব করল একটু একটু করে তার জীবনীশক্তি ফিরে আসছে, ফিরে আসছে সুস্থতার অনুভূতি। আবার সে কাজে গেল, আবার খাওয়া শুরু করল, শুরু করল হাসি-মস্করা, গান গাইল, গল্প বলতে আরম্ভ করল।

সন্ধেবেলা বাড়ি ফেরার পথে ওমরের সঙ্গে শেখ দুনাইমের দেখা হল। তার আঁকাবাঁকা লাঠির উপর ভর দিয়ে খাল-পুলের উপর দিয়ে ধীরপদে আসছিল শেখ দুনাইম। পরনে ছিল তার কালো কোট—শুধু নিষ্প্রভ দুটি চক্ষু কোটর ছাড়া আর কিছুই তার দেখা যাচ্ছিল না। সেই চক্ষু-কোটরের গভীর থেকে স্তিমিত একটু আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। তাকে দেখে ওমরের শরীরে অজানা একটা ভয়ের শিহরণ খেলে গেল। এগিয়ে এসে জোর করে মুখে একটু হাসি এনে বন্ধুকে অভ্যর্থনা করল কিন্তু আগের মতো

মজার মজার গল্প বলে বন্ধুকে খুশি করতে গিয়ে সে দেখল কোথায় যেন তাল কেটে যাচ্ছে। সে দেখল তার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, তার ঘাড়ে যেন একটা ভারি বোঝা চেপে আছে। সে তাড়াতাড়ি একটা বাজে অজুহাত দেখিয়ে বুড়োর কাছ থেকে পালিয়ে বাঁচল।

সে গ্রামে পৌঁছবার আগেই সন্ধ্যা নামল। লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটছিল সে—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ি পৌঁছতে হবে তাকে। আর সারাক্ষণ সে চেষ্টা করছিল মনটাকে শান্ত করে সাহস ফিরে পাবার। হঠাৎ তার কানে এল ঘূর্ণি বাতাসের সঙ্গে ছাগলের খুরের শব্দের মতো পায়ের শব্দ। তার মনে হল শেখ দুনাইম তার পেছনেই রয়েছে।

সামনে অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। একটা অস্বস্তিকর নৈঃশব্দ তাকে ঘিরে ধরেছে। পড়ি কি মরি করে সে বাড়ির দিকে ছুটল। আতঙ্কে তার সারা শরীর হিম হয়ে এল। বাড়িতে ঢুকে সে শক্ত করে দরজা বন্ধ করে দিল। কিন্তু ঘরের ছোট ঘুলঘুলিটার ফাঁক দিয়ে শেখ দুনাইমের চোখ দুটো—দুটো ছোট গর্ত আর তার স্তিমিত দীপ্তি—যেন তার দিকে তাকিয়ে রইল। নিজের ক্লোকটা পাকিয়ে ঘুলঘুলিটা সে বন্ধ করে দিল। নিঃশ্বাস নিতে তার কষ্ট হচ্ছিল, বুকের বোঝাটা যেন আরও ভারি হয়ে বসেছে।

'এই লোকটা কি চায় আমার কাছে?' নিঃশ্বাস নেবার জন্য খাবি খেতে খেতে সে চিৎকার করে উঠল। 'লোকটা কি চায় আমার কাছে?'

তিন

দিন আসে, দিন যায়। কখনও দেখা যায় ওমর খুশিতে উজ্জ্বল, স্বাস্থ্য ও কর্মশক্তিতে ভরপুর, আবার কখন দেখা যায় দুশ্চিন্তা ও হতাশায় সে একেবারে ভেঙে পড়েছে। এখন কদাচিৎ সে শেখ দুনাইমের সঙ্গে দেখা করে, কেননা, তার সামনে এলেই সব কিছু ওমরের যেন গোলমাল হয়ে যায়। শেখের প্রতি তার মনোভাব এখন ঘৃণায় রূপান্তরিত হয়েছে, একটা অদ্ভুত ব্যাখ্যাহীন ঘৃণা—যা তার রক্তকে বিষিয়ে তুলল, তার অস্তিত্বকে বেঁধে ফেলল দুঃস্বপ্নের শেকলে। শেখের চেহারাটাই তার কাছে এত ঘৃণ্য মনে হতে লাগল যে পুরনো বন্ধুর দিকে চোখ তুলে তাকানও তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল।

তারপর এমন দিন এল যখন তাদের মধ্যে স্নেহের শেষ সম্পর্কটাও ছিন্ন হল।

ওমরের আবার জ্বর হল। প্রচণ্ড মাথা-ধরা নিয়ে সে বাড়ি ফিরল। বাড়ি ফিরে সে মৃত্যুর কথা ভাবতে লাগল। তার মনে হল তার শেষদিন ঘনিয়ে এসেছে। বিকারের ঘোরে তার মনে হল শেখ ঘুনাইম এসেছে তার দেহকে স্নান করাতে, কাফনে মুড়ে কবরে শুইয়ে দিতে। আতঙ্কে সে চিৎকার করে উঠল, অভিশাপ দিতে দিতে শেখকে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলল।

জ্বরতপ্ত দেহকে ঢাকবার জন্ত একটা পুরনো ক্লোক বের করবার জন্ত বাক্স খুঁজতে গিয়ে তার হাতে পড়ল একটা পশমের টুপি—বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসাবে শেখ ঘুনাইম যা তাকে দিয়েছিল। ছো মেরে টুপিটা তুলে নিয়ে অস্থিরভাবে সে ওটা নাড়াচাড়া করতে লাগল। হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝলকের মতো তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে উঠে পকেট থেকে দেশলাই বের করে টুপিটাতে আগুন ধরিয়ে দিল। তারপর লকলকে আগুনে টুপিটার পুড়ে যাওয়া সে গভীর তৃপ্তির সঙ্গে লক্ষ করতে থাকল।

এরপর যখনই তার মনে হত জ্বর আসছে, বড় একটা কাগজ নিয়ে একই মূর্তি কতকগুলি এঁকে ফেলত। তারপর কাগজটা কুটিকুটি করে কেটে তাতে আগুন ধরিয়ে দিত। তার চোখ তখন ঘৃণা এবং প্রতিহিংসায় জ্বলজ্বল করে উঠত।

"পুড়ে মর শেখ ঘুনাইম" সে বিড় বিড় করে বলত, "পুড়ে মর, জাহান্নামে যা!"

কাগজের টুকরোগুলো পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করত, তারপর স্টোভের উপর উঠে গভীর ঘুমে ঢলে পড়ত। সারারাত কেটে যেত সুখস্বপ্ন দেখে।

একদিন ওমর গিয়েছিল স্টেশন কাফেতে ধূমপান করতে। হঠাৎ দেখল দূর থেকে শেখ ঘুনাইম আসছে দৃঢ় পা ফেলে। ওকে দেখেই হঠাৎ ওমরের রক্ত মাথায় উঠে গেল। সে একদৃষ্টে বুড়োকে লক্ষ করতে লাগল। একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারল বুড়োর দিকে। ঢিলটা গিয়ে লাগল বুড়োর ঘাড়ে। ঢিলটা মেরেই ওমর মাঠের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। কে ঢিল মেরেছে দেখবার জন্ত পিছন ফিরে শেখ কাউকে দেখতে পেল না—শুধু দেখল অল্প দূরে কয়েকটা বাচ্চা খেলা করছে। শেখ ভাবল বাচ্চাদের মধ্যেই কেউ ঢিল ছুঁড়েছে—আর তা হঠাৎ তার গায়ে এসে লেগেছে।

ওমর সেদিন বাড়ি ফিরল খুশি মনে। পরদিন আবার সে ওঁৎ পেতে থাকল শেখের জন্যে—শেখের গায়ে সেদিন দুটো ঢিল লাগল, একটা ঘাড়ে, একটা পিঠে। তারপর থেকে তার একমাত্র চিন্তা হয়ে দাঁড়াল কি করে শেখের ক্ষতি করা যায়। আর এ-ব্যাপারে সে বিস্ময়কর উদ্ভাবনীশক্তির পরিচয় দিল। সারারাত জেগে সে ফন্দি আঁটত কি করে শেখের অপকার করা যায়। অনেকবার শেখ রাস্তায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল—কে যেন রাস্তার খানার উপর পাতা-টাতা বিছিয়ে এমন করে রেখেছে যেন বোঝা না যায় ওখানে গর্ত আছে। রাত্রে সে নিত্যকার মতো খালে চান করতে গিয়ে একাধিকবার অনুভব করল কোনো অদৃশ্য হস্ত যেন তাকে গভীর জলে ঠেলে দিচ্ছে, তাকে ডুবিয়ে মারবার জন্য। একাধিকবার পথে যেতে যেতে তার ঘাড়ের উপর গাছের মোটা ডাল ভেঙে পড়েছে—মরতে মরতে সে বেঁচে গেছে।

ওমর শেখের শরীরের উপর আক্রমণ করেই ক্ষান্ত হল না, তার বাড়ির উপরও আক্রমণ চালাল। একদিন দেখা গেল শেখের একগাদা হাঁস-মুরগীকে কে যেন গলা মুচড়ে মেরে রেখেছে। রহস্যজনকভাবে শেখের বাড়ির দেয়ালে ও ছাদে ফুটো দেখা দিয়েছে। কে এসব করছে শেখ ভেবে কিনারা করতে পারল না। সে ভাবল এসব অপকর্ম নিশ্চয়ই কোনো দুষ্ট জীনের কাজ। তাই সে শুধু বলল, 'আমি খোদার শরণ নিলাম।' এই বলে দুষ্টকে প্রতিহত করার জন্য সে ঈশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করল।

চার

কিছুদিন পরে, একদিন মধ্যরাত্রে সাহায্যের জন্য আকুল আহ্বানে আল্‌নামিনার লোকেদের ঘুম ভেঙে গেল। তারা বিছানা ছেড়ে উঠে দৌড়ে গেল কি হয়েছে দেখতে। গিয়ে দেখল শেখ যুনাইদের বাড়ি থেকে লক্‌লক্ করে আগুনের শিখা উঠছে। আশেপাশের বাড়িগুলোও বিপন্ন। তারা সবাই মিলে উঠে পড়ে লাগল আগুন নেভাতে। অনেক কষ্টে আগুন যখন নিভল তখন তারা বাড়ি তল্লাস করতে শুরু করল। দেখা গেল উঠোনের মধ্যে একটা অর্ধদগ্ধ মৃতদেহ পড়ে আছে। তারা মৃতদেহটা ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে টেনে বার করবার চেষ্টা করছে এমন সময় তাদের কানে এল একটা বীভৎস চিৎকার:

"আমার প্রিয় বন্ধুর দেহটা আমি বইব···আমি ওর জন্য কোরাণ পড়ব···

আমি ওকে গোসল করিয়ে কবরে শুইয়ে দেব···শেখ যুনাইম খোদা তোমাকে করুণা করুন।"

ভিড়ের লোকেরা ফিরে তাকিয়ে দেখল—ওমর। সে দু-হাতে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বাড়ির মধ্যে দৌড়ে ঢুকে পড়ল। ভিড় তাকে রাস্তা করে দিল, শবটা ছেড়ে দিল তারই হেফাজতে। ওমর তার শেষকৃত্য করল একেবারে নিখুঁতভাবে। শেখকে সে একটা বিছানায় শুইয়ে দিল, মুমূর্ষু বা মৃতের শিয়রে বসে শেখ কোরাণের যেসব বয়েদগুলি আবৃত্তি করত সেইগুলি আবৃত্তি করল, তারপর দেহটা চান করিয়ে কাফনে মুড়ে নিয়ে গেল গোরস্থানে, তারপর মাটির বালিশে শুইয়ে অতি সন্তর্পণে তাতে মাটি চাপা দিল। গ্রামবাসীরা যখন যে যার ঘরে ফিরে গেল ওমর তখন উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভেঙে জোরে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস টানল।

পাঁচ

শেখ যুনাইমের কাজটা করার জন্যে আল্‌নামিনার লোকেরা তার বন্ধু ওমর ছাড়া আর কাউকে খুঁজে পেল না। তারা ওমরকেই ওই কাজের ভার দিল। ওমর সানন্দে সেই ভার নিল, এবং খুব উৎসাহের সঙ্গে কাজটা সে করে যেতে লাগল। সে মনেপ্রাণে এই কাজ করতে লাগল। মাঠে যাওয়া ছেড়ে দিয়ে সে মৃতের সৎকারে আত্মনিয়োগ করল, তাদের কবরের মধ্যে শুইয়ে দেওয়া, মাটি চাপা দেওয়া এই হয়ে দাঁড়াল তার সর্বক্ষণের কাজ। কোনো মুমূর্ষু বা মৃতের কথা শুনলেই অদ্ভুত একটা উত্তেজনা বোধ করত সে, তার শিকারের দেহটা হাতে পেলেই চাপা একটা পুলকে তার দেহে শিহরণ উঠত, সে ভাবত এদের পরমায়ুটুকু তার পরমায়ুর সঙ্গে যোগ হল।

ওমর—বা আরো সঠিকভাবে বললে শেখ ওমর যখন থেকে তার এই নতুন কাজের ভার নিল তখন থেকে তার জীবনে বিরাট একটা পরিবর্তন দেখা দিল। তার দেহ শীর্ণ হয়ে গেল, চোখ দুটো বসে গেল কোটরে, কপাল ঠেলে উঁচু হয়ে উঠল। সে আর হাসত না, গল্পগাছা করত না, তার লম্বাটে মুখটা ভীতিজনকভাবে গম্ভীর হয়ে উঠল। সে লোকজনকে এড়িয়ে চলত, একা থাকতে ভালোবাসত। খালপুল সে পেরোয় লম্বা লম্বা দৃঢ় পা ফেলে, তার লম্বা শরীরটা কাঠ হয়ে থাকে। আর তার এই হাঁটার মধ্যে থাকত কেমন একটা অশুভ সংকেত।

শেখ যুনাইমের ছড়িটার উপর ভর দিয়ে ঘুরে চলে সে। ছড়িটা সে পেয়েছিল উত্তরাধিকার হিসেবে। দূর থেকে তাকে দেখতে পেলে লোকেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে:

"ঐ দেখ গাঁয়ের এজরাইল আসছে—ঐ দেখ আসছে আত্মার ছিনতাই।"

অনুবাদ: প্রদ্যোৎ গুহ

. The Angel of Death by Mahmoud Teymour

আকুতাগাওয়া রিউনোসুকে

কেসা ও মোরিতো

আকুতাগাওয়া রিউনোসুকের (১৮৯২-১৯২৭) রচনাবলীর শ্রেষ্ঠাংশ হল ঐতিহ্যগত জাপানী কথাকাহিনীর—প্রধানত ত্রয়োদশ শতকের 'উজি গল্প-সংগ্রহের' অন্তর্ভুক্ত কাহিনীগুলির—নব রূপায়নসমূহ। অভিজাত-বংশীয়া কেসা ও সৈনিক মোরিতো-র প্রেমোপাখ্যানের এই অভিনব নবায়নে ভয়ানক রসসৃষ্টিতে আকুতাগাওয়ার বিশিষ্ট দক্ষতা চমৎকার স্ফূর্তি পেয়েছে। অপর একজন শক্তিমান লেখক কিকুচি কান তাঁর "নরকের দরোজা" শীর্ষক রচনায় এই প্রেমোপাখ্যানটিকেই অবলম্বন করেছেন।

[রাত্রি। পাঁচিলের বাইরে ছড়ানো ঝরাপাতার উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মোরিতো মেঘোত্থিত চাঁদের দিকে তাকাচ্ছে। চিন্তামগ্ন মোরিতো।]

ওই তো চাঁদ। একদা ওর জন্যে আমি অপেক্ষা করে থাকতাম, কিন্তু এখন ওর ঝাঁঝালো আলো আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে। যখনই ভাবছি আজ এই রাত ভোর হবার আগেই আমি মানুষ খুন করব, তখন ভিতরে-ভিতরে কেঁপে উঠছি। ভাবো একবার, এই দুটো হাত রক্তে রাঙা হয়ে উঠবে! আর তখন না-জানি নিজেকে কতো বড়ো পিশাচ মনে হবে! তবু যদি কোনো ঘৃণ্য শত্রুকে হত্যা করতে হতো তাহলে আমার বিবেক এভাবে যন্ত্রণা দিত না। আজ রাত্রে এমন একজনকে আমায় খুন করতে হবে, যাকে আমি মোটেই ঘৃণা করি না।

লোকটি আমার বহুকালের মুখচেনা…নাম, ওআতারু সায়েমন্‌নো-জো। যদিও নামটি এখনো আমার কাছে নতুন ঠেকে, তবু সে কত বছর আগে প্রথম আমি এই ফরসা, একটু বেশিরকম সুন্দরপানা মুখখানা দেখি আজ আর তা মনে নেই। যখন জানলাম ও কেসার স্বামী তখন আমার হিংসে হয়েছিল

সন্দেহ নেই। কিন্তু এখন সে-হিংসের ছিটেফোঁটাও আর নেই। প্রেমে ওর সঙ্গে আমার আড়াআড়ি, তবু ওর উপর একটুও ঘেন্না বা রাগ নেই। না। বরং বলতে পারি, সহানুভূতিই আছে। কোরোমোগাওয়া যখন আমায় বললে কেসাকে পাবার জন্যে ওআতারু কী অসাধ্যসাধনটাই না করেছে, তখন সত্যি বলতে কি মনটা ওর উপর সদয়ই হয়ে উঠল। পূর্বরাগের পালা চলছিল যখন, তখন জমাতে পারবে এই আশায় ও পদ্য লেখার পাঠ পর্যন্ত নিয়েছে। আহ্, অই সৎ সরল সামুরাই-এর প্রেমের কাব্যির কথা ভেবে এখনও আমার হাসি পাচ্ছে। না, ঠিক তাচ্ছিল্যের হাসি নয়; কেসাকে খুশি করার জন্যে ও কী কাণ্ডটাই না করেছিল মনে করে একটু যেন মায়া হচ্ছে। খুব সম্ভব যে-মেয়েকে আমি ভালোবাসি তাকে খুশি করতে লোকটার ভালোবাসাভরা আগ্রহের কথা ভেবে আমি—সেই মেয়েটির প্রেমিক—কেমন এক ধরনের আনন্দ পাচ্ছি।

কিন্তু আমি কি হলফ করে বলতে পারি, কেসাকে আমি ভালোবাসি? আমাদের ভালোবাসার যুগটাকে দুটো ভাগে ভাগ করা চলে: অতীত আর বর্তমান। ওআতারুকে বিয়ে করার আগেই আমি ওকে ভালোবেসেছিলাম। কিংবা, ভালোবেসেছি বলে ধারণা হয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে, আমার ভালোবাসাটা যথেষ্ট খাঁটি কিনা সন্দেহ। সেই বয়সে, যখন কোনো মেয়েমানুষকে নিজের করে পাই নি, তখন কেসার কাছে কী আমি চাইতে পারতাম? বোঝা যাচ্ছে, আমি ওর দেহটা চেয়েছিলাম। যদি বলি, আমার ভালোবাসা ছিল আসলে দেহের কামনার ভাকামিভরা প্রকাশ, তার গহনার সামিল, তাহলে খুব বেশি অন্যায় বলা হবে না। অবশ্য এটা সত্যি, ওর সঙ্গে সব চুকেবুকে যাওয়ার তিন বছর পরেও ওকে আমি ভুলিনি। কিন্তু যদি আগে ওকে এক বিছানায় পেতাম, তাহলেও কি আমার ভালোবাসা বজায় থাকত? স্বীকার করছি, 'হ্যাঁ' বলব এত সাহস নেই। পরের যুগে আমার প্রেম অনেকখানিই ছিল ওকে না-পাওয়ার দরুণ অনুতাপমাত্র। এই অতৃপ্তি নিয়ে গুমরে গুমরে থেকে শেষে, যাকে ভয় পেয়েছি আবার একান্তভাবে কামনা করেছি, সেই মাখামাখিতে কখন জড়িয়ে পড়েছি। আর এখন? নিজেকেই ফিরেফিরতি প্রশ্ন করছি, সত্যিই কি আমি কেসাকে ভালোবাসি?

প্রথমবারের সম্পর্ক চুকে যাওয়ার তিন বছর বাদে ও আতানাবি সেতুর উৎসর্গের সময় যে-মচ্ছব হয় তাতে আবার ওকে দেখতে পাই। গোপনে ওর

সঙ্গে দেখা করার জন্যে মাথায় যতরকম ফন্দি এসেছে ততভাবে তখন থেকে চেষ্টা শুরু করি। প্রায় ছ-মাস বাদে প্রথম সফল হই। শুধু দেখা করাই নয়, আগে থেকে ঠিক যেমন ভেবে রেখেছি সেইভাবেই ঘনিষ্ঠতা শুরু করি। ওকে যে আগে আমার শয্যাসঙ্গিনী করতে পারিনি এ-অনুতাপ তখন আর ছিল না। কোরোমোগাওয়ার বাড়িতে কেসাকে যখন দেখলাম, তখনই লক্ষ করেছি আমার মনের ক্ষোভ অনেকটা কমে এসেছে। ইতিমধ্যে অন্য মেয়েমানুষ-সংসর্গের যে জ্বালা কমেছিল তাতে সন্দেহ নেই। তবে আসল কারণ ছিল এই, কেসার অমন রূপ তখন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তিন বছর আগের সেই কেসা গেল কোথায়? দেখলাম, চামড়ার সে-জেল্লা আর নেই; মোলায়েম গালদুটি আর ঘাড়ের পেশী শুকিয়ে গেছে; থাকার মধ্যে আছে কেবল স্বচ্ছ, জলজলে কালো দুটি চোখ·········আর তার চারপাশে অন্ধকার রেখা। ওর এই ভোল-বদল আমার ইচ্ছেটাকে যেন পিষে মারল। মনে পড়ছে, সেদিন আমি দারুণ ঘা খেয়েছিলাম। ইচ্ছাপূরণের মুখোমুখি হয়ে আমাকে মুখ ঘুরিয়ে নিতে হয়েছিল।

যে-মেয়েমানুষকে এতটা সাদামাটা মনে হল তার প্রেমে তবে পড়লাম কেন? প্রথম কথা, ওকে জয় করার জন্যে একটা অদ্ভুত, অসহ্য তাগিদ বোধ করেছিলাম। কেসা বসে ছিল। স্বামীকে ও যেন কত ভালবাসে, ইচ্ছে করে বাড়িয়ে বাড়িয়ে তার সম্পর্কে বলছিল। কিন্তু আমার কাছে কথাগুলো ফাঁপা, অর্থহীন ঠেকছিল। মনে হচ্ছিল ও স্বামীকে নিয়ে মিথ্যে আস্ফালন করছে। আবার কখনো মনে হচ্ছিল, আমি ওকে করুণা করব মনে করে ও ভয় পেয়েছে। আর প্রতি মুহূর্তে ওর মিথ্যের মুখোশ খুলে দিতে আমি ব্যস্ত হয়ে উঠছিলুম। কিন্তু ও যে মিথ্যে বলছে তা আমি ভাবলাম কেন? কেউ যদি বলত, আমার এই সন্দেহের মূলে ছিল কিছুটা আমারই অহংকার, তবে খুব সম্ভব আমি তা অস্বীকার করতে পারতাম না। যাই হোক, আমার সেদিন ধারণা হল, কেসা মিথ্যে বলছে। আর এখনো আমার তাই-ই ধারণা।

শুধু-যে কেসাকে জয় করার ইচ্ছেই আমাকে পেয়ে বসেছিল, তা কিন্তু নয়। তার চেয়েও বেশি করে (কী বলব, আজ এ কথা ভাবতেও লজ্জা করছে!) নিছক দেহ-কামনাই আমাকে নাকে দড়ি দিয়ে টেনেছিল। না, ওকে এর আগে বিছানায় না-পাওয়ার দরুণ অনুতাপ এটা নয়। এ এমন

একটা স্থূল দেহভোগের-জন্যেই-দেহের কামনা, যে-কোনো স্ত্রীলোকের দ্বারাই যা মেটানো সম্ভব ছিল। বেশ্যাসক্ত পুরুষও কখনো এতটা ভোঁতা রুচির পরিচয় দিতে পারে না।

সে যাই হোক, এই মতলবেই আমি শেষকালে কেসাকে প্রেম জানালাম। বলতে গেলে, আমাকে মেনে নিতে ওকে বাধ্য করলাম। এখনো ফিরে ফিরে যখন সেই মূল সমস্যার কথা ভাবি—না-না, ওকে ভালোবাসি কিনা তা নিয়ে অত আকাশপাতাল ভাবার দরকার নেই। কখনো কখনো ওকে দস্তুরমতো ঘেন্না করেছি। বিশেষ করে প্রথম দিন সব চোকবার পর ও যখন শুয়ে শুয়ে কাঁদতে লাগল.........আমার কাছে টেনে নিতে গিয়ে নিজের চেয়েও ওকে সেদিন বেশি অধম মনে হয়েছিল। জটপাকানো চুল, ঘামেভেজা রঙমাখা মুখ—সবকিছু ওর দেহমনের কুচ্ছিত রূপটাই ফুটিয়ে তুলল। তখনো পর্যন্ত ভালোবাসা বলে যদি কিছু থেকেও থাকত, সেই দিন মন থেকে তা একদম মুছে গেল। আর যদি কোনোদিন ওকে ভালো না বেসে থাকি, তবে অইদিন আমার মন নতুন বিতৃষ্ণায় ভরে গেল। তাই ভাবছি, যে-মেয়েকে ভালোবাসি না তারই জন্যে আজ রাত্রে খুন করতে চলেছি এমন একজনকে, যাকে আমি ঘৃণা পর্যন্ত করি না।

সত্যি, এর জন্যে শুধু নিজেকেই দোষী করা চলে। বাহাদুরি দেখিয়ে কথাটা পেড়েছিলাম আমিই। কি, না "ওআতারুকে খুন করা যাক, কী বলো।"......যখন ভাবি কেসার কানে অই কথাগুলো আমি ফিসফিস করে বলছি, তখন আমার মাথা কতদূর ঠিক ছিল সে-সম্বন্ধেই সন্দেহ জাগে। অথচ কথাগুলো আমি সত্যিই বলেছিলাম, যদিও জানতাম যে বলাটা উচিত হচ্ছে না, বলব না ভেবে দাঁতে দাঁত চেপে ছিলাম যদিও। কিন্তু এ-ইচ্ছে আমার হল কেন? সেদিনের কথা স্মরণ করে আজ আমি এর কারণ কল্পনাতেও আনতে পারছি না। তবে কিছু-একটা বলতে হলে বলব, বোধহয় আমার মনের ভাবখানা ছিল এইরকম: কেসার প্রতি আমার তাচ্ছিল্য আর ঘেন্না যত বেড়ে যাচ্ছিল, তত বেশি করে মনে হচ্ছিল ওকে কোনো-না-কোনো ভাবে অপমান করতে হবে, ওর গায়ে কলঙ্কের কালি লেপে দিতে হবে। আর, যে-স্বামীকে নিয়ে ও এত বাড়াবাড়ি করছিল, সেই ওআতারুকে আমাদের খুন করতে হবে এ কথা বলা আর এতে ওকে জবরদস্তি রাজি করানোর চেয়ে চমৎকার কলঙ্কের পথ আর কী হতে পারে? তাই যে-

খুন আমি কখনো করতে চাইনি, উৎকট দুঃস্বপ্নে-ভোগা মানুষের মতো সেই খুনের ব্যাপারে ওকে রাজি হওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগলাম। কিন্তু এও যদি হত্যাকাণ্ডের পক্ষে উপযুক্ত উদ্দেশ্য বলে বিবেচনা না করা হয় তাহলে বলতে হয় কোনো অজানা শক্তি (তাকে দুষ্ট প্রেতাত্মার ভরও বলতে পার!) আমাকে বিপথে চালিয়েছিল। যাই হোক, কেসার কানে অই এক বিষ আমি বারে বারে ঢালতে লাগলাম।

অল্প কিছুক্ষণ পর ও আমার দিকে মুখ তুলে তাকাল। আর নিতান্ত ভিতুর মতো রাজি হয়ে গেল। কত সহজে ওকে রাজি করানো গেল শুধু এই ভেবেই কিন্তু আমি আশ্চর্য হইনি। তারপর, সেই প্রথম, ওর চোখে এক অদ্ভুত চাউনি দেখলাম······ব্যভিচারিণী কোথাকার! আচমকা হতাশায় মন ভরে গেল, ভয়ংকর উভয়সংকট সম্বন্ধে আমি সজাগ হয়ে উঠলুম। আর অই অথব কুৎসিত জীবটার সম্পর্কে কী বিতৃষ্ণাই না জাগল! একবার ইচ্ছে হল, কথা ফিরিয়ে নিই। ভাবলুম বিশ্বাসঘাতিনী মেয়েমানুষটাকে আচ্ছা করে কলঙ্কের পাঁকে ডুবিয়ে দিই। তাহলে ওকে দিয়ে দেহের তৃষ্ণা মেটালেও ঘেন্না আর রাগের হম্বিতম্বির আড়ালে আমার বিবেক স্বচ্ছন্দে লুকিয়ে থাকতে পারবে। কিন্তু তা অসম্ভব হয়ে পড়ল। আমার চোখে চোখ পেতে রাখতে রাখতে ওর চাউনি গেল বদলে। মনে হল, আমার মনের কথা যেন ঠিক-ঠিক ধরে ফেলেছে।······আজ খোলাখুলি স্বীকার করছি, ওআতারুকে খুন করার নির্দিষ্ট দিনক্ষণ যে সেদিন আমি ঠিক করে ফেললাম তার কারণ আমার ভয় ছিল এ-কাজে রাজি না হলে কেসা নির্ঘাত আমার উপর শোধ তুলবে। হ্যাঁ, এই ভয় এখনো পর্যন্ত আমাকে সারাক্ষণ আচ্ছন্ন করে আছে। আমাকে কাপুরুষ ভেবে যারা হাসতে চায় হাসুক—আমি জানি, সেই মুহূর্তে কেসার রূপ তারা দেখেনি! সেদিন ওর শুকনো চোখের কান্নার দিকে নিরুপায়ভাবে তাকিয়ে মনে হয়েছিল, যদি ওর স্বামীকে খুন না করি তাহলে যেনতেনপ্রকারে ও-ই চেষ্টা করবে যাতে আমি খুন হই, কাজেই ওআতারুকে খুন করে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে হবে। সেদিন হলফ করার পর আমি দেখেছি চোখ নামিয়ে নেবার সময় ওর ফ্যাকাশে গালে হাসির ছোট্ট টোল পড়ল।

সেই শয়তানী শপথের দরুণ আজ আমাকে খুন করতে যেতে হচ্ছে। আমার হরেক অপরাধের লিস্টিতে শেষে খুনও যোগ করতে হল। এ-রাত্রে খাঁড়ার মতো যে-শপথটা মাথার উপর ঝুলছে, সেটা যদি ভাঙি তো কী

হয়······উঁহু, তা সম্ভব নয়। প্রথম কথা, আর যাই হোক, আমি দিব্যি গেলেছি। তাছাড়া কেসার প্রতিশোধের ভয়ের কথা তো বলেইছি। আর ভয়টা একটুও বানানো নয়। তবু, এছাড়া আরও কিছু আছে।······আহ! কী সে শক্তি যা আমার মতো কাপুরুষকেও নিরপরাধ এক মানুষকে খুন করার জন্যে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে? জানি না। কিংবা কী জানি হয়তো······না, তা হতে পারে না। মেয়েটাকে আমি ঘেন্না করি। ভয়ও করি। কুকুরমতো ঘেন্না করি। তবু······হয়তো এ-কাজ করছি ওকে ভালোবাসি বলেই।

[মোরিতো হেঁটে চলে, নিঃশব্দে। চন্দ্রালোক। দূরে এক গানের গলা শোনা গেল।]

মানবমনে জড়ায় আঁধার
এই সীমাহীন রাত,
(কেবল) বাসনার আগ জ্বলে-নেবে
জীবনের সাথ সাথ।

[রাত্রি। বিছানায়, বন্ধ মশারির বাইরে বসে আছে কেসা। আলোর দিকে ওর পিছন ফেরানো। চিন্তামগ্ন অবস্থায় আমার হাতা দাঁত দিয়ে অন্ন অন্ন খুঁটছে।]

ও আসবে, না আসবে না, তাই ভাবছি। মনে হয় নিশ্চয়ই আসবে। এদিকে চাঁদ ডুবতে শুরু করেছে অথচ কই পায়ের শব্দ তো শুনছি না। হয়তো ও মত বদলেছে। যদি ও না আসে······আহ! যে-কোনো বেশ্যার মতো এই কলঙ্কিত মুখ তাহলে ফের তুলে ধরতে হবে সূর্যের আলোয়। এমন বেহায়া আমি হলুম কী করে? এর পর আমার অবস্থা হবে রাস্তার পাশে পড়ে-থাকা মৃতদেহের মতো—অমনি অপমানিত, পদদলিত, প্রকাশ্য দিনের আলোয় নির্লজ্জ নগ্ন। তবু মুখ বুজে থাকতে হবে। আর তাই যদি হয় তবে মরণেও তার শেষ নেই। না-না, সে আসবেই। সেদিন চলে আসার আগে আমি যখন ওর চোখের দিকে তাকালুম, বুঝলুম ও আসবে। আমাকে ও ভয় করে। ঘেন্না করে, তাচ্ছিল্য করে, তবু আমাকে ভয় করে। অবশ্য আমাকে যদি শুধু নিজের শক্তির উপর ভরসা রাখতে হতো তাহলে ও যে আসবেই এমন কথা বলতে পারতুম না। কিন্তু আমার নির্ভর ও নিজে। ওর স্বার্থপরতাই আমার ভরসা। হ্যাঁ, স্বার্থপরতা থেকে ওর মনে যে জঘন্য ভয় জন্মেছে, তারই

উপর আমার নির্ভর। আর তাই ওর আসা সম্পর্কে আমি নিশ্চিত। ও আসবেই, চোরের মতো লুকিয়ে·········

কিন্তু নিজের উপর বিশ্বাস হারিয়ে নিজেকে আমার কী ঘৃণ্যই না মনে হচ্ছে। তিন বছর আগে আমার সবচেয়ে বড় মূলধন ছিল রূপ। তাই বা কেন, মাসির বাড়ি যেদিন ওর সঙ্গে আমার দেখা হল সেদিন পর্যন্ত বললেই বরং সত্যি বলা হবে। সেদিন ওর চোখে এক নজর তাকাতেই টের পেলুম আমার কুশ্রীতার ছায়া পড়েছে সেখানে। অথচ আমার যেন কোনো পরিবর্তনই হয়নি ও এমনি ভাব করল, আর এমন ফুসলানোর ঢঙে কথা বলতে লাগল যেন ও সত্যিই আমাকে কামনা করে। কিন্তু যে-মেয়ে একবার জেনেছে সে কুচ্ছিত, তার পক্ষে কি আর কথার মোহিনীমায়ায় সান্ত্বনা পাওয়া সম্ভব? তিক্ত বিদ্বেষ···ভয়ে···নিজেকে আমার চরম হতভাগ্য বলে মনে হল। ছোট-বেলায় ধাইয়ের কোলে চেপে চন্দ্রগ্রহণ দেখে আমার মন যেমন সর্বনাশের আশঙ্কায় অস্বস্তিতে ভরে গিয়েছিল, এ তার চেয়ে আরও শোচনীয় অবস্থা। ও আমার সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দিল। আর তারপর ধূসর বৃষ্টিঝরা ভোরের সেই নিঃসঙ্গতা আমাকে গ্রাস করল। নিঃসঙ্গতার শিউরে শিউরে অবশেষে আমার মড়ার মতো দেহটা একদিন অই লোকটাকে ভোগ করতে দিলুম। হ্যাঁ, অই লোকটাকে, যাকে আমি ভালো পর্যন্ত বাসি না, অই লম্পট লোকটা—যে আমাকে ঘৃণা করে, অবজ্ঞা করে। ফুরিয়ে-যাওয়া রূপের জন্যে হা-হুতাশে ভরা একাকিত্বকে আমি বইতে পারিনি বলে কি? এক উন্মাদ মুহূর্তে ওর বুকে মুখ গুঁজে সেই নিঃসঙ্গতাকেই কি এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলুম? তা যদি না হয়, তবে কি ওর নোংরা কামুকতার ছোঁয়াচে আমি নিজেই বিচলিত হয়েছিলুম? ভাবতেও আজ আমার ঘেন্না হচ্ছে! লজ্জা! কী লজ্জা! বিশেষ করে ও যখন আমায় ছেড়ে দিল, আমার দেহটা রেহাই পেল যখন, নিজেকে তখন কী অঘন্যই যে মনে হল!

না-কেঁদে থাকতে চেষ্টা করলুম, কিন্তু নিঃসঙ্গতার ক্ষোভে রাগে চোখে জল উথলে উঠতে লাগল। সতীত্ব খুইয়েছিলুম বলেই যে আমি মরমে মরেছিলুম তা নয়, সতীত্ব নষ্ট তো হয়েই ছিল, কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার, লোকটা তার ঘৃণা দিয়ে, অবজ্ঞা দিয়ে আমায় জালিয়ে মারছিল, যেন আমি একটা ঘেয়ো কুকুর। কী করলুম তারপর? খুব আবছা, দূরাগত স্মৃতির মতো একটু একটু মনে পড়ে। মনে পড়ছে, যখন আমি ফুঁপিয়ে কাঁদছিলুম তখন ওর গোঁফ-

যেন আমার কানে ঠেকল……আর তপ্ত নিঃশ্বাসের সঙ্গে এই ফিসফিস কথাগুলো কানে এল: "ওআতারুকে খুন করা যাক, কী বলো!"—শুনে এমন এক কিম্ভূত উল্লাস বোধ করলুম, আগে যেমনটা আর কখনো করিনি। কিন্তু সে কি উল্লাস? চাঁদের আলোকে যদি উজ্জ্বল বলো, তাহলে আমি যা অনুভব করেছি তা উল্লাসই, তবে প্রখর সূর্যালোকের তুল্য উল্লাসের সঙ্গে তার অনেক তফাত। তবু, যতই বলি না কেন, অই ভয়ংকর কথাগুলোতেই কি আমি সান্ত্বনা পাইনি? আহ! আমার পক্ষে—কোনো মেয়ের পক্ষে—ভালোবাসা পাওয়ায় কি আনন্দ থাকে, যদি সে ভালোবাসার অর্থ হয় নিজের স্বামীর খুনের কারণ হওয়া?

আমি কাঁদতে লাগলুম। বিচিত্র চাঁদনি রাতের নিঃসঙ্গতা আর পুলকের বিমিশ্র আবছা অনুভূতি নিয়ে কাঁদলুম কিছুক্ষণ। তারপর? শেষ পর্যন্ত কখন যেন খুনের ব্যাপারে ওকে সাহায্য করতে রাজি হয়ে গেলুম! আর তারপর… শুধু তারপরই স্বামীর কথা মনে পড়ল। হ্যাঁ, তার পরই শুধু। আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আমি আমার নিজের লজ্জা নিয়ে বুঁদ হয়ে ছিলুম। সেই মুহূর্তে স্বামীকে মনে পড়ল, আমার সেই মৃদু আর চাপা-স্বভাবের স্বামী……না, ঠিক তাঁর চিন্তা নয়, বরং তাঁর সেই হাসি-হাসি মুখের জীবন্ত একটা ছবি—হাসিমুখে আমাকে কী যেন একটা বলছেন তিনি। আর সেই মুহূর্তে মতলবটা মাথায় এল আমার। আমি নিজে মরবার জন্যে প্রস্তুত হলুম……আমার মন সুখে ভরে উঠল।

কান্না থামিয়ে ফের আমি যখন লোকটার চোখের দিকে তাকালুম, দেখলুম আমার কুশ্রী চেহারাটা তখনো সেখানে ছায়া ফেলে আছে। আর বুঝতে পারলুম আমার ক্ষণপূর্বের সুখ মন থেকে সব ধুয়ে মুছে যাচ্ছে……ফের মনে পড়ল ছোটবেলায় ধাইয়ের কোলে চেপে গ্রহণ দেখার সেই অন্ধকার অনুভূতি… মনে হল, আমার আনন্দের আড়ালে লুকিয়ে-থাকা শয়তান প্রেতাত্মাগুলো একসঙ্গে মাথাচাড়া দিয়েছে যেন। সত্যিই কি স্বামীকে ভালোবাসি বলে তাঁর জায়গায় নিজে মরতে চেয়েছিলুম? না, ওটা একটা ওজর মাত্র—আসলে অই লোকটাকে আমার এই দেহ দান করার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছিলুম আমি। কিন্তু আত্মহত্যা করব-যে সে সাহস ছিল না, লোকে কী বলবে এই ভয়ে বিকল হয়েছিলুম। হয়তো এই সবকিছু লোকে ক্ষমা করবে; অথচ তা সত্ত্বেও ব্যাপারটা অনেক বেশি ঘৃণ্য, অনেক বেশি কুৎসিত। স্বামীর জন্যে

নিজেকে বলি দেওয়ার অজুহাতে আমি কি আসলে আমার উপর লোকটার ঘৃণা, অবজ্ঞা আর অন্ধ নারকী দেহ-কামনার শোধ তুলতে চাইনি? হ্যাঁ, এতে কোনো সন্দেহ ছিল না। লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার সেই বিচিত্র চাঁদনি-আলোর উল্লাস ফুড়িয়ে গেল; হৃদয় অসহ দুঃখে আচ্ছন্ন হল। তাহলে, স্বামীর জন্যে নয়, নিজের জন্যেই আমি মরতে চলেছি। মনের জ্বালায় তিক্তবিরক্ত হয়ে, কলঙ্কিত এ-দেহের উপর বিদ্বেষে আমি মরতে চলেছি। আহ, মরার পক্ষে একটা ভদ্রগোছের কৈফিয়তও আমার জুটল না।

বেঁচে থাকার চেয়ে তবু এই অশোভন মৃত্যুও কত ভালো! তাই সেদিন আমি জোর করে হাসলুম, বারবার দিব্যি করলুম স্বামীকে খুন করার ব্যাপারে ওকে সাহায্য করব। ও যদি কথা না রাখে তাহলে আমি যে কী করব সেটুকু আন্দাজ করার মতো বুদ্ধি ওর আছে। সেদিন শপথ পর্যন্ত করেছে, কাজেই ও নিশ্চয়ই আসবে চুপিসাড়ে......ও কী, বাতাস? যতবার ভাবছি আজ রাত্রে আমার সব যন্ত্রণা জুড়োবে, ততবার অসম্ভব স্বস্তি বোধ করছি। কাল ভোরে হিমেল আলো এসে একেবারে আমার মুণ্ডকাটা ধড়ের উপর পড়বে। উনি—আমার স্বামী যখন সে-দৃশ্য দেখবেন—না, থাক, তাঁর কথা আর ভাবব না। তিনি আমায় ভালোবাসেন, কিন্তু বিনিময়ে আমি তো কিছু দিতে পারিনি। আমি শুধু একজনকেই ভালোবেসেছি, আর আমার সেই ভালোবাসার লোক আজ রাত্রে আমায় হত্যা করবে। এই শেষের মধুর যন্ত্রণার মধ্যে এমনকি বাতির আলোটাও বড় চোখে লাগছে...... ।

[কেসা আলো নিবিয়ে দিল। অল্প পরেই জানলার পাল্লা খোলার মৃদু শব্দ। পাণ্ডুর চন্দ্রালোকের একটা ফলা মশারিতে এসে ঢেকল।]

অনুবাদ : মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

· Kesa and Morito by Ryunosuke Akutagawa

থেজগিয়াই

তার বউ

রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক উ খিন হান-এর ছদ্মনাম থেজগিয়াই। ১৯০৮ সালে তাঁর জন্ম, শিক্ষাদীক্ষা রেঙ্গুন, লণ্ডন ও ডাবলিনে। বহু লেখা তিনি বর্মী ভাষায় অনুবাদ করেছেন। প্রকাশ করেছেন তাঁর প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতার কয়েকটি সংকলন।

কো হপিন-এর বউ মা প' কাজ করে বাজারে। ডালায় সবজী নিয়ে প্রতি সকালে সে এক মাইল হেঁটে শহরে যায়। বেচাকেনা তড়িঘড়ি হলে সে সকাল সকাল ফেরে, নইলে সূর্য হেলে পড়লে পর। গ্রামের পাশের নদীটির এ-পার ও-পার জোড়া বাঁশের সাঁকোটির কাছে এলেই তার মনে হয় স্বামীর, ছেলেদের কথা।

লম্বা সে, লালচে চুল, দাঁত একটু ঠিকরে বেরুনো তবু তাকে কুৎসিত বলা চলে না। তার স্বামী কো হপিন মানুষটা আরামী, বাড়িতে বসে বসে খায়। একেবারে কিছু করে না এ-কথাটা সত্যি নয়। ভাত রাঁধতে হয় তাকে, দেখতে হয় ছেলেমেয়েদের।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে ন'-বছর ধরে শিক্ষানবিশী করেছে কো হপিন, কিছু লেখাপড়া শিখেছে। ভালমানুষ, হাসতে ভালবাসে, দানধ্যান এবং বিয়ের ব্যাপারে সে-ই হয় প্রধান হোতা ও উদ্যোক্তা। বউ-এর মতো লম্বা নয় সে, তার উপর তার বুকের খাঁচা সরু, মাথায় দিব্যি ঝাঁকড়া চুল, গোঁফজোড়াটি সরু, হাঁটু পর্যন্ত উলকি আছে।

যখন তাদের বিয়ে হয় তখন, এবং একটি ছেলে হবার পরেও মা প' দোকানে বসত, কো হপিনের দেখাশুনো খোঁজ-খবরদারীও করত। দ্বিতীয় ছেলেটি জন্মালে সে কোনোমতে দোকানটুকু চালাত। মেয়েটি হলে পরে মা প' প্রায়ই ক্লান্ত, হয়রাণ হয়ে পড়ত। কারবারের একটা ক্ষতিতে ভারী ঘা খায়

সে একবার। তার অবস্থাও শোচনীয় হয়ে পড়ে। কিন্তু কোনোদিন কোনো অভিযোগ জানায়নি সে।

যখন তার বন্ধুদের মধ্যে কেউ বলে 'গ্রামে বিয়েতে তোমার স্বামীর প্রশস্তি ও আশীর্বাণী পাঠ তোমার শোনা উচিত। কি চমৎকার। তারী বিদ্বান মানুষটি,' তখন মনে জোর পায় সে। উৎসাহ পায় যখন মাঝে মাঝে তার চোদ্দ বছরের ছেলেটা বাঁশের সাঁকোর কাছে তার সঙ্গে দেখা করে, তার ঘাড় থেকে নিয়ে নেয় ডালা এবং ঝুড়ি। এমনি সব সময়ে, কৃতজ্ঞতায় তার সব চিন্তা ধেয়ে যায় তার স্বামীর দিকে।

একবার। বাড়ির সমুখে উঁচু মাচায় ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সে গল্প করছিল। এমন সময়ে রাস্তায় হঠাৎ আবির্ভূত হল এক তাড়িখেকো মাতাল, তাদের দিকে চাইতে লাগল তারী কুচ্ছিৎ, অপমানজনক ভাবে। ছোটরা ভয়ে ভিতরে পালাল। কো হ্‌পিন তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে কোমরে হাত রেখে কনুই উঁচিয়ে দাঁড়ায়। মাতালটা চোখ ফিরিয়ে নিলে তখনি, চলে গেল স্খলিত পদক্ষেপে। তারী কৃতজ্ঞ হল মা প', ভাবলে ঘরের মানুষটা না থাকলে আমাদের কী লাঞ্ছনাটা হত।

মা প'র এই সাঁইত্রিশ বছর, কো হ্‌পিন ছ'-বছরের বড়।

কো হ্‌পিনের বয়স তার যাই হোক না কেন, সত্যি, পরিশ্রম বলতে যা বোঝায়, তা কোনোদিনই করেনি। সবাই যখন তার সম্পর্কে বলে ঘাঘরার কিনারা আঁকড়ে ধরেই যৌবনটা ও কাটিয়ে দিলে, তখন রসিকতা করে ও বলে, 'হিংসে কোর না। আগেকার সুকৃতি, ভাল ভাল কীর্তিকলাপ আছে বলেই ত' এখন যেমনটি দেখছ এমনি আরামে দিন কাটাতে পারছি।'

বলে বটে, কিন্তু মনে মনে দুঃখু পায় ও। চমৎকার লাগসৈ জবাব দিতে পারবার গর্বে সে দুঃখটা ভুলেও যায় আবার। জবাব শুনে অন্যদের ভুরু কুঁচকে ওঠে, নয় তো বিদ্রূপে মুখ বাঁকায় তারা। প্রতিবেশীদের এইসব ভাবভঙ্গীই সময়ে, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তার কাজের চাড় যোগালে। এক আতিভাই-এর কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে বাঁশের ব্যবসা করতে গেল সে; লোকসান হল খুব। পরের বর্ষায় মাঠে গেল লাঙল দিতে। ঘরে ফিরল পায়ে জখম নিয়ে, রক্ত পড়ছে, লাঙলের ফলাটাই সে মেরে বসেছে পায়ে। ঘা শুকোতে পনেরো দিন লাগল।

দুই

যেদিন তেতাল্লিশ বছর পূর্ণ হল, সেদিন সে সুস্থ হল। গায়ের জখম শুকিয়েছে বটে, কিন্তু মনের ক্ষত ক্ষেপে উঠেছে।

মা প' অভ্যেসমত বাজারে বেরিয়েছে, বড় ছেলেটা গেছে মঠের ইস্কুলে। আর ছেলেমেয়ে দুটো বাড়ির সমুখের তেঁতুলগাছটার নিচে খেলা করছে। এক পাত্তর চা নিয়ে বসেছিল কো হপিন, দেখতে পেল যন্ত্রপাতির বাক্স নিয়ে ও-পাশের বাড়ি থেকে ছুতোরটি কাজে বেরুচ্ছে, ছ'-ছটা ছেলেমেয়ের বাপ। পাশের বাড়ির লোকটি নদী পেরিয়ে ওপারে গেল পাতা কাটতে। উল্টোদিকের বাড়ির বুড়োটা অবধি একটুকরো কাঠকে চেঁছে রাজমিস্তিরিদের গাঁথনি-কাজের চামচ বানাতে ব্যস্ত।

প্রথম পেয়ালার পর পর পেয়ালা চা খেতে আর ছেলেপুলের খেলা দেখতে দিব্যি আরাম লাগছিল কো হপিনের, বেশ খুশী খুশী। কিন্তু পড়শীরা যখন সবাই কাজে গেল তখন তার ফুর্তি গেল উপে, মনে পড়ল এখনো উনোনে ভাতের হাঁড়ি বসানো বাকি। পড়শীদের ব্যঙ্গবিদ্রূপ মনে পড়ল হঠাৎ, সমস্ত জীবনটা যেন মিছিলের মতো ভেসে চলে গেল চোখের সামনে দিয়ে। মঠ ছেড়ে আসবার পর থেকে বাবুয়ানী, মা প'র সঙ্গে বিয়ে, তার কারবারে লোকসান, তার পায়ের চোট। ব্যথিত হল সে, লজ্জিত, ইচ্ছা হল জীবনের এই ধারা ভেঙেচুরে বেরিয়ে আসে।

মনে হল সন্নেসী হয়ে যাওয়া ভাল, তাহলে আর ভাত সেদ্ধ করতে হয় না, 'পরম মঙ্গলে'র দিকে একদৃষ্টি হতে পারে সে। তার কারণে বউ ছেলেপুলেরও কদর বাড়বে। সে নিশ্চিত জানল পুনর্জন্মের কষ্ট থেকে মুক্তি পাবার সময় তার সমাগত। ছোটখাট একটি দেবতা হবার সাধনা করতে হবে। কিন্তু আবার মনে হল ভাতও বসাতে হবে, নইলে নিজেরও খাওয়া জুটবে না, ছেলেপুলে দেবে কান্না জুড়ে, উঠে সে রান্নাঘরে গেল।

এদিকে বাজারে তখন মা প' তার তরকারীতে জল ছিটিয়ে সবজীর ওজন বাড়াচ্ছে যাতে দুটো উপরি পয়সা কামাই হয়। বাড়তি রোজগারটুকু দিয়ে তার স্বামীর জন্যে কয়েকটা খাসা চুরুট কেনার ইচ্ছে।

কো হপিন ভাত রাঁধতে বড়। ছেলেদের ডেকে সে কালকের বাসি তরকারী দিয়ে খেতে দিলে। ছেলেরা খেলতে গেলে সে উঁচু মাচায় বসে আবার শুরু করলে চিন্তা। সন্নেসী হলে ভিক্ষাপাত্র হাতে সে রোজ সকালে

এ-বাড়ি আসবে, দেখতে পাবে মা প' আর ছেলেমেয়েদের। কিন্তু মা প' নিরক্ষর, ধর্মের অনুশাসন সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। মরলে পরে ও নিম্নস্তরের জগতে যাবে এই জন্যেই তো কো হপিনের করুণা হয়। ইচ্ছে করে ওর চক্ষু ফুটিয়ে দিতে।

ছেলেপুলের ঝগড়া তাকে ফিরিয়ে আনল বাস্তবে। বোন আঁচড়ে দিয়েছে ভাই-এর মুখ, পালটা শোধ নেবার জন্যে সে দিয়েছে বোনের চুল টেনে। দুজনেই কান্না জুড়েছে।

কো হপিন ছেলেমেয়েকে ধরে ডেকে এনে দুজনকে দু-কোণে বসিয়ে দিলে। আবার চিন্তায় বুঁদ হতে ইচ্ছে হল, কিন্তু খেই হারিয়ে ফেলেছে। ছেলেমেয়ের দিকে চেয়ে দেখে খুদে মাথা ঘুমে ঢুলছে, তার নিজের ভিতরেও ঘুমের হাই ঠেলে উঠল। 'নড়িস না যেন', হুকুম করে সে শুয়ে পড়ল।

তার চোখ বুঁজল, ছোটদের খুলল, এ ওর চোখে চোখে কথা কইলে বাপের দিকে চেয়ে। বাবা ঘুমোলে পরেই তারা ছুটে চলে যাবে খেলতে।

তেঁতুলগাছ থেকে ছেলেকে নামতে বলছে মা প', শুনে কো হপিনের ঘুম ভাঙল।

'নেমে আয় এখনি, পড়ে যাবি! বোন কোথায়?'

'নদীর ধারে', ছেলে জবাব দিলে।

'কো হপিন! ছেলেমেয়েকে এমনি ছেড়ে রাখ না কি? খুব বাপ হয়েছ!' মা প' চেঁচালে।

মেয়ে এল কাদামাখা হাতে, ছেলে নামল তেঁতুল গাছ থেকে।

কো হপিন তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল ছেলেমেয়ের দিকে, তারা মা'র পিছনে লুকোলে।

'এই যে তোমার চুরুট', মা প' ওর হাতে গুঁজে দিলে, তারপর ছেলেমেয়েকে নিয়ে যায় রান্নাঘরে। কো হপিন দেখে মা প' মেয়ের হাত ধুইয়ে ছেলেমেয়েকে মটরের পিঠে খেতে দেয়। তারপর মাটিতে বসে মা প' মেঝেতে ঠ্যাং ছড়িয়ে, চুল খুলে, সামনে ঝুঁকে, পায়ের উপর চুলগুলো ঝোলে।

'কনুই দিয়ে আমার পিঠ ডলে দে তো,' ছেলেকে বলতে দাঁতে পিঠেটা চেপে ধরে রেখে ছেলে পিঠ ডলে দেয়।

কনুই-এর চাপে পিঠের কাঁপুনি, মাথার ঝাঁকুনিতে এলোচুলের দুলুনি দেখে মনে হয় মা প'-কে যেন ভূতে পেয়েছে।

দেখে দেখে কো হ্‌পিন বিরক্ত হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, সন্নেসীর হলদে আলখাল্লা আমায় পরতেই হবে সে ভাবে।

সে যাই হোক, বছর না ঘুরলে কিন্তু বউকে এ-কথা বলতে সে সাহসই পেল না।

তিন

তিনমাস হয়ে গেল, অথচ কো হ্‌পিন বলেছিল তার এ পীতবস্ত্র ধারণ মোটে একমাসের জন্যে। মা প'র মাসী এসেছিল ছেলেপুলেকে দেখবে শুনবে বলে, এখন নিজের ছেলেপুলের জন্যে তার মনে টান লাগল।

একদিন সে সাধুকে শুধোল, 'ব্রহ্মচারী! সংসারে ফিরবে কবে, শ্যাঁ!'

সাধু জবাব দিলে না, তার বদলে সন্নেসীব জীবনের প্রশস্তিবাচক কতকগুলো শ্লোক আউড়ে গেল। মাসীর কানে শ্লোক ঢুকল না, তার মনে হল এখানে তাকে অন্যায় ভাবে আটকে রাখা হয়েছে, রাগ হল তার।

সন্নেসী বিদায় হতেই সে মা প'-কে ডাকে।

'মা প', আমি ফিরে যেতে চাই। তোমার সন্নেসীকে আলখাল্লা খুলে ফেলতে বল বাপু, আমি এখানে আর বাঁদীগিরি করতে পারব না!' শাসিয়ে বলে।

মা প'রও ইচ্ছে তার স্বামী বাড়ী ফিরুক। দু-একবার কথাটা পেড়েও, উপদেশের ঠেলায় ফিরিয়ে নিতে হয়েছে। সন্নেসীরা তিন মাসের জন্যে নির্জনে যাবে—সে সময় আসন্ন। কি করবে ঠিক করতে না পেরে সে এক বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করে, কিছুক্ষণ কথা বলে দু'জনেই হাসিতে ফেটে পড়ে।

চার

রোদে সোনালী সকাল। তেঁতুল গাছে ঘুঘু ডাকছে। বাজারে না গিয়ে মা প' বাড়িতেই রান্না তাড়াতাড়ি করলে। তারপর নেয়ে ধুয়ে পা পর্যন্ত পাউডার মেখে গন্ধে ভুরভুর করতে লাগল। মুখেও মাখলো আলতো করে। তারপর এলোমেলো চুল ক'গাছা একত্র করে মানানসৈ খোঁপা বাঁধলে। কপালের সামান্য ক'গাছা চুল জড়ো করে পাতা কাটলে এমন ছাঁদে যাকে বলে ঘুঘু পাখীর ডানা। ভুরু আঁকলে চওড়া করে, ঠোঁট রাঙাল পানের রসে। চমৎকার সাদা কাপড়ের জামা আর লাল ফুল ছাপা নতুন ঘাঘরা পরলে।

ছোটদের পরণে পরিষ্কার পোশাক, গৃহস্থালীর যা কিছু সব বাঁধাছাঁদা শেষ, উঠোনে একটা বয়াল গাড়ি অপেক্ষা করছে।

সন্নেসী এল দশটার সময়ে, সঙ্গে তার বড় ছেলে, ও ছিল মঠের ইস্কুলে। আসবার সময়ে তার উদ্বেগ হচ্ছিল এই যে, আবার ওরা আমায় সন্ন্যাস ছেড়ে আসতে বলবে। বাড়ির কাছে আসতেই চোখে পড়ল বয়াল গাড়ি, বাড়িতে ঢুকে দেখতে পেল বাক্সবন্দী গৃহস্থালীর জিনিসপত্র। পুজোর জায়গায় মাসী তার জন্য যে-মাদুর বিছিয়ে রেখেছে, তাতে বসে সে বৃথাই খুঁজতে লাগল মা প'-কে।

কিছুক্ষণ বাদে মা প' এল খাবারের থালা হাতে। বড় বিষণ্ণ তার চাহনি, তার চলাফেরা। সন্নেসী এক নজর দেখল মা প' কি সাজ সেজেছে। আবার দেখল, অবাক হল ওর ধরণ-ধারণ দেখে, শক্ত করতে লাগল নিজের মনকে, মা প' তাকে সংসারে ফিরতে বলবে নির্ঘাৎ, অনুনয় প্রত্যাখ্যান করতে হবে তো।

খাওয়া হতে মা প' সরিয়ে নেয় থালা, একটু দূরে বসে সসম্ভ্রমে। সন্নেসী যেই উপদেশ শুরু করতে যাবে, সে মাসীকে শুধোয়, 'মাসী, গাড়োয়ান এখনো আসেনি ?'

উপদেশ বর্ষণ আর করতে পারে না সন্নেসী। গাড়ির দিকে চেয়ে বলে, 'মা প', কি হচ্ছে এখানে ?'

'বলব, সব বলব ব্রহ্মচারীকে।' মাথা নুইয়ে রেখে মা প' বলে, 'মাসীমা গাঁয়ে ফিরে যেতে চাচ্ছেন। উনি ফিরলে পর একই সঙ্গে দোকান সামলানো আর ছেলেপুলে দেখা, দুটো আমি পেরে উঠব না। তাই আমি প্রভুর অনুমতি চাইছি, ছোট দুটোকে নিয়ে আমাকে যেন গাঁয়ে গিয়ে মাসীর সঙ্গে থাকতে দেন। বড়জন প্রভুর কাছেই থাকবে।'

বড় ছেলের দিকে ফিরে বললে, 'বাছা, মহারাজের পেছনে গিয়ে দাঁড়াও।' আনত মুখ থেকে এক ফোঁটা চোখের জলও মুছলে।

সন্নেসী নীরব, চিন্তান্বিত।

'ব্রহ্মচারীর যদি ইচ্ছে হয়, তবে সারাজীবন তিনি সন্নেসী থাকুন না কেন। তাঁর এই তুচ্ছ মেয়েছেলেটাকে যে করে হোক জীবিকার চেষ্টা করতে হবে। তাঁর জগত আর এর জগত আলাদা, দুটোর মাঝে মস্ত তফাৎ। এখন থেকে দুজনের মধ্যে সন্নেসী এবং সামান্য এক ভক্তের সম্পর্কই থাকবে শুধু। তবু তার

তো দুটো বাচ্চা আছে। যদি ভরসা করবার মতো আর কারুকে পায়, তবে তাকে গ্রহণ করবার ইচ্ছে রাখে সে। তাই এখনি সে সাফসাফ করে নিতে চায় সবকিছু, যাতে পরে কোনো গোলমাল না হয়।'

সন্নেসী তাজ্জব হয়ে চেঁচিয়ে উঠল। মা প' তার চোখ তুলল একটু, আলখাল্লার উপর সন্নেসীর হাতদুটি বিভ্রান্ত, চঞ্চল, সে মা প'-র দিকে চাইল।

'তুজনের ভালর জন্তেই এ-সব কথা বলা। ব্রহ্মচারী স্বাধীন ভাবেই ধর্মপালন মেনে চলতে পারবেন, তাঁর এ নগণ্য ভক্ত যদি এমন কাউকে পায় .....'

'তোমার মাসীর গাঁয়ে তাড়িখোর মাতাল বড্ডই বেশি।' সন্নেসী বললে, 'আমি সংসারেই ফিরব।'

এখন আবার মা প' কো হপিনের বউ।

অনুবাদ : মহাশ্বেতা দেবী

His Wife by Zagiwai

রিচার্ড রীভ

সম্ভবামি

মুখ্যত গল্পলেখক। এবং উপন্যাসে উৎসাহী রিচার্ড রীভ বয়সে তরুণ (জন্ম ১৯৩১) হলেও বিশ্বখ্যাতির অধিকারী। দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে জন্ম, অন্যায়. লাঞ্ছনার সঙ্গে আজীবন পরিচিত এই কালো মানুষটি সমস্ত বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হয়েও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। ইংরেজি ও ল্যাটিন খুব ভালো জানেন—এই দুটি বিষয়ে শিক্ষকতাও করে থাকেন। স্বদেশের পত্র-পত্রিকায় ছাত্রজীবনেই তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সূচনা—দক্ষিণ আফ্রিকার ভূতপূর্ব 'হার্ডলিং চ্যাম্পিয়ন', একজন পর্বতারোহী এবং নিপুণ মৎস্যশিকারী। সাহিত্যিক-সংগীতজ্ঞ ও শিল্পীদের নিয়ে গঠিত দক্ষিণ আফ্রিকা শিল্প-সংস্থার তিনি কর্মসচিব—এই সংস্থার উদ্দেশ্য সাংস্কৃতিক বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

আদিতে ছিল স্বর
সেই স্বর উচ্চারিত হলো নির্জনতায়।
স্বর থেকে উত্থিত হলো মানুষ
মানুষ জয় করে নিলো পৃথিবীর মুখ থেকে ভাষা।

পৃথিবীর সারা দেহ আবৃত হলো মেখলায়;
মেখলার গভীর আড়ালে
নিরাপদে লালিত হলো মানুষ।

কিন্তু মানুষের সঙ্গে এলো পাপ
এলো আর্তি সবখানে।

.

দৈব দেহে দেখা দিলো ক্যান্সার
যা আর কখনোই সারবে না।

দূর হ!

ধূলিধূসর মেন স্ট্রীটে বন্দুকের গুলির মতো গর্জে উঠলো শব্দগুলো।

রবিবারের শান্ত বিকেলের নির্জনতা ভেঙে চুরমার হলো আবার সেই একই গর্জনে—দূর হ!

শ্বেতাঙ্গ বালক তার হাতের আঙুলগুলো মুষ্টিবদ্ধ করলো কৃষ্ণকায় ছেলেটির বিরুদ্ধে। 'দূর হ, অসভ্য, বর্বর কোথাকার', এগার বছর বয়সের ছেলের পক্ষে যতটা ক্রুদ্ধ ঘৃণা সম্ভব সমস্তটা মিশিয়ে সে বললো—'জানিস কার সঙ্গে কথা বলছিস?'

লোকটি ছেলেটির দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালো, অবশ্য খানিকটা হকচকিয়েও গেল। ছেলেটি ধুলোর মধ্যে খালি পা-দুটো ফাঁক করে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে তখনও। তাকে ঘিরে নভেম্বরের রৌদ্রস্নাত দক্ষিণ আফ্রিকার উষ্ণ ঘুমন্ত একটি গ্রাম।

খুব সাধারণ ছোট একটি দোকানের রকে একটা বাদা কুকুর নখ দিয়ে পোকামাকড় খুঁটছিল। দূরে নীল রঙের ছোট পাহাড় ঝলসানো-'কারু'র উষ্ণ কুজ্ঝটিকার আড়ালে অস্পষ্ট দেখাচ্ছিল। মেন স্ট্রীটের উষ্ণভারমন্থর পরিবেশ হঠাৎ অস্বাভাবিকভাবে ছেলেটির তীক্ষ্ণ স্বরে ভেঙে খান্‌খান্‌ হয়ে গেল।

'আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যা এক্ষুনি।'

লোকটি শান্তভাবেই তাকিয়ে রইলো, যদিও কিছুটা হতভম্বের মতো! প্রথমে সেই ক্রুদ্ধ শ্বেতাঙ্গ বালক তারপর ভীত-বিড়ম্বিত নিগ্রো ছেলেটির দিকে।

আগন্তুকের মুখটা সুন্দর না হলেও অদ্ভুত অনুভূতিপ্রবণ এবং তার গায়ের বিবর্ণ বাদামি রঙ থেকেই বোঝা যাচ্ছিল, সে শ্বেতাঙ্গ নয়। জঙ্গলের

মতো তীক্ষ্ণ ও বক্র তার নাক। চুলগুলো রোদেজলে অনাবৃত থেকে গাঢ় বাদামী রঙের। চোখদুটি সবচেয়ে বেশি আকর্ষক। পিঙ্গলবর্ণ চোখদুটি গায়ের কালো রঙের সঙ্গে অদ্ভুত বেমানান। এই মুহূর্তে সেই চোখে কিছুটা বিভ্রান্তি-মেশানো কৌতুকের বিদ্যুৎ যেন ঝিলিক দিয়ে উঠলো।

'তুমি ওর পরে অত রেগেছ কেন? ছোট ছেলেরা পরস্পরের সঙ্গে ভাই-এর মতো মিশবে।'

গম্ভীর ও স্বচ্ছ তার কণ্ঠস্বর—কথাগুলো যেন একটু প্রত্যয়ের সঙ্গে উচ্চারণ করলো।

'একটা কালো জানোয়ার আমার ভাই?' শ্বেতাঙ্গ ছেলেটির ঠোঁট কাঁপতে লাগলো। 'একটা অসভ্য বর্বর! সে আমার ভাই? তোরা দু'-জনেই দূর হয়ে যা এখান থেকে!'

আফ্রিকানিবাসী শ্বেতাঙ্গদের কণ্ঠবর্ণ-প্রধান ভাষায় কথাগুলো সে ছুঁড়ে মারলো, আর হৈ-চৈ না করে রাগে গরগর করতে করতে চলে গেল—নরম ধুলোয় রয়ে গেল তার শুকনো খালি পায়ের ছাপ।

লোকটি স্মিতহাস্তে ওর ঐ অপস্রিয়মান মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকলো কিছুক্ষণ, তারপর ক্রন্দনরত নিগ্রো ছেলেটির দিকে মন দিলো। তার দিকে উদ্যত অনেকগুলি দৃষ্টি সে অনুভব করলো এবং সতর্কভাবে তাকালো। দোকানটার রকে—ছায়ায় তিনটি শ্বেতাঙ্গ যুবক প্রায় স্থিরভাবেই বসেছিল এবং কতকটা উদাসীন ভাবে লক্ষ করছিলো তাকে।

'খোকা, এদিকে এসো', যে-ছেলেটি তখনো ওখানে দাঁড়িয়েছিল তাকে ডেকে লোকটি বললো: 'এসো না এদিকে!'

ছেলেটা সন্দিগ্ধ বোধ করলো। ও কান্না থামালো বটে কিন্তু কাছে এলো না। অপরিচিত মানুষটিকে মনে মনে বিচার করলো। ছেলেটির কালো চোখদুটো নোংরা শরীরের মধ্যে যেন ডুবে গেছে। জুতোর সামনের দিকটা ছিঁড়ে গেছে। কুশ্রী বোঁচকাটা ধুলোয় মাখামাখি। 'লক্ষ্মী ছেলে, এদিকে এসো!'

ছেলেটা হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালো, তারপরেই ছুট। ওর সরু পা দুটোয় যতটা জোরে সম্ভব দোকান পার হয়ে ও ছুটে চলে গেল।

শ্বেতাঙ্গ যুবকগুলির মধ্যে একজন হেসে উঠলো, বাকি দুজন নির্বিকার। আগন্তুক ক্লান্তিভরে তার বোঁচকাটা ঘাড়ে তুলে নিলো এবং চারিদিকে

বিহ্বলভাবে তাকালো। পথ বহুদূর প্রসারিত। রোদ্দুরের হল্কা তার চোখ ধাঁধিয়ে দিলো।

ও তৃষ্ণার্ত বোধ করলো, দারুণ তৃষ্ণা। সকাল থেকেই তৃষ্ণা বোধ করছিলো। প্রখর রৌদ্র চাবুক মারছিলো চারদিকে, সমস্ত জিনিষ কেমন ধূসর পিঙ্গল দেখাচ্ছিল।

সকাল থেকে ও শুধু একটা কল খুঁজে বেড়াচ্ছে। এতক্ষণ ধরে একটাও তার চোখে পড়ে নি। কোনো বাড়িতে গিয়ে দরজার কড়া নাড়তে খুব দ্বিধা হচ্ছিল ওর। কিন্তু এখন আর উপায় নেই।

ও স্পষ্টই বুঝতে পারলো শেতাঙ্গ যুবকগুলি ওদের টুপির চওড়া ধারের নিচে চোখ রেখে ওকে লক্ষ করছে। দোকানটা সম্পূর্ণ বন্ধ, কিন্তু দোকানীর বাড়িটা মাত্র কয়েক গজ দূরেই। পরিচ্ছন্ন ও চূণকাম করা বাড়ির ত্রিকোণ-বিশিষ্ট ধারগুলো রোদে ঝক্‌মক্ করছিলো। শুকনো গলাটা ভেজাতে হলে এই মুহূর্তে ওর আর কোনো উপায় নেই। মুখে-চোখেও জল দেওয়ার খুব দরকার। 'কারু'র রাস্তা দিয়ে একটা গোটা সকাল হাঁটা যে কী ভীষণ ব্যাপার!

সদর দরজার সামনে গিয়ে ও ঘণ্টা বাজালো। বাড়ির ভিতরে কলিং বেলের আওয়াজ ও বাইরে থেকেই শুনতে পেলো।

দোকানের রক থেকে কুকুরটা গর্জে উঠলো। চারিদিকের নীরবতা যেন চাবুকের আঘাতে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। যুবকগুলি কুকুরটাকে থামানোর কোনো চেষ্টাই করলো না। লোকটি তার বোঁচকাটা দিয়ে কুকুরটাকে ঠেকাতে ও আত্মরক্ষা করতে লাগলো।

একটি মোটাসোটা শেতাঙ্গ স্ত্রীলোক ব্যস্তসমস্ত ভাবে বাড়ির পিছন দিকের উঠোন থেকে বেরিয়ে এলো। রোদ ঠেকানোর জন্য তার মাথায় টুপি। ভিজে হাত মুছছিল এপ্রনে।

'কী?' কুকুরটাকে টানতে টানতে সে বললো, 'এই বিচ্ছু, চুপ কর।'

'ঠাকরুন, আপনাকে কষ্ট দিলাম বলে দুঃখিত। আমি কেবল তেষ্টা মেটানোর মতো কিছু চাই—জল কিংবা অন্য যা হোক কিছু।'

'তুমি শেতাঙ্গ ব্যক্তিদের বাড়ির সদর দরজায় এইভাবে হাজির হও নাকি?'

'মাফ করুন, ঠাকরুন।'

'কদর্য, অভদ্র লোক কোথাকার'—স্ত্রীলোকটি তার দিকে ঘৃণাপূর্ণ ক্রুদ্ধ

দৃষ্টিতে তাকালো। তারপর অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে বললো: 'পিছন দিকে একটা কল আছে।'

'দয়া করুন ঠাকরুন, আমি শুধু একটু জল চাই।'

'তার মানে, তুমি কি বলতে চাও—আমি আমার কাজ ফেলে তোমাকে জল দেব?'

'দয়া করুন আমাকে।'

'নির্লজ্জ শয়তান কোথাকার। এখান থেকে দূর হয়ে যা। তোর উপযুক্ত জায়গায় চলে যা।'

'দয়া করে যদি—।'

'দূর হয়ে যা। নইলে কুকুর লেলিয়ে দেব।'

'দয়া করুন ঠাকরুন।'

স্ত্রীলোকটি ঘৃণা ও ক্রোধে পিছনের উঠোনের দিকে চলে গেলো। কুকুরটা—লোকটার পা দুটো ঘিরে ভীষণ গর্জন করতে লাগলো। শেষে ক্লান্ত হয়ে ঘেউ ঘেউ করতে করতে রকটার দিকে চলে গেলো।

'এখান থেকে দূর হয়ে যা। তোর উপযুক্ত জায়গায় চলে যা।' লোকটা আবৃত্তি করলো কথাগুলো। কথাগুলো ও যে রাগের সঙ্গে আওড়ালো, তা নয়। আর কিছু বলার ছিল না তাই। 'এখান থেকে দূর হয়ে যা'···

কুকুরটা আবার মাছি খুঁটতে লাগলো। ওর দিকেও তাকাচ্ছিল সন্দিগ্ধভাবে। যুবকগুলি কিছুটা উদাসীন কিছুটা বা ক্রূরদৃষ্টিতে ওকে লক্ষ করছিলো। ও একবার ভাবলো দোকানটা কখন খুলবে ওদের কাছে জিজ্ঞাসা করবে কিনা। কিন্তু, ঠিক করলো জিজ্ঞাসা করবে না। ও স্পষ্ট বুঝতে পারছিল ওদের অলস মন্থর ভঙ্গিটা বাইরের মুখোশ মাত্র, আর যে-কোনো মুহূর্তে তা অত্যন্ত ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে। রাস্তার উপরেই দাঁড়িয়ে রইল ও। কী করবে ঠিক করতে পারলো না।

'কি হে?' রকে বসেই একটি যুবক ওকে জিজ্ঞেস করলো।

ও তাকালো। কিছু বললো না।

'মেয়েটার কাছে কী দরকার ছিল তোমার?'

প্রশ্নের হীন ইঙ্গিতটা ও বুঝলো। মহিলাটির সঙ্গে ও-তো কোনো অসংগত ব্যবহার করে নি।

'আমি জল খুঁজছি। তেষ্টা মেটানোর জন্য যা হোক কিছু।'

'দেখতে পাচ্ছিস না হতভাগা দোকান বন্ধ ?'

ও বুঝতে পারলো ব্যাপারটা খারাপ দিকে গড়াচ্ছে।

'কোনো শ্বেতাঙ্গ কথা বললে মুখ খুলবি, বুঝলি ?'

ও বোবার মতো তাকিয়ে রইলো। যুবকটি লম্বা হাই তুললো তারপর মন্থর ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালো।

'বাচ্চা ছেলেটার সঙ্গে কী করছিলি ?' খুব উদাসীন স্বরে যুবকটি বললো।

'কিছু না।'

'কিছু না কি ?'

'কিছু না, বাবু।'

'কী চাস তুই এখানে ?'

'একটু জল।'

'জল, মানে ?'

'জল বাবু।'

'এই নে জল।'—ব্যাপারটা এত আকস্মিক যে, লোকটা আত্মরক্ষা করার সময়ই পেলো না। একটা প্রচণ্ড ঘুসি বিদ্যুতের মতো ঝিলিক মেরে এলো আর ওর মুখে বসে গেলো তীব্র যন্ত্রণার সঙ্গে। যুবকটি তখনো রুখে দাঁড়িয়ে। বাকি ছোকরা দুটি ওদের জায়গা ছেড়ে নড়লো না, আগের মতো অলস দৃষ্টিতে তাকিয়েই রইলো।

'ফের বাবু বল্ গাধা!'

ও এমন হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলো যে কথা বলতে পারলো না। রক্ত আর থুথু আর ধুলো ঢোঁক চিপে গিলতে গিয়ে ওর শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এলো।

'বাবু বল্ গাধা!'

ওর বোঁচকাটার জন্য চারিদিকে কিছুক্ষণ হাতড়াতে হলো। তারপর জামার আস্তিনে মুখটা মুছতে গিয়ে রক্ত আর ধুলোয় আরো খানিকটা মাখামাখি হয়ে গেলো। ছোকরাটি ঘরে ফিরে গেলো। নিজের জায়গায়, অলস ভঙ্গিতে আবার বসে পড়লো।

আগন্তুক মেন স্ট্রীট দিয়ে আবার যখন হাঁটতে লাগলো, সূর্যের তাপ তখনও ওর উপর বর্ষিত হচ্ছিল। একজন ফিরে এলে তাঁর সঙ্গে এইরকম ব্যবহার করা হয়েছিলো। এই মূল্য তাকে দিতে হলো কারণ সে কৃষ্ণাঙ্গ হয়ে জন্মেছে।

এই জিনিস সে সহ্য করতে পারে, সে ভাবলো, কারণ এ-রকম ব্যবহার এই প্রথম নয়। তবু ব্যাপারটা ভাবতে গেলে দুঃখই পেতে হয়।

কৃষ্ণাঙ্গদের এলাকায় পৌঁছোনোর জন্য সে পাহাড়ে উঠলো। সমস্ত কিছুই শান্ত ও বিবর্ণ। কেবল ধুলো আর মাছি। আর সমস্ত পরিবেশ আচ্ছন্ন করে আছে পচা মাংস ও তরিতরকারির তীব্র কটু দুর্গন্ধ।

উত্তপ্ত ও গুমোট আবহাওয়া। অবশ্য গ্রামের তুলনায় অনেক আর্দ্র। আগাছাভরা ধূলিধূসর পথগুলো কুঁড়েঘরগুলোকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। প্রথমবার বাঁক নিতেই লোকটা অতি জীর্ণ এক কুঁড়ের সামনে এসে থামলো। ঢেউতোলা টিনের দেওয়াল বিপজ্জনকভাবে কাত হয়ে পড়েছে। প্রস্তুত চোয়ালে হাত বুলোতে বুলোতে সে খোলা দ্বারপথে তাকিয়ে দেখলো।

ভিতরে যদিও অন্ধকার তবু দেখা গেল দেয়ালে পিঠ রেখে একটি স্ত্রীলোক বিছানায় বসে আছে। ঘরের দূরতম কোণে তিনটে স্ফীতোদর ছেলেমেয়েও শান্তভাবে বসেছিল। লোকটি ভদ্রভাবে বলল—

'ভিতরে আসতে পারি ?'

স্ত্রীলোকটি ক্লান্তভাবে বসেছিল। মুখ তুলে দেখলো না।

'একটু ভিতরে আসতে পারি কি ?'

এবারেও মাথা না তুলে ক্লান্তস্বরে স্ত্রীলোকটি বললো—'আসুন।'

ঘরের মধ্যে ঢুকে লোকটি বললো, 'ধন্যবাদ। আপনার এখানে একটু জল হবে কি ?'

'হ্যাঁ।' স্পষ্টতই উদাসীন সুরে বললো স্ত্রীলোকটি—'জনি !'

কোনো উত্তর নেই।—'জনি, বাবা !'

বছর দশেকের একটি বাচ্চা ছেলে পিছন দিক থেকে বেরিয়ে এলো। আগন্তুকের মনে হলো এই ছেলেটিকে যেন সে গ্রামে দেখেছিলো। অবশ্য সে নিশ্চিতভাবে মনে করতে পারলো না কিছু। কারণ ওদের সকলকেই একই রকম দেখাচ্ছিল। শীর্ণ, অপুষ্ট এবং রোদে-পোড়া পিঙ্গল চেহারা।

'ওরে বাবা জনি, ভিতর থেকে ভদ্রলোককে এক মগ জল এনে দে না।'

আফ্রিকান ভাষায় স্ত্রীলোকটি বললো। ছেলেমেয়েগুলি বড়ো বড়ো সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলো। আগন্তুক বুঝতে পারলো, মেয়েলোকটি অন্তঃসত্ত্বা।

যদিও তার বয়স ত্রিশের বেশি নয়, তবু সে বিছানায় বসেছিলো যেন কত বুড়ি। একটু কষ্ট করেই সে বিছানার তলা থেকে একটা স্যুটকেশ টেনে বার করলো এবং ইঙ্গিতে লোকটিকে বসতে বললো। স্ত্রীলোকটি কখনোই সোজাসুজি লোকটির মুখের দিকে তাকাচ্ছিল না।

'বসুন। আমাদের বাড়িতে কিন্তু কফির আয়োজন নেই।'

'ধন্যবাদ। একটু জল হলেই আমার চলবে।' অস্বচ্ছ স্যুটকেশটার উপরে উপবিষ্ট লোকটিকে এমন অদ্ভুত দেখাচ্ছিল যে ছেলেমেয়েগুলির ঠোঁটে হাসির রেখা দেখা দিলো। একটা অস্বস্তিকর নীরবতা বিরাজ করছিলো।

'মশাই দূর থেকে আসছেন ?'

লোকটি ঠিক বুঝতে পারলো না এটা একটা মন্তব্য না প্রশ্ন।

'হ্যাঁ, আমি এখানে নতুন।'

স্ত্রীলোকটি ওর দিকে তাকালো কিন্তু সোজাসুজি মুখের দিকে নয়। লোকটির কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক হলেও তার দৃষ্টিতে ছিল অভিনবত্ব। এই দৃষ্টির অর্থ কী সে স্পষ্ট বুঝতে পারলো না ; কিন্তু তার মধ্যে কী যেন একটা ছিলো। স্ত্রীলোকটি একটু যেন ভেবে বললো, 'এখানে আমরা সবাই গরীব। আজকাল খাবার জিনিসও তেমন পাওয়া যায় না।'

ওর ছেলেটা একটা এনামেলের মগে করে ঈষদুষ্ণ জল নিয়ে আবার ঘরে ঢুকলো। আগন্তুক খুব ব্যগ্রভাবে অনেকটা জল এক চোঁকে খেয়ে ফেললো। কয়েক ফোঁটা জল তার চিবুক ও শার্টের ভিতর দিয়ে গড়িয়ে পড়লো। কাঁচা দাড়িতে জল পড়ায় খুব জ্বালা করতে লাগলো। ও বুঝতে পারছিলো যে স্ত্রীলোকটি ওর কাছে খুব সহজ হতে পারছে না। সে তার দৃষ্টি এড়িয়ে চলছিলো, কিছুতেই তার মুখের দিকে তাকাচ্ছিল না।

জল খেয়ে জিজ্ঞাসা করলো—'এরা কি তোমার ছেলেমেয়ে ?'

'হ্যাঁ—এই তিনটি এবং জনি। তিনটি ছেলে এবং একটি মেয়ে।' সে আত্মসচেতনভাবে হাসলো—'এবং আর একটি আসছে।'

'তোমার স্বামী ?'

'মারা গেছেন। খুব বেশিদিন নয়। এখন আমাকেই চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এই ঝামেলাটা চুকে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি গ্রামে কাজ খুঁজে নেবার চেষ্টা করতে পারবো।'

'তোমার স্বামীর কথা শুনে খুব খারাপ লাগছে।' সে আরও প্রশ্ন জিজ্ঞেস

করতে চাইছিলো কিন্তু যেভাবে হোক বুঝতে পারলো এই আলোচনায় সে উৎসাহবোধ করবে না।

'অনেকটা পথ আমায় আসতে হয়েছে'—ও বললো।

এতেও স্ত্রীলোকটিকে নির্বিকার মনে হলো। ওর তেষ্টা আগেই মিটেছিলো। তবু ও আরো এক ঢোঁক জল খেলো।

'আমাকে আরো দূরে যেতে হবে।'

'মশায় কি ট্রেনে করে আসছেন?'

'না, পায়ে হেঁটে।'

'এটা কিন্তু নিরাপদ নয়। বিশেষত আজকাল কৃষ্ণাঙ্গদের পক্ষে তো নয়ই।' দম নেবার জন্য স্ত্রীলোকটি এক মুহূর্ত থামলো।

'আফ্রিকানরা সর্বত্রই আছে। আমি কোনো আফ্রিকান অথবা শ্বেতাঙ্গ কাউকেই বিশ্বাস করি না। শ্বেতাঙ্গরা একদিন গ্রামে আমার স্বামীকে লাথি মেরেছিল, কারণ ওরা বলে সে নাকি উদ্ধত ছিলো।—খুব ঝামেলা চলছে।'

এতটা কথা বলে সে হাঁপাতে লাগলো। স্বভাবতই একসঙ্গে এতগুলো কথা বলার মতো অবস্থায় সে ছিলো না।

'তোমার স্বামীকে ওরা কেন লাথি মেরেছিলো?'

স্ত্রীলোকটি ধীরে ধীরে ওর দিকে তাকালো। তার বাস্তববুদ্ধি যেন ঘা খেলো। একটা কৃষ্ণাঙ্গ লোক এই সব ব্যাপার বোঝে না? হতে পারে সে কেপটাউন থেকে আসছে বলেই তার এই অজ্ঞতা। কেপটাউনের অবস্থা একটু অন্যরকম সে শুনেছে।

'তোমার স্বামীকে কি জন্যে ওরা লাথি মেরেছিলো!'

এই প্রথম স্ত্রীলোকটি ওর মুখের দিকে সরাসরি তাকালো।

'দেখুন মশায়, ভগবান আমাদের আলাদা করেই সৃষ্টি করেছেন। কাজেই মেলামেশা করাটা আমাদের অন্যায়। শ্বেতাঙ্গরা শ্বেতাঙ্গদের মতো থাকবে আর কৃষ্ণাঙ্গরা নিজেদের মতো। আমাদের কৃষ্ণাঙ্গদের একজোট বেঁধেই থাকতে হবে। আপনি কি আসবার সময় পাহাড়ের উপর কোণের দিকে সবুজ রেলিং দেওয়া একটা বাড়ি লক্ষ করেছেন? সিমন্‌স্‌ নামে একটি মেয়ে ওখানে থাকে। সে তার কৃষ্ণাঙ্গ শিক্ষকের সঙ্গে চলে গিয়েছিলো। লোকেরা তা নিয়ে কানাকানি করে। তার পক্ষে মেলামেশা করাটা পাপ, সে কৃষ্ণাঙ্গ কিনা!'

কথাগুলো বলতে গিয়ে তার দম ফুরিয়ে গেলো, চোখদুটো ক্লান্তিতে বুঁজে এলো, আর নিজের স্ফীত উদরে সে হাত বুলোতে লাগলো। আগন্তুক জনির চুলে হিজিবিজি কাটছিলো। স্ত্রীলোকটির তা ভালো লাগলো না।

'আগুনটা দেখ!'—সে তার বড় ছেলেকে ক্লান্ত স্বরে বললো—যদিও তাতে আদেশের সুরটা স্পষ্টই ফুটে উঠলো।

আগন্তুকটি একটু বিব্রত বোধ করলো। তারপর বললো—'তুমি চার্চে যাও?'

'হ্যাঁ—রবিবার সন্ধ্যাবেলায় যাই। পারলে আজ রাত্রেও যেতাম।' সে তার শরীরের দিকে লাজুকভাবে তাকিয়ে হাসলো—'কিন্তু এখন সম্ভব নয়। আমরা ছোট লেকটার ধারে যে-চার্চ—ঐটায় যাই।'

'আমি মেন স্ট্রীটের দোকানের কাছে মস্টার্ট স্ট্রীটে একটা চার্চ দেখলাম।'

'ওটা শেতাঙ্গদের জন্য। ওদের প্রধান যাজক অবশ্য আমাদের চার্চে মাঝে মাঝে আসেন।'

'কেন?'

সত্যিই লোকটা কিছু বোঝে না।

ও অবশ্য ঠিক করলো প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করবে না।

এখন তার চলে যাওয়ার সময়। বোঁচকাটার জন্য সে হাত বাড়ালো। তারপর ক্লান্তভাবে উঠে দাঁড়ালো।

'জলের জন্য অশেষ ধন্যবাদ বোন, ভগবান তোমাদের পথ দেখিয়ে দিন। ধন্যবাদ বোন!'

স্ত্রীলোকটির গালে অস্বস্তিকর রক্তিমাভা ফুটে উঠলো। লোকটি যা বললো ও তা শুনলো মাত্র, অনুভব করতে পারলো না।

'হ্যাঁ', লোকটি পুনরুক্তি করলো, 'ভগবান আমাদের আলাদা করেছেন!'—চিবুকে হাত বুলিয়ে ও ধুলোমাখা বোঁচকাটা কাঁধে তুলে নিল।

গোটা গ্রামটার মতো মস্টার্ট স্ট্রীটও সপ্তাহের অন্য সব দিন বিবর্ণ ও প্রাণহীন থাকতো। রবিবারের সন্ধ্যাটা ছিল আলাদা রকমের। সেদিন ভাড়াটে গরু ও ঘোড়ার গাড়ি এবং মোটর ইত্যাদি চার্চের বাইরে এসে জড়ো হতো। চার্চটা অন্যান্য গ্রামের তুলনায় মোটেই সুন্দর ছিল না, তবু গ্রামের লোকেরা বেশ গর্বের সঙ্গেই চার্চটার কথা বলতো। বছর তিনেক আগে পুরোনো চার্চটা পুড়ে যাওয়ার পর বেশ আধুনিক কায়দায় এটা তৈরি হয়েছিলো।

আগন্তুক চার্চের সামনে এসে থামলো। উন্মুক্ত দ্বারপথে সে গানের আওয়াজ শুনতে পেলো। সান্ত্বনা পেলো তাতে। ভিতরে নিবিড় উষ্ণতা—ঈশ্বরের স্তবগান। ওর মনে হলো ১২৩তম স্তবই গীত হচ্ছে। দ্বিধাগ্রস্তভাবে সে ভিতরে প্রবেশ করলো এবং তাড়াতাড়ি গিয়ে শান্তভাবে পিছনের দিকে একটি আসনে বসলো। সারিটা খালি ছিলো এবং কেউ তাকে লক্ষও করলো না। চার্চের প্রধান কর্মচারীর সহকারী—দরজার মুখে ধর্মগ্রন্থে গভীরভাবে মনঃসংযোগ করে ছিলো। আগন্তুক চারিদিকে তাকিয়ে দেখলো। চমৎকার কারুকার্যখচিত বক্তৃতামঞ্চ পাখির ডানার মতো দেখাচ্ছিলো। উঁচু জানালাগুলিতে শাদা পর্দা টাঙানো। দেয়ালের গায়ে কালো অক্ষরে খোদিত ছিলো বাইবেলের বাণী।

ধর্মোপদেশক একঘেয়ে সুরে ক্লান্তিকর ভাষণ দিচ্ছিলেন একটানা, শ্রোতারাও নিস্তেজ ভঙ্গিতে বসে শুনছিলো।

'হে আমার প্রিয় খ্রীষ্টীয় ভ্রাতাভগ্নীগণ, ঈশ্বর আপনাদের প্রতি সদয় হোন।'

'স্বস্তি স্বস্তি' ধর্মসভা সমস্বরে উচ্চারণ করলো।

দৃশ্যত সুন্দর লাগলেও সেখানে এমন একটা কিছু ছিলো, যাতে জায়গাটা ওর পছন্দ হচ্ছিলো না।

'আজ রাত্রে আমরা 'প্রতিবেশীদের প্রতি আমাদের কর্তব্য' সম্বন্ধে আলোচনা করবো। আমাদের ঈশ্বর, যিনি প্রেমের দেবতা, উপলব্ধির দেবতা, অনন্ত জ্ঞানের দেবতা, তিনি আমাদের এখানে প্রেরণ করেছেন, সেই সর্বশক্তিমানের কর্মশক্তি ও নীতির মূর্ত প্রতীক হিসাবে। নাস্তিকদের উপদেশ দেবার জন্য, গরীব ও মন্দভাগ্যদের সাহায্য করার জন্য, তিনি আমাদের প্রেরণ করেছেন। আমরা, শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় তাঁর আহ্বান শুনেছি। ল্যাংস্লেই-এর কৃষ্ণাঙ্গ মিশনের দিকে তাকালেই আমরা তার প্রমাণ পাই—যে-মিশনটি গঠনের জন্য আমরাই আমাদের পরামর্শ, অর্থ এবং মূল্যবান সময় ব্যয় করে তাদের সাহায্য করেছি। এ আমাদের কর্তব্য ছিলো, আর সে কর্তব্য আমরা পালনও করেছি। কিন্তু বন্ধুগণ, আবার আহ্বান এসেছে। স্থানীয় লোকদের জন্য এখনো কোনো চার্চ নেই। আবার ওদের সাহায্য করার জন্য আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আমরা যেন মুখ ফিরিয়ে চলে না যাই। ওদের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে যেন ভ্রূকুটি না করি; ওদের কাজ বৃথা—

তাও যেন না বলি। এই আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য হোক। নাস্তিকদের শিক্ষা দিতে হবে। মন্দভাগ্যদের মধ্যে তাঁর কাজ প্রসারিত করতে হবে, অনুন্নতদের সাহায্য করতে হবে, মূর্খদের শিক্ষা দিতে হবে।'

সেই গর্ভিনী নারী ও ছোট লেকের ধারে মিশন চার্চের কথা মনে পড়লো আগন্তুকের।

'এই সব কর্তব্য অপ্রয়োজনীয় নয়। স্থানীয় লোক ও কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিকে আমরা নিশ্চয়ই সাহায্য করবো—যাতে সমাজে সে তার উপযুক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।'

সেই ব্যস্তসমস্ত উত্তেজিত স্ত্রীলোকটি কথাটা আরো দৃঢ়ভাবে বলেছিলো—'এখান থেকে দূর হয়ে যা। তোর উপযুক্ত জায়গায় চলে যা।'

'ঈশ্বর ও সরকার পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত। ঈশ্বরের প্রতি আমাদের কর্তব্য হচ্ছে…'

আগন্তুক ভাবছিলো, এই দেখবার জন্যই তিনি ফিরেছিলেন? মানুষের জন্য ঈশ্বর এই বিশ্বই কি রচনা করেছিলেন? মানুষের প্রতি মানুষের এই অবিচার? আপন ভাই-এর প্রতি মানুষের এই নির্মমতা?

দরজার কাছে কাউকে দেখতে গিয়ে সভাস্থ একটি স্ত্রীলোক অবজ্ঞাতভাবে উপবিষ্ট আগন্তুকটিকে তার সন্ধানী চোখে লক্ষ করলো। ক্রোধ ও ঘৃণায় তার মুখ শক্ত হয়ে উঠলো। মাথা নিচু করে সে তার পার্শ্ববর্তিনী মহিলার উদ্দেশে ফিস্‌ফিস্‌ করে কী বললো।

সে তখন চারিদিকের সহস্র গোপন কটাক্ষের লক্ষ্য হয়ে পড়লো। একটি মুরুব্বি গোছের লোক উঠে পা টিপে টিপে দরজার কাছে চার্চের প্রহরীর দিকে গেলো। খুব দ্রুত ফিস্‌ফিস্‌ করে একটা সলাপরামর্শ হয়ে গেলো। প্রহরীটি উঠে কর্তৃত্বসুলভ চালে গলাটা ঝেড়ে নিল, তারপর জুতোর ডগায় মস্‌মস্‌ শব্দ তুলে সোজা আগন্তুকের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

মৃদু কণ্ঠে বললো—'ওহে, এখানে তোমাদের প্রবেশ নিষেধ।'

'কেন? আমি তো কেবল ঈশ্বরের উপাসনা করতে চাই।'

'বুঝলাম, কিন্তু তার জন্য ল্যাংড্রেই-এ তোমাদের জন্য আলাদা জায়গা আছে।'

'কিন্তু আমি এখানে থাকতে চাই।'

'এই চার্চ কেবল শ্বেতাঙ্গদের জন্য।'

'খ্রীস্ট সমস্ত মানুষকেই ত্রাণ করার জন্য পৃথিবীতে এসেছিলেন।'

'দেখো হে, আমার সঙ্গে তর্ক করো না, যত তাড়াতাড়ি আর ধীরে সুস্থে সম্ভব দূর হও।'

'যে-কেউ আমাতে বাস করে আর বিশ্বাস করে তার মৃত্যু নেই'—বলে চলেছেন ধর্মোপদেশক।

'চলে এসো। বেরিয়ে যাও। তোমার বোঁচকাটা নিয়ে যাও।'

চার্চ থেকে ধূলিধূসর পথে বহিষ্কৃত হলো সে, আর তার বোঁচকাটা পিছন থেকে ছুঁড়ে ফেলা হলো বাইরে।

ওর মুখে ক্লিষ্ট পরিতৃপ্তির অদ্ভুত ছাপ ফুটে উঠলো। অস্বাভাবিক কোমলতায়, অপূর্ব, পবিত্র আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো মুখটা। দুঃখবেদনার সঙ্গে পরিচিত এবং সন্তোলাঞ্ছিত একটি মানুষের বোধের গভীরতায় প্রসন্ন চোখদুটি থেকে আনন্দের আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছিলো।

ক্লান্ত পথিক কাঁধে তুলে নিলো বোঝা, প্রায় দু'হাজার বছর আগে তাঁর নিজের ক্রুশ কাঠ—ক্যালভারি পাহাড়ের উপরে তিনি যেমন কাঁধে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। ধূলিধূসর পথের উপর দিয়ে যখন পরিশ্রান্ত পথিক কোনোমতে নিজের দেহটাকে টেনে নিয়ে এগোতে লাগলো, তখন মনে হচ্ছিলো আঁকাবাঁকা পথের উপর দিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তার যাত্রা।

দিব্যদ্যুতিতে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠলো তার মুখ, আর স্বর্গীয় বিভায় দীপ্ত দুই চোখ।

'পিতা, আমি ফিরে এসেছি দেখ', তিনি বললেন,
'এবং তারা বিদ্রূপে বিদ্ধ করলো আমাকে।
কারণ, বুঝবার মতো প্রসন্ন হৃদয় তাদের ছিলো না।
শোণিতক্ষরিত আমার হৃদয় পৃথিবী ও তার মানুষের জন্য।
হে পিতা, ক্যালভারি পাহাড়ে একদিন বলেছিলাম, বলছি আজও—
ক্ষমা করো, ক্ষমা করো ওদের, ওরা জানে না ওরা কী করেছে।'

অনুবাদ : জ্যোতির্ময় ঘোষ

The Return by Richard Rive

আইভাইলো পেত্রভ

পিসির বিয়ে হবে

আইভাইলো পেত্রভ (জন্ম ১৯২৩) ১৯৪৮-এ তাঁর লেখা ছাপাতে শুরু করেন। এ পর্যন্ত তাঁর দুটি বই প্রকাশিত হয়েছে, একটি গল্পের বই, নাম 'বেপটিজম্', অপরটি মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা এবং সমকালীন জীবন নিয়ে লেখা উপন্যাস, নাম 'লোনকার প্রেম'। তিনি তাঁর চরিত্রগুলোকে এক কাব্যময় পরিবেশে মেলে ধরতে পারেন এবং যুক্তিসীমার মধ্যে এক গভীর পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সচল রাখতে পারেন। তাঁর বর্ণনা সহজ, অকপট, চাপা উত্তেজনাপূর্ণ যা অদৃশ্যভাবে জীবণ টানে এবং সব সময় এমন কিছু ব্যক্ত করে যা অত্যন্ত জরুরি এবং হৃদয়গ্রাহী।

আইভাইলো পেত্রভ দব্রুদজার (Dobrudja) এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ডোব্রিচ (Dobrich) শহরের হাইস্কুলে তিনি পড়াশোনা করেছিলেন এবং সোফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়েছিলেন। বর্তমানে তিনি বুলগেরীয় লেখকদের প্রকাশন-ভবনের একজন সম্পাদক। 'পিসির বিয়ে হবে' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৩ সালে।

শীতের এক সকালে ঠাকুরদা অন্যদিনের চেয়ে আগেই আমাদের জাগিয়ে দিলেন। তিনি তাঁর মস্ত ভারি হাতে ছোট্ট জানালার ফ্রেমে এমন জোরে ঠকাস্ ঠকাস্ ঘুষি মারতে লাগলেন যে শার্সির গায়ে জমা তুষারবিন্দুগুলো কেঁপে কেঁপে ঝরে গেল।

'এই, তোরা কি সব ঘরের মধ্যে মরে আছিস? উঠে পড়।' তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন। মা আর বাবা জেগে উঠল। আমরাও বিছানা ছেড়ে উঠলাম। ছোট্ট বোন আর আমি। আমরা জামা কাপড় নিয়ে অন্য আরেকটা

ঘরে ছুটে গেলাম। ঘরের ভিতরটা বেশ গরম, আরামপ্রদ। ঠাকুরমা আর পিসি আগেভাগেই উঠেছিল এবং স্টোভটার চারপাশে ব্যস্ত হয়ে ঘোরাফেরা করছিল। মা এসে ওদের সঙ্গে জুটল। এবং এই তিন মহিলা মিলে এমন গোরগোল তুলল যেন বাড়িতে সেদিন মস্ত একটা ভোজের আয়োজন চলছে।

পিসি আমাদের জামা কাপড় পরিয়ে সুন্দর করে মাথা ঢেকে স্টোভের পাশে বসিয়ে দিল।

'সোনারা কি একগাল কিছু খেতে চাও?' পিসি শুধালো। 'এসো, পিসি আজ তোমাদের দুধ আর রুটি খেতে দেবে।'

পিসিকে কেমন চঞ্চল মনে হচ্ছিল। তার উজ্জ্বল নীল চোখজোড়া উদগ্রীব, খুশি। পিসি আমাদের শান্তিতে দুধরুটি খেতে দিল না। ছোট্ট বোনের গালে চিমটি কাটল, আমাকে সুড়সুড়ি দিল, বা আমাদের দুজনের মাথা ধরে আস্তে ঠুকে দিল।

'মা, ওমা, আজ কি বড়দিন?' ছোট্ট বোন জিগ্যেস করল। আর সকলে হাসল।

'বড়দিন এখন অনেক দূর,' নাক মুছতে মুছতে মা বলল।

'পিসির বিয়ের আজ পাত্তিপত্র হবে। ঘটকরা আজই আসছে, আর তাকিয়ে দেখ নিজের সুরৎখানা কী করেছ! এসো, শিস্‌শির সকালের খাওয়া শেষ করে নাও। তারপর আমি তোমাকে নতুন ফ্রকটা পরিয়ে দেব।' মা বলল।

ছোট বোন মস্ত একটা কাঠের চামচ দিয়ে এমন জেবড়াজোবড়া ভাবে দুধরুটি খাচ্ছিল যে দুধরুটির আদ্দেকটাই গড়িয়ে গড়িয়ে তার ছোট্ট ফ্রকে পড়ে যাচ্ছিল।

'আচ্ছা, পিসি, কি করে তোমার বিয়েটা হবে?' সে জিগ্যেস করল। 'বিয়ে ঠিক হয়ে গেলে কি হবে, বল না।'

পিসি বলল, 'আমাদের তখন একটা বিয়ে হবে সোনা, আর তারপর আমি চলে যাব, আমি অপর একজনের সঙ্গে থাকব। আমি অন্য বাচ্চাদের মামী কাকী হব।'

ছোট্ট বোনের বড় বড় কালো চোখ পিসির দিকে প্রশ্ন মেলে তাকাল। তার নিচের ঠোঁটটা কাঁপতে লাগল আর তার জোর কান্নায় ঘরটা ভরে উঠল।

'লক্ষীটি, ওই শোনো আবার ব্যাগপাইপ বাজছে।' ঠাকুরমা ওকে কোলে তুলে নিয়ে ওর কান্না থামাতে কত কিছুই না করল। 'পিসির বিয়ে হবে আর

তুই কাঁদছিস ? পিসি তোকে কি সুন্দর একটা ফ্রক দেবে দেখিস। উঃ কি ভালো না দেখতে ! আর পিসির বাক্স থেকে আমিই তোকে খুলে দেখাব। এসো, সোনা আমার এসো।'

এদিকে আমার ফুর্তি আর ধরে না। বাড়িতে একটা বিয়ে হবে ! আমি ছুটে বেরিয়ে গেলাম। ঘন পালকের মতো সাদা তুষার আমার কোমর পর্যন্ত। আমি বরফের বল বানালাম ; এদিক ওদিক ছুঁড়ে মারলাম। কিন্তু সেগুলো শূন্যেই টুকরো টুকরো হয়ে গেল। দিনটা স্থির। হাওয়া বইছিল না। ঠাণ্ডাটা মিষ্টি লাগছিল। আর আমি যখন নিঃশ্বাস নিচ্ছিলাম তখন আমার নাকে কুয়াশা জমা হচ্ছিল। সূর্য উঠছিল। তার রশ্মি এমন কোমল লাল যে আমি একটুও চোখ পিট্‌পিট্‌ না করেই সূর্যের দিকে তাকাতে পারছিলাম। সেই লঘু তুষারপাত, যা জমে জমে ছাইচ চুঁই চুঁই করছিল, তার রঙ এখন তামার মতো হল। ঠাকুরদা আর বাবা মিলে আমাদের বাড়ির দরজার রাস্তাটা সাফ করছিলেন। সেই রাস্তা ধরে আমি ঠাকুরদার কাছে যেতেই তিনি হাতের কোদালটা নেড়ে আমাকে রাস্তা থেকে সরে যেতে বললেন আর আমি সেজন্য ছুটে আমার জায়গায় ফিরে এলাম। একসময় ঠাকুরমা বাড়ির ভিতর থেকে বাইরে এলেন। গাড়িবারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে তিনি ঠাকুরদাকে আস্তে এমন ভাবে কাছে ডাকলেন যে মনে হল এবার গুঞ্জনায় এমন সব কথা হবে পড়শিদের যা শোনা বারণ। ঠাকুরদা কোদালটা বরফের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে তাঁর কাছে এলেন।

'ভদ্রলোক ভালোমানুষরা এক্ষুনি এসে পড়বে। তাদের কি দিয়ে আপ্যায়ন করব ? ঘরে কিছু নেই। তুমি একটা মুরগি মেরে দাও না গো।'

ঠাকুরদা ভুরু কোঁচকালেন ; তাঁর নীল চোখদুটো আকাশের দিকে তুললেন, তারপর বললেন, 'ও এই মতলব, তাদের জন্ত মুরগিভোজের ব্যবস্থা ! যেন মুরগি না হলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে !'

উরু চাপড়ে ঠাকুরমা চেঁচিয়ে উঠল, 'হায় আমার কপাল, এই ভদ্রলোকই আমার মারবে। ভালোমানুষের পো, বলি তোমার বাড়িতে লোকজন আসছে কী জন্ত, শুনি। হাত দিয়ে জল গড়ায় না হাড়কঞ্জুষ বুড়ো, জান না ? তোমার নিজের মেয়েকে উদ্ধার করতে।' ঠাকুরদার প্রকাণ্ড হাতদুটো কাঁপছিল, তিনি সে দুটো প্রসারিত করে দিলেন, তারপর ঘসতে লাগলেন। যখনই কোনো কিছু করতে তাঁর মনে দ্বিধা জাগে তখন এরকম করাটাই তাঁর অভ্যেস।

'তোমার মেয়ের দাম কি একটা মুরগির চেয়েও বেশী নয়? এমন দিনে তুমি যদি আর কিছু ভাবতে না পার তাহলে তুমি আমাকে মেরে ফেল' এই বলে ঠাকুরমা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঠাকুরদা মুরগিঘরের দিকে চলে গেলেন। একটু পরেই যে-মোরগটাকে তিনি মেরেছিলেন সেটাকে নিয়ে, তার শক্ত পা-দুটো ঝুলিয়ে ফিরে এলেন। পাখিটার কাটা গলা থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছিল আর সেই রক্ত বরফের উপর টকটকে লাল দাগ রেখে যাচ্ছিল।

'এই নাও' ঠাকুরমার হাতে ওটা দিতে দিতে ঠাকুরদা বললেন—'কাজের এখনো আদ্দেকই হল না, আর তোমরা ওদের মুরগি মেরে খাওয়াতে লেগে গেছ। খাবে যখন এই মুরগিটাই ওরা খাক। ব্যাটা বাচ্চা মোরগগুলোকে বড্ড জ্বালাত আর প্রায়ই পড়শিদের ঘরে বাগানে উড়ে যেত। আর কিছু দিন পরে হলে অন্য কারো থালায়ই ওর জায়গা হত।'

ঠাকুরদা সত্যি কঞ্জুষ। কোনো ছুটিছাটার দিনে যদি মেয়েদের মধ্যে কেউ সাহস করে মুরগি মারত তাহলে ঠাকুরদা বোধহয় তার চোখদুটো উপড়ে নিতে পারতেন। কটা মুরগি মুরগিঘরে আছে, তা তাঁর ঠিক জানা আছে। পাখা ওঠে নি এমন মুরগি কটা, যুবা বয়সী পুরুষ মোরগ কটা, সবই তাঁর নখদর্পণে। তাদের অভ্যেস এবং চিহ্ন পর্যন্ত তিনি ভালভাবে জানেন। অবশ্য মুরগি সংখ্যায় খুব বেশী ছিল না এবং কয়েকটি মাত্র ডিম দিত। গরমের সময় যারা রুগ্ন তারাই শুধু ডিম পেত, বাদবাকি ডিম বেচে ঠাকুরদা নুন কেরোসিন ইত্যাদি জিনিষপত্র কিনে আনতেন। কখনো যদি নিড়ানি বা কাস্তে-টাস্তে ভেঙে যেত বা ভোঁতা হয়ে যেত তবে ঠাকুরদা নিজেই সেগুলো সারাতেন বা তাদের ধার তুলতেন। তিনি তাঁর গোলাবাড়িতে খালি পা-দুটো মুড়ে বসতেন যাতে তাঁর পায়ের তলা গদির কাজ করে। তারপর প্রাপনল-এর প্রকাণ্ড বাক্সটা উল্টে নিয়ে তার উপর হাতুড়ি চালাতেন। পনেরো পাউণ্ড ওজনের প্রাপনল-এর এই বাক্সটা আঁদ্রিয়াপোল-সীমান্ত থেকে ফেরার সময় তিনি এনেছিলেন।

বাক্সটা তাঁর থলির ভিতর পুরে তিনি বাড়ির দিকে পা বাড়িয়েছিলেন। যেন ওটা তাঁর একটা সম্বল। ঠাকুরদার জীবনটা এমনিতে কঠিন কঠোর, ফলে তাঁর সবকিছুতেই রূঢ়তা, রুক্ষতা—যে-নিড়ানি দিয়ে তিনি কাজ করতেন তা সসপেন-এর ঢাকনির মতো বড়, আর তাঁর কাস্তেও বেঢপ রকমের প্রকাণ্ড। সবই পুরনো আর মরচে-ধরা, আর সবই তাঁর নিজের হাতে তৈরী। কিন্তু

ঠাকুরদার মনে কোনো অভিযোগ ছিল না। পুরনো ন্যাকড়া হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁর জামা-কাপড় পরতেন। বাড়িতে রান্না করা খাবার আছে কিনা এ কথা তিনি কোনোদিন জিগ্যেস করেন নি। কয়েকটা পেঁয়াজ এবং মস্ত একটা রুটি খেয়ে সমস্ত দিনটা তিনি মাঠে কাটিয়ে দিতেন। আমরা যখন ফসল কাটতাম তখন তিনি সাধারণত মড়াই করতেন এবং অপরের হয়ে কাজ করে যেতেন। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হলে তিনি বাড়ি ফিরতেন, পাউরুটির পিঠটা নিতেন এবং মড়াই-এর উঠোনে কুলকিসমিস গাছটার উপর উঠে বসতেন। সেখানে বসে তিনি এক কামড় রুটি আর এক কামড় কুলকিসমিস খেতেন।

এসব দেখে আমার বাবা রেগেই খুন হতেন। তাঁর স্বভাবটাই ছিল আমুদে আর হাসিখুশি। তিনি আমাদের এই দারিদ্র্যে গা ছেড়ে দিতে পারতেন না এবং ঠাকুরদাকে ভীষণ বিদ্রূপ করতেন।

'হাড়কঞ্জুষপনা করে, ভাঙা জিনিস কুড়িয়ে জোড়াতালি দিয়ে সারাটা জীবন তুমি একই রকম কাটালে। এতটুকুন পরিবর্তন হল না। সীমান্ত থেকে ফেরার সময় হাডজিওলোভ্স্ আনল মোহর আর তুমি আনলে প্রাপনল এক বাক্স।'

এ কথা শুনে ঠাকুরদা ক্ষেপে উঠতেন 'আচ্ছা, আমি মরি, দেখা যাবে তোমাদের কত মুরোদ।'

'তোমার এই বাঁজা ক্ষেতগুলো আমি বেচে দেব। তারপর বাজারের বাগানে কাজে লাগব; আমি হাডজিওলোভ্স্-এর হয়ে কাজ করব না।' বাবা বলতেন।

ঠাকুরদা চেঁচিয়ে উঠতেন—'এখুনি যাচ্ছ না কেন? আছ কেন এখানে! কিন্তু তুমি যদি গাঁ ছেড়ে চলে যাও, না খেয়ে মরবে। পয়সাকড়ি উড়িয়ে দিতে তুমি ওস্তাদ।'

ঠাকুরদা ওরকমই ছিলেন। তবু তিনি কি কৃপণ? তাঁর একমাত্র মেয়েকে দেখতে যারা আসছেন তাদের জন্য তিনি একটা কেন, তিনটে মুরগিও কি মারতে পারতেন না?

লোকজনরা ঠিক সময়েই এসে গেল। তাদের মধ্যে একজন বেশ লম্বা চওড়া, মাথায় নরম ফলাজলা টুপি। আরেকজন বেঁটে গোল, তার গায়ে লাল পটি বসানো নতুন কোট। তার গোল মুখখানা তরমুজের ভিতরের মতো লাল। আমি দূর থেকেই তাকে চিনতে পারলাম। তার নাম কিরাঞ্জো জস্কভ। সেই

গাঁয়ের সবচেয়ে সেরা ঘটক। যেখানেই বিয়ে সাদির বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা আছে সেখানেই সে নিশ্চিত হাজির। তার দারিদ্র্য একটা কিংবদন্তি। গুঁড়ি গুঁড়ি একপাদা ছেলেপুলে, প্রায় উলঙ্গ। গরমের সময় তাকে দেখে দুঃখ হবে। তার টুপিটা পুরনো এবং তেলচটচটে, তার সার্টটা কলারসর্বস্ব, বাকি সবটাই জোড়াতালি। কিন্তু শীতকালে কিরাঞ্চো লাল গদি-আঁটা গরমের কোটটি পরত আর তা পরত শুধু সেই উপলক্ষে যখন কোনো বিয়ের ঘটকালি হচ্ছে। যখনি ওই লাল গদি-আঁটা কোট গাঁয়ের রাস্তায় দেখা যেত তখনই লোকেরা এই কথা পরস্পর বলাবলি করত যে নিশ্চয়ই কোনো বাড়িতে বিয়ের কথা-টথা চলছে এবং তারা কবে বিয়ে হয় সেইদিনের প্রতীক্ষা করত। এই প্রতীক্ষায় তারা কখনো বিফল হত না কারণ কিরাঞ্চো খুব মুখমিষ্টি মানুষ। যে-মেয়ের বিয়ের কথা হচ্ছে সে মেয়ে অন্ধ হতে পারে, অলস হতে পারে, কুচ্ছিত হতে পারে, যা খুশি তাই হতে পারে কিন্তু যে মুহূর্তে কিরাঞ্চো তার গুণগান শুরু করল সেই মুহূর্তে বুঝতে হবে যে বাজিমাৎ। সে মেয়ের সাতপুরুষের ইতিহাস বলবে, মেয়ের রূপ এমন ভাবে বর্ণনা করবে যেন সাক্ষাৎ প্রতিমার কথা বলছে। তারপর কার সাধ্য আছে সেই মেয়ে বৌ করে ঘরে না তুলে পারে!

আমি যখন বুঝতে পারলাম যে পিসিকে দেখতে লোকজনরা আসছে তখন আমি চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে বাড়ির ভিতর চলে গেলাম—'ঠাকুমা ওরা আসচে।' তারপর আবার ছুটে গেলাম ঠাকুরদা আর বাবার কাছে। গেটের কাছে জমা উঁচু তুষারস্তূপের ভিতর দিয়ে অতিথিরা উঠোনে এল।

'নমস্কার খুড়ো', কিরাঞ্চো বলে উঠল, এবং তার বেঁটে মোটা পা থেকে বরফ ঝেড়ে ফেলার জন্য পা ঝাড়তে লাগল।

ঠাকুরদা, তিনি তখনও বরফ সাফ করছিলেন, প্রতি-অভিবাদন করলেন আর বাবা এই অপ্রত্যাশিত সম্পর্ক স্থাপনে লজ্জায় লাল হল, তারপর হো হো করে হেসে উঠল!

সেই ফশাঅলা টুপি পরা লোকটি শান্ত শ্রদ্ধার কণ্ঠে বলল—'নমস্কার আইভান দাদু।'

আমি তাকেও চিনতে পারলাম। তার নাম মিট্রি। সে বাবা ভাসিয়েভ পরিবারের লোক। তাঁরা গাঁয়ের সবচেয়ে ধনী ঘরের একঘর। আর সেইজন্য তার পাতলা ঠোঁটটা কুঁচকে জিগ্যেস করল:

'আপনারা কি অনাহুত অতিথি চান?'

'কেউ কি অতিথির ভয়ে ঘর ছেড়ে পালায়?' ঠাকুরমা জবাব দিলেন। এবং তখনই তিনি রাস্তার বরফ সরাবার কাজ বন্ধ করলেন এবং তার কোদালটা বরফের স্তূপের মধ্যে গুঁজে রাখলেন। অতিথিদের আসার সঙ্গে সঙ্গেই হয়তো তাঁর কোদাল ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাঁর দিকটাও তো তাঁকে ঠিক রাখতে হবে। তাদের অভ্যর্থনা করার জন্য কেউ কি আর রাস্তায় ছুটে যেতে পারে? যেন অনেকক্ষণ ধরে কেউ তাদের পথ চেয়ে বসে আছে। না, যদি কেউ আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চায় তবে তারা আমাদের খুঁজে বার করবে।

আমি লক্ষ করলাম যে বাড়ির ভিতরেও সেই অপ্রত্যাশিত অতিথিদের সংযত সম্ভ্রমের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানানো হল। সেখানেও মিত্রি চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে তার পায়ের মোজা থেকে বরফ ঝাড়তে লাগল এবং জিগ্যেস করল যে অনাহূত অতিথিদের গ্রহণ করা হবে কি না। সেই সময় কিরাঞ্জো ঠাকুমাকে খুড়ি বলে তার হাতে চুমু খেয়ে এমন ভাবখানা দেখাল যেন তিনি ওর কত আপন জন। সে বাড়ির ভিতর এমন ভাবে এল যেন এটা তারই বাড়ি, এবং যা মাথায় এল তাই বকবক করে বলতে লাগল। যেমন গত বছর যখন শীত পড়ল তখন গরুর গাড়ি নিয়ে সে গিয়েছিল বনে এবং রাত্রি হয়েছিল গভীর, আর নেকড়েরা তাকে আক্রমণ করেছিল। বিশ্বাস কর আর নাই কর একটা নেকড়ে ছিল গাধার মতো প্রকাণ্ড। সে বলদ দুটোর সামনে রাস্তার উপর এসে স্থির হয়ে দাঁড়াল আর অন্য নেকড়েটা প্রায় গরুর গাড়ির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কপাল ভালো যে কিরাঞ্জো চাবুকের বাঁটটা দিয়ে এমন এক ঘা কশাল যে তার নাক দিয়ে রক্ত ঝরতে শুরু করল।

যখন মেয়েরা টেবিল পাতছে তখন সে হা হা করে উঠল। 'তোমাদের এসব কষ্ট করার কোনো মানে হয়। আমরা তো আর এখানে খেতে আসিনি, খুড়ি!' এই কথা বলে সে তার পশমের টুপিটা খুলে তার বাঁ হাঁটুর কাছে খড়ের মাদুরের উপর রাখল, এবং ভাল করে বাবু হয়ে বসে তার সসেজের মতো পুরু ঠোঁট দুটো চাটতে লাগল। 'তোমরা যখন এতই করেছ তখন তোমাদের সঙ্গে সুপ দিয়ে একগাল খাব। তোমরা আতিথ্য করবে আর আমরা তা গ্রহণ করব না এত দেমাক আমাদের নেই।' তার পাকা ঘটকের চোখ বুঝতে পেরেছিল যে প্রচুর পানাহারের আয়োজন হয়েছে এবং খুব সাবধানে সে তার আগমনের উদ্দেশ্য আকারে ইঙ্গিতে বলতে লাগল। এসব কথাই অবান্তর,

কেননা লোকজন কেন এসেছে, তা বাড়ির সকলেই জানত এবং ধৈর্যের সঙ্গে এতক্ষণ তাদের পথ চেয়ে বসেছিল। কিন্তু কিরাক্রো সোজাসুজি কোনো কথায় আসতে পারে না। প্রথমত মাঠে চাষের অবস্থা তাকে বলতে হয়, গাঁইগরুর হাল, গত বছরের ভাল ফসল যার ফলে এ বছর শীতে এত বিয়ের ধুম।

ইতিমধ্যে টেবিল পাতা হয়ে গেছে। লম্বা নীল টেবিলের উপর রুটির পুরু টুকরো রাখা হয়েছে আর গরম ধোঁয়াওঠা সুপের বাটি, চীজ, গুড়—এক কথায় আমাদের বাড়িতে এরকম ব্যাপক আয়োজন আগে কখনো দেখিনি। আমরা সকলেই এক টেবিলে বসলাম, শুধু পিসি দাঁড়িয়ে থাকল সতর্ক হয়ে। ঠাকুরমা চোখ দিয়ে বলল আর অমনি পিসি টেবিলের উপর নিচু হয়ে অভ্যাগতদের রুটি পরিবেশন করল অথবা আর একটু সুপ এনে দিল অথবা তাদের গ্লাসগুলো মদে ভর্তি করে দিল।

ঠাকুরদা বসেছিলেন মিত্রির পরেই এবং তার সঙ্গে শান্তভাবে প্রতিটি কথা ওজন করে বলছিলেন। মা আর বাবা চুপ করেছিল এবং একে অপরের দিকে লুকিয়ে তাকাচ্ছিল। রাশটা নিজের হাতে ধরে ঠাকুরমা কিরাক্রোর কথা আদ্দেক আদ্দেক শুনছিলেন এবং সব দিকে খুব কড়া নজর রাখছিলেন এবং পিসিকে আকারে ইঙ্গিতে নির্দেশ দিচ্ছিলেন।

তারপর সেই শোরগের স্টু পরিবেশন করার সময় এল। সামনে মোটা চাকের কাঠিটা দেখামাত্র কিরাক্রো ঠোঁট দিয়ে আস্বাদনের এক শব্দ করল। এক গ্লাস মদ গলা দিয়ে গলিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে আসল কথাটা পড়ল।

'ভাল কথা, আইভান খুড়ো', সে বলল, 'আমরা একটা কাজে এসেছি' এবং সে তার হাতের তালু দিয়ে তার উরুর উপর সশব্দে এক চাপড় মারল।

সকলেই নীরব। ঠাকুরমা বিচক্ষণভাবে সামনের দিকে তাকাল। ঠাকুরদা গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে তাঁর বাটির উপর চোখ রাখল, মিত্রি শান্তভাবে একটুকরো রুটির জন্য হাত বাড়িয়ে দিল আর পিসি লজ্জায় লাল হয়ে স্টোভের দিকে কিছু আনতে চলে গেল।

কিরাক্রো বলেই চলল—'সত্যি কথা বলতে কি খুড়ো, আমরা একটা জরুরি কাজেই এসেছি।'

'তাই যদি এসে থাক তাহলে বল।' ঠাকুরদা বললেন এবং কাশলেন। 'তুমি কি বুঝতে পারছ না আমরা কেন এসেছি?' কিরাক্রো বলল, 'তোমাদের

একটি মেয়ে আছে, আমাদের একটি ছেলে আছে। মেয়েটির জন্য ছাড়া আর কি জন্য আমরা আসতে পারি ?'

ঠাকুরদা তক্ষুনি এ কথার কোনো জবাব দিলেন না। তিনি হাসতে চেষ্টা করলেন কিন্তু অনেক চেষ্টা করে তিনি অনেকদিন তেল না দেওয়া গরুর গাড়ির চাকার মতো একটা কঁ্যাচ কঁ্যাচ শব্দ বার করলেন।

'তা এসেছ ভালই করেছ, কিন্তু আমাদের ছোট মেয়ে বড্ড ছোট', তিনি বললেন। 'খুড়ো, পাখিও তেমনি কম বয়সী আর ছোট' কিরাক্রো চাকের কাঠিটা তার দাঁত দিয়ে কামড়াতে কামড়াতে বলল 'কিন্তু এরা নিজেদের বাসা নিজেরাই বানায়।'

'আমার ঠিক হিসেব নেই, ওর বোধ হয় উনিশও পেরোয় নি।' ঠাকুরদা বললেন।

কিন্তু কিরাক্রোর সব কিছুরই একটা জবাব দেওয়া চাই। সে তার ভাল করে চিবোনো হাড়টা প্লেটের উপর নামিয়ে রেখে বলল, 'তোমার খুব ভাল স্বাস্থ্য' —তারপর আরেক গ্লাস মদ গলায় ঢেলে, মাথা নেড়ে ঠাকুরদার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'এখন আমি যা বলি শোন, মেয়েরা হল ফুলের মতো। বয়েস পেরিয়ে গেলো কি ব্যাস, যেন বাসি ফুল—তা দিয়ে তোড়া বাঁধা যায় না।

'ঠিক তাই' শেষ পর্যন্ত মিত্রি মুখ খুলল এবং হাসল, তাতে তার ঠোঁটদুটো মাঝখান দিয়ে এক পেনি গলে যাওয়ার মতো যথেষ্ট ফাঁক হল। 'তোমরা যদি মেয়ে দিতে রাজি থাক তাহলে ঠিক করে ফেল, দিয়ে দাও, আর তা না হলে আমরা..... '

অসমাপ্ত কথাটা ভয় দেখানোর মতো শোনাল অথবা এও হতে পারে ঠাকুরদা সেভাবেই কথাটা গ্রহণ করলেন এবং তাঁর সব কিছু তালগোল পাকিয়ে গেল। তিনি তাঁর কাঁপা কাঁপা হাতে কপাল থেকে ঘাম মুছে নিলেন তারপর একটা খালি গ্লাস ঠোঁটের কাছে তুলে ধরলেন। অবশ্য তাঁর পক্ষে তালগোল পাকানো কিছু আশ্চর্য নয়। তারা এসেছে তাঁর মেয়ের জন্য। তাতে তাঁর মেয়ে ধনী ঘরের বৌ হবে, কিন্তু শত হলেও তিনি বাপ, একটু ইতস্তত তাঁর হতেই পারে। ওদের একবার বলার পরই তিনি তাঁর মেয়েকে যেতে দিতে পারেন না, বলতে পারেন না, 'তোমরা ওকে চাও, আচ্ছা নিয়ে যাও।'

'একটা কথা তোমাকে আমি বলব খুড়ো।' কিরাক্রো উৎসাহিত উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল। 'তোমার মেয়ে যে-যায়গায় যাচ্ছে তার কথা অন্য কোনো মেয়ে

স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। ওখানে ও মান পাবে, ওর উপর কেউ কথা বলবে না। কেননা বাবাডালিভ্সরা যে সে নয়। তুমি জানো বাবাডালিভ্সরা কারা? দশটা গাঁয়ের লোক ওদের দেখে মাথার টুপি নামায়। এই গাঁয়ে ওদের মতো অত জমি আর কারো আছে? কারো নেই। ওদের মতো অত গাইগরু আর কারো আছে? কারো নেই। আমি তোমাকে দেখে অবাক হচ্ছি আইভান খুড়ো।'

ঠাকুরদা তাঁর কম্পিত হাত বুকের উপর রাখলেন এবং এরকমটা কি মদ খাওয়ার ফলে হল না অন্য কিছুর জন্য তা আমি জানি না, তাঁর চোখদুটো সহসা জলে ভরে গেল।

'ভাল কথা, আমার মেয়েকে তাঁর ছেলের বৌ করতে চেয়েছেন বলে অর্জিই দাদামশাইকে আমার ধন্যবাদ জানিও। আমার কথায় আর কী হবে, এখন মেয়ে কি বলে একবার দেখা যাক। ওর মতটা একবার শুনি।' ঠাকুরদা তাড়াতাড়ি পিসির দিকে চোখ ফেরালেন 'বল মা বল, তোমার মনের কথা বল, এই ভদ্রলোকরা তোমার জন্যই এসেছেন।'

আমরা সবাই পিসির দিকে তাকালাম। পিসিকে দেখতে সেদিন কী সুন্দর লাগছিল। বসন্তের হালকা পাতার মতো শিহরিত, ছিপছিপে লম্বা ওখানে সোজা দাঁড়িয়েছিল। তার শ্রদ্ধায় জোড় বাঁধা হাতদুটো কাঁপছিল। লজ্জায় লাল, প্রতি কিনারে রূপোর বল আঁকা সবুজ রুমাল-ঘেরা পিসির সেই কোমল মুখ আমি কোনোদিন ভুলব না। তার সাদা ব্লাউজ বুকের ওঠানামার সঙ্গে কাঁপছিল। তার স্কার্টের রঙ ছিল উজ্জ্বল লাল তাতে বড় বড় বিনুনি আর তার নিচের দিকটা চুপটি কালো ভেলভেট দিয়ে সুন্দর মানানসই। আর পিসির চোখজোড়া, তার স্বচ্ছ নীল চোখ লজ্জিত, মেঝের দিকে নামানো।

বেশী রকম লাল হয়ে পিসি টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল এবং শান্ত গলায় বলল: 'আমার অমত নেই বাবা।' কিরাক্রো গলা কাটিয়ে গর্জন করে উঠল আর আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আর ঠাকুরমা কাঁদতে লাগলেন। এ কান্না আনন্দের না দুঃখের তা কেউ বুঝতে পারল না। তাঁর শুকনো গাল বেয়ে অশ্রুর ধারা নামল আর তিনি তা জামার খুঁটে মুছে নিলেন। কিন্তু তারপর পিসির দিকে তাকিয়ে তিনি মৃদু হাসলেন এবং বললেন যে তিনি এবং গাগিভিট্না দাদুর মধ্যে এই ছেলের সঙ্গে বিয়ে নিয়ে কথা বলাবলি হয়েছে। ভগবানের ইচ্ছে, তাই হতে চলেছে। হঠাৎ গরম বোধ করার জন্য অথবা অন্য কোন কারণে বলতে পারব না ঠাকুরদা তাঁর পদি লাগানো কোটের বোতাম

খুলতে শুরু করলেন এবং মিত্রিকে বললেন, 'ওর জন্ম আমরা আমাদের যথাসাধ্য করব মিত্রি, কিন্তু আমরা খুব বড়লোক নই, আমরা আমাদের দিন আলস্যে কাটাই নি। আমাদের মেয়েকে দেওয়ার জন্ম, আমাদের সকলের মিলিতভাবে কিছু আছে।'

কিরাঞ্জো স্রেফ পাগলা হয়ে গেল, সে গ্লাসের পর গ্লাস মদ ঢালতে লাগল, তার ফুলে ওঠা ঠোঁটদুটো চাটল আর গলা ফাটিয়ে হাকড়ে উঠল :

'যেখানেই আমি হাত লাগিয়েছি আইভান খুড়ো, সেখানেই বাজিমাৎ হয়েছে। তোমার মেয়ে যে বিয়ের পর রূপোর চামচে খাবে আর নরম কার্পেটের উপর হাঁটবে সেই বিয়ে ঠিক করে দেওয়ার জন্ম তুমি আমার কাছে ঋণী। আচ্ছা, আচ্ছা' আবার টুপিটা ধরে খড়ের মাদুরে রেখে দিয়ে বাড়ি মারতে মারতে সে চিৎকার করে উঠল, 'খুড়ো আমি বলি দারিদ্র্য দূরে যাক, আর মনের বিয়ে হোক। বিয়ে মানুষকে স্ফূর্তি দেয়।'

কিরাঞ্জো কাঁদল। তার রক্তবর্ণ চোখ থেকে অশ্রু গড়াল। মুছে ফেলার জন্ম মাথা না ঘামিয়ে সে মদ খেলো, এলোমেলো কথা বলল এবং টুপি দিয়ে মাদুরের উপর বাড়ি মারতে লাগল।

মিত্রি যাওয়ার জন্ম উঠে দাঁড়াল। কিরাঞ্জোও উঠল এবং খুব অনিশ্চিত-ভাবে তার টলা পায়ের উপর দাঁড়িয়ে সে দুলছিল। কিন্তু কারো সাহায্যও সে নেবে না।

'আরে না না, কিরাঞ্জো পড়বে না, তোমরা যদি দেখতে কিরাঞ্জো কত মদ খেয়েছে, একটা পুরো সমুদ্র…'

যে-পিনি ঠাকুরদা তার বিয়ের জন্ম এনেছিলেন পিসি এমব্রয়ডারি করা শাদা রুমালে সেই পিনিটি জড়িয়ে নিল আর তার সঙ্গে দিল একগুচ্ছ টকটকে লাল জেরানিয়াম এবং এ সবই সে মিত্রির হাতে চুমু খেতে খেতে তাকে দিল। ঠাকুরদা এই প্রতীকের উপর ক্রুসচিহ্ন আঁকলেন। আর এ সবই মিত্রি নিমেষে টুপির মধ্যে ঢুকিয়ে রাখল এবং পিসি বাবাডালিভস পরিবারের জন্ম সহৃদয় শ্রদ্ধা নিবেদন করল।

'আচ্ছা, আমরা শুক্রবার দিন আসব।' মিত্রি বলল, 'তখন একটা বড় রকমের শপথ করা যাবে, আর রোববার যদি আপনারা তৈরি থাকেন তবে বিয়েটাও চুকিয়ে দেওয়া যাবে।'

অতিথিরা চলে গেল।

বিশ্বাস কর আর নাই কর এক সপ্তাহে আমাদের পরিবারের জীবনটা পাল্টে গেল। সকলের মনে মমতা বেড়ে গেল, মা আর ঠাকুরমা কোনো কিছু নিয়েই আর ঝগড়া করত না, অনেক রাত্রি পর্যন্ত স্টোভের ধারে বসে কথা বলতে বলতে হাসতে হাসতে কাজ করত বা সুতো কাটত। ঠাকুরদা আর বাবা সব সময় উঠোনের কাজে ব্যস্ত, বরফ সাফ করে, গাইগরুকে দানা-পানি খাওয়ায়, ঝগড়াঝাটি নেই। আর পিসি কোথাও বেরতো না, তার সিন্দুকের কাছে অনেক রাত্রি পর্যন্ত জেগে বসে থাকত। বাড়ির সবাই আমাদের বাচ্চাদের খুশি রাখতে তৎপর। তারা আমাদের ভালো জামা-কাপড় পরিয়ে রাখত। ঠাকুরদাও নতুন চোগা পরলেন আর ঠাকুরমা পরলেন নতুন ডোরাকাটা এপ্রন। এ কথা মনে হল ভাগ্য যেন নিজেই আমাদের বাড়িতে ঢুকে পড়েছে।

পরের শুক্রবার আর আসছিল না। আমি জানি অন্যরা সেই দিনটির জন্য কিভাবে অপেক্ষা করছিল কিন্তু আমার কাছে সেই সাতদিন মনে হচ্ছিল সাত বছর। দিনগুলো যা'হ'ক করে কাটল কিন্তু রাতগুলো! রাত্রি হলে আমরা শুতে যেতাম কিন্তু আমি ঘুমুতে পারতাম না। আমি পিসির বিয়ের কথা ভাবতাম। আমাদের আশেপাশের অনেক বিয়েতে আমি গেছি এবং অন্য বাচ্চাদের দেখে আমার হিংসে হত। হিংসে না করে কি পারা যায়? সমস্ত গ্রামটা উঠে আসত ওদের বাড়িতে তারপর চলত খেলা, নাচ আর গান। গত শরৎকালে যখন মিটকোর দিদির বিয়ে হল তখন মিটকো হল বড় কুটুম। সামনের দিকে লাল এমব্রডারি করা সাদা একটা শার্ট তাকে পরানো হয়েছিল আর তার নতুন পশমের টুপিটা, কী সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল। নিজেকে তার খুব কেউকেটা মনে হয়েছিল। তারা তাকে বলত ডিমিটার—ছোট শ্যালক। সে কিছুক্ষণের জন্য আমাদের কাছে এসে তার নতুন পোশাক দেখিয়ে তারপর বড়দের কাছে চলে যেত। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি বিয়েতে পিসেমশাই-এর যে-জুতোজোড়া আমাকে দেওয়ার কথা আমি সেই জুতোর কথা সবচেয়ে বেশি ভাবতাম। ঠাকুরদা আমাকে যখন পিসির বিয়ের কথা বলল তখন এই বিয়েতে আমি কি পাব তাও বলেছিল। বর বড়লোক অতএব আমাকে নিশ্চয়ই একজোড়া জুতো উপহার দেবে। সাত রাত্রি আমি এই স্বপ্ন দেখেছি এবং সাতবার।

বিয়ে শুরু হল। বাড়ির ভিতর, গাড়ীবারান্দা, উঠোন লোকে লোকারণ্য,

ভিতরে গলে কার সাধ্য। ঘোমটা পরাতে পিসির বন্ধুরা এসেছে। তারা চুমকিমোড়া ফুলের তোড়া দিয়ে পিসিকে সাজাল। তারা গানও গাইল। মেয়েরা তাদের কাছে এসে ভিড় জমাল, পিসির দিকে তাকিয়ে দেখল আর বলল, 'কি সুন্দর কনে, আশীর্বাদ কর।' তারপর আঙুল দিয়ে ক্রশ আঁকল। একসময় একটা গোলমাল উঠল আর সব লোকজন চেঁচাতে চেঁচাতে উঠোনের দিকে গেল, 'ওরা আসছে, ওরা আসছে', আমিও ছুটে গেলাম এবং একটা ঘোড়ার পিঠে দুজন লোককে দেখলাম। ঘোড়াগুলির গায়ে মুখে ফেনা লেগে ছিল। খবর নিয়ে দূত এসেছে। দুজনের কে আগে খবর পৌঁছোতে পারে যে বর কনে তুলে নিতে বেরিয়েছে তারই প্রতিযোগিতা হচ্ছিল। তারা মদের বোতলের জন্যও ছুটছিল। একটা সাদা গামছায় জড়িয়ে বোতলটা উঠোনের সবচেয়ে উঁচু বাবলাগাছটার উপরের ডালে বেঁধে রাখা হয়েছিল। সেই দূতরা ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নামল, ঘন তুষার স্তূপের ভিতর দিয়ে ছুটে গেল আর তাদের একজন হামাগুড়ি দিয়ে গাছে এবং অপরজন পিছু পিছু তাঁকে অনুসরণ করল। লোকজনরা চিৎকার করে তাদের উৎসাহিত করল। হামাগুড়ি দিয়ে তারা শিশিরে ভেজা গাছের গোড়া অবধি উঠল, তাদের হাত থেকে ধারালো কাঁটা ফুটে যাওয়ার জন্য রক্ত বেরুচ্ছিল। দু নম্বর এক নম্বরের পা ধরে টানছিল যাতে সে মদের বোতলটা হাতে না পায়। উঠোনের লোকেরা মজা দেখছিল এবং তাদের উৎসাহিত করছিল। অবশেষে একনম্বর মদের বোতলটি হাতের নাগাল পেল এবং ওখানে বাবলা গাছের মাথায় সে বোতলটা খুলে খেতে লাগল এবং উপস্থিত জনমণ্ডলী তাকে চিৎকার করে উৎসাহ ও সমর্থন জানাল। আর যখন সকলে হাঁ করে তার দিকে তাকিয়েছিল তখন চারটে পুষ্ট ঘোড়ায়টানা একটা গাড়ি দ্রুত গেট পার হয়ে ভিতরে ঢুকল। কুটুমরা, তাদের পরনে ছিল মেষচর্মের কোট, খুব জাঁকালো ভঙ্গীতে গাড়ী থেকে নেমে বাড়ির দিকে পা বাড়াল, ওঁরা সকলেই ছিলেন—ঠাকুরদা জর্জি, গ্রোন গার্ড ভিৎসা, তার স্ত্রী, মিত্রি, অন্য ছেলেরা এবং ছেলের বৌরা। বরও এখানেই ছিল বেশ বড় সড় একটি লালমুখো লোক, তার মাথায় অ্যাসট্রাক্যান টুপী, তাঁদের যাওয়ার রাস্তা করে দেওয়ার জন্য লোকজন সরে দাঁড়াল। বিয়ে শুরু হল, নাচ শুরু হল, আনন্দ ফুর্তি এবং চিৎকার চেঁচামেচি। বর পিসির নিকটে গেল এবং তারা দেয়ালের ধারে পাশাপাশি দাঁড়াল। ছোট্ট বোন আর আমি তাদের সঙ্গে ছিলাম। ব্যাগপাইপে এমন করুণ সুর বাজতে লাগল যে মনে হল যেন আমাদের বাড়ি থেকে পিসির বিদায়

আসর বলেই তারা এই সুর বাজাচ্ছে। ঠাকুরমা কাঁদতে লাগল, ঘোমটার নিচে পিসিও। পিসির জন্য আমারও খুব দুঃখ হল এবং চোখদুটো জলে ভরে উঠল। আমার আশপাশের লোকজনকে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না এবং তারা যেন গলে গিয়ে রঙ-গোলা অস্পষ্টতা হয়ে উঠল। কেউ যেন আমার হাত ধরে বলল, 'দৌড়ে যাও, বরকে দরজা দিয়ে ঢুকতে দিও না।' আমি ভিড়ের ভিতর দিয়ে পিছলে গিয়ে ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে পড়লাম। পিসি আর পিসিব বর থামল।

'আমাকে যেতে দাও', সে বলে উঠল।

আমি একটা কথাও বললাম না, যারা চোখ দিয়ে আমাকে উৎসাহ দিচ্ছিল আমি আমার চারদিকে তাঁদের দেখলাম এবং দরজা আটকে থাকলাম।

'এসো, ওকে একটা কিছু উপহার দাও, তা না হলে ও তোমাকে যেতে দেবে না', কেউ যেন বলে উঠল।

'ওর কাছে জুতো চাও, ও তো বড়লোক, ও তোমাকে একজোড়া জুতো দেবে', আরেকজন বলে উঠল।

'আচ্ছা কুটুম ভাই, তুমি কি চাও?' বর একটু গম্ভীর হয়ে জিগ্যেস করল। আবার একটু হাসলও।

আমি বললাম—'আমি একজোড়া জুতো চাই'।

'তোমার জন্য আমি জুতো কোথায় পাব'—বর জিগ্যেস করল

আমি সাহস সঞ্চয় করে বললাম—'তুমি কিনবে'

'তোমার কি একটা টুপি চাই না?'—সে আবার জিগ্যেস করল

'না চাই না, টুপি আমার একটা আছে'—আমি বললাম

'অথবা একজোড়া পাৎলুন?' তার পরের প্রশ্ন

'না, আমার চাই না'

'আমাকে একটু যেতে দাও, দেবে?'

'না, পিসির দাম একটা টুপির চেয়ে বেশি', আমি বললাম—আমাকে যেন কেউ শিখিয়ে দিল।

একটা হাসির রোল উঠল। বরও হাসল, কিন্তু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল।

'আর কুটুমভাই' সে বলল 'মনে হচ্ছে আমরা ঝগড়া করতে যাচ্ছি, তুমি আর আমি।'

আমার মনে হল বর সত্যি সত্যি রেগে যাচ্ছে এবং তার জন্ত রাস্তা করে দিচ্ছিলাম কিন্তু সে তার এক আত্মীয়কে ডাকল। তারা যে বাক্সটা এনেছিল তাতে হাত ঢুকিয়ে একজোড়া জুতো বার করে নিয়ে আমার হাতে দিল।

আঃ সে কি জুতো! একেবারে নতুন। সাদা পেরেকওয়ালা। আর তার পালিশের গন্ধটাই বা কি ভালো!

আমি সে দুটো চেপে ধরলাম আর······আর ছোট্ট বোনের কান্নার চিৎকারে জেগে উঠলাম। ঘুমের ঘোরে আমি তার চুল ধরে প্রাণপণ টানছিলাম।

শেষ পর্যন্ত শুক্রবার এলো। সমস্ত দিন মেয়েরা ব্যস্ত, ধোয়া মোছা, সবকিছু সাজানো, রান্না—সবচেয়ে মোটা দুটো মুরগি ঠাকুরমা মেরেছেন—এবং সন্ধ্যে নাগাদ সবকিছু তৈরী। আমরা সবচেয়ে ভালো পোষাক পরে কুটুমদের পথ চেয়ে বসেছিলাম। কাঠগুলো চট্‌পট্‌ আগুনে ফাটার ক্রমাগত শব্দ হচ্ছিল এবং সুখাদ্যের সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। ঠাকুরমা অন্তত বিশবার বাইরে গিয়ে দেখলেন কুকুরগুলো ঠিকমতো বাঁধা আছে কিনা, যাতে তারা কুটুমদের কাউকে কামড়াতে না পারে। অন্ধকার হয়ে এল। গ্রামটা চুপচাপ কিন্তু কুটুমদের দেখা নেই।

'ওরা আসবে, দু-এক মিনিটের মধ্যেই এখানে এসে পড়বে।' ঠাকুরমা বলল। 'ওরা নিশ্চয়ই দুপুরে রওনা হবে না। বুড়ি গারখুভিৎসা, অনেক দিন বেঁচে থাকুক, তার শরীর ভালো নয় ঠিক আমার মতো, কালেভদ্রে বেরোয়, আহা বেচারী!'

'আচ্ছা খাদ্যভোজটা তো আমরা সেরে ফেললেই পারি, ওরা যদি আসে আসবে।' বাবা বলে উঠল। 'আমরা মাঝরাত্রি পর্যন্ত ওদের জন্ত অপেক্ষা করব না।'

ঠাকুরমা তাঁর দিকে এমন ভাবে তাকাল।

'একটু অপেক্ষা কর।' ঠাকুরমা বলল, 'খিদেয় তুমি মূর্ছা যাবে না।'

বাবা মাথা নিচু করল এবং বিড় বিড় করে বলল, 'তারা আসতে পারে আবার না-ও আসতে পারে। বাবাভালিভস্‌রা এদিকে দেখে ওদিকেও দেখে, আমি ওদের জানি।'

ঠাকুরমা বকে উঠলেন—'এত কথার দরকার নেই, বাইরে গিয়ে দেখ ওরা আসছে কিনা।'

আমরা স্টোভটা ঘিরে বসে থাকলাম, এটা-ওটা নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কোনো কথাবার্তাই জমল না। বাবার কথাগুলো আমাদের অন্তরে যন্ত্রণা জাগাল। কুটুমরা যদি না-ই আসে? কত দেরি হয়ে গেল তাদের তবু দেখাই নেই।

'হায় কপাল, এরা এত দেরি করছে কেন?' শেষ পর্যন্ত ঠাকুরমাও ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল। সে পিসির দিকে তাকিয়ে বলল—'নিশ্চয়ই ওদের কিছু হয়েছে। লোকভর্তি বাড়িতে কত কিছুই হতে পারে।'

ঠাকুরদা ভোঁস ভোঁস শব্দ করে উঠলেন তারপর নিচু হয়ে আগুনে কাঠ দিলেন।

সমস্ত নীরবতাটা যন্ত্রণা দিচ্ছিল। যখনই ব্যাপারটা শুরু হয়েছে তখনই আমার কাছে ভালো ঠেকে নি। বাবা আবার বললে, 'যার সঙ্গে যার চলে, কিন্তু তোমরা তো ·'

'এ সব বাজে কথা বলবে না।' মা বকে উঠল, 'তুমি ওখানে বসে থাক।'

মা তার কথা শেষ করার আগেই গাড়িবারান্দায় পায়ের শব্দ শোনা গেল। আমরা লাফিয়ে উঠলাম এবং পিসি দরজার কাছে যেতে না যেতেই দরজাটা খুলে গেল।

কিরাঞ্চো ঢুকল। সে এগিয়ে এল, আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল : 'তোমাদের সকলকে নমস্কার জানাই।'

'প্রত্যাভিবাদন এবং তোমাকে স্বাগত জানাই, তুমি একটি আসন গ্রহণ কর। তুমি কি বসবে না?' ঠাকুরমা বলল।

সকলেই অতিশয় ব্যস্ত হয়ে উঠল। পিসি কিরাঞ্চোকে একটা টুল এগিয়ে দিল, মা তার কাছ থেকে টুপিটা নিতে গেল এবং সেটা দরজার পিছনে ঝুলিয়ে রাখল। বেড়ালটা আবার বসতে গিয়ে খুশির হল। কুটুমরা নিশ্চয়ই এক্ষুণি এসে পড়বে। তারা যে আসছে এ কথা জানাবার জন্যই তারা আগে কিরাঞ্চোকে পাঠিয়েছে। ঠাকুরমার মুখ থেকে মেঘ সরে গেল। তিনি কিরাঞ্চোর বৌ ছেলেমেয়ে কেমন আছে এই সব কথায় মুখর হয়ে উঠলেন। সে টুলের উপর বসল, মুখ দিয়ে জোরে নিঃশ্বাস ফেলল, তার পশমের টুপিটা মাথার পিছন দিকে সরিয়ে দিল। তার পাশেই বসেছিলেন ঠাকুরমা।

'আবহাওয়াটা কেমন?' ঠাকুরদা জিগ্যেস করলেন।

'আবহাওয়া তো ভালোই কিন্তু···গণ্ডগোল যে এখানে।'———

কিরাঞ্জো তার বুকপকেটে হাত ঢুকিয়ে বলের মতো পাকানো একটা শাদা রুমাল বার করল। এটা হচ্ছে সেই রুমাল যেটা পিসি মিত্রিকে চিহ্ন স্বরূপ দিয়েছিল।

'আইভানদাদু, ওরা এই চিহ্ন ফেরত পাঠিয়েছে।' সে বলল—'ওদিকের এক গাঁয়ের এক বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়েছে, সুতরাং বুঝতেই পারছ…'

ঘরটার ভিতর সবকিছুই নিঃশব্দ হয়ে গেল। পিসির চোখ ফেটে জল বেরুল।

অনুবাদ : চিত্ত ঘোষ

(*) Antie gets engaged by Petrov

নুগ্রহ নটস্নুশান্ত

একটি শিশুর জন্যে

নুগ্রহ নটস্নুশান্ত : জন্ম ১৫ই জুন ১৯৩১। জন্মস্থান, মধ্যজাভা, ইন্দোনেশিয়া। বর্তমানে জাকার্তার ইন্দোনেশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য ফ্যাকাল্টির অধ্যাপক। 'একটি শিশুর জন্যে' নেওয়া হয়েছে তাঁর গল্পগ্রন্থ 'অকালবর্ষণ' থেকে। মূল থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন শ্রীসুবার্ত, এম. এস-সি।

আকাশ আলকাতরার মতো কালো। আকাশভরা আগুনের ফুলকি ও আগ্নেয় রেখা। সমুদ্রের গর্জন ও বাতাসের গোঙানি ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে একটানা বিস্ফোরণের শব্দ।

পাহাড়ের চূড়োয় পৌঁছে এবার আমার নামার পালা। শরীরটাকে মাটির সঙ্গে আরো মিশিয়ে আমি নামতে লাগলাম। পাহাড়টা ছোট আর নিচু। চারদিক থেকে বোমা আর কামানের এই অগ্নিবৃষ্টি না থাকলে পর্যবেক্ষণের কাজটা আমার পক্ষে তেমন দুরূহ হত না। একেই অন্ধকার রাত্রি, তার উপরে আমার সামনে দৃষ্টি আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে একসারি আগুনে ঝল্‌সানো ক্যাসাভা ও ভুট্টা গাছ। কী ভালোই না লাগত এখন যদি ভাজা ক্যাসাভা বা ভাপে-সেদ্ধ ভুট্টা খেতে পারতাম! দূর হোক গে। আমি চোখ ঘষতে লাগলাম, চোখের ভিতরে নরম আর ধারালো কি যেন পড়েছে।

প্রায় হামাগুড়ি দেবার মতো করে নিচে নামছি, কেননা রণক্ষেত্রের দিক থেকে যেসব "সীসের ঝাঁক" আসছে তা আমি এড়িয়ে চলতে চাই। ডাচরা আগেই ঢুকে পড়তে পেরেছিল, ফলে আমাদের ডান বাহুর অবস্থা একটু কঠিন। তবে আমাদের বাম বাহু আপাতত শান্ত। কিন্তু এই পাহাড়ের উপরকার অবস্থা যদি জানা না যায় আর শত্রু যদি আক্রমণ করে তাহলে আমাদের বাম বাহুরও অচিরেই বিশৃঙ্খল অবস্থায় পড়বার সম্ভাবনা।

দুম্ করে একটা আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে আমি হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়লাম। বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ শুনতে পাচ্ছি। পনেরো বার শুনলাম, তারপরে মুখ তুলে তাকালাম। ও হরি, আমার সামনে মিটার দশেক দূরে ছোট একটা নারকেল গাছ। হতভাগা গাছটা আর ঠাঁই পেল না। তবুও ভালো যে কামানের গোলা নয়, নারকেল গাছ! গাছটাকে আমি ক্ষমা করতে পারলাম, যদিও এই গাছটার জন্যেই আমাকে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়তে হয়েছিল।

এমনি সময়ে সীসের ঝাঁক উড়ে আসতে লাগল, আরো অনেক বেশি সংখ্যায়, আরো অনেক দ্রুত। অভ্যাসবশতই আমি স্টেনগানটাকে প্রস্তুত করে রাখলাম। সামনে আকাশের পটভূমিতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে একটা বাঁশের ঝুঁড়ে। কখনো অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে, কখনো কামানের গোলার বিস্ফোরণে আলোকিত হয়ে উঠছে। কার্তুজের ক্লিপটা আমি হাতের তালু দিয়ে ঠিক অবস্থায় আনতে চেষ্টা করলাম, যদিও আমি জানতাম যে ওটা পুরোপুরি ঠিক অবস্থাতেই আছে। আমি দরদর করে ঘামছি। আমার হাত এমনভাবে কাঁপছে যে হাতটাকে আমি বশে আনতে পারছি না। আর প্রতিবারেই যেমন হয়, একটা ভয় কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করতে হচ্ছে আমাকে, ভয় কাটিয়ে উঠতে গিয়ে তেমনি একটা বৈকল্য। আমি জানি, আমার এই ভয়কে জয় করতে পারলেই গুলি-ছোঁড়ার খেলায় আমার অর্ধেক জিৎ হয়ে গেল।

পিঠের উপরে একটু বেয়াড়াভাবে আমার থলেটা ঝুলছে। থলের মধ্যে হাত পুরে আমি গুণতে লাগলাম বাড়তি ক্লিপ কটা আছে। এক, দুই, তিন—তিনটি। তাহলে সব মিলিয়ে দাঁড়াল চারটি। এক-একটিতে পনেরো রাউণ্ড। তাহলে সব মিলিয়ে ষাট রাউণ্ড। সংখ্যার দিক থেকে খুব বেশি নয়। আচ্ছা, সব ক'টা ক্লিপ লাগিয়ে রাখি না কেন? স্প্রিং ঢিলে থাকাই ভাল (অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের তাই মত), তাতে প্রাণ হারাবার আশঙ্কাটা কমে। আমার সর্বাঙ্গ ঘামে সপসপ করছে, যেন স্নান করবার পরে গা মোছা হয় নি। বন্দুকের গায়ে আমি আরেকবার হাত বুলিয়ে নিলাম, মনের ভাবখানা এই যে বন্দুকটা আমাকে আশ্বস্ত করুক। নিচু গলায় কাকুতি-মিনতি করলাম, 'দেখো, যেন ঠেকে যেও না!' গুলি-ছোড়ার নিয়ন্ত্রণ চাবিটাকে প্রথমে রাখলাম 'একে একে' অবস্থায়—যাতে বেহিসেবী গুলি-খরচ না হয়। কিন্তু তিন সেকেণ্ড না কাটতেই চাবিটাকে ঘুরিয়ে দিলাম 'ঝাঁকে ঝাঁকে' অবস্থায়—যাতে নিরাপদ

বোধ করতে পারি। বুকের মধ্যে চিপচিপ করছে, আওয়াজ শুনে মনে হয় বুকটা ধাতুতে তৈরী। বুক ভরে একটা নিশ্বাস নিলাম। নিজের উপরেই নিজের রাগ হতে লাগল। হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে এগিয়ে চললাম।

'এখানে একটা যুদ্ধ চলছে—তবুও যে কেন বাতি নিবিয়ে রাখে না।' ভাবতে ভাবতে প্রথমে আমার-রাগ হল, তারপরে করুণা। কুঁড়েটা গরীবের, দেখেই বোঝা যাচ্ছে। পৃথক রান্নাঘর নেই, বাঁশের তৈরী একটিমাত্র কুঠরি। জমির হিসেব যদি নেওয়া হয় তো পাক সিমিন[1] গরীব নয়; ম্‌বোক সিমিন[2]-এর বয়স কম, দেখতেও মন্দ নয়, সৈন্যদের মধ্যে থেকেও সতীত্ব বজায় রেখেছিল—সে এখন বাচ্চাকে নিয়ে চলে গিয়েছে অনেক দূরে।

আহা, এখন যদি শরীরটা গরম রাখার কোনো ব্যবস্থা থাকত। ঠাণ্ডা হাওয়ায় আমি কাঁপছি। বুলেট যাচ্ছে কেটে কেটে, তবে আগের চেয়ে আরো কম সংখ্যায়। কুঁড়েটার দিকে আমার যাবার ইচ্ছে, শরীরটাকে আধাআধি খাড়া করে উঠে দাঁড়ালাম। হাতের মুঠোয় স্টেনগানটা ঠাণ্ডা আর ভিজে-ভিজে লাগছে। ঠিক এমনি সময়ে একটা দৃশ্য চোখে পড়ল। ইলেকট্রিক শক্ খাওয়ার মতো আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। কুঁড়েটার বিপরীত দিকে একটা ছায়া যেন নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। হাতের বন্দুকের মুখটা সঙ্গে সঙ্গে একটুখানি উঠে এল। দূরে কামানের গোলা ফাটছে। শোনা যাচ্ছে রাইফেলের আওয়াজ।

আমি তেমনি দাঁড়িয়ে। বুকটা চিপচিপ করছে। আর কোনো আওয়াজ নেই। একটি পা বাড়ালাম, তারপরে আরেকটি পা। আমার পা টলছে, পা টলছে।

টলটলে পা। আচমকা রাত্রির নিস্তব্ধতা চিরে শোনা গেল একটি শিশুর কান্না। আমার খানিকটা আত্মবিস্মৃতি ঘটল। ছুটে গিয়ে সামনে দাঁড়ালাম। একটি স্ত্রীলোকের গোঙানি কানে এল। ম্‌বোক সিমিন। নিশ্চয়ই প্রসব হয়েছে। আমার মনে পড়ল আমার ছোটভাইয়ের জন্মের সময়ে মায়ের কথা। ক্যাসাভার ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে ছুটে এসে আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম খিড়কির দরজার সামনে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগলাম। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আমাকে সতর্ক করেছে, তাই অপরিণামদর্শীর মতো আমি আরো সামনে ছুটে যাই নি। সামনেই সদর দরজা। আরো সামনে খানিকটা খোলা জায়গা।

১। মধ্য জাভার গ্রামাঞ্চলে দম্পতির চলতি নাম। স্বামীকে বলা হয় 'পাক'।
২। স্ত্রীকে বলা হয় 'ম্‌বোক'।

তারপরেই শত্রুর ঘাঁটি। শিশুর কান্না শুনতে পাচ্ছি। শিশুর কান্নার ফাঁকে ফাঁকে আমার মায়ের কণ্ঠস্বর। অস্থির হাতটা দিয়ে দরজাটা আঁকড়ে ধরেছিলাম। হাতটা নামিয়ে নিলাম। এবারে আমার হাতের বন্দুকটা তৈরী, বন্দুকের নলটা সিধে। ছিটেবেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু মনের মধ্যে আশঙ্কাটা থেকে গিয়েছিল। চারদিকেও চোখ রাখছিলাম। হঠাৎ দক্ষিণ দিকটায় আমার চোখ পড়ে গেল। এই দক্ষিণ দিকটা হচ্ছে আমি যে-দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছি তার বাঁ দিকে। ওদিকটায় বেশ আলো, কারণ ওখানে একটা বাতি জ্বলছে। ঠিক এমনি সময়ে আরো কাছে থেকে কামানের গোলা ফাটার শব্দ হতে লাগল। পাহাড়ের ওদিক থেকে আরো ঘন ঘন বুলেটের শিস শোনা যাচ্ছে। আমি অভ্যাসবশতই মাঝে মাঝে মাথা নিচু করছি। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে পাক সিমিন বাড়িতে নেই। সম্ভবত সে গিয়েছে ধাই ডাকতে, বা সাহায্য করতে পারে এমন কাউকে। প্রসূতি ও শিশুকে অবিলম্বে অন্যত্র সরানো দরকার।

যা করতে হয়, এক্ষুনি। সময় নেই। খুব কাছেই একটা বুলেট বিঁধল। তখন মন স্থির করে নিয়ে আমি দরজাটা খুলে ফেললাম। আমার চোখে পড়ল সামনের দরজায় নীল পোশাক আঁটা সাদা একটা অবয়ব, চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। একটা পাথরের মতো আমি মাটিতে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে গুলি চলতে লাগল, তার দিক থেকেও, আমার দিক থেকেও। দুই দরজার মাঝখানের বাতাস খানখান হয়ে গেল। আমি তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এলাম, বাতি থেকে যতোটা সম্ভব দূরে। বাতির আলোটা এখন গিয়ে পড়েছে বাইরের দিকে। পিছু হটতে হটতে আমি হোঁচট খাচ্ছি, তবুও পিছু হটছি। বারুদের ধোঁয়া আমাকে গ্রাস করেছে। শুনতে পাচ্ছি শিশুর কান্না। বিশ্রী লাগছে।

পলকের মধ্যে ডাইনে-বাঁয়ে চোখ বুলিয়ে নিলাম। ঈশ্বরের দয়াই বলতে হবে, আমার চোখ গিয়ে পড়ল ক্যাসাভা ক্ষেতের ধারে পড়ে থাকা চাল কুটবার একটা কাঠের মুগুরের উপরে। ঘামে আমার চোখের দৃষ্টি আবছা হয়ে যাচ্ছিল। মুগুরটার পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ঘাম মুছলাম। তারপর চোখ রাখলাম কুঁড়েঘরের ওপাশটায়, মাঝে মাঝে এদিকে ওদিকে। কেননা এমনও তো হতে পারে যে ডাচ্ ম্যানটা একপাশ থেকে এসে আমাকে আক্রমণ করে বসবে। কথাটা ভাবতেই আমি একটু নড়েচড়ে বসলাম। আমি তো পেছন দিক থেকে গিয়ে ওকে আক্রমণ করতে পারি? কেন নয়? কিন্তু কথাটা

ভেবেও আমি আবার কাঠের মুগুরটার আড়ালেই আশ্রয় নিলাম। কুঁড়েঘরের মধ্যে একটি শিশু রয়েছে। শিশুটির কথা ভেবেই আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হল যে এখানে অপেক্ষা করাটাই ভালো। এখানে একটা আড়াল আছে—নিরাপত্তার কথাই প্রথমে ভাবা দরকার। তাছাড়া আমার গুলির নিশানা অনির্দিষ্ট নয়, একটু এদিক-ওদিক হয়ে গেলে গুলি গিয়ে মা বা শিশুর গায়ে লাগবে এমন সম্ভাবনা কম। কিন্তু ডাচম্যানটার মতলব কি? কোথায় ঘাঁটি নিয়েছে? সঙ্গে সঙ্গে, আমার মনের এই প্রশ্নের জবাব দেবার জন্তেই যেন, ডাচম্যানটা ওপাশ থেকে জানানি দিল। লোকটা এখনো ওখানেই। আমি গুলির জবাব দিলাম গুলি দিয়ে। তবে আমার যদি শুনতে ভুল না হয়ে থাকে ডাচম্যানের গুলির আওয়াজ টমসনের। বাচ্চাটা তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। বাতাসে শুধু বারুদের গন্ধ। কাঁপা-কাঁপা উঁচু গলায় মূবোক সিমিন ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে, খুব শীত করলে মানুষের গলার স্বর যেমন হয়।

আমি তাকিয়ে রইলাম কুঁড়েঘরের বেড়ার গায়ে একটা আয়তাকার কালো ছোপের দিকে। এই ছোপটার পেছনেই নড়াচড়া করছে একটি ভুতুড়ে ছায়ামূর্তি, যার লক্ষ্য আমি। তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার চোখ টনটন করতে লাগল।

ছেলেবেলায় আমরা লুকোচুরি খেলতাম। সেই স্মৃতি মাঝে মাঝে আমার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। অনুভূতিটা একই ধরনের, তফাৎ শুধু মাত্রার। বাচ্চাটা সমানে কেঁদে চলেছে, অবস্থাটা যে কি রকম ঘোরালো তা নিয়ে ওর কোনো দুশ্চিন্তা নেই। কী দরকার ছিল ওর ঠিক এই সময়টিতে জীবন শুরু করার, যখন দুজন সৈনিক পরস্পরকে খুন করবে বলে বেরিয়েছে? আমার গায়ের গরম ঘাম ঠাণ্ডা হয়ে গেল। উত্তেজিত ভাবে, ক্ষিপ্র হাতে, আমি বন্দুকের কার্তুজ-ক্লিপটা বদলে নিলাম। চাবিটাকে ঘুরিয়ে দিলাম 'একে একে'-র দিকে, তারপরে এক রাউণ্ড গুলি ছুঁড়লাম। আমি চাইছিলাম আমার গুলির জবাবে ডাচম্যানটাও গুলি ছুঁড়ুক। হলও তাই। গুলির জবাবে গুলি ছুটল, গুণে গুণে তো বটেই, সুদ বাবদও কয়েকটা। গুলি-ছোড়াছুড়ি এমনি চলতে থাকলে আমার গুলির পুঁজি অচিরেই নিঃশেষ হবে। তাহলে আমাদের অস্ত্রাগারের কর্তা যা রাগাটাই রাগবেন, তাঁর আর কোনো কাণ্ডজ্ঞান থাকবে না। দৃশ্যটা ভেবে আমার হাসি পেল। আচ্ছা, আমি যদি মরেই যাই তাহলে তো তাঁর এই রাগের কোনো

অর্থ ই থাকে না। আমার গুলির পুঁজি শেষ হয়েছে আর আমি মরে কাঠ হয়ে গেছি—তাহলে ঘটনাটা দাঁড়িয়ে যায় একেবারেই অন্যরকম। সেক্ষেত্রে এ-ধরনের একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হতে পারে: 'শেষ বুলেট পর্যন্ত আত্মরক্ষা করার পরে…'

'এই মরেছে!'

আরেকটু হলে ডাচম্যানটা আমার মাথা গুঁড়ো করে দিয়েছিল আর কি! কানের পাশেই এত আওয়াজ! কানদুটো কটকট করছে। লোকটার কাণ্ডকারখানা দেখে বোঝা যাচ্ছে একেবারে খাঁটি ডাচম্যান, হিসেব করে বুলেট খরচ করতে জানে না। আমার হাতের বন্দুকটা কাঁপতে লাগল, তারপরে হাত থেকে খসে পড়ল। মুহূর্তের জন্যে আমার কেমন একটা বিহ্বল অবস্থা। তারপরে কতকগুলো চিন্তা মাথার মধ্যে তালগোল পাকাতে লাগল। বুলেটটা আরেকটু নিচে দিয়ে গেলেই হয়েছিল আর কি! মাথাটা আর আস্ত থাকত না। সারা শরীরে দুর্বলতা বোধ করতে লাগলাম।

তুমি না পুরুষ মানুষ! তুমি না পুরুষ মানুষ! তুমি তো মুরগির ছানা নও! চাপা স্বরে ধমক দিয়ে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করলাম। তবুও আমার শরীরটা কাঁপছে। আমি কোনো কিছু স্পষ্টভাবে চিন্তা করতে পারছি না। বড়ো বেশি কুইনাইন খেলে যা হয়, আমার অবস্থাটাও তাই। ঘুম পাচ্ছে; ঠিক ঘুম নয়, তন্দ্রা। আর হঠাৎ আমার মনে হতে লাগল, আমি যদি বাড়ি ফিরতে পারতাম! আমার বাড়ি! যেখানে বুলেট নেই, যেখানে নেই ওঁৎ-পেতে-থাকা ডাচম্যান। প্রাণপণে চেষ্টা করলাম মনের এই চিন্তাটাকে দূর করতে। মনের এই চিন্তাটাকে ভুলতে। ঈশ্বর জানেন, কত মানুষকে আমি ঠকিয়েছি, এমনকি অনেক চালাকচতুর মানুষকেও। কিন্তু নিজেকে ঠকাই কি করে? মৃগুবটার পাশে মাটিতে মুখ দিয়ে আমি পড়ে রইলাম। মাটিতে মুখ দিয়ে আমি পড়ে রইলাম। তখন শরীরটা সুস্থ বোধ হতে লাগল। বেশ তো, হলামই বা একটা মুরগির ছানা, ক্ষতি কি!

কামানের গোলা এবার যেন আরো এগিয়ে এসেছে। পাহাড়টাকে গ্রাস করতে চায়, তিনজন মানুষ সমেত এই পাহাড়টাকে। তিনজনই বা কেন! চারজন। আমারই ভুল, চারজন। শিশুটিকেও হিসেবের মধ্যে ধরতে হবে

বৈকি। আর স্বীকার করতেই হবে, এই শিশুটির গলার স্বরই সবচেয়ে উচ্চগ্রামে। কিন্তু আর দেরি নয়, শিশুটিকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেওয়া দরকার। যে-কোনো মুহূর্তে এই এলাকায় সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে! শিশুটির কান্না শুনে আমি বিচলিত বোধ করছি। বাড়িতে আমারও একটি ভাই আছে যে এখনো শিশু। কিন্তু সে আছে মায়ের কোলে, নিরাপদে। কিন্তু এখানে এই শিশুটির মা পর্যন্ত নিরাপদ নয়। ওদের দুজনকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়াটা আমার কর্তব্য। কিন্তু আমি কী করতে পারি, আমি তো নিজেও নিরাপদ নই। সবচেয়ে সহজ ব্যবস্থা একটা অবশ্যই আছে: একছুটে পালিয়ে যাওয়া ও পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট করা। কিন্তু, রণকৌশলের দিক থেকে এই পাহাড়টার গুরুত্ব আছে। এই পাহাড়টা হবে শত্রুর কাছে একটা ফাঁদ। মবোক সিমিন ও তার শিশুর ভাগ্য তো অনিশ্চিত। ভাচরা যদি···

কোথাও কিছু নেই, কুঁড়েঘরের মধ্যে সাদামতো কী যেন একটা পড়ল। একটা সাদা রুমাল। রুমালের ভাঁজ থেকে একটা নুড়ি গড়িয়ে পড়ল। শয়তানি! আমাকে ধোঁকা দিতে চাইছে! এ-ছাড়া অন্য কোনো চিন্তা আমার মনে এল না।

তবুও মনে মনে রুমালটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। সাদা, ধবধবে সাদা। কথাগুলো বিড়বিড় করে উচ্চারণ করতেই ডাচম্যানটার কথা মনে পড়ল। কী মতলব ওর? সাদা কাপড়ের অর্থ সাধারণত আত্মসমর্পণ, কিংবা অন্ততপক্ষে অস্ত্র-সংবরণ। ও কি আমার কাছে আত্মসমর্পণ করতে চায়? দূর, তা কেন হবে, এটা নিতান্তই আমার মনগড়া চিন্তা! আমরা কেউ-ই কাউকে কোণঠাসা করতে পারি নি। তাহলে ধরে নিতে হয় অস্ত্র-সংবরণ। কিন্তু তাই বা কেন হবে?

জবাব পাওয়া গেল শিশুটির চিৎকারে। ডাচম্যানটাও শিশুটির স্থানান্তর চাইছে। তার আগে আমার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া। কিন্তু আমার কাছে কী চায় ও? ওর চোখে আমার দাম কতটুকু? অবশ্যই আমি ওর শত্রু, আমি ওর নিরাপত্তার বিঘ্ন। তাহলে তো ও অনায়াসে পালিয়ে যেতে পারে! কিন্তু তা তো যাচ্ছে না। তাহলে আমি আর ও একই কথা ভাবছি।

কেমন মানুষ ওই ডাচম্যানটা? আমি গম্ভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলাম, যেন বীজগণিতের আঁক কষছি। ওর চোখে আমি তো একটা

দস্যু, একটা বর্বর, জানোয়ারসদৃশ একটা জীব! আমাদের সম্পর্কে এসব কথাই তো লেখা হয় ওদের পত্র-পত্রিকায়, যা আমরাও পড়ি। "ওই কীটগুলোকে বাঁচতে দিও না—যত পারো মারো!" কাজেই ধরে নেওয়া চলে যে পারলে আমাকেও ও খুন করত, নিষ্ঠুরভাবে খুন করত। সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো ছবি আমার মনে পড়ে গেল! ওদের হাতে আমাদের বন্ধুরা কি-রকম ব্যবহার পেয়েছে তারই ছবি! কারও শরীরে বিশেষ বিশেষ অঙ্গ নেই, কারও মাথার খুলি রাইফেলের বাঁট দিয়ে বা শক্ত কোনো জিনিস দিয়ে ঠুকে ঠুকে গুঁড়ো করা হয়েছে। আমি কেঁপে উঠলাম। কি করি এখন? দ্বিতীয় কোনো মানুষ আমার পাশে নেই যার পরামর্শ নিতে পারি। ঈশ্বর আমাকে এমন অবস্থাতেই ফেলেছেন যে একা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ঈশ্বর পরীক্ষা করে দেখছেন, আমি সত্যিই ঈশ্বরের জীব কিনা। আমি যদি সঠিক বিচারশক্তির পরিচয় দিতে পারি তাহলে পুণ্যের ঘরে আমার কিছু সঞ্চয় হবে। আর যদি না পারি…! ডাচম্যানটা কি ভাবছে?

ওর সম্পর্কে আমারই বা কী ধারণা? লোকটা কেমন? সাতই ডিসেম্বর বাহিনীর[৩] যারা সৈন্য, তারা কারা? শোনা যায় তারা নাকি অ-পেশাদার। আমার মতো, তারাও নাকি দু-তিন বছর আগে ছিল অ-সামরিক। আর রণক্ষেত্রে আমি যতোটুকু দেখেছি, ওদের মধ্যে অনেকেরই বয়স খুব কম, আমার চেয়ে সামান্য কয়েক বছরের বড়ো হয়তো। আরো দেখেছি, রণক্ষেত্রে ওরা সহজেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, যা করে না রয়েল নেদারল্যাণ্ডস বাহিনীর সৈন্যরা, নিকা কুকুরা ও লাল হাতিরা[৪]। এমনও হতে পারে, আমি যা ভাবছি, এই ডাচম্যানটাও তাই ভাবছে। সাহায্য করতেই ও চায়। কিন্তু আমাকে বাদ দিয়ে ওর পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়। আমি ওর পক্ষে আশঙ্কার কারণ। তবে আমি ওর সহায়ও হতে পারি। কিন্তু আমার এই অনুমান যদি ভুল হয়? মা ও শিশুকে সাহায্য করার আগে ও যদি আমাকে খুন করে? এমন হওয়াটা যে একেবারে অসম্ভব তা তো নয়। শেষকালে কিনা নিজের বোকামির জন্যে প্রাণ হারাব! একটা কেন, হাজারটা শিশুর জন্যেও এই বোকামি নয়! কিন্তু শিশুটির কথা ভেবে আবার আমার মন

৩। ইন্দোনেশীয়দের সশস্ত্র প্রতিরোধকে চূর্ণ করবার উদ্দেশ্যে নেদারল্যাণ্ডস থেকে প্রেরিত ডাচ সৈন্যবাহিনী।

৪। নিকা কুকুর ও লাল হাতি হচ্ছে রয়েল নেদারল্যাণ্ডস বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ইউনিট।

আবার নরম হয়ে গেল। এমনও তো হতে পারে, আমার মতো এই ডাচম্যানেরও ছোট ভাই আছে, কিংবা হয়তো নিজেরই ছেলেমেয়ে। নাও যদি থাকে, শিশুদের সম্পর্কে আমার যেমন মমতা, ওরও হয়তো তাই। এমনি নানা কথা ভেবে নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে ও আসলে সাহায্য করতে চায়। কিন্তু চাইলেই তো হবে না। একা ওর পক্ষে কিছুই সম্ভব নয়। একা আমার পক্ষেও নয়। কিছু করতে হলে ওকে আর আমাকে হাত মেলাতেই হবে। ওকে আর আমাকে! ওকে আর আমাকে! কথাগুলো আমি বারবার উচ্চারণ করলাম। ততোক্ষণে আমি পকেট হাতড়াতে শুরু করেছি। পকেটে রুমাল নেই, রয়েছে শুধু একটা ব্যাণ্ডেজ যেটা এককালে সাদা ছিল। কল্পনার চোখে দেখতে লাগলাম বিরাট বিশাল হিংস্র একটা ডাচ সৈন্য! কিন্তু কই, তবুও তো আমি কাঁপছি না? অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে বৃথাই নুড়ি খুঁজলাম। আর ঠিক এমনি সময়ে বিস্ফোরণের আওয়াজ, স্ত্রীলোকটির প্রার্থনা-উচ্চারণ ও শিশুর কান্না ছাপিয়ে শোনা গেল একটি সুউচ্চ গলা: 'গুলি বন্ধ!' এডিস্টোন বন্দুকের চাবি টিপলে যেমন আওয়াজ হয়, গলার স্বরটি তেমনি। হালকা অথচ চড়া।

আর এমনি ঘটনার যোগাযোগ, তক্ষুনি দুটো হাতবোমা এসে পড়ল কুঁড়েঘরটার সামনে। বিস্ফোরণের শব্দও শিশুটির কান্না থামাতে পারল না। মা কিন্তু চুপ। আমি তাড়াতাড়ি একটা বুলেট বার করলাম, তারপরে বুলেটটাকে ব্যাণ্ডেজের মধ্যে জড়িয়ে ছুঁড়ে দিলাম কুঁড়েঘরটার মধ্যে। বুলেট আর ব্যাণ্ডেজ গিয়ে পড়ল চৌকাঠ ডিঙিয়ে।

এবারে? ঘরের মেঝের উপরে দু-টুকরো ময়লা ন্যাকড়া পড়ে আছে। এই তো ঘটনা! খুব একটা বিশ্বাস তৈরি হবার মতো ঘটনা কি? আমার হৃৎপিণ্ডটা গলার কাছে উঠে এসে কাঁপতে লাগল।

'বন্দুক নামিয়ে নাও! গুলি বন্ধ করো!' লোকটি হাঁক দিচ্ছে।

'একসঙ্গে যাই চলো!' আমি প্রস্তাব করলাম। আমার নিজের গলার স্বর নিজের কানেই অচেনা ঠেকছে।

'গুলি করবে না তো?' লোকটির গলার স্বরে আমারই মতো ইতস্তত ভাব।

'গুলি বন্ধ!' আমি জবাব দিলাম। তারপরে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম।

লোকটির ছায়া নড়ছে দেখা গেল। ছায়াটা সরে গেল দেওয়ালের আড়ালে তখন আমি ভাবলাম: লোকটি নিশ্চয়ই দেওয়ালের পেছনে

দাঁড়িয়েছে। এখন যদি আমি বন্দুক তাক করি তো মুহূর্তে ওর দফা শেষ হয়ে যায়! আর আমি অর্জন করতে পারি একটা ডাচম্যানকে খতম করার গৌরব।

এসব কী ভাবছি আমি! নিজের উপরেই আমার ঘৃণা হল। মন স্থির করে নিয়ে আমি সামনের দিকে পা বাড়ালাম। কিন্তু দেওয়ালটার কাছাকাছি এসে আবার আমি নিচু হলাম। আবার আমার হৃদপিণ্ডটা গলার কাছে এসে কাঁপতে লাগল।

'একসঙ্গে যাবে তো?' লোকটির প্রশ্ন।

'চলো যাই!' আমার জবাব।

'চলো যাই!'

মনে মনে স্বপ্ন দেখছি। প্রথমে একটা টমসন বন্দুক, তারপরে সবুজ হাত, প্রথমে একটা, তারপরে দুটো। সামনে এগিয়ে এল, থামল। আমি কাঁপছি, আমার স্টেনগান উদ্যত। লোকটি এবার পুরোপুরি আমার সামনে। গুঁড়ি মেরে আছে, আমিও তাই, আমি আর ও মুখোমুখি।

দুজনেই উঠে দাঁড়াম। ও স্যালুট করল। জবাবে আমিও। ও এগিয়ে এল আমার দিকে। সবুজ, প্রকাণ্ড, লোমশ একটা মানুষ। ও হাসতে চেষ্টা করল, কিন্তু হাসিটা ঠিক ফুটছে না। ও আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। আমি তাকালাম ওর হাতের দিকে, ওর মুখের দিকে, তারপরে বাঁশের চৌকিতে শুয়ে থাকা মবোক সিমিন ও শিশুটির দিকে। তখন আমরা হাতে হাত দিলাম। আর ঠিক তখুনি একটা বিস্ফোরণে আমাদের কানে তালা ধরে গেল, খোলা দরজা দিয়ে এক দমক বাতাস ঢুকল ঘরের মধ্যে। আমরা নিচু হলাম। উবু হয়ে বসে আবার দুজনে দুজনের দিকে তাকালাম। ওর চোখের ভাষা আমি পড়তে পারছি। আমার কাছাকাছি আসবার জন্যে ওকেও আমারই মতো অনেক ভয় জয় করে আসতে হয়েছে।

আমি উঠে দাঁড়াম, ও-ও। বাঁশের চৌকিটা আমি আঙুল দিয়ে দেখালাম। ও সায় দিল। আমরা চৌকিটার কাছে এগিয়ে এলাম। মবোক সিমিন দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে আছে, শিশুটিকে আগলে। আর চাপা স্বরে গোঙাচ্ছে।

'মবোক সিমিন!' আমি ডাকলাম।

সঙ্গে সঙ্গে ও ফিরে তাকাল আর ওর চোখ গিয়ে পড়ল পায়ের কাছে দাঁড়ানো ডাচম্যানের দিকে। আর অমনি তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিল।

ভাচম্যান হাসতে চেষ্টা করছে, কিন্তু হাসিটা কিছুতেই ফুটছে না। আমার দিকে অসহায়ের মতো তাকাচ্ছে।

'মৃবোক সিমিন,' আমি আরো কাছে এগিয়ে এলাম যাতে আমাকে ও দেখতে পায়, তারপরে স্থানীয় ভাষায় বললাম, 'আমি আমাদের সেনাদলেরই সৈন্য।'

এবারে আর ওর মুখে আতঙ্ক নেই, তার বদলে বিস্ময়, বিহ্বলতা। ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে আমার দিকে আর আমার "বন্ধুর" দিকে। আবার একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। আবার আমরা মাটিতে। আমি যতটা না কাঁপছি তার চেয়ে অনেক বেশি কাঁপছে কুঁড়েঘরটা।

'যাওয়া যাক।' আমি বললাম।

ভাচম্যান সায় জানাল। মৃবোক সিমিনকে ও তুলল চৌকি থেকে। আমি তুললাম কাঁহ্নে বাচ্চাটাকে। বাচ্চাটার গায়ের গন্ধ মাছের মতো। আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম।

'আমাদের ঘাঁটিতে যাবো তো?' ভাচম্যান জিজ্ঞেস করল।

'না। না!' আমি শিউরে উঠলাম।

ও দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর বলল, 'তোমাদের ঘাঁটিতে যেতে আমার ভয় করছে।'

আমি বললাম, 'চলো, তাহলে কোনো প্রতিবেশীর কাছে নিয়ে যাই।'

খুশি হয়ে ও বলল, 'হ্যাঁ, তাই চলো।'

পথে কোনো বিরোধী দলের মুখোমুখি আমাদের পড়তে হল না। আমরা ক্রোমোর বাড়িতে পৌছলাম। গোড়ায় ক্রোমো ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আমি খুব সংক্ষেপে ঘটনাটা বললাম। কিন্তু ওর মুখ দেখেই বোঝা গেল যে আমার কথায় ও বিশ্বাস করে নি। বোধহয় ভাবছে যে আমি গুপ্তচর।

বিদায় নেবার আগে আমরা মুহূর্তের জন্যে থামলাম। তারপরে ভাবলাম। একটা বুলেট বার করে আমি ওকে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ও-ও আমাকে একটি দিল, এবারে আর অবশ্য সুদসমেত নয়।

ঘাঁটিতে ফিরে এসে আমি রিপোর্ট করলাম যে পাহাড়টি জনমানবশূন্য।

সেদিন সারারাত আমরা যুদ্ধ করলাম, যতক্ষণ না ভোর হল।

অনুবাদ : অমল দাশগুপ্ত

The Baby by Nugroho Notosusanta

ডেভিড ওয়য়োইয়েলে

আমার দোয়া

বিশ্ববিদ্যালয়ের য়ুরোপীয় শিক্ষাপদ্ধতির আওতায় শিক্ষিত নাইজিরিয়ান লেখক ডেভিড ওয়য়োইয়েলে গত দশ বছরে যে নতুন লেখকশ্রেণী লিখতে শুরু করেছেন, তাঁদেরই অন্যতম। এজেকিয়েল মফালীল এই গল্পটির উল্লেখ করে দক্ষিণ আফ্রিকার গল্পের থেকে পশ্চিম আফ্রিকার গল্পের মৌলিক পার্থক্য লক্ষ করতে বলেন।

এতক্ষণ পরিষ্কার চাঁদ ছিল। এখন রাতটা অন্ধকার। ডোগো রাতের আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখল। ও দেখল ছুটন্ত কালো মেঘগুলো চাঁদকে আড়াল করেছে। গলাটা পরিষ্কার করে সঙ্গীকে বলল, "আজ রাতে বিষ্টি হবে।" ওর সঙ্গী স্থলে তক্ষুনি জবাব দিল না। স্থলে বেশ লম্বা আর মজবুত গড়নের লোক। ও আর ওর সঙ্গী, দুজনেরই মুখ এক মূঢ় অজ্ঞানতার মুখোস যেন। ডোগোর মতো স্থলেরও জীবিকা চুরি। ঠিক এই সময়টাতে ও অনভ্যস্তভাবে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল। "ও-কথা বলার কোনো মানে হয় না," একটু পরে স্থলে বলল। ওর নিজের ভাষায় 'ডিউটি'র সময় সর্বদা যে লম্বা, বাঁকা খাপে ভরা ছুরিটা বাঁ হাতের উর্ধ্বাংশে লটকে রাখে, সেটা নাড়াচাড়া করতে করতে ও কথাটা বলল। ওর সঙ্গীর হাতেও শোভা পাচ্ছে একই ধরনের একটা নিষ্ঠুর চেহারার জিনিস। "কেমন করে জেনে ফেললি হবেই বিষ্টি ?"

"জেনে ফেললাম ?" ডোগো বলল, ওর গলার আওয়াজে বিরক্তি আর অসহিষ্ণুতা। ডোগো কথাটার স্থানীয় অর্থ—লম্বা। কিন্তু লোকটা লম্বা তো নয়ই, চওড়াপানা, বেঁটে আর মোটা। ছুটে-বেড়ানো মেঘগুলোর দিকে হাত

বাড়িয়ে বলল, "উপর দিকে তাকালেই জানা যায়। সারাজীবন ধরে অনেক বিষ্টি তো দেখলাম : ওগুলো বিষ্টির মেঘ।"

ওরা কিছুক্ষণ নিঃশব্দে হাঁটল। বড় শহরটার মিটমিটে লাল আলোগুলো ওদের পিছনে বাঁকা রেখায় জ্বলতে লাগল। বাইরে কোনো লোকজন নেই, আধরাত কখন পার হয়ে গেছে। ওদের গন্তব্যস্থল স্থানীয় শহরটা আধমাইল জুড়ে রাত্রিবেলায় ছড়িয়ে আছে। আঁকাবাঁকা রাস্তাগুলোয় একটাও বিজলী বাতি জ্বলছে না। এই অবাঞ্ছিত ব্যাপারটা এ দুজন লোকের হিসেবের সাথে একেবারে খাপ খেয়ে গেল। শেষ অবধি স্থলে বলল, "তুই তো আল্লা নস, অত জোরগলায় বলার তোর এক্তিয়ার নেই।"

স্থলে দাগী পাপী। দুষ্কৃতিই তার পেশা। এ কথা সে তার গতবার বিচারের সময় জজসাহেবকে বলেছিল। বিচারে তার অল্প কিছুদিনের জন্যে জেল হয়েছিল। "তোমার মতো অসৎপ্রকৃতি লোকের হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করা অবশ্যকর্তব্য"—নিস্তব্ধ আদালতে নির্মম জজসাহেবের গলার আওয়াজ ওর কানে এখনও বাজে। স্থলে কাঠগড়ায় সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল; লজ্জার লেশ নেই, কোনো ভাব-বৈকল্য নেই। ও-সব কথা সে আগেও শুনেছে। "তুমি আর তোমার মতো লোকেরা মানুষের জীবন ও সম্পত্তির শত্রু এবং এই আদালত সর্বদা সজাগ থেকে লক্ষ রাখবে যাতে তুমি আইন-অনুযায়ী সমুচিত শাস্তি লাভ কর।" জজসাহেব তারপরে বজ্রদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়েছিলেন, আর স্থলে খুব ঠাণ্ডা চোখে পাল্টা তাকিয়েছিল। ঐ ধরনের এতগুলি জজসাহেবের চোখের দিকে ও তাকিয়েছে যে, সহজে ভয় পাওয়া ওর পক্ষে কঠিন। তাছাড়া, একমাত্র আল্লা ছাড়া আর কিছুতে কাউকে ওর ভয় নেই। জজসাহেব তাঁর আইনজ্ঞ চিবুক তুলে ধরে বলেছিলেন, "তুমি কি কখনও একবার চিন্তা করে দেখ না যে, পাপের পথ শুধু নিরাশা, শাস্তি আর দুঃখকষ্টের মধ্যে ঠেলে দেয়? তোমার শরীর দেখলে মনে হয় যে-কোনো পরিশ্রম করতে পার। একবার কেন এ কাজের পরিবর্তে সৎভাবে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করে দেখ না?" স্থলে তার চওড়া কাঁধ একটু ঝাঁকিয়েছিল। বলেছিল, "আমি যেভাবে শুধু জানি, সে ভাবেই রোজগার করি। ঐ পথটাই আমি বেছে নিয়েছি।" জজসাহেব স্তম্ভিতভাবে পিছনে ঠেসান দিয়ে বসলেন, তারপর আর-একবার চেষ্টা করার জন্যে সামনের দিকে ঝুঁকলেন: "চুরি, বাটপাড়ি, দুষ্কর্মের মধ্যে অন্যায় দেখার ক্ষমতা কি তোমার

নেই ?" স্থলে আবার কাঁধ ঝাঁকিয়েছিল : "আমি যেভাবে রোজগার করি, তাতে বেশ তুষ্টি লাগে।" "তুষ্টি লাগে!" জজসাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন, আর আদালতে একটা ফিস্‌ফিসানির ঢেউ বয়ে গেল। জজসাহেব তাঁর হাতুড়ি ঠুকে আওয়াজ থামালেন। "আইন-ভঙ্গ করে তুমি সন্তোষলাভ কর ?" "আমার আর কোনও উপায় নেই," স্থলে বলল, "আইন বড় ভেজালে জিনিস; সব কাজে বাগড়া দেয়।" "সর্বদা গ্রেপ্তার ও কারাবাস—জেলের মধ্যে পচে তুমি কি সন্তোষলাভ কর ?" ভীষণ ভ্রূকুটির সাথে জজসাহেব শুধোলেন। "সব ব্যবসাতেই বিপদ আছে," স্থলে দার্শনিকের মতো উত্তর দিল। জজসাহেব মুখের ঘাম মুছলেন : "কিন্তু, বাপু, আইন তুমি ভাঙতে পার না। শুধু ভাঙার চেষ্টা করতে পার। শেষ পর্যন্ত শুধু নিজেই ভেঙে পড়বে।" স্থলে মাথা নাড়ল। আলাপের ভঙ্গিতে মন্তব্য করল, "আমাদেরও একটা অমনিধারা প্রবাদ আছে, 'গাছের গুঁড়িকে যে নাড়াতে চেষ্টা করে সে শুধু নিজেকেই নাড়া দেয়'।" কুঞ্চিত ভ্রূ-জজসাহেবের দিকে ও চোখ তুলে তাকায়। "আইনটা যেন মোটা গাছের গুঁড়ি—না ?" জজসাহেব ওকে তিনমাসের দণ্ড দিলেন। স্থলে আবার কাঁধ ঝাঁকিয়েছিল, "সবই আল্লার দোয়া..."

মেঘে ঢাকা আকাশটাকে এক সেকেণ্ডের জন্যে জ্বালিয়ে দিয়ে যায় তীব্র-গতি একটা বিদ্যুতের জিভ। "বিষ্টি তো হবেই মনে হচ্ছে। কিন্তু কেউ বলে না : বিষ্টি হবেই। তুই একটা তুচ্ছ মানুষ। তুই শুধু বলবি : আল্লার যদি মর্জি হয়, তবে বিষ্টি হবে," স্থলে মন্তব্য করে নিজের বুদ্ধিমতো। সে গম্ভীরভাবে ধার্মিক লোক। তার ধর্মে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে, বা কোনো কিছু সম্পর্কে বদ্ধমূল মতপ্রকাশ বা ভবিষ্যদ্বাণী করা মানা। তার আল্লার ভীতি একেবারে অকৃত্রিম। তার দৃঢ় বিশ্বাস যে আল্লা প্রত্যেক মানুষের জীবিকার প্রশ্নটার ভার তার নিজের হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন। তার নিশ্চিত ধারণা যে আল্লা কিছু লোককে তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত দেন, যাতে যাদের খুব কম আছে তারা ওদের থেকে খানিকটা ভাগ নিতে পারে। আল্লার নিশ্চয় মর্জি নয় যে কতকগুলো পেট অতিরিক্ত ঠাসা হোক, আর কতকগুলো পেট একেবারে খালি থাকুক।

ভোগো নাক দিয়ে একটা আওয়াজ করল। দেশের সব কয়টা বড় শহরে ও জেল খেটেছে। জেল ওর কাছে এক বাড়ি থেকে আর-এক

বাড়ি। ওর পাপকর্মের সঙ্গীর মতো ও-ও কোনো মানুষকে পরোয়া করে না, তবে তফাৎ এই যে আত্ম-পোষণ ছাড়া ওর আর কোনো ধর্ম নেই ওর সঙ্গীর মতো। "কী আমার ধার্মিক পুরুষ রে," ও বিদ্রূপ করে বলল, "মরে যাই!" সুলে জবাব দিল না। ভোগো অভিজ্ঞতা দিয়ে জানে, সুলে তার ধর্ম নিয়ে কথা সইতে পারে না। আর সুলের খাপ্পা হওয়ার প্রথম নিশানা হল ওর মাথায় একটা গাঁট্টা। এরা দুজন কখনও ভান করে না যে ওদের শরিকানার মধ্যে কোনও ভালোবাসা, বন্ধুত্ব বা অন্য কোনও সম্পর্কের বিলাসিতার স্থান আছে। জেলখাটার অবসরে ওরা একত্রে কাজে নামে শুধু সুবিধের জন্যে। যে-শরিকানাকে ওরা নিজের নিজের বিশেষ উপকারের জন্যে দরকার বলেই বিশ্বাস করে, সেখানে সৌখিন ব্যবহারবিধির বালাই থাকতে পারে না। "আজ রাত্তিরে মাগীর সঙ্গে দেখা হয়েছে?" ভোগো বিষয়টা বদলে ফেলে জিগ্যেস করে। সুলের বিরক্তির ভয়ে নয়, ওর ফড়িঙের মতো লাফ-খাওয়া মনটা চট করে অন্য জায়গায় চলে যায়। "আ-আঃ," সুলে আওয়াজ করে একটা। "বললি না?" সুলে আর কিছু না বলায় ভোগো জিগ্যেস করে। "বেজম্মা!" নিরাসক্ত গলায় সুলে বলে। মিহিগলায় ভোগো বলে, "কে? আমি?" "আমরা মাগীটার কথা বলছিলাম," সুলে জবাব দেয়।

ওরা একটা ছোট জলস্রোতের কাছে এসে পৌঁছয়। সুলে থামে, হাত-পা ধোয়, তাড়া মাথাটা ধোয়। ভোগো জলের পাড়ে উবু হয়ে বসে শীষ-ছোরাটা একটা পাথরের উপরে শানাতে থাকে। "কোথায় যাচ্ছি বল দেখি?" "ঐ সামনের গাঁয়ে," সুলে কুলকুচো করে বলে। "জানতাম না ওখানে তোর পরাণের বিবি আছে," ভোগো বলে। সুলে বলে, "আমি কোনো মাগীর ঘরে যাচ্ছি না। যাচ্ছি এই এটা-সেটা জোগাড় করতে—অবিশ্যি আল্লার মর্জি হয় যদি।"

"তার মানে চুরি করতে?" ভোগো জুগিয়ে দেয়।

"হ্যাঁ", সুলে স্বীকার করতে রাজি হয়। শরীরটা টান করে পেশীবহুল হাতটা ভোগোর দিকে বাড়িয়ে বলে: "তুই-ও তো চোর···তার উপরে বেজম্মা!"

ভোগো শান্তভাবে ছোরাটার ধার পরীক্ষা করতে করতে মাথা নাড়ে: "ওটাও কি তোর ধম্ম নাকি, মাঝরাত্তিরের নদীতে হাত-পা ধোয়া?" সুলে আর খানিকটা দূরে গিয়ে পাড়ে না ওঠা পর্যন্ত জবাব দেয় না।

"নদী পেলেই হাত মুখ ধুতে হয়; কারণ আল্লাও জানে না আর-একটা নদী কখন পাওয়া যাবে।" স্বলে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগোয়, ভোগো তার পিছনে চলে। "মাগীকে বেজন্মা বললি কেন?" ভোগো শুধোয়। "বেজন্মা তাই।" "কেন?" "মাগী আমায় বলে কি, ও নাকি কোট আর কালো ব্যাগটা মোটে পনেরো শিলিঙে বেচে দিয়েছে।" চোখ নামিয়ে আড়-চোখে ও সঙ্গীর দিকে তাকায়: "তুই বোধহয় আমি পৌছবার আগেই শিখিয়ে এসেছিলি কী বলতে হবে?" "আরে আমি হপ্তাখানেক ধরে মাগীকে চোখেই দেখি নি," ভোগো প্রতিবাদ করে। "কোটটা বেশ পুরনো। পনেরো শিলিং দাম তো খারাপ লাগছে না। ও তো ভালোই পেয়েছে মনে হচ্ছে।" "তাই তো," স্বলে বলে। ভোগোর কথা ও বিশ্বাস করল না। "লাভের বখরা যদি আগেই পেয়ে যেতাম, আমারও ঐ রকমই মনে হত⋯"

ভোগো কিছু বলল না। স্বলে ওকে সবসময় সন্দেহ করে, ভোগোও সৌজন্যে পিছ-পা নয়। ওদের পরস্পরের প্রতি সন্দেহ কখনও ভিত্তিহীন, কখনও উল্টো। ভোগো কাঁধটা বাঁকাল, "কী বকছিস বোঝা দায়।" "না, তা বুঝবে কেন," স্বলে নীরস গলায় বলে। "আমি শুধু নিজের বখরাটা বুঝি," ভোগো বলে যায়। "তোর দ্বিতীয়বারের বখরা, তাই না?" স্বলে বলে, "তোরা দুজনেই তোদের ভাগ পাবি—তুই বেঠিক বাপের কুচুকুরে ব্যাটা আর সেই কঙ্কাল শয়তানী মাগী।" একটু থেমে ও আবার বলে, "ও আমার উরোতে চাকু মেরেছে—হারামজাদী।" ভোগো নিজের মনেই আস্তে একটু হাসল, "তাই ভাবি তুই খোঁড়াচ্ছিস কেন! তোর উরোতে চাকু মেরেছে বুঝি? কী উদ্ভট্টি ব্যাপার, না?" "উদ্ভট্টি আবার কি দেখলি?" "শুধু টাকাটা চাওয়ার জন্যে তোকে চাকু মেরে দিল!" "চেয়েছি? খোড়াই। ঐ রকম চরিত্তিরের কাছে কিছু চাওয়াই বেফায়দা।" "তাই নাকি?" ভোগো বলল, "আমি তো সবসময় ভাবি তোর শুধু চাওয়ার অপেক্ষা। কোটটা অবিশ্যি তোর নয় সত্যি কথা। কিন্তু তুই তো ওকে বেচতে বলেছিলি। ও তো চোরাই মাল কেনা-বেচায় ঘাগী, ওর জানা উচিত টাকাটা তোরই পাওনা।" "কোট আর ব্যাগের জন্য পনেরো শিলিঙে একটা বুদ্ধু শুধু খুশি হয়।" স্বলে বলল। ভোগো হিহি করে হেসে বলল, "তুই তো বুদ্ধু নস, অ্যা? কি করলি তুই তারপরে?" "ধোলাই দিলাম এপিঠ ওপিঠ" খেঁকিয়ে উঠল স্বলে। "বেশ করেছিস," ভোগো মন্তব্য করল,

"তবে গণ্ডগোলটা এই যে যতটা দিয়েছিস তার চেয়ে ঢের বেশী পেয়েছিস মনে হচ্ছে।" ও আবার হঁ হঁ করে হাসল। "ঘায়ের দপদপানি ঠাট্টা নয়," স্থলে বিরক্ত হয়ে বলল। "ঠাট্টা করছে কে? আমার সময়ে আমিও চাকু খেয়েছি। তুমি বাপ রাত্তিরবেলা চাকু লটকিয়ে ঘুরবে, আর কেউ কখনও তোমায় আর চাকু মারবে না, এ তো হয় না! এ ধরনের ব্যাপারগুলোকে ব্যবসার বিপদ-আপদ মনে করলেই হয়!" "ঠিক বলেছিস," স্থলে ঘোঁৎ করে, "কিন্তু তা ভাবলেই তো আর ঘা সারে না!" "না, কিন্তু হাসপাতালে গেলে সারে," ভোগো বলল। "জানি। কিন্তু হাসপাতালে সারাবার আগে অনেক কথা জিগ্যেস করে।"

ওরা গাঁয়ে ঢুকলো। ওদের সামনের চওড়া রাস্তাটা অনেকগুলো ছোট ছোট পথে ভাগ হয়ে বাড়িগুলোর মাঝে মাঝে পাক খেয়ে খেয়ে চলেছে। স্থলে একটু থেমে ওরই একটা পথ ধরল। নিঃশব্দ পদে ওরা এদিক-ওদিক এগোতে লাগল। লোকভর্তি মাটির বাড়িগুলোর একটাতেও বাতি চোখে পড়ছে না। খুপরির মতো জানলাগুলোর প্রত্যেকটা এঁটে বন্ধ করা বোধহয় আসন্ন ঝড়ের ভয়ে। পুবদিক থেকে একটা অলস মেঘের গুরু গুরু ডাক গড়িয়ে এল। ওদের দেখে ভয় পেয়ে কতকগুলো ছাগল আর ভেড়া চমকে লাফিয়ে উঠল, এ ছাড়া গাঁয়ের পথে শুধু ওরা দুজন। কিছুক্ষণ পরে পরেই স্থলে একটা সম্ভবপর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ছে। দুজনে সাবধানে চারিধারে দেখছে; ও জিজ্ঞাসু চোখে সঙ্গীর দিকে তাকাচ্ছে, সে মাথা নাড়ছে, দুজন আবার রওনা দিচ্ছে।

প্রায় পনেরো মিনিট ধরে ঘুরে বেড়ানোর পর বিদ্যুতের একটা তীব্র আলো ঝলসে উঠে ওদের চোখের মণিগুলো যেন পুড়িয়ে দিয়ে গেল। তাইতে ওরা মনস্থির করে ফেলল। "এবার তাড়াতাড়ি করা ভালো," ভোগো ফিস্ ফিস্ করে বলল, "ঝড় এল বলে।" স্থলে কিছু বলল না। কয়েক গজ দূরেই একটা ভাঙাচোরা বাড়ি। সেদিকে ওরা এগিয়ে গেল। বাড়ির চেহারা দেখে ওরা পিছ-পা হল না। অভিজ্ঞতা থেকে ওরা শিখেছে, বাড়ির চেহারা দেখে বোঝা যায় না ভিতরে কী আছে। কত দুর্গন্ধ ঝুপড়ির মধ্যে দামী মাল জুটে গেছে। ভোগো স্থলের উদ্দেশে মাথা নাড়ল। "তুই বাইরে দাঁড়া আর জেগে থাকার চেষ্টা কর," স্থলে বলল। মাথা নেড়ে একটা বন্ধ জানলা দেখাল, "ওটার কাছে দাঁড়িয়ে থাক।"

ভোগো তার নির্দিষ্ট জায়গায় সরে গেল। স্থলে এবড়ো-খেবড়ো কাঠের দরজাটা নিয়ে পড়ল। এমন-কি ভোগোর অভ্যস্ত কানও কোনো গোলমেলে আওয়াজ ধরতে পারল না; ও যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে টেরও পেল না স্থলে কখন বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ল। ওর মনে হচ্ছিল যুগ যুগ ধরে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে—আসলে কয়েক মিনিটের ব্যাপার। এইবার ওর পাশের জানলাটা আস্তে খুলে গেল। ও দেয়ালের সাথে মিশে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু জানলা দিয়ে যে পেশীবহুল হাতদুটো বেরিয়ে এল তা স্থলের, একটা বড়সড় লাউয়ের খোল ওর দিকে সে বাড়িয়ে ধরল।

ভোগো লাউয়ের খোলটা ধরে তার ওজন দেখে অবাক হয়ে গেল। ওর হৃৎপিণ্ডটা দ্রুততালে চলতে লাগল। এদিককার লোকেরা লাউয়ের খোলকে ব্যাঙ্কের চেয়েও বেশী বিশ্বাস করে। খোলা জানলা দিয়ে স্থলে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "নদী।" ভোগো বুঝল। লাউয়ের খোলটাকে মাথায় চড়িয়ে ও দ্রুতপায়ে নদীর দিকে চলল। স্থলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ওর পিছনে আসবে।

লাউয়ের খোলটাকে সাবধানে নদীর পারে বসিয়ে খোদাই করা ঢাকনিটাকে ও খুলে ফেলল। এটার মধ্যে যদি কিছু দামী থাকে, ও ভাবল, স্থলে আর ওর সমান ভাগ নেওয়ার দরকার নেই। তাছাড়া কে জানে স্থলে এটাকে জানলা দিয়ে বার করে দেওয়ার আগে ভিতর থেকে কিছু জিনিস সরিয়েছে কিনা। ডান হাতটাকে ও খপ করে খোলের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়, আর পরমুহূর্তেই ওর মনে হয় কব্জিতে কে যেন সাংঘাতিক ভাবে ছুরি বসাল। এক ঝাঁকানিতে হাতটা বার করে আনার সময় ওর গলা দিয়ে একটা তীব্র আর্তধ্বনি বেরিয়ে আসে। কব্জিটাকে চোখের কাছে এনে ভালো করে দেখে, তারপরে ধীরে একটানা শাপশাপান্ত শুরু করে। ওর জানা দুটো ভাষায় দুনিয়ার সমস্ত কিছুকে ও নরকস্থ করে। কব্জিটা ধরে নিচু গলায় শাপগাল দিতে দিতে ও মাটিতে বসে পড়ল। স্থলের আসার আওয়াজে ও থেমে গেল। লাউয়ের খোলার ঢাকনিটা লাগিয়ে ও অপেক্ষা করতে লাগল। স্থলে কাছে এসে জিগ্যেস করল, "কিছু গোলমাল হল?" "কিছু না," স্থলে বলল। দুজনে মিলে ঝুঁকে পড়ল লাউয়ের খোলটার উপর। ভোগোকে বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতটা ধরে থাকতে হচ্ছিল, কিন্তু এমন ভাবে ধরে রইল, যাতে স্থলে লক্ষ না করে। "খুলেছিস নাকি?" স্থলে

জিগ্যেস করল। "কে? আমি? না তো।" ভোগো বলল। স্থলে ওর কথা বিশ্বাস করল না, ও জানত সে কথা। "এত ভারি কী হতে পারে?" কৌতূহলী ভোগো প্রশ্ন করল। "দেখা যাক।" স্থলে বলল।

ও ঢাকনিটা খুলে খোলটার খোলা মুখে হাত পুরে দিল, আর মনে হল কব্জিতে একটা তীক্ষ্ণ ছুরির আঘাত। সাঁ করে ও হাতটা বের করে আনে। ভোগোও সোজা হয়ে দাঁড়ায়, আর এই প্রথম স্থলে লক্ষ করে ভোগো আর-এক হাত দিয়ে কব্জিটা ধরে আছে। পরস্পরের দিকে অগ্নিদৃষ্টি ফেলে ওরা অনেকক্ষণ নীরবে চেয়ে থাকে। "তুই তো সব সময় জোর করতিস, সব জিনিসে আমাদের আধা-আধি বখরা," ভোগো খুব সাধারণভাবে বলে। খুব শান্তভাবে, প্রায় শোনা যায় না এমন গলায় স্থলে কথা বলতে শুরু করে। অশ্লীল ভাষায় যত গালাগাল আছে ভোগোকে তাই দিয়ে সম্বোধন করে। ভোগোও সমান তালে চালায়। গালাগাল ফুরিয়ে গেলে তবে ওরা থামে। "আমি বাড়ি যাচ্ছি।" ভোগো ঘোষণা করে। "দাঁড়া" স্থলে বলে। ওর অক্ষত হাতটা দিয়ে পকেট তন্ন তন্ন করে খুঁজে একটা দেশলাইয়ের বাক্স বার করে। অনেক কষ্টে একটা কাঠি জ্বালিয়ে খোলটার উপরে ধরে, উঁকি মারে। ছুঁড়ে ফেলে দেয় কাঠিটা। "দরকার হবে না," ও বলে। "কেন হবে না?" ভোগো জানতে চায়। "তার কারণ ওর মধ্যে একটা ক্রোস-কেউটে," স্থলে বলে। একটা অসাড় অনুভূতি ওর হাত বেয়ে উপর দিকে ধেয়ে চলেছে। প্রচণ্ড ব্যথা। ও বসে পড়ে। "আমি এখনও বুঝতে পারছি না কেন যেতে পারব না," ভোগো বলে। "তুই কি কখনও এ প্রবাদ শুনিস নি, কেউটে যাকে কামড়ায় সে কেউটের পায়ের তলায় মরে? বিষটা এতই চড়া: তোর মতো শুয়োরের বাচ্চাদেরই উপযুক্ত। বাড়ি পৌঁছনো তোর হবে না। তার চেয়ে এখানে বসেই মর।" ভোগো মানতে রাজি হয় না, কিন্তু যন্ত্রণার চোটে বাধ্য হয় বসে পড়তে।

কয়েক মিনিট ওরা চুপ করে থাকে আর বিদ্যুৎ খেলা করে বেড়ায় ওদের ঘিরে। শেষ পর্যন্ত ভোগো বলে, "বেশ মজা কিন্তু, তোর শেষ মালটা হল একটা সাপুড়ের ঝুড়ি।" "আরও মজা যে তার মধ্যে আছে কেউটে সাপ, তাই না?" স্থলে বলে···ও কঁকিয়ে ওঠে। "রাত পোয়াবার আগে আরো মজার ঘটনা ঘটবে দেখবি," ভোগো বলে। যন্ত্রণায় ও কুঁচকে আসে। "যেমন, দুটো নিরীহ লোকের মরণ," স্থলে জুগিয়ে দেয়। "হতভাগা সাপটাকে

মেরে ফেললে তো পারি," ভোগো বলে। ও চেষ্টা করে নদী থেকে একটা পাথর তুলে আনায়, পারে না। "যাকগে, যাকগে," ও মাটিতে শুয়ে পড়ে বলে, "আর কীই বা এসে যায়।"

চটপটিয়ে বিষ্টি নামে। "কিন্তু বিষ্টিতে মরি কেন?" ভোগো রেগে বলে ওঠে। "এখান থেকে যদি সটান নরকে যাস, তবে হয়তো চুপসে ভিজে মরলে কিছু সুবিধে হতে পারে," সুলে বলে। দাঁতে দাঁত চেপে ভালো হাতটা দিয়ে ছুরিটা ধরে ও শরীরটাকে টেনে নিয়ে যায় খোলটার কাছে। চোখ বন্ধ করে খোলের ভিতরে ছুরিশুদ্ধ হাতটা ঢুকিয়ে, সজোরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে সাপটার কিলবিলে দেহটায় প্রচণ্ড আঘাতের পর আঘাত হানতে থাকে। হামাগুড়ি দিয়ে ও যখন ফিরে এসে শুয়ে পড়ে, কয়েক মিনিট পরে ওর নাক দিয়ে বাঁশির মতো আওয়াজে নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে। ওর হাতটা তখন সাপের ছোবলে ঝাঁঝরা। সাপটা কিন্তু মরে গেছে। সুলে বলে, "অন্তত এ সাপটা জন্মের মতো পোষ মেনে গেল।" ভোগো কিছু বলে না।

কয়েক মিনিট নীরবে কাটে। ওরা তখন মরণান্ত বিষের ক্রিয়ায় জরজর; বিশেষ করে সুলে, সে আর গোঙানি চেপে রাখতে পারছে না। এখন শুধু কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার। ভোগোর ইন্দ্রিয়গুলো নিস্তেজ হয়ে আসছে; "বড় দুঃখ তুই এই ভাবে শেষ হলি," ও জড়িয়ে জড়িয়ে বলে, "তা মোটামুটি মন্দ হল না রে চোট্টা বদমাস!" "তোর জন্যে আমি চোখের জলে একসা হলাম," নিদারুণ অবসন্ন সুলে টেনে টেনে বলে, "এবার পুরোনো চেনা পথের শেষ। কিন্তু একদিন যে পথের শেষ হবে, এ তো তোর জানা উচিত ছিল রে বেশরম বেজন্মা!" গভীর একটা নিঃশ্বাস নেয় ও। "সকালবেলা যাহোক আর হাসপাতালে যেতে হল না," কাঁপা হাতে ঊরোতের ঘা-টায় হাত বুলিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে সুলে বলে। "আঃ" হাল ছেড়ে ও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, "সবই আল্লার দোয়া।"

ঝিরঝিরিয়ে বিষ্টি নামে।

অনুবাদ : করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়

The Will of Allah by David Owoyele

যোশেফ স্কভোরেসকি

জল-উপবাস

যোশেফ স্কভোরেসকির জন্ম ১৯২৪ সালে। ইংরেজি ও মার্কিন সাহিত্যের তিনি বিশেষজ্ঞ। বহু সমালোচনা-গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। তাঁর প্রিয় লেখক হেমিংওয়ে। 'দি কাওয়ার্ডস' নামে একটি বিতর্কমূলক উপন্যাস নিয়ে সৃজনশীল সাহিত্যের জগতে তাঁর প্রথম আবির্ভাব। এই উপন্যাসে তিনি দেখিয়েছেন তথাকথিত দেশপ্রেমিক চেক পেটি বুর্জোয়ারা আসলে ছিল কাপুরুষ।

ধর্মের মৃত্যু হয়েছে। আজকাল অনেক লোকই আর ধর্মে বিশ্বাস করে না। অনেকেই বলে, হয়তো আছে একটা কিছু। আর তাদের কথাও হয়তো ঠিক, কিন্তু ও নিয়ে কেউ আর মাথা ঘামায় না।

কিন্তু আমার কথা যদি বলি, আমি যখন ছোট ছিলাম, আমার কিন্তু ধর্মে মতি ছিল—নাস্তিকতাকে আমি ভয়ংকর কিছু একটা জ্ঞান করতাম। আমার মাথায় গিজগিজ করতো বাইবেলের রহস্যময় বীভৎস সব গল্প—এব্রাহামের গল্প যে তার ছেলে ইসাককে বলি দিতে চেয়েছিল, আদম ও ইভের গল্প সোনার জন্যে যারা ইডেন উদ্যান থেকে বিতাড়িত হয়েছিল কিংবা যোশেফের গল্প বিশ্বাসঘাতকতা করে যাকে দাস হিসেবে ইজিপ্টে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল। এই সব গল্পে আমি এক ধরনের রোমাঞ্চ অনুভব করতাম, বিশেষ করে গোধূলির আলোতে নন্দনকাননের বিশাল পত্রচ্ছায়ায় নগ্ন ইভ ও নগ্ন আদমের কল্পনা আমাকে শিহরিত করত এবং যখন এব্রাহামের করাল ছুরিকা তার উপর নেমে আসছে তখন ইসাকের জন্য সত্যি আমার মায়া হত। কেইনের অভিশাপের বীভৎসতা রাত্রে আমার নিদ্রা হনন করত, মনে হত শ্মশ্রুমণ্ডিত যিহোভা যেন স্বর্গ থেকে ঝুঁকে পড়েছেন, আর আমি যেন কেইন, আমাকে তিনি ক্রুদ্ধ স্বরে

ভর্ৎসনা করছেন। "তোকে অভিসম্পাত দিলাম···তুই হবি ভবঘুরে, পৃথিবীতে এক ভবঘুরে।"

শাদা রাত্রিবাস-পরা দাড়িওয়ালা এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক ছাড়া আর-কোনো রূপে আমি ঈশ্বরকে কল্পনা করতে পারতাম না। কুমারী মেরীকে আমি কল্পনা করতাম সাশ্রুলোচন এক তরুণী রূপে পরনে যার সন্ন্যাসিনীর শুভ্রবাস, মাথা একটা নীল আওরাখায় ঢাকা আর যীশুখ্রীষ্ট কোমরে তোয়ালে জড়ানো এক গাট্টা-গোট্টা পালোয়ান।

এসবই ছিল খুব সুন্দর, কখনও বা একটু ভীতিপ্রদ। এই সব অদ্ভুত গল্প থেকে যেসব নীতিশিক্ষা আহরণ করার কথা—আমার ছেলেমানুষি মগজে তা ঢুকত না।

সিনাই পর্বত আর গ্যালিলিসের কানার জগতের সঙ্গে আমাদের এই ছোট্ট শহর কেন্স জগতের পার্থক্য আমার ছেলেমানুষি মগজকে চিন্তাক্লিষ্ট করত। এখানে যখন ছায়াবীথি ধরে পুরনো প্রাসাদের দিকে বেড়াতে যেতাম, মা আমার হাত ধরে থাকতেন। সেখানে অতিবৃদ্ধ লিমডেন গাছগুলি দীর্ঘশ্বাস ফেলত। কিংবা বেড়াতাম লেচুজে নদীর ধারে—হেমন্তের বাতাসে বিমর্ষ উইলো গাছেরা যেখানে কেবল মাথা নাড়াত।

আসলে কিন্তু এ-দুয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ ছিল না। বলতে কি, দু-হাজার বছর আগে প্যালেস্টাইনের মরুভূমিতে যা ঘটেছিল আর এই ছোট্ট শহরের সদর রাস্তায় যা ঘটে তার মধ্যে বিন্দুমাত্র কোনো সম্পর্ক নেই—এই শহরে যেখানে কাপড়ের দোকানের শো-কেসের সামনে দাঁড়িয়ে জাঁবরেল পাপা ওহ্রেনজুগ ফিকফিক করে হাসে আর লজেঞ্চুসের দোকানের মিঃ হাজার জেলাতেলে মুখ কুঁচকে কাউন্টারের ওপাশ থেকে চকলেট-লজেঞ্চুস তুলে দেয়। কিংবা যেখানে ফাদার মেলুন রবিবার দিন গীর্জার গথিক খিলানের মধ্যে গিল্টি করা চালিস (এক ধরনের পাত্র) উঁচু করে তুলে ধরে। যখন সে হাত উঁচু করে, আলখাল্লার তলা দিয়ে তার ডোরাকাটা ট্রাউজার দেখা যায়, দেখা যায় শাদা অন্তর্বাসের বাঁধন আর পুরনো ধরনের দড়িবাঁধা জুতো। বর্ষাকালে তার পায়ে থাকে রবারের গলোশ।

এই কারণে অনেকদিন সন্ধ্যায় আমি একা একা গীর্জার ধারে ঘুরঘুর করতাম। সেখানে জনকয়েক বুড়িকে সর্বদাই দেখা যেত, বেদীর সামনে হাঁটু মুড়ে বসে আছে। আমি মনে মনে ঈশ্বরকে কল্পনা করার চেষ্টা করতাম, চেষ্টা করতাম

অন্তত তাঁর উপস্থিতি অনুভব করার। রেভারেণ্ড মেলুন ভারিক্কি চালে বলতেন, 'ঈশ্বর শুধু আত্মা মাত্র।' ঈশ্বরের দেহ নেই, তিনি নিছক আত্মা ছাড়া আর কিছু না, তদুপরি একটি ত্রয়ী (ট্রিনিটি), অর্থাৎ শ্যামদেশীয় যমজের মতো একটা ব্যাপার আর কি—এই কথা ভেবে আমি মনে মনে দুঃখিত হতাম। গীর্জার উপাসনাস্থলে, যেখানে ঘসা-কাঁচের জানালার মধ্য দিয়ে ম্লান আলো এসে পড়ত —সেখানে দাঁড়িয়ে আমি সমস্ত শক্তি দিয়ে ঈশ্বরকে কল্পনা করার চেষ্টা করতাম। কিন্তু শাদা রাত্রিবাস পরা এক বৃদ্ধ, কোমরে তোয়ালে জড়ানো এক ব্যায়ামবীর এবং ফ্যাকাশে নীল আলখাল্লা-পরা এক বিমর্ষ পথিক রমণী ছাড়া আর কোনো রূপে তাঁকে আমি কল্পনা করতে পারতাম না।

গীর্জার কর্মচারীদের সঙ্গে যোগাযোগের একেবারে গোড়াতেই আমার অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতা হয়েছে। বাবার ভাই, কারেল খুড়ো, কখনও-সখনও আমাদের বাড়ি আসতেন। তিনি ছিলেন পুরোহিত, বুদেজোভিসের আর্চডিয়াকন। চমৎকার লোক ছিলেন তিনি। তাঁর গলার স্বর ছিল সদয়, কিছুটা অনুনয় মাখা। মাথার চুলে টোকা মারতে মারতে তিনি আমাকে বলতেন, 'আমার ছোট্ট ফুলের কুঁড়িটি।' তাঁর বক্ষদেশ ছিল চওড়া, আর কালো নিম্নবাসে ঢাকা পেটটি ঈষৎ ...রেল। তাঁর জোড়া-চিবুকের নিচে তিনি রোমান কলার পরতেন আর রেশমী ফুলের নক্সাকাটা মাফলার।

খুব ছেলেবেলার যেসব ঘটনা আমার মনে আছে তার মধ্যে সবচেয়ে পুরনো একটি আমার প্রায়ই মনে পড়ে: সোনালী আঙুরের নক্সা আঁকা ল্যাভেণ্ডার রঙের দেয়াল কাগজে-মোড়া একটি ঘরে আমি আর কাকা একা ছিলাম। একটি সোফায় মখমলের তিনটে বালিশের উপর আমি বসেছিলাম। সোফার অন্যপ্রান্তে বসেছিলেন কাকা—বেগুনি রঙের মাফলার জড়ানো, সোনার ফ্রেমের চশমায় আঁটা ছিল তার শুভ্র সদয় চোখ দুটো। তাঁর নরম অনুনয়মাখা গলার স্বর মনে পড়ে—ছোট্ট ফুলের কুঁড়িটি, নাও, খাও।' কারেল খুড়ো তিন-থাকওলা মস্তো একটা চকোলেট ক্রিমের বাক্স নিয়ে আমাকে বলছিলেন। আমি ব্যগ্র হাত বাক্সটার দিকে বাড়ালাম—এই সময় কাকা তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে গেলেন। ঘরে চকোলেটের বাক্স সহ আমি একা রইলাম। আমি মুঠো ভর্তি করে সেই কালো বলবলগুলি নিলাম, মুখে দিলেই যা গলে যায় এবং তার ভেতরকার উষ্ণ তরল পদার্থ ফোঁটা ফোঁটা করে সোজা চলে যায় পাকস্থলীতে।

আমি খেয়ে চলেছি, হঠাৎ অদ্ভুতভাবে ঘরটা দুলতে লাগল। আমি সোফার তিনটে কুশনের উপর থেকে পড়ে গেলাম কিন্তু হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে আবার এসে উঠলাম মখমলের পিরামিডের উপর, মুঠো মুঠো করে চকলেট মুখে পুরতে লাগলাম। ঘরটা উল্টোদিকে কাত হল, তারপর ল্যাভেণ্ডার রঙের দেয়াল-কাগজগুলো দুলতে লাগল, ঘুরপাক খেতে লাগল, ঘূর্ণীঝড় তুলল আর আমার কেমন আনন্দ হল, শান্তি অনুভব করলাম। মনে হল পড়ে যাচ্ছি, নিচের দিকে, কিসের কিংবা কার নরম আলিঙ্গন অনুভব করলুম তারপর মনে হল পাইখানায় কে জল চালছে। আমার হাসি পেল—কারেল খুড়ো পাইখানায় জল চালছে। তারপর দেয়াল-কাগজগুলো এত জোরে ঘুরপাক খেতে লাগল যে শুধু সোনালী আর ল্যাভেণ্ডার রঙের আভাসটুকুই জেগে থাকল—তার মধ্যে হঠাৎ ফুটে উঠল রেশমী ফুলের নক্সা, তার উপর চশমা পরা সন্ত্রস্ত সদয় একটা মুখ। কাকার অনুনয়ভরা কণ্ঠস্বর কানে এল।

'হায় হায়, আমার ছোট্ট ফুলের কুঁড়িটি!' তারপর গালচের ভারী পায়ের শব্দ, অনেকের গলার স্বর। বাবার মুখ দেখা গেল। কাকার অনুনয়ভরা গলার স্বর শুনতে পেলাম আবার।

'আমি জানতাম না ওর মধ্যে রামের ক্রিম আছে।' তারপর গলার স্বরে আরও মিনতি এনে বললেন, 'আমি বাথরুমে গিয়েছিলাম, ইত্যবসরে সব সাবাড় করে দিয়েছে।'

তারপর বাবার জোরালো গলা শোনা গেল। 'ডাক্তার স্টীলকে ডাকি।' তারপর টেলিফোনের ঠুনঠুন শব্দ, বাবার গলা—'হ্যালো, ডাক্তার স্টীল?' তারপর কি কথা হল আমি শুনতে পাই নি। প্রথমটা খুব ভালো লাগছিল, তারপর খুব খারাপ। বমি করলাম, তারপর বিছানায় পড়ে রইলাম। বিশ্রী লাগছিল, মনে হচ্ছিল, বেঁচে থাকি আর মরে যাই তাতে কিছু এসে যায় না।

তারপর আমার নিউমোনিয়া হল। আমি প্রতিজ্ঞা করলাম প্রতিদিন একশবার 'হেইল মেরি' আর 'আওয়ার ফাদার' জপ করব। ফলত আমি ভয়ানক রকমের ধার্মিক হয়ে উঠলাম। নিচু ক্লাসের ব্রানিক আমাকে দিয়ে এমন-কি স্কুলের প্রেক্ষাগৃহে গীর্জার কাজ করিয়ে নিত। আমি অর্গানের বেলো ঠেলতাম, পরে ফাদার মেলুনের সহকারীও হলাম। ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসের জন্ত আমার গর্বের

সীমা ছিল না এবং এক অর্থে এর জন্ত আমি শহীদও হয়েছিলাম। দুঃখের বিষয়, আমি পুরোপুরি এর মর্যাদা রক্ষা করতে পারি নি।

তবে, জীবন মানেই আপস-রক্ষা। আর প্রথম এই আপস-রক্ষা করেছিলেন বাবার এব্রাহামই যখন তিনি তাঁর প্রথম জাত পুত্রকে বলি না দিয়ে বলি দিয়েছিলেন একটা সাধারণ ভেড়াকে।

আমি শহীদত্ব লাভ করি হিউবার্ট খুড়োর গ্রীষ্মকালীন শিবিরে। শিবিরে জার্মান ভাষায় কথা বলতে হত, কাউকে যদি চেক ভাষায় কথা বলতে শোনা যেত—তাহলে তাকে তিরিশ বার একটি জার্মান লাইন লিখতে হত। এই নিয়মের কল্যাণে চেক ভাষা এমন ছড়িয়ে পড়েছিল যে, যে-শিশু এই কঠিন স্লাভ ভাষা অল্পই জানত, সেও এই ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করত শিবিরের আইন ভাঙার জন্ত।

হিউবার্ট খুড়োর গ্রীষ্ম-শিবির একটা মজার প্রতিষ্ঠান ছিল। শিবিরের মালিক ম্যানেজার ও প্রধান উপদেষ্টা হিউবার্ট খুড়ো জাতিতে ছিলেন ইহুদী, তার জন্ম অষ্ট্রিয়ায়, পাশপোর্ট ইংলণ্ডের, বাস চেকোস্লোভাকিয়ায় কিন্তু মাতৃভাষা জার্মান। শিবিরটা ছিল ছয় থেকে চৌদ্দ বছরের ছেলেমেয়েদের জন্ত। মেয়েদের বিভাগের কর্ত্রী ছিলেন হার্থা খুড়ি, হিউবার্ট খুড়োর স্ত্রী। তিনি ছিলেন জাঁদরেল এক সেমিটিক মহিলা, চেহারা ব্যায়ামবীরের মতো। হস্তশিল্প আর সিগারেট তার ছিল একান্ত প্রিয়।

শিবিরে সাকুল্যে বাটটি ছেলে-মেয়ে ছিল—মেয়ে কুড়িটি আর ছেলে চল্লিশটি। এদের শতকরা ৮০ জনই ছিল ইহুদী আর তাদের মধ্যে ২৫ জন নামমাত্র জার্মান জানত। তা সত্ত্বে হিউবার্ট খুড়ো এই রকম একটা ধারণা সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন যে খাস জার্মানভাষী পরিবেশে দু মাস ছুটি কাটালে তিনি বাচ্চাদের প্রতিবেশী জাতির ভাষা বেশ ভালো করেই শিখিয়ে দিতে পারবেন।

এই শিবিরেই কুইডো পিক, আলিক মুনেলেস ও পল বস্তির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। এই তিনজন একটি ধার্মিক ত্রিমূর্তি গড়ে তুলেছিল। প্রাগে তারা ইংলিশ হাই স্কুলে পড়ত। তাদের চুন্নত হয়েছিল এবং তারা 'প্রতিশ্রুত ভূমি' নামে পত্রিকা পড়ত যার কাজ ছিল মোজেসের সন্তানদের মধ্যে ইহুদী ধর্ম প্রচার। আমিও এই পত্রিকার নিয়মিত লেখক হয়ে উঠলাম, যদিও জিয়নিজম বলতে কি বোঝায় তা আমি ঠিক জানতাম না।

এই ত্রিমূর্তি প্রতিদিন অত্যন্ত ভক্তিভরে প্রার্থনা করত, অন্তত তাদের দেখলে

তাই মনে হত। সন্ধ্যার শুতে যাবার আগে বিছানার উপর পুবদিকে মুখ করে নতজানু হয়ে তারা একটার পর একটা হিব্রু শব্দ আউড়ে যেত। কে জানে, সবটাই হয়তো তাদের ভান তবু ওদের আমি হিংসে করতাম। ওদের প্রার্থনার ভাবভঙ্গী ও কোলাহলময়তার পাশে আমাদের নীরব ধ্যান কেমন জোলো মনে হত।

মোটা কুইডো পিকের এ-ব্যাপারে উৎসাহ ছিল ওদের সবার চেয়ে বেশি। তাছাড়া শিবিরে সে ছিল ইহুদী ধর্ম, অন্তত পক্ষে তাদের রীতিনীতি বিষয়ে, সবচেয়ে বড়ো বিশেষজ্ঞ। নানা সংস্কার, নিয়ম-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, প্রার্থনা এবং সর্বোপরি উপবাস ইত্যাদিতে ঠাসা ইহুদীদের জীবনযাত্রার অবিশ্বাস্য জটিলতা সম্পর্কে তার কাছ থেকে আমি অনেক কিছু জেনেছিলাম।

মোটা কুইডো পিক যখন এই উপবাস সম্পর্কে বলত তখন তার যেন উৎসাহের সীমা থাকত না। তার কথা শুনে মনে হত, ওদের ধর্মে উপবাসের যেন শেষ নেই। আর কত বিচিত্র ধরনের সব উপবাস—কোনো উপবাসের সময় একমাস ধরে মাংস খাওয়া চলবে না, কোনো উপবাসে ময়দা খাওয়া নিষিদ্ধ শুধু আলু খেয়ে থাকতে হবে, কোনো উপবাসে নিষিদ্ধ চিনি, কোনোটায় নুন। এমনিধারা একশ গণ্ডা ধর্মীয় নিষ্ঠুরতার ফিরিস্তি শুনতে শুনতে হিংসেয় আমার বুক ফেটে যেত আর সম্ভবত সেই কারণেই আমার একবারও মনে হয় নি, বছরের মধ্যে বারো মাসই যদি উপবাস থাকবে তাহলে কুইডোর এমনি ধারা গোলগাল চেহারা হল কী করে। গ্রীষ্মের ছ মাসের মধ্যে কোনো উপবাস পড়ল না এবং কুইডো সব কিছুই রাক্ষসের মতো খেতে থাকল—এতেও আমার মনে কোনো সন্দেহ জাগে নি। আমি বরং আমাদের ক্যাথলিকদের শুক্রবারের একটা মাত্র উপবাসের কথা ভেবে মনমরা হয়ে থাকি। যদি ও উপবাসটা আমি হিউবার্ট খুড়োর শিবিরে এতটা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতাম যে প্রায় কোনো খাদ্যই আমি সেদিন দাঁতে কাটতাম না—কিন্তু ইহুদীদের শতমুখী উপবাসের কাছে তা ছিল নিতান্তই ছেলেখেলা। সুতরাং, এই অনার্য দরবেশরা যখন আমায় ল্যাও মারছিল, আমি ওদের উপর টেক্কা দেবার একটা ফন্দী বার করলাম।

স্বভাবতই আমার প্রবল ধর্মভাব অন্যান্য খ্রীষ্টান ও ইহুদী ছেলেদের পরিহাসের বিষয় হয়ে দাঁড়াল। একদিন হোলাল নামে এক ছোকরা আর সবাইকে ছাড়িয়ে গেল। বলতে কী খ্রীষ্টান ছেলেদের ধর্ম বিষয়ে একটি ব্যক্তিগত কৌতূহল ছিল যেটা হল শিবিরের ইহুদী ছেলেদের যৌনাঙ্গের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে। রাত্রে আলো

নেভার পর খ্রীষ্টান ছেলেদের পীড়াপীড়িতে ইহুদী ছেলেরা গোপনে তাদের এই বৈশিষ্ট্যটি প্রদর্শন করত।

আমি অবশ্য এই প্রদর্শনীতে কখনও যোগ দিই নি, কুইডো পিকও না। যখন এই প্রদর্শনী চলত, আমরা দু'জনে তখন ভক্তিভরে প্রার্থনায় রত থাকতাম। পাশের ঘর থেকে যখন চাপা হাসির রেশ ভেসে আসত, আমরা তখন বিছানার উপর হাঁটু মুড়ে বসে একই ভগবানকে ডাকতাম—শুধু কে তার পুত্র এই নিয়েই ছিল আমাদের বিরোধ। আমরা কেউই অপরের চেয়ে আগে প্রার্থনা শেষ করে হার মানতে রাজী ছিলাম না। ফলত প্রায়ই কুইডো পিক সকালে ঘুম থেকে উঠতো প্রার্থনার বিশেষ সাজ জড়ানো অবস্থাতেই।

শেষে যখন মনে হল কুইডোর হামবড়াই আর সহ্য করা চলে না—তখন আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলল। দু ঘণ্টা ধরে প্রার্থনা করে ক্লান্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে আছি। প্রায় মাঝরাত তখন, আধ-ঘুমের মধ্যে কুইডো একটা অতি-উপবাসের কথা বলছিল। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর এটি উদ্‌যাপিত হয়। এক দিন উপবাস, তার পরদিন একশ গ্রাম মাজো আর আধ পাঁট চিনি ছাড়া চা—এমনি করে সাত মাস চলে। আমি বলে ফেললাম, আমাদের ক্যাথলিকদেরও একটা উপবাস আছে—তাতে জল বা জলে তৈরী কোনো পানীয় গ্রহণ নিষিদ্ধ। উপবাসটা চলে তিনদিন ধরে—কালই শুরু। কুইডোকে হার মেনে কথা বন্ধ করতে হল—আমি জয়ের আনন্দ নিয়ে শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালেই আমি মর্মে মর্মে বুঝলাম জল-উপবাসটা সহজ ব্যাপার হবে না। আগস্টের রাতটা খুব গরম ছিল। সকালে খ্রীষ্টান ও অ-খ্রীষ্টান ছেলেরা যখন টেবিলের উপরের টিপট থেকে বাটি ভর্তি চা ঢেলে নিচ্ছিল—মাখন-মাখান রোল আর জ্যামে কামড় বসাতে আমার কেমন যেন লাগছিল। বিশেষ করে কুইডো যেভাবে তার প্রাতরাশ সারছিল আর কাপের পর কাপ চা তার উদরের গহ্বরে নৃশংসভাবে চালান করছিল—তা আমার কাছে মনে হচ্ছিল একান্ত বিরক্তিকর।

সকালে খেলাধুলার একটা হাল্কা প্রোগ্রাম ছিল—ডিসকাস ছোড়া—যাতে আমি বিশেষ পারদর্শী ছিলাম। দশটার সময় জলখাবার দেওয়া হল আর সেই সঙ্গে বরফের বালতিতে করে সোডা আমি তখন ঝোপের আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নিলাম ধ্যান করার জন্য। সেখানে একটা পিঁপড়ের ঢিবি ছিল—আমার রুটির একটা বড় অংশ তাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিলাম।

দুপুরের দিকে মনে হল আর জের বজায় রাখতে পারব না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সুপ খেতে অস্বীকার করলাম, কেননা কুইডো বলল সুপও জল দিয়ে তৈরী পানীয় এবং আমাকে তা মেনে নিতে হল।

মধ্যাহ্ন ভোজের পরে দু ঘন্টার আবশ্যিক বিশ্রাম—সে সময়টাও আমার কাটল তৃষ্ণার্ত জাগরণে। বিকেলে শুকনো গলায় ভলিবল খেলা, পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় ঘুরে বেড়ান, তারপর সসেজ, হট ডগ আর চটকানো আলুর সান্ধ্য ভোজ। খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম—তাতে চটকানো আলুর পরিমাণ একটুও কমল না। সকলের খাওয়া শেষ হল, কুইডো পিক ধম্মো দেখেছি ভাব নিয়ে টাইটম্বুর করে গ্লাশ ভর্তি করে বরফ দেওয়া চা খাচ্ছিল আর বড় বড় চোখ করে আমার যন্ত্রণা লক্ষ করছিল।

এমন কি হিউবার্ট খুড়োরও চোখে পড়ল কিছু একটা হয়েছে। তিনি আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—'কি হয়েছে তোমার, বোশেফ?' আমি বীরের মতো বললাম, কিছু হয় নি আর খেতে পারছি না। আমার হট ডগ-টা কুইডো পিককে দিলাম। সে অম্লানবদনে তা নিল, কেননা, সে তার নিজের ধর্মের মতো ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসকেও শ্রদ্ধা করে। চটকানো আলুর প্লেটটা নিয়ে আমি গেলাম রান্নাঘরে।

কিন্তু অবস্থা চরমে উঠল সেইদিন সন্ধ্যায়। হিউবার্ট খুড়ো জানালেন পরের দিন ব্রেনস্কোর পাথরের সেতুর দিকে বেড়াতে যাওয়া হবে—সারাদিনের জন্যে। লাঞ্চের বাক্স সঙ্গে নিয়ে সকালে বেড়িয়ে পড়তে হবে। ফেরা হবে সন্ধ্যায়।

জবের এই বিচার বাণী শুনে আমি উপরে শুতে গেলাম। মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত পথিকের স্বপ্ন দেখে রাতটা কাটল।

সকাল বেলা কয়েক চামচ জ্যাম দিয়ে প্রাতরাশ সারলাম। তেষ্টায় কাঠ গলা দিয়ে শক্ত কোনো খাবার নামল না। তারপর আমরা বেড়িয়ে পড়লাম।

সেদিনটা ছিল আগস্ট মাসের সুন্দর উষ্ণ একটা দিন। পাহাড়ি পথ ধরে প্রায় বিশ কিলোমিটার পথ আমাদের যেতে হবে। দশটা নাগাদ সূর্য দারুণ তেতে উঠল।

সাড়ে দশটা নাগাদ সকলের ফ্লাস্কের জল গেল ফুরিয়ে। ছেলেরা সব পিছিয়ে পড়তে লাগল। পাহাড়ের চূড়ো অব্দি পথের দুপাশে সারি সারি

জলপানের কেন্দ্র। আর্য-অনার্য সকলেই সেখানে গিয়ে হানা দিয়ে সোডা খেতে লাগল।

আর এই সময় আমি গিয়ে কোনো গাছের ছায়ায় দাঁড়াতাম আর তক্ষুনি সোডার বোতল হাতে নিয়ে কুইডো এসে আমার পাশে দাঁড়াত। জিজ্ঞাসা করত আমি ঠিক আছি কি না। আমি মাথা নেড়ে এমন ভাবে আকাশের দিকে তাকাতাম—যেন প্রার্থনা করছি। কুইডো তৎক্ষণাৎ সেখানে থেকে চলে যেত— অবশ্য তার আগে বোতলে কয়েকটা চুমুক লাগাত এবং পরিতৃপ্তির সঙ্গে ঢেকুর তুলত।

পাথরের সেতু পর্যন্ত সারাটা পথ ঐ বিভীষিকাময় সোডার বোতলগুলি বারবার হানা দিতে লাগল। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় আমি অল্প একটু আচার শুধু মুখে তুলতে পারলাম। আমার কটলেটটা কুইডো আর আলিক মুনেলেস পরিতৃপ্তির সঙ্গে ভাগ করে খেল। সোডা যখন এল তখন আমি গিয়ে আশ্রয় নিলাম পাইনের একটা কুঞ্জে, কিন্তু প্রার্থনার পরিবর্তে যত ধর্মদ্বেষী চিন্তা আমার মাথায় ভিড় করে এল, কেমন একটা রাগ ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠল। আর আশ্চর্য হলাম, আমার যত রাগ গিয়ে পড়ছিল কুইডো পিকের উপর, অথচ ওর কী দোষ, ও তো আর ক্যাথলিকদের অন-উপবাসের জন্ত দায়ী নয়!

লাঞ্চের পর আমরা ক্লান্তিকর পথে বাড়ির দিকে রওনা হলাম। আবার সেই দুধারের সোডা, বিয়ার, লেমন স্কোয়াশের দোকান। আবার আমার চারপাশে সোডা পানরত ছেলেদের ভিড় জমল। আমার পাশে পাশে কুইডো পিক— সোডায় ওর পেট টাইটম্বুর।

আমি পিছিয়ে পড়তে লাগলাম, আমার পা আর চলছিল না, তেষ্টায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছিল। কুইডো আমার সঙ্গে রইল, যদিও আমি অচিরেই বুঝলাম আমার ক্রুশ বইতে আমাকে সাহায্য করা ওর উদ্দেশ্য নয়। ওর উদ্দেশ্য ছিল বিদ্বেষভরে প্রশ্ন করা আমি অসুস্থ বোধ করছি কি না। আমি তাকে বললাম, কিছুমাত্র না, বরং দেহের দাবি থেকে মুক্ত হয়ে আমি প্রায় খ্রীষ্টীয় সপ্তম স্বর্গে পৌঁছে গেছি। তখন কুইডো আরম্ভ করল বর্ণনা করতে উপবাসের ফলে ইহুদীদের শরীরে কি কি প্রতিক্রিয়া হয়। কুইডো বকবক করছিল আর যখন তখন এক একটা সোডার বোতলে চুমুক লাগাচ্ছিল। আর রাগে আমার সমস্ত শরীর জ্বলে যাচ্ছিল।

শেষ পর্যন্ত আমরা এসে পৌঁছলাম একটা উপত্যকায়। এখানে পাইন গাছের

ছায়ায় একটা পানশালা ছিল। এর অর্ধেকটা গোয়াল ঘর। বেড়ার উপর দিয়ে গরুগুলোর বোকাবোকা মুখ দেখা যাচ্ছিল। পানশালায় দু সারি টেবিল আর বেঞ্চি। আমরা বেঞ্চিতে গিয়ে বসে পড়লাম। পানশালার কর্ত্রী একটি গোলগাল মহিলা পাঁচটি সোডার বোতল নিয়ে এসে বলল, যেসব ভালো ভালো পানীয়ের বিজ্ঞাপন রয়েছে একদল ট্যুরিস্ট এসে আগেই তা শেষ করে গেছে। এই বোতল কটি ছাড়া আর কিছুই নেই—তবে আমরা যদি চাই দুধ পাওয়া যেতে পারে যত খুশি।

দুধ!

কথাটা শুনেই আমার চোখ হেসে উঠল। হোলি গোস্ট ভ্রুকুঞ্চিত করল, ভ্রূক্ষেপ করলাম না। আমি একটা সুপ্ত ষড়যন্ত্র ফেঁদে ফেললাম মনে মনে। আমি কুইডোকে বললাম, দুধ জলমিশ্রিত পানীয় নয়, গরুর বাটের স্বাভাবিক ফল, ঈশ্বরের উপহার। সুতরাং জল-উপবাসের মধ্যে এটা পড়ে না।

কুইডোকে আমার যুক্তি মেনে নিতে হল।

আর পেট পুরে আমি দুধ খেলাম। বাড়ি পৌঁছবার আগেই আমার পেট খারাপ করল। অন্তত পাঁচবার ঝোপের আড়ালে আমাকে অদৃশ্য হতে হল, বলা বাহুল্য, প্রার্থনার জন্য নয়।

যাই হোক, আমি আর তখন তৃষ্ণার্ত নই।

এই হল আমার প্রথম ধর্মীয় আপস। আর পাপের পথে একবার পা বাড়ালে বহুদূর পর্যন্ত নেমে যেতে হয়। আমি তার ব্যতিক্রম ছিলাম না। পরের দিন যখন তেষ্টা পেল, এবং রান্নাঘরে দুধ পেলাম না, আমি বাথরুমে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে কলের জলে তেষ্টা মেটালাম। আমি এত নিচে নেমে গেলাম যে তৃতীয় দিনে সান্ধ্যভোজের সময় পেট পুরে পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেতে খেতে উপবাসের উপকারিতা বিষয়ে কুইডোর কাছে নাতিদীর্ঘ একটা বক্তৃতাও দিয়ে ফেললাম। ধর্মের জন্য ত্যাগস্বীকার করলে শরীর ও মন কত ভালো হয় বিনিয়ে বিনিয়ে বললাম ওকে।

এইভাবেই লোকে ভণ্ডতপস্বী হয়ে ওঠে, আত্মা জাহান্নামে যায়।

এইভাবেই আমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছি। কিন্তু তিনি তাঁর অসীম করুণায় নিশ্চয়ই শিশুর সরলতার কথা মনে রেখে আমার দম্ভ এবং কুইডোর বিবেককে মার্জনা করেছেন।

কিন্তু কুইডোকে সত্যি সত্যি মার্জনা করা হয়েছিল কিনা, তা শুধু তিনিই বলতে পারেন। জেরেৎসিনের বন্দীশিবিরেও একইরকম নিষ্ঠার সঙ্গে কুইডো প্রার্থনা করত কিনা তাও তিনিই জানেন। কুইডোর সঙ্গে এখানেই আমার যোগাযোগ ছিন্ন হয়।

এ-সবই ভগবানের হাতে। সৃষ্টিকর্তার এই সব রহস্যের মধ্যে মানুষের নাক গলাবার কথা নয়।

অনুবাদ : শচীন বসু

The Great Catholic Water-fast by Josef Skvorecky

জন আপ্‌ডাইক্‌

রবিবার

জন্‌ আপ্‌ডাইকের জন্ম ১৯৩২ সালে, পেন্‌সিল্‌ভেনিয়ার পিলিংটনে। প্রথমে হার্ভার্ড কলেজ ও পরে অক্‌সফোর্ডে রাসকিন্‌ চারুকলা মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষান্তে ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৭ সাল অবধি "নিউ ইয়র্কার' পত্রিকার কর্মীরূপে উক্ত পত্রিকায় গল্প লিখতে শুরু করেন। ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দ পুওর-হাউস ফেয়ার' জাতীয় শিল্পসাহিত্য-পরিষদের পুরস্কার লাভ করে। পরে 'দ সেন্টর' এবং 'র‍্যাবিট্‌, রান্‌' উপন্যাসদ্বয় তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করে। গত দশ বছরের মধ্যে যাঁরা লিখতে শুরু করেছেন, তাঁদের মধ্যে আপ্‌ডাইক্‌ই বোধ হয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন গল্পকার। মধ্যবিত্ত জীবনের ছোট ছোট টেনশনগুলি নিয়েই তাঁর সব লেখা।

রোববারের সকাল। ঘুম ভাঙতেই মনে হল, এই ছায়াপথের মতো বিশাল দীর্ঘ দেহটাকে কে টেনে তুলতে চায়? আর কেনই বা তোলা? কোন এক পাদ্রী গির্জায় দাঁড়িয়ে মনের শান্তি ফেরি করবে, তাই শুনে কে আর মোহভঙ্গ করতে চায়? মনের শান্তির কথা না হলে আছে তো ঐ "অখণ্ড ব্যক্তিসত্তা", নয়তো "আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেকার গুপ্ত শক্তি"! পাপ বা অনুশোচনার মতো ভারী সাবেকী কথাগুলো আর শোনাই যায় না, একটা বেশ নির্লজ্জ কুসংস্কারও খুঁজে পাওয়া যায় না। এইসব ভেবে সে স্থির করে ফেলল, আজ সে ঘরে বসে সেন্ট পল পড়বে। তার যেন মনেই আসেনি, এই পন্থাটাই সবচেয়ে সহজসাধ্য।

তার স্ত্রী সারাটা বাড়ি হন্তদন্ত হয়ে বেড়াতে থাকে, অথচ একটা কথাও বলে

না। সে বাইবেল পড়তে বসলেই তার স্ত্রী এমন একটা ভাব করে, যেন তার স্ত্রীকে 'রামি' খেলতে না ডেকেই 'পেশেন্‌স্‌' খেলতে বসে গেছে, নয়তো তার স্ত্রীর সাধের জেন অস্টেন বা হেন্‌রি জেম্‌স সম্পর্কে যেন বাঁকা মন্তব্য করছে। তবু স্ত্রীকে এই রোববারের মেজাজটা খিঁচিয়ে দেবে ভেবেই সে বলল, "এই যে, আমার ঠাকুরদার প্রিয় জায়গাটা। কোরিন্‌থিয়ান্‌স্‌-এর প্রথম খণ্ড, একাদশ পরিচ্ছেদ, তৃতীয় শ্লোক্‌। 'আমি তোমাদের এই কথা জানাতে চাই, প্রত্যেক পুরুষের মাথার উপর খ্রীষ্ট। নারীর মাথার উপর পুরুষ। খ্রীষ্টের মাথার উপর ঈশ্বর।' ঠাকুরদা আমার মাকে এইটুকু পড়ে শোনালেই মা খেপে উঠতেন।"

মেরীর শান্ত মুখে কেমন যেন একটা গোঁয়ারতুমি এসে গেল: "কী বললে? মাথা? প্রত্যেক পুরুষের মাথার উপরে? এখানে 'মাথা' কথাটার মানেটা কী? আমি বাপু বুঝলাম না।"

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে পারলে সে একগাল হেসে উত্তর দিত। কিন্তু ঐ জায়গাটায় 'মাথা' কথাটার মানে বেশ স্পষ্ট থাকলেও সে আর কোনো সমার্থক শব্দ খুঁজে পেল না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "এ তো বোঝাই যাচ্ছে।

"আরেকবার পড়ে শোনাও দেখি। আমি ঠিক শুনিই নি।"

"না।"

"আরে, পড়ো না, লক্ষ্মীটি। 'পুরুষের মাথার উপর ঈশ্বর', তারপর?"

"না।"

স্ত্রী হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। সেখান থেকে বলল, "শুধু আমায় খেপানো, কী যে মজা পাও!" সে কিন্তু স্ত্রীকে খেপাতে যায়নি; এইবার কথাটা মাথায় এল।

রোববার দুপুরে তাদের এক বন্ধু খেতে আসে—লেনার্ড বায়ান্‌, ইহুদী লোকটার বদভ্যাস, যে-কোনো কথা থেকেই হৃদয় ও দেহের কথা টেনে আনে। 'ফ্যামিলি' ছবিটা সম্পর্কে কথা থেমে যেতেই চপ্‌ খেতে খেতেই সে বলল, "জানো, আমাদের বাড়িতে আমার বাবা আমায় চুমো খেতে কোনো সঙ্কোচ বোধ করতেন না? আমি গ্রীষ্মের শিবির থেকে ফিরে এলেই বাবা আমায় আলিঙ্গন করতেন—শারীরিক আলিঙ্গন। কোন সঙ্কোচের বালাই ছিল না। আমাদের বাড়িতে পুরুষদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসা দেখানোয় কোনো অস্বাভাবিকের বোধ ছিল না। মনে আছে, সেবার কাকা এলেন, এসেই আমার বাবাকে আলিঙ্গন করলেন। অথচ অ্যামেরিকানদের বাড়িতে এই

সম্পর্কের চিহ্নমাত্র নেই ; এইটেই আমার অসহ্য লাগে। বোঝা যায়, মার্কিনী পুরুষেরা সর্বদাই এই ভয়ে মরছে, পাছে লোকে তাদের 'হোমোসেক্শুয়েল' বলে ? কিন্তু কেন এমনি করে পুরুষত্বকে সামলে রাখতে হবে ? ইতালীতে, রাশিয়ায়, ফ্রান্স্-এ বাপ ছেলেকে চুমো খায়, কিন্তু মার্কিনী বাপ মার্কিনী ছেলেকে চুমো খেতে পারে না কেন ?"

মেসী সচরাচর এরকম ক্ষেত্রে মত প্রকাশ করে না, কিন্তু আজ বলে বসল, "ওটা এদেশের আদি আগন্তুকদের ব্যাপার।" আর্থার ভাবল, পাছে লেনার্ড কথা বলতে বলতে এমন জায়গায় চলে যায় যাতে নিজেকেই লজ্জা পেতে হয়, সেই ভয়েই বোধ হয় মেসী এমনভাবে কথায় যোগ দিল। কিন্তু কথাটা বলেই যেন মেসী আটকে গেছে ; তার মুখ দেখে মনে হয়, নিজের কথাগুলো তার নিজের কাছেই যেন অর্থহীন ঠেকছে ; তবু সে সাহস করে বলে গেল, "ওরা তখন এত একা যে, ওদের পৌরুষটুকুই ওদের সম্বল।"

টেবিলের একেবারে ধারে কনুইটা রেখে মেসীর দিকে ঘাড়টা এগিয়ে খুব নরম গলায় লেনার্ড বলল, "কিন্তু জানো, এ কথা নিঃসংশয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে, এদেশের আদি শ্বেতাঙ্গ আগন্তুকেরা ছিল পাঁড় মাতাল ? কিন্তু সে কথা যাক। লোকে বলে 'আদি আগন্তুক'। কিন্তু আমার তাতে কী আসে যায় ? আমি তো এই দ্বিতীয় জেনারেশন মার্কিনী।"

আর্থার তাকে বলল, "কিন্তু সেইটেই তো কথা। তোমার আসে যায় না। তুমি এইমাত্র বলেছ, তুমি কিংবা তোমার পরিবার মার্কিনী নও। তারা পরস্পরকে চুমো খেত। আমার কথা ভাবো। এগারো জেনারেশন আগে জর্মন ছিলাম। শ্বেতাঙ্গ, প্রোটেস্টান্ট, ছোট শহরের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক। আমি খাঁটি মার্কিনী। জানো, আমি কখনও আমার মা-বাবাকে চুমো খেতে দেখিনি ? কখনো নয়।"

লেনার্ড স্বভাবতই প্রচণ্ড বিচলিত হয়ে উঠল, বলল, "কিন্তু এ তো অসহ্য ! অসহ্য।" কিন্তু মেসীর প্রতিক্রিয়া দেখবে বলেই আর্থার কথাটা ছুঁড়ে মেরেছিল। কথাটা শুনে সে কতটা বিচলিত হল, আর কথাটা সত্যি কি মিথ্যে না জানায় সে কতটা বিচলিত হল, ঠিক তফাৎ করা গেল না। লেনার্ডকে সে বলল, "মিথ্যে কথা", কিন্তু তারপরেই আর্থারকে জিজ্ঞেস করল, "সত্যি ?"

মেসীকে যেন অবজ্ঞা করেই আর্থার লেনার্ডকে বলে চলল, "আলবৎ সত্যি। আমাদের পরিবার দেহের সম্পর্ককে ভয় করতেন। বছরের পর বছর কেটে গেছে,

আমি আমার মাকে চুঁইনি। আমি যখন কলেজ যেতে শুরু করলাম, তখন থেকে মা আমার বুকে জড়িয়ে ধরে বিদায় দেন। এখনও বাড়ি গেলে জড়িয়ে ধরেন। কিন্তু মায়ের যখন বয়স কম ছিল, আমি যখন কুড়ি পেরোইনি, তখন এসব ছিল না।"

লেনার্ড বলল, "আর্থার, তোমার কথা শুনে তো আমার ভয় হয়।"

"কেন? ভয়ের আবার কী আছে? আমায় নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করবার কথা আমার বাবার কখনও মাথাতেই আসেনি। আমি যখন ছোট্ট ছিলাম, বাবা আমায় কোলে নিতেন। আমি যেই ভারী হয়ে উঠলাম, বাবা কোলে তোলা বন্ধ করে দিলেন—ঠিক যেমন আমি যেই নিজে নিজে কাপড় ছাড়তে শিখে গেলাম, মা আর আমার কাপড় ছাড়াতে আসতেন না।" "আমার মা-বাবাকে কখনও চুমো খেতে দেখিনি" কথাটায় যতটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল, ততটা আর হচ্ছে না দেখে আর্থার আরো এগিয়ে বাবার কথা ভাবল, "একটা বয়স পেরোবার পরেই মার্কিনী ছেলেকে যারা চালিয়ে নিয়ে বেড়ায় তারা সব বাইরের লোক, ছেলেটা তাদের কাছে শুধু টাকা আদায়ের উৎস— যত সব সিনেমার ম্যানেজার, গ্যারেজের মিস্ত্রী, খাবারের দোকানের লোক। যে খাবারের দোকানটায় খেতাম, লোকটা ঠকিয়ে বেশি টাকা আদায় করত, অথচ আমরা একটু গোলমাল করলেই বকাবকি করত। কিন্তু তবু ঐ লোকটাকে বাবার মতো ভালোবাসতাম।"

লেনার্ড বলল, "কী ভয়ংকর কথা বলছ, আর্থার। আমাদের পরিবারে পরিবারের বাইরে আমরা কাউকে বিশ্বাসই করতাম না। আমাদের বন্ধুবান্ধব ছিল না, এ কথা বলছি না। বন্ধুবান্ধব অনেক ছিল। কিন্তু তবু ঠিক ঐরকম নয়। মেরী, তোমার মা তোমায় নিশ্চয়ই চুমো খেতেন, বল?"

"হ্যাঁ। সব সময়। আমার বাবাও।"

আর্থার বলল, "কিন্তু মেরীর মা-বাবা তো নাস্তিক।"

মেরী বলল, "ওঁরা ইউনিটেরিয়ান।"

আর্থার বলে চলল, "এইবার এসো তোমার প্রশ্নে। কেন এমন হয়? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একদা এসে শ্বেতাঙ্গেরা বসতি গড়েছিল, এদেশ সম্পর্কে এ ছাড়া আমরা আর কি জানি? এটা প্রোটেস্ট্যান্ট দেশ—পৃথিবীতে বোধ হয় এই একটাই। এই দেশ আর সুইট্জারল্যাণ্ড। আচ্ছা, এখন বল, এই প্রোটেস্ট্যান্টিজ্‌ম্ কি? শুধু মনের শক্তি দিয়ে, আর কোনো কিছু

দিয়ে নয়, ঈশ্বরলাভের কল্পনা। পাহাড়ের শীর্ষে কেবল এই মন, আর কিছু নয়।"

লেনার্ড সায় দিল, "সে-তো ঠিকই। সে-তো জানি।" কিন্তু আর্থারের এইবার মনে পড়ে গেল, এইমাত্র যে-কথাটা বলেছে, সেটা প্রোটেস্টান্টিজম্-এর সংজ্ঞা নয়, চেস্টারটনের পিউরিট্যানিজম্-এর সংজ্ঞা। নিজেকে শুধরে নেবে ভেবে, তর্কের তাড়নায় মনের গোপন দেশে পৌঁছে যাচ্ছে ভেবে লজ্জা পেয়েও আর্থার বলে চলল, "সামন্ততান্ত্রিক মধ্যস্থের ভূমিকায় আসীন গীর্জার জায়গায় এল লুথারের কল্পনার খ্রীষ্ট। ক্যাথলিক দেশে প্রত্যেকে প্রত্যেককে চুমো খায়, কেননা তারা ভাবে, এ এক বিরাট পরিবার—একা ঈশ্বরই তিন জনের এক পরিবার। গীর্জা তো কোটি কোটি মানুষের পরিবার। বিধর্মীরাও সেই পরিবারেরই অংশ। কিন্তু প্রোটেস্ট্যান্টের জীবনে সে একা, সে বাঁচে নিজেরই অন্তরে। সত্যকে একাই খুঁজতে হয়। মানুষের একাই থাকা উচিত।"

লেনার্ড বলল, "হ্যাঁ, ঠিকই।" আর্থারই বোকা বনে গেল। সে ভেবেছিল, কথাটা নিয়ে তর্ক উঠবে। তার শ্রোতারা আবার খেতে শুরু করে দিয়েছে দেখেই আর্থার বুঝল, তার কথা আর দাগ কাটছে না। তবু তাদের নাড়া দেবেই বলে সে যেন শেষ মার মারল, "আমাদের যখন ছেলেমেয়ে হবে, আমি নিশ্চয়ই তাদের সামনে মেসীকে চুমো খাব না।"

কথাটা বড় রূঢ়, বড় দুঃসাহসিক। আর্থার নিজেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। মেসী কোনো কথা বলল না, মুখ তুলে তাকালোও না, কিন্তু তার মুখ নম্রতার মধ্যেই অভিযোগে কঠিন হয়ে উঠল।

আর্থার বলল, "না, আমি ও কথা বলতে চাই নি। সব মিথ্যে কথা, মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে। আমার পরিবার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ছিল।"

মেসী লেনার্ডকে নরম গলায় বলল, "ওর কথা বিশ্বাস কর না। ও এতক্ষণ সত্যি কথাই বলছিল।"

লেনার্ড বলল, "আমি জানি। আমি যেদিন থেকে আর্থারকে চিনেছি, সেইদিন থেকেই ওর বাড়ি সম্পর্কে ঐরকম একটা কথাই ভেবেছি। সত্যিই ভেবেছি।"

লেনার্ড নিজের অন্তর্দৃষ্টির কথা ভেবে সান্ত্বনা পেল, কিন্তু তাদের মধ্যে যেন এক অসংগতির হাওয়া এসে লেগেছে, তাতে লেনার্ডও মুষড়ে পড়ল। তারই মন থেকে যেন সারা ঘরটা মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল, তাদের মাথায় কুয়াশার

তার জড়িয়ে এল। অনেকক্ষণ পরে লেনার্ড যখন উঠল, আর্থার ও মেসী, কেউই তাকে ছাড়তে চায় না; তার সময়টা ভালো কাটলো না বলে তাদের দুঃখ। আতিথেয়তার ব্যত্যয় ঘটেছে এই অপরাধবোধে তারা ভবিষ্যতে আবার কোনোদিন জমিয়ে বসবার কথা তুলে অনেক কথা বলে গেল। লেনার্ড যখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল, তখন তার টুপি পরার কায়দাটা সকলের মতো বেপরোয়া নয়, কেমন যেন মিইয়ে গেছে, ভিজে ভিজে—তার মনের মধ্যে যে ঝাপসা ঝিরঝিরে বৃষ্টি নেমেছে, তাকেই বোধহয় বাইরের বর্ষণ বলে ভুল করেছে।

রাত্রের খাবার সময় এল। মেসী বলে দিল, তার শরীরটা যেন কেমন করছে, সে আজ খাবে না। আর্থার রেকর্ডপ্লেয়ারে বেনি গুডম্যানের ১৯৩৮-এর কার্নেগি হল কনসার্টের রেকর্ডটা বাজিয়ে দিল। স্ত্রী রবিবারের 'টাইম্‌স্' পড়তে বসেছিল। আর্থার তাকে উঠিয়ে আনল। ব্রার্লাণ্ডি আর পার্‌সেল্ শুনে মেসী মানুষ হয়েছে—'সিঙ্, সিঙ্ সিঙ্'-এর সুরে জেস স্টেসির অনবদ্য একক পিয়ানো তাকে শুনতেই হবে। মেসীর জন্যেই আর্থার দু-দুবার রেকর্ডটা বাজাল। আধ বাটি জলে পুরো টিনটা ঢেলে দিয়ে আর্থার 'চিকেন উইথ্ রাইস' সুপ বানাল—একা একজনের জন্যে, বেশি পাতলা না করলেও চলবে। সুপটা ফুটে উঠতেই এমন ভালো লাগল যে সে মেসীকে জিজ্ঞেস করল—খাবে নাকি একটু? মেসী মুখ তুলে তাকালো, একটু ভেবে বলল, "বেশ, এক কাপ।" যা পড়ে রইল তাতে একটা বড় বাটি ভরে গেল—প্রচুর, অথচ বাড়াবাড়ি রকমের প্রচুর নয়।

সুপটা শেষ করে মেসী বলল, "বাঃ, বড় ভালো কিন্তু।"

"একটু ভালো লাগছে?"

"একটু।"

মেসী একটা ছোট গল্পের বই পড়তে শুরু করল। শোবার ঘর থেকে রকিং চেয়ারটা বের করে এনে আর্থার তার পাশে এসে বসল, 'দ ট্র্যাজিক সেন্স্ অফ্ লাইফ্'-এর পেপার ব্যাক সংস্করণটা পড়তে শুরু করল। এই একটা ব্যাপারেও মেসী তাকে ভুল বোঝে। সে জানে, সে উনামুনো পড়তে বসলেই মেসীর মন খারাপ হয়; যাতে মেসী আর কষ্ট না পায়, সেইজন্যই সে বইটা তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলার চেষ্টা করছে। বইটায় কী আছে, মেসী

তার কিছুই জানে না; শুধু একবার আর্থারের কাছেই শুনেছিল, লেখকের মতে, মৃত্যুকে এড়াবার আকাঙ্ক্ষা থেকেই ধর্মের উৎপত্তি। তবু তার সন্দেহ কাটে না।

মেগী তাকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, তুমি কি কখনও ঐ ভয়-দেখানো দর্শনতত্ত্ব ছাড়া আর কিছু পড়তে পারো না?"

"ভয়-দেখানো বলছ কেন? লোকটা আসলে এক ধরণের খ্রীষ্টান।"

"তোমার বাপু গল্প উপন্যাস পড়া উচিত।"

"পড়ব, পড়ব। এটা শেষ হলেই পড়ব।"

বোধ হয় ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। হাতের বইটা মাটিতে ফেলে দিয়ে মেগী বলল, "উঃ, কী ভয়ংকর! কী বীভৎস!"

আর্থার তার দিকে তাকালো: কী ব্যাপার? মেগী প্রায় কাঁদো-কাঁদো।

মেগী বুঝিয়ে দিল, "এতে একটা গল্প আছে। পড়লেই কেমন যেন অসুস্থ করে দেয়। আমি আর গল্পটার কথা ভাবতেই চাই না।"

"তাই তো বলি, ঐসব জোলো গল্প না পড়ে যদি কির্কেগার্দ পড়তে—"

"মোটেই না। এমন বীভৎস যে গল্পটাকেও মোটেই ভালো বলা যায় না।"

আর্থার নিজেই গল্পটা পড়তে বসল। তার মুখোমুখি সামনের চেয়ারটায় এসে মেগী বসল। বইয়ের পাতার ওপারে ভোরের ঈষৎ চঞ্চল বিবর্ণ মেঘের মতো তার দেহের উপস্থিতি আর্থার অনুভব করতে পারে। গল্পটা শেষ করে আর্থার বলল, "বেশ ভালোই তো। বেশ স্পর্শ করে।"

মেগী বলল, "বীভৎস। আচ্ছা, লোকটা স্ত্রীর প্রতি অমন বীভৎস ব্যবহার করে কেন?"

"সে তো বোঝাই যাচ্ছে। লোকটা নিজের জাতের বাইরে গিয়ে পড়েছে। ফাঁদে পড়ে গেছে। চমৎকার একটা লোক অদৃষ্টের ফেরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।"

"কী বলছ? কী যা-তা বলছ।"

"যা-তা! কিন্তু, মেগী, গল্পটার 'পেথস্' তো ঐখানেই। নিজের স্বার্থপরতা ও নিষ্ঠুরতা নিয়েও লোকটা তার স্ত্রীকে ভালোবাসে। সে তো নিজেই গল্পটা বলছে, তাতে যদি স্ত্রীর প্রতিই সহানুভূতি আকৃষ্ট হয়, তাতে তো এইই বোঝা যায় যে, স্ত্রীর প্রতি তার মনোভাব সহানুভূতিশীল। এই জায়গাটা দেখ—স্ত্রী ট্রেনে বসে আছে। 'ট্রেন চলতে শুরু করল, সে আমার দিকে ফিরে তাকাল। তার শান্ত, সুন্দর মুখ মিলিয়ে যাবার আগে ক্ষণেকের জন্য মনে

হল যেন এক দীর্ঘ শ্বেত হৃদয়।" গল্পটি ফরাসী থেকে অনূদিত—অক্ষম অনুবাদ। গল্পটির নাম 'এক শ্বেত হৃদয়'। "তারপর, যখন মনে পড়ে—'আমি তখন অনুভব করিনি এমন এক গভীর ভালোবাসার অভিনয় করতে পেরেছিলাম ভেবেই আনন্দ পেলাম। সেও কেমন মাত্রার সীমা পেরিয়ে সাড়া দিয়ে ছিল। আর সেই অত্যুৎসাহী সাড়াতেই কি নিহিত ছিল তার জয়?' দেখছ না, কতখানি সহানুভূতি! কী আশ্চর্য এক ছবি! নিজেরই শিথিল চরিত্রের খাঁচায় বাঁধা পড়েছে একটা অদ্ভুতরকম মানুষ।"

আর্থার অবাক হয়ে দেখল, মেসী কাঁদতে শুরু করেছে। তার দিকে তাকিয়ে আছে মেসী। তার চোখের নিচের পাতায় জল জমেছে। তার চেয়ারের ধারে হাঁটু গেড়ে বসে তার কপালে কপাল ঠেকিয়ে আর্থার ডাকল, "মেসী"। সমস্ত অন্তর দিয়ে সে তখন মেসীকেই খুশী করতে চায়; কিন্তু তবু তার সব-কিছুতেই যেন একটা তাড়াহুড়োর ভাব, একটা ভার বসে আছে। সে বলল, "বল, কী হল? মেয়েটার জন্যে আমারও দুঃখ হয়।"

"তুমি যে বললে, লোকটা চমৎকার?"

"আমি তা বলতে চাইনি। আমি বলতে চেয়েছিলাম, গল্পটার অলংকরতা ঐখানেই, লোকটা বোঝে, লোকটা মেয়েটাকে ভালোবাসে।"

"এর থেকেই বোঝা যায়, আমরা কত আলাদা।"

"না, কক্ষণো নয়। আমরা আলাদা নই। আমরা একেবারে এক।" প্রথমে মেসীর নাক, তারপর নিজের নাক ছুঁয়ে সে বলে চলল, "আমাদের নাক দুটো দুটো মটরের মতো এক, আমাদের মুখ দুটো দুটো শালগমের মতো এক, আমাদের চিবুক দুটো দুটো হ্যাম্স্টারের মতো এক।" মেসী ফোঁপাতে ফোঁপাতে হাসল। কিন্তু আর্থারের যুক্তির যুক্তিহীনতায় মেসীর কথাটার সত্যতাই যেন প্রমাণ হয়ে গেল।

মেসী যতক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল, আর্থার তাকে দুহাতে ধরে রইল। কান্নার বেগ যখন কমে এল, মেসী নিজেই সোফায় গিয়ে শুয়ে পড়ল, বলল, "যখন কোথায় যেন একটা ব্যথা করে, অথচ বোঝা যায় না, ব্যথাটা মাথায় না কানে না দাঁতে, তখনই সবচেয়ে বিশ্রী লাগে।"

আর্থার তার কপালে হাত রাখল। আর্থার কখনই জ্বর-জারি ঠিক বুঝতে পারে না। গা-টা গরম লাগল, কিন্তু সব মানুষের দেহই তো গরম। সে তবু জিজ্ঞেস করল, "টেম্পেরেচার নিয়েছ?"

"থার্মোমিটারটা যে কোথায় আছে জানি না। ভেঙে গেছে বোধ হয়।" মেসী শুয়ে থাকে কোনো পরিত্যক্তা রমণীর ভঙ্গিতে—একটা বাহু শূন্যে নিক্ষিপ্ত, তার নিচের নীলাভ দিকটাই উপরে দেখা যায়। হঠাৎ জিভটা বার করে বলে উঠল, "উঃ, ঘরটা কী অগোছালো হয়ে আছে।" বইয়ের সারিতে বাইবেলটা উঠিয়ে রাখা হয়নি, চার-চারটে অধর্মীয় বইয়ের গায়ে হেলান দিয়ে পড়ে আছে। রাত্রের আহারের অবশেষ খানকয়েক খালি গেলাস জানলার ধারে, আলমারীর মাথায়, বইয়ের শেল্‌ফের একেবারে নিচের তাকে প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। লেনার্ডের রবারের চটিজোড়া টেবিলের নিচে পড়ে আছে, গুড্‌ম্যানের রেকর্ডের মোড়কটা পাপোষের উপর পড়ে, সারা সপ্তাহের বিশৃঙ্খলায় সারবন্ধ সানডে টাইম্‌স্‌-টা সারা ঘর জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। আর্থারের সুপের বাটিটা এখনও টেবিলের উপর পড়ে আছে; মেসীর পেয়ালাটা উল্টে পড়ে আছে প্লেটের উপর, তারই চেয়ারের পাশে, উনামুনো আর ছোট গল্পের বইটাও ঐখানেই পড়ে।

মেসী বলল, "কী বিশ্রী! আচ্ছা ঘরটা একটু গুছিয়ে রাখতে তোমার কী হয়?"

"করছি। করছি। তুমি এবার শুতে যাও।" আর্থার মেসীকে ধরে ধরে পাশের ঘরে নিয়ে গেল, তার টেম্পেরেচার নিল। কাপড় ছেড়ে নাইটগাউন পরবার সময় মেসী থার্মোমিটারটা মুখে রাখল। আর্থার টেম্পেরেচার দেখল, আটানব্বুই পয়েন্ট আট। আর্থার মেসীকে বলল, "সামান্য একটু। শুয়ে পড়। সেরে যাবে।"

স্নানের ঘরের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মেসী বলল, "আমায় কেমন শুক্‌নো দেখাচ্ছে!"

"আমাদের 'ফ্যামিলি' নিয়ে আলোচনা করতে যাওয়াই ভুল হয়েছিল।" মেসী শুয়ে পড়ে যখন সাদা চাদরে সারা দেহ জড়িয়ে নিয়েছে, সাদা বালিশের গায়ে যখন শুধু লাল মুখটা জেগে আছে, আর্থার বলল, "তুমি আর গার্বো। একবার বল, সেই যেমন করে গার্বো বলে 'তুমি আমায় ঠকাচ্ছ'।"

অবিকল সেই সুইডিশ স্বরে মেসী ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, "তুমি আমায় ঠকাচ্ছ।"

বসবার ঘরে ফিরে এসে আর্থার বইগুলো তাকে উঠিয়ে রাখল, টাইম্‌স্‌-এর গার্ডেনিং-এর পাতা থেকে কাগজের টুকরো ছিঁড়ে পাতায় চিহ্ন করে রাখল, সেদিনকার কাগজটা একসঙ্গে জড়ো করে জানলার উপর রাখল, লেনার্ডের

রবারের চটিজোড়া দশ সেকেণ্ড হাতে রেখে একটা কোণায় ফেলে দিল, ফোনোগ্রাফ থেকে রেকর্ডটা নামিয়ে খামে পুরে উঠিয়ে রেখে দিল।

সবশেষে আর্থার প্লেট আর গেলাসগুলো জড়ো করে ধুয়ে ফেলল। সে যখন জলে হাত ডুবিয়ে হাত ধুচ্ছে, সাবানের ফেনাগুলো পাতলা হয়ে ভেঙে পড়েছে, হাত দুটো রূপোলি ধূসর লাগছে, ঠিক তখনই রোববারের ঘটনাগুলো তার মনে ফিরে এল, যেন কোন ভঙ্গুর উত্তেজককে ঘিরে মৌক্তিকের পাত জমতে জমতে এক নিখুঁত হিরণ্ময় চেতনা হয়ে উঠল। সেই চেতনায় সে জানল : তুমি কিচ্ছু জানো না।

অনুবাদ : শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

Sunday Teasing by John Updike

সেবদেৎ কুদরেৎ

মৃত্যু উপলক্ষে ভোজ

সেবদেৎ কুদরেৎ ১৯০৭ সালে ইস্তাম্বুলে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়, তাঁর শৈশবে পিতাকে হারান; মা কায়িক পরিশ্রম করে ছেলেকে লেখাপড়া শেখান। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সাহিত্য-বিষয়ে শিক্ষকতা করেন এবং অ্যাডভোকেটও হয়েছিলেন। প্রথমে তাঁর পরিচিতি কবি ও নাট্যকার হিসাবে, গত দু' দশক ধরে তিনি প্রধানত গল্প-উপন্যাসই লিখছেন; তুর্কী ভাষায় প্রকাশিত 'ক্লাসমেট্‌স্' এবং 'নো ক্লাউড্‌স ইন দি স্কাই' তাঁর দুটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস।

বাতাসের রঙ বদলে দিল জানুয়ারি মাস। পাঁশুটে রঙের আকাশের তলায় পৃথিবীকে যেন আরো ভয়ংকর দেখাল। লোকজন এখন শুধু কাজকর্মের জন্যে বেরোয়। রাস্তাগুলো বিশেষ করে পিছন দিক্‌কার ছোটখাট রাস্তাগুলো খালি, ফাঁকা পড়ে রইল। ওকগাছের তলায়, মসজিদের চাতালে, ফোয়ারার ধারে একটিও লোক রইল না—এইসব জায়গায় রাস্তার ছেলেরা সাধারণত গরমকালে এসে জোটে দু'দণ্ড জুড়োবার জন্যে। ফোয়ারা-তলা কখনো একেবারে খাঁ-খাঁ করে নি, কেউ না কেউ প্রায় প্রতিদিন সেখানে জল আনতে যেত।

একটি ছেলে সেদিন দুপুরবেলা জল আনতে গিয়েছিল ফোয়ারার ধারে, সে ছুটতে ছুটতে, হাঁপাতে হাঁপাতে রাস্তায় প্রথম যে-লোকটিকে দেখতে পেল, তাকেই বলল 'দর্শন আগা মারা গেছে।' দর্শন আগা পাড়ার খুব পরিচিত লোক। তার বয়স বছর পঞ্চাশেক; শক্ত-সমর্থ চেহারা, কালো গোছালো দাড়ি। দর্শন আগা ছিল ভিস্তিওয়ালা, জল বইত। একটি ছোট্ট দোতলা

বাড়িতে বউ আর দুই ছেলে নিয়ে কোনোরকমে দিন গুজরান করত সে। ছুটো মশক, একটা বাঁক আর ছু'পাশে ঝোলানো একটা শেকল—এই ছিল তার মোট সম্বল। রোজ সকালবেলা বাঁকটা কাঁধে ফেলে মশক ছুটোকে আংটার সঙ্গে শেকল দিয়ে ঝুলিয়ে সে বেরিয়ে পড়ত, প্রথমে নিজের পাড়ায় হেঁকে ফিরত : 'জল নেবে গো কেউ ? জল।'

তার চাপা অস্থিরচিত্ত গলার স্বর যতদূর সম্ভব রাস্তার শেষ বাড়িটিতে অবধি গিয়ে পৌঁছুত। যাদের জল দরকার তারা ডেকে বলত, 'দর্শন আগা, এক ভার' 'ছু ভার' কিংবা 'তিন ভার'। এক ভার মানে ছু' মশক জল। তখন দর্শন আগা পাহাড়ে উঠে ফোয়ারাতলায় যেত, মশকগুলোকে ভর্তি করে সারাদিন ধরে কেবল একবার ফোয়ারাতলা আর-একবার হেথা-হোথা এবাড়ি-ওবাড়ি করে ফিরত। এক একবারের জন্যে তিন কুরুশ পেত সে ; এইভাবে ছু'বেলা ছু'মুঠো আহার জোটানো যেন ছুঁচ দিয়ে দিয়ে কেমুয়া খোঁড়ার সামিল, ফোঁটা ফোঁটা করে যোগাড় করা। যদি কেবল তার রোজগারের উপর নির্ভর করতে হত তাহলে তাদের চার চারটে প্রাণীর মুখে অন্ন যোগানো শক্ত হয়ে দাঁড়াত ; কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, দর্শনের বউ গুলবাজের ডাক পড়ত হপ্তায় অন্তত বার তিন-চারেক ঠিকে-ঝির কাজ করবার জন্যে। এই কাজের মধ্যে নানা ছুতোর-নাতায় একটু বেশী জল খরচ করে গুলবাজ তার স্বামীর আয় বাড়ানোর চেষ্টা করত। হয়ত জিনিষটা খানিক প্রবঞ্চনার সামিল, কিন্তু ভাবলে পরে কি করুণ অথচ এতে তেমন কারুর ক্ষতিও হবার কথা নয়—বড়জোর একটা কি ছুটো মশক জল যাতে তার স্বামী আর কয়েক কুরুশ বাড়তি রোজগার করতে পারে !

এখন এসবই হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। খুব শীগগিরই দর্শন আগার মৃত্যুর কারণও জানতে পারা যায়। জলে ছাপাছাপি মশকের আংটাগুলো বাঁকের সঙ্গে লাগিয়ে যখন সে বরফের উপর দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল, সেইসময় তার পা পিছলে যায়। সারা রাত্তির ধরে জমে কাচের মতো ঝকঝকে পিছল হয়ে ছিল বরফগুলো, তার উপর ক্রমাগত টিপটিপ করে জল পড়েছে। ভর্তি জল নিয়ে টাল সামলাতে পারে নি, ফোয়ারার কলের নিচে পাথরটায় তার মাথা ঠুকে গিয়েছিল। কে ভাবতে পেরেছিল যে দর্শন আগা হঠাৎ সাত-তাড়াতাড়ি এমনি করে মারা যাবে। তাকে দেখলে মনে হওয়া স্বাভাবিক যেন পাথরটাই পলকা এবং লাগলে পাথরটারই আঘাত লাগা উচিত। কিন্তু সে ? কে

ভাবতে পেরেছিল যে সেই পাথরে লেগেই তার মাথার খুলি ফেটে দু'খানা হবে? আসলে মানুষ যতই বলিষ্ঠ, শক্তসমর্থ হোক্ না কেন মৃত্যু যখন আসে তখন ঐভাবেই অকস্মাৎ আসে।

গুলবাজ যখন এই খবর শুনল, তখন পাথর হয়ে গেল। সে যে ছোটখাট অন্যায় করেছিল, প্রবঞ্চনা করেছিল, এটা কি তারই শাস্তি? না, না, ভগবান অত নিষ্ঠুর হতে পারেন না। মস্ত দুর্ঘটনা ছাড়া এটা আর কিছু না। তার সাক্ষী আছে: পা পিছলে গিয়েছিল, পড়ে যায়, তারপরই না মারা যায়? এরকম করে যে-কেউ পড়ে মারা যেতে পারে।

হয়ত যেতে পারে কিন্তু তারা কিছু অন্তত বন্দোবস্ত করে রেখে যেত তাদের সংসারের ভরণপোষণের জন্যে। দর্শন আগার সম্পত্তি বলতে তো ঐ দুটো মশক আর একটা বাঁক, ব্যস্।

তবে গুলবাজ এখন কি করবে? সে ভাবে আর ভাবে কিন্তু কোনো থই পায় না। দুটো ছেলে নিয়ে, যার একটার বয়স নয়, আরেকটার বয়স ছয়— একা সব সামলানো বড় সহজ কথা নয়। হপ্তায় মাত্র দু-তিনবার কাপড় কেচে এই দুটো পেট সে চালাবে কি করে? তার মনে পড়ে যায় এক সময় সে কিভাবে যথেচ্ছ জল খরচ করেছে। আর তাকে জলের কথা ভাবতে হবে না। এক লহমায় সব বদলে গেছে। এখন বেশী বা কম জল খরচ করায় কোনোই তফাৎ নেই। যদি সে একটা পথের হদিশ পেত তাহলে এই ঝি-গিরি সে ছেড়ে দিত একেবারে। যে-জনকে সে একদিন ভালবেসে এসেছে হঠাৎ তাকে ঘৃণা করতে লাগল—জলের ঝকঝকে ঔজ্জ্বল্যে কোথায় যেন বিশ্বাস-ঘাতকতা আছে, তার বয়ে যাওয়ার মধ্যে শত্রুতা সাধার ভাব। আর সে জল দেখতেও চাইল না, তার কলকল শুনতেও না।

বাড়িতে কেউ মারা গেলে সাধারণত রান্নাবান্নার কথা কেউ ভাবে না। আহারের কথা বাড়ির সবাই ভুলে যায়। ছত্রিশ ঘণ্টা, বড় জোর আটচল্লিশ ঘণ্টা এই অবস্থাটা থাকে, তারপর পেটে যখন টান পড়ে, নাড়িতে ধরে পাক, তখন বাড়ির কেউ হয়ত বলে, 'এস, এখন দুটো কিছু মুখে দাও'। এইভাবে আস্তে আস্তে আবার জীবনের বাঁধা অভ্যাসটা ফিরে আসে।

শোকের বাড়িতে একদিন বা দু'দিন খাবার-দাবার পাঠিয়ে দেয় পাড়া-প্রতিবেশীরা, এটা মুসলমান সমাজের রেওয়াজ। গুলবাজ এবং তার ছেলেদের জন্যে প্রথম খাবার এল কোণের সাদা বাড়িটা থেকে। বৈষ্ণ ঐফেন্দী হচ্ছে ব্যবসাদার,

তারই বাড়ি। এক মাইল দূর থেকেও লোকে বুঝতে পারত যে বাড়িটা কোনো বড়লোকের। যেদিন দর্শন আগা মারা যায় তার পরের দিন দুপুরে হাতে মস্ত এক ট্রে নিয়ে সাদা বাড়ির ঝি এসে গুলবাজের দরজায় কড়া নাড়ে। সেই ট্রে-তে মুরগীর মাংসের ঝোল দিয়ে রান্না করা সিন্নাই, ভাল চাট্‌নি দেওয়া কয়েক টুক্‌রো মাংস, পনির এবং মিষ্টি সাজানো ছিল। সত্যি কথা বলতে কি সেদিন খাবার কারুরই মনোগত ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু যেই ট্রে-র ঢাক্‌না তোলা হল অমনি ইচ্ছেটা যেন দানা বাঁধল, নিস্তেজ হয়ে এল ব্যথার তীব্র অনুভূতি। তখন তারা সকলে চুপচাপ খাবার টেবিলের চারধারে জড়ো হল। হতে পারে তারা এমন খাবার আগে খায়নি বলে কিংবা বেদনা তাদের বোধকে বাড়িয়ে তীক্ষ্ণ করে তুলেছিল বলেই কিংবা কে জানে, প্রত্যেকটি খাবার খেয়ে তারা চমৎকৃত হয়। একবার খেয়েও তাই তারা সন্ধেবেলা আবার টেবিলে গিয়ে বসে এবং দুপুরের অবশিষ্ট যা ছিল তাই দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে।

আরেকজন পড়শী পরের দিনের খাবারের ভার নেয়। এইভাবে তিন-চারদিন চলে। অবশ্য প্রথম দিনের খাবারের মতো পরের দিক্‌কার খাবার-দাবারগুলো মোটেই তত সুস্বাদু ও চমৎকার ছিল না, তবে গুলবাজের বাড়িতে যা হত তার চেয়ে সবগুলোই ভাল। এইভাবে চললে গুলবাজ আর তার ছেলেরা হয়ত শেষ পর্যন্ত রক্ষা পেত, কিন্তু ট্রেগুলো যখন আসা বন্ধ হয় এবং বড় রাস্তার দোকান থেকে খুচরো খুচরো কয়লা যা তারা কিনছিল তা যখন আর কেনা যায় না তখন তারা টের পেতে থাকে যে, তাদের দুঃখ সত্যিই অসীম, অসহ্য।

প্রথম যেদিন খাবার আসা বন্ধ হয় সেদিন তারা দুপুর পর্যন্ত আশা করে বসেছিল, রাস্তায় পায়ের শব্দ শোনে আর একবার করে দৌড়ে যায় সাদা ঢাক্‌না দেওয়া যদি কোনো বড় ট্রে দেখতে পায় এই আশায়। কিন্তু না, শুধু রাস্তা দিয়ে লোকজন হেঁটে যাচ্ছে তাদের নিজের নিজের নিত্যকার ধান্দায়। তাদের হাত খালি। নৈশ আহারের সময় তারা বুঝল যে, না, কেউ তাদের জন্যে খাবারদাবার আনছে না, আগেকার মতো বাড়িতেই নিজেদের রান্নাবান্না করতে হবে। এ ক'দিন তারা অন্যরকম খাবারে অভ্যস্ত হয়েছিল, এখন প্রায় বিনা মাখনের আলুর তরকারী মুখে রোচা ভার হবে। কিন্তু এতেও আবার অভ্যস্ত হয়ে ওঠা ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় ছিল না। তিন-চারদিন তো তাদের ভাল করে খিদেই পেল না; ঘরে কাঁচা জল বলতে যা

ছিল তা ফুরিয়ে যাওয়া ইস্তক। মাখন, ময়দা, আলু ঘরে সব কিছুই বাড়ন্ত। পরের ক'দিন হাতের সামনে যা পেল, তারা তাই খেয়ে রইল ; ছটো পেঁয়াজ, এক কোয়া রসুন, আলমারিতে পাওয়া এক মুঠো শুকনো সীম। শেষে এমন একদিন এল যখন বাড়ির যাবতীয় পাত্র, শিশি-বোতল, চুবড়ি, কৌটো সব আভাড় হয়ে গেল। সেইদিনই প্রথম তারা সত্যি সত্যি খালি পেটে শুতে যায়।

পরের দিনও তা-ই। বিকেলের দিকে ছোট ছেলেটা কাঁদতে থাকে, 'মা আমার পেটের ভেতরটা মোচড়াচ্ছে।' মা বলে 'একটু ধৈর্য ধর্ বাবা, একটু চুপ কর্, দেখ না কিছু একটা হবেই।' তাদের সকলেরই মনে হয় পেট পড়ে যেন ছোট ছেলের মুঠোর মতো হয়ে গেছে। উঠে দাঁড়ালে সবারই মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করে, তার চেয়ে চিৎপাত হয়ে শুয়ে থাকা অনেক ভাল ; তাতে মনে হয় যেন স্বপ্ন দেখছে। চোখের সামনে লাল-নীল মরীচিকা ভাসতে দেখে তারা, কাণের ভিতরটা ভোঁ-ভোঁ করে ওঠে। গলার স্বর ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসে।

পরের দিন গুলবাজ এক স্বপ্ন দেখে : কোথায় যেন কোন্ বাড়িতে একজন পরিচারিকা চায়। কে বলতে পারে হয়ত সত্যিই একদিন সকালবেলা খবর পাবে : 'গুলবাজকে বলো যেন আজ কাপড়চোপড়গুলো কেচে দিয়ে যায়।' হ্যাঁ, যে-গুলবাজ ঠিক করেছিল যে কলের দিকে আর ফিরেও তাকাবে না, সে-ই শেষ পর্যন্ত এই ডাক পাবার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। কিন্তু পাড়ার লোকেরা ভাবে এখন বোধহয় ওকে কাজে ডাকা ঠিক হবে না। 'আহা বেচারী' তারা সবাই বলাবলি করে 'এখনো বোধহয় দুঃখে ওর বুকটা পুড়ে যাচ্ছে গো, এইসময় কাপড় ধোলাই করতে পারে !' সেদিন আর বিছানা ছেড়ে উঠতে চাইল না। শুয়ে শুয়ে সকলেই খাবারের স্বপ্ন দেখে। বিশেষ করে ছোট ছেলেটা প্রায়ই বলতে থাকে, 'আমি রুটি দেখতে পাচ্ছি, রুটি। দেখ মা দেখ (হাত বাড়িয়ে যেন ধরতে যায়) কি সুন্দর নরম তুলতুলে, চমৎকার করে সেঁকা।'...

বড় ছেলেটা দেখে মিষ্টি। কী বোকা সে, এত বোকা যে ট্রে-তে করে যখন এল তখন তারিয়ে তারিয়ে না খেয়ে সে কিনা একসঙ্গে গব-গব করে খেয়ে ফেলল তার ভাগটা ! যদি আরেকবার তেমনটা পায় তাহলে এবার কি করবে সে জানে : খুব আস্তে আস্তে খাবে, একটা একটা ক'রে, তারিয়ে-তারিয়ে, চেটেপুটে।

গুলবাজ চুপ করে বিছানায় পড়ে থাকে, শোনে ছেলেদের বিড়বিড় করা, পাছে কেঁদে ওঠে তাই ঠোঁট কামড়ে ধরে তবু চোখের পাতা ভিজে ওঠে, গাল বেয়ে জল গড়ায়। বাইরে পৃথিবী যেমনকার তেমনি চলতে থাকে। এই রাস্তায় সে কম দিন হল না বাস করছে, এখন শুধু শুয়ে শুয়েই বলে দিতে পারে কোথায় কি ঘটছে।

একটা দরজা বন্ধ হয়। পাশের বাড়ির সেবাৎ ছেলেটা স্কুলে যাচ্ছে; সর্বদা সে অমনি শব্দ করেই দরজা বন্ধ করে। যদি বড় ভাই সুলেমান হত তাহলে সে দরজা বন্ধ করত খুব আস্তে করে; দুই ভাই স্বভাবে এত বিপরীত! তারপর বাতের ব্যথায় পা টেনে টেনে, ধীরে ধীরে যায় এক বুড়ী। ও হচ্ছে সালের মা, সালে ক্যাবিন বয়-এর কাজ করে জাহাজে। রাস্তার শেষে, লাল বাড়িতে বাস করে নাপিত তহসিন একেন্দী, সে যায়। প্রত্যহ সকালবেলা ঠিক এইসময় গিয়ে বড় রাস্তায় সে তার দোকান খোলে। পরের জন হচ্ছে হাসান বে, দালালির কাজ করে ইদ্রিস আগা—তার নাতি; হাসান ইলেকৃট্রিক কোম্পানিতে কেরাণীর কাজ করে। মনোমত কোনো শিক্ষিতা মেয়ে পেলে তাকে বিয়ে করেই সে এ পাড়া ছেড়ে চলে যাবে। এ হচ্ছে বিদ্যালয়ের শিক্ষক হুরিয়ে হানিম। তারপর চটি বানায় যে ফয়জুল্লা সে। তারপর ট্যাক্স কলেক্টর সেলিম বে। এবং সবশেষে রুটিওয়ালা রোজ রিফ্‌কী বে'র বাড়ির সামনে গিয়ে থামে। রোজ এই একই সময়ে আসে বলতে গেলে। ঘোড়ার দু'পাশে বড় বড় ঝুড়ি বাঁধা, তাতে রুটি-বোঝাই থাকে। এই ঝুড়িগুলোর কিঁচকিঁচ শব্দ বেশ দূর থেকেই শোনা যায়।

বড় ছেলেটাই প্রথম কিঁচকিঁচ আওয়াজ শোনে রুটির ঝুড়ির, শুনে ছোট ভাইয়ের দিকে তাকায়। তারপর ছোট ছেলেটাও শুনতে পায়, সে-ও ভাইয়ের দিকে তাকায়; দুজনের চোখাচোখি হয়। ছোটটাই 'রুটি' বলে বিড়বিড় করে ওঠে।

শব্দটা কাছে আসে। গুলবাজ আস্তে আস্তে উঠে পড়ে, ঘরে ঠাণ্ডা আছে, বাইরে যাবার জন্যে সে একটা আলোয়ান জড়িয়ে নেয় গায়ে। ওর কাছে-ধারে দুটো রুটি চাইবে স্থির করে। কাপড় কাচার কাজ পেলেই সে শোধ করে দিতে পারবে। দরজার খিলে হাত রেখে গুলবাজ ইতঃস্তত করে। খুব মন দিয়ে শুনতে থাকে শব্দটা। এগিয়ে-আসা সেই ঘোড়ার খুরের শব্দ যেন

ক্রমেই তার সব সাহসকে গুঁড়িয়ে-মাড়িয়ে দেয়; শব্দটা যখন আর মাত্র কয়েক পা দূরে তখন সে এক ঝট্‌কায় দরজার খিলটা খুলে ফেলে। গুলবাজ বড় বড় চোখ করে রুটির দিকে তাকায় যেন কী এক অপরূপ বস্তু তার চোখের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে! চৌকো-চৌকো ঝুড়িগুলো এত চওড়া যে সাদা ঘোড়াটার প্রায় সবদিক জুড়ে আছে এবং এত ভারী যে প্রায় মাটি ছোঁব-ছোঁব করছে। দুটো ঝুড়িই একেবারে ঠাসা, ছাপাছাপি। সাদা বিশুদ্ধ ময়দায় তৈরী রুটি। এত টাট্‌কা আর তুলতুলে যে ছুঁলেই আনন্দ, এত নরম যে হয়ত আঙুল-ই বসে যাবে। কী সুন্দর এক গন্ধ নাক দিয়ে ঢুকে গলা দিয়ে নেমে যায়। গুলবাজ ঢোক গেলে। রুটিওয়ালাকে কিছু বলবে বলে যে-ই হাঁ করে সে, অমনি লোকটা এমন হঠাৎ হেট্‌-হেট, জল্‌দি চ' বলে বেমক্কা চেঁচিয়ে ওঠে যে গুলবাজের আর সাহসে কুলোয় না, একটাও কথা বেরোয় না মুখ দিয়ে, শুধু চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে; তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে ঝুড়িগুলোর দিকে, তাদের জানলার কাছ ঘেঁষে চলে যাচ্ছে। ঈশ্বরের আশীর্বাদ এই খাদ্য সামগ্রী তার বাড়ির সুমুখ দিয়ে চলে যায় অথচ সে হাত বাড়িয়ে তা' গ্রহণ করতে পারে না। ঘোড়াটা ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় আর তার লম্বা, সাদা ল্যাজটা নাড়তে থাকে রুমালের মতো—যেন বলে, 'বিদায় গুলবাজ! বি-দা-য়!'

দরজাটা ধড়াস করে বন্ধ করে সে ঘরে ফিরে আসে। ছেলেগুলোর রুগ্ন চোখের দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারে না, ওরা আশা করে অপেক্ষায় রয়েছে। এই শূন্য হাত সে কোথায় লুকোবে! হঠাৎ নিজেকে যেন ধিক্কার দেয় গুলবাজ, এই দুটো হাত মরতে আছে কি করতে! ঘরে একটুকু উচ্চবাচ্য হয় না, ছেলেরা অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। যার খালি হাত যাতে দেখতে না হয় সেইজন্যে বড় ছেলেটা চোখ বন্ধ করে; ছোট ভাইটাও দেখাদেখি তাই করল। মেঝের উপর পাতা ছিল একটা আসন, গুলবাজ তাতে নিজেকে সমর্পণ করে—কোমল, নির্ভার কোনো ছায়ার মতো, ঘাগরায় পা ঢেকে, ময়লা, নোংরা আলোয়ানটায় বেশ করে গা জড়িয়ে এমন জড়সড় হয়ে বসে যেন সে এই মুহূর্তে এক অসীম শূন্যতায় মিলিয়ে যেতে চায়। পুরনো, এক মোট কম্বলের মতো দেখায় তাকে। ঘরে তখন আরো দম-বন্ধ করা আবহাওয়া, প্রখর নিস্তব্ধতা। আধঘন্টা কি তারও বেশী কেউ এতটুকু নড়াচড়া করে না। শেষ পর্যন্ত ছোট ছেলেটাই আবার নীরবতা ভাঙে ঘরের। বিছানা থেকে সে চেঁচিয়ে ওঠে: 'মা! মা!'

'কি বাবা ?'

'আমি আর সইতে পারছি না, আমার পেটের ভিতর কি রকম করছে !'

'সোনা আমার, মণি আমার।'

'এই যে পেটের এখানটা। কী যেন নড়ছে।'

'ক্ষিধেতে ওরকম হচ্ছে, বাবা। আমারও হচ্ছে। কিচ্ছু ভেব না, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'আমি মরে যাব, আমি মরে যাব।'

এই সময় বড় ছেলেটা চোখ খোলে এবং ভাইয়ের দিকে তাকায়। গুলবাজ দু'জনকেই লক্ষ করে। ছোট ছেলেটা একটু থামে। তার চোখ আরো ঘোলাটে হয়ে আসে, ঠোঁট শুকনো, খসখসে এবং সাদাটে ; গাল বসে গেছে ; রক্তহীন ও ফ্যাকাসে দেখায় তাকে। গুলবাজ বড় ছেলেকে ইশারা করল। দু'জনেই ঘরের বাইরে থাকে। দু'ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, পাছে কেউ শুনতে পায় এই ভয়ে গুলবাজ ফিসফিস করে তার বড় ছেলেকে বলে, 'তুই মুদীর দোকানে যা একবার। গিয়ে বল্ আমরা ওকে ক'দিনেই মিটিয়ে দেব'খন, ও যেন কিছু চাল ময়দা আর আলু ধার দেয় আমাদের, যা।'

ছেলেটার গায়ের কোট জীর্ণ হয়েছিল, বাইরের ঠাণ্ডা আটকাবার মতো শক্তপোক্ত ছিল না। পায়ে জোর ছিল না একটুও। কোনো রকমে দেওয়াল ধরে ধরে সে নিজেকে সামলে রাখে। শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়, সেরাপাশা পাহাড়ে যেতে পথে পড়ে দোকানটা। দোকানের ভিতরটা যেন গরম, আগুনের মালসা জলছে। অন্য সব খদ্দেরদের চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে ছেলেটা যাতে মুদীর সঙ্গে সে একটু নিরিবিলি হতে পারে, তাছাড়া এই ভজে আরও খানিকটা তাত পোহানোও হয়ে যায়। সকলে চলে গেলে আঁচের কাছ থেকে সরে গিয়ে সে আধ সের চাল আধ সের ময়দা আর আধ সের আলু চায়। পকেটে হাত ঢোকায় টাকা বার করবার জন্তে তারপর হঠাৎ টাকাটা যেন ভুলে ফেলে এসেছে বাড়িতে এইভাবে বিরক্তির ভাব প্রকাশ করে সে বলে, 'দেখেছ টাকাটা ফেলে এলুম বাড়িতে। এই ঠাণ্ডায় আবার অতটা পথ যাব আসব ! তার চেয়ে তুমি বরং লিখে রাখ, কাল যখন আসব দিয়ে যাব'খন, কেমন ?'

দোকানদার এইসব চালাকী অনেক জানে। সে তার চশমার ফাঁক দিয়ে ভাল করে দেখে বলে 'তুমি তো বড় রোগা হয়ে গেছ খোকা, এঁ্যা! ঘরে যার টাকা আছে সে কি অত রোগা হয় বাপু?'

ছেলেটির সওদাগুলোকে একপাশে সরিয়ে রাখতে রাখতে সে ফের বলে, 'আগে টাকা নিয়ে এস, তারপর নিয়ে যেও।' 'ঠিক আছে' মিথ্যে ধরা পড়ে গেছে দেখে ছেলেটি বেদম ঘাবড়ে যায়, 'আমি নিয়ে আসছি' এই বলে সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে দোকান ছেড়ে।

ছেলেটা চলে গেলে মুদী তার বউকে বলে, বউ আবার তার দোকান-দারিতে সাহায্য করে, 'আহা বেচারা! দেখে ওদের এত দুঃখু হয়! ওখান থেকে কি করে যে চালাবে কে জানে।'

তার স্ত্রী-ও সায় দেয়, 'ভাবলে পরে আমারও কষ্ট হয়। বেচারা!'

পথে বরফের মতো কন্‌কনে ঠাণ্ডা, দোকানে ঢোকবার আগে যা ছিল তার চেয়ে বেশী মনে হয় ছেলেটির, আরো অসহ্য যেন। কোণে সাদা বাড়ির চিম্‌নি থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। আহা যারা ওখানে বাস করে তারা কত সুখী! কিন্তু ওদের প্রতি তার এতটুকু হিংসে নেই, বরঞ্চ শ্রদ্ধাই আছে, ওরাই তো তাকে এমন সুন্দর খাবার খাইয়েছে যা জীবনে ও কোনোদিন খায় নি।

ছেলেটি বাড়ির দিকে পা চালায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। তার দাঁত ঠকঠক করে। বাড়িতে পৌঁছে তার মা বা ভাইকে কিছু বলতে হয় না। খালি হাত দেখেই সব বোঝা যাচ্ছিল। ওদের সপ্রশ্ন চোখের সামনে জামা-কাপড় ছেড়ে সে সাদা বিছানায় ঢোকে। বিছানাটা এখনো তবু খানিক গরম আছে, মুখেও বলে, 'আমার খুব শীত করছে, আমার খুব শীত করছে।' গায়ের ঘন কম্বলটা ওঠে আর নামে, শরীর ভীষণ কাঁপতে থাকে।

গুলবাজ সামনে যা কিছু পায় তা-ই ওর গায়ে চাপিয়ে দেয়, দিয়ে ভয় পেয়ে তাকিয়ে থাকে খোকড়গুলোর দিকে, ছেলের কম্প দেওয়া শরীরে ওগুলো ক্রমাগত উঠছে-নামছে। এই কাঁপুনি প্রায় ঘণ্টা দেড়েক কি তারও বেশী থাকে। তারপর জ্বর আসে এবং সেই তাড়সে অবসাদ। ছেলেটি চিৎপাত হয়ে পড়ে থাকে, স্থির, নিস্পন্দ তার দৃষ্টি আচ্ছন্ন, ঘোলাটে। গায়ের ঢাকা

তুলে গুলবাজ তার ঠাণ্ডা হাত দিয়ে ওর মাথাটা চেপে ধরে, কপাল পুড়ে যাচ্ছে।

সন্ধ্যে পর্যন্ত গুলবাজ অস্থির হয়ে বাড়িতে পায়চারী করতে থাকে। কী করবে সে কিছুই বুঝতে পারে না। মাথায় আসে না কিছু! শুধু ঘর-বা'র করে আর শূন্য, বিস্ফারিত চোখ তুলে তুলে দেওয়াল, কড়িকাঠ আর আসবাব-গুলোর দিকে তাকায়। হঠাৎ তার মনে হয় সে আর মোটে ক্ষুধার্ত নয়। যেন অতিরিক্ত গরম অথবা ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে গেছে সব। ক্ষিধের চোটে স্নায়ুর আগাপাশতলা সব অবশ ভোঁতা হয়ে গেছে।

সূর্য অস্ত গেল এইমাত্র। অসুস্থ ছেলের বিছানা থেকে সরিয়ে খোকড়-গুলোকে জড়ো করে মেঝেয় রাখা হয়েছিল, এখন সেটাকে অন্ধকারের স্তূপ বলে মনে হয়। জড়ো-করা এই জিনিসগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ এক কাজের কথা মাথায় আসে গুলবাজের: আচ্ছা, এইগুলোর বিনিময়ে কেউ সামান্য কিছু দিতে পারে না? পাড়ার কে যেন একবার বলেছিল মনে আছে যে, বড়বাজারে কোথায় একটা দোকান আছে নাকি যারা পুরনো জিনিস কেনা-বেচা করে। কিন্তু নিশ্চয়ই সেটা এখন বন্ধ হয়ে গেছে! তার মানে সেই কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা!

যাই হোক্ তবু কিছু একটা সমাধান করতে পেরেছে এই ভেবে খানিক স্বস্তি পায় সে এবং অস্থির পদচারণা থামিয়ে রুগ্ন ছেলের পাশে গিয়ে বসে।

ছেলেটার জ্বর ক্রমেই বাড়ে। গুলবাজ স্থির, অপলক বসে থাকে। ছোট ছেলেটা ক্ষিধের জ্বালায় ঘুমোতে পারে নি। সে-ও বড় বড় চোখ করে এই কাণ্ড-কারখানা দেখছিল। বড় ছেলেটা একবার কাত্‌রে ওঠে, জ্বরের ঘোরে এপাশ-ওপাশ ছটফট করে, স্বস্তি পাচ্ছে না কিছুতে। গাল একেবারে পুড়ে যাচ্ছে যেন। ভুল বকতে থাকে, চোখ কপালে ওঠে—কড়িকাঠের একটা জায়গায় একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তো আছেই। বিস্ফারিত চোখ, দৃষ্টি অস্বচ্ছ ও নিবদ্ধ। নিজের বিছানায় শুয়ে ছোট ছেলেটা তার দাদাকে খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করছিল। জ্বরের ঝোঁকে বড় ছেলেটা তখন আস্তে আস্তে বিছানায় উঠে বসে, খুব নিচু গলায় ফিসফিস করে মা-কে বলে, যাতে কেবল তার মা-ই শুনতে পায়, 'আচ্ছা মা, দাদা মরে যাবে না কি?'

এক দুরন্ত ঠাণ্ডা বাতাস গুলবাহের সর্বাঙ্গ যেন শিরশিরিয়ে দেয়, খুব ভয়-ভয় চোখে সে ছেলেকে দেখে, 'কেন এ কথা জিজ্ঞেস করছিস বাবা?'

মা'র চোখের দিকে তাকিয়ে ছেলেটা একটু চুপ ক'রে থাকে তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে এমনভাবে বলে যাতে তার ভাই শুনতে না পায়:

'তাহলে, তাহলে যে সারা বাড়ি থেকে আমাদের জন্যে খাবার আসবে।'

অনুবাদ: অসিত গুপ্ত

Feast of Dead by Cevdet Kudret

কু উ

নতুন যুগের নতুন ধারা

কু উ হোপাই প্রদেশের উই শহরের বাসিন্দা। ১৯২৮ সালে একটি সচ্ছল কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম। জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধের সময় একটি সত্যোমুক্ত শহরে এক ভ্রাম্যমান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিনি লেখাপড়া শুরু করেন। ১৯৪৪ সালে শহরের নর্মাল স্কুলে ভর্তি হন। কিছুদিন পর তিনি দক্ষিণ হোপাই জেলার এক সাংস্কৃতিক দলে যোগ দেন এবং "মজুর কৃষক ও যোদ্ধা" নামক কাগজের জন্য প্রতিরোধ যুদ্ধের সম্পর্কে ছোটগল্প লিখতে শুরু করেন। কৃষি-সংস্কারের সময় তিনি আরও বহু সাহিত্য রচনা করেন। তাঁর লেখা বইগুলির মধ্যে "ওয়ান মিল উইথ দি ইউথ লীগ মেম্বার্স," "দি প্লেজ" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ওয়াং-এর বাবা আর মেয়ের মা ছেলে-মেয়ের মনের কথা বুঝতে পেরে তাদের বিয়েতে আর অমত করলেন না। চমৎকার চৌকস ছেলে ওয়াং জেলার সরকারী দপ্তরে কাজ করত। কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্ত ফেংল্যান্ মেয়েটি মাঠের কাজে খুব দড়ো তাই প্রত্যেকের কাছেই সে ছিল সুপরিচিত। কৃষকদের সবাই ওদের দু'জনকে পছন্দ করত এবং তাদের ধারণা—ওদের দু'জনের বিয়ে হলে চমৎকার মানাবে।

আলাদা আলাদা দু'খানি গ্রামে তারা বাস করত; কিন্তু মাঝখানকার ছোট্ট একটি খাল পেরিয়ে এ গ্রাম থেকে ও গ্রামে যাওয়া যেত। বিয়ের কথা স্থির হওয়ার পর ওয়াং সর্বদাই কোনো না কোনো ছুতো করে ফেংল্যান্‌কে দেখতে আসত। সুতরাং কিছুদিনের মধ্যেই দুই গ্রামের বৃদ্ধা মহিলারা তার ঘন ঘন যাতায়াত নিয়ে ফিসফিস গুজগুজ শুরু করল।

তারা বলাবলি করত "যে ছেলেমেয়ের বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে তাদের এরকম সব সময় মেলামেশা করাটা নিতান্তই বেহায়াপনা।"

ফেংল্যান্-এর বাবা বিয়ের কিছুদিন আগে হিসাব্ করতে বসল মেয়েকে যৌতুক দেওয়ার জন্ত কত শস্ত বিক্রি করা দরকার। একদিন খুব ভোরে উঠে শস্ত ভর্তি কয়েকটি বস্তা সে তার ঠেলাগাড়িতে তুলে বেঁধে রাখল। সে ঠিক করেছিল প্রাতরাশের পর শহরে গিয়ে শস্তগুলি বাজারে বিক্রি করে সেই টাকা দিয়ে ফেংল্যানের জন্ত কয়েকটি জিনিস কিনে আনবে। কিন্তু সে যখন ঠিক রওনা দেবে, তখন তার মেয়ে এসে তাকে থামিয়ে দিল।

মেয়ে বলল, "বাবা, তুমি কি করছ? এ বছর আমাদের সামান্ত শস্ত সঞ্চয় করে রাখতে যথেষ্ট কষ্টে দিন কাটাতে হয়েছে। তুমি কি ভুলে গেলে আমাদের গ্রামের সভায় ঠিক হল গম না ওঠা অবধি প্রত্যেকেই পাঁচ টাউ শস্ত জমা রাখবে?"

তার বাবা ঠেলাগাড়ি থামিয়ে তার পাইপ ভরতে লাগল।

"যখন থেকে তোমার কাজ করার বয়স হয়েছে, তখন থেকে তুমি আমাদের পরিবারের জন্ত মুখ বুজে খেটেছ। স্যায়ত তোমার জন্ত যা করা উচিত, আমি তাই করতে যাচ্ছি ফেংল্যান্।" তার বাবা এমন বিচলিত হয়েছিল যে তার পক্ষে কথা বলাও কষ্টকর হচ্ছিল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ধূমপান করার পর সে আবার শুরু করল "আমি তোমার জন্ত চার প্রস্থ জামা-কাপড়—দু' প্রস্থ ভাল সুতির কাপড়, দু' প্রস্থ ছাপা জামা; কয়েকটি দরকারি ফার্নিচার, একটি কেটলী, কয়েকটি বাটি, একখানি আয়না, ফেস পাউডার এমনি কয়েকটি জিনিস কিনব ভাবছিলাম। তুমি কী বল?' এসব জিনিস কি তোমার পছন্দ নয়?"

ফেংল্যান্ একটু হাসল, তারপর ঠেলাগাড়ি থেকে থলেগুলি নামাতে সুরু করল, আর তার বাবা বিস্ময়ে একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

সে বলল, "ওয়াং-এর কথাগুলো কি তোমার মনে নেই বাবা। সে আমাদের এক পয়সাও খরচ করতে বারণ করেছিল। আমি তো তাদের পরিবারেই যাচ্ছি? মুক্ত এলাকায় এমন কোন পরিবার আছে যাদের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নেই? বাড়তি চেয়ার টেবিল আমাদের কি কাজে লাগবে? লাঙল টানতে অথবা চারা লাগাবার কাজে ওগুলি আমাদের কোনো সাহায্যই করবে না। আর ছাপা জামা-কাপড় পরার সময় পাব কখন? এখন তো আর পুরোনো যুগ নেই। যখন স্ত্রীকে বিয়ের পর তিন বছর মাঠে কাজ

করতে দেওয়া হত না। ওয়াং-এর পরিবারে গিয়ে আমাকে অবশ্যই মাঠের কাজে তাদের সাহায্য করতে হবে। মুখে পাউডার লাগাব কখন। ওয়াং নিজে সরকারী কর্মচারী। সে নিশ্চয়ই ওসব নেবে না, আর আমিও ও-সব জিনিস চাই না।"

ফেংল্যান্ যখন শস্য ভর্তি বস্তাগুলো চালার নিচে এনে রাখছিল, তখন তার বাবা উঠোনের ভিতর এক পা এগিয়ে গিয়ে বসল, তার ভ্রূ কুঞ্চিত হল ও চিন্তায় মাথা ঝুঁকে পড়ল। মেয়ে ফিরে এলে তিনি বললেন, "শস্য বিক্রি যদি নাই করি ত আমাদের বাছুরটাই বেচে দি। দুটো বলদের আমাদের দরকার নেই।"......

"বাছুর তো আরও বিক্রি করা চলে না।" ফেংল্যান্ প্রতিবাদের সুরে বলল, "ঠিক জন্মের পর থেকে আমি ওটাকে বড় করেছি। এখন ওর বয়স এক বছর হয়েছে এবং শীঘ্রই ওটাকে কাজে লাগাতে পারব। তুমি কি করে ওটাকে বিক্রি করতে চাইছ? ওয়াংদের কোনো ষাঁড় নেই। আমরা যখন চাষ করব তখন তোমার কাছে ছাড়া আর কার কাছ থেকে ধার করব?"

হতবুদ্ধি হয়ে তার বাবা মেয়ের যুক্তির উত্তর দিতে পারে না। কিন্তু কৃষকদের মধ্যে যারা সেকেলে তারা তাকে দেখে হাসাহাসি করবে এত কথা ভেবে সে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু সে অন্য কোনো পথ খুঁজে পেলে না।

বিয়ের দিনে ওয়াং-এর মা মোরগের ডাক শুনেই ঘুম থেকে উঠে পড়লেন। রাগতভাবে তিনি জামা-কাপড় পড়ে তৈরী হয়ে যেখানে তার ছেলে ঘুমুচ্ছিল সেই ঘরে গেলেন। বিয়ের পর এই ঘরে নতুন বৌ-ও থাকবে এবং উৎসবের পূর্বে উপহার ও যৌতুকের জিনিসগুলিও এই জায়গায়ই সাজিয়ে রাখা হবে। "উঠে পড়!" তিনি ডেকে বললেন। "তুই কি বলে ঘুমুচ্ছিস্ এখনও? জায়গাটা তো এমন করে রেখেছিস যে দেখে মনে হয় এখানে মড়া মরেছে।

প্রচণ্ড রাগে গজগজ করতে করতে করতে সে উঁচু শোয়ার জায়গায় তার ছেলের পাশে ধপ্ করে বসে পড়ল।

ঘুমের চোখ ঘষতে ঘষতে ওয়াং উঠে বসল। "এখনও ভোর হয়নি মা," বলে সে হাই তুলল। "এত ভোরে তুমি কি করছ?"

"বলিহারি যাই—আমি পড়ে পড়ে ঘুমোব। জিজ্ঞেস করি—কেউ দেখলে বলবে, এটা একটা বিয়ে বাড়ি!"

"তার মানে তুমি বলতে চাও যে দরজার বাইরে পাল্কী নেই কেন? ওগো

মা, আজকাল আর ওসবের চলন নেই। সবাই এখন আরও বেশী কাজ করে ভাল ফসল তুলতে ব্যস্ত। কার সময় আছে পাল্কী নিয়ে মাথা ঘামাবার, তা ছাড়া আমি পার্টির কর্মী। কৃষক সাধারণও যখন আর ওসব জিনিস পছন্দ করে না, তখন আমি কী করে ঐ সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক প্রথা আঁকড়ে থাকি।"

"তুই কী বকছিস। তোর মার মাথাটি এলম কাঠের তৈরী নয়!" তীব্র ক্রোধে ফেটে পড়ে শোয়ার জায়গায় উপর পাতা বেতের মাদুর চাপড়াতে চাপড়াতে প্রতিবাদের স্বরে বলে মা। "বিয়ের কনে পাল্কীতে এল না কিসে এল বয়ে গেছে তাতে আমার। কিন্তু ওদের তো বাপু শুনি অবস্থা বেশ ভালোই— তবু এক কানাকড়ির জিনিসও ওরা কেন পাঠাল না সেই কথাটা বুঝিয়ে বলবে আমায়? আমার যখন বিয়ে হয়েছিল তখন তোর ঠাকুমা আমাকে একটি সিন্দুক কিনে দেওয়ার জন্য তার রান্নার বাসন-পত্রও সব বিক্রি করেছিল"......

বৃদ্ধা রাগে একেবারে কাঁই।

ছেলে তাকে শান্ত করার জন্য অনেক চেষ্টা করল, "মা, আমাদের এখানে কোনো দুর্ভিক্ষ হয়নি, কিন্তু দুর্ভিক্ষে বহু স্থানের সমূহ ক্ষতি হয়েছে। তাদের সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য। সেইজন্য আমাদের সকলকেই সঞ্চয় করতে হবে। ফেংল্যান্-এর বাবা মেয়েকে যৌতুক দেবার জন্য যদি শস্য বিক্রি করেন তাহলে বসন্তকালে তারা কি করবে?"

সে যা বলল, মা তার একটি শব্দও শুনেছে বলে মনে হোল না। সে নিজের মনে কিছুক্ষণ গজগজ করে আবার চেঁচাতে শুরু করল:

"ভ্যালা লোক যা হোক! কেপ্যানের যাত—একরত্তি জিনিসও দিলে না গো! দুপুরবেলা মেয়েরা সবাই যৌতুকের জিনিসপত্র দেখতে আসবে, আর লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাবে। গরিব পরিবারে জন্মালেও এমন ব্যাপার আমি কখনও দেখিনি।"

"মাগো, এখন দিনকাল সব বদলে গেছে।" ওয়াং বললে, "ওসব পুরোনো দিনের কথা নিয়ে ঘ্যানর ঘ্যানর করে লাভ নেই। আমাদের এমন কি একটি বলদও নেই। ফেংল্যান্ যদি টুকটুকে লাল ছুটো পেল্লায় সিন্দুক যৌতুক নিয়ে আসে, তারা কি লাঙল বইতে পারবে, না বীজ বুনতে পারবে।"

"তোর শুধু ঐ এক কথা—মাঠের কাজ।" মা একটু নরম কাটল না। "তুই কি মনে করিস জমির কি দরকার তা না বুঝেই আমার তিনকাল

কেটেছে! কাজ তো করতে হবে। কিন্তু মানও তো বাঁচাতে হবে! এই দিন তো বারবার আসবে না।"

ইতিমধ্যে বেশ বেলা হয়ে গেছে। ওয়াং হাত-মুখ ধুয়ে জামাকাপড় পড়ল

সে বলল, "মাগো, আজকের দিনে কাজ দিয়েই মানুষের মান-সম্মান। সেই আগেকার দিন আর নেই। যখন আমাদের সকলের অবস্থা আরও ভাল হবে, তখন যদি আমরা চাই ফেংল্যান্-এর বাবা নিশ্চয়ই আমাদের কিছু দেবেন।"

"বোকারাম! ওই আশাতেই থাকো! মেয়ে পার করার পর কেউ আবার তাকে উপহার দেয়—জন্মে শুনিনি।"

"দেখ মা, আমি মেয়েটিকেই বিয়ে করছি", ওয়াং অসহিষ্ণুভাবে বলল, "যৌতুক নয়।"

মা চটে গেল।

বলল, "বেশ, তোমরা তোমাদের বিয়ে করগে যাও—আমি ওর মধ্যে নেই। আমি যাচ্ছি তোর দিদিমার কাছে, সেখানেই ও-কটা দিন থাকব।" বৃদ্ধা সবেগে ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে গাঁয়ের মোড়ল চু-র প্রায় ঘাড়ে এসে পড়ল। চু যাচ্ছিলেন যে-হলঘরে বিবাহোৎসব হবে সেখানে কতকগুলি অভিনন্দনপত্র টাঙাতে। পথ দিয়ে যেতে যেতে মা ও ছেলের ঝগড়া শুনে তিনি আসছিলেন কি ব্যাপার দেখতে। এমন সময় এই দুর্ঘটনা। রাগে লাল হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বৃদ্ধা মহিলা গ্রামের মোড়লের নিকট তার সমস্ত অভিযোগ পেশ করল।

"আপনি ব্যাপারটা ভুল বুঝেছেন," চু হাসিমুখে তাকে বুঝিয়ে বললেন, "ধরুন দুটি কনে আছে। একটি কনে বাক্স বোঝাই উপহার আর বিছানাপত্র নিয়ে এল কিন্তু সে কোনো কাজ জানে না; আর-একটি মেয়ে তার একজোড়া কর্মদক্ষ হাত ছাড়া আর কিছুই আনতে পারল না—আপনি কোনটিকে পছন্দ করবেন?"

মায়ের রাগ পড়ে গেল। তিনি হেসে বললেন, "যারা কঠোর পরিশ্রম করতে পারে দেশের লোক তাদেরই চায়! এতো সবাই জানে।"

প্রাতরাশের পর, বিবাহোৎসবের হলঘরটি বেশ সুন্দরভাবে সাজানো হল। শুভেচ্ছা-বাণীগুলো দিয়ে দেয়ালগুলি অলংকৃত করা হোল আর তার মাঝখানে টাঙানো হল চেয়ারম্যান মাও-এর ছবিটি। জেলা সরকারের কাছ থেকেও উপহার এসেছিল। কৃষকেরা এমন ঠাসাঠাসি করে বসেছিল যে একবিন্দু জল

ধরারও জায়গা ছিল না। অতিথিদের প্রত্যেকেই এমন আগ্রহের সঙ্গে এক-দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন, মনে হচ্ছিল যেন একজনের একজোড়া চোখ, দেখবার জন্য যথেষ্ট নয়। ছেলে মেয়ে, ছেলে বুড়ো সকলেই খুশিখুশি ভাবে কথা বলছিল।

এক বুড়ি ব্যস্তসমস্তভাবে ঘুরে ঘুরে জিগ্যেস করছিল, "এখনো বিয়ের কনেকে দেখছি না কেন? ওরা কি পাল্কি-টাল্কি আনবে না? সেই ভালো। বিয়ের সময় আমাকে যখন পাল্কিতে করে আনছিল—আমার তো বাবু মাথা ঘুরছিল! খরচই যে শুধু হয়েছিল তা নয়—শরীরেও অস্বস্তি হয়েছিল। তার চেয়ে এই ভালো। এতে টাকাও বাঁচে, কাজও হয়।"

আর-এক বকবকানি ওয়াং-এর মার কাছে ছুটে গেল: "কনের যৌতুকগুলি রেখেছেন কোথায়?"

মা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। কথা বলার জন্য সে মুখ খুলল, কিন্তু তার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরল না। সুতরাং সে শুনতে না পাওয়ার ভাণ করে তখন থেকে প্রশ্নকর্ত্রীকে এড়িয়ে চলতে লাগল।

বাজনা বেজে উঠল। ফেংল্যান্ এল তার বাবাকে সঙ্গে না নিয়েই, যদিও বাবার সঙ্গে আসাটাই সামাজিক প্রথা। গ্রামের মোড়ল চু কনেকে অভ্যর্থনা জানাতে এবং উৎসবে পৌরোহিত্য করতে উঠে দাঁড়ালেন। মৌমাছির মতো সব্বাই তাদের ঘিরে ধরল, এগিয়ে গেল। গ্রামের মহিলা সমিতির সভানেত্রী বেশ কষ্ট করেই অতিথিদের ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন ফেংল্যানের হাত ধরে।

বিয়ের কনের পরনে ছিল সাধারণ নীল কাপড়ের জ্যাকেট ও তার সঙ্গে মানানসই ট্রাউজার। সাধারণ চাষী মেয়ের মতো মাথায় বেঁধেছিল ছাপা রুমাল। সে বসেছিল ওয়াং-এর পাশে আর তার চোখদুটি খুশিতে চকচক করছিল, কনেকে আরও ভাল করে দেখার জন্য অতিথিরা বকগলা করে ঠেলাঠেলি শুরু করল আর শিশুরা উঠল হাততালি দিয়ে।

"বন্ধুগণ, চুপ করুন!" চু চেঁচিয়ে বললেন, "আমরা এখন কাজ শুরু করব। প্রথমত আমরা বলতে চাই যে ওয়াং এবং ফেংল্যান্ স্বেচ্ছায় দুজনে দুজনকে নির্বাচিত করেছে। তারা একসঙ্গে কাজ করত এবং একে অন্যের কর্মক্ষমতা দেখে আকৃষ্ট হয়। তারা প্রেমে পড়ে এবং দুজনে বিয়ে করবে স্থির করে। আপনারা সবাই জানেন মাঠের কাজে ফেংল্যানের হাত কত ভাল। সে বাড়তি ফসল উৎপাদন ও খরচ কমানোর জন্য সরকারের আবেদনে সাড়া দিয়েছে—তাই সে মূর্খের মতো যৌতুকে টাকা খরচ করে নি……"।

"ওদের বলতে দিন ওরা কি ভাবে পরস্পরের প্রেমে পড়েছিল," এক ছোকরা চাষী চেঁচিয়ে বলল। "কনেকে অভিনয় করে দেখাতে বলুন!" অন্য অতিথিরা হাসতে হাসতে দাবি জানাল।

এই ধরনের আনন্দ উল্লাসের মধ্যে কুচকুচে কাল গোঁফওয়ালা প্রায় চল্লিশ বছর বয়স্ক একটি লোক একটি বাছুরকে তাড়া করে নিয়ে উঠোনে এসে দাঁড়াল। ইনি হলেন ফেংল্যানদের গ্রামের প্রধান লো সুতরাং বর তাকে অভিনন্দন জানাতে এগিয়ে এল।

"আপনি বাছুরটাকে এনেছেন কেন?" ওয়াং প্রশ্ন করল।

"এটি ফেংল্যানের যৌতুক," লো সহাস্তে উত্তর দিলেন। এরপর তিনি ওয়াং-এর মাকে ডেকে বললেন: "কনের বাবার পাঠান উপহারটি এসে দেখুন!"

বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি উঠোনে নেমে এলেন। একজন অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে একটি চক্‌চকে মোটা বাছুর দেখে তিনি বুঝতে পারলেন না যে এটা দিয়ে কী করা হবে।

"এই বলদটি ফেংল্যানের," লো বললেন। "এখন ফেংল্যান্ ওয়াংকে বিয়ে করে আপনাদের সঙ্গে থেকে কাজ করবে। ওর বাবা জানেন যে আপনাদের একটিও হালের বলদ নেই—যা না থাকলে চাষ করা খুব কষ্টকর। তাই তিনি এই বাছুরটিকে যৌতুক পাঠিয়েছেন……"

ওয়াং-এর মা কখনও বলদের মালিক ছিল না। সে বাছুরটির মাথায় আদর করার জন্য সলজ্জভাবে হাতখানি এগিয়ে দিল। বাছুরটি নির্বিকারভাবে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে সামনের পা-দুটো মাটিতে ঠুঁড়তে লাগল। পশুটির গায়ের লোম পিঙ্গলবর্ণ হলেও বুকের কাছটা ছিল সাদা। একবার দেখলেই বোঝা যায় যে এই সুন্দর ও শক্তিশালী বাছুরটি কেমন কাজে লাগবে!

আনন্দে আত্মহারা বৃদ্ধার দন্তবিহীন মুখখানি হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। কিন্তু হঠাৎ তার মনে এক দুশ্চিন্তা দেখা দিল।

"আমার ছেলে বাড়িতে কাজ করে না, তা ছাড়া আমি কখনও বলদ রাখি নি," তিনি চিন্তিতভাবে বললেন, "এটা আমাদের খুব বিপদে ফেলবে।"

চাষীরা হেসে উঠল এবং চু বললেন: "আপনি নিশ্চয়ই আনন্দে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন! আপনি কি ভুলে গেছেন যে আপনার নতুন বৌ একজন আদর্শ কর্মী?"

"ফেংল্যান নিজ হাতে এই বাছুরটিকে বড় করেছে," লো বললেন।

কয়েকজন বয়স্ক ব্যক্তি প্রাণীটিকে আদর করার জন্য চারদিকে জড়ো হলেন। বাছুরটির মুখের মধ্যে তাকিয়ে, পায়ের ক্ষুরগুলি পরীক্ষা করে তারা পেছনের লোমশ জায়গায় হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলেন। এইভাবে যৌতুক পাওয়া বলদটিকে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হল।

যে-মেয়ে বাছুরটিকে বড় করেছে, সমবেত চাষীরা তার প্রশংসা করতেও ভুল করল না। "একজন আদর্শ কর্মী নিশ্চিতভাবেই সব কাজ সুষ্ঠুভাবে করে থাকেন।" তাঁরা বললেন।

"আমরা এই গ্রামের লোকেরা একজন নামকরা নতুন কর্মীকে আমাদের মধ্যে পেয়ে নিজেদের ভাগ্যবান বলে মনে করতে পারি," মহিলা সমিতির সভানেত্রী কয়েকজন সভ্যকে বললেন, "এখন আমরা পূর্ণোদ্যমে সময়-অনুযায়ী উৎপাদনের কাজ সুরু করতে পারব।"

"আমরা কেন এই ধরনের যৌতুকের কথা কখনও ভাবিনি?" একজন মহিলা বিস্ময়ের ভঙ্গীতে বললেন। "আমাদের যখন বিয়ে হয়, তখন আমরা যে-সমস্ত জিনিষ নিয়ে এসেছিলাম সেগুলি ছিল জড় ও অকেজো! এরকম একটা জ্যান্ত কেজো উপহারের সঙ্গে সেকেলে উপহারের তুলনা হয় না।"

আনন্দ উৎসবের মধ্যে অভ্যাগতগণ বারবার ওয়াংএর মাকে কিছু বলতে বললেন। "আপনাদের পরিবারে একজন নতুন লোক এল" তারা হাসতে-হাসতে বললেন। "এই আনন্দের দিনে আপনাকে অবশ্যই কিছু বলতে হবে!" তাঁরা বৃদ্ধাকে পুত্র ও পুত্রবধূর সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করলেন।

মা হাসিমুখে ওয়াং, ফেংল্যান্ ও তাদের ঘিরে বন্ধুবান্ধব যারা বসেছেন—সবার দিকে তাকাল। সে নিজের মনে ক্রমশই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ছিল। শেষে বলল: "যদিও আমার মন পুরোন ভাবধারায় গঠিত, তবু আমি বুঝতে সুরু করেছি। এখনকার নতুন যুগে নতুন পথে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।..."

অনুমোদনের হাসি ও ধ্বনি দিয়ে তার কথাগুলিকে অভিনন্দিত করা হল।

তখন থেকে জনসাধারণ এই নতুন কায়দায় বিয়ের কথা আলোচনা করতে লাগল।

অনুবাদ: শচীন সেন

New Times, New Method by Ku Yu

আকাকি বেলিয়াশভিলি

অদৃষ্টের পরিহাস

সুপরিচিত জর্জীয় লেখক আকাকি বেলিয়াশভিলি (জন্ম ১৯০৩) রেখাচিত্র ও ছোট গল্প লিখতে শুরু করেন সতেরো বছর বয়সে। তাঁর কয়েকটি ছোট গল্প সংগ্রহে বর্ণিত হয়েছে প্রাক্-বিপ্লব ও আধুনিক জর্জিয়া।
কয়েকটি উপন্যাসও তিনি লিখেছেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ঐতিহাসিক উপন্যাস "বেসিকি", আঠারো শতকের প্রখ্যাত জর্জীয় কবি ও নাগরিক ভিসসারিওন গাবাশভিলির জীবন কাহিনী এটি। তাঁর ছদ্মনাম ছিল "বেসিকি"।

মেঠো পথে অন্যমনস্কভাবে চলেছে কারামান মুখেইজে, নানা চিন্তার ভিড় তার মাথায়। রাস্তাটা তার নখদর্পণে, প্রতিটি আটঘাট। চালি থেকে পিৎসুন্দা আর লাতফার থেকে উৎভিরি পর্যন্ত রাস্তায় এমন কোনো পথ নেই যাতে সে একবার না একবার চোরাই ঘোড়া নিয়ে যায় নি। পুরনো খাসা সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়াতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল সে। সারা মুলুকে তার মতো ঘোড়াচোর আর ছিল না। তার তুলনায় সাৎসি খ্ভিতিয়া* নগণ্য। খাস শয়তানও কারামান মুখেইজে'র মতো ধূর্তভাবে ঘোড়া লুকোতে পারে না! ঘোড়া হারিয়ে গেল, পাত্তা আর মিলল না—সবাই বুঝত এটা কারামানের কারসাজি। কিন্তু করবার কিছু তাদের ছিল না, কারামান মুখেইজে'র বিরুদ্ধে টুঁ শব্দ করার মুরোদ কার?

সত্যি, কারামানের পক্ষে দিনগুলো ছিল খাসা, নেচে কুঁদে বেড়াবার দিন।

এখন ওরা ঘোড়া গণনার একটা ব্যবস্থা চালু করেছে। টাকার শ্রাদ্ধ! টাকাটা পেলে কারামান বড় লোক বনে যেত। গণনার বালাই না করে

আশেপাশের অনেক দূরের প্রতিটি ঘোড়ার কথা বলে দিতে পারত সে—কার কত বয়স, কী রং, কী ছাপ গায়ে। প্রত্যেকের বংশাবলী, ক'বার ঘুড়ীগুলো বাচ্চা দিয়েছে, সব তার জানা। এমন কি কারা বাচ্চা দেবে সেটা পর্যন্ত। যা কিছু জানার আছে সব তার নখদর্পণে।

আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করল কারামান। সময় বদলেছে। পেশা ছেড়ে দিতে হয়েছে বছর দশেক হল। জোর কদমের ঘোড়া তো দূরের কথা, ফিরফিরে কোনো ঘোড়াতে হাত দেবার উপায় নেই এখন। তখন ঘোড়া হাতানো আর হাতানোর সমস্ত চিহ্ন ঢেকে রাখা ছিল সহজ ব্যাপার—এখন চেষ্টা করে দেখুক দিকি। বলশেভিকরা বড়ো ভারিক্কি লোক, তাদের ব্যবস্থাপনা অন্য ধরনের। এখন কারামানের কাছে পড়ে আছে শুধু মধুর স্মৃতি। তার ব্যবসার ধ্বজা ছিন্নভিন্ন।

এ ধরনের চিন্তায় মশগুল হয়ে কারামান ভারি পায়ে চলেছে। নাবায়দেভ পাহাড়ের মাথা পেরোচ্ছে এমন সময় বনের ধারে চোখে পড়ল একটা অশ্বতর, ডিমের মতো সুডৌল আর মসৃণ।

অভ্যাসবশে চট করে চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল কারামান। কেউ নেই। তারপর ভালো করে তাকাল জানোয়ারটার দিকে।

ওটার তাকে ভ্রূক্ষেপ নেই, ঘাস ছিঁড়ে চলেছে।

কাছে এসে পাছায় হাত বুলিয়ে পা দুটো পরীক্ষা করে দেখে কারামান তারিফের চোটে পিছিয়ে গেল এক পা।

"ওরে বাবা! কী নিরীহ বুদ্ধিমান জীব!" মনে মনে বলে উঠল কারামান। "কী চকচকে আর হৃষ্টপুষ্ট! তাছাড়া কাঁচা বয়স। অবশ্য খচ্চরের বয়সে কিছু এসে যায় না, তবু···"

জন্তুটা তখন লেজের ঝাপটে মাছি তাড়িয়ে ঠিক ভেড়ার মতো শান্তভাবে ঘাস চিবোতে ব্যস্ত। আর একবার চারদিক দেখে নিল কারামান। বুকটা টিপটিপ করছে। চুরির জন্য নিজেকে এগিয়ে দিয়েছে এমন একটা জানোয়ার আগে সে দেখেছে বলে মনে হল না।

কথাটা ঝিলিক দেবার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল ঘোড়াচুরির সেই পুরনো আবেগ যেটা দশ বছর তাকে বিচলিত করেনি।

"হতচ্ছাড়া খচ্চরটাকে নেকড়েরা খায় না কেন! কেন বেটা আমার পেছনে লেগেছে! আমাকে দিয়ে চুরি করাতে চায়? কী করি? বুকটা চমড়ে দিচ্ছে

একেবারে। ওটাকে ছেড়ে চলে যাব? কিন্তু তাহলে আজ রাতেই বুক ফেটে যাবে। দশটা বছর কোনো জানোয়ার চুরি করিনি, সৎ হয়ে গিয়েছি ভেবে সবাই আমাকে সমীহ করে। আর এটার জন্ত মুখে চুন কালি দেব! না! থাক বেটা এখানে, খুনে কোথাকার।"

কারামান রাস্তায় ফিরে গেল। জন্তটা প্রশান্তভাবে ঘাস চিবোচ্ছে। পাঁচ পা ফেলার আগেই কিন্তু কারামানের হাঁটু মুচড়ে যাবার জোগাড়, ঘুরে আবার জন্তটার মুখোমুখি হল সে।

'বেটা দাঁড়িয়ে আছিস কেন? হতচ্ছাড়া বাউণ্ডুলে কোথাকার! আর কেউ একটা এসে পড়লে বাঁচি!' অসহায়ভাবে চারদিকে তাকাল কারামান। 'তাহলে আমার মনটা স্থির হয়। বসে কিছুক্ষণ দেখি। হয়ত কেউ এসে পড়বে।'

বসে ঘাম মুছে সিগারেট ধরাল সে। কিন্তু কপাল খারাপ, রাস্তায় কারোর দেখা নেই। জানোয়ারটা ঘাস খেয়ে চলেছে। দু-একবার সামনের পা বাড়িয়ে নাকটা ঘষে নেওয়া হল। ফিরে দেখল কারামনকে, যেন এই প্রথম নজরে [illegible]ড়েছে। তারপর আবার ধীরে সুস্থে ঘাস চিবোতে লাগল।

'বেটার ধর্মভয় বলে কিছু নেই!' ফেটে পড়ল কারামান। 'তিথিরিঙ [illegible]সে দূর থেকে তোকে দেখছি বলে মস্করা করা হচ্ছে? আমাকে নিয়ে [illegible]ত দিলে সারা দুনিয়ায় আমার বদনাম রটবে। বেটা দেখছি আমাকে [illegible]বেই। দোষটা ওর, আমার নয়।'

[illegible]য়ে উঠে কারামান কয়েকটা পাতলা ডাল কেটে পাকিয়ে দড়ি [illegible]সটা এবং নিজের বেল্ট দিয়ে লাগাম গোছের একটা জিনিস [illegible]র সেটা নিয়ে গেল জানোয়ারটার কাছে।

[illegible]া বন্ধ করল না সে।

[illegible]। দেখছিস না আমার হাতে লাগাম! পালা বলছি! [illegible]বেশ, তাহলে আর কী! আহা মরি, বাছাকে দেখ একবার! [illegible]াথাটা অন্তত একবার বাঁকা! এত ভালোমানুষ হওয়া ভালো [illegible]তোর ব্যাপার! বেশ, তোর যা মর্জি! চল, তাহলে!'

[illegible] কারামান জন্তটার পিঠে চেপে চলল বনের মধ্যে।

[illegible]স জানোয়ার! কী নধর! দাম হবে অন্তত পাচ হাজার। [illegible] পকেটস্থ। জীবনে এমন ভালোমানুষ দেখিনি। আর

চলার ভঙ্গিটা দেখ দিকি! আর কী চকচকে! যেটার জন্য অবশ্য পাপী হতে হল, কিন্তু এরকম একটা খাসা জিনিসের জন্য পাপ করাটাও পাপ নয়।'

প্রত্যেকবার ঘোড়া চুরি করে যে-সমস্তায় কারামান পড়েছে সেটা হল কোথায় লুকিয়ে রাখা যায়। এ ব্যাপারে তার নিজস্ব নিয়মকানুন আছে: যদি আথখাজিয়ায় নিয়ে যাবার উদ্দেশ্য থাকে তাহলে সে যাবে বিপরীত দিকে, যেন যাচ্ছে কাখেতিয়ায়। যদি রাচে'তে বেচবার মতলব থাকে তাহলে ভান করবে বাগদাদিতে যাচ্ছে।

এবারও তাই করল কারামান। সটান রাস্তার দিকে না গিয়ে গেল বনের পথে; ঠেকে তার শেখা যে পাশ পথ অনেক নিরাপদ, তাতে গন্তব্য যতটা তাড়াতাড়ি পৌছনো যায় ততটা হয় না সড়কে। যে-পথটা ধরল সেটা তার খুব চেনা। পথটা একটা কাঁটা ঝোপ পেরিয়ে, বহুদিন পরিত্যক্ত একটা শীতের রাস্তা ছেড়ে নেমেছে দুৰ্জ্জেভস্ত ব্রিজে। আসল কথা হল ব্রিজটা পার হওয়া। পার হলে নিশ্চিন্তি।

চুরির পরিকল্পনা আগে থেকে করলে কারামানের মন ধীরস্থির থাকত, কেননা পালিয়ে যাবার পথ নিয়ে তখন মাথা ঘামাতে হত না। কিন্তু ঝোঁকে মাথায় জানোয়ার পাকড়ালে প্রথমে জানা দরকার সেটা কার, তাহলে কো[illegible] দিক দিয়ে ওটার খোঁজে লোক আসবে বোঝা যায়। মালিক কে [illegible] থাকলে অনেক বিপদের সম্ভাবনা।

তাই বন হয়ে যেতে যেতে কারামান ভেবে বের করার চেষ্টা[illegible] মালিক কে হতে পারে।

একটা ব্যক্তিগত সওয়াল দিয়ে সে শুরু করল: 'তুই কা[illegible] কালা নাকি তুই! তোকে কে খাইয়েছে, জল দিয়েছে? [illegible] কোথায়? নাঃ, মুখে রা পর্যন্ত কাটছে না দেখছি। গা[illegible] দেখছি না, জানার উপায় নেই······দেখছি দশ বছরের আল[illegible] আমার। কার হতে পারিস তুই? হেঁয়ালি-বটে! দাঁড়া দাঁ[illegible] মনে হচ্ছে! বুদ্ধিশুদ্ধি এখনো কিছু আছে দেখছি। তোকে [illegible] তুই হচ্ছিস আমব্রসি পাদরীর খচ্চর! পাদরী বেশ গুছিয়ে[illegible] তাই না? এরকম একটা মাল বাগিয়েছে! ছেড়ে শয়তা[illegible] পেশা ছাড়েনি। সময় বদলেছে, কিন্তু তাতে ওর কী? এ [illegible] লম্বা চুল কেটে ফেলেছে অনেক দিন, কিন্তু আমব্রসি[illegible]

নাস্তিক! আজকালকার দিনে খচ্চর নিয়ে ওর কদরটা কী? গির্জেয় বিয়ে হয় না, নামকরণ হয় না, পুজোয় যেতে হয় না, তবু তোকে ছাড়বে না, আগেকার দিনের হোমরা-চোমরা লোক যেমন কখনো নিজের ছোরা হাতছাড়া করত না। তোকে দেখে তো যে-কেউ বলতে পারে তুই একদম বেকার, চেহারাটা তো দেখছি রাজকুমার সেবেতেলির বিধবা বউয়ের মতো মধুর!'

এইসব চিন্তায় মগ্ন হয়ে কারামান পাহাড়ের বন-ছাওয়া ঢালু বেয়ে নেমে পৌঁছল প্রনা নদীর তীরে। জানোয়ারটা বেশ কদমে পা চালিয়েছে, যেন পিঠে কাউকে চাপিয়ে বেশ খুশি। কারামানের পুলক দেখে কে!

'কি সুন্দর জন্তু! জীবনে তোর মতো খচ্চর হাতে পড়েনি। ট্রেনের মতো? না, ট্রেন নয়। মোটরগাড়ি? না, তাও নয়। ও সবের সঙ্গে তোর তুলনা করা মানে তোকে হেনস্থ করা। তুই হচ্ছিস একটা হাওয়াই-জাহাজ, ঠিক তাই, হাওয়াই জাহাজ! তুই তো কদমে পা ফেলিস না, উড়ে যাস! তুই চুরির মাল না হলে তোকে কখনো ছাড়তাম না, দুনিয়ার কোনো কিছুর বদলে ছাড়তাম না!'

ঝোপঝাড় এত সুকৌশলে ঠেলে, জেয়ানার মধ্য দিয়ে এত হালকাভাবে মতো জন্তুটা এত উৎসাহে চলতে লাগল যে গতিবেগ কমল না মুহূর্তের জন্য। মস্করা করে নির্লজ্জ, তোকে বেচতে গিয়ে যে কেঁদে ফেলব তাতে তোর শরম হচ্ছে দিয়ে চুরি করওয়ালা একটা মানুষ কেঁদে ফেলবে দেখে লোকে বলবে কী? তোর অভ্যাস না? না?'

দ্রেভেভরস্ত ব্রিজে পথটা শেষ হল। ব্রিজ পেরোলে কারামানের পিছু ধাওয়া কেউ করবে না, কেননা ওখান থেকে চতুর্দিকে রাস্তা গিয়েছে, কোন রাস্তা সে নিয়েছে তা কেউ জানতে পারবে না।

বেশ ভারসা নিয়ে ব্রিজ পর্যন্ত গেল কারামান, ওপারে গিয়ে কখন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবে। কিন্তু হঠাৎ ওর হাওয়াই-জাহাজের মতো অশ্বতর থেমে গেল।

'কী হল? ক্লান্ত বুঝি?' তোক দিয়ে জিজ্ঞেস করল কারামান।' এই তো ব্রিজটা শুধু পার হব, তারপর তুই জিরিয়ে নিস। ওখানকার ঘাস এত মিষ্টি যে আমারো মুখে বেশ রুচবে মনে হচ্ছে।'

হালকাভাবে গাছের ডালটা তুলল সে তার কোনো সন্দেহ নেই যে কয়েক মুহূর্ত পরেই ওপারে ও পৌঁছিয়ে যাবে, পৌঁছবে গভীর বনে তীক্ষ্ণ সব দৃষ্টির আড়ালে।

একচুল নড়ল না জানোয়ারটা। অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল কারামান।

'ওহে, থেমে যাবার মানেটা কী শুনি? ও, বুঝেছি! একটু ইয়ার্কি করা হচ্ছে! কিন্তু দোহাই বাপু, ওটি করিস না তোর মায়ের দিব্যি! ঠাট্টা ইয়ার্কির সময় নয় এটা। কেউ হয়ত এসে পড়বে এখখুনি। চল্, সাঁকোটা পার হই, চল!'

এমন কি কান পর্যন্ত নাড়াল না জন্তুটা। সামনের পা দুটো ব্রিজের পাটাতনে রাখল। এখান থেকে নড়ার মতলব যে নেই সেটা স্পষ্ট।

'অনেক হয়েছে! খোলামেলা জায়গায় আমাকে চেঁচাতে হবে নাকি? তোর লজ্জা বলে কিছু নেই? সারা পথ তোর তারিফ করেছি, করিনি? জুতোর ডগায় জন্তুটাকে হালকা সুড়সুড়ি দিয়ে, তোক দিতে দিতে বলল কারামান।

লেজ দিয়ে মাছি তাড়াতে তাড়াতে গ্যাঁট হয়ে দাঁড়িয়ে রই লজন্তুটা।

'হয়েছে! চল! ভাবিস না আমি চটতে পারি না! এবার গলা উঁচিয়ে বলল কারামান। 'যদি আমাকে ভালোবাসিস তো চটাস না বলছি! চল!'

কিন্তু জন্তুটা নাছোড়বান্দা হবে বলে ঠিক করেছে। কানদুটো নাড়িয়ে লেজটা আরো জোরে বাঁকাল সে।

তুই চাস বুঝি এখানেই রাত কাটাই? কানদুটো খোড়া হয়েছে দেখছি। নিজেকে কী ভাবিস বল তো? শোন, আমি একবার রাজকুমার সুলুকিজের ঘোড়াকে চাবকেছিলাম! চল বেটা, যা বলছি কর!'

ধৈর্য হারিয়ে কারামান গাছের ডাল দিয়ে জন্তুটাকে বেশ জোরে এক ঘা বসাল।

রেগে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে সে আরো জোরে পাটাতনে পা ঠেসে দাঁড়াল।

'বেটা বেইমান! তোর সঙ্গে রাগারাগির ইচ্ছে নেই, কিন্তু তুই বাধাচ্ছিস সেটা। চল বলছি! নইলে এমন একটা পেঁদানি খাবি যা আমার সবচেয়ে বড়ো শত্রুরও যেন কখনো খেতে না হয়! তবে রে!'

মিনিট দশেক কারামান সপাসপ মেরে চলল জন্তুটাকে, কিন্তু তাতে জানোয়ারটা আরো একরোখা হয়ে একচুল নড়ল না।

কারামান একটু জিরিয়ে নিল। চাবকে কিছু লাভ হবে না জেনে আবার মিষ্টি কথায় ভোলাবার চেষ্টা করল সে।

'দেখ, আমার দশাটা দেখ। তোর লজ্জা বলে কিছু নেই? আমার গর্ব আছে আর তুই দুনিয়ার সামনে আমাকে অপদস্থ করছিস! আয় ব্রিজটা পার হই! ভয়াবার কিস্সু নেই। পড়বি না। আচ্ছা, আমিই প্রথমে যাচ্ছি,

যদি তাই চাস তুই। ব্রিজের ওপর দিয়ে ট্রাক চলে আর তোর ভার সইতে পারবে না এটা?'

জন্তুটার পিঠ থেকে নেমে যেমন-তেমন সেই লাগামটায় টান দিতে লাগল কারামান। একবার ধমকায়, একবার মিষ্টি কথা বলে। কোনো লাভ নেই। নড়ল না জন্তুটা।

মেজাজ চড়ে গেল কারামানের। ভীষণ চোখ পাকিয়ে সে তাকাল তার দিকে, লড়িয়ে মোরগের মতো।

'তুই ভাবছিস আমি ল্যা-চুলো পুরুতঠাকুর, লোক হাসাবি? তোকে ব্রিজ পার না করাতে পারলে আমার নাম কারামান মুখেইজে নয়। আমাকে এখনো চিনিসনি দেখছি।'

চারদিকে তাকাতে একটা শক্ত লাঠি নজরে পড়ল রাস্তার মাঝখানে, ঝট করে সেটা তুলে নিল কারামান। সে যাতে পিঠে না চাপতে পারে তৎক্ষণাৎ তার ব্যবস্থা করল জানোয়ারটা। পা ছুঁড়ে শুরু করল লাফাতে। কিন্তু এ ধরনের ছেলেমানুষী ফিকিরে ঘাবড়াবার পাত্র নয় কারামান। কিছুক্ষণ পরে কষ্টে সে তার পিঠে চেপে লাঠিটা উঁচিয়ে ধরল।

'এইবার দেখ!' চেঁচিয়ে বলে প্রাণপণ শক্তিতে লাঠিটা বসাল জন্তুটার পাছায়।

কাতরে উঠে জন্তুটা পেছনের পা দুটো ছুঁড়ল।

'চল বেটা!' আর এক ঘা বসাল কারামান।

আবার কাতরে উঠল সে, কিন্তু নড়ল না একচুল।

কারামান তখন পাগল হয়ে গিয়েছে, প্রাণপণে মারতে লাগল তাকে।

শুয়োরের মতো চেঁচিয়ে উঠে পিঠ থেকে তাকে ঝেড়ে ফেলার জন্য পা দাপাতে লাগল জন্তুটা। শেষ পর্যন্ত যন্ত্রণা আর সইতে না পেরে এত জোর ঝটকায় ঘুরল যে আর একটু হলে কারামান পড়ে যেত। তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে লাগল সে। চড়াই উতরাই, খানা-খোঁদল আর বন, কিছুতে এসে যায় না, জোর কদমে সে দৌড়ল। ঝুলে পড়া ডালপালায় চোখ উপড়ে না যায়, শুধু সেটা দেখা ছাড়া আর কিছু করার উপায় নেই কারামানের।

জন্তুটাকে থামাবার যত চেষ্টা সে করছে তত জোরে দৌড়চ্ছে সেটা। শেষে ওটার সামনের পাগুলোর নিচে পায়ের ডগা বসাতে পেরে আগের চেয়ে নিরাপদ বোধ করে হাঁফ ছাড়ল সে।

'দৌড়, দৌড়, আহাম্মক কোথাকার!' বিড়বিড় করে সে বলল। 'থামতেই তো হবে তোকে। কতক্ষণ আর দম থাকবে। আমার হাত থেকে ছাড়ান পাবি না!'

হঠাৎ একটা ভাঙা পাথরের দেয়াল হালকা পায়ে পার হয়ে জন্তুটা একটা বাড়ির খিড়কিতে ঢুকে দরজার সামনে দাঁড়াল।

দরজা খুলে গেল, বেরিয়ে এসে আমব্রসি পাদরী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল কারামানের দিকে।

হতভম্ব হয়ে বসে রইল কারামান।

নড়বড়ে সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত তার কাছে এল পাদরী। বিড়বিড় করে বলল, 'তুমি নাকি, কারামান?'

"হায়, কারামান না হয়ে যদি আর কেউ হতাম", মনে মনে বলল ঘোড়াচোর।

'বেশ করেছ, বাছা! হতচ্ছাড়া জানোয়ারটাকে কোথায় পেলে? মাসখানেক হদিস মেলেনি। কত জায়গায় না খুঁজেছি···নামো, নেমে পড়। বেটা তোমার ধকল করেছে দেখছি। বেজায় ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমায়।'

নেমে কারামান পাদরীর দিকে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকাল, পরাজিত জেনারেলের মতো আবছা সে দৃষ্টি। সত্যি, চোরাই খচ্চর নিয়ে হাতেনাতে ধরা না পড়াটা হাঁফছাড়ার মতো ব্যাপার, তবে লজ্জাকর পরাজয়ের একটা বোধ তাকে পেড়ে ফেলেছে।

'বেটা বদমাসকে পেলে কোথায়?' আনন্দে বকবক করে চলেছে আমব্রসি। 'দেখ তো, নিজে চরে চরে কেমন নধর চেহারাটা বাগিয়েছে! একগুঁয়ে জন্তটাকে বাড়িতে কী করে ফিরিয়ে আনতে পারলে বল তো? তাজ্জব কাণ্ড! অনেক ধন্যবাদ, বাছা! তোমার এ উপকার কখনো ভুলব না!'

অশ্বতরের দিকে তাকাল কারামান, বলল না কিছু। ব্যাপারটা কী ভাবে ঘটে তার নিজেরো ঠিকমতো জানা নেই।

আর জানোয়ারটা প্রশান্তভাবে ঘাস চিবোতে চিবোতে লেজ দিয়ে ভনভনে মাছি তাড়াতে লাগল।

অনুবাদ: সমর সেন

চৈত্র, ১৩৭১

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র : ভিয়েৎনাম

সোয়াইৎজার : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

দেবেশ রায়ের উপন্যাস

ব্যক্তিমানুষ ঃ মার্কসীয় ধারণা ঃ আদাম শাফ

চারুলতা প্রসঙ্গ ঃ পাঠকদের মতামত

সংস্কৃতি-সংবাদ, পুস্তক-পরিচয়

বর্ষ ৩৪ । সংখ্যা ৯
চৈত্র, ১৩৭১

সূচীপত্র

প্রচ্ছদপট : সুবোধ দাশগুপ্ত

সম্পাদক

গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

পরিচয় (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

একটি শতবার্ষিকীর জন্য

(অ্যালবার্ট শোয়াইৎজার, জন্ম ১৮৭৫)

আরো দশ বছর যদি আমরা বাঁচি, আমাদের সময়ের একজন মানুষের একশো বছর বয়স উপলক্ষে নিবিড় একটি জন্মদিন যাপন করবো। সেজন্য এক দশকের নিরন্তর প্রস্তুতি দরকার। যদিও বাংলা ভাষায় তাঁর নামের বানান বা উচ্চারণ কী ভাবে করবো সে বিষয়েও এই মুহূর্তে আমার অন্তত ধারণা নেই কোনো। শোয়াইৎজার তাঁর কিশোরকাল বাহিত করেছেন সেই উপত্যকায় যেখানে ফরাসি-জর্মন জীবনধারা মিশে আছে। যুগ্মসংস্কৃতির এই সন্তান ঐ উত্তরাধিকার সম্পর্কে সচেতন। তাই তাঁকে বলতে হয়েছে 'ফরাসি ভাষা যেন সুন্দর পার্কের বিন্যস্ত রাস্তা, আর জর্মন ভাষা যথেচ্ছ বিহারের মহারণ্য।'

শেষে একদিন সত্যিই এই মানুষটি স্বস্তিমসৃণ উদ্যান থেকে বেরিয়ে পড়লেন দারুণ সুন্দর অরণ্যে। যখন চতুর্দিক থেকে নিরাপত্তা তাঁকে বেষ্টন করেছে, তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন নিরক্ষ আফ্রিকার জঙ্গলের ডাক্তার হবেন। তিরিশ বছর বয়সের জন্মদিনে এরকম শপথ গৃহীত হয়েছিল। তাই অবৈধ কৌতূহল জাগে, ভাবতে ইচ্ছে করে বুঝি-বা কোনো বানানো বিষাদে অথবা মুহূর্তের উত্তেজনায় ঐ উৎসর্গবাসনা পোষণ করেছিলেন শোয়াইৎজার। নাকি বীরপুরুষের মতো তাঁকে দেখাবে, এটাই অভিপ্রেত ছিলো তাঁর! আমাদের এই সমস্ত গোপন অনুমান অকস্মাৎ নিরস্ত করে তিনি বলে উঠেছেন, কার্লাইলের Heroes and Hero Worship তেমন কিছু গভীর গ্রন্থ নয়; আসলে অঘটনঘটন বীরের ধর্ম নয়, আত্মত্যাগ আর আহুতির মধ্যেই যথার্থ বীররস। উৎসর্গিত এ রকম পুরুষও, তাঁর মতে, পৃথিবীতে অনেক, অথচ খুব কম জনই তাঁদের জানে।

নিজে তিনি দ্বিতীয়োক্ত পর্যায়ের আশ্চর্য পুরুষ, অগোচরে বীরের দায়িত্ব বহন যাঁর অভিপ্রায় ছিলো। এবং আজ যখন সারা জগৎ তাঁর নামের নিশান তুলে ধরেছে, তখনো কি তিনি শিকড়ের সাংকেতিকতায় প্রচ্ছন্ন নন? শিল্পী, না সংস্কারক? দার্শনিক, না ধার্মিক? কী তাঁর পরিচয়? নাকি সব মিলিয়ে একটি সর্বাঙ্গীন পরিচিতি যার কল্পনা করার স্পর্ধাও আজ আর নেই আমাদের।

তাঁর জীবনের এক-একটি ঘটনায় সংজ্ঞাতিগ ঐ সর্বতা মুদ্রিত হয়ে আছে। পুত্রহারা এক বৃদ্ধা নদীর তীরে পাথরে বসে কাঁদছেন, শোয়াইৎজার তাঁকে হাত ধরে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে দেখলেন সেই কান্নার শেষ নেই, হঠাৎ অনুভব করলেন সূর্যাস্তের পড়ন্ত আলোয় দুজনেই একসঙ্গে অঝর কান্নায় ভেসে যাচ্ছেন। আরেকবার একটা স্টেশনে সস্ত্রীক তিনি ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছেন, সঙ্গে প্রচুর মোট। একটি পঙ্গু লোক এগিয়ে এসে বলল, সাহায্য করবে। প্রখর দুপুরে ভিড় ঠেলে সে যখন মালপত্র নিয়ে চলতে থাকলো, শোয়াইৎজার সেই স্মৃতির মর্যাদা রাখবেন বলে স্থির করলেন ভবিষ্যতে ভারি বোঝা নিয়ে কাহিল কারুকে দেখলে তিনিও সাহায্য করতে এগিয়ে যাবেন। একবার উল্টো ফল হলো। বিপন্ন একটি লোকের ভার লাঘব করতে গিয়ে ছাখেন সে ওঁকে চোর ঠাউরেছে।

মনে পড়ে যায়, অনুষঙ্গের আংশিকতায়, আমাদের বিদ্যাসাগরকে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনের সমস্ত খসড়া যেন উন্মুক্ত যার প্রতিটি পৃষ্ঠা আদর্শ উদাহরণের মতো ব্যক্ত হয়েছে। শোয়াইৎজার, আমাদের অপর আপনজন, আত্মার তিমিরাভিসারের ভিতর দিয়ে প্রতীকের সাহায্যে রৌদ্রে এসেছেন। এবং ঐ পরিণতির প্রসাদগুণ সত্ত্বেও তাঁর জীবনে অতি সাধারণ এবং অত্যন্ত সুগোপন মানবিক গুণাবলী জড়িয়ে আছে। গ্রেহাম গ্রীনের কোনো উপন্যাসে তাই শোয়াইৎজারের আদলে এমন একটি সাধারণত্বে অসাধারণ মানুষকে আঁকা হয়েছে যার বিষয়ে এরকম উপকথা গড়ে উঠেছে, বনের মধ্যে গিয়ে পলাতক কুষ্ঠরোগীকে সারারাত বৃষ্টির মধ্যে বুক দিয়ে আগলেছেন। আর, আশ্চর্য, তাঁকেই সবাই ভুল বুঝছে।

শোয়াইৎজার বলবেন, ভুল বুঝুক, তবু মানবজীবনের একেবারে গোড়ার কথা সত্যকাম অঙ্গীকার। ধর্মতত্ত্বের পাঠ নেওয়া সারা হলে তাঁর অধ্যাপক থিওবাল্ড যিগ্‌লার তাঁকে বললেন দর্শনশাস্ত্রে থিসিস তৈরি করতে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিঁড়িতে অধ্যাপকের ছাতির ছায়ায় সব কথা পাকা হয়ে গেল, তিনি সোর্বোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কান্টের ধর্মীয় দর্শন সম্পর্কে গবেষণা চালাবেন। কিন্তু প্যারিসে এসে অকস্মিতর আকর্ষণ হয়ে উঠলো যন্ত্রসংগীত। উম্মাদের মতো শিখতে থাকলেন অর্গ্যান, পিয়ানো। বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে এই সব যন্ত্রে অধিকার নিলেন, বুঝতে পারলেন অঙ্গুলি একাগ্র হয়ে স্পর্শভাষাকে যেমন করে গড়ে তুলছে, অদৃশ্যকে স্থাপত্যে আনতে হবে। এরি মধ্যে রাত্রি জেগে তাঁর গবেষণা চলল, দেখলেন কান্টের ধর্মীয় দর্শনে অমরতা সম্পর্কে কোনো মাথাব্যথা নেই, আছে পরিবর্তনের অনিশ্চয়তা। আছে গভীর চর্যা, নেই সামঞ্জস্য।

অথচ গভীরতাকে সহজের সামঞ্জস্যে অনুবাদ করাই সেদিন তাঁর কাছে প্রধান সমস্যা ছিল। ডক্টরেট অর্জিত হলো, দার্শনিক কান্ট থেকে শুরু করে সংগীতস্রষ্টা বাখ পর্যন্ত বিচিত্র বিষয়ে বই লিখলেন, কিন্তু কখন যে তিনি অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গের দ্বৈরথ মিটিয়ে আদিবাসীদের সেবায় আত্মদান করবেন বলে মনস্থ করেছেন, একজন চাপা প্রকৃতির বন্ধু ছাড়া আর কেউ সে কথা জানতেন না। অর্গ্যানগুরু উইডর তাঁকে পুত্রাধিক স্নেহ করতেন। যখন তিনি তাঁর এই প্রতিজ্ঞা শুনলেন, ভর্ৎসনা করে উঠলেন: 'তুমি কি যুদ্ধের গোলাবারুদের মধ্যে একখানা রাইফেল ঘাড়ে করে সেনাপতি সাজতে চলেছো?' একজন রীতিমতো আধুনিকা প্রমাণ করতে চেষ্টা করলেন: 'আদিবাসীদের জন্য জীবন না সঁপে বক্তৃতা দিলেই তো ব্যাপারটা ভালোভাবে চুকে যায়। গ্যেটের ফাউস্টের ঐ কর্মযোগের বচন এখন বাতিল। এ যুগে প্রোপাগাণ্ডাই সব ঘটাতে পারে।' আরো বাধা ছিলো। থিওলজিক্যাল সেমিনারির অধ্যক্ষপদ না হয় ছাড়লেন, কিন্তু ডাক্তারি না জেনে ডাক্তার হবেন কী করে? স্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাত বছর ধরে চিকিৎসাশাস্ত্রে অক্লান্ত অধ্যবসায়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করলেন। ঐ শাস্ত্রজ্ঞান যে বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, তাঁর রহস্যময় সমগ্রতার সঙ্গে গ্রথিত অভিজ্ঞতা, তার প্রমাণ ঐ সময়ে একই বছরে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ-দুটির বিষয়: 'ঐতিহাসিক যীশুর সন্ধানে' এবং 'জর্মন ও ফরাসি অর্গ্যান নির্মাণ ও অর্গ্যানবাদন।' ধর্মপ্রচারক পলের জীবনভাষ্য লেখবার অব্যবহিত পরেই অধ্যাপক ও প্রচারকের কাজ ছেড়ে দিলেন। যীশুর জীবনের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি খুঁজলেন, সে বিষয়ে অম্বেষী গ্রন্থ লিখলেন। আফ্রিকায় রওনা হলেন। ল্যাম্বারেনে পৌঁছে তিনি, তাঁর স্ত্রী শুক্লপক্ষের মানুষ

হিসেবে অবতীর্ণ হলেন এবং ঐ বন্দিদশাতেই সভ্যতার মর্মকথা সম্বন্ধে তাঁর ঐতিহাসিক গ্রন্থ শুরু করে দিলেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ। হাসপাতালের কাজ করতে অনুমতি পেয়েছেন, এবং কথঞ্চিৎ স্বাধীনতা। অগোয়ে নদী ধরে সূর্যদেবতা ন'গোমো-পূজার দেশে যেতে গিয়ে চকিতে উপলব্ধি করলেন তাঁর আপন দর্শন: জীবন সম্পর্কে মৈত্রীবিনয়, Reverence for life. নিজের জীবনপ্রসঙ্গে তিনি সেন্ট পলের অভিক্ষেপ বারংবার স্মরণ করেছেন, কিন্তু তাঁর সাদৃশ্যে সন্ত ফ্রান্সিসের নাম আরো বেজে ওঠে। ফ্রান্সিস পশুপাখির মধ্যে স্নেহসম্ভ্রম বিলিয়ে দিয়েছিলেন, শোয়াইৎজারও। দুজনেই মানবতার দেবায়তনের মধ্যে মূক বনপ্রাণীকে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন। শোয়াইৎজার তাঁর হৃদয়ের ঐ দয়াকে যুক্তি দিয়ে যাচাই করে নিতে ভোলেন নি, প্রসঙ্গত বারংবার সাক্ষী মেনেছেন প্রিয়তম সহপথী অ্যালবার্ট আইনস্টাইনকে। হৃদয়বান, যুক্তিশীল, সবার সঙ্গেই তাঁর আত্মীয়তা। তার্কিক ইয়াঙ্কি কিংবা স্বপ্নাতুর পাস্তেরনাক ঐ ব্যক্তিত্বেরই আমন্ত্রণে সমান সাড়া দিয়েছেন। এই সাযুজ্য বাইরেও ছড়িয়ে পড়ুক, তিনি কি নিজেও তা চান নি?

তাই কি বিজ্ঞানী বা রাষ্ট্রনায়ক সবার সঙ্গেই তাঁর মুখমণ্ডলের উপমা অমন বিভ্রান্তিকর! ট্রেনে একবার ওঁকে ছোটোরা ধরলো: 'ডক্টর আইনস্টাইন, অটোগ্রাফ দিতে হবে।' তৎক্ষণাৎ স্বাক্ষর দিলেন: 'অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের বন্ধু অ্যালবার্ট শোয়াইৎজার।' ষ্ট্রাসবুর্গের হোটেলে তাঁর আবক্ষ মূর্তি দেখে কোনো সভার জ্ঞানীগুণী সদস্যেরা বললেন: 'স্ট্যালিনের ঐ মূর্তি কেন ওখানে রাখা হয়েছে? ওটা সরিয়ে ফেলো।' তাঁর এক আত্মীয়ের কাছে ঐ মূর্তিটির প্রতিচিত্র দেখে এক ব্যবসায়ী নাকি বলেছিলেন: 'আরে, এ যে দেখছি আমাদেরই একজন!'

এসব ঘটনা শোয়াইৎজারকে আপ্লুত করে, কেননা, যা-কিছু প্রাণময়, যেখানে যেভাবে মনস্বিতা অনুস্যূত, যুক্ত হতে ভালোবাসেন তিনি। শুধু ঘৃণা করেন ঊষর তথাকথিত ইন্টেলেকচুয়ালকে। একটি অভিজ্ঞতাকে তিনি এই মর্মে কথাপ্রসঙ্গে ব্যবহারও করেন। একবার ভীষণ বৃষ্টিতে বাড়ি তৈরির কাঠের গুঁড়িগুলোকে ছাউনির মধ্যে বয়ে-বয়ে আনছেন, সঙ্গে মাত্র দু'জন সহযোগী। এক সুবেশ যুবককে দেখে শোয়াইৎজার অনুরোধ করলেন সঙ্গে হাত লাগাতে। 'আমি ইন্টেলেকচুয়াল, ঐ সব কাঠ-টাট বওয়া আমার কর্ম নয়'—যুবকের মুখে এই উত্তর শুনে সঙ্গে-সঙ্গে সপ্রতিভ শোয়াইৎজার প্রত্যুত্তর

করলেন: 'আপনি মশায় ভাগ্যবান। আমিও ইন্টেলেকচুয়াল হতে গিয়েছিলাম, হতে পারলাম কই!'

আর্ত মানুষের প্রতি সমানুভব তাঁর জীবনের অঙ্গ। নোবেল প্রাইজ থেকে প্রাপ্ত অর্থে কুষ্ঠগ্রস্ত মানুষের জন্য সেবাভবন বানালেন, পশ্চিম জর্মন গ্রন্থসংস্থা প্রদত্ত অর্থ দান করলেন জর্মন উদ্বাস্তু আর দরিদ্র লেখকদের। তাঁর সেবাব্রতে ভিক্ষুণী যাঁরা সেই শ্রীমতী শোয়াইৎজার, এমা হাউসনেখ্‌ৎ, এমা মার্টিন এবং আরো অনেক নির্বাচিত সহকর্মী দিনে-দিনে তাঁর করোঞ্চ শুভেচ্ছাকে প্রত্যক্ষ পার্থিবে প্রয়োগ করে আমাদের বোঝাতে পেরেছেন, এঁর বাণী ও জীবনে কোনো কপট ব্যবধান নেই। এবং শুশ্রূষার উৎসারণ ঘটেছে শোয়াইৎজারের মর্মের সেই জাগর চিন্তার উৎস থেকে যা প্রায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। বেঁচে থাকবার জন্য আকাঙ্ক্ষা (তাঁর দর্শনের কেন্দ্রবস্তু) অচেতন মানুষের পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকর, কেননা, একজনের সেই আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সংঘাত ঘটলে তার কক্ষপথে-আসা আরেকজন মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু যিনি চিন্তাশীল মানুষ তাঁরি মধ্যে বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা সহযোগিতার শক্তিতে জীবনের প্রতি সৌজন্যসুন্দর মনোভঙ্গিতে পরিণত হয় এবং মানুষের বাস্তবিক, আত্মিক ও নৈতিক প্রমূল্যকে সমৃদ্ধ করে তোলে। এটাই শোয়াইৎজারের অস্তিত্বের বার্তা। এত স্বাভাবিক, এমন অ-নাটকীয়—শোয়াইৎজারের নিজের ভাষায় এত অ-রোমান্টিক এই সমস্ত উচ্চারণ যে আলোড়িত হতে ইচ্ছে করে না। মনে হয় অসংখ্যবার শুনেছি এই সব কথা। শোয়াইৎজার জানেন, তাই Epigony শব্দে আমাদের বিদ্ধ করেন, যার অর্থ 'উজ্জ্বল যুগের উত্তরাধিকারী।' ঐ কথাটা আমাদের মনে অহেতু শ্লাঘা জোগায়, কেননা 'আমরা সভ্যতার ধারক' এ-ধরনের অহমিকা যুদ্ধোত্তর জগতে আর মানায় না। শোয়াইৎজার এইভাবে আমাদের বিবেকের স্বরলিপি ক্ষমা আর সমালোচনায় ধরে আছেন। সম্ভবত তিনি সবচেয়ে ঘৃণা করেন আমাদের আপাতবিবেকী মনোবৃত্তিকে যার নামে অক্ষমতা কিংবা ক্লীবত্বও অনায়াসে চলে যায়। এক-এক সময় শিউরে উঠেছেন পৃথিবী-জোড়া সংবেদনশূন্যতায়। মনে হয় তাঁর, মানবজাবহ যেন শোচনীয় রকম নিরুত্তাপ, কেননা মন যতটুকু চায় ততোটুকুও আমরা অন্যদের হাতে দিতে পারি না নিজেদের। আফ্রিকার প্রান্তে হাসপাতালের দায়িত্ব নিয়ে প্রায় সারাজীবন পড়ে আছেন তিনি, জগতের যন্ত্রণায় মনে হয় তাঁর: 'আণবাস্ত্র পরীক্ষা আর আণবিক যুদ্ধনির্ঘোষের বিরুদ্ধে কেউ চীৎকার করে উঠুক,

আফ্রিকার কালো রাত্রে কুকুরের মতো। সংবাদপত্র নির্বাক। চার্চ মন্থর। যারা কথা বলতে পারে তারা কেন কথা বলে উঠছে না। অন্তত কুদ্ধ চিঠি লিখুক, খোঁয়াড়ে-পোরা কুকুর যেমন গুমরে ওঠে।'

এ ভাষা মানুষের উচ্চারিত মিস্টিক মন্ত্র। এ ভাষা কালান্তর-পত্রপুটের রবীন্দ্রনাথের মতো নিঃশর্ত। ভাবতে ভালো লাগে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই সাধনশিল্পী নিশ্চিত সগোত্রতা আবিষ্কার করেছেন। গ্যেটের কাছে তিনি নিজে ঋণী এবং ঐ একই অভিধায় সাযুজ্যময় রবীন্দ্রনাথকে তিনি বলছেন, 'ভারতবর্ষের গ্যেটে, যিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে জীবন বিষয়ে স্বীকৃতিসূচক সত্যের এমন মহান্ সুঠাম ও মায়াবী রূপ দিয়েছেন যা এর আগে কখনো কেউ পারেন নি।'

শোয়াইৎসার বিশ শতকের প্রথম বছরে ওবেরামেরগাউ গাঁয়ে যীশুজীবনের প্যাশন-প্লে দেখে অভিনেতাদের উচ্ছল প্রশংসা করেছেন। এই শতাব্দীরই অন্য এক লাঞ্ছিত প্রহরে একই জায়গায় একই নাটকের অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়ে 'শিশুতীর্থ' রচনা করেন। দুজনের জীবনই কি প্রতীকী নাটকের জীবন্ত চরিত্রায়ণ নয়?

অ্যালবার্ট শোয়াইটজার

একখানি চিঠি

রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি রবীন্দ্র-ফলক উপহার প্রবর্তন দ্বারা সর্বদেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সম্মানিত করবার আয়োজন করেছেন এবং সম্প্রতি অ্যালবার্ট শোয়াইটজারকে যে এই ফলক উৎসর্গীকৃত হয়েছে, এ কথা গত মাঘ সংখ্যায় সংস্কৃতি-সংবাদে বিজ্ঞাপিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে, উপহার স্বীকার করে ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এশিয়াটিক সোসাইটিকে শোয়াইটজার যে-চিঠি লেখেন তাতে ভারতবর্ষের চিন্তাধারা ও আধুনিক ভারতের মনীষীদের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধার পরিচয় সংক্ষেপে ব্যক্ত হয়েছে—চিঠিখানির ভাবানুবাদ আমরা প্রকাশ করছি। শোয়াইটজারের নবতিতম জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনার্থ একটি রচনাও এই সংখ্যার অন্যত্র মুদ্রিত হয়েছে।

আপনার ৬ জানুয়ারির সময়লিপি ২ ফেব্রুয়ারি তারিখে এখানে [আফ্রিকায়] আমার কাছে পৌচেছে। আমার হয়ে রবীন্দ্র-ফলক গ্রহণ করবার জন্য কাউকে কলকাতায় পাঠাবার তখন আর সময় ছিল না। এই দার্শনিকপ্রবরের প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে আসছি।

তাছাড়া কলকাতায় পাঠাবার লোক পাওয়াও আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এ অবস্থায় ফলকটি ফ্রান্সে Gunsbach-এ আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ করি। এ ব্যবস্থা যথোচিত সৌজন্যসম্মত নয়, এজন্য আমি বড়ই দুঃখিত। কিন্তু অন্য কোনো উপায়ও তো দেখি না।…

ভাষায় প্রকাশ করে বলতে পারব না, রবীন্দ্র-ফলক উপহারের সংবাদ আমার হৃদয়কে কী গভীরভাবে স্পর্শ করেছে।

ষ্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যখন ছাত্র, তখনই আমি ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে আগ্রহশীল, যদিও সেকালে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতবর্ষের মনীষীদের বিষয়ে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা ছিল না। ১৯০০ সালের কাছাকাছি সময়ে য়ুরোপবাসীর মনে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে ঔৎসুক্য জন্মাতে থাকে। ক্রমশ রবীন্দ্রনাথ মহামনীষীরূপে পরিচিত হন; রবীন্দ্র-দর্শন আমার মনে গভীর ছাপ রেখে যায়। জর্মন দার্শনিক আর্থার শোপেনহাওয়ার ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। তাঁর একজন ছাত্র যে-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন আমি সেই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেছি, ফলে তরুণ বয়সেই ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে; ডক্টর অব ফিলজফি উপাধি-পরীক্ষা দেবার সময় ভারতীয় দার্শনিকদের কথা আমি জেনেছি। য়ুরোপ যখন রবীন্দ্রনাথের পরিচয় লাভ করে সে-সময় আমি ষ্ট্রাসবুর্গে অধ্যাপক। চরিত্রনীতির (ethics) সমস্যা-বিচারে এ-সময়ে আমি আত্মনিয়োগ করি; এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, ভারতীয় চরিত্রনীতিশাস্ত্রে যে বলেছে, শুধু মানুষের প্রতি করুণাপ্রকাশ করলে চলবে না, সর্বজীবে দয়া করবে, এই কথাটিই ঠিক। সর্বজীবে মৈত্রীই যে সত্যচরিত্রনীতিসম্মত, ধীরে ধীরে পৃথিবীতে এ কথা স্বীকৃতিলাভ করছে।

আমার পক্ষে গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, ভারতবর্ষে যাবার অবসর আমি করতে পারি নি। ১৯১৩ সালে আফ্রিকায় আমি আরোগ্যশালা প্রতিষ্ঠা করি, এই কাজেই আমার সর্বশক্তি নিযুক্ত হয়েছে—দেশভ্রমণের কথাই এক্ষেত্রে ওঠে না। তবে চিঠিপত্র ও ইংরেজ বন্ধুদের সূত্রে ভারতবর্ষের মনীষীদের সঙ্গে, বিশেষ করে গান্ধীর সঙ্গে, আমার যোগাযোগ ঘটেছে।

নেহরুর কারামুক্তির পর তাঁকে আমার গৃহে অতিথি হতে আমন্ত্রণ জানাতে গান্ধী আমাকে অনুরোধ করেন। ঐ সময়ে আমি ইউরোপে Lausanne-এ কাজ থেকে কিছু দিনের ছুটি নিয়ে আছি। সেইবার, কারামুক্তির পর, নেহরু প্রথম আমার বাড়িতে এসেছিলেন।

এশিয়াটিক সোসাইটি আমাকে যে বহুমান দিলেন এজন্য পুনরায় তাঁদের আমি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৫

রঞ্জিত সিংহ

রাষ্ট্র : ধৃতরাষ্ট্র : অগ্রগতি

দৃক্‌শক্তির অভাব তোমার আছে কিছু
নইলে তুমি অনায়াসে পড়তে প্রেমে
অগ্রগতির প্রবণতা স্বভাবনিচু
অন্ধ পথে চলতে থাকে ক্রমেই নেমে।

জর্মানীতে শুনেছিলাম অস্ত্রোপচার
পূর্বরাগের পুলক লাগায় জীর্ণদেহে
বাহাত্তরের আসর জমায় যে-সব বিকার
তাদের নবীন রসের নিদান বুঝলেছে।

শীর্ণ দেহ, ছিন্ন ছাতা, মলিন ধুতি
পিছল পথে কাদম্বরীর অমোঘ টানে
অবাক মানেন স্রষ্টা স্বয়ং ভবভূতি
রুচির বিকার ঘোরায় রীতি প্রণয়দানে।

বাহাত্তরের সঙ্গদানে কাদম্বরী
বিকায় দেহ অগ্রগতির অজুহাতে
ধৃতরাষ্ট্র রাষ্ট্রে এনে বিভাবরী
হাত বুলিয়ে কখন ফেলেন গিরিখাতে।

দুগ্ধপোষ্য শিশুর মতন কথা বলে—
কিংবা ধরুন প্রতিবেশী রিম্ন সেন
মন্ত্রীসভা এবার যখন ভীষণ টলে
বাহুরশাহের গদি বলে তিনিই রাখেন।

অগ্রগতির অর্থ যদি বুঝে থাকি
নীতিসুধা প্রধান তবে ওঠাবরে
পারমার্থিক হাস্ত ছাড়া যা রয় বাকি
বহ্বারম্ভে সে সব লঘুক্রিয়া করে।

বিকাশ দাশ

নীলকণ্ঠ

কোনো পরাভূত লয়ে ডুবে যেতে চেয়েছি অতলে,
যে-অতলে অবলুপ্ত নগরীর মতো অন্ধকার!
অথচ সূর্যের দিকে সবুজ পল্লবগুলি মেলে
অজস্র আলোর স্তরে ফিরেছে বৃক্ষেরা বারংবার!
ক্ষিপ্র বাতাসের মুখে অগ্রবর্তী চৈত্রের খবর
পেয়ে আন্দোলিত হল আরবার রুগ্ন শাখাগুলি।
রক্তে রক্তে আলোড়ন, প্রতীক্ষার ঊর্মিল প্রহর
কেটেছে,—ভরেছে গানে বর্ণে-গন্ধে রক্তিম গোধূলি!

বারংবার ফিরে তাই নির্ভীক নাবিক উপকূলে,
জীবনের, যৌবনের; রক্তকণিকারা প্রাণাকুল।
যদি বিদ্ধ হতে হতে যন্ত্রণায়, মৃত্যুর ত্রিশূলে,
বিশীর্ণ পাণ্ডুর ডালে কখনো ফোটানো যায় ফুল!

মৃত্যুর সীমান্ত একদিকে, অন্যপ্রান্তে শুধু সঙ্ঘবদ্ধ ভিড়,
প্রসন্ন আলোকে দীপ্ত জয়স্তম্ভ যৌবনের—বিদীর্ণ তিমির!

কবিরুল ইস্‌লাম

বন্ধু, এখানে

বন্ধু, এখানে ইতিহাস নিজ কক্ষে
পুনরাবৃত্ত বৈচিত্র্যের ঢেউ
আসে না কখনও, হাসে না তাপিত চক্ষে,
জোয়ারের জলে ভাসে না অকূলে কেউ।

বন্ধু, এখানে সঞ্চিত পাপ জমে
সিঞ্চিত হয়ে আকারে প্রকারে বাড়ে,
পদক্ষেপেই পদস্খলন ক্রমে
অবাধিত করে অকাল অন্ধকারে।

বন্ধু, এখানে স্খলনীবি প্রত্যয়ে
জীবননটীর ভ্রূকুটি কেবলই ঘটে,
প্রেমের নাটক অভ্যাসে প্রশ্রয়ে
কুটি কুটি হয়ে হাওয়ায় হাওয়ায় লোটে।

বন্ধু, এহেন প্রাণধারণের শোক
অপাপবিদ্ধ প্রাণীরও ঘনায় অমা,
তাই দিয়ে রচি পদাবলী, গাঁথি শ্লোক
যদি ফিরে পাই কণা পরিমাণ প্রমা।

বন্ধু, এমনি ইতিহাস নিজ কক্ষে
পুনরাবৃত্ত—বৈচিত্র্যের ঢেউ
আসে না কখনও, হাসে না তাপিত বক্ষে,
জোয়ারের জলে অকূলে ভাসে না কেউ।

সৌমিক মজুমদার

তোমাকে জীবনে কাম্য

জীবন সমুদ্র নয়, পরিমাপে সমুদ্র বিশাল
তবুও সমুদ্র দেখি কোনো কোনো মানবীর চোখে।
দু-চোখে সমুদ্র নেই উচ্ছ্বসিত জলের কল্লোল
শোনা যায় বহু ধৈর্যে কান পেতে উত্তলিত বুকে।
জীবনে জোয়ার আসে, মাঝে মাঝে বিশাল প্লাবন—
ক্লান্ত কচ্ছপের মতো খোলসে আবৃত করে দেহ
কেউ কেউ ভেসে যায়, হাবুডুবু খায় আমরণ
অনিকেত লবণাক্ত স্বেদে, পরিশেষে জীবন দুঃসহ।

দুর্বিসহ অন্ধকারে হাত নেড়ে জলের ঝিনুকে
ক্লান্ত ডুবুরীর মন আলোর আসঙ্গ স্পর্শ চায়।
সাগরের নিঃসীম অতলে তোমার শুক্তি চোখে
শতমুক্তা বিচ্ছুরিত হলে, অন্য এক আকাঙ্ক্ষায়
জানালাটা খুলে দেই, ভেঙে ফেলি জলের দেয়াল;
তোমাকে জীবনে কাম্য পরিমাপে সমুদ্র বিশাল।

অসীম রায়

এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা

(বিষ্ণু দে-কে)

এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর,
তারি মধ্যে বাংলাদেশ, তারি মধ্যে তুমি,
বাতাসে আছড়ায় স্বপ্ন, বাতাসে পাক খায় হাহাকার।

এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর,
তারি মধ্যে একটি লোক, একটি সম্ভাবনা,
কিংবা সম্ভাবনা নয়, চিত্রকল্প প্রেরণার।

ওপারে যে স্মৃতিসত্তা, মেঘলা আকাশ,
বাতাসে জলের গন্ধ, এপারে রয়েছে ভবিষ্যত
—অতীতনিশ্চিহ্ন দীর্ঘ স্থির অন্ধকার—
তারি মধ্যে তুমি।

দেবেশ রায়

যযাতি

(পুনরাবৃত্তি)

খোকার অভিযোগ আমি পৈতৃক সম্পত্তির ব্যাপারে আমার ভাইদের ঠকিয়েছি।

আমার বাবা সামান্য কিছু ধানী জমি রেখে গিয়েছিলেন। আমরা তিন ভাই। তার মধ্যে আমিই সবার বড়। এ কথা সত্য যে বাবার মৃত্যুর পর সমস্ত জমির মালিকানা আমার উপরই বর্তায়। কিন্তু এখনো সে-সমস্ত জমির অধিকাংশ ভোগ করছে আমার ছোট ভাই বিরজা। আমার মেজ ভাই এবং আমি বাইরে। আসলে মেজ ভাই নীরজামোহন ম্যাট্রিক পাশ করেই কলকাতায় পড়তে যায়। তারপর সে আর পাকাপাকি দেশে কোনোদিন ফিরে আসে নি। সেখানেই এক সওদাগরি আফিসে চাকরি নেয় ও কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। শুনতে পেয়েছি কলকাতার কাছেই কোথাও নীরজা কাঠা-পাঁচেক জমি কিনেছে। বাবা যখন মারা যান তখন নীরজার সবে বিয়ে হয়েছে আর আমার খোকার বয়স তখন চার-পাঁচ, আজ থেকে প্রায় চব্বিশ-পঁচিশ বৎসর আগের কথা। বাবাকে নীরজা শেষ দেখা দেখতে পায় নি। ও যখন এসে পৌঁছুল আমরা শ্মশানে রওনা হয়ে গেছি। নীরজা শ্রাদ্ধশান্তি চুকিয়েই আবার কলকাতা ফিরে যায়। আমি কলকাতায় গেলে নীরজার ওখানেই উঠি। নীরজা যদিও কোনোদিন আমার এখানে আসে নি, বা, আসার মতো কোনো সুযোগ তার হয় নি, নীরজার বড় ছেলে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে বছর পাঁচ-সাত আগে একবার বেড়াতে এসেছিল। সুতরাং খোকা যে বলে আমি আমার ভাইদের ঠকিয়ে বাবার সম্পত্তি হাতিয়েছি এ-কথা আদৌ ঠিক নয়। তাই যদি হবে তবে আমাদের ভাইয়ে-ভাইয়ে কোনো গোলযোগ নেই কেন।

আমার ছোট ভাই বিরজামোহন চিরকাল আমার কাছেই মানুষ। বাবা যখন মারা যান তখন বিরজার বয়স গোটা আটেক হবে। বিরজা

আর খোকা একই সঙ্গে বড় হয়েছে। ম্যাট্রিক পাশ করার পর আমি বিরজাকে আরো পড়তে বললাম। আমার মুখের উপর কোনো জবাব দিল না। পরে ওর বৌদিকে জানিয়েছিল যে পড়ায় ইচ্ছে ওর নেই, ব্যবসা করবে। সে-কথায় কোনো উত্তর আমি দিই নি। বিরজা আমার ওখানে খেয়ে-ঘুমিয়ে ঘুরে সময় কাটাতে লাগালো। শেয়ারপত্রের ব্যবসাতে তখন আমার ভীষণ ঝামেলা। আমি বিরজাকে দিয়ে কিছু-কিছু কাজকর্ম করাতাম। শেষে একদিন ওর বৌদির কাছে শুনলাম, বিরজার যে শুধু বিয়ে করার ইচ্ছেই হয়েছে তাই নয়, প্রায় বিয়ে-পাগলা হয়ে উঠেছে। আমি বিরজাকে ওর আগে বলেছিলাম দেশের বাড়িতে গিয়ে সম্পত্তি দেখাশুনা করতে। বিরজা খুব গা করে নি। তখন ক্রমাগত সংবাদ পাচ্ছিলাম যে দেশের বাড়িতে কোনো ফসলই আমাদের ঘরে উঠছে না, সবই প্রজাদের ঘরে উঠছে। এদিকে আমি তখন এত ব্যস্ত যে দেশে যাওয়াও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এই সময় বিরজার বিয়ের কথা শুনে আমি খুশিই হয়েছিলাম, দেখেশুনে একটি মেয়ে বের করে, বিরজার বিয়ে দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দিলাম। সস্ত্রীক বিরজা সেখানে সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করছে। সুতরাং খোকা যে বলে আমি ভাইদের ঠকিয়েছি—তা সত্য নয়।

কিন্তু আমার অনুমান খোকা কোনো একটা গোপন দিকে ইঙ্গিত করেছিল। সে বিষয়ে যথেষ্ট জানা না থাকায় ও অভিযোগ আকারে উপস্থিত করতে পারে নি, কিন্তু এতটা জানা ছিল যাতে ইঙ্গিত করতে পারে। আমি নিজেও অনুমান করতে পারি না খোকা কী বলতে চায়। বাবার সম্পত্তির প্রসঙ্গে এটুকু সত্যি কথা—আমি মনে মনে চেয়েছিলাম যে সম্পত্তিটা যদি সাত-আটখানা না হয়ে গোটা থাকে, তাহলে এর একটা অন্তত মূল্য থাকে, তাহলে সেই কয়েক বিঘে মাটি একটা সম্ভাব্য মূলধন হতে পারে, নইলে তো মাটি মাটিই, ধুলো-বালি। যে-ই পাক, সে যেন ভোগ করতে পারে। বিরজা তখন শিশু, নীরজা থাকে কলকাতায়, জমির সঙ্গে তার কোনোপ্রকার সম্পর্কই সম্ভব ছিল না। সুতরাং সমস্ত সম্পত্তির দায় আমার উপর আসাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু আমি কখনো ভাবি নি যে নীরজা-বিরজা-কে ঠকিয়ে আমি সম্পত্তি নেবো। আমিই ছিলাম সম্পত্তির স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী, যেহেতু জমি ও বাবার সঙ্গে আমারই যোগাযোগ ছিল প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ। শেষ বয়সটা বাবা আমার কাছেই ছিলেন। রেণুকে ভীষণ

ভালোবাসতেন। রেণুও শ্বশুরমশাই বলতে অজ্ঞান ছিল। একবার অবিশ্যি বাবা আমার সঙ্গে কথা উত্থাপন করেছিলেন উইল করে যাবেন বলে। আমি বলেছিলাম—উইল করার জন্য আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, আর আপনার জিনিস যাকে ইচ্ছে তাকে দিয়ে যাবেন, আমি কী বলবো। দু-একদিন পর বাবা আমাকে বলেছিলেন একজন উকিলের কাছে তাঁকে অথবা তাঁর কাছে কোনো উকিলকে নিতে অথবা আসতে। আমি রাজি হয়ে মন্তব্য করেছিলাম—বাঙালি মধ্যবিত্তের সম্পত্তি তো সাত ভূতে লুটেপুটে খায়, সুতরাং এটুকু দেখবেন যাকেই দেন সে যেন তত্ত্বাবধান করতে পারে, আর স্বত্বকার্যের নামে যদিও সবাইয়ের মধ্যেই সমান ভাগ করে দেন তবে হয়তো আপনার মনস্তুষ্টি হবে কিন্তু ও এক আঙুল সম্পত্তির জন্য কেউই মাথা ঘামাবে না—প্রজাদের ভাগেই সব যাবে।—আজ আমি নিজে বেশ বড় সম্পত্তির মালিক। অনুমানে বুঝতে পারি বাবা তাঁর উত্তরাধিকারীদের চাইতে সম্পত্তিকেই বেশি ভালোবাসতেন। সেটা বাসাই স্বাভাবিক। আমিও বাসি। নইলে আর জ্যেষ্ঠ উত্তরাধিকারীকে তাড়িয়েও সম্পত্তি আগলে আছি কেন? তাই শেষ পর্যন্ত উইল করে বাবা আমাকে বলেছিলেন—নীরজা তো বিদেশেই থাকে, সুতরাং ওর নামে আলাদা করে কিছু রাখলাম না, দেখাশোনা করবে কে? বিরজা তো তোমার কাছেই আছে, তোমার নামে আর বৌমার নামে সব লিখে দিলাম। বৌমার অংশটা সম্পূর্ণতই তোমার। আর তোমার নামীয় অংশটার দায়িত্ব তোমার কিন্তু অন্যদের কাকে কী দেবে সে সব তুমি স্থির করে যখন হয় দিয়ে দেবে।

খোকা যাই বলুক, বাবার কথা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। সমস্ত সম্পত্তি প্রকৃতপক্ষে আমারই নামে। একেবারে দলিল করে লেখা। সুতরাং আমার যদি ইচ্ছে থাকত তাহলে আমি ও-সম্পত্তি বসে-বসেই ভোগ করতে পারতাম, তার জন্য আমাকে একটি কাণাকড়িও খরচ করতে হত না। চারপুরুষের এজমালি বাড়ি নিজেদের চার ভাইয়ের মধ্যে ভাগ করে নিতে তাছুড়ীদের কলকাতা থেকে বড় উকিল ডাকিয়ে আলিয়াতি করতে হয়েছিল। আমাকে চেষ্টা করতে হত না, চেষ্টার কোনো প্রশ্নও আসে না, বাবা যে-সম্পত্তি আমার নামে লিখে দিয়েছিলেন, ইচ্ছে করলেই, সে-সব আমিই নিঃসপত্ন ভোগ করতে পারতাম। ভোগ আমি করি নি। অথচ সেই সম্পত্তি-রক্ষার জন্য ট্যাক্স, দলিলদস্তাবেজ, মামলা-মোকদ্দমা—সব বোঝা

বইতে হয়েছে আমাকে। নীরজা প্রবাসী, বিরজা অনভিজ্ঞ, এ কথা সত্য যে সম্পত্তি আমি সবার মধ্যে ভাগ করে দেই নি। কার মধ্যে দেব? নীরজা-বিরজা, লতিকা আর মাধবী-র মধ্যে! যদি ভাগ করে দিতাম এক বিরজার সম্পত্তিটুকু ব্যতীত আর এক ছিলতে জমি ভূমি-আইনের জাল গলে বেরতে পারত? সেটেলমেন্টের খাতায় এতদিনে আমাদের আর কোনো সম্পত্তি থাকত না, সবই প্রজা-অধিকারের নামে দাখিলা হয়ে যেত। ভূমি-আইনের সমস্ত ফাঁক দিয়ে যে আমাদের জোত-জমি অখণ্ড আছে তার একমাত্র কারণ বিরজার জমিতেই থাকা, ও আমার বিবেচনা।

তাছাড়া বিরজা-নীরজা-লতিকা-মাধবীর মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করে দেবার সব দায়িত্ব আমাতেই অর্শায় না। কেউ কোনোদিন চায়ও নি। রেণুর নামে যে-জমিটুকু আছে, আমি সেটুকুকে কোনোদিনই আলাদা করে নিই নি। সব একই সঙ্গে আছে, সব জমিরই দেখাশোনা বিরজা করে। তবে খোকার মনে এ-রকম কথা এসেছে কেন যে আমি আমার পিতৃসম্পত্তির অন্যান্য সহ-অধিকারীকে ঠকিয়ে নিজে গ্রাস করেছি। তার ছুটো সূত্র থাকতে পারে। ইতিমধ্যে বিশেষত ভূমি-আইন পাশ হওয়ার পর পাশাপাশি কিছু জমিজমা বিক্রয় হচ্ছিল। বিরজা আমার নির্দেশমতো তার কিছু কিছু জমিজমা রেণুর নামে কিনেছিল। কিনবার টাকা আমি নিজে দেই নি, এজমালি জমির উৎপাদনবিক্রয় থেকে হয়েছে। ঘটনাটার আসল অর্থ এক বিরজাই বুঝতে পেরেছিল। কারণ বিরজা জমিতেই থাকত। বিরজা বুঝতে পেরেছিল যে এজমালি জমির প্রাপ্য মুনাফা দিয়ে যে-জমি আমি কিনছি সেটা এজমালি নয়, সেটা আমার নিজের। বিরজা যে বুঝতে পেরেছিল তা টের পেলাম যখন একদিন চিঠি পেলাম যে বিঘে কয়েক জমি বিরজা নিজের নামে কিনতে চায়। আমি তো সম্মতি দিয়েইছিলাম, আরো বলেছিলাম যে বিরজা যদি ইচ্ছে করে নিজের নামে আরো কিছু জমি রাখতে পারে। এটা সত্যি কথা যে এজমালি জমির মুনাফা দিয়ে আমি নিজের জমি বাড়িয়েছি। আইনের দিক থেকে সে জমিটাও এজমালি হওয়া উচিত। কিন্তু এটাও সত্যি এজমালি জমি বলে যেটুকু আছে সেটা আমারই নামে, আইনসংগতভাবে সে জমি আমারই, আইনসংগতভাবে সে-জমির মুনাফা আমারই—তাতে কারো কিছু বলার নেই। তবুও আমি শুধু মুনাফাটুকু দিয়ে নিজের জমি কিনেছি মাত্র, মূল সম্পত্তি তো এখনও

আমি গ্রাস করি নি। আইনসংগতভাবে যা সম্পূর্ণই আমার, তার অংশবিশেষও আমি ভোগ করতে পারবো না? সে-অধিকারও আমার নেই? আমার পুত্র তা নিয়ে আমারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে।—এই সূত্র থেকে খোকা মনে করে থাকতে পারে যে আমি ঠগ। আর-একটা সূত্রও থাকতে পারে। নীরজার সঙ্গে এমনি কোনো যোগাযোগ না থাকলেও, আমি কলকাতায় গিয়ে ওর ওখানেই উঠি। ও একবার চিঠি দিয়েছিল যে কলকাতার কাছেই ও জমি কিনতে চায়, জমি প্রায় ঠিকঠাক করেই রেখেছে, কিন্তু টাকার অভাবে এখুনি কিনতে পারছে না, অর্ধেক টাকা তার আছে, বাকি অর্ধেক দরকার। এর জবাবে আমি লিখেছিলাম, ধার-দেনা করে নিজের নামে কিছু জমি কিনে রাখা ভালো, এবং সেইজন্য আমি অন্তত হাজার টাকা দিতে পারি। নীরজা টাকাটা আমার কাছ থেকে নিয়েছিল। নেয়ার আগে অবিশ্যি ও টাকার প্রসঙ্গে চিঠি লিখেছে। কিন্তু নেয়ার পরে গত কয়েক বৎসরেও টাকার প্রসঙ্গে কোনো কথা লেখে নি। আমি বুঝে গেছি যে ও-টাকা নীরজা আর ফেরত দেবে না। নীরজা ধরে নিয়েছে বাবার সম্পত্তির যে-অংশের মালিক ও হতে পারত ঐ টাকাটা তার নিম্নতম মূল্য। নীরজা নিজের জমি কিনবার কথা আমাকে জানিয়েই দিল এই মনে করে যে সে এখানকার জমির বদলে ওখানে জমি কিনতে চায়, সুতরাং এখানকার জমির টাকাটা তাকে দিয়ে দেয়া হোক। মূর্খ জানে না যে এখানকার জমি আইনসংগতভাবেই আমার। আমি ওকে ইচ্ছে করলেও ওর জমির মূল্য হিসেবে একটি পয়সা দিতে পারব না, যেহেতু ওর কোনো জমিই নেই। এবং যে এক হাজার টাকা দিয়েছি সেটা সত্যিসত্যি আমি চাই ওর একটা নিজস্ব বাড়ি হোক বলেই। খোকা এ-ঘটনাটি জেনে আমাকে প্রবঞ্চক ঠাওরাতে পারে। মূর্খ, দায়কে ভেবেছে অন্যায় ক্ষতিপূরণ।

কিন্তু যদি আমার উপরের অনুমান ও ব্যাখ্যাগুলি সত্য হয় তবে তো বিবাদ ভাইদের সঙ্গে আমার। খোকা এর মধ্যে আসে কোত্থেকে?

আমার অনুমান ও ব্যাখ্যাগুলি সত্য কি না সেটা আমার পক্ষে নিশ্চিতরূপে জানা সম্ভবই নয়। নীরজা আর বিরজা কী ভেবে কী করেছে তা নিশ্চিতরূপে আমি জানবো কোত্থেকে। কিন্তু আমার সমস্ত চিন্তাভাবনা কাজকর্ম ঐ অনুমান ও ব্যাখ্যাকে নিশ্চয় হিসেবে ধরে নিয়েই। এটা নিশ্চয় হিসেবে ধরে

নিয়েছিলাম যে বিরজা যে আমার হয়ে আমারই নামে এজমালি সম্পত্তির টাকা থেকে জমি কিনছে তার দালালি বা প্রতিদান হিসেবে নিজের নামেও দু-চার বিঘে চায়। আমি অনুমতি দিয়েছিলাম। তাতে বিরজা আমার সম্পর্কে একটা কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌছতে পারবে না। বিরজা নিজের মনে স্থির করতে পারবে না যে আমি পিতৃসম্পত্তিকে এজমালির রক্ষক হিসেবে বাড়াচ্ছি নাকি ব্যক্তিগত সম্পত্তিরই বৃদ্ধি ঘটাচ্ছি। এটা নিশ্চয় হিসেবে ধরে নিয়েছিলাম যে নীরজা যে পিতৃসম্পত্তি ভোগ করছে না তার প্রতিদানে অর্থ চাইছে। আমি নিজেই টাকা পাঠিয়েছিলাম। তাতে নীরজা আমার সম্পর্কে একটা কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌছতে পারবে না; নীরজা বুঝতে পারবে না এক হাজার টাকা ভ্রাতৃস্নেহবশত পাঠিয়েছি, নাকি খরিদ্দার হিসেবে। আমি আমার অনুমানকেই সত্য বলে ধরে নি বলে আমার পক্ষে নির্দিষ্ট—ভুলই হোক, ঠিকই হোক—একটি কর্মসূচী গ্রহণ করা সম্ভব। কিন্তু নীরজা বিরজা কোনোদিন নিজের কর্মসূচী ঠিক করতে পারে না বলেই আমাকে দাদা-দাদা না করেও পারে না আবার মনে মনে দুষতেও ছাড়ে না যে আমি একাই সব লুটে-পুটে খাচ্ছি। যদি পারতো তাহলে খোকার সঙ্গে আমার যেমন সোজাসুজি কথাবার্তা হয়ে গেছে, আজ যেমন খোকা আর আমি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন,—আমার ভাইদের সঙ্গেও তদনুরূপই ঘটতো এবং অনেক আগে। অথচ দুই ভাই, দুই বিবাহিত বোন, মৃত্যুর পূর্বে পিতা, বর্তমান দুই সন্তান ও স্ত্রীকে নিয়ে আমি অত্যন্ত সফল পারিবারিক ব্যক্তি বলে প্রকীর্তিত আর খোকা ভ্রাতৃহীন, পিতৃহীন, মাতৃহীন, আচ্ছাদনহীন ও অন্নহীন হয়ে পথে। আমার চরিত্রের, আমার বিচার-ক্ষমতার, আমার অনুসরিত কর্মপন্থার এত বড় জয় ইতিপূর্বে আর ঘটে নি।

আর একদিক থেকে এত বড় পরাজয়ও আমার ইতিপূর্বে আর ঘটে নি। সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ না করলে দ্বিধা আর সংশয়ের টানাপোড়েনে কোনো জায়গাতেই পৌছনো যায় না—এটা একদিকের সত্য। তেমনি আর-একদিকের সত্য—আমার অনুমান আর আমার ধারণাকেই একমাত্র সত্য বলে মেনে নেয়ায়—প্রকৃত সত্য হয়তো খোকার চেহারা ধরেই আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রকৃত সত্য হয়তো খোকার প্রতি ভালবাসা নিয়ে অহোরাত্র আমার সঙ্গে ঘর করে চলেছে। অথচ এ ছাড়া আমার কিছু করার ছিল না। অথচ এই অনুমান আর ধারণাকে সত্য বলে

মেনে নিয়ে বাকি জীবন অতিবাহন ছাড়া আমার উপায়ান্তর নেই। আমার নিয়তি। নিজের ধারণা আর অনুমানের উপর বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস ব্যতীত এতো টাকা-পয়সা আমি এক জীবনে উপার্জন করতে পারতাম না। আর এতো টাকা-পয়সা উপার্জন করে সমৃদ্ধির মোটামুটি ছোটখাটো শিখরে নিজের স্থান পাকা করা আমার নিয়তি ছিল। কারণ সেই ছিল আমার স্বপ্ন।

স্বপ্ন বলাও ঠিক নয়, কেননা সেটা আমার কোনো অজ্ঞান মুহূর্তের কল্পনা ছিল না, অথচ সজ্ঞান মুহূর্তের চিন্তা ছিল। আমার আফিস যাওয়ার পথে রাধাবল্লভ বণিকদের বাড়িটা তখন উঠছে। প্রতিদিন, একেবারে নিয়মের মতো, বাড়িটা পেরিয়ে যাবার সময় প্রথমে আমার অভিমান হতো যে ব্যাটা গন্ধবণিকেরও বাড়ি ওঠে, আর আমার ওঠে না, ব্যাটা শুকনো লঙ্কার ব্যবসা করে বড়লোক, সম্মান নেই। আর তারপর রাগ হতো এতোগুলো টাকা দিয়ে পঞ্চাশ বছরের পুরনো বাড়ির মতো লম্বা মোটা থাম লাগাচ্ছে, বিরাট বিরাট দেয়াল তুলছে। সেই অভিমান আর রাগের পর বাকি রাস্তাটুকু আমি প্ল্যান ভাঁজতে ভাঁজতে যেতাম—আমার বাড়ি হলে আমি কী রকম ভাবে বানাতাম। নূতন নূতন বাড়ি তৈরি করার কায়দা আমার জানা ছিল। আমি চেষ্টা করে জানি নি। নিজের একটা গোপন বাসনা ছিল বলেই যেখান থেকে যে-উপকরণ পেতাম তাই দিয়ে আমার গোপন ইচ্ছাকে লালন করতাম, সাজাতাম, বড় করে তুলতাম। আমি ভাবতাম রাধাবল্লভ বণিকের ঐ জমিটাতে যদি আমাকে বাড়ি তৈরি করতে হতো তবে আমিও বাড়িটাকে দোতলাই করতাম —নিচের তলাটার মুখ উত্তরদিকেই রাখতাম, কারণ উত্তরদিকেই বড় রাস্তা আর দোতলা করতাম পূর্বদিকে মুখ করে—সামনে চাতালটাকে অর্ধেক ঢাকা রাখতাম, দোতলার ছাতে প্রাচীর দেয়ার বদলে গ্রিল দিতাম—দোতলায় চেয়ারে বসে সামনে দৃষ্টি দিতে না পারলে অস্বস্তি ঠেকে। না হয় একতলা বাড়ি-ই করতাম, কিন্তু উত্তরদিকের দেয়ালটাকে সমান্তরাল কৌণিক আয়ত-টুকরো করতাম—যাতে বাইরের শব্দ ঘরের ভিতরে না ঢুকতে পারে, সেখান থেকে সম্প্রসারিত একটা গাড়ি-বারান্দা রাখতাম, গাড়ি-বারান্দা দিয়ে ওঠা যাবে বাইরের ঘরে, বাইরের বাঁ ও ডান দিকে দুটো ঘর থাকবে, দুটোই বাথরুমসহ, একটা বসবার ঘর আর একটা অতিথির ঘর ; ও পথ দিয়ে ভিতরে যাওয়া যাবে না, গাড়িবারান্দার দক্ষিণ দেয়ালে আটকা থাকবে, ওপাশ থেকে বারান্দা গোল হয়ে গিয়ে অন্তঃপুরে যাবে, ঢোকার পথে প্রথমেই বসবার ঘর,

এ-ঘরে কোনো টেবিল থাকবে না। এ-রকম ভাবতে ভাবতেই আফিসে গিয়ে পৌছুতাম। বাড়ি বানানোর প্ল্যান ভাবাটা আমার প্রায় শখের হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি যে-বাসাটিতে ভাড়া ছিলাম সেটার পশ্চিমদিকে মুখ। ভিতরে অবিশ্যি সাত-সকালেই রোদ্দুর আসতো, কিন্তু সকালবেলায় ভিতরে বসতে আমার ভালো লাগতো না। পাশেই রান্নাঘর ছিল। ঐ সাতসকালেই ছ্যাক-ছ্যাক ছোঁক-ছোঁক শুনতে বিরক্তি লাগতো। আমি বাইরের মাঠটাতে বসতাম, বেলা গোটা আটেকের সময় সেখানে রোদ্দুর আসতো। জায়গাটা বসবার পক্ষে অনুকূল ছিল না—সামনে কাঁচা নর্দমা, পাশে পায়খানা। খবরের কাগজ পড়তে পড়তে আমি প্রতিদিনই একই কথা ভাবতাম। বাড়িওয়ালাকে বলে বাড়িটা একটু বদলে নিতে হবে। পায়খানাটা ভেঙে বারান্দায় স্যানিটারি ল্যাট্রিন, বাথরুম,—তাহলে ও জায়গাটা খালি হয়ে যাবে, ফুলের বাগান করা যায়, আর এখানকার কুয়োপাড় থেকে দেয়ালটা এগিয়ে নিয়ে এলে কাঁচা নর্দমাটা আর দেখা যাবে না, ওদিকে পড়ে যাবে, কিন্তু বাড়িওয়ালা তো আর নিজের জমির জলনিকাশী নালা আমার সুবিধের জন্য দেয়ালের ওপাশে দেবে না। বাড়ির প্ল্যান করা আমার এ-রকম স্বভাব হয়ে গিয়েছিল যে রাস্তায় কোনো খারাপ বাড়ি তৈরী হতে দেখলে বা বাড়িতে নিজের কোনো অসুবিধা হলে সঙ্গে সঙ্গে নিজের অজ্ঞাতেই আমি বাড়ির স্বপ্ন রচনার দিকে হেলে যেতাম। বিশেষত একটা কোনো বিশেষ জমিতে একটা কোনো বিশেষ অসুবিধা থাকলে তাকে কী করে অতিক্রম করা যায় সেটাই আমার প্রধান বিবেচ্য হতো। আমার বাসাবাড়ির ঠিক সামনেই ছিল একটা কাঠা তিনেকের মতো জায়গা। হঠাৎ একদিন দেখলাম সেখানে বাড়ি তৈরি হচ্ছে। জমিটা চার পাশ থেকে আটকা, একমাত্র পশ্চিমদিকে আর-এক বাড়ির নালার পাশ দিয়ে গিয়ে বড় রাস্তায় পৌঁছতে হতো। বাড়িটা তৈরি হচ্ছিল সাবেকি কায়দায়। মনে মনে আমি অস্থির হয়ে উঠেছিলাম—বাড়িটার ভিতরে এক চিলতে রোদ্দুরও ঢুকবে না ভেবে। এবং রোদ্দুর ঢোকানোর কোনো উপায়ও ছিল না। এক দোতলা করা যায়। কিন্তু একতলা? বহু ভাবতে ভাবতে একদিন রাত্রিতে অকস্মাৎ আমার মনে হলো করা যায়, বাড়িটাতে রোদ্দুর আনা যাক বা না যাক ঘরের মধ্যে আলো অন্তত আনা যায়, টিনের চাল হলে আনা যায়। পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ দুটো ঘর তৈরী করা যাবে, আর তার সঙ্গে একটা ছোট্ট বসবার ঘর, বারান্দায় একটা রান্নাঘর। ঘর তিনটে মিলে মেঝের

পরিসীমা যদি আটতিরিশ বাই চোদ্দ হয়,—বাইরের ঘর দশ বাই চোদ্দ, বাকি ছুটি চোদ্দ চোদ্দ করে তাহলে আটতিরিশ ফুট লম্বা দুদিকের চালের দুদিকে প্রথম পাঁচ ফুটের মধ্যে একজোড়া, পরবর্তী তিন ফুটের একদিকে একটা, তার পরের সাত ফুটের আর-একদিকে একটা, এবং অনুরূপ ভাবে বাকি চোদ্দ ফুটেও কাঁচের মতো অভ্র-সিট টিনের চালের সঙ্গে ফিট করে দিলে ঘরের ভিতরে আলো ছড়িয়ে থাকবে। সিটগুলো জোড়া জোড়া লাগালে হবে না, একদিকে একটা লাগালে তার চেয়ে একটু দূরে আব-একদিকে আর-একটা—তাহলে ঘরের মধ্যে আলোটা বিস্তারিত হবে। এখন অবিশ্যি মনে হয় অভ্র-পাতের বদলে অভঙ্গুর প্লাস্টিক পাতও লাগানো যায়। বাড়িটায় এতবড়ো বাধা অতিক্রম করতে পারলাম বলে আমার আনন্দ তো হলোই, কিন্তু সবচেয়ে খুশি হলাম এই আবিষ্কার করে: কলকাতায় পড়বার সময় ক্লাইভ স্ট্রীটে এক সন্ধ্যাবেলা বেড়াতে-বেড়াতে, এক গুদামের চালে এই অভ্র-পাত পথের বাতির আলোয় সেই যে চমকাতে দেখেছিলাম, কত বছর পর সেটা আজ আমার মনে এলো। তাহলে কি সেই সুদূর যৌবনেই অচেতনে আমি স্বপ্ন দেখতাম।—কোথাও কোনো ভালো বাড়ি তৈরি হতে দেখলে আমার আনন্দের আর সীমা থাকতো না। একবার আমার যাতায়াতের পথের ধারে একটা বাড়ি তৈরি হয়ে উঠতে দেখছিলাম, কিছুদিন পর ভিতরদিকে একটা কন্‌স্ট্রাকশন দেখে আমার একটু খট্‌কা লাগলো—ঠিক ঐ জায়গায় ও-রকম কন্‌স্ট্রাকশন হওয়ার কথা নয়, খানিকটা উদ্বেগ নিয়ে যাতায়াত করছি, এমন সময় একদিন লক্ষ করলাম সেই অদ্ভুত কনস্ট্রাকশনটা আকস্মিক বদলে গেছে আর তারপরই দেখলাম সেটা গিয়ে শেষ হলো একটা ঘরে, শোয়ার ঘরের মতোই ঘর, এবং পববর্তীকালে সেটা শোয়াব ঘর হিসেবেই ব্যবহৃত হতো এবং ঘরটার নিচের তলা রান্নাঘর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কোনো নতুন কিছুতেই যাদের আপত্তি তারা বলেছিল যে ও-রকম ঘর বিলেতে চলে, এদেশে রোদ-হাওয়া দরকার, ও-রকম ঘর চলবে না। তাদের তর্ক থামিয়ে দিয়ে ঘরের সমান্তরাল দুই দেওয়াল জুড়ে বিরাট বিরাট কাঁচের জানলা,—এমন যা ঠেলে উপরে তুলে দেওয়া যায়,—গলে ঘরময় রোদ দাপাদাপি করে বেড়াতে লাগলো।

আমার এই বাড়ি দেখে কেউ এ কথা বলবে না যে আমার স্বপ্ন দেখা ব্যর্থ হয়েছে। জমিটা গলির মধ্যে বড় রাস্তার কাছে। গলিটা বাড়ির পশ্চিম-দিকে। সুতরাং প্রাথমিক অসুবিধা তো ছিলই—পশ্চিমমুখো ছাড়া উপায়

নেই, দক্ষিণদিকে একটা বিরাট মাঠ, পুবে একটা দোতলা বাড়ি, উত্তরে বস্তি। আমার এই বাড়িটা সুতরাং বাধ্যতাবশতই পশ্চিমমুখো। একতলা-দোতলা উভয়ই—সমকৌণিক। ভিতরে দক্ষিণদিকে ঘরের সারি, বারান্দার লাগাও দুটো ঘর, তারও ওপাশে খাওয়ার ঘর ও রান্নাঘর। তেতলায় দু-খানা ঘর, উচ্চতা কম, একটা আমার লাইব্রেরি, আর-একটা আফিস। চারতলায় একটা মাত্র ঘর, ছোট, নীচু। মোট জমি দেড় বিঘের মতো। রাস্তার উপরেই বাড়ি, বাড়ির উত্তর ও পুবে খালি জমি। অনেক ভেবেচিন্তে যদি বিচার করতে হয় তবে এতটি এক কেন একশবার বেরবে। রান্নাঘর, খাবারঘরের দিকটা পরে তৈরি হয়েছে ফলে পরিকল্পনা একসঙ্গে হয়ে ওঠে নি। প্যাটার্নটাও পুরোন আমলের জাহাজ মার্কা, স্ট্রিম লাইন নয়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বাড়িটাকে আমি আবাস করতে চেয়েছি। বাড়ির প্রতিটি ঘর ঘুরলে যে-কেউ দেখবে, আমি অর্থকে জীবনযাপনের জন্যই ব্যবহার করেছি, জীবনকে অর্থোপার্জনের জন্যই ব্যয় করি নি। প্রতিটি খাটের উপরে ফ্যান, শোবার ঘরে সোফা-কাউচ, প্রতিটি ঘরে চার-পাঁচ রকমের বাতি, খাবার ঘরে বিরাট টেবিল, দুদিকে কুড়ি-কুড়ি চল্লিশটা চেয়ার ধরে, রেফ্রিজারেটর, ফোন, আধুনিক স্নানাগার। আমার অর্জিত অর্থের পক্ষে এতো সোপকরণ জীবন-নির্বাহ বোধহয় সংগতির পরিচায়কও ছিল না। তবু বাড়ি করার কথা যে-মুহূর্তে আমার মাথায় এসেছে সেই মুহূর্তেই সে-বাড়ির উপকরণের কথাও এসেছে। মাথার উপর চাল তুলবার জন্য আমি বাড়ি তুলি নি। আমি বাড়ি তুলেছিলাম জীবনের ভোগের একটা কেন্দ্র গড়বার জন্য।. এবং এ গৃহে সত্যি আমি জীবনকে ভোগ করেছি। যদি সেই ভোগের সূত্র ধরে খোকা আসতো, এ-বাড়ির ভোগধারাকে স্বীকার করে নিয়ে যদি খোকা আসতো, তবেই খোকা হতো আমার পুত্র। আর আমার প্রজা হয়েও যদি কেউ এই ভোগের অধিকারকে প্রশ্ন করার দুঃসাহস রাখে, তবে সে আমার দেহজ হয়েও, আত্মজ নয়। আমার পক্ষে এই ভোগের অধিকার ত্যাগ করা বা না করা কোনো ইচ্ছা বা অনিচ্ছার বিষয় নয়, এটাই আমার নিয়তি, নিয়তি। খোকা তাকে স্বীকার করে নি, খোকা তাই পথে—এর চাইতে বড় প্রমাণ আর কী আছে যে এটা নিয়তি, হঠাৎ চরম মুহূর্তে কী করে এটা প্রমাণিত হয়ে গেল যে খোকার জন্মও আমার ভোগবাসনা থেকেই, সুতরাং খোকার চেয়ে ভোগ বড়, স্নেহের চাইতে সম্পত্তি বড়।

আর খোকা আমার সমস্ত অস্তিত্বকে প্রশ্ন করার দুঃসাহস করে কোন অধিকারে। সে যে শুধু এই অর্থে প্রতিপালিতই তাই নয়, সেও তার প্রথম যৌবন থেকে শুরু করে এই সেদিন পর্যন্তও এই অর্থকে বেশ ভালোরকম আস্বাদ করেছে, অর্থের দ্বারা লব্ধ কী কী তার একটা হিসেব-নিকেশও সে মনে মনে করে ফেলেছিল।

খোকা যখন ডাক্তারি পড়তে গেছে, সরকারিভাবে আমি তাকে মাসে দুশ করে টাকা পাঠিয়েছি। বেসরকারিভাবে তার মা তাকে কতো দিয়েছে জানি না, তবে নিয়মিতভাবে ক্রমবর্ধমান হারে দিয়েছে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। খোকার চেহারা রাজপুত্রের মতো। হোস্টেলের ভাত খেয়েও ওর চেহারা থেকে যেন একটা আগুনের হলকা বেরতো। ওর মা বলতো খোকা দিন দিন রোগা হচ্ছে। খোকা রোগা হচ্ছিল ঠিকই। কিন্তু সেটা তার গৃহপালিত মাতৃস্নেহাধিক্য দেহ থেকে ক্ষরণের ফলে। মেদ যতো ঝরে যাচ্ছিল, তখন, খোকার চেহারা যেন ততো দীপিত হচ্ছিল। গায়ের রঙ খোকার চিরকালই ফরসা। কিন্তু কলকাতার জলহাওয়ায় যেন তা থেকে রুক্ষতা ঝরে গিয়ে মাখনের লাবণ্য এসেছিল। সেই লাবণ্যের মধ্যে মেদ ঝরে যাওয়ায় দিনেদিনে পেশীগুলো স্পষ্ট হচ্ছিল। আলোতে খোকার গায়ের রঙ চমকে-চমকে উঠতো, আর খোকা গম্ভীর প্রশান্ত হচ্ছিল। খোকার ভাবে-সাবে মনে হতো ও যেন অনেক কিছু পেয়েছে। আমি জানতাম সেটা কী পাওয়া: খোকা যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হয়েছিল।

(ক্রমশ)

আদাম শাফ

ব্যক্তিমানুষ : মার্কসীয় ধারণা

একটা বহুব্যাখ্যাত সত্য থেকেই শুরু করা যাক: যে-কোনো ধরনের সমাজবাদের—বৈজ্ঞানিক ও ইউটোপিয়ান উভয় ধরনের সমাজবাদের পক্ষেই—মানুষ আর তার কার্যকলাপ কেন্দ্রীয় সমস্যা। আর এ কোনো বিমূর্ত মানুষ নয়, রক্তমাংসের মানুষ, ব্যক্তিমানুষ।

কিন্তু কোনো কোনো অবস্থায় এই পুরোন সত্যটাও, কথাটা হয়তো বিপরীতকথন বলে মনে হবে, গুরুত্বপূর্ণ নতুন আবিষ্কারের চরিত্র নিতে পারে। কেননা এ ছাড়া সমাজবাদের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা, তার তাত্ত্বিক সোপান ও তাৎপর্য উপলব্ধি করা অসম্ভব।

অমানুষিক বাস্তবতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মধ্য থেকে, মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মধ্য থেকে, মানবিক সম্পর্কের প্রতি ঘৃণার মধ্য থেকেই চিরকাল সমাজবাদী চিন্তাধারার উদ্ভব হয়েছে। "স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী"—ফরাসী বিপ্লবের এই মূলমন্ত্রে মানব-সমাজের শাশ্বত আকাঙ্খাই প্রতিভাত হয়েছে। শতাব্দী প্রবাহের মধ্য দিয়ে এই আকাঙ্খাই বৃহত্তর অর্থসমন্বিত হয়ে উঠেছে এবং বহুভাবে ব্যক্ত হয়েছে। এই সব ঝোঁক এবং মনোভাবের উৎস হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে আদিম সমাজের কালে, শ্রেণীব্যবস্থার প্রথম বিভেদাত্মক উপাদানের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামের মধ্যে। সে যাই হোক, ধর্মীয় কি ধর্মনিরপেক্ষ, বৈজ্ঞানিক কি ইউটোপিয়ান, তার ধরন যাই হোক, এগুলি সব সময়ই ছিল প্রতিবাদের অভিব্যক্তি, যদিও হয়তো সর্বক্ষেত্রে সংগ্রামের অভিব্যক্তি নয়। আর মানুষ, তার দুঃখভোগ, তার আশা—এই ছিল সেই প্রতিবাদের প্রস্থানবিন্দু। আর ঠিক এই কারণেই সব ধরনের সমাজবাদই এক ধরনের সুখের তত্ত্ব, যদিও হয়তো সর্বক্ষেত্রে এই সুখ অর্জনের জন্য সংগ্রামের, প্রামাণ্য সংগ্রামের, তত্ত্ব নয়। কিন্তু মানুষকে যখন সমাজবাদী আদর্শের কেন্দ্রীয় সমস্যা হিসাবে গণ্য করা হয় না, তখন তা তাৎপর্য হারায়, তার অর্থ অনুধাবন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

মার্কসবাদ এর থেকে কোনো ব্যতিক্রম তো নয়ই, বরং তা সমাজবাদী ভাবাদর্শের ঐতিহাসিক বিকাশেরই অংশ। নতুন এবং পরিপক্বতর পরিস্থিতিতে, মানবিক সম্পর্কের চরিত্র যখন ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে যেতে থাকে এবং যখন প্রযুক্তি-বিদ্যার অগ্রগতির ফলে যা একদা ছিল কল্পনা তা বাস্তব হয়ে উঠতে থাকে, সমাজবাদী চিন্তাও নতুন ও পরিপক্বতর রূপ গ্রহণ করতে পারে। মার্কসের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে এর সূচনা। মার্কস মূলত পূর্ববর্তী সমাজবাদের ধারণা বাতিল করলেও তার প্রস্থানবিন্দু: ব্যক্তিমানুষ ও তার সমস্তাকে গ্রহণ করেন।

সমাজে নিমজ্জিত ব্যক্তিমানুষের একটি সামাজিক মূল ও প্রকৃতি আছে, কিন্তু এক অর্থে আবার সে স্বয়ম্ভূ। আলোচ্য বিষয় যাই হোক,—শ্রেণীসংগ্রাম বা ইতিহাসের নিয়ামক নিয়মগুলি—সমস্ত বিশ্লেষণের উৎসই মানুষ, রক্তমাংসের বাস্তব মানুষ, ইতিহাসের প্রকৃত নির্মাতা। কেননা যত কিছু দুঃখভোগের প্রকৃত বিষয় সে, সমস্ত কর্মের প্রকৃত কর্তাও সে। মার্কস তাঁর যৌবনে কিংবা পরে পরিণত বয়সে কখনই একে খণ্ডন করার প্রয়াস করেন নি।

তাঁর তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসার একেবারে শুরু থেকেই জীবন্ত ব্যক্তিমানুষই ছিল মার্কসের প্রস্থানবিন্দু। ঠিক এই বিশেষ ক্ষেত্রেই ফয়ারবাখের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মার্কস বিজ্ঞানবাদের (idealism) বিরুদ্ধে, বিশেষ করে হেগেলীয় বিজ্ঞানবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর প্রথম সোপান জীবন্ত মানুষ, রক্তমাংসের মানুষ।

তাঁর যৌবনে এবং পরবর্তীকালে মার্কস মানুষকে যে তাঁর দর্শনের উৎসমুখ বলে গণ্য করতেন তা একটি অকাট্য সত্য, তাঁর রচনাবলীতেই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে। অবশ্য মার্কসীয় ব্যবস্থায় প্রস্থানবিন্দু বা আগমন-বিন্দু হিসাবে, লক্ষ্য হিসাবে, মানুষকে যে-স্থান দেওয়া হয়েছে তত্ত্বগতভাবে তা যথার্থ কিনা—তা স্বতন্ত্র প্রশ্ন। অন্য ভাবে প্রশ্ন করা যায়: মার্কসবাদ মানুষকে প্রধান ভিত্তিপ্রস্তর হিসাবে গণ্য করলেও তার ব্যক্তি-বিষয়ে নিজস্ব কোনো ধারণা আছে কি, না তার ব্যবস্থার আলোকে এরূপ কোনো ধারণা থাকা সম্ভব? প্রশ্নটা অদ্ভুত মনে হতে পারে কিন্তু তাই বলে একে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

ফয়ারবাখের প্রকল্প, দর্শনের প্রস্থানবিন্দু জীবন্ত মানুষ, রক্তমাংসের মানুষ যে প্রকৃতির অংশ—আজকের দিনে এ কথা মামুলী শোনায়। কিন্তু ইতিহাসের

প্রেক্ষিতে দেখলে এটা ছিল একটি দুঃসাহসী প্রস্তাব যা, মার্কস বলতেন, সে যুগের সমগ্র হেগেলীয় দর্শনকে সোজা দিক উপরে করে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। যেসব বক্তব্য একদা সাহসিক বলে চিহ্নিত হত কালক্রমে সহজে স্বীকৃত এবং সত্য বলে গৃহীত হওয়ায় তা অত্যন্ত বাসি বলে মনে হয়।

সংকীর্ণ প্রকৃতিবাদে আচ্ছন্ন হয়ে ফয়ারবাখের নৃতত্ত্ববাদ ঐতিহাসিক দৃষ্টি হারিয়ে ফেলে। মার্কস তার জন্য এর সমালোচনা করেন। তৎসত্ত্বেও নৃতত্ত্ব ঈশ্বরকেন্দ্রিকতা থেকে মানবকেন্দ্রিকতায় রূপান্তরিত করে এবং দার্শনিক বিশ্ববীক্ষার বিকাশ ঘটিয়ে বস্তুতন্ত্রের বিকাশে তা একটি আবশ্যকীয় ভূমিকা নিয়েছে। সত্যই এই নৃতত্ত্ববাদ তার ব্যক্তিবিষয়ক ধারণায় সামাজিক ও ঐতিহাসিক উপাদানকে কোনো স্থান দেয় নি বা কম গুরুত্ব দিয়েছে। এই ছিল তার ব্যর্থতা। কিন্তু তা সত্ত্বেও, এও আবার সত্য যে এই তত্ত্বে মানব-বিশ্বের ঈশ্বরকেন্দ্রিক ব্যাখ্যার সঙ্গে মৌলিক বিচ্ছেদ সূচিত হল, অর্থাৎ সূচিত হল সনাতন ধারণার বিরোধী ব্যাখ্যার। আর এই বিচ্ছেদ ব্যতিরেকে হেগেলবাদকে অতিক্রম করা এবং বস্তুতন্ত্রকে সংহত করা অসম্ভব হত। আশ্চর্যের কিছু নেই যে এই তত্ত্ব মার্কসবাদের উদ্গাতাদের দার্শনিক বিবর্তনে বিশেষ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল—যে-ভূমিকাকে পরবর্তীকালে তাঁর ফয়ারবাখ-সংক্রান্ত গ্রন্থে এঙ্গেলস্ বিশেষভাবে সাধুবাদ জানিয়েছেন। আশ্চর্যের কিছু নেই যে ফয়ারবাখের নৃতত্ত্ববাদের সমালোচনা করা সত্ত্বেও তাঁর (ফয়ারবাখের) মতবাদের এই দিকটি মার্কস সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন করতেন।

তাহলে প্রারম্ভ বিন্দু হল প্রাণিবিশ্বের একটি প্রাণীর রক্তমাংসের নিদর্শন হিসাবে, প্রকৃতির অংশ হিসাবে কল্পিত ব্যক্তিমানুষ। ব্যক্তিমানুষ সম্পর্কে মার্কসের বস্তুতান্ত্রিক ধারণার এটি হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান।

প্রকৃতিবাদও বস্তুবাদ কিন্তু তা সীমাবদ্ধ ধরনের বস্তুবাদ, মানব-সমস্যার বিচিত্র সার্বিকতাকে তা প্রতিফলিত করতে অক্ষম। তাই স্বাভাবিকভাবেই নৃতত্ত্বের মাধ্যমেই মার্কস যেমন ফয়ারবাখের সমীপে আসেন তেমনি আবার নৃতত্ত্ব থেকেই তাঁরা ভিন্নপথ ধরেন। কিন্তু ফয়ারবাখের নৃতত্ত্ববাদের ব্যর্থতা নগ্ন করে দেখিয়ে দিতে গিয়ে মার্কস সাধারণভাবে ফয়ারবাখের বস্তুবাদের দুর্বলতাগুলিও দেখিয়ে দেন। এইভাবে ফয়ারবাখের সমালোচনার মধ্য দিয়েই মার্কস মানুষ সম্পর্কে তাঁর ধারণার বিপরীত দিকে পৌঁছন—পৌঁছন তাঁর নিজস্ব মৌলিক ধারণায়। 'পাণ্ডুলিপি'র মাত্র দু'বছর পরে লিখিত হয় 'জর্মান

ইডিওলজি', কিন্তু এর মধ্যেই নিহিত ছিল মানুষ সম্পর্কে প্রকৃতিবাদী ধারণার সমালোচনার পূর্ণতাপ্রাপ্ত রূপ এবং এর সামাজিক দিকের একটি রূপরেখা।

মানুষ প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ: সে হল প্রাণিজগতে চিন্তাশক্তিসম্পন্ন নরগোষ্ঠীর (Homo Sapiens) অন্তর্ভুক্ত, আর ব্যক্তিমানুষ হল তারই এক একটি নিদর্শন। কিন্তু ব্যক্তির তত্ত্বগত মর্যাদাকে যদি এই সমস্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রাখা হয় (যদিও ঈশ্বরকেন্দ্রিক বিজ্ঞানবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে—আরও সাধারণভাবে—সনাতন ধারণার বিরুদ্ধে সংগ্রামে এটি সবচেয়ে জরুরী বিষয়) যদি এই কথাগুলি ব্যবহার করা হয় পশুজগতের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ-নির্দেশক বৈশিষ্ট্যগুলি বোঝাতে, অর্থাৎ যা মানুষের কতকগুলি বিশেষণমাত্র, জীবন্ত প্রকৃতির অন্য অংশের দ্যোতক নয়—তাহলে তা মানুষের কয়েকটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের সমাহারে পর্যবসিত হবে, আর তাকেই উন্নীত করা হবে মানুষের "মর্মার্থের" (essence) স্তরে। "মানব সত্তা"-কে তাহলে কতকগুলি বিমূর্ত বৈশিষ্ট্যে পরিণত করা হবে যা কিনা প্রত্যেক ব্যক্তিমানুষের "জন্মগত"—একটি বিশেষ শ্রেণীর উপকরণরূপে যা তার বৈশিষ্ট্য।

ব্যক্তির এই ধারণার বিরুদ্ধে মার্কস প্রতিবাদ করেন এবং সংগতভাবেই। কেননা এর প্রকৃতিবাদ সীমাবদ্ধ ও একদেশদর্শী, মানুষের উপাদান হিসাবে জীবতত্ত্বের দিকটিই শুধু এতে স্বীকৃতি পায় এবং সামাজিক দিকটি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়। কিন্তু চিন্তাশক্তিসম্পন্ন নরগোষ্ঠীকে অন্য প্রাণী থেকে যা স্বতন্ত্র করে তা শুধু তার জীবতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নয়,—এক অর্থে প্রধানত সামাজিক-ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যই।

কেননা যখনই সামাজিক বন্ধনের ব্যাপারটি চালু করা হয় তখনই ব্যক্তির ধারণাটি অন্য গুণে গুণান্বিত হয়ে ওঠে; এটা সংকীর্ণ জীববিদ্যা-সংক্রান্ত মতামত যা মানুষের সামাজিক গ্রন্থিতে বাঁধা পড়ার দিকটি অবহেলা করে, তার বিমূর্ত চরিত্রের তুলনায় মূর্ত হয়ে ওঠে। অথচ মানুষ শুধু জীবজগতের একটা বিশেষ কুলের জীবতত্ত্বের ক্রমবিকাশের সৃষ্টিই নয়, মানুষ এই ক্রমবিকাশের ফলে এক সামাজিক-রাজনৈতিক সৃষ্টি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে যে-পার্থক্য সেটা নির্ভর করে প্রত্যেক সমাজের বিকাশের স্তরের উপর অথবা একই সমাজের ভিন্ন-ভিন্ন শ্রেণী এবং স্তরের উপর। মানুষকে যখন অন্যান্য স্তন্যপায়ী জীবদের সঙ্গে তুলনা করে শুধুমাত্র তার সাধারণ জৈবিক বিশেষত্বের ভিত্তিতে দেখানো হয়, তখন মানুষ থাকে শুধু একটা "বিমূর্ত মানুষ", একটা "সাধারণ গোষ্ঠের

মানুষ" ; এটা মানুষকে মূর্ত ভাবে ব্যাখ্যা করে দেখানোর বিরুদ্ধ রীতি—মূর্ত করে দেখানোর ভিত্তি হচ্ছে মানুষের সামাজিক গ্রন্থিতে বাঁধাপড়ার ব্যাপারটি, বিকাশের একটা বিশেষ পর্যায়ে সমাজের একজন হিসাবে তার অবস্থান, সমাজের শ্রমবিভাগ এবং সংস্কৃতি প্রভৃতি ব্যাপারে কোনো একটি শ্রেণীর অংশ হিসাবে তার অস্তিত্ব।

মানুষ যে প্রধানত প্রকৃতির অংশ এবং জীবকুলে অন্যতম, ফয়ারবাখের এই আবিষ্কার আজ যতই মামুলি মনে হোক একদিন সব সবলতা সত্ত্বেও এ ছিল প্রকৃত প্রতিভার এক সত্যিকারের অবদান। ওর চেয়ে আদৌ কম অনুপ্রেরণার দান ছিল না মার্কসের সহজ আবিষ্কার—যদিও তা এখনো আমাদের কাছে নতুন মনে হয়—এই আবিষ্কারটি ঐতিহাসিক বস্তুবাদের আরো এক ধাপ অগ্রগতির সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত অর্থাৎ ব্যক্তি হচ্ছে সমাজের অংশ এবং বাস্তবক্ষেত্রে মানবিক সম্পর্কগুলির সঙ্গে বিজড়িত, বিশেষত উৎপাদনের ক্ষেত্রে,—আর মানুষ এইসব অবস্থারই সৃষ্টি।

কিন্তু এ থেকে মানুষ হচ্ছে প্রকৃতি এবং সমাজের অংশ এই রকমের একটা সাধারণ বক্তব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেই চলবে না, ব্যক্তির সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক সংগঠনের ধারণাটিকেও আরো বাস্তব রূপদানের প্রয়োজন। মার্কস তাঁর ফয়ারবাখ-সংক্রান্ত ষষ্ঠ থিসিসে বলেছেন, "কিন্তু মর্মবস্তু কোনো-একজন ব্যক্তির মধ্যে অমূর্তভাবে বিরাজ করে না।" এই থিসিস যেটা প্রায়ই উদ্ধৃত করা হয়, অথচ কদাচিৎ কেউ যার মূল্য বোঝেন এবং আমার আশঙ্কা খুব কম সময়ই কেউ তার অর্থ উপলব্ধি করেন—একে আমি মার্কসের যৌবনকালের অন্যতম যুগান্তকারী সাফল্য বলে গণ্য করি। এটা ঐতিহাসিক বস্তুবাদের আরো ক্রমবিকাশের পথ উন্মুক্ত করেছে।

মার্কসের বিশ্লেষণের ন্যায়ানুগ প্রস্থানবিন্দু হচ্ছে এই বিশ্বাস যে, মানুষ তার শ্রেণী (Species) হিসাবে এবং শ্রেণীর প্রতিনিধিস্বরূপ ব্যক্তি হিসাবে সামাজিক বিকাশেরই সৃষ্টি, অর্থাৎ একটি সামাজিক সৃষ্টি। এই কথা বলে মার্কস অ্যারিস্টটলের আপ্তবাক্য (কোনো বস্তু আসলে যা, ঠিক তাই), অর্থাৎ মানুষ সমাজের অঙ্গ, শুধু তারই প্রতিধ্বনি করেন নি ; তিনি অনেক বেশি বলেছেন—অর্থাৎ মানুষ সমাজের সৃষ্টি, মানুষ যা হয়েছে সেটা সমাজেরই কাজের পরিণতি। এটা মার্কস একেবারে গোড়াতেই দেখেছিলেন এবং বুঝেছিলেন ; অন্তত তিনি এ কথা 'হেগেলীয় আইনশাস্ত্র দর্শনের একটি সমালোচনা'র ইতি-

পূর্বেই উল্লেখ করেছিলেন, এবং তারপর আরো সুগভীর এবং সমুন্নত আকারে 'পাণ্ডুলিপি'তে প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু যদি কেউ বিশ্বাস করে যে, মানুষ শুধুই প্রকৃতির সৃষ্টি নয়, শুধু চিরস্থির "মানব প্রকৃতি" থেকেই তার জন্ম হয় নি, ঐতিহাসিক অবস্থার চাপে সে তার দৃষ্টিভঙ্গি, মতামত, মূল্যজ্ঞান প্রভৃতি বদলায়—এক কথায়, সে যদি সমাজের সৃষ্টি হয়—তাহলে মূল বিষয় যেটা দাঁড়ায় তা হচ্ছে—এর অর্থ কী।

এই 'সমালোচনা'য় মার্কস দেখিয়েছিলেন যে, ধর্মের বিশ্লেষণ মানুষের সমস্যাকে তীক্ষ্ণতর করে তুলেছে এবং তিনি লিখেছেন, "কিন্তু মানুষ একটা বিমূর্ত জীব নয়, সে পৃথিবীর বাইরে কোনো একটা জায়গায় বাস করে না। মানুষ হচ্ছে মানুষ, রাষ্ট্র এবং সমাজের এক জগৎ।"

এর অর্থ শুধু এই নয় যে, মানুষ বিশ্বসংসার এবং সমাজের সঙ্গে 'জড়িত', এর অর্থ আরো সুদূরপ্রসারী—মানুষ এই জগৎ দ্বারা গঠিত এবং সৃষ্ট।

'ফয়ারবাখ সম্পর্কে থিসিস' এই বক্তব্য পরিস্ফুটনের পথে আর-একটি অগ্রগামী পদক্ষেপ : মানবিক সত্তা—সমগ্র সামাজিক অবস্থা।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে থিসিসটি বেশ সরল এবং স্বচ্ছ। যদি মানুষের সত্তা তার চেতনা দ্বারা গড়ে না ওঠে, বরং তার চেতনাই তার সত্তা দ্বারা গড়ে ওঠে, যদি মানুষের মনোভাব, মূল্যজ্ঞান প্রভৃতি একটা ঐতিহাসিক সৃষ্টি হয় এবং তা যদি ভিত্তি (base) এবং সৌধের (super-structure) মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কের ফল হয়—কিন্তু সব জিনিসটার গতি বৃহৎকালের আওতায় শেষ পর্যন্ত নীচের ভিত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়—তাহলে মানুষ একটা বিশেষ অবস্থায় কী রকম সেটা নির্ভর করে সামাজিক সম্পর্ক এবং বিশেষ করে উৎপাদনক্ষেত্রের সামাজিক সম্পর্কের উপর। এটাই থাকে তার চেতনার মূলে—এটাই তার চেতনা সৃষ্টি করে—যদিও এই সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল। যাকে দার্শনিকেরা বলেন, "মানব প্রকৃতি" অথবা "মানুষের মর্মবস্তু" তাকে এইভাবে সামাজিক সম্পর্কের একটি সৃষ্টি বা কর্মে পর্যবসিত করা যায়।

অবশ্য ঐতিহাসিক বস্তুবাদের পরিণত তত্ত্বের অস্তিত্ব সাধারণভাবেই যখন ধরে নেওয়া হয় তখন যেটা পরিষ্কার এবং সহজ মনে হয়, সেটাই এক সময় অনেক জটিল মনে হয়েছিল যখন এই তত্ত্ব বিদ্যমান ছিল না। এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা যে, মার্কসবাদী তত্ত্বে ব্যক্তির ধারণাটি ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

থেকে গৃহীত হয় নি, বরং মার্কসের সমাজবিদ্যা ব্যক্তির সমস্যা থেকে সমুদ্ভূত। অবশ্য এটা শুধু শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছবার পথের কথা, এটা তত্ত্বের গুণাগুণের প্রশ্ন নয়।

মানুষ একটি সমাজে একটি বিশেষ সামাজিক অবস্থায় এবং মানবিক সম্পর্কের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে; এটা তার ইচ্ছাধীন নয়, এটা পূর্বসূরীদের কর্মফলস্বরূপ বিদ্যমান থাকে। আর এই সামাজিক অবস্থার ভিত্তির উপর— যা আবার শেষ বিচারে উৎপাদন সম্পর্কের উপর দাঁড়িয়ে থাকে—গড়ে ওঠে সমস্ত মতামত, মূল্যজ্ঞান এবং তার ফলস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলির এক ঘোরালো কাঠামো। কোনটা ভালো কোনটা মন্দ, কোনটা উপাদেয় কোনটা নিতান্ত বাজে, এই সব মতামত অর্থাৎ মূল্যজ্ঞানের ধারা সামাজিক-ভাবে উদ্ভূত হয়—আর বিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞানও নির্ভর করে সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশের উপর। প্রচলিত সামাজিক চেতনার মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্ক একজন বিশেষ ব্যক্তিকে—যে এক বিশেষ সমাজে জন্ম নিয়েছে এবং শিক্ষা পেয়েছে— গড়ে তোলে, রূপ দেয়। এই অর্থে সামাজিক সম্পর্ক ব্যক্তিকে সৃষ্টি করে। একে অস্বীকার করার অর্থ গ্রাম্য অজ্ঞতার প্রচার—বর্ণবিদ্বেষী ছাড়া কেউ তা চাইবে না; জনমতের চোখে তা হবে বৈজ্ঞানিক মনোভাবের মৃত্যু। এটা মনস্তত্ত্বের অগ্রগতির একটা ফল—কিন্তু সেই সঙ্গে এটা মার্কসবাদ প্রভাবিত সমাজবিজ্ঞানের অগ্রগতির পরিচায়কও বটে।

মানুষ কোনো-একটা স্থির ধারণা নিয়ে জন্মায় না—জন্মাবধি কোনো নৈতিক চিন্তা নিয়ে তো নয়-ই—তার একটা প্রমাণ এই যে, শুধু বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগেই এরূপ চিন্তার যে বিপুল বৈচিত্র্য দেখা যায় তা নয়, একই কালে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় যে ভিন্ন ভিন্ন সমাজের ক্রমবিকাশ ঘটে সেগুলির মধ্যেও চিন্তার এই পার্থক্য দেখা যায়। অন্যদিকে বিকাশের কতকগুলি সম্ভাবনা নিয়ে মানুষ জন্মায় এবং এগুলি নির্ভর করে এদের ঐতিহাসিকভাবে গঠিত দৈহিক-মানসিক কাঠামোর উপর। এটা প্রাণিবর্গের মধ্যে প্রধান বিভাগোদ্ভূত (Phylogenesis), সেটাও আবার ঐতিহাসিকভাবে স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু জৈবিক বিকাশের একটা বিশেষ স্তরে—যার পরিবর্তন ঘটে অতি শ্লথ গতিতে—মানুষ তার মনোভাব, মতামত, মূল্যজ্ঞান প্রভৃতির দিক থেকে তত্ত্বজ্ঞানোদ্ভূত বিকাশের ফল (ontogenesis), যা হচ্ছে সমূহরূপেই একটা সামাজিক সৃষ্টি। তত্ত্বজ্ঞানের গঠনের দিক দিয়ে সে সম্পূর্ণ সামাজিকভাবে

নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এটা এমনভাবে ঘটে যা তার আয়ত্তের বহির্ভূত—ভাষার মধ্য দিয়ে ঘটে, শিক্ষার মধ্য দিয়ে এটা ঘটে, শিক্ষা হচ্ছে এমন জিনিস যা একধরনের রীতিনীতি ন্যায়বোধ প্রভৃতি চালু করে। আর ব্যাপারটা ঘটে এমনভাবে যে, আমরা যখন পরে এর উৎপত্তি এবং আপেক্ষিকতা উপলব্ধি করিও, তখনও এর প্রভাব থেকে সারাজীবন আর মুক্ত হতে পারি নে। বস্তুত, এমনকি আমাদের শ্রবণ এবং দর্শনের ধরনধারণ—সংগীত এবং শিল্পের জন্য আমাদের মনের সাড়া—সেই সঙ্গে আমাদের সাহিত্যিক রুচি প্রভৃতিও এইভাবে গঠিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব আমাদের এ-সব বিষয় সম্পর্কে পরিপক্ক এবং সচেতন চিন্তার পূর্বেই স্বতন্ত্রভাবে গঠিত হয়ে যায়।

এইভাবে মানুষের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি, তার চেতনা বিশেষ সামাজিক অবস্থার ফল এবং প্রকাশ হিসাবে দেখা দেয়। তার তত্ত্বজ্ঞান যেটা হচ্ছে একটা বিশেষ সময়ে সমগ্র সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি, তাকে পরোক্ষভাবে এ-সব কিছুরই প্রতিচ্ছবি বলা যায়। স্বভাবতই হচ্ছে এক ধরনের রূপকের ভাষায় কথা বলা—একটা উপমা—কিন্তু আমরা এই উপমার মধ্য দিয়ে যা বলতে চাই তা খুব পরিষ্কার।

ব্যক্তির এই বর্ণনার সঙ্গে ব্যক্তি যে প্রাণিজগতের একটি বিশেষ শ্রেণী তেমন কোনো বক্তব্যের **পার্থক্য কিছু নেই**, কারণ এ দুই বক্তব্যই কোনো সংজ্ঞাদানের দাবি করছে না। মানুষের মতো একটি জটিল সত্তা নিয়ে আলোচনাকালে শুধু তার বহুবিধ দিকের মাত্র কয়েকটি নিয়েই বিশ্লেষণের চেষ্টা হয়। এখন, যদি মানুষ প্রাণিজগতের একটি বিশেষ শ্রেণীহিসাবে প্রকৃতির অংশ এই বক্তব্য সমস্যার একটি দিকের মীমাংসা করে দেয় যেহেতু এতে মানুষকে ধর্মমুখীনতা বা বহু-বাদের তত্ত্ব থেকে মুক্ত করে, তাহলে মানুষের নানাপ্রকারের চেতনা যে সমগ্রভাবে সামাজিক সম্পর্কের অবদান এই বক্তব্য আবার সমস্যা ও প্রশ্নের অন্য দিকটির নিষ্পত্তি করে দেয়। এর মধ্যে প্রতিযোগিতা বা পরস্পরকে নাকচ করার কথা ওঠে না—বরং অনুসন্ধানের দুটি দিকই উভয়ের পরিপূরক, যদিও দুটি একত্র করলেও সমগ্র সমস্যার সব কিছু বলা হয় না। তখনো কতকগুলি জরুরী প্রশ্ন থেকে যায়—এবং আমরা আমাদের পরবর্তী বক্তব্যের মধ্যে এর গোটাকয়েক সম্বন্ধে বিচার করতে চেষ্টা করব। এও হবে এখানে ব্যক্তির যে-ধারণা ব্যক্ত হল তারই পরিপূরক, এটা কোনো 'প্রতিদ্বন্দ্বী' বক্তব্য হবে না।

এখানে, প্রচলিত সামাজিক অবস্থার দান মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি এবং চেতনার দিক থেকে ব্যক্তিকে বর্ণনা করার মূল্য কী, তা বিবেচনা করে দেখলে হয়তো অন্যায় হবে না।

এতে অন্তত দুই দিক থেকে ব্যক্তির ধারণাটিকে রূপায়িত করে তোলা যায়।

প্রথমত, এই দিক থেকে যে, মার্কসবাদী পদ্ধতি অনুসারে মূর্তকে পেতে হবে এমন একটা কিছুর মারফত যা অমূর্ত এবং অপেক্ষাকৃত সরল। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, রক্তমাংসের মানুষ যা থেকে যে-কোনো সমাজতত্ত্বের বিশ্লেষণকে নিশ্চিতভাবেই শুরু করতে হয়, সেটা সত্তা হিসাবে এক অত্যন্ত জটিল বস্তু। এই জটিল বস্তুর বৈষয়িক এবং আধ্যাত্মিক এই দুটি দিক যদি বাদ দেওয়া যায়, তাহলে "মানুষ" বা "মানবিক সত্তা"র বর্ণনা অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং মামুলি হয়ে ওঠে এবং এর খুব বেশি মূল্য নেই। কিন্তু আমরা যদি তার সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি থেকে শুরু করি—আর এ সবের বিশ্লেষণ চালানো যেতে পারে এগুলিকে কতকগুলি সামাজিক অবস্থা হিসাবেও গণ্য করে—তাহলে আমরা বাস্তব মানুষের আরো বেশি সমৃদ্ধ ধারণায় পৌঁছব। উল্লেখ করার প্রয়োজন করে না যে, এতে মানবজীবনের কতকগুলি জটিল দিক, যথা, মূল্যজ্ঞান, মতাদর্শের প্রকৃতি এবং মানুষের আচরণ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয়ত, যখন ব্যক্তির সমস্যাগুলিকে সামাজিক অবস্থার অবদান হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয় তখন ব্যক্তির ধারণাকে গোষ্ঠী এবং সমাজের সঙ্গে তার সম্পর্কের মাধ্যমে মূর্ত করে তোলা যায়। এটা নিঃসন্দেহে দার্শনিক নৃতত্ত্বের একটা প্রধান বিষয়—এবং মার্কসবাদের মধ্যে এটা ব্যক্তি আর সমাজ বা সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যেকার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আলোকে পরিষ্কার সমাধানে পৌঁছয়।

ব্যক্তি একটি বিশেষ অর্থে সামাজিক সম্পর্কের অবদান; এই অর্থে, সমাজ যে বিশেষ রূপ নিয়ে বিরাজ করে সেই রূপেরই সৃষ্টি হল ব্যক্তি। যদি সামাজিক সম্পর্ক হয় শ্রেণীসম্পর্ক, তাহলে ব্যক্তি এই সম্পর্কের সৃষ্টি এবং সে তার শ্রেণীর পটভূমিকা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু সমস্যাটিকে শুধু ব্যাপক সামাজিক শ্রেণীতে পর্যবসিত করা যায় না, এর মধ্যে আছে সামাজিক স্তর, বিশেষ বিশেষ পেশা-অবলম্বনকারী গ্রুপ প্রভৃতি—এগুলি আবার নির্ভর করে

সমাজের কাঠামোর উপর এবং এই কাঠামো একটা বিশেষ সময় এবং অবস্থায় কী ভূমিকা গ্রহণ করে তার উপর। এইভাবে ব্যক্তির ধারণা অনেক বেশি বাস্তব মূর্তি ধারণ করে এবং সমাজে স্থায়ীভাবে আসন গেড়ে বসে।

এখন মার্ক্সীয় ব্যক্তি-চিন্তার তৃতীয় আবশ্যকীয় দিকটি ভেবে দেখা যাক।

ব্যক্তিকে প্রকৃতির অংশ হিসাবে এবং সামাজিক সম্পর্কের সৃষ্টি হিসাবে উপস্থিত করার উভয় ব্যাখ্যাই মানবকেন্দ্রিক এবং আত্মনির্ভর ধারণার কাঠামোর সঙ্গে খাপ খায়। এই কাঠামো মানব-জগৎকে তার প্রস্থানবিন্দু হিসাবে গ্রহণ করে, এর চৌহদ্দীর মধ্যেই বিরাজ করে এবং যেসব থিয়োরী মানুষের ভাগ্যকে মানবোত্তর কোনো কিছুর প্রভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে মনে করে, সে-সব থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়। এই চিত্রকে পূর্ণ করতে হলে আর-একটি প্রশ্নের জবাব দিতে হবে, কেমন করে সামাজিক মানুষের জন্ম হল এবং কিভাবে সে বিকাশলাভ করল। কারণ মানুষের সঙ্গে প্রকৃতি এবং সমাজের একটা সম্পর্ক আছে শুধু এ কথা বললেই এ-প্রশ্নের পুরো জবাব পাওয়া যাবে না : মানুষ কী?

এই প্রশ্নের কোথায় জবাব খুঁজতে হবে? মার্কস ভেবেছিলেন, মানবিক শ্রমের মধ্যে, মানবিক বাস্তব ক্রিয়াকর্মের মধ্যে, যেগুলিকে এমন একটি প্রক্রিয়া বলে ধরা হয় যার মাধ্যমে মানুষ বস্তুবিশ্বকে রূপান্তরিত করে এবং এইভাবে নিজেকেও রূপান্তরিত করে।

স্বয়ংসৃষ্টি—এটাই মার্কসের এ-প্রশ্ন সম্পর্কে জবাব এবং এই জবাব ব্যতিরেকে তাঁর ব্যক্তির ধারণার প্রধান দিকগুলি উপলব্ধি করা প্রায় অসম্ভব।

মার্কস এই জবাব আবিষ্কার করেন নি—তিনি এখানে হেগেলের কাছে এবং হেগেল মারফত ইংরেজ অর্থনীতিবিদদের কাছে (বিশেষত অ্যাডাম স্মিথ) ঋণী। স্বভাবতই হেগেল যেভাবে তাঁর স্বয়ংসৃষ্টির ধারণা ব্যক্ত করেছিলেন, মার্কস সে-ভাবে তা গ্রহণ করেন নি: এ-ক্ষেত্রেও তিনি হেগেলের তত্ত্বকে সঠিক করে দিয়েছিলেন। আর তিনি ইংরেজ অর্থনীতিবিদদের সঙ্গেও একমত ছিলেন না। যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে, ব্যক্তি সম্পর্কে মার্কসের প্রস্থানবিন্দু এই যে, ব্যক্তি শুধু চিন্তা করে না এবং যুক্তি উপস্থিত করে না, ব্যক্তি সচেতন এবং যুক্তিসংগতভাবে কর্মেও প্রবৃত্ত হয়।

শ্রমই হল এই রূপান্তর-কর্মের মৌলিক রূপ, কারণ মানুষ রূপকথার দৈবশক্তির মতো নয়, সে শূন্য থেকে সৃষ্টি করে না, কিছু একটা থেকে

সবকিছু সৃষ্টি করে। মানবিক শ্রম বাস্তব বিশ্বকে রূপান্তরিত করে, এবং এইভাবে অর্থাৎ মানবিক শ্রমের ফল হিসাবে তাকে মানবিক বিশ্বে পরিণত করে। আর বাস্তব বিশ্বকে—প্রকৃতি এবং সমাজকে—পরিবর্তন করতে গিয়ে মানুষ তার অস্তিত্বকে এবং তার ফলে জীবজগতের একটা শ্রেণীহিসাবে নিজেকেও পরিবর্তন করে। এইভাবে সৃষ্টির মানবিক প্রক্রিয়া হল মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে তার স্বয়ংসৃষ্টির প্রক্রিয়া। ঠিক এইভাবেই—শ্রমের মধ্য দিয়ে—নরগোষ্ঠীর জন্ম হয়েছিল এবং এই শ্রম মারফতই সে তাকে পরিবর্তিত এবং রূপান্তরিত করে চলেছে।

ঠিক স্বয়ংসৃষ্টির এই পটভূমিকাতেই বাস্তব ক্রিয়াকর্মের ধারাগুলির পরিষ্কার অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। এই ধারাগুলির নানাপ্রকার অর্থ আছে এবং সাধারণভাবে মার্কসবাদী দর্শন এবং বিশেষভাবে নৃতত্ত্বের ক্ষেত্রে এর নানাবিধ প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু এর ঐতিহাসিক উৎপত্তিস্থল রাজনীতির ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত। মার্কস মানবজীবনে বিপ্লবী কর্মের ভূমিকা-স্বীকৃতির মারফত মানবিক কাজের বাস্তব ধারার নিজস্ব ব্যাখ্যায় পৌঁছতে পেরেছিলেন। আমি কর্ণুর সঙ্গে আদৌ একমত নই যে, মার্কসের বাস্তব কর্ম হল আত্মবিচ্ছেদের (alienation) ধারণার বিকল্প কিছু। বস্তুত এটা আত্মবিচ্ছেদের সঙ্গে যুক্ত, তবে সেটা অন্য সূত্র মারফত: মার্কস আত্মবিচ্ছেদ অতিক্রম করার উপায় উদ্ভাবনের দিক থেকে আত্মবিচ্ছেদের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছিলেন যে, এটা কখনো বসে বসে চিন্তা করলে নিষ্পন্ন করা যাবে না, এটা করা যাবে বিপ্লবী কর্মের মাধ্যমে। তিনি "হেগেলীয় দর্শনের সমালোচনা"য় লিখেছিলেন, "সমালোচনার অস্ত্র নিশ্চয় কখনো অস্ত্রের সমালোচনার স্থান নিতে পারে না: বস্তুগত শক্তির বিরুদ্ধে বস্তুগত শক্তি প্রয়োগ করতে হবে।" বিচ্ছেদ এবং তাকে অতিক্রম করার দার্শনিক অনুসন্ধিৎসা আর সেই সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক কার্যকলাপই মাসর্ককে ক্রমে ক্রমে কমিউনিস্ট মৌলিক চিন্তার দিকে ঠেলে দেয়, মার্কস বাস্তব কার্যকলাপের ভূমিকার তাৎপর্য বুঝতে পারেন। তার মানসিক ক্রমবিকাশ—বিশেষত দর্শনের ক্ষেত্রে—কিছুতেই বোঝা যাবে না যদি একে তার রাজনৈতিক কর্ম এবং অভিজ্ঞতার পটভূমিকার বাইরে থেকে দেখি।

শ্রমের মাধ্যমে মানুষের স্বয়ংসৃষ্টির ধারণা হচ্ছে ধর্মকেন্দ্রিকতা এবং তার আনুষঙ্গিক বহু-বাদের (heteronomy) সর্বাপেক্ষা মৌলিক অস্বীকৃতি।

শুধু এই চিন্তার আলোকেই আমরা গ্রামচির সুন্দর ভাষায় বলতে পারি, "আমাদের সত্তা, আমাদের জীবন এবং আমাদের ভাগ্যের আমরাই কর্মকার", আমরা শুধু এই চিন্তার আলোকেই বলতে পারি, "মানুষ হচ্ছে একটা প্রক্রিয়া, অথবা সঠিকভাবে বলতে গেলে, তার কাজের প্রক্রিয়া।" এরূপ মানব-দর্শনের মধ্যে কী বিরাট এবং আশাব্যঞ্জক দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

ব্যক্তি প্রকৃতির অংশ হিসাবে একটি বস্তু; ব্যক্তি সমাজের অংশ এবং তার দৃষ্টিভঙ্গি, মতামত এবং বিচারশক্তিকে সামাজিক সম্পর্কের সৃষ্টি হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়; পরিশেষে, ব্যক্তি স্বয়ংসৃষ্টির একটি পরিণতি—ইতিহাসের স্রষ্টা হিসাবে ব্যক্তির বাস্তব ক্রিয়াকলাপ—এগুলিই হচ্ছে ব্যক্তি সম্পর্কে মার্কসীয় চিন্তার ভিত্তি।

এই চিত্র এই চিন্তার সমগ্র দিক প্রতিভাত করে না; এটা সম্ভবও নয়, প্রয়োজনীয়ও নয়। এটা অ্যারিস্টটলের কথা মনে থাকা সত্ত্বেও কোনো সংজ্ঞা নির্ণয়ের প্রচেষ্টা নয়, এর কোনো মৌলিক গুরুত্ব নেই, এটা সব সময় জরুরীও নয়—যদিও এ ধরনের সংজ্ঞা নির্ণয়ের সমস্ত উপাদানই বর্তমান আছে। কিন্তু সবচেয়ে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে এই যে, এই চিন্তার ফল হিসাবে ব্যক্তির তত্ত্বগত সত্তার সমস্যা এমনভাবে সমাধান করা যেতে পারে যাতে সেটা ব্যক্তিস্ববাদ এবং অস্তিত্ববাদের প্রতিদ্বন্দ্বী নৃতত্ত্ব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা কিছু দাঁড়ায়।

ব্যক্তির মার্কসীয় চিন্তার মধ্যে কি 'ব্যক্তিত্বের সমস্যাও অন্তর্ভুক্ত? নিশ্চয়ই। কিন্তু এটার মধ্যে কি ব্যক্তিত্বের কোনো উন্নত থিয়োরীর সন্ধান মেলে? এ প্রশ্নের কোনো সহজ হ্যাঁ বা না উত্তর দেওয়া যাবে না। কারণ ব্যক্তি-সম্পর্কীয় মার্কসীয় চিন্তার মধ্যে এরূপ থিয়োরীর কিছু অংশ আছে, কিন্তু পুরোপুরিভাবে তেমন কিছু নেই।

মার্কস ব্যক্তিত্ব এবং ব্যক্তিসত্তার ধারণার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং সঠিক শব্দগুলিই ব্যবহার করেছেন। অতি তরুণ বয়স থেকেই তাঁর ব্যক্তিত্বের তত্ত্বগত স্থান কোথায় সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা ছিল। তিনি তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্বের থিয়োরীর গোড়া পত্তন করেন: এটা হচ্ছে একজন প্রকৃত ব্যক্তির কি কি বিশেষ দিক আছে নির্ধারণ। অতএব ব্যক্তি (individual) এবং মানুষকে (person) পৃথক করা যায় না, কারণ তারা একই প্রকৃত বস্তুর দুই নাম। এই বক্তব্য—এবং বস্তুবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্বের থিয়োরীর দিক থেকে এর মৌলিক গুরুত্ব আছে—মার্কসের "হেগেলীয় আদর্শবাদের

সমালোচনা"র ফল ; এতে মার্কস ব্যক্তিত্বের নানা ধরনের ভাববাদী থিয়োরী এবং বিশেষভাবে খ্রীষ্টীয় ব্যক্তিত্ববাদ সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন।

হেগেল বলেছেন, "'মনগড়া চিন্তার একমাত্র সত্য হল মন, ব্যক্তিত্বের একমাত্র সত্য হল ব্যক্তি।" এ হচ্ছে সব কিছু কুয়াশাচ্ছন্ন করে দেওয়া। মনগড়া চিন্তা হচ্ছে মনের সংজ্ঞা, ব্যক্তিত্ব হচ্ছে ব্যক্তির সংজ্ঞা। ফলে, হেগেল এগুলিকে কর্তার অধীনস্থ কর্ম বিবেচনা না করে কর্মকে স্বাধীন, স্বতন্ত্র করে দিয়েছেন এবং তারপর কোনো অতীন্দ্রিয় কৌশলে এগুলিকেই এদের বস্তুসত্তা করে তুলেছেন। কর্তার ফলে কর্ম আসে এবং মনই হচ্ছে মনগড়া চিন্তার উৎস ইত্যাদি। কিন্তু হেগেল তার বদলে কর্মকেই স্বতন্ত্র সত্তা দান করেছেন, কিন্তু এটা করতে গিয়ে তিনি এদের প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য প্রকৃত বস্তুসত্তা থেকে পৃথক করেছেন···হেগেলের কাছে অতীন্দ্রিয় জগতই প্রকৃত বস্তু হয়ে ওঠে, আর প্রকৃত বস্তুকে অন্য কিছু মনে হয়, অতীন্দ্রিয় সত্তার রূপপ্রকাশ বলে মনে হয়।"

এটা হয়তো 'দার্শনিক কচকচি'র জটিল অস্পষ্ট ভাষায় লেখা হয়েছে, কিন্তু এর অর্থ যথেষ্ট পরিষ্কার : প্রকৃত ব্যক্তি-মানব হওয়া উচিত সমস্ত বিশ্লেষণের প্রারম্ভ-বিন্দু। এটা একটা জটিল দৈহিক-আধ্যাত্মিক সত্তা এবং সেই কারণেই নানা দিক এবং বৈচিত্র্যের আলোকে একে বিচার করা যেতে পারে। এর একটি দিককে বলা হয়, "একটি বিশেষ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব," যথা, তার আধ্যাত্মিক মানসিক গুণাবলি অর্থাৎ সেই ব্যক্তির মতামত, দৃষ্টিভঙ্গি, আচার আচরণ, একে আমরা অনেক সময় বলি 'চরিত্র'। এই বর্ণনা "ব্যক্তিত্বের" বর্ণনার মতোই অস্পষ্ট, এ ক্ষেত্রে আরো বেশি বৈজ্ঞানিক সুনির্দিষ্টতা থাকা উচিত, কিন্তু এ থেকে মনে যে ভাবগুলি জাগায় তা একেবারে এক না হলেও একই প্রকারের। যদিও এটা তখনো ব্যক্তির সমস্তাকে কিছুটা ধোঁয়াটে এবং অনির্দিষ্ট রাখে এবং বৈজ্ঞানিক বিস্তারিত ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে (বিশেষত মনঃসমীক্ষাবিদ এবং নৃতত্ত্ববিদদের দ্বারা), তবু আমরা অন্তত মূল বিষয়টির জ্ঞানলাভ করি : এমন কোনো লোক নেই যে শুধু একটা পৃথক আধ্যাত্মিক সত্তা, যেটা প্রকৃত সত্তাবিশিষ্ট ব্যক্তি থেকে পৃথক। ব্যক্তিত্ব হচ্ছে শুধু ব্যক্তিরই একটা বিশেষ বর্ণনা এবং ব্যক্তি থেকে একে আলাদা করাটা হচ্ছে ব্যক্তিকে তার চেহারা বা ছায়া থেকে আলাদা করার মতো ভুল এবং বিভ্রান্তিকর ব্যাপার এবং তাকে আর একটা স্বাধীন সত্তা আরোপের মতো ঘটনা।

ব্যক্তিত্বের খুব প্যাঁচালো এবং দীর্ঘ আলোচনা করা যেতে পারে—এ রকম আলোচনা খুবই সহজ তার কারণ কোনো বিশেষ চিন্তাধারার অনুসরণকারীরাই এ-বিষয়ে স্পষ্ট কিছু বলতে পারেন নি। কিন্তু তাঁদের সবার আলোচনাতেই ব্যক্তিত্বের থিয়োরীর কেন্দ্রীয় সমস্যাকে ব্যক্তির তত্ত্বগত অবস্থানের উপর নির্ভরশীল বলে গণ্য করা হয়েছে, আর এতে বেছে নেওয়ার কাজটা অপেক্ষাকৃত সহজ: হয় ব্যক্তিত্বকে একটা বস্তুর কতকগুলি গুণ হিসাবে ধরে নেওয়া—ফলে যেটা অধিকতর বিশ্লেষণের স্বাভাবিক প্রস্থান-বিন্দু হয়ে দাঁড়ায়—নতুবা আধ্যাত্মিক সত্তা হিসাবে স্বয়ম্ভু বলে বিচার করা—এতে শুধু যে ব্যক্তিত্বের প্রশ্নেই ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত থাকে তাই নয়, সাধারণভাবে ব্যক্তির প্রশ্নেও ঐ দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়।

কাজেই ব্যক্তিত্বের প্রশ্নে মার্কসীয় ধারণাটি ব্যক্তির তত্ত্বগত অবস্থানের প্রশ্নে মার্কসীয় বস্তুবাদী জবাবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ব্যক্তির সামাজিক চরিত্রের স্বীকৃতি এবং তাকে সমগ্র সামাজিক সম্পর্ক হিসাবে বিচার করলে আর একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয়: ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সামাজিকভাবে গঠিত হয় এবং তার সামাজিক চরিত্র থাকে।

"রাষ্ট্র পরিচালনার কর্ম এবং ক্ষেত্র ব্যক্তির সঙ্গে জড়িত (রাষ্ট্র শুধু ব্যক্তির মাধ্যমে কাজ করে); কিন্তু সে ব্যক্তি শুধু একটা দৈহিক ব্যক্তি নয়, সে হচ্ছে রাষ্ট্রের একজন সদস্য। সে সব কাজ রাষ্ট্রের সদস্য হিসাবে ব্যক্তি-চরিত্রের সঙ্গে জড়িত। হেগেলের পক্ষে এটা বলা খুব হাস্যকর যে, এ-সব কাজ শুধু একটা বাইরের আকস্মিক ঘটনা হিসাবেই প্রত্যেকটি ব্যক্তিত্বের সঙ্গে জড়িত।... হেগেল রাষ্ট্রচালনার কাজ এবং ক্ষেত্রকে বিমূর্ত এবং বস্তুনিরপেক্ষভাবে কল্পনা করেছেন; কিন্তু তিনি ভুলে গিয়েছেন যে, প্রত্যেকটি ব্যক্তিত্ব হচ্ছে মানবিক ব্যক্তিত্ব এবং রাষ্ট্রের কর্ম এবং কর্মক্ষেত্র হচ্ছে মানবিক ক্রিয়াকলাপের বিষয়; তিনি বিস্মৃত হয়েছেন যে, যেটা একটি "বিশেষ ব্যক্তিত্বের" মূল উপাদানগুলি রচনা করে সেটা তার শ্মশ্রু, রক্ত বা বিমূর্ত দৈহিক প্রকৃতি নয়, সেটা তার সামাজিক চরিত্র।"

এটা ব্যক্তির ভাববাদী ধারণার (ব্যক্তিত্ববাদী) বিরুদ্ধে আর একটি আঘাত: ব্যক্তিত্ব কোনো স্বাধীন স্বতন্ত্র আধ্যাত্মিক সত্তা নয় (স্বতন্ত্র অর্থাৎ বস্তুবিশ্ব সম্পর্কে এবং বাস্তব ব্যক্তিবিশ্ব সম্পর্কেও)—বরং এটা একটা সামাজিক সৃষ্টি, এটা বাস্তব ব্যক্তিবর্গের মধ্যেকার সামাজিক সম্পর্কের অবদান। সেই

অন্তই ইতিহাসের গতিপথে মানবিক ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটে, যেমন পরিবর্তন ঘটে যে-সব অবস্থা ইতিহাসকে রূপ দেয় তার ক্ষেত্রেও।

সর্বশেষে, ব্যক্তি সম্পর্কে মার্কসীয় চিন্তা থেকে তৃতীয় সিদ্ধান্ত : যেহেতু মানবিক ব্যক্তিত্বের চরিত্র সামাজিক, ঠিক সেহেতুই এটা প্রথম থেকেই জন্মায় না, এটা গঠিত হয়, এটা একটা প্রক্রিয়া। এটা কোনো মানবেতর শক্তির সৃষ্টি নয়, সামাজিক মানবের নিজস্ব অবদান, স্বয়ং সৃষ্টির দান। মার্কসের ব্যক্তিত্বের থিয়োরী যে তাঁর সাধারণ ব্যক্তি-চিন্তার সঙ্গে যুক্ত, এটা সেই কার্যকারণ সম্পর্কের আর একটি দিক এবং এটা ভাববাদী রহস্যবাদের বিরুদ্ধে আর একটি আঘাত।

মার্কসবাদী থিয়োরীতে ব্যক্তিত্বের সমস্যা সম্পর্কে আর একটি মন্তব্য : ব্যক্তিত্বের বিষয়টি যার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত সেটি হচ্ছে ব্যক্তিসত্তা—যাকে দেখতে হবে তার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে, পুনরাবৃত্তিহীনতার মধ্যে। সত্য কথা, মার্কসবাদীরা এই মত পোষণ করে, ব্যক্তিত্ব হচ্ছে একটি সামাজিক সৃষ্টি এবং তার সামাজিক চরিত্র আছে, কিন্তু এটা শুধু এর উৎপত্তির ব্যাখ্যা। মানবিক ব্যক্তিত্ব সামাজিকভাবে নির্ধারিত হয়, এটা এক ধরনের সামাজিক অবশ্যম্ভাবী বিকাশের কেন্দ্রবিন্দু, কিন্তু আর কিছুর জন্যে না হলে শুধু এর জটিলতার জন্য এটা একটা নিজস্ব সত্তা বিশিষ্ট বস্তু—এর পুনরাবৃত্তি ঘটে না এবং এই দিক থেকে অনন্য (জার্মান আইডিয়লজি দেখুন)।

বস্তুত এটা হল সামগ্রিক কাঠামো এবং সে জন্য এটা এখন একটা দৈহিক-মানসিক কাঠামো যার পুনরাবৃত্তিহীনতা ব্যক্তির বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ফলে, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ, মতামত, ইচ্ছা, পছন্দ এবং বেছে নেওয়ার মানবিক চরিত্রের সঙ্গেই এর প্রধান সম্পর্ক। এইদিক থেকেই মার্কসবাদ ব্যক্তিমানুষ সম্পর্কে ব্যক্তিত্ববাদের ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি নাকচ করে ব্যক্তিসত্তা হিসাবে ব্যক্তি মানুষের সুসম্পূর্ণ থিয়োরী উপস্থিত করে—অথচ অন্তত এর নৃতত্ত্বমূলক ব্যবস্থায় এরূপ থিয়োরীর যথেষ্ট স্থান আছে। বিতর্কটা বিষয়ের ব্যাখ্যা নিয়ে, খোদ বিষয় নিয়ে নয়।

এর সঙ্গে একটা উপসংহার যুক্ত আছে, যদিও সেটা মার্কসবাদী তাত্ত্বিকরা খোলাখুলিভাবে বলেন নি, তবু সেটা অন্তর্নিহিতভাবে পুরোপুরিই স্বীকৃত হয়েছে : পুনরাবৃত্তিহীন কাঠামোর সমগ্ররূপ হিসাবে ব্যক্তির একটা 'মূল্য' আছে এবং সেটা খুব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, একমাত্র ব্যক্তির মৃত্যুর সঙ্গেই এটা লুপ্ত হয়ে

যায়। সুতরাং এক হিসাবে যদিও ব্যক্তি স্বতন্ত্র সত্তা নয়—বরং সে সহস্র বন্ধনে সমাজের সঙ্গে জড়িত এবং সমাজেরই একটা সৃষ্টি—তবু সে পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনাহীন একটি সমগ্রতার প্রতিনিধি, 'নিজের মধ্যেই সে একটা বিশ্ব' এবং এটা ব্যক্তির মৃত্যুর পর নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এখানেও আবার অস্তিত্ববাদের ভূয়োদর্শন পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে মার্কসবাদ কিন্তু অস্তিত্ববাদী মতাদর্শের একটি জাজ্জ্বল্যমান তথ্য আদৌ অস্বীকার করে না; আবার দেখা যাচ্ছে বিতর্কটা ব্যাখ্যা সম্পর্কে, বিষয়টির অস্তিত্ব নিয়ে নয়। এর মৌলিক ফলাফল আছে, সেটা নৈতিকতার থিয়োরীর ক্ষেত্রে বর্তায় এবং মানবিক কর্ম যা অন্যান্য জনগণের ভাগ্যকে প্রভাবিত করে সে-ক্ষেত্রে বর্তায়।

এগুলিই তাহলে মার্কসীয় ব্যক্তি-ধারণার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিত্বের থিয়োরীর প্রধান প্রধান দিক—আর এ-টুকু বলাই সম্ভব যে, এই থিয়োরী মার্কসবাদের মধ্যে বিদ্যমান আছে, অথবা অন্তত মার্কসবাদী ধ্যানধারণা থেকে ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, মার্কসবাদের মধ্যে এটাকে সত্যই বিকশিত করে তোলা হয়েছে; ব্যাপারটা নিশ্চয়ই সে-রকম কিছু নয়, এবং সমস্যাটা এখনো বিতর্কের অপেক্ষা রাখে—এটা আরো এইজন্য যে, সমস্যাটা দার্শনিক কল্পনা নিয়ে নয়, সমস্যাটা হল মনস্তত্ব, সামাজিক নৃতত্ব, সমাজতত্ব প্রভৃতি মানববিজ্ঞানের গবেষণা ক্ষেত্রের অনুসন্ধান থেকে সাধারণ প্রতিপাদ্য রচনার।

এই বিশেষ ক্ষেত্রটি মার্কসবাদে নিতান্তই অবহেলা করা হয়েছে—ঠিক যেমন অবহেলা করা হয়েছে ব্যক্তি এবং সামাজিক মনস্তত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব কিছুকে। জ্ঞানের সমাজতত্ব এই বাদ পড়ার ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে: যখন মার্কসবাদ ব্যক্তির সমস্যাকে দেখতে ভুলে গেল এবং যখন গণ-আন্দোলনগুলির পর্যালোচনার উপর জোর দেওয়া হল, তখন ব্যক্তির সঙ্গে জড়িত সব কিছুর অবহেলা স্বাভাবিক পরিণতি প্রাপ্ত হল। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, আজ একজন মার্কসবাদী ব্যক্তিত্বের সমস্যা তুলতে গেলেই এমন বহু ধারণারই সম্মুখীন হবেন যেগুলি সাধারণত ভাববাদী অনুজ্ঞা থেকে রচিত এবং এগুলির বিরুদ্ধে একমাত্র তাঁর পদ্ধতির প্রশ্ন উপস্থিত করা ছাড়া অন্য খুব বেশি কিছু বলার থাকে না। এইজন্যই মার্কসবাদকে এখানে ধ্বংসমূলক হতে হবে, বিভ্রান্তিকর মতামত এবং ব্যক্তিত্ব সম্পর্কীয় প্রতিপাদ্যগুলিকে খণ্ডন করতে হবে—সেই সঙ্গে স্বভাবতই নিজেদের গঠনকাজ বাদ দেওয়া চলবে না। নেতিও ইতির দিকে এগিয়ে দেয়।

এ-কাজের গঠনমূলক দিকগুলি সংগঠিত করা এখনো বাকী আছে। আর কোনো কারণে না হলেও এটা এইজন্য প্রয়োজনীয় যে, যদি ব্যক্তির প্রকৃতি সম্পর্কীয় গবেষণার ক্ষেত্রের পূর্ণচিত্র পেতে হয়, তাহলে এ-কাজ করতেই হবে। এ-কাজ পরিচালনায় জন্য একটা আলোচ্য কর্মসূচী হিসাবে আমি ফ্রোমের প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করতে পারি : মানব-চরিত্রকে পর্যবেক্ষণ করা যায় একটা ফিল্টার হিসাবে, যার মাধ্যমে ভিত্তিমূলের অনুরণনগুলিকে নির্বাচন করা হয় এবং উপরের কাঠামোতে পরিচালিত করা হয়। এই প্রস্তাব ব্যক্তিত্বের সমস্যার গবেষণায় একটি দিকের প্রতি মনোযোগী হওয়ার পথে মূল্যবান দিশারী—অন্তত এই দিক থেকে যে, যতটা সম্ভব জৈবিক ব্যাপার ব্যক্তিত্বের সামাজিক চরিত্রের পূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়াটা আদৌ তার বাস্তব মনস্তাত্ত্বিক বিষয়গুলি (অর্ধ-অবচেতন দিকগুলি সহ) পর্যবেক্ষণ নাকচ করে দেয় না। ব্যক্তিত্বের অনুসন্ধান সময় শুধু তার বুদ্ধিগত দিক নয় অ-বুদ্ধিগত দিকগুলিও খুঁজে দেখার ব্যবস্থা করতে হবে, যদি এই অ-বুদ্ধির দিকগুলি মানব-আচরণের মধ্যে অনুসৃত হয়ে থাকে—এবং এমন কি এই সব অ-বুদ্ধির ব্যাপারগুলিরও বুদ্ধিগত ব্যাখ্যা দানের চেষ্টা করতে হবে। এটা নিশ্চয়ই খুব সহজ কাজ নয় এবং এটা মার্কসবাদীদের বহু ধারণাকে বদলাতে এবং বহু আপ্তবাক্যকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য করবে। কিন্তু প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যদি আমরা ব্যক্তি সম্পর্কে আমাদের নিজস্ব চিন্তাকে একান্তভাবে বিকশিত করে তুলতে চাই এবং প্রতিদ্বন্দ্বী থিয়োরীগুলিকে পরাস্ত করতে চাই।

আমার মতে ব্যক্তির ধারণা হচ্ছে যে-কোনো দার্শনিক নৃতত্ত্বের কেন্দ্রবিন্দু, এটা আর কোনো কারণে না হলেও শুধু এই জন্য যে, ব্যক্তির জীবজগতে স্থানের সমস্যাটির সমাধান করতে হবে এবং এইভাবে নৃতত্ত্ব এবং বিশ্বের সমগ্র চিত্রের মধ্যে একটা সূত্র বের করতে হবে। কারণ দার্শনিক নৃতত্ত্ব—দৃশ্যত বিপরীত-মুখী হওয়া সত্ত্বেও এবং তার উদ্যোক্তাদের প্রায়শ অতি হিংস্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও—সহস্র বন্ধনে বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে জড়ানো, সবচেয়ে বড় কথা, এই সব সূত্র হচ্ছে পরস্পর বিজড়িত : একটা সুসঙ্গত বিশ্ববীক্ষা ব্যবস্থায় নৃতত্ত্বের ক্ষেত্রে কতকগুলি অনিবার্য নির্বাচনের সমস্যা দেখা দেবেই এবং এর পাল্টাটাও ঘটে।

কী ভাবে একটা নৃতত্ত্বমূলক ব্যবস্থার ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত সেটা বিতর্কের বিষয়। আমার মতে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক উপায় হচ্ছে

ব্যক্তির ধারণা থেকে শুরু করা, কারণ এই রীতি গ্রহণ করলে সমগ্র প্রতিপাদ্য বিষয়কে যুক্তি পরম্পরায় ব্যবস্থাধীন করা যায়। কিন্তু অনুসন্ধান এবং প্রতিফলনের প্রকৃত প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তির ধারণা প্রস্থানবিন্দু নয়, আগমনবিন্দু। একমাত্র ব্যক্তিজীবনের নানাবিধ সমস্যা-সমাধানের ভিত্তিতেই ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন থিয়োরী প্রতিষ্ঠা করা যায়। আর ঠিক সেইজন্যই বিপরীত-ভাবেও এই ব্যবস্থাটিকে উপস্থিত করা যায়—অনুসন্ধানের ফলাফল অর্থাৎ ব্যক্তির ধারণা থেকেও শুরু করা যায়।

যাই হোক, বিভিন্ন নৃতত্ত্ব-মতাবলম্বীদের মধ্যে যে প্রধান মতপার্থক্য সেটা ঠিক এই ব্যক্তির ধারণা বা বিশেষভাবে তার জীবতাত্ত্বিক অবস্থানকে কেন্দ্র করেই ; আর সেইজন্যই এই ধারণা এই সব মতাবলম্বীদের অনুসন্ধানের ভিত্তি হতে পারে।

ব্যক্তির জীবতাত্ত্বিক অবস্থান মার্কসীয় মতবাদের কাঠামোর মধ্যে পরিষ্কারভাবে নির্ণয় করা যেতে পারে। সে হচ্ছে প্রকৃতির এমন অংশ যা সচেতনভাবে দুনিয়াকে বদল করে এবং এইদিক থেকে সমাজের অংশ। প্রাকৃতিক-সামাজিক সত্তা হিসাবে তাকে বস্তুনির্ভর বাস্তবতার বহির্ভূত আর কিছু ব্যাপারের সাহায্য ব্যতীতই বোঝা যায়। ব্যক্তির জীবতাত্ত্বিক অবস্থানের এরূপ ব্যাখ্যা—আর এটা সমগ্র মার্কসবাদী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত—একটি সম্পূর্ণ মানবকেন্দ্রিক দার্শনিক নৃতত্ত্ব গড়ে তোলা সম্ভব করে—আর সেটা বিশেষ অর্থে স্বনির্ভর।

বাইরে থেকে দেখতে যেমনই হোক, নৃতত্ত্বের ধারণাটি নির্ভর করে বুনিয়াদি হিসাবে কোনটা গ্রহণ করা হয়েছে, তার উপর : হয় সামাজিক সূত্রজালে জড়িত মূর্তিমান ব্যক্তি, অথবা মানবেতর কোনো বিশ্ব।

প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে একটি একান্ত মানবকেন্দ্রিক নৃতত্ত্ব গড়ে তোলা যায় যার জন্য কোনো মানবেতর কিছুরই প্রয়োজন করে না, এটা মানববিশ্বকে মানুষের সৃষ্টি বলে গ্রহণ করে। এটা এবং একমাত্র এই নৃতত্ত্বই বস্তুবাদী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে যথাযথভাবে খাপ খায় ; একদিকে এটাকে এর যুক্তিসঙ্গত পরিণতি বলে ধরা যায় (এঙ্গেলস একবার বস্তুবাদকে বাস্তবের বাইরে থেকে সংগৃহীত সবকিছু বর্জিত এক বাস্তবমুখীন দৃষ্টিভঙ্গি বলে অভিহিত করেছিলেন), অন্যদিকে, এটাকে এমন একটা অবস্থান বলা যায় যা এইরকম একটা বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গিতে এসে পৌছয়।

এ-ধরনের নৃতত্ত্ববিদ্যা—মানবকেন্দ্রিক এবং তার ফলে বস্তুবাদী—'স্বনির্ভর'ও বটে—অর্থাৎ মানববিশ্বকে তার বাইরের সমস্ত শক্তি থেকে স্বতন্ত্র বলে গণ্য করা হয়, এটা মানুষেরই একটা সৃষ্টি। স্ব-নির্ভরতা সব সময়ই একটা কিছুর সঙ্গে তুলনামূলক সম্পর্ক—এ-ক্ষেত্রে অতিপ্রাকৃতিক, মানবেতর শক্তি যা মানুষের ভাগ্য এবং আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে তার থেকে পৃথক বস্তু। এই অর্থে "স্ব-নির্ভর নৃতত্ত্ব" শব্দটা কখনো বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়, একে ব্যক্তিস্ববাদী যাঁদের নৃতত্ত্ব হচ্ছে ব্যক্তিমানুষ একটা আধ্যাত্মিক সত্তা এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাদের "স্ব-নির্ভরতা"র সঙ্গে এক করে দেখলে চলবে না। সেখানে আত্মাকে বাস্তব জগতের সম্পর্ক থেকে স্বতন্ত্র একটা কিছু মনে করা হয়—এ-সম্পর্কে যাকে আমরা বলি "স্ব-নির্ভর-নৃতত্ত্ব" তার একেবারে বিপরীত। এই সব শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ভুল ধারণা থেকে মৌলিক বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে—এমন কি মার্কসবাদী নৃতত্ত্বের স্ব-নির্ভর চরিত্রের অস্বীকৃতিও ঘটতে পারে।

শেষোক্ত ক্ষেত্রে, অর্থাৎ, যখন নৃতত্ত্ব যাত্রা শুরু করে একটা মানবেতর জগৎ থেকে—ভগবান, অতিপ্রাকৃতিক শক্তি, চরম চিন্তা, প্রভৃতি থেকে—তখন মানুষ তার প্রস্থানবিন্দু নয়, আগমনবিন্দু। তখন তার একটি ধর্মকেন্দ্রিক চরিত্র দাঁড়ায় (এ-কালের নৃতত্ত্ববিদদের এটাই সাধারন ধারণা), সেটা ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত—অথবা, আরো বিস্তৃত ক্ষেত্রে সেটা হয়ে দাঁড়ায় 'নানা ধর্মীতা' যখন সেটা মানবেতর ঘটনাবলীর প্রভাবাধীন হয়—সাধারণ ভাষায় একে অতিপ্রাকৃতও যে বলা যায় তাও নয়। "নানা ধর্মীতা" সেইজন্য "ধর্মকেন্দ্রিকতা"র চেয়ে ব্যাপকতর একটা ধারণা। ধর্মকেন্দ্রিক নৃতত্ত্ব (যথা খৃষ্টীয় ব্যক্তিস্ববাদ) নানাধর্মী, কারণ এটা মানববিশ্ব সম্পর্কে ঈশ্বরের সর্বোচ্চ এবং নিয়ন্তার ভূমিকার ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত ; কিন্তু হেগেলীয় নৃতত্ত্ব যদিও 'নানাধর্মী' তবু ধর্মকেন্দ্রিক নয়, কারণ চরম চিন্তাকে ধর্মীয় ব্যবস্থার অতিপ্রাকৃতিক শক্তির মতো একটা ভূমিকা দান করা হয়েছে।

স্বভাবতই নৃতত্ত্ববিদ্যার প্রস্থানবিন্দু আকস্মিক কিছু নয় ; এটা যে বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির কাঠামোর মধ্যে নৃতত্ত্বকে গড়ে তোলা হয়েছে তার সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এটা ভাবা ভুল যে, নৃতাত্ত্বিক থিয়োরী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির পটভূমিকা এবং "দার্শনিক অনুমানগুলিকে বাদ দিয়েই" গড়ে তোলা যায়। একজন মার্কসবাদী যদি তার চিন্তার নিজস্ব কাঠামো ভেঙে ফেলতে প্রস্তুত না থাকে, তাহলে

যেভাবে তৃতীয় ব্যক্তিস্ববাদ ব্যক্তির ধারণাকে ব্যাখ্যা করেছে, সে কখনো তা গ্রহণ করতে পারে না। আবার উল্টো দিকে অস্তিত্ববাদী অথবা ব্যক্তিস্ববাদী কখনো নিজের অনুরূপ বিপদ না ডেকে এনে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের থিসিস গ্রহণ করতে পারে না।

যখন কোনো নৃতত্ত্ববিদ্যা তার প্রস্থানবিন্দু বেছে নেয়, তখন সেই নির্বাচন শুধু যে তার সাধারণ চরিত্র নির্ধারণ করে তাই নয়, বহু বিশেষ বিশেষ প্রশ্নের বিচারের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যেমন, দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, যে-নৃতত্ত্ব অতিপ্রাকৃত শক্তি এবং তার সৃষ্টির অস্তিত্ব স্বীকার করে, সে নৈতিক দায়িত্বের সমস্যাকে একভাবে দেখবে, আর যে-স্বনির্ভর নৃতত্ত্ব বস্তুবাদকে মানুষের স্বয়ংসৃষ্টির মতবাদের সঙ্গে মিলিয়ে নেয়, সে সেটাকে অন্যভাবে দেখবে। এবং এটা একটা কারণ যে-জন্য দার্শনিক নৃতত্ত্বের একটা পরিষ্কার আদর্শগত চরিত্র থাকে।

"আদর্শ" শব্দটা যতরকম চলতি অর্থে ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে আমরা এটা "সমাজতান্ত্রিক আদর্শ", "বুর্জোয়া আদর্শ" প্রভৃতি যে-অর্থে ব্যবহৃত হয় এখানে সেই অর্থ সম্পর্কেই আগ্রহান্বিত। এই শব্দের মধ্যে যেটা অন্তর্নিহিত আছে সেটা হচ্ছে, মতামত এবং দৃষ্টিভঙ্গি যা সামাজিক বিকাশের গৃহীত লক্ষ্য বা এক ধরনের মূল্যজ্ঞানের পদ্ধতি সম্পর্কে জনগণের সামাজিক আচরণকে প্রভাবিত করে। এই ধরনের ব্যাখ্যাত "আদর্শের" মধ্যে দার্শনিক নৃতত্ত্বও থাকবে, সেটা এই ধরনের একপ্রকার মতামত প্রকাশ করবে। এর অর্থ এই নয় যে, নৃতত্ত্ব 'প্রত্যক্ষ' কার্যকর এবং বিশেষত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হাজির করে—কিন্তু এ-ধরনের 'অপ্রত্যক্ষ' যোগসূত্র নিশ্চয়ই বিদ্যমান থাকে। এই কারণেই দার্শনিক নৃতত্ত্ব একটা আদর্শগত সংগ্রামের ক্ষেত্র, বিভিন্ন চিন্তা এবং ভাবধারার রণভূমি। যেমন, একটা বিশেষ দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে যে, ব্যক্তির ধারণা একটা অতি বিমূর্ত (abstract) সমস্যা, অথচ এটা তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি করে—সে-বিতর্কের প্রকৃতি এবং প্রতিক্রিয়া মাত্র তখনই অনুধাবন করা যায় যখন তার আদর্শগত তাৎপর্য হিসাব করা যায়, অর্থাৎ মানুষের সামাজিক আদর্শসৃষ্টির ক্ষেত্রে এবং সেইভাবে তার আচার-আচরণের ক্ষেত্রে এর প্রভাব অপ্রত্যক্ষ হলেও হিসাব করতে হয়। ব্যক্তি সম্পর্কিত থিয়োরির কোনো একটিকে অনুসরণ করতে দেখে প্রত্যক্ষভাবে কোনো কার্যকর সিদ্ধান্ত করা যায় না, কিন্তু অপ্রত্যক্ষভাবে এরূপ সিদ্ধান্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আর এখানেই শেষ বিচারে ব্যক্তির ধারণা এবং সাধারণভাবে দার্শনিক নৃতত্ত্বের এত সামাজিক গুরুত্ব।

অনুবাদ : গোলাম কুদ্দুস

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

মৎস্যভেদ

ইচ্ছেমতো বেরনো গেলে কখন পৌঁছে যেত। সূর্য লাল হয়ে গোঁজিয়ে ওঠার অনেক আগে। এবং ততক্ষণে ঠিক জায়গাটি বেছে নিয়ে বসে পড়ত। চারের চেলাগুলো বেলাবেলি জলে ফেলা হলে সন্ধ্যার শুরুতেই মাছ বুদ্বুদ কাটত চারঘাটায়। কিন্তু কুসুমের ঝামেলা মেটাতে গোটা দুপুর কখন গড়িয়ে গেছে। বিকেলও মজে গেছে একটু করে। এবং এইসব ভেবেই কান্তর মেজাজ চটকে গেল।

মাটির ভাঁড় থেকে মস্ত কুচ্ছিতকালো একটা কেঁচো বের করছিল সে। বঁড়শীতে গাঁথতে গিয়ে দেখল বেজায় তড়পাচ্ছে। তখন জমাট ক্রোধটা ফেটে সোজাসুজি ছিটকে পড়ল। 'মাগীর গুহ্যতে এমনি করে বঁড়শী বিঁধিয়ে দেবে বড়বাবু!'

পাতকুড়ো রাশিকৃত কাঁচা ঘাস ছিঁড়ে কাদার উপর পরিপাটি সাজাচ্ছে। সারাটি রাতের একাসনে নীরব তপস্যার ব্যাপার রয়েছে। পাতকুড়ো বার বার পরখ করে দেখছে, কতটা পুরু হলে পচা পাঁকের রস পাছায় ছোপ ধরাবে না। এখন সে বাবার আচমকা গালমন্দ শুনে একটু থামল। প্রশ্ন করে বসল, 'কেন, বাবা?'

'থাম রে ছোঁড়া!' কান্ত হাঁকড়ে উঠল। 'যেন বিচারকর্তা বড়বাবু এলেন!' কেঁচোটা স্প্রীঙের মতো পাক খাচ্ছে। ভীষণ মুখব্যাদান করে, অথচ খুবই আরাম পাচ্ছে এরূপ ভঙ্গিতে তাকে বঁড়শীতে ঢোকাতে থাকল সে। অথচ একবার নয়, দুবার 'বড়বাবু' নামক মারাত্মক শব্দটা নিজস্ব অভ্যাসে ও ক্ষিপ্রতায় আস্তে আস্তে কখন ছোটবাবু হয়ে গেছে। কান্ত তখন থেমে মুখ তুলল। ছোটবাবুকে দেখতে থাকল। ছোটবাবু আকাশ হয়ে গেলে, বৌ কুসুম ডুকরে ডুকরে ছটফট করে গড়াচ্ছে তার ঢালু নীলধূসর মস্ত খোলে। কুসুম আজ বারো বছর ছোটবাবুর বাড়ি যায় নি। বন থেকে তাড়া দিয়ে শেকলে আস্ত একটা বাঘিনী বেঁধেছিল এমতো গর্ব কান্তর মনে লালিত হয়েছে। তাছাড়া বারো বছরের মধ্যে ছোটবাবুর মৃত্যুও

একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সেবার ঘরে ফিরে কান্ত ছাখে যে কুসুম ভয়ানক কেঁদেছে। চোখ ফুলোফুলো, লালচে গাল—খুবই রগড়া-রগড়ির ব্যাপার এটা। তেড়ে মারতে গিয়ে কান্ত থেমে যায়। কুসুম তখন বলেছিল, 'সারা গ্রাম কাঁদছে, পিথিমী কাঁদছে, আমি কোন ছার।' মহাত্মা, সাধুপুরুষ…কান্ত আকর্ণ হেসেছিল। কুসুম ফের বলেছিল, 'দায় পড়েছে আমার! তোমার সঙ্গে বিয়ে না হলে এখনও ঝিগিরি করতাম ও-বাড়িব। কাঁদতেও হত।' এবং তখন এই পাতকুড়োর বয়স সাত। এখন পাতকুড়ো চলতি হিসেবমতো সাবালক অর্থাৎ বারোয় পৌঁছেছে। এ বয়সে এইসব ছেলেরা বাবার মনে রীতিমতো আশার সঞ্চার করে। কেবল মাঝখানে ছোটবাবু থেকেই সব উল্টো ঘুরে গেছে। কান্ত সবসময় ছোটবাবুকে চারপাশে উপরে নিচে সবখানে, সুমুখে ও পেছনে ভ্রমণ করতে ছাখে। ছোটবাবুর গতরের রঙ ছিল সোনালী শামুকের মতো। কিংবা ফসলের খাড়া শীষের মতো। তাই শামুক, ধানের শীষ, দেখলেই বড্ড ভাবায় কান্তকে। পৃথিবীটা যেন এইসব অদ্ভুত বস্তুতে গড়া। কোষে কোষে এই উপাদানগুলো অলঅল করে। পোকার মতো নড়ে। শব্দ করে। রক্তমাংসে ওতপ্রোত-সংলগ্ন একটা অমানুষিকতা। কুসুমও ছাড়া নেই এর থেকে। কুসুমের নিঃশ্বাসে গায়ে-গতরে সেই কটু গন্ধ, তেতো স্বাদ। তাছাড়া পাতকুড়ো, এই পাতকুড়োও তো…মধ্যে মধ্যে ভীষণ কোনো হঠাৎ-আবিষ্কারের মতো কান্ত লাফিয়ে ওঠে। ওই তো, ওই তো…তারপর কান্ত কিছু দেখতে পেয়ে স্বপ্নের ভিতর ছুটোছুটি করে। মধ্যে মধ্যে ছোটখাটো স্বপ্নও ছাখে। ঘনঘোর অরণ্যে একা একটা বাঘ মারতে বেরিয়েছে। কোপ তুলে দেখল বাঘটা কানা। কানা কিংবা মরা। ককিয়ে উঠতেই কান্তর ঘুম ভেঙেছে।

'বাপ্পোত, জানগম্যি থেকে টানা স্বপ্নই চলেছে। আগলাম না রে বাপু।' কান্তর প্রচণ্ড ইচ্ছে, মাথায় বাড়ি-টাড়ি মেরে এই লম্বা ঘুমের টানা স্বপ্ন থেকে ওকে জাগিয়ে দেওয়া হোক। ছোটবাবু, কুসুম, পাতকুড়ো…কী কুচ্ছিত সব চলেছে।…'শালা, আগুন জালিয়ে লঙ্কাকাণ্ড করে দোব একেবারে।' কিংবা একপাত্র গলায় চেলে তুখোড় চেঁচিয়ে: 'দোব লাথি মেরে সব ভেঙে…' পা তুলে ভাঙার যোগ্য কিছু নয় দেখে কিংবা অসমর্থতায় কান্ত আরও কয়েক পাত্র গিলে কেঁদে গান করে। অথবা গান করে কাঁদে। শেষে কান্ত ছোটবাবুর পাল্টা এই 'বড়বাবু'কে জুটিয়ে নিয়েছিল।

ইতিমধ্যে কখন রোদ ফুরিয়েছে মহলার বিলে। ধূসর কয়েক পোঁচ আলো গায়ে-গতরে গাছপালায় ছড়িয়ে আছে। বিলের জলে ঘননীল কুয়াশা দুলতে দুলতে এগোচ্ছে। জলে এখন একটু-একটু কাঁপন। ভিতরের দিকে তাকিয়ে কান্তর মনে হল, আসল জগৎ বুঝি ওটাই। মনে মনে বলল, 'দিই এক্ষুনি ডুব...' কিন্তু হাল্কা পেটটা কেবল লাটিমের মতো পাক খাচ্ছে জেনে লোভ ও ভাবনাকে থামিয়ে রাখল।

এবং কান্তকে বিভ্রান্তমুখে জলের দিকে তাকাতে দেখে পাতকুড়ো ফিকফিক করে হেসে উঠেছে।

কান্ত ধমকাল। 'হাসলি যে?'

'কী দেখছ, বলতে পারি।'

'না বললে তোর মায়ের মুণ্ডুটা চিবিয়ে খাব।' কান্তও এবার হো হো করে হাসল। কাঁহাতক আর এমনি স্যাঁতসেতে থাকতে ইচ্ছে করে। এখন এই সুপ্রাচীন মহলা বিলের নির্জনতাটা ঠাণ্ডার তেলঘামে ভরা। বিন্দুবিন্দু চোঁয়াচ্ছে চারপাশ থেকে। শিশির ইতিমধ্যে পলিমলিন ঘাসগুলো দুমড়ে দিয়েছে। হাল্কা কুয়াশার ফাঁকে উড়ন্ত বুনোহাঁসের দৃশ্য ও পাতকুড়ো না থাকলে মনে হত ত্রিপূর্ণীর ঘাটের চাঁড়াল হবার জন্যে তাকে এখানে আনা হয়েছে।

পাতকুড়ো এসে কাঁধে হাত রাখল। ফিসফিস করে বলল, 'মাছটা দেখতে পেয়েছ?'

কান্ত চমকাল। 'মাছ?'

ছোট্ট করে 'হুঁ' দিয়ে পাতকুড়ো তর্জনী তুলে চারঘাটা দেখাল। চারঘাটায় জল কাঁপছে। খুঁজে খুঁজে কান্ত দেখতে পেল শেষে। লম্বা কালো একটা রেখা জলের উপর টানটান হতে চেষ্টা করছে। নাকি অন্য কিছু। চলপেটের উপর ঘূর্ণীপাকটা থেমে গেছে। রোম শিরশির করছে। বড় পুরনো এই মহলা বিল। অবিশ্বাসী চোখে কিছুটা হতাশ ও নিস্তেজ স্বরে কান্ত বলল, 'মাছ না কোনো রাজামহারাজা!' ফের ম্লান হেসে বলল, 'বাবু-টাবু হবে। বড় কিম্বা ছোট।'

পাতকুড়ো সাবধানে হাসছে। 'বেচলে অনেক চাল হবে। ভাত খাবো...' মুখ কান্তর কাঁধে ঝুঁকিয়ে দিয়েছে সে। নিঃশ্বাসের গন্ধটা বেশ লোভাটে। তারপর ছলাৎ করে একটু লালা কান্তর কাঁধটায় মেখে গেল। পাতকুড়োর

ভাতখাবার ইচ্ছের ছোটবাবু থুথু ফেলল এরূপ দ্রুত সিদ্ধান্তে, অত্যাসমতো, কান্ত সজোরে পিঠটা নাড়া দিল তৎক্ষণাৎ।

পাতকুড়ো বিরস মুখে সরে গেল। ও জানে না বাবা কেন অকারণ এমন তেড়েমেড়ে ওঠে। এবং এইসব ভেবে একটা ফাঁড়িঘাস উপড়ে নিয়ে তার নলে জল ভরে ফুঁ দিতে থাকল সে।

কান্ত ততক্ষণে সার সার তগি পুঁতেছে। একটা করে সুতো খুলছে নল থেকে আর বঁড়শী ও ভারা সমেত ছুঁড়ে ফেলছে চারঘাটায়। চারঘাটা খুব ঘুরে হয়ে গেছে দেখে সে আবার একটা অশ্লীল গাল দিল। সব তগি ফেলা হলে তখন পা ছড়িয়ে বসল কান্ত। বিড়ি জ্বালল এতক্ষণে।

মাছের রেখাটা আর দেখা যাচ্ছে না। জলের উপর ধূসর তেলতেলে রঙটাও নেই। বরং স্থিরভাবে তাকালে জলের নিচে কয়েকটি নক্ষত্র দেখা যায়। তারা ভীষণ কাঁপছে। তাদের হলুদ রঙ জলে গুলে যাচ্ছে। পাতকুড়ো বাবার সম্পর্কে ক্ষুব্ধ হচ্ছিল। একদিন, ঠিক কবে মনে পড়ে না, বাবা যেন ওকে সেই শেষবার খুবই চুমু খেয়েছিল…যেন, যেন পাতকুড়ো তখন জলের নিচে অমানুষিক যুদ্ধে লিপ্ত থাকার পর। পাতকুড়ো ভাবল, মাছটা ধরা গেলে বাবা ও সে উভয়ে খুশি হবে। তখন একবার বাবার কোলে চাপতে চাইলে বাবা অনেক চুমু খাবে তাকে।

কান্ত বিড়ি ছুঁড়ে ফেলে এতক্ষণে ডাকল, 'পাতকুড়ো!'

পাতকুড়ো মুখ তুলল। 'বলো।'

'একটা কথা বলবো তোকে। এখন তুই সোমত্ত হয়েছিস। বলা উচিত।' বেশ শান্তভাবে কথা বলছে কান্ত।

পাতকুড়ো খুশি হয়েছে। ভিতরটা হাসিতে ফেটে পড়ছে তার।

'একটা বিচারের ভার তোকে দিচ্ছি।'

'উঁ?' অবাক হয়ে পাতকুড়ো প্রশ্ন করল।

'নেয্য বিচার। বুঝেছিস?' কান্ত বলল। 'মন দিয়ে শুনে যা।'

'বলো।' পাতকুড়ো গম্ভীর হয়েছে এবার।

'ছোটবাবু নামে একটা রাজামহারাজা মানুষ ছিল। তার বাড়ি ঝিগিরি করত একটা মেয়েমানুষ। আর তার চাকরও ছিল একটা। সে পুরুষমানুষ। তারপর…' ঢোক গিলে কান্ত ফের বলতে থাকল। 'যোয়ান পুরুষ আর যুবতী মেয়ে। ছোটবাবু বড় দয়ালু। তাদের বিবাহ দিলেন। কিন্তু…'

পাতকুড়ো ঘামছে। এ সব ঘটনার কোনোরূপ প্রতিক্রিয়া অনুভব করছে না সে। কেবল কান্তর অদ্ভুত ভঙ্গিটা তাকে আকৃষ্ট করে তুলল।

'কিন্তু—কিন্তু মেয়েটি অনেকদিন ছোটবাবুর বাড়ি ছিল। আর ছোটবাবুটা তাকে…' কান্ত থামল হঠাৎ। তার চোখদুটো পিটপিট করছে। বমি করার মতো সশব্দে থুথু ফেলল সে।

তখন পাতকুড়ো না হেসে থাকতে পারল না। বাবাটা যেন সবসময়ই নেশায় চুর। কী বলে, কী করে, বেশ সঙ একখানা। এবং বেশ জোরে ফিক ফিক করে হাসতে থাকে পাতকুড়ো।

কান্ত ধমকাল। 'হাসিস নে। এটা হাসির কথা না। এ একটা সমিস্তে। রক্তারক্তি সমিস্তে।'

হাসি থামিয়ে ভয়ে ভয়ে হাঁটুর ফাঁকে মুখ ডুবিয়ে রাখল পাতকুড়ো। অন্ধকারে একটা কাঁড়িঘাস টেনে ধরেছে সে। বাবার 'রক্ত' ও 'সমিস্তে' তাকে প্রকৃতই বিচলিত করেছে। কিন্তু কিছু করার নেই জেনে অথবা এইসব হঠকারিতায় কালকের ভাত খাওয়াটা বিপন্ন দেখে দ্রুত উঠে এল। 'বাবা, মাছটা পালিয়ে যাবে। কথা বলো না।' কান্তর মুখে হাত রেখে ফের বলল পাতকুড়ো, 'এখন চুপচাপ থাকো।'

তখন কুয়াশা আরও ঘন হয়েছে। আকাশ সেই ঘনীভূত কুয়াশার ধাঁধে ধাঁধে আটকে গেছে। অন্ধকারে তারপর জোনাকি জ্বলল। জোনাকিগুলো জলের উপর ঘুরঘুর করল। কান্তর চুলে বসল। কান্ত এসব কিছু টের পাচ্ছে না। কিংবা জেনেশুনেও চুপ করে আছে। অনেক দূরে নীল অন্ধকারের গভীর থেকে বুনো হাঁসের পাখনায় ও ঠোঁটে জলভাঙার শব্দ শুনতে পাচ্ছিল পাতকুড়ো। ছল, ছল,…গম… গম। মাথার ভিতর মনে হয়। ক্রমাগত সেই সব ধ্বনি শুনে পাতকুড়ো আর স্থির থাকতে পারল না। অস্ফুট স্বরে বলে উঠল: 'ওরা কারা ?'

'ওরা বেশ আছে। বুঝলি রে ছোঁড়া ?' কান্ত বলল। 'ওই জল-কন্যারা।' এবং ঠিক তখুনি একটা তগির সুতো হঠাৎ পাক খেয়ে খুলতে থাকল। বাঁশের নলটা চরকীর মতো ঘুরে ঘুরে খড় খড় শব্দ করছে। সুতোটা ভীষণ বেগে জলের ভিতর দৌড়চ্ছে।

খ্যাচ মেরেই কান্ত বুঝল মাছটা বড়ো। এবং দারুণ বিঁধেছে। উৎকট উল্লাসে হাঁকরে উঠল সে।

পাতকুড়ো উত্তেজনায় হাততালি দিতে থাকল। তার মাথায় ভাত খাওয়ার পাগলামিটা ফেঁকে উঠেছে। কুসুম জীবন্তীর বাজারে যাবে এবং অনেক চাল, মুশুরী ডাল, আধপো লঙ্কা...অর্থাৎ কুসুম আসবার সময় ঠিক যা যা বলেছিল, ঝাঁকবন্ধ ওড়াউড়ি শুরু করেছে ভিতরদিকে। পাতকুড়ো সামলাতে না পেরে কেঁদেকেটে দে বলে ফেলল, 'পালালে আর বাড়ি যাওয়া হবে না।'

কান্ত সুতো সাবধানে ধরে আছে। কখনও ঢিলে রাখছে, কখনও টানটান। পাতকুড়োর কথা শুনে বলল, 'গামছা পড়ে নে। নামতে হবে।' কান্তর আঙুলে সুতো কেটে বসে যাচ্ছিল। বার বার আঙুল বদলাতে হচ্ছে। এবং একটু করে কাতরানির পর পাছায় আঙুলের রক্ত মুছে নিচ্ছে। এরপর সুতোটা আচমকা স্থির হলে কান্ত হতাশভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'ঝাঁঝরিতে আটকেছে।'

পাতকুড়ো ঝুঁকে পড়ে সুতোটা দেখল।

অন্ধকারে জুলজুল করে তাকাচ্ছে কান্ত। পাতকুড়োর মুখ দেখার চেষ্টা করছে সে। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'নেমে যা দিনি জলে।'

পাতকুড়োর ছেলেমানুষ গতর শিরশির করছে। চারপাশে তাকাল সে। কুসুম বলেছিল, 'বাপবেটায় যাচ্ছিস, হাসিমুখে ফিরলে ভালো। নৈলে...' নৈলে কিছু ঘটে যেতে পারে হয়তো। এবং কুসুম মস্ত ঢোক গিলে তখনই তার জীবন্তীর বাজার, চাল-ডাল-লঙ্কার কথাটা প্রকাশ করে। শুনতে শুনতে তখন যে-লালা জমল পাতকুড়োর গালে, এখন অব্দি একটানা চলেছে। এখন ক্ষিপ্র হাতে গামছা পরে নিয়ে চিবুক ও ঠোঁটটা রগড়াচ্ছে।

পাতকুড়ো কুতকুতে চোখে বিলের পুরনো ও অন্ধকার জলের দিকে তাকাল। একটু সময় ধরে বাবাকে স্পর্শ করে থাকল। তার প্রশ্ন করার ইচ্ছে: মাছটা কি ভীষণ জ্যান্ত? কিন্তু পারলে না। কান্তর গলা ঘড়ঘড় করছে। অর্থাৎ কাসি সামলাচ্ছে। পাতকুড়ো জানে এ সময় বেশি শব্দ করতে নেই।

কান্ত ফের ফিসফিস করে উঠল: 'যাবি নে রে ছোঁড়া?'

পাতকুড়ো জলের উপর অন্ধকার দেখছে। কুয়াশা দেখছে। এখন ওই অন্ধকার ও কুয়াশাকে তার পরম সুখের আকর মনে হচ্ছে। পাতকুড়ো

মুখ তুলে আকাশে নক্ষত্র দেখল। বুনো হাঁসের পাখার শব্দও শুনতে পেল সে। এগুলো তাকে খুবই প্রীতভাবে আকর্ষণ করছে। জলের নিচে মড়ার ঠাণ্ডা গভীরতা; সেখানে ওতপ্রোত জড়ানো খাঁজে খাঁজে শুধু হিম। নিঃশ্বাস নেওয়া যাবে না এবং ঝাঁঝরিগুলো সম্ভবত জ্যান্ত। তাছাড়া অধিক জ্যান্ত একটা মাছ, বিপন্ন হলে এরূপ জ্যান্ত হয়ে ওঠা খুবই সম্ভব। পাতকুড়োর বিশ্বাস হচ্ছে যে সবগুলো বঁড়শি বেঁধে নি। শুটিকয় অপেক্ষা করছে তার জন্যে। আস্তে আস্তে পাতকুড়ো অন্য রকমটি হয়ে গেল। এখন তার ছুটে পালাতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু পা তুলতেই কান্তর থাবায় আটকে গেল সে। কান্ত যেন হাঁফাচ্ছে। কান্ত তাকে জলের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। পাতকুড়োর স্মৃতিটা চমকাল তক্ষুণি। কবে এরূপ ঘটেছিল, স্পষ্ট মনে নেই, জলের নিচে দারুণ যুদ্ধ, বাবা ও পাতকুড়ো।···

আর-একটা ঠেলা খেয়ে পাতকুড়ো হুতুমপ্যাচার স্বরে বলে ফেলল, 'তুমিও চলো, বাবা।'

কান্ত বলল, 'মাছটা বড়ো। বেচলে অনেক দাম হবে।' তারপর কান্ত জড়ানো স্বরে একটানা একটি সুখের দিনকে বর্ণনা করতে থাকল। বিনোটিতে শ্যামচাঁদের মেলা বসবে। বেশি দেরি নেই। সার্কেস, হাতি ঘোড়া বাঘ ভালুক ও সাপ, সিংহ ও মেয়েমানুষ—যার গতরে হাড় নেই। এবং নতুন জামাকাপড়, রেলগাড়ি, সুখ। পাতকুড়ো মনে মনে জলের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত তখন। কান্ত মোটামুটি একটা বর্ণনা দিয়ে শেষে বলল, 'তোকে দেখলে মাছটা ভয় পাবে না। ছেলেমানুষকে ওরা ভয় পায় না।'

পাতকুড়ো হেসে উঠল ফিকফিক করে।

'আমাকে নামতে দেখলে আরও জ্যান্ত হবে।'

পাতকুড়ো জলে পা ফেলল।

'তুই টেনে তুললে তখন আমিও নামবো।'

পাতকুড়ো ক্ষিপ্রতর পা ফেলে জলে নেমে গেল।

জলে অন্যরকম শব্দ এতক্ষণে। এ সময় কান্ত মানুষের মুণ্ডু এককোপে দু ভাগ করার শব্দ শুনছে। ভীষণ হিংস্র সব দৃশ্য ভাবছে সে। উত্তেজনায় লম্বা কানের নিচেটা জ্বলজ্বল করে কাঁপছে। ফের কান্ত পাতকুড়োর উদ্দেশে বিড়বিড় করে বলল, 'ঝাঁঝরির ভেতর ঢুকে পড়বি। নৈলে ওকে ধরা যাবে না।'

পাতকুড়ো এগোচ্ছে। অন্ধকার জলের উপর প্রতিমার তেলঘামের মতো আধো-আলো। তার ছোট্ট ও চ্যাপটা শরীর ক্রমে হারিয়ে যাচ্ছে। কুসুম, ছোটবাবু, পাতকুড়ো—তার ভাতখাবার ইচ্ছে, বিনোটির মেলা, সার্কেসের অস্থিহীন মোম মেয়েমানুষ এবং প্রাচীন জলের জগৎ, অতিকায় বিষ মাছ, এই সব নানা দৃশ্য সবেগে ঘুরপাক খাচ্ছে। কান্তর বিন্দুকে কেন্দ্র করে এই ঘূর্ণী চলেছে। পাতকুড়োর মাথা জলে ডুবে যাবার আগে ককিয়ে উঠল কান্ত। 'অঃ, অঃ!'

পাতকুড়ো অমনি চমকেছে। 'কী, কী?'

কান্ত সোজা দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল, 'এই জলে সাপ আছে। শঙ্খচূড় সাপ।'

'ইস্!' পাতকুড়ো তাচ্ছিল্য প্রকাশ করছে।

'ছোটবাবুর ভূত।'

'যাঃ!'

'অমানুষী মেয়ে।'

'হুঃ!'

একের পর এক ঘোষণা পাঠ করল কান্ত। ইস্তাহার পড়ার মতো। কিংবা পুরুত যেরূপ মন্ত্র বলে ও বলিয়ে নেয় পাপস্খালনের জন্যে। কিন্তু পাতকুড়ো অস্বীকার করল সবগুলো। মরিয়া হয়ে কান্ত শেষ ঘোষণা পাঠ করল, 'এখানে পিতা পুত্রকে বলিদান করেছিলেন।'

পাতকুড়ো ডুবেছে। জলের বজবজ শব্দ। মোটা মোটা বুজকুড়ি ভাঙছে অন্ধকারে। কান্তর হৃদপিণ্ডে এখনও কুসুমের ভালোবাসার কামড়—যন্ত্রণা চলেছে। বিপন্ন কান্ত চিৎকার করে উঠল, 'পাতকুড়ো, ফিরে আয়!' এই চিৎকার জলের আকাশে কুয়াশার ঝুলন্ত দেয়ালে চোট খেতে খেতে, শিশিরে ভিজে এবং নক্ষত্রের দিকে ব্যর্থ ছোটাছুটি করল। তার প্রতিধ্বনি রাতের অন্ধকার মহলা বিলের উপর ঘুরে ঘুরে বুনো হাঁসগুলোর মতো টুকরো টুকরো ছড়িয়ে গেল জলে।

মধ্যে মধ্যে জলের শব্দ ঘোরালো হচ্ছে। কান্ত বুঝতে পারছে, পাতকুড়ো মাথা তুলে দম নিচ্ছে। তারপর কান্ত খুব সতর্কভাবে চারপাশটা দেখে নিয়ে জলে নামল। জল প্রকৃতই জ্যান্ত। মাংসে কামড় বসিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। কান্ত পাতকুড়োর প্রতি বিস্মিত হল। কদিন ধরে দু বেলা

আবেবাবে শাক কচু বুনোআলু খাওয়ার পর (কুসুম কপালে করাঘাত করে বলে : 'ছোটবাবু বেঁচে থাকলে এ সব হত না!') আগামী সকালে প্রচুর ভাত খাওয়ার সম্ভাবনা কান্তকে তৃপ্ত করতে পারছে না। এবং যতই সে জলের গভীরে পা ফেলছে, গা শিরশির করে মনে হচ্ছে, কোথাও একটা চালাকি করা হয়েছে। দারুণ হঠকারিতায় কান্ত প্রচণ্ড থাবা মেরে হৃদপিণ্ড থেকে কুসুমের দাঁত উপড়ে ফেলল।

কান্ত পাতকুড়োকে ছুঁয়ে বলল, 'আয়, একসঙ্গে ডুব দিই।' পাতকুড়োর হাতটা শক্ত করে ধরে জলে ডুবল সে। ঈপ্সিত জলের জগতে এতক্ষণে সে প্রবেশ করল। কান্ত হাতড়ে হাতড়ে পাতকুড়োর গলাটা খুঁজছিল। তার মনে হচ্ছিল জলের জগতে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সে বদলে গেছে এবং এটাই তার সংগত ও স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। বস্তুত কান্ত এখন হাঙর, সাপ বা অমানুষিক কিছু হয়ে গেছে। অথচ শরীরের কোষে কোষে স্মৃতিগুলো চিড়বিড় করে জ্বলছে। পাতকুড়োকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করার সঙ্গে সঙ্গে বুকে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা অনুভব করল কান্ত। হুড়মুড় করে জল ভেঙে মাথা তুলল। দেখল পাতকুড়োও উঠেছে। ভীষণ হাঁসফাঁস করছে সে। পাতকুড়ো ভেসে থেকে ককাচ্ছে যেন। কান্ত প্রশ্ন করার সাহস পেল না।

পাতকুড়ো মুখ-চোখ থেকে জল মুছে বলল, 'আর একটু থাকলে মরে যেতাম।'

কান্ত সাড়া দিল না।

'অমন করে ধরেছিলে কেন?'

পাতকুড়োর প্রশ্নটা বড় কটু। অতিশয় ঝাঁঝালো। কান্ত তাড়াতাড়ি পায়ের নিচে মাটি পেতে চাচ্ছে। নতুবা সঠিক জবাবটা দেওয়া কঠিন তার পক্ষে। পাতকুড়োকে আবার বিচারকের আসনে বসিয়ে আত্মরক্ষা করতে চাইল সে। ডাকল, 'পাতকুড়ো, এদিকে আয় দিনি।'

পাতকুড়ো কাছে এল। কান্তর সোজাসুজি ভেসে থাকল। অন্ধকার যতই হোক, পাতকুড়োর দাঁতের নির্ভীক হাসি স্পষ্ট দেখা যায়। কান্তর মনে হচ্ছে, জলের জগতে না জানি কতই শক্তি।

কান্ত গলা ঝেড়ে বলল, 'জল ঠিক আয়নার মতো। চেহারা দেখা যায়। তুই তোর চেহারাটা দেখেছিস কখনো?'

স্বরের ঘন ঘন কাঁপন ও বৈচিত্র্য অনুভব করে পাতকুড়োর গা ছম ছম করছে। কান্ত তার হাত শক্ত করে ধরতেই ভাত খাবার ইচ্ছেটা মরে যাচ্ছে। এবং বিনোটির মেলা, জানোয়ার, কাপড়চোপড়, রেলগাড়ি, একে একে এই গা-ছমছম ভয়ের খোঁদলে ঢুকে পড়ছে। সে কান্তর বুকে ঘন হল তখন। কাঁধ জড়িয়ে আদর পেতে চাইল।

কান্ত তাকে ঠেলে দিয়ে জলে নখের আঁচড় কাটতে থাকল। 'তোর মায়ের বিচার কর দিনি।'

পাতকুড়োর কান্না পাচ্ছিল। আজ দুদিন থেকে বাবাকে কোনো নেশা করতে ভাখে নি সে। এই শরৎকালে জীবন্তী বাজারের শুঁড়িখানা ছাড়া সস্তা মাল সচরাচর মেলে না। চালের অভাবে এক সময় গম ভেজাল দিয়ে কান্তকে অন্ননেশার ধেনো তৈরি করতে দেখেছিল। তারপর চালও নেই। নেশা জুটছে না। অথচ লোকটা সব সময় এই নেশাটে গন্ধ শতরে লেপটে ফেরে। কান্তর মুখের কাছে মুখ এনে শুঁকবার চেষ্টা করল সে। কিন্তু শুঁকতে গিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না পেল।

কান্ত ঘড় ঘড় করছে। 'ডুবার চেষ্টা করেছিলাম, পারি নি। একবার কুসুম জেগে উঠেছিল। আরেকবার জলে ছুঁড়ে ফেললাম। তখনও পারলাম না। তক্ষুনি তুলে কোলে নিয়েছিলাম। অনেক চুমু খেয়েছিলাম।'… কান্ত তার হৃদপিণ্ডে ফের সূচের জ্বালা অনুভব করছে। কুসুমের ভালোবাসার দাঁত বিদ্ধ হয়ে আছে এখনও। 'আয়, শেষবার দেখি মাছটা'…বলেই কান্ত অমানুষিক ধরনের হুংকার দিল। হৃদপিণ্ড থেকে ঝাঁকুনি মেরে কুসুমের দাঁতগুলো উপড়ে ফেলল। তারপর পাতকুড়োকে সজোরে ঠেলে ডুব দিল জলে।

জলে ডোবার সঙ্গে সঙ্গে কান্ত জানল এক প্রবলপরাক্রান্ত শত্রুর সঙ্গে যে যুদ্ধে লিপ্ত হতে যাচ্ছে। জলের নিচে কান্তর হাড় মটমট করছে; পেশীগুলো কুঁকড়ে যাচ্ছে। অথচ এই গভীর জগতে সকলই সম্ভবপর। শুধু দুষ্কর্ম সেরে ফেলার ছাড়পত্র পাওয়া যায়। কেবল সময়ের মাপটা একটু ভিন্ন। সময় এখানে বড় চটপটে ও চালাকচতুর। তখন বুক ফেটে ফুসফুস ও হৃদপিণ্ড গলে গলে বদলায়। এদিকে শত্রুও বড় শক্তিমান—প্রতি মুহূর্তে অনুভব করছে কান্ত। পাতকুড়ো বঁড়শির সুতোর উপর পিছলে পিছলে যাচ্ছে। চোখ খুলবার চেষ্টা করে কান্ত দেখল, কুসুমের কাটামুণ্ডু ঝাঁঝরিতে

আটকে আছে। ফুলো ফুলো গাল, সেই সচেতন চোখদুটো। মুণ্ডুতে কোনো দাঁত নেই—যা হৃদপিণ্ডে কামড় বসাতে পারে। সব দাঁত উপড়ে দিয়েছে কান্ত। তারপর কুসুমের মুখমণ্ডল জলের রেখায় রেখায় আঁকিবুকিতে ঘুরপাক খেতে থাকল। ঝাঁঝরি থেকে ঝাঁঝরিতে, ঘন পচা দামের ফাঁকে, আড়ালে, খাঁজে খাঁজে, কুসুম অতঃপর ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে। কান্তর ইচ্ছে ভয়ানক চেঁচিয়ে কথা বলে ওঠে; অথচ বুদ্বুদ ফুটছে ভীষণ শব্দ করে। সুতো স্পর্শ করে এগোল কান্ত। এবং তক্ষুনি পাতকুড়োকে ফের আবিষ্কার করল। সে তার ভাত খাবার ইচ্ছে নিয়ে হিংস্রভাবে ঝাঁঝরির উপর নখের আঁচড় কাটছে। আরো এগিয়ে পাতকুড়োর হাত ও মাছের মুণ্ডুটা অনুভব করে ওদের হ্যাঁচকা টানে টেনে তুলল। জলের উপর হাপরের আওয়াজ করে নিঃশ্বাস পড়ছে। জলের উপর ঘন নীল কুয়াশা জমে আছে। বেশ উষ্ণতা ও বাতাস। দূরে এ সময় একটা আলোও জ্বলতে দেখল। নক্ষত্র দিগন্তের কাছে জ্বলজ্বল করছে। কান্নার পর স্যাঁতসেঁতে মুখমণ্ডলের মতো এখন এই পৃথিবী।

'কাল অনেক ভাত খাবো। তখন যেন গালমন্দ করো না।' উলঙ্গ পাতকুড়ো গামছার জলগুলো নিঙড়ে নিতে নিতে বলল। তার কণ্ঠস্বরে ক্লান্তি ঝরছে।

এবং কান্তও ক্লান্ত। কথা শুনে একটু হাসল। হাসতে হাসতে বিদ্ধ মাছটা তুলে ধরল সে। নক্ষত্রের আলোয় দেখতে থাকল। কান্ত টানা নিঃশ্বাস ফেলে আবার মাছটা দেখল। আসল জগতের গভীর সবটুকু দেখে নিয়েছে যেন। এই বঁড়শি-বেঁধা মাছটার মতো অসহায় সে। এবং পাতকুড়ো। এবং, হয়তো—কুসুমও।

গোপাল হালদার

রূপনারানের কূলে

(পূর্বানুবৃত্তি)

সতীনাথ ভাদুড়ীর অপ্রত্যাশিত মৃত্যুতে (৩০শে মার্চ, ১৯৬৫ ইং) মনে হয়েছিল এখনি না হয় এই সুহৃদটির কথা স্মরণ করি। পরেকার কথা আগে বলতে বাধা নেই,—সাময়িকও হত। কিন্তু সময়ের সে গণ্ডী ছাড়িয়েও সতীনাথ বেঁচে থাকবেন—সাহিত্যে। বন্ধুদের স্মৃতিতেও তাঁর মুখটি থাকবে তেমনি উজ্জ্বল—যে মুখের দিকে তাকিয়ে অনেক তুচ্ছতাকে ছাড়িয়ে ওঠা যায়। অন্তত আমার তো তাই অভিজ্ঞতা। সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর কথা বলবার মতো—বাস্তববোধ যে সত্যবোধেরই সাধনা, আদর্শবাদী সতীনাথের লেখা বাঙলায় তার দৃষ্টান্ত। অসামান্য তাঁর দায়িত্ববোধ, সাহিত্যিক বিবেক, আর অনলস সাধনা। মানুষ হিসাবেও দেখেছি এ গুণেরই সমাবেশ—আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে—মানুষের প্রতি মমতা, তার অন্তরে অন্তর্দৃষ্টি, সাধারণ মানুষের অসাধারণতায় আস্থা, আর গাছ, ফুল, পশু-পাখি, পৃথিবীর তাবৎ জিনিসের প্রতি এক নিগূঢ় রসানুভূতি—প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সহজ আমেজে যে-অনুভূতি গভীর ও স্বচ্ছ, মার্জিত ও সুপরিমিত। তাঁর কথা তাই বলবার রইল—কারণ, কাছ থেকে তাঁর গৃহে তাঁর অতিথিরূপে তাঁকে দেখবার আমার যে-সৌভাগ্য হয়েছে তা আমাকে না বলে স্বস্তি দেবে না। এবারকার মতো পূর্বাপরই চলুক পূর্ব-কথা। লেখক—৩।১।৭২ বাং, ১৬।৪।৬৫ ইং

সত্যেন্দ্র মিত্র

স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের নামটা এখনো বাতিল হয়ে যায় নি। বিশ বছরের বেশি হল তিনি নেই (১৯৪৩)। কিন্তু আমাদের আমলে অর্থাৎ তার আগেকার পঁচিশ-ত্রিশ বছরে তাঁর নামটাই ছিল নোয়াখালির বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম। আমার হিসাবে আবার প্রধান। তবে সে হিসাবটা প্রথমত স্বদেশীর হিসাব, আর পরে ব্যক্তি-সম্পর্কের হিসাব। 'স্বদেশী'র বাইরেও তাঁর পরিচয়টা প্রথম থেকেই স্পষ্ট ছিল—মানুষ হিসাবেই সত্যেন্দ্রচন্দ্র ছিলেন স্বতঃস্ফূর্ত। প্রবল ব্যক্তিত্বের জন্য নয়, বরং অমায়িক ব্যক্তিত্বের জন্যই। বড়োদের স্নেহভাজন, বন্ধুদের সকলের প্রিয় কিন্তু আমাদের

অনুরদের সাক্ষাৎ-পরিচয়ের পক্ষে দুর্লভ—'স্বদেশী'র প্রতিপাল্য গোপনতায় তা প্রয়োজন। সাধারণভাবে অন্য দশজন কলেজী যুবকের মতো তিনি তখন কলকাতায় পড়েন; এম-এ পাশ করে পৈতৃক ধারায় উকিল হবেন, বসবেন হাইকোর্টে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তেমন জ্যোতিষ্ক তিনি ছিলেন না, মোটামুটি ভালো ছেলে। সেই 'জ্যোতিষ্ক'রা দু-একজন ছাড়া কোথায় যায়? খাতাপত্রের গাদায় চাপা না পড়লে হাইকোর্টের রূপোর পাহাড়ে তাদের স্থান। পাঠ্য বিষয় ছাড়িয়ে তাদের অন্য এলেকা মাড়াতে নেই। কিন্তু সত্যেন্দ্রচন্দ্রের ছিল নানা বিষয়ে ঔৎসুক্য। তার চেয়েও বেশি তাঁর উৎসাহ। তাও বেশি বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে গল্পে-আলোচনায়। রাজনীতি তখনি বাঙলা দেশের শিক্ষিতদের গল্প-আলোচনায় একটা বড়ো বিষয়। সে গল্পে তাই সত্যেন্দ্রের আবার আরো বেশি উৎসাহ। ধর্মের কথাতেও তাঁর উৎসাহ। সাধু, সন্ন্যাসী ও ভক্ত মানুষদের প্রতিই তাঁর বেশি ভক্তি। রাজনীতির হেরো 'অরবিন্দ-বারীন্দ্র বা বিপিনচন্দ্র' ব্রহ্মবান্ধব তো অত পথেঘাটে মেলে না। তাঁদের কথা তখনো বলতে হয় চাপা গলায়।

সত্যেন্দ্রচন্দ্রের 'স্বদেশী' পরিচয়টা যখন আমার কাছে পৌঁছয় তখন প্রথম মহাযুদ্ধের কাল। স্বদেশীতে তখন আমার সবে হাতেখড়ি হয়েছে। কিন্তু সাক্ষাৎ-পরিচয় তখনো ঘটে নি—ঘটা সেই 'স্বদেশী'র নিয়মেই হোত অনিয়ম। সান্নিধ্য ঘটার তো প্রশ্নই ওঠে না। অনতিপরেই সত্যেন্দ্রচন্দ্র গ্রেফতার হয়ে অন্তরীন হলেন—তার আগে তিনি আমাকে দেখেন নি, নাম জানতেন কিনা তাও জানি না। প্রথম মহাযুদ্ধ যখন শেষ হল তখন বন্দীরা ছাড়া পান; আমরা তার আগেই কলেজে। সত্যেন্দ্রচন্দ্র (এবার 'সত্যেনদা') একটু দেরিতেই ছাড়া পেয়েছিলেন। তখন তিনি দোমনা হাইকোর্টেই আবার ওকালতিতে বসবেন, না, অদ্বৈত চিন্তাতেই আত্মনিয়োগ করবেন। অবশ্য আরেকটি জিনিসও ছিল তেমনি প্রবল—মানুষের প্রতিও আকর্ষণ। নারী-পুরুষ সকল সমাজে স্বচ্ছন্দ তাঁর সামাজিকতা, আলাপ-আলোচনা, প্রীতি-সৌহার্দ্য; বয়ঃকনিষ্ঠ আর বয়োজ্যেষ্ঠ সকলের সঙ্গে সমান অমায়িকতা আর স্বাভাবিক হৃদ্যতা। আসলে দুটি নয়—তিনটিই ছিল তাঁর চরিত্রের প্রধান লক্ষণ, এ কথা তাঁর অনুগামী ভক্ত ক্ষিতীশ চৌধুরীর। "সত্যেনদার চিরদিনই তিনটি দিকে দেখেছি প্রধান উৎসাহ—স্বদেশীর কথায়, ধর্মের কথায় আর মেয়েদের সঙ্গে আলাপ-গল্পে।" উৎসাহ জিনিসটা ছোঁয়াচে—তিনি যেমন উৎসাহী ওঁদের সঙ্গে ওঁরাও তেমনি দেখেছি উৎসাহী তাঁর সঙ্গে—সাহচর্যে। সেদিনের 'স্বদেশী'দের পক্ষে এই উৎসাহটা

ছিল পরিত্যাজ্য। শিক্ষিত সমাজেই কি খুব তখনো স্বাভাবিক ছিল মেয়েদের সমাজে পুরুষদের কারো স্বচ্ছন্দ গল্প-পরিচয়ের যোগাযোগ? তার উপরে 'স্বদেশী'দের তো 'সিরিয়াস্' না হলেই নয়। মেয়ে জাতটার সঙ্গে গল্পে-পরিচয়ে 'খেলো' হওয়া কি তাদের সাজে? অদ্বৈতবাদীদের তো আবার কথাই নেই—নরকস্য দ্বারং নারী। কিন্তু সত্যেন্দ্রচন্দ্রের মন্ত্র শঙ্করের ও-মন্ত্র নয়, আর 'স্বদেশী'র ওই কোড্ অব কন্‌ডাক্‌ট্‌ও অপ্রযোজ্য। তাঁর উৎসাহী মন জীবনের উৎসাহে আনন্দে মেয়ে-পুরুষ সকলের কাছে স্বচ্ছন্দ।

স্বদেশীযুগের টানে কী করে সত্যেন্দ্রদা বিপ্লবী রাজনীতির খাদে এসে গিয়েছিলেন, তা আমি শুনেছি,—আমার দেখা অধ্যায় তা নয়। বরিশালের 'শঙ্কর মঠে'র স্বামী প্রজ্ঞানন্দের শিষ্যরা তা বলতে পারবেন, অর্থাৎ এখনকার 'শ্রীসরস্বতী প্রেস'-এর বয়োজ্যেষ্ঠ কর্তৃপক্ষ। কিন্তু উৎসাহী হলেও সত্যেন্দ্রচন্দ্র রুদ্র প্রকৃতির নন। উদ্দীপনা থাকলেও তাঁর মেজাজ ছিল সকৌতুক অনুগ্রতার। দুঃসাহসিক ও দুঃসাধ্য কর্মে তাঁর আকর্ষণ ও কুশলতা না থাকারই কথা, ছিল বলেও জানি না। শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেষভাগে আমাকে একদিন কথাসূত্রে বলেছিলেন, 'এ পর্যন্তই আমার কাজ—ওদের (রুদ্রপন্থীদের) আশ্রয় ও সহায়তা দান। এর বেশি আগেও করি নি, এখনো না।' তখন (১৯৩৮) তিনি তখনকার জোড়া বাঙলার আইন-সভার দ্বিতীয় কক্ষের সভাপতি। এম-এ পাশ করে যখন (১৯১৪-১৯১৬) হাইকোর্টে ওকালতি করছিলেন তখনো কি ছিল এই তাঁর 'স্বদেশী' কর্ম? বোধহয় আরও কিছু ছিল। তখন গুপ্তসমিতির গোষ্ঠিতে সাজ-সাজ রব; দেশ-জোড়া চাপা উত্তেজনা—অস্ত্র-সমেত জার্মান যুদ্ধজাহাজ এলো বলে। সকল বিপ্লবী দলের সমবেত কার্যক্রম ও মন্ত্রণাও চলছে—বাঘাযতীন যার করতেন সেনাপত্য, যতীন মুখুজ্জের পরিচালনাতেই তাঁর সহকর্মীরা করছিলেন কলকাতায় দুঃসাহসিক মোটর-ডাকাতি; অর্থ সংগ্রহ, অস্ত্র সংগ্রহ। সম্ভবত সকল দলের পরামর্শে ও মন্ত্রণায় তখন সত্যেন্দ্রচন্দ্রও ছিলেন একজন মুখপাত্র। ১৯১৬ সালে তাই সত্যেন্দ্রদা গ্রেফতার হন; তা 'কৃষ্ণনগর ডাকাতি'রই একটা জের। সে ডাকাতির সম্পর্কে যাঁরা গ্রেফতার হয়েছিলেন তাঁরা অনেকেই ছিলেন সত্যেন্দ্রচন্দ্রের বিশেষ অনুগামী। নোয়াখালিরও কেউ কেউ—দুঃসাহসের সর্দার নরেন ঘোষ চৌধুরী থেকে আমাদের অগ্রজ কর্মী ক্ষিতীশ রায়চৌধুরী পর্যন্ত।

সত্যেন্দ্রদা অবশ্য গ্রেফতার হলেন ডাকাতির দায়ে নয়, দলের পরামর্শদাতা

সন্দেহে, তখনকার ভারতরক্ষা আইনে। অন্তরীন থাকেন পদ্মার একটা চরে। মুক্তি পেয়ে ফিরে এলে পেলাম সাক্ষাৎ-পরিচয়। কলকাতায় ওকালতিতে বসছেন—আমরাও কলকাতায় পড়ি। সহকর্মীদের নেতা, পুরনো দিনের স্বদেশীদেরও অনেকের বন্ধু, তাঁর গৃহে তাঁদের দেখাশুনা পরামর্শের কেন্দ্র। দেখতাম পুলিন দাস মশায়কে, মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ীকে আর তখনকার জ্যোতিষ্মান্ ইদানীংকার অস্তমান অনেক স্বদেশী দাদাদের। ডায়ার-ওডায়ারের জলি-যন্ত্রণায় দেশের প্রাণ তখন জলছে। সত্যেন্দ্রচন্দ্র ও তাঁর স্বদেশী বন্ধুরা অনেকে আকৃষ্ট হলেন তার প্রতিবাদে কলকাতায় স্পেশাল কংগ্রেসে (১৯২০)। নির্বাসন-শেষে লাজপৎ রায় সবে দেশে ফিরেছেন, তিনিই প্রেসিডেন্ট। গান্ধীজীর নন-কো-অপারেশন প্রস্তাব সেখানেই গৃহীত হয়। কিন্তু সে অন্য ইতিহাস—কংগ্রেসের দ্বিতীয় জন্মের কথা। সত্যেন্দ্রচন্দ্র তখনি চিত্তরঞ্জনের অনুগামী হন—আমরণ তিনি সে মানুষেরই ছিলেন ভক্ত—তাঁর নেতৃত্বে, আর তার থেকেও বেশি চিত্তরঞ্জনের ব্যক্তিত্বে ও প্রাণবত্তায় মুগ্ধ।

সত্যেন্দ্রচন্দ্র গান্ধীজীর নীতিতে বিশ্বাস করতেন না, তাঁর পদ্ধতিতেও না। পা বাড়িয়ে জেলে যেতে তাঁর আগ্রহ ছিল না। এমন কি, আমাদের মধ্যে যাঁরা ভালো ছেলে, নন-কো-অপারেশনে কলেজ ছাড়তে আর জেলে যেতে উদ্‌গ্রীব, তাঁদেরও তিনি উৎসাহ দিতেন না। বাধাই দিতেন—'জেল-ভরাবার লোকের অভাব নেই। জেলের ভয়-ভাঙার কাজ শেষ হয়েছে। জেল-ভাঙার দিনই আসছে।' দশজনের কাছে তাঁর জেলে না-যাওয়াটা অপরাধ। আমরাও সেরূপ তর্ক করতাম। তিনি হাসতেন। 'আরও বড়ো জাগরণ আসছে। গান্ধীজী তাকে রূপ দিতে না চাইলে অন্যরা রূপ দিবে। ততক্ষণ জীইয়ে রাখতে হবে আন্দোলন।' এল তাই স্বরাজ্য পার্টি গঠনের আবশ্যকতা। সত্যেন্দ্রচন্দ্র ছিলেন সুভাষচন্দ্রের পরেই দেশবন্ধুর অনুগত কর্মী। স্বরাজ্য পার্টির মেম্বর রূপে নির্বাচিত হলেন (১৯২৩?) বাঙলার কাউন্সিলে। তখনকার গঠন-চক্র মন্ত্রিত্ব ভাঙার কাজে, চতুর কর্মী। শীঘ্রই (১৯২৪) বিপ্লব-যোগাযোগের জন্য গ্রেফতার হয়ে গেলেন মান্দালয়ে—সুভাষচন্দ্রের সতীর্থরূপে। ফিরে এসে যখন আবার কাজে নামলেন তখন দেশবন্ধু নেই, সুভাষচন্দ্র তাঁর অভিপ্রেত নায়ক। সত্যেন্দ্রচন্দ্র তখন নির্বাচিত হলেন কেন্দ্রীয় আইন-সভায়। কিন্তু 'স্বদেশী'দের পুরনো দলাদলি মাথা চাড়া দিয়েছে, যাদুগোপাল মুখুজ্জের

চেষ্টায় গড়া স্বদেশীদের ঐক্য ১৯২৮-এর কলকাতা কংগ্রেসের পরেই ভেঙে গিয়েছে। 'যুগান্তর' গোষ্ঠী জুটেছে সুভাষের চতুষ্পার্শে, 'অনুশীলন' দলের আশ্রয় সেনগুপ্ত। সুভাষ-সেনগুপ্ত দ্বন্দ্বে সত্যেন্দ্রচন্দ্র সুভাষপন্থী, আমাদের কারও কারও তাতেও আপত্তি। কিন্তু শুনবেন কেন? তিনি যুগান্তরের মানুষ, সুভাষচন্দ্রেরও বন্ধু।

দিল্লীতেই অবশ্য তাঁর তখন কর্মক্ষেত্র—আর তাও আইন-সভায়। বক্তৃতায় তিনি বরাবরই বিমুখ। কিন্তু মানুষের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে চরিত্র-মাধুর্যে তাকে বন্ধু করে নিতে অদ্বিতীয়। কর্মকৌশলে বিরোধীকে বাগে আনতেও সিদ্ধহস্ত। দিল্লীর আইন-সভায় পণ্ডিত মতিলাল তখন নেতা। সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র তাঁর অধীনে দলের কর্মকুশল 'চেতক' বা 'হুইপ'। ভোটাভুটিতে কংগ্রেস পার্টিকে জয়ী করতে তাঁর সামাজিকতা ও বুদ্ধিচাতুর্য কোনোটারই কম দরকার হোত না।

এই মিত্রলাভ-মিত্রভেদের খেলায় যখন তিনি জমেছেন, তাঁর কৃতিত্বও সে ক্ষেত্রেই বিকশিত, তখন এল আবার গণ-আন্দোলনের জোয়ার, আইন-অমান্যের পালা (১৯৩০)। আবার কাউনসিল বয়কটের ডাক, গান্ধীজীর দ্বিতীয় সংগ্রাম। 'রীপিট দি মিক্শ্চার'-এ সত্যেন্দ্রবাবু অবিশ্বাসী—কাউনসিল বয়কটে অস্বীকৃত,—তাঁর বিপ্লবী বন্ধুদেরও তাই ছিল পরামর্শ। কিন্তু ওদিকে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের (১৮ই এপ্রিল ১৯৩০) সঙ্গে তাঁদের সশস্ত্র সংগ্রামও শুরু হয়ে গিয়েছে। এদিকে দেশও তাঁর কাজে সায় দিতে চায় নি। আমরাও মানতে চাই নি। অবশ্য তিনি আইন-সভার সদস্যপদ পরিত্যাগ করে পুনর্নিবাচনে দাঁড়ালেন, নির্বাচিত হলেন। দিল্লীর সেই পঙ্গু আইন-সভায় ব্রিটেনের সেই অসহায়তার দিনে তিনি যতটা পারলেন তবু সরকারকে বাধা দেন। কলকাতায়ও বিপ্লবী ও রাজবন্দীদের পরোক্ষে সাহায্য-পরামর্শে সর্বদাই সক্রিয় সক্রিয় থাকতেন—সে সময়ে তাও ছিল বিশেষ দুর্লভবস্তু। কিন্তু পাঁচ বছর পরে যখন আবার নির্বাচন এল, কংগ্রেসও কেঁচে গণ্ডূষ করে আবার বয়কট তুলে নামল নির্বাচনে, তখন (১৯৩৭) কংগ্রেস নেতৃত্ব তাঁকে প্রার্থী মনোনীত করল না। স্বাধীনভাবে দাঁড়িয়ে কংগ্রেসের বিরোধিতায় তিনি পরাজিত হলেন। বাধ্য হয়েই তখন খুঁজলেন বাঙলা দেশের দ্বিতীয় কোঠায় স্থান। নিজের বুদ্ধি ও প্রভাবে তা লাভ করলেন; আর সেই পুঁজিতেই নির্বাচিত হলেন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান। এই পদে থাকাকালেই তাঁর

স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। আর শেষপর্যন্ত তিনি চিরবিদায় নেন ১৯৪৩-এ পূজোর দিকে।

এই শেষ কয় বৎসর তিনি কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন না—অথচ সময়টা ছিল সঙ্কিক্ষণ—যুদ্ধ আসছে—ওদিকে মুসলিম লীগ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রী। জিন্নাহ্‌'র ভেদনীতির অপ্রতিহত প্রসার। এই বিষম কালটাতে হয়তো সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের মতো মানুষের কিছু রাজনৈতিক উপযোগিতা ছিল। পূর্বেকার আমলের মুসলমান নেতাদের কাছে তখনো দেশবন্ধুর নাম ছিল শ্রদ্ধার জিনিস। দেশবন্ধু তাঁদের স্বদেশ-শাসনের দাবিকে রোধ করতে চান নি—একটা প্যাক্ট (১৯২৪ ?) করে তাঁদের সে দাবি মেনে নিয়ে স্বদেশসেবায়ও চেয়েছিলেন বাঙালি-মুসলমান নেতাদের সহযোগী করে ফেলতে। কিন্তু তাঁর প্যাক্ট নাকচ হয়ে যায় গান্ধীজীর বাধায়—কংগ্রেসের সর্বভারতীয় বিরোধিতায়। সেই প্যাকট উপলক্ষ করেই সত্যেন্দ্রচন্দ্র ও মুসলমান রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের সৌহার্দ্য অর্জন করেছিলেন। তাঁরাই ১৯৩৭-এ তাঁর কাউন্‌সিল নির্বাচনেও ছিলেন তাঁর বিশেষ সহায়।

বাঙলার কংগ্রেস ও লীগ দলের পক্ষে এই ১৯৩৭-এর পর্বটা শুধু লীগ-মন্ত্রিত্ব ভাঙার ব্যর্থ পর্ব নয়, বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানের মন ভাঙা-ভাঙির শেষ পর্ব—পরের দশ বছরে তা সম্পূর্ণ হয় দেশবিভাগে। জানি না, কারও সাধ্য হোত কিনা মুসলিম লীগের ভাঙনমুখী উগ্র স্রোতের মুখ আবার জাতীয় বোঝাপড়ার দিকে ফিরিয়ে দিতে। কোনো দু-এক জনের পক্ষে তা নিশ্চয়ই সম্ভব হোত না। সম্ভবত দু-একটা প্রদেশ থেকেও সে চেষ্টা সার্থক হত না—সর্বভারতীয় সমুদ্রের টানে দু-একটা নদীর সাধ্য কি স্রোত ফেরায়। সমগ্রভাবেই তার গতিনিয়ন্ত্রণ করা তখন দরকার ছিল। তবু বাঙলার মতো কোনো দু-একটা প্রদেশেও হয়তো উদারবুদ্ধি বুর্জোয়া রাজনীতির দিক থেকে সে পরীক্ষা করা চলত। পরীক্ষাটা হয় নি—ভাঙাভাঙির পালাটাই অমল, হাত মিলানের চেষ্টা করবার মতো লোকও পাওয়া গেল না। সত্যেনদা অন্তত সে প্রয়োজন অনুভব করতেন। হাত তিনি বাড়াতেও চাইতেন, কিন্তু তখন সে হাতে জোর নেই। তিনি কে ? কংগ্রেসের খেদানো মানুষ। জাতীয় রাজনীতির প্রধান স্রোতের উৎক্ষিপ্ত, কাউন্‌সিলের চড়ায়-ঠেকা নৌকা—স্রোতাবর্ত থেকে দূরে থাকতেই যে বাধ্য। নিজের রাজনৈতিক বুদ্ধি ও সেতু-রচনা বিদ্যার প্রয়োগ করতে না পেরে মনের খেদ সত্যেনদা মনেই পোষণ করতেন। এদিকে শুভকামনা ছাড়া কিছুই তাঁর

করার ছিল না। অন্য দিকে অবশ্য সত্যেনদার কাজ ছিল প্রচুর—সে কাজ বিপ্লবী রাজবন্দীদের মুক্তি-চেষ্টা, তাঁদের স্বাস্থ্য, মানবিক সম্মান, মূল অধিকার, তাদের পরিবার-পরিজনের স্বস্তি, সম্মান-সংরক্ষণ; এমনি শত জিনিস। সত্যেন্দ্র মিত্র কাউনসিলের সভাপতিপদ থেকে এ সব দিকে সেই ১৯৩৭-১৯৩৯ পর্যন্ত যা করেছেন কংগ্রেসের সদস্যরা তা করতে পারতেন না। তাঁদের সুযোগ ছিল সীমাবদ্ধ, সুযোগ আদায়ের সংকল্প আরও সংকীর্ণ। এ সত্যটা এখনো বিস্মৃত হবার মতো নয়।

১৯৩১-এ আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ডাঃ নারায়ণ রায় প্রমুখ দণ্ডিত রাজবন্দীদের অনশন ভাঙার চেষ্টায় তিনি অগ্রসর হন—সে উপলক্ষেই তাঁর সেক্রেটারিরূপে সে জেলের অভ্যন্তরে আমি প্রথম পদার্পণ করি। ১৯৩৭-এ আবার আন্দামান-বন্দীদের অনশন সূত্রে সারা বাঙলার জেলে যখন রাজবন্দীদের অনশন শুরু হয়, তখন তিনি মন্ত্রী স্যর নাজিমুদ্দীনকে নিয়ে প্রেসিডেন্সি জেলে এসে উপস্থিত হন মীমাংসার অগ্রদূত হিসাবে। মীমাংসাও হয়। গান্ধীজীও সে সময়ে নিচ্ছিলেন সে-প্রশ্নের সমাধান ভার। তারপরেও তার জের ঘোচে নি—দণ্ডিত বন্দীদের জন্য তখন সত্যেন্দ্রচন্দ্র ছিলেন সর্বদা সহায়তাদানে সক্রিয়। আমি তাঁর শত চেষ্টার সাক্ষী।

১৯১৯ থেকে আমার সঙ্গে সত্যেন্দ্রদা'র সাক্ষাৎ পরিচয়। দিনে দিনে তা বাড়ে, মাসে মাসে তা পেকে উঠে, বর্ষে বর্ষে আমি নিকটতর হই, আর ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় বন্ধনে তা পৌঁছে সেই শেষ কয় বৎসরে। সমস্ত স্মৃতিকথা এক-আধ খণ্ডেও লেখা দুঃসাধ্য। এত বৎসরের বলে নয়, এত বিচিত্র আর এত ঘনিষ্ঠ বলে। যখন তিনি রাহুগ্রাসের পথে—আর তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রায় পূর্ণগ্রাস—সেই সময়টার কথাই তাই এখানে এক ঝলক মনে করি। রাজনীতিতে তখন আমি তাঁর থেকে প্রায় সকল বিষয়েই ভিন্ন মতের। কর্মপদ্ধতিতেও সর্বাংশেই তখন ভিন্ন পথের যাত্রী। জেল থেকে তিনি আমাকে নিজের পদ-প্রতিষ্ঠার বলে তখন (১৯৩৭, ৯ই সেপ্টেম্বর) বাড়ি ফিরিয়ে আনেন। রইলাম স্বগৃহে অন্তরীন। তাঁর বাড়ি ছাড়া আমার কলকাতায় অন্য পাড়ায় যাওয়াও নিষিদ্ধ। বোধহয় পুলিশের একটু আক্রোশও জন্মেছিল। পাঁচ মাস পরেও সে নিষেধ অব্যাহত রইল। অন্য বন্দীরা তখন অধিকাংশেই মুক্ত। সত্যেনদা তাই নিষেধ-ভঙ্গের একটা আয়োজন করলেন। তিনি নিজের দায়িত্বে আমাকে নিয়ে চললেন শ্রীনিকেতনে—আমাকে বললেন,

কর্তৃপক্ষদের তা জানিয়ে দিতে। শ্রীনিকেতন থেকে ফিরে দেখলাম—বোধহয় ৯ই কি ১০ই ফেব্রুয়ারি মুক্তির আদেশ পড়ে আছে বাড়িতে।

শ্রীনিকেতনে সত্যেনদা গিয়েছিলেন সেখানকার বার্ষিক সম্মেলনের সভাপতিত্ব করতে। আমিও তাই 'দীন যথা যায় দূরে রাজেন্দ্রসঙ্গমে' প্রথমত যাই কবি-দর্শনে, দ্বিতীয়ত একবার সত্যই বুঝতে চাই স্বদেশী-সমাজের পথটা দিয়ে রাজনৈতিক স্বরাজের লক্ষ্যের কতটা কাছে পৌছানো যায়। আশা মিথ্যা হয় নি; যতটুকু সে সময়ে আমার পক্ষে তা সার্থক হবার তা হয়েছে। সত্যেন্দ্রদাই তার অনেকও দায়ী। তাঁকে সভাপতিত্বে আহ্বান করেছিলেন স্বর্গীয় কালীমোহন ঘোষ। তাঁরা স্বদেশীযুগের পুরনো বন্ধু—ছাড়াছাড়িও হয়েছে, ভুল বুঝাবুঝি বাড়ে নি। কালীমোহনবাবুকে আমি প্রথম যখন দেখি তখনো আমি সত্যেন্দ্রদার সঙ্গী। সে আরও বিশ বৎসর আগেকার (১৯২০?) কথা। পুজোর না গ্রীষ্মের ছুটিতে নোয়াখালি যাচ্ছি, সত্যেন্দ্রদাও যাচ্ছেন। নৈহাটিতে এসে গাড়িতে উঠলেন কালীমোহন ঘোষ—সঙ্গে বালক শান্তিদেব না সাগরময়। তিনিও যাচ্ছেন বাড়ি—চাঁদপুরে। দুই পুরনো সুহৃদে সাদর সম্ভাষণ। তারপরেই আলাপ-আলোচনা, সুহৃদসম্মত তর্ক, মতের ঐক্য ও মতানৈক্য। সমবায়, সমাজতন্ত্র, রাজনীতি, সমাজনীতির কত কথা দু'জনাতে সারা পথ। আমি উদ্‌গ্রীব শ্রোতা। প্রায় বিশ বৎসর পরে ১৯৩৮-এ শ্রীনিকেতনে সে সব কারো মনে নেই—আমার ছাড়া। সেই আমিও জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এসেছি। অনেক কথা মাথায়, তার থেকেও বেশি ভাবনা ভবিষ্যৎ কাজের। ঠিকানা না হারালে, কাজই এগিয়ে দেবে পথ থেকে পথে, শেষ ঠিকানার দিকে। কবি পীড়ার পরে স্বাস্থ্য লাভ করছেন—তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা তুলবার সাহস ছিল না। তাঁর কথাতেই তবু নিজের মতো করে উত্তর বুঝে নিলাম। সেখানেই সত্যেনদার সঙ্গে সুযোগ হল তারপর পুরনো অতিথিভবনের দোতলায় মতবিনিময়ের। তাঁর চক্ষে গণবিপ্লবের আশা স্তিমিত। শ্রেণী-সংঘর্ষের সম্ভাবনায় তিনি প্রমাদ গণেন। সমবায় ও পল্লীসংগঠনে অবশ্য কারও আপত্তি নেই। দেশের তা মূল কাজ, আজও চাই, কালও চাই। 'কিন্তু স্বাধীনতা যে চাই এক্ষুনি'—দেরি করবার জো নেই। তা পেতে হবে,—যেমন করে পারি—যত দিক দিয়ে পারি—ইংরেজের উপর চাপ দিয়ে। আমাদের ভিতরের বাধা সরিয়ে আর তাদের বাধা বাড়িয়ে। হিংসা-অহিংসার তর্কটা অবান্তর—যদি ক্রিয়া বা চেষ্টা হয় সার্বজনীন স্বার্থে, বহুজনহিতায় চ বহুজনসুখায় চ,

তাহলেই তা শুদ্ধ। আকস্মিক হিংসা আর আকস্মিক অহিংসার বিচার নৈয়ায়িকদের দরবারে। হাঁ, চাপ বাড়িয়ে একবারে যা পাব কিছুতেই তা সম্পূর্ণ স্বরাজ নয়। হয়তো আদায় করতে হবে কিস্তিতে কিস্তিতে। তবু তা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে হবে অগোণে। 'চাপ বাড়াবার পলিটিক্স' আমার কাছেও অগ্রাহ্য নয়, তবে বুঝলাম—পথের মিল মতের মিল আমার সঙ্গে আর সত্যেন্দ্রদার বেশি হবে না। কিন্তু মনের মিল আরও হাজার সূত্রে আমাকে সত্যেন্দ্রদা'র নিকটতর করে তুলল। রাজবন্দীদের কারও কোনো অসুবিধার খবর পেলেই তিনি আমাকে বলতেন, "প্রশ্ন তৈরি কর—কাউন্সিলের জন্য। আমিই কাউকে দিয়ে তোলাব।" তাই তোলাতেন। মাঝে মাঝে তাঁর উদ্বোধনী বক্তব্যও তাঁর কথামতো লিখতে হয়েছে। বিশিষ্ট বাঙালি-সমাজের নেতাদের বিয়োগ হলে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন না করে তিনি সভার উদ্বোধন করবেন না। তৎপূর্বে এরূপ রেওয়াজ হয় নি। ইংরেজকর্তারা সভ্যকারের দেশী সমাজের জন্য কেয়ার করতেন না। বাইরেরও নানা কাজে আমাকে সত্যেন্দ্রদা ডাকতেন, পুরাতন-নতুন, বিপ্লবী-অ-বিপ্লবী বন্ধু ও কর্মীদের সম্বন্ধে করতেন গল্প আলোচনা—সব তাদের প্রশংসারও কথা নয়। তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকে আমিও নিতাম কিছু সংগ্রহ করে।

(ক্রমশ)

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

ভিয়েৎনামে শান্তিপ্রতিষ্ঠা

সেই যেদিন শুনলাম হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করার ফলে যত লোক মরেছিল, প্রচলিত সামরিক উপায়ে জাপানকে পরাস্ত করার চেষ্টা করলে তার চেয়ে বেশি লোক মরত, অতএব ওটা ঠিক কাজই হয়েছিল, সেদিন স্তম্ভিত হয়ে ভেবেছিলাম, তবে কি এখন থেকে ন্যায়-অন্যায়ের, ভাল-মন্দের বিচার মানুষের বিবেককে পরিত্যাগ করে গণিতশাস্ত্রের আশ্রয় নিল? সংগঠিত গণহত্যার এই অমানবিক ক্যালকুলাস যাঁরা উদ্ভাবন করেছেন তাঁদের কার্যকলাপ সম্পর্কে বিবেকের প্রশ্ন তখন থেকে বহুবার উঠেছে। মনে পড়ছে সোভিয়েত ইউনিয়নের আকাশে আমেরিকার ইউ-২ বিমানপোতের অভিযান সম্পর্কে স্বয়ং আইজানহাওয়ারের উক্তি। দম্ভভরে বললেন, হ্যাঁ, আমরা মিথ্যা কথা বলেছিলাম, উচিত কাজই করেছিলাম, রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য মিথ্যার 'প্রয়োজন' আছে, বিশেষ করে যখন কম্যিউনিস্ট রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নে কোথায় কি ঘটছে তা জানার উপর আমেরিকার ও 'মুক্ত' মানব-সমাজের বাঁচা-মরা নির্ভর করছে। রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ মিথ্যা কথা বলে থাকেন, এটা তেমন একটা নতুন কিছু নয়। কিন্তু মিথ্যা কথা বলার লজ্জাহীন দম্ভ ও প্রকাশ্যে ঘোষিত পলিসিটা সত্যই বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন আমেরিকার নতুন কীর্তি।

তাই ভিয়েৎনাম সম্পর্কে আমেরিকার শাসকেরা 'উত্তর দিক থেকে আক্রমণ' নামে একটা দলিল খাড়া করেছেন দেখলে স্বভাবতই মনে এই প্রশ্ন জাগে, এতে সত্যের সঙ্গে মিথ্যার কি পরিমাণ ভেজাল আছে? ঠকতে চাই না আমেরিকার শাসকদের কথা বিশ্বাস করে। কী জানি দুদিন বাদে নিজেরাই হয়তো বলে বসবেন, হাঃ হাঃ হাঃ, কেমন ঠকিয়েছি তোমাদের, সবই মিথ্যা কথা, সমস্ত দলিলটাই জাল, জাল, জাল! সে বড় লজ্জার কথা হবে।

এই ভিয়েৎনামের ব্যাপারেও তো তাঁরা নতুন করে ঘোষণা করেছেন, মিথ্যা কথা তাঁরা বলেছেন এবং তার 'প্রয়োজন' ছিল। যখন কানাঘুষায় শোনা গেল আমেরিকা ভিয়েৎনামে বিষ ও গ্যাস প্রয়োগ করছে, তখন প্রথমে বলা হলো, সব মিথ্যা কথা। তারপর স্বীকার করা হলো, হ্যাঁ, বিষ ব্যবহার করা হয়েছে বটে তবে ওটা কিছু নয়, মাত্র আগাছা-সংহারক বিষ! ওতে শুধু উদ্ভিজ্জই বিনষ্ট হয়। আগাছা? উদ্ভিজ্জ? মানে কি? মানে হলো দরিদ্র ভিয়েৎনামী চাষীদের বহু যত্নের ও বহু পরিশ্রমের ফল তাদের আহার্য শস্য। বিষপ্রয়োগের দ্বারা একটা বিরাট অঞ্চলের অধিবাসীদের তাদের আহার্য দ্রব্য থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। আর এই তথাকথিত আগাছা-সংহারক বিষের প্রয়োগে শুধু উদ্ভিজ্জই মরে না, মানুষও মরে। এ কথা আমেরিকার বৈজ্ঞানিকেরাই বলেছেন। ওর ব্যবহার আমেরিকায় নিষিদ্ধ। তবু ভিয়েৎনামে তা ব্যবহৃত হচ্ছে। ভিয়েৎনামীরা যে এশিয়াবাসী, 'নিকৃষ্ট জাতি'!

গ্যাসের ব্যবহার সম্বন্ধে আমেরিকার শাসকেরা বলছেন, এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে তোমরা এত মাতামাতি করছো কেন? আমরা তো ঘাতক গ্যাস ব্যবহার করি নি, অঘাতক গ্যাস ব্যবহার করেছি। ওতে কি হয়? বড় জোর কয়েকদিন মানুষ যন্ত্রণায় ছটফট করে, বমিটমি করে, অজ্ঞান হয়ে থাকে, তারপর সব ঠিক হয়ে যায়। এত বড় একটা মহাকারুণিক কাজ তাঁরা করছেন শুনে মন যখন তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠছে তখন হঠাৎ মনে পড়ে গেল তাঁদের মিথ্যা কথা বলার পলিসির ব্যাপারটা। যথারীতি শোনা গেল যে তাঁরা বিষাক্ত ঘাতক গ্যাসই ব্যবহার করছেন। আর কেনই বা না করবেন। একে তো ভিয়েৎনাম এশিয়ার দেশ। তার উপর যখন 'উত্তর দিক থেকে আক্রমণ' চলেছে। লক্ষ্য ও উপায়ের নৈতিক প্রশ্ন কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলির কার্যকলাপ সম্বন্ধে উত্থাপন করা চলে এবং এ-বিষয়ে বই লিখে একটা গোটা লাইব্রেরি ভরিয়ে ফেলা চলে। কিন্তু কমিউনিজমকে রুখবার ব্যাপারে এ প্রশ্ন উঠতেই পারে না!

তার উপর যখন শোনা গেল, অজস্র আগুনে বোমার বৃষ্টিপাত করে আমেরিকা গোটা দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে জ্বালিয়ে দিয়ে দেশটাকে নির্মানব করার চেষ্টা করছে, তখন আমেরিকার শাসকেরা বললেন, ওটা তো আমরা করছি দক্ষিণ ভিয়েৎনামের লোকেদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে রক্ষা করার জন্য, সেখানে 'মুক্ত' মানবসমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য, আমরা চাই ভিয়েৎ কং

গেরিলাদের সামরিক ঘাঁটিগুলি জানিয়ে দিতে। 'উত্তর দিক থেকে আক্রমণ'! তোমরা কি আমাদের দলিলটা পড়ো নি?

হ্যাঁ, পড়েছি। এক জাতি ভিয়েৎনামীরা, দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত। উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মধ্যে লোকচলাচল কোনোদিন বন্ধ হয় নি। অ্যামেরিক্যানরাই সগর্বে ইতিপূর্বে আমাদের বলে এসেছেন, দেখো, কত লক্ষ লোক উত্তর ভিয়েৎনাম থেকে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে পালিয়ে এসেছে স্বাধীনতার সুমিষ্ট মার্কিন আপেল আস্বাদন করার জন্য। জেনীভা চুক্তির পূর্বে লাও দং পার্টির সভ্যেরা দক্ষিণ ভিয়েৎনামেও প্রচুর সংখ্যায় ছিল। দেশ বিভাগের পর তারা অনেকেই দক্ষিণ ভিয়েৎনামেই থেকে গেছে। সুতরাং ভিয়েৎ কং গেরিলা বাহিনীর কেউ কেউ উত্তর ভিয়েৎনাম থেকে এসেছে বা তারা লাও দং পার্টির সভ্য, এটা বলাও করে দেখালে তার দ্বারা কিছুই প্রমাণিত হয় না। এটা লক্ষ করলাম, যেসব ব্যক্তিদের উল্লেখ করা হয়েছে তারা সকলেই যুদ্ধবন্দী। মার্কিন যন্ত্রণালয়ে কোন্ কোন্ বিশেষ নির্যাতন পদ্ধতির দ্বারা তাদের মুখ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়েছে এ বিষয়ের উপর আদলাই ষ্টিভেনসন কিছু আলোকপাত করলে অন্তত রাজনীতি ও মনস্তত্ত্বের ছাত্রদের গবেষণার ক্ষেত্রটা কিঞ্চিৎ প্রসারিত হতো। কিন্তু এই সামান্য সুবিধাটুকু থেকেও তিনি পৃথিবীর পণ্ডিতসমাজকে বঞ্চিত করেছেন।

'উত্তর দিক থেকে আক্রমণ'! মিথ্যা কথা বলা যাঁদের পলিসি, তাঁদের দ্বারা অতি সঙ্গোপনে রচিত একটা দলিল পড়ে তবেই বুঝতে হবে, দক্ষিণ ভিয়েৎনামে উত্তর ভিয়েৎনামী সৈনিকদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। কিন্তু আমেরিকার স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, গ্যাসবাহিনী ও বিষ-বাহিনী যে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম অধিকার করে সেখানকার সমগ্র জনগণের বিরুদ্ধে এক অচিন্তনীয় বিভীষিকা সৃষ্টির তাণ্ডবে মত্ত, এ কথা বোঝার জন্য তো কোনো দলিলের প্রয়োজন হয় নি। একটা চাক্ষুষ সাক্ষ্যের ব্যাপার। বিশ্বাস করতে না চাইলেও তাকে বিশ্বাস না করে উপায় নেই। অন্যটা সত্য কিনা তা বিচার করার জন্য উকীল ডাকিয়ে নথিপত্র পড়াতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত সন্দেহ থেকেই যায় ব্যাপারটা আদৌ সত্য কিনা এবং পৃথিবীর মানুষকে ঠকানোর জন্য মার্কিন রাষ্ট্রবিভাগের দপ্তরখানায় নতুন একটা ষড়যন্ত্র চলছে কিনা।

সুতরাং সর্বাগ্রে প্রশ্ন ওঠে, আমেরিকা দক্ষিন ভিয়েৎনামে উপস্থিত কেন? আমেরিকার শাসকেরা অভিযোগ আনছেন, উত্তর ভিয়েৎনাম জেনীভা চুক্তি

ভঙ্গ করে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্যকে আঘাত করেছে। কিন্তু তাঁরা নিজেরা কি করেছেন? আমেরিকার প্রতিনিধিরা অবজ্ঞাভরে জেনীভা বৈঠকের টেবিল ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। আমেরিকা জেনীভা চুক্তিতে স্বাক্ষরই করে নি কেননা তার অন্য প্ল্যান ছিল এবং প্ল্যানটা যে কি তা বুঝতেও বিলম্ব ঘটলো না। জেনীভা চুক্তির কয়েক মাস পরেই সম্পন্ন হলো সিয়াটো চুক্তি। একটা নতুন জোট তৈরি হলো এবং তার মধ্যে টেনে আনা হলো দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে। জেনীভা চুক্তিতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছিল, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সমস্ত জোটের বাইরে থাকবে এবং তার মাটিতে কোনো বিদেশী সামরিক ঘাঁটি খাড়া করা হবে না ও কোনো বিদেশী সৈন্য মোতায়েন করা হবে না। কিন্তু আমেরিকা জেনীভা চুক্তির এই সব সর্তকে অগ্রাহ্য করে অতি শীঘ্রই দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে একটা বিরাট মার্কিন সামরিক শিবিরে পরিণত করল। যে-আমেরিকা সমগ্র বিশ্বের গণমতকে পদদলিত করে জেনীভা চুক্তিকে একটা কাগজের টুকরোয় পরিণত করেছে, সেই আমেরিকার মুখেই যখন শুনি—যে উত্তর ভিয়েৎনাম জেনীভা চুক্তির পবিত্রতাকে লঙ্ঘন করেছে তখন বিস্ময়ের একটু কারণ ঘটে বই কি! তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীকার করতে হয় যে ভিয়েৎনামে আমেরিকার কার্যকলাপে ব্যথিত হয়ে আর্ল রাসেল আমেরিকার শাসকদের সম্বন্ধে যে-সব কথা বলেছেন সেগুলি ঠিক কথা। সত্যই তাঁরা সারা পৃথিবীময় একটা অমঙ্গলের সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন। পাইকারি নরহত্যায় অভ্যস্ত হয়ে নিত্য নতুন নৃশংসতার অনুষ্ঠানে, মিথ্যাভাষণে এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণে প্রবৃত্ত হতে তাঁদের নিজেদের মনে কোনোই সংকোচ নেই। দুঃখ হয় এ-সব কথা ভাবতে কিন্তু কথাগুলি একান্তই নিষ্ঠুর সত্য।

কি অছিলা ছিল দক্ষিণ ভিয়েৎনামে আমেরিকার সশস্ত্র হস্তক্ষেপের পিছনে? বন্ধুরাষ্ট্র দক্ষিণ ভিয়েৎনাম নিজেকে বিপন্ন বোধ করছিল এবং সেখানকার ডিয়েম সরকারের আমন্ত্রণে মার্কিন সৈন্যবাহিনী সেখানে প্রেরিত হয়েছিল দক্ষিণ ভিয়েৎনামের স্বাতন্ত্র্যকে ও সেখানকার জনগণের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারকে রক্ষা করার জন্য! বিপন্ন বোধ করেছিল দক্ষিণ ভিয়েৎনামী সরকার? কার দ্বারা? উত্তর ভিয়েৎনামের দ্বারা? 'উত্তর দিক থেকে আক্রমণ'—এর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য দক্ষিণ ভিয়েৎনামের 'কমিউনিজমবিরোধী' জনগণ মার্কিন অস্ত্রসাহায্য প্রার্থনা করেছিল? এর

সবটাই ছেলেভুলানো ঠাকুরমার রূপকথা, গালগল্প। উত্তর ভিয়েৎনামের সামরিক হস্তক্ষেপ সম্বন্ধে স্টিভেনসনের দ্বারা পরিবেশিত তথ্যকে যদি পুরোপুরি মেনেও নেওয়া যায়, তবু অস্বীকার করি কি করে—যে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে আমেরিকার সামরিক হস্তক্ষেপের পরিমাণ তার চেয়ে বহু সহস্রগুণ বেশি। এই বিপুলতম অস্ত্রসাহায্য পেয়েও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের স্বাধীনতাকামী ও 'কমিউনিজমবিরোধী' জনগণ মাত্র কয়েক হাজার উত্তর ভিয়েৎনামী সৈনিকদের নগণ্য সামরিক শক্তির দ্বারা পরাভূত হলো এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনামের তিন-চতুর্থাংশ জুড়ে একটা উত্তর ভিয়েৎনামী সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো এমন একটা আজগুবি কথা বিশ্বাস করতে হলে প্রথমে বুদ্ধিকে গলা টিপে মারতে হয় এবং তারপর ইতিহাসের ও সমরবিজ্ঞানের সকল শিক্ষাকে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিতে হয়!

সত্য কথা এই-যে ডিয়েম সরকার ও তার পরেকার ঘন ঘন পরিবর্তনশীল সকল দক্ষিণ ভিয়েৎনামী সরকারই আমেরিকার পুতুল সরকার, দক্ষিণ ভিয়েৎনামের জনগণের দ্বারাই তারা বিপন্ন বোধ করে, তাদের বিরুদ্ধেই আমেরিকার ও তার পুতুল সরকারগুলির অভিযান, কেননা তারা মার্কিন অর্থে ও মার্কিন অস্ত্রশস্ত্রে পুষ্ট, দুর্নীতিপরায়ণ, দুষ্কৃতকারী ও স্বেচ্ছাচারী পুতুল সরকারগুলির সন্ত্রাসবাদী রাজত্বের উচ্ছেদ করে প্রকৃতই নিজেদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এ কথা যে সত্য তার প্রমাণের কোনো অভাব নেই। মনে পড়ছে, ডিয়েম গোষ্ঠী যে হোয়াইট পেপার প্রকাশিত করেছিল তাতে ফাশিস্ত ঔদ্ধত্যের সঙ্গে বলা হয়েছিল, আমরা এত হাজার লোককে খুন করেছি, এত লক্ষ লোককে বন্দীশালায় আটক করে রেখেছি, এত সংখ্যক গর্ভবতী নারীর পেট কেটে ফেলে তাদের অজাত সন্তানদের পাথরে আছড়ে 'মুক্ত' মানবসমাজের রক্তাক্ত গরিমায় ভিয়েৎনামের মাটিকে রঞ্জিত করেছি। এরা কারা? এরা সবাই দক্ষিণ ভিয়েৎনামেরই লোক। এদেরই বিরুদ্ধে আমেরিকার বহুবর্ষব্যাপী সামরিক অভিযান। তবু আমেরিকা জিততে পারে নি। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের গণবাহিনীর হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে। আমেরিকা তার পুতুল সরকারের হাতে যত বেশি অস্ত্রশস্ত্র তুলে দেয়, বিপ্লবী গণবাহিনীর অস্ত্রসজ্জা ততই বাড়তে থাকে। এটা শুধু দক্ষিণ ভিয়েৎনামেই নয়। অন্যত্রও দেখা গিয়েছে। তাই স্টিভেনসনকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়, ভিয়েৎ কং গেরিলাদের হাতে এত রাইফেল, এত মর্টার, এত

বোমা আছে, এই সবের ফিরিস্তি দিয়ে আপনি কাকে ঠকাতে চাইছেন? নিজেকেও তো ঠকাতে পারেন নি। ওয়াশিংটনই ভিয়েৎ কং গেরিলাদের সর্বপ্রধান অস্ত্রাগার। এ কথা আপনিও জানেন, আমরাও জানি।

ইতিহাসে বারংবার দেখা গিয়েছে, পরাজয়ের মুহূর্তেই অত্যাচারীরা সবচেয়ে নির্মম ও মরিয়া হয়ে ওঠে। তাই আজ দেখছি, আমেরিকার শাসকেরা শুধু যে দক্ষিণ ভিয়েৎনামকেই জালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে চাইছেন তাই নয়, তাঁরা উত্তর ভিয়েৎনামের উপর নিয়মিতভাবে বোমাবর্ষণ শুরু করেছেন এবং দর্পের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন, তাঁরা এটা আরো বেশি করে চালিয়ে যাবেন। উত্তর ভিয়েৎনামের উপর এই অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও সম্পূর্ণ অবৈধ আক্রমণের গায়ে একটা মিথ্যা ঔচিত্যের লেবেল এঁটে দেওয়ার জন্যই তাঁরা নিরাপত্তা পরিষদে 'উত্তর দিক থেকে আক্রমণ' নামে একটা বানানো দলিল উপস্থিত করেছেন। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের গৃহযুদ্ধকে উচ্চগ্রামে তুলে তাঁরা একটা বিশ্বযুদ্ধ বাধাতে চান। গৃহযুদ্ধের সঙ্গে আন্তর্জাতিক যুদ্ধের গ্রন্থিবন্ধন ঘটিয়ে তাঁরা চাইছেন মানবজাতিকে ব্ল্যাকমেল করতে। এটাই আজকের দিনে মানুষের সামনে সবচেয়ে বড় অমঙ্গল ও বিপদ। মানবজাতিকে যদি বাঁচতে হয় তবে এই গ্রন্থিকে ছিন্ন করতে হবে। বিপ্লবের অধিকার প্রতিটি জাতির জন্মগত অধিকার। মার্কিন সংবিধানেও এর স্বীকৃতি আছে। এটা অস্বীকার করলে জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের বুলিটা একটা অর্থহীন প্রলাপ হয়ে দাঁড়ায়। কমিউনিজম ভালো হতে পারে, মন্দ হতে পারে। এ বিষয়ে আমেরিকা বা অন্য কোনো রাষ্ট্র বা জাতি যে-মত পোষণ করতে চায় করুক। তাতে কেউ আপত্তি করছে না। কিন্তু কোনো দেশের আভ্যন্তরীণ বিপ্লবের ফলে সে দেশে একটা কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখে গেলেই অমনি আমেরিকা বহিরাক্রমণের ও বন্ধুরাষ্ট্রকে সাহায্য করার জিগীর তুলে সামরিক শক্তির দ্বারা বিপ্লবকে রক্তগঙ্গায় ডুবিয়ে দেবে এবং গৃহযুদ্ধকে আন্তর্জাতিক যুদ্ধের স্তরে উত্তোলন করার চেষ্টা করবে, এটাই বিশ্বশান্তির পথে প্রধানতম বাধা। ওয়াশিংটনকে মানতে হবে, কোনো জাতির কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠা করার অব্যাহত অধিকার আছে। মস্কো ও পিকিংকেও মানতে হবে, কোনো জাতির পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা অবলম্বন করার অব্যাহত অধিকার আছে। ঐতিহাসিক রঙ্গমঞ্চে প্রতিটি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে অবাধে ক্রিয়া করতে দেওয়া হোক। ইতিহাসকেই

শেষ কথা বলতে দেওয়া হোক, সমগ্র পৃথিবী কমিউনিস্ট হয়ে যাবে অথবা পুঁজিবাদ, কমিউনিজম ও নানাপ্রকার মিশ্র সমাজব্যবস্থা সুদীর্ঘকাল ধরে পাশাপাশি অবস্থান করবে। ইতিহাস যদি কমিউনিজমের সম্প্রসারণের বিপক্ষে রায় দিয়ে থাকে তবে কেন এই অকারণ লালাতঙ্ক? কমিউনিজমের প্রসার রোধ করার জন্য আমেরিকাকে পৃথিবীর পুলিশম্যানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার অধিকার কে দিয়েছে?

এটা খুব সুখের ও আশার বিষয় যে সকল দেশের সাধারণ মানুষের শুভবুদ্ধি আমেরিকাকে এই বিপজ্জনক ভূমিকা থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করছে। ভিয়েৎনামে ইয়াঙ্কি-ডুড্‌লের নৃশংস খেলার বিরুদ্ধে এশিয়ায়, আফ্রিকায়, ইউরোপে এবং আমেরিকাতেও প্রতিবাদ উঠছে এবং ক্রমশই অধিকতর সোচ্চার হয়ে উঠছে। ভারত ও আরো কয়েকটি নিরপেক্ষ ও অসংলগ্ন দেশের সরকার প্রস্তাব করেছে, অবিলম্বে বিনা-সর্তে শান্তির কথাবার্তা বলার জন্য একটা জেনীভা ধরনের বৈঠক বসুক। জবাবে রাষ্ট্রপতি জনসন বলেছেন, আমরা তাতে রাজী আছি, তবে শান্তির আলোচনাকালে আমরা আরো বেশি মাত্রায় উত্তর ভিয়েৎনামে বোমা ফেলতে থাকবো, আরো ব্যাপকভাবে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে অগ্নিকাণ্ড ঘটাতে থাকবো, আমরা চাই দক্ষিণ ভিয়েৎনাম একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বলে চিরকালের জন্য স্বীকৃত হোক, সপ্তদশ প্যারালাল উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বিভাগরেখা বলে মানতে হবে এবং এই গ্যারান্টি দিতে হবে যে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে উত্তরদিক থেকে হস্তক্ষেপ কোনোদিন ঘটবে না। শান্তির সর্তহীন আলোচনা এতগুলি সর্তের অধীনস্থ! প্রতাপের দম্ভে ও শক্তির মদমত্ততায় আমেরিকার শাসকেরা একেবারে উন্মাদ হয়ে গেছেন। যুদ্ধ ও শান্তি যে এক জিনিস নয় এবং উত্তর ভিয়েৎনামে বোমা ফেলা বন্ধ না করলে শান্তি-বৈঠক যে বসতেই পারে না এই প্রাথমিক উপলব্ধিটাই তাঁদের মনে নেই। তাঁদের শান্তি-নীতিটাও একটা ব্ল্যাকমেলের নীতি। পূর্বাহ্লেই তাঁরা শান্তি-বৈঠকের উপর হুকুমনামা জারি করবেন যে অমুক অমুক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। এবং যে-সিদ্ধান্ত তাঁরা পৃথিবীর উপর চাপাতে চান তা শুধু শান্তির মূলনীতির বিরোধীই নয়, সম্পূর্ণ অবাস্তবও বটে। সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, উত্তর ভিয়েৎনাম বা ভারত কোনো রাষ্ট্রই এই গ্যারান্টি দিতে পারে না যে, দক্ষিণ ভিয়েৎনামের জনগণ নিজেদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারের বলে বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লব করবে না,

নিজেদের মনোমতো সরকার প্রতিষ্ঠিত করবে না এবং দুই ভিয়েৎনামকে এক করবে না। অথচ ঠিক এই সকল জিনিসই আমেরিকার শাসকেরা চাইছেন। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের লোকেরা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থা স্থাপন করার চেষ্টা করলেই অমনি তাঁরা চেঁচিয়ে উঠবেন, ওই আবার 'উত্তর দিক থেকে আক্রমণ' শুরু হলো, অতএব আমরা পুনরায় চললুম আমাদের সৈন্যবাহিনী, গ্যাসবাহিনী ও বিষবাহিনী নিয়ে ভিয়েৎনামে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে।

সাধারণ মানুষের সহজবুদ্ধি এই কথাই বলে, ভিয়েৎনামে শান্তি-প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ হলো সেখান থেকে মার্কিন সৈন্যবাহিনীর অপসারণ। এটা দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার যে, আমেরিকা কর্তৃক জেনীভা চুক্তির লঙ্ঘন, দক্ষিণ ভিয়েৎনামের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আমেরিকার সশস্ত্র হস্তক্ষেপ এবং ভিয়েৎনামী জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে ও বিপ্লবের অধিকারকে মেনে নিতে আমেরিকার অস্বীকৃতি, এই তিনটি ব্যাপারই ভিয়েৎনামে সকল অনর্থের মূল। তাই যখন দেশে দেশে সাধারণ মানুষের মুখে শুনি, ইয়াঙ্কি, ভিয়েৎনাম ছাড়ো, তখন মনটা খুশি হয়ে ওঠে। কিন্তু তারপরে এ কথা বলতে আমাদের কারো কারো গলায় বেধে যাচ্ছে কেন? ভিয়েৎনাম থেকে মার্কিন সৈন্য চলে গেলেই সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চীনের কবলস্থ হবে, এই ভয়ে? কেন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার লোকেদের শুভবুদ্ধির, জাতীয় চেতনার ও আত্মশক্তির উপর কি আমাদের মনে এতই অনাস্থা এসে গেছে? যদি এসে থাকে, সেটা আমাদের পক্ষে গৌরবের কথা নয় নিশ্চয়ই।

ভিয়েৎনাম থেকে মার্কিন সৈন্যের অপসারণের জন্য অবিলম্বে শান্তি-বৈঠক বসা দরকার এবং শান্তির কথাবার্তা বলা দরকার, এ বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে না। তাই ভারতসমেত সতেরটি রাষ্ট্র যখন অবিলম্বে বিনাসর্তে শান্তির আলাপের জন্য আবেদন করল, তখন আনন্দিতই হয়েছিলাম, আবার মনের কোণে এই প্রশ্নও দেখা দিয়েছিল, বিনাসর্তে শান্তির আলাপ কি সম্ভব এবং উচিত? সম্প্রতি ভারতের প্রধান মন্ত্রী পরিষ্কারভাবে বলেছেন, তাঁদের শান্তি-প্রস্তাবের মধ্যে এই সর্ত অন্তর্নিহিত ছিল যে শত্রুতামূলক সামরিক কার্যকলাপ এখনই বন্ধ করতে হবে। কোনোরকম শান্তির আলোচনাই সম্ভব নয় যদি আমেরিকা উত্তর ভিয়েৎনামে বোমা ফেলা এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনামে আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ না করে। আমেরিকা যদি এই সব নোংরা

কাজ থেকে নিবৃত্ত হয় তাহলে শান্তির আলোচনাকালে ভিয়েৎ কং বাহিনীও যে স্বাভাবিকভাবেই সশস্ত্র কার্যকলাপ বন্ধ রাখবে, এ কথা বলাই বাহুল্য। শান্তির বৈঠক বসুক, কিন্তু আমেরিকার হুকুমতি শান্তির সর্ত মেনে নেওয়ার জন্ত নয় এবং ভিয়েৎনামী জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে বিকিয়ে দেওয়ার জন্ত নয়। সে অধিকার তো কারো নেই। শান্তির মূলনীতি সম্পর্কে আপস পৃথিবীতে শান্তি আনবে না, যুদ্ধের আগুনই জ্বালাবে। আর্ল রাসেল বিষাদের সুরে বলেছেন, আমেরিকার শাসকবৃন্দকে তাঁদের জগদ্বিধ্বংসী কর্মকাণ্ড থেকে নিবৃত্ত করার আশা তিনি পোষণ করেন তবে অতি ক্ষীণ আশা। নৈরাশ্যের কারণ আছে সত্য। আন্তর্জাতিক যুদ্ধ ভিয়েৎনাম সমস্যার কোনো সমাধানই নয়। আমেরিকার শাসকেরা ঠিক ওই নরকের ও বিলুপ্তির পথেই মানুষকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছেন। তবু এই সুদৃঢ় বিশ্বাস ভিত্তিহীন নয় যে আজকের পৃথিবীতে শান্তির শক্তিগুলি যুদ্ধের শক্তিগুলির চেয়ে অনেক বেশি জোরালো এবং শান্তিকামী সমগ্র মানবজাতির কাছে ক্ষমতান্ধ মার্কিন শাসকদের আত্মসমর্পণ করতেই হবে কেননা অন্তরে অন্তরে তাঁরা কাপুরুষ।

অতি-একা সতীনাথ

কেষ্টনগরের সেই বিখ্যাত ভাদুড়ি-পরিবারের সঙ্গে বিহারের ছোট শহর পূর্ণিয়ার দীর্ঘ দিনের যোগসূত্র সম্ভবত শেষবারের মতো ছিন্ন হয়ে গেল। এঁরা অনেকেই বাঙলা দেশের গৌরব বাড়িয়েছেন। বেঙ্গল কেমিক্যালের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রভূষণ ছিলেন স্বনামধন্য পুরুষ।

প্রচার-বিমুখতা সম্ভবত এঁদের পারিবারিক সম্ভ্রমবোধের অঙ্গ। সতীনাথ নিজেও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। বরং কঠোরভাবে প্রশংসামুখর পরিবেশ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে ভালোবাসতেন। ভালোবাসতেন আবাল্য যে-পরিবেশের মধ্যে বড় হয়েছেন তার ভালো-মন্দ গুণী-নির্গুণ সব মানুষের সঙ্গে মিশতে, যদিও একটু আলগোছে। এদের কাছ থেকে নিন্দা-প্রশংসা যা কিছু পেয়েছেন সহাস্যে গ্রহণ করেছেন। যে-কোনো সামাজিক-সাংস্কৃতিক আলোড়নের বেদনা-আনন্দ তিনি নিজের মানসলোকে বসে একা বহন করতে ভালোবাসতেন।

এই একাকীত্ব মৃত্যুক্ষণ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গ ছাড়ে নি। সকালের খাবার দিয়ে চাকর বাজারে চলে গেছে। একটা সন্দেশ মুখে দিয়েই অন্তলোকের ডাক শুনলেন। ঘর থেকে এলেন উঠোনে মুক্ত আকাশের নিচে। এক ঝলক রক্ত হৃদপিণ্ড থেকে তুলে ছড়িয়ে দেহটাকে লুটিয়ে দিলেন। তখন প্রিয় রক্তঙ্গবাব গাছটা শোকে বিহ্বল হয়ে হয়তো কিছু ফুল ছড়িয়ে দিয়েছে!

বহুর মধ্যে বিচরণ করেও এমন নিঃসঙ্গ মানুষ কদাচিৎ নজরে পড়ে। শুধু নিঃসঙ্গ নয়, নিস্পৃহও। অশন-বসন নিতান্ত যেটুকু না হলে নয়। ঘরের আসবাব ভাঙা বা রং-চটা হোক ভ্রূক্ষেপ নেই। গণ্যমান্য বা নগণ্য সব অতিথির সমান সমাদর। এই মানসিকতা যে রাজনৈতিক মার্গে বিচরণ করার ফলেই গড়ে উঠেছিল তা নয়। পারিবারিক ঐতিহ্যই এই।

কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় হোস্টেলে না থেকে ঘর ভাড়া করে থাকা পছন্দ করেছেন। সেখানে খাটিয়া কম্বলই সম্বল। বারে গিয়েছেন, অভিজাত ক্লাবে গিয়ে টেনিস খেলেছেন। কিন্তু পোশাকের চটক নেই, আইনের বিতর্কের সময় হাকিমের কাছে বুদ্ধির বড়াই নেই, ক্লাবে নির্দোষ খেলায় অতিরিক্ত আমোদে আগ্রহ নেই।

রাজনীতিতে সতীনাথের সক্রিয় প্রবেশ প্রাক্-চল্লিশে গান্ধীজির ব্যক্তিগত

সত্যাগ্রহে অংশ নিয়ে কারাবরণের মধ্য দিয়ে। তারও আগে মানবেন্দ্র রায়ের রাজনীতি তাঁর মনে প্রভাব ফেলেছিল। জেল থেকে ফিরে আইন-ব্যবসায়ে আর ফিরে গেলেন না। দেখা গেল তাঁকে সব সময়ের কংগ্রেসকর্মী হিসেবে, আর বোধ হয় ছ' মাসের মধ্যেই সর্বজনপ্রিয় নেতা ভাদুড়িজি। তারপর বিয়াল্লিশের আন্দোলনে গ্রেপ্তার হওয়া পর্যন্ত সারা জেলায় গ্রামে-বন্দরে দিনমজুর, কৃষিমজুর, কৃষক, ভূস্বামী সমস্ত স্তরের মানুষের মধ্যে নিরলসভাবে সংগঠন গড়ে বেরিয়েছেন। যে-কোনো কাজে হাত দিয়েছেন তদ্গতভাবে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে করেছেন। এই নিষ্ঠাবোধ রাজনীতিক্ষেত্রে এবং পরবর্তী জীবনে সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁকে দিয়েছিল সহনশীলতা, পরমতসহিষ্ণুতা।

বিয়াল্লিশের আন্দোলনে যোগ দিয়ে দীর্ঘদিন সতীনাথকে কারাবাস করতে হয়েছিল। তাঁর নিজের কথায়, জেলে সময় কাটাবার জন্যেই লেখা শুরু করেন। অবশ্য সাহিত্যের অনুসন্ধিৎসু পাঠক ছিলেন ছাত্রজীবন থেকেই। বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি যুগ-পরিবর্তন সাগ্রহে লক্ষ করতেন। আলোচনা করার মতো সঙ্গী পেলে যে-মতের সঙ্গে নিজের মনের মিল নেই জোর গলায় তারই স্বপক্ষে যুক্তি তুলতেন। যাঁরা তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন একই কায়দার বারবার প্রয়োগ পরিহার করতেন। যে-লেখা ভালো লাগতো যাচাই করার চেষ্টা করতেন কোনো সাধারণ, সাহিত্য সম্পর্কে অসচেতন, অল্প-শিক্ষিত পাঠকেরও মনে সে লেখার আবেদন আছে কি না। কলেজের সাহিত্য-উৎসাহী ছাত্রকে হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের 'খোয়াই' কবিতা পড়তে বলে কান খাড়া করে থাকতেন ছন্দ যতি খুঁজে পাচ্ছে কি না। জানতে চেষ্টা করতেন জেম্‌স্ জয়েস-এর বৈশিষ্ট্য অপরের চোখেও সমানভাবে ধরা পড়েছে কি না, মপাশঁ অথবা রবীন্দ্রনাথ কার গল্প তুলনামূলক বিচারে শ্রেষ্ঠ—নিজের যে-মত আছে সেটা আর কারো সঙ্গে মেলে কি না।

রাজনীতিতে যতদিন কংগ্রেসে ছিলেন ব্যক্তিগতভাবে কী পছন্দ করতেন না বা কাদের পছন্দ করতেন না সেটা বড় কথা ছিল না। দলের নিয়ম-কানুন শৃঙ্খলা অন্তত নিজে নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলা পছন্দ করতেন। আশ্রমে প্রার্থনা-সভায় সকলের সঙ্গে গলা মেলাতেন, চরকা নিজে তো কাটতেনই, অন্যকেও কাটতে উৎসাহ দিতেন। সহকর্মীর সংকীর্ণ স্বার্থবোধে ব্যথিত হয়েও স্বার্থ-সিদ্ধির প্রতিবন্ধক হতে চাইতেন না। যেটাকে নিজে পথ হিসেবে বেছে নিয়েছেন সঙ্গী না পেলে একাই সে-পথে অনায়াসে এগিয়ে চলতেন।

সর্বক্ষণের রাজনৈতিক কর্মী থেকে সাহিত্যকর্মকে জীবনসঙ্গী করলেন এটা তাঁর হঠাৎ-চিন্তা অথবা 'জাগরী' রচনায় খ্যাতির জন্যেই নয়। জেল থেকে বেরিয়েই দেখলেন, তাঁর ধ্যানধারণা চিন্তা সহকর্মীদের থেকে একেবারে আলাদা। জেলা কংগ্রেসের কর্মকর্তা হিসেবে তিনি হয়তো মনে করছেন কাটিহারের চটকল মজুরদের লালঝাণ্ডা সংগঠনটি মজবুত এবং কংগ্রেসের তরফ থেকে পাল্টা সংগঠন না গড়ে ট্রেড ইউনিয়নের স্বার্থকেই বড় করে দেখা দরকার; দলের তা মনঃপূত হল না। এই ধরনের বিরুদ্ধ চিন্তা তাঁকে ক্রমে কংগ্রেস থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া দেশ তখন স্বাধীন হয়েছে। তিনি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন স্বার্থান্বেষীরা ক্রমে সংগঠনকে বগলদাবা করবে। কংগ্রেস ছেড়ে কিছুদিন সোশ্যালিস্ট পার্টিতেও কাজ করে দেখলেন, অল্প সময়ের জন্যে।

তারপর অস্থিরতা, দুরন্ত মানসিক অস্থিরতা তাঁকে বিদেশ ভ্রমণে টেনে নিয়ে গেল। খুব সাধ ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন দেখে আসবেন। এত নিন্দা এত প্রশংসা যে-দেশ সম্বন্ধে শুনেছেন সে দেশ দেখার বাসনা তাঁর অপূর্ণ রয়ে গেল। একটা ক্ষোভও। যাঁরা সহায় হলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হতে পারত কী ভারতবর্ষে কী প্যারিসে তাঁরা সতীনাথের পেছনে ফেলে আসা রাজনীতিটাই দেখছিলেন, নতুন আদর্শের দিগন্ত-সন্ধানীকে দেখতে চান নি—এমন একটা ধারণা তাঁর মনে বদ্ধমূল ছিল।

এক বছর প্যারিসে কাটিয়ে ফ্রান্সের শিল্প-মানসের জারক রসে সঞ্জীবিত হয়ে দেশে ফিরে তিনি রাজনীতির দিকে পিঠ রেখে সরস্বতীর সাধনাতেই মগ্ন থেকেছেন আমৃত্যু। কিন্তু রাজনীতি তাঁকে ছাড়ে নি একেবারে। মফঃস্বল থেকে বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক কর্মী শহরে কোনো কাজে এলে ভাদুড়িজিকে দর্শন না করে ফিরতেন না। অনেক সময় বাড়িতেও আশ্রয় দিয়েছেন—কমিউনিস্ট, সোশ্যালিস্ট বা কংগ্রেসকর্মী যিনিই আশ্রয়প্রার্থী হয়েছেন।

জাগরীতে তিনটি ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের চরিত্র রূপায়িত করতে গিয়ে সতীনাথ কোনো বিশেষ মতাদর্শের প্রতি লেখকের পক্ষপাত যাতে না পড়ে সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখার চেষ্টা করেছিলেন। চরিত্রগুলি যে যার ধারণা অনুযায়ী নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের আদর্শ অনুসরণ করেছে। নীলুও। নীলুর চরিত্র নিয়ে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক কুৎসা দেখে তিনি ব্যথিত হয়েছিলেন। যে-অঞ্চলের কাহিনী লিখেছিলেন সেখানে তখনো কমিউনিস্ট

পার্টির কোনো সংগঠন ছিল না। নীলুর দলের সদর দপ্তর বোম্বাইতে—কুৎসা-রটনাকারীদের হাতে এর চেয়ে বেশি কোনো মশলা ছিল না। আরো কিছু দলের অস্তিত্ব সে সময় ছিল নীলুর চিন্তাধারার মিল যাদের সঙ্গে বেশি। শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায় জাগরীর যে-সমালোচনা লিখেছিলেন সেটা সতীনাথের ভালো লেগেছিল এবং নিজে উদ্যোগী হয়ে অনেক কমিউনিস্ট-বিরোধীকে তা পড়িয়েছিলেন।

পরবর্তী রচনাগুলিতে সযত্নে তিনি এই ধরনের বিতর্কের অবকাশ পরিহার করে চলতেন।

সতীনাথ নিজে সবচেয়ে খুশি হয়েছিলেন 'ঢোঁড়াই চরিত-মানস' লিখে। 'অচিন রাগিণী'কে তিনি দ্বিতীয় স্থান দিয়েছিলেন। অবশ্য নিজের লেখা সম্বন্ধে অত্যন্ত আপনজনের কাছেও কিছু বলতে চাইতেন না তিনি। রাজনৈতিক বিদ্রূপাত্মক যে কয়েকটি ছোট গল্প লিখেছেন তাঁর নিজের কাছে সেগুলিও ছিল প্রিয়।

উপযুক্ত সমালোচক সতীনাথের সাহিত্যের মূল্যায়ন করবেন। তাঁর জীবনকে গভীরভাবে না জানলে সুষ্ঠুভাবে তা করা সম্ভব নয়। এত নীরব ব্যক্তি সম্বন্ধে একজনের কাছ থেকে হয়তো সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। খুব কাছে থেকে তাঁকে নিবিড়ভাবে জেনেছেন এমন লোকেরাই তাঁর যথার্থ পরিচয় দিতে পারবেন। গত বারো বছর ধরে তাঁর নিকটতম সঙ্গীকে তিনি অন্তরে ধরে রেখেছিলেন—সে তাঁর মৃত্যুবাণ, হৃৎপিণ্ডের উপর একটি ফোঁড়া।

ব্রজেন্দ্র ভট্টাচার্য

পুস্তক-পরিচয়

শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন ও সাধনা। শ্রীহরীশচন্দ্র সরকার। প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন। প্রাপ্তিস্থান জিজ্ঞাসা। কলিকাতা ২৯। ছয় টাকা।

রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তিনি কবি। এই পরিচয়েই তিনি পশ্চিমের স্বীকৃতি লাভ করেন, এই পরিচয়েই তিনি পূর্বে ও পশ্চিমে যুগবরেণ্য। সার্থক জীবনের অভিজ্ঞতায়, বিচিত্র অনুভবে ও বিচিত্র কর্মপ্রয়াসে, তাঁর সমস্ত ব্যক্তিত্ব যে-পরিণতির দিকে চলেছিল তাতে তাঁকে কবি বলে বিশেষিত করাই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ নিজেও জীবনের অন্ত্য পর্বে পৌঁছে সামগ্রিক ভাবে নিজেকে কবি বলেই গ্রহণ করেছিলেন। এই তাঁর শেষ ও সর্বোত্তম পরিচয়।

আমাদের কাছে তাঁর আরো একটি বিশেষক নাম আছে, তাঁকে আমরা গুরুদেব বলে প্রণাম করি। এই নামে আমরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করি তা নয়, এই নামের প্রকৃত মূল্য আছে। অনেক দিন ছিলেন তিনি আমাদের প্রতিবেশী, ফুল-লতা-পাতা আলো-আঁধার পশু-পক্ষী নিকটের ও দূরের বন্ধুস্বজন সব মিলিয়ে মহাজীবনের শরিক কবি-প্রতিবেশী তিনি। আর, শিথিল সমাজের বিচ্ছিন্ন আত্মকেন্দ্রিক আত্মবিশ্বাসহীন অন্ধ অগণিত নরনারীর মধ্যে ছিলেন তিনি গুরু-প্রতিবেশী। গুরু-প্রতিবেশীর নিভৃত সাধনা ছিল তমসো মা জ্যোতির্গময়; প্রতিবেশীদের যে-সাধনায় আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন তা-ও ঐ তমসো মা জ্যোতির্গময়। তিনি শতবার শত উপলক্ষে শতভাবে আহ্বান জানিয়েছিলেন বস্তুশৃঙ্খলীকরণে নয়, তম থেকে জ্যোতির দিকে দৃঢ় পদক্ষেপের সমবেত প্রচেষ্টায়। শান্তিনিকেতনে ও শ্রীনিকেতনে তাঁর সাধনার মূলমন্ত্রই হল জ্যোতির্গময়, শিক্ষা ও পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যই হল আত্মবিশ্বাস অর্জন, সাহস ও শক্তি সঞ্চয়, প্রীতি ও সমবায়, মন্ত্রের ভাষায় অন্ধতম থেকে আলোয় আত্ম-আবিষ্কার। এই তো গুরুর কাজ, অন্তরে আলো জ্বালিয়ে দেওয়া। তাই তো করেছেন, তারই সাধনা করেছেন আমাদের গুরু-প্রতিবেশী, তাই তাঁকে আমরা প্রণাম করি শুধু কবি বলে নয়, গুরুদেব বলে।

আলোচ্য গ্রন্থে লেখক প্রথম অধ্যায়ের নাম দিয়েছেন 'কবি-গুরুদেব'। প্রথম অধ্যায়ের এই নামটি অন্যান্য অধ্যায় পাঠের সময় মনের মধ্যে গানপুরার

মূল সুরের মতো বাজতে থাকবে। সমগ্র বক্তব্য বুঝে নেবার পক্ষে নামটি এবং অধ্যায়টি বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

গ্রন্থটির অন্য ছয়টি অধ্যায় ও মূল্যবান পরিশিষ্ট একত্রে যেন দুটি বিষয় পাঠকের কাছে উপস্থিত করতে চেয়েছে। প্রথমটি হল রবীন্দ্রনাথের দর্শন-তত্ত্ব ও শিক্ষানীতির আলোচনা, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা ও উপলব্ধির বিশিষ্টতা নিরূপণ, অন্যান্য দার্শনিক ও শিক্ষাগুরুর সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য ও স্বাতন্ত্র্য বিচার। দ্বিতীয় বক্তব্যে আছে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ও শিক্ষণ সম্পর্কিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা। গ্রন্থটি খণ্ডে বিভক্ত না হলেও সমগ্র বক্তব্যের এই দুটি ভাগ আছে মনে করা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক ছিলেন কিনা, এ নিয়ে আলোচনা হতে শুনেছি। রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক কিনা, এ প্রশ্নের উত্তরে লেখক বলেছেন, 'তাঁর নিজস্ব কোনো দর্শনের অস্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ বার বার অস্বীকার করেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর একটি দর্শন ছিল। বুদ্ধি-গঠিত কোনো ইমারত নয়, এক দীর্ঘ বিচিত্র জীবনের মৌলিক অভিজ্ঞতা থেকে স্বতঃ-উৎসারিত একটি দর্শন।' লেখকের মতে '…তাঁর সাধারণ দর্শন ও শিক্ষাদর্শনের মধ্যে মূলনীতির কোনো পার্থক্য নেই।' ঠিক এই কারণেই রবীন্দ্রদর্শন বা তাঁর শিক্ষাদর্শের সম্যক্ আলোচনা অত্যন্ত কঠিন। স্বতঃ-উৎসারিত দর্শন বলে তাঁর জীবনের কোনো পর্বে লিখিত-অলিখিত গ্রন্থে শিক্ষাচিন্তা সম্পূর্ণ করা নেই। শিক্ষার দর্শন বা তত্ত্ব বা নীতি তাঁর সমগ্র জীবনের সৃষ্টির মধ্যে ছড়িয়ে আছে। বিরাট সেই সৃষ্টির ক্ষেত্র থেকে আহরণ করলে এবং 'মৌলিক অভিজ্ঞতা'র সমগ্র পটভূমিতে সুসংগত করে সাজিয়ে নিলে একটি মহৎ দর্শন ও প্রকল্প লাভ করা যায়। লেখক সেই দুরূহ কার্য সম্পাদনে প্রয়াসী হয়েছেন। তিনি দেখেছেন যে, রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় ও অনুভবে শিক্ষার সমস্ত তত্ত্ব ও ব্যাবহারিক নির্দেশ এক মহৎ ঐক্যে অমূল্য হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, ভাবীকালের প্রয়োজনে ব্যাবহারিক স্তরে পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপযোগী নমনীয়তাও আছে। এক দিকে শৃঙ্খলা ও ঐক্য, অন্যদিকে মুক্তি, উভয়ই আছে।

রবীন্দ্র-সৃষ্টি-পরিক্রমাও যথেষ্ট নয়। তাঁর স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করতে গেলে তাঁর পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক দার্শনিক ও শিক্ষাগুরুদের চিন্তার সঙ্গে পরিচয় আবশ্যক। লেখক তারও চেষ্টা করেছেন, বিশেষ বিশেষ দার্শনিক মতবাদ ও শিক্ষাপ্রকল্পের প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। বার্গ্সঁ,

ফ্রোয়েবেল, পেস্তালৎজি, রুশো, হার্বার্ট, ডিউই, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, গান্ধীজি প্রভৃতি মনীষীর দর্শনপ্রকল্পের সারাৎসার দিয়েছেন তুলনামূলক আলোচনা-প্রসঙ্গে। সারাৎসার সংগ্রহে লেখক অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। বলা বাহুল্য, এই কার্যে তাঁর নিজস্ব বিচার প্রতিফলিত হয়েছে। এ ছাড়া প্লেটো, অ্যারিস্টটল্ ও আরো অনেকের কথা ও প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। যেসব পাঠকের মোটামুটি পরিচয় আছে এই সকল মনীষার সঙ্গে, তাঁদের পক্ষে উদ্ধৃতিগুলি সহায়ক হবে সন্দেহ নেই। সাদৃশ্য ও স্বাতন্ত্র্যের উল্লেখ কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক দুই করে সাজিয়ে দিয়েছেন।

আরো প্রশংসার কথা, তত্ত্বের গুরুভারে রবীন্দ্রনাথের সহজ স্বাতন্ত্র্য চাপা পড়ে নি; শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্টতা অন্বেষণে লেখক ব্যর্থ হন নি। প্রকৃত শিক্ষায় প্রকৃতির ভূমিকা রবীন্দ্রচিত্তে একটি বিশেষ রূপ নিয়েছে। প্রকৃতি শুধু বস্তুসুখের আকর নয়, শুধু বিজ্ঞানচর্চা বা সৌন্দর্যবোধচর্চার ক্ষেত্র নয়, 'তিনি প্রকৃতিকে বসিয়েছেন এক অন্তরঙ্গ সাথীর আসনে, যার সঙ্গে মানুষ রসানুভূতি, কল্পনা ও প্রেমের সাহায্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে।' বিজ্ঞানের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার সামঞ্জস্য-সাধনার দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লেখক ভোলেন নি। তাছাড়া শিক্ষাব্যবস্থায় স্বাধীনতার সহজ একটি আবহাওয়া যেমন অত্যাবশ্যক, তেমনি গুরুর ভূমিকাটিও সুনির্দিষ্ট। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-সাধনায় শিক্ষার্থীর স্বাধীনতাকে লাঘব না করেও গুরুর ব্যক্তিত্বকে একটা বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভারতীয়তা এবং বিশ্বমানববোধ কেমনভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর শিক্ষাপ্রকল্পে, তা-ও লেখকের বক্তব্যের অন্তর্গত। ছোট ১৪৫ পৃষ্ঠার গ্রন্থে এতখানি উপস্থিত করা প্রায় অসম্ভব। তাই স্থানে স্থানে পাঠ কঠিন মনে হতে পারে—ভাষার আড়ষ্টতার জন্য নয়, অল্প পরিসরে বহু তত্ত্বের সমাবেশের জন্য।

প্রকাশনের দিকে যথেষ্ট যত্ন গ্রহণ করা হয়েছে। প্রচ্ছদপটের ছায়াঘন চিত্রটি গ্রন্থের বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য বৃদ্ধি করেছে। প্রচ্ছদপটের অন্তঃপৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে প্রায় একশত পঙ্‌ক্তির প্রবন্ধাংশ মুদ্রিত করে এবং অধ্যাপনানিরত রবীন্দ্রনাথের একটি দুষ্প্রাপ্য চিত্র ও তাঁর একটি প্রতিকৃতি-চিত্র অন্তর্ভুক্ত করে গ্রন্থটির প্রকৃত মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি করা হয়েছে।

সমীরণ চট্টোপাধ্যায়

উপেক্ষিত এক কবি

তন্ময় সীমায় যেতে। চিত্ত ঘোষ। **নিউ এজ** পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। **দুই** টাকা।

কবিতার বাজার সম্প্রতি বড়ই মন্দা। অন্তত, আমাদের দেশে। পাঠক-সাধারণের চিরকেলে অনীহা তো আছেই, শিল্প-উপভোগের বেনামীতে জীবন-উপলব্ধির তাগিদ আমাদের স্বভাবে এখনো শিকড় নামায় নি। কবিতা ও পাঠকের মধ্যবর্তী সহৃদয় সমালোচক, যথার্থ শিল্প-সমালোচনাও দেশে ক্রমশ বিরল হয়ে এল। এর উপর বাংলা কবিতায় আধুনিকতম পরীক্ষাপ্রকরণে উত্তরোত্তর জীবনবিমুখ ঝোঁক পাঠকের সেই নিস্পৃহাকে সংক্রামক করে তুলছে।

রাজনীতির স্থূল হস্তপীড়ন এখন সাহিত্যের সর্বাঙ্গে। সাম্যবাদী লেখকের রাজনীতি-বিষয়ে মনোযোগ নিয়ে সাবেকী কটাক্ষ যদিও আজও চলে, তবু হাওয়া পালটেছে অনেক। এখন হরেকরকম রাজনীতি, হরেকরকমতর দল। দেশের অর্থনীতিভিত্তিক ব্যাপকতর রাজনীতি তো আছেই, আজকাল ব্যক্তিকেন্দ্র রাজনীতি, সাহিত্যের রাজনীতি, রাজনীতিতে অনীহাবশত 'শুদ্ধতা'-র অশুদ্ধতর রাজনীতি; এখন রাজনৈতিক দল, সাহিত্যিক দল, ব্যক্তিপূজক দল, দলের মধ্যে দল-উপদল, গোষ্ঠী, দলে অবিশ্বাসীর চণ্ডতর দল। সর্বাত্মক এই রাজনীতি ও দলাদলির ঘূর্ণাবর্তে সাহিত্যের—কবিতার তো বটেই—নাভিশ্বাস উপস্থিত।

আমাদের আলোচ্য কবি চিত্ত ঘোষ মধ্যবয়স্ক, দীর্ঘকাল ধরে তিনি কবিতা লিখছেন, তাঁর কবিকৃতি বিশিষ্ট, স্বাবলম্বী, প্রাপ্তবয়স্ক। 'তন্ময় সীমায় যেতে' তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। অথচ, আশ্চর্যের বিষয়, যদৃকম অনেক কবিতা-লেখককে নিয়ে পত্র-পত্রিকায় অশোভন হইচই হামেশা হলেও, চিত্ত ঘোষ সমালোচক ও পাঠকের দৃষ্টি তেমন আকর্ষণ করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। তা না হলে তাঁর আলোচ্য কবিতার বইটি দু-বছরের উপর প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও সে-সম্পর্কে মোট দুটি-তিনটির বেশি সমালোচনা বা তেমন উল্লেখ্য কোনো আলোচনা দেখা গেল না কেন? চিত্ত ঘোষ বৃহত্তর অর্থে দলভুক্ত, অথচ দলীয় বা উপদলীয় নন। সংকীর্ণ গোঁড়ামি থেকে তাঁর মন আশ্চর্যরকম মুক্ত। সম্ভবত সে-কারণেই, আমাদের সাহিত্য-সংসারে তাঁর জন্যে দল বা বেদলের কোনোরকম মাথা ব্যথা নেই; তাঁর বরাদ্দ না-নিন্দা না-প্রশংসার

মাঝামাঝি ত্রিশঙ্কু অবস্থা, কিংবা নিরবচ্ছিন্ন উপেক্ষার ফাঁকে কালেভদ্রে মুরুব্বির মৃদু পিঠ-চাপড়ানি।

কবি য়েট্‌স বিষয়ে আলোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একদা তৎকালীন ইংরেজ কবি-গোষ্ঠীকে 'বিশ্বজগতের কবি' ও 'সাহিত্যজগতের কবি' বা 'জগতের কবি' ও 'কবিদের কবি', এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন। অতি-সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যচেষ্টার দিকে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীভেদ আরো কত মর্মান্তিক সত্যি মনে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে-কবিতায় আয়োজন প্রচুর; তার ভাষা-ছন্দের অঙ্গসজ্জা কখনো জীবনানন্দীয় স্বেচ্ছা-শিথিল, কখনো সুধীন্দ্র দত্তসুলভ জটিল নিপুণ, কখনো-বা অন্য কিছু; ইঙ্গিত-লক্ষণা-প্রতীক-প্রতিমার ঠাসবুনোন অপর্যাপ্ত; পশ্চিমের নবতম নন্দনতত্ত্বের নজির মিলিয়ে তার উৎকেন্দ্র চলনবলন; সীমা থেকে অসীমে, অরূপ থেকে রূপে তার মুহুর্মুহু পরিকল্পিত উদ্‌বর্তন—কেবল প্রাণপ্রতিষ্ঠাটুকুই তাতে বাকি রয়ে গেল। বাকি রইল, কারণ, ওই কবিকৃতি প্রায় সবটুকুই আরোপিত দেখানেপনা, ভান। কারণ, কবিতায় প্রাণসঞ্চারের কাজ নিছক পুঁথিপড়া বিদ্যে, অভিনব তত্ত্ব কিংবা আধুনিকতর থেকে তম ফ্যাশনের দ্বারা সাধ্য নয়। জীবনের সঙ্গে, পৃথিবীর সঙ্গে যে নিঃসঙ্কোচ ঘনিষ্ঠ আদানপ্রদান কবিতার প্রাণবস্তু, এই আধুনিকদের অনেকের তা আয়ত্ত নয়। আসলে এঁরা রবীন্দ্রনাথ-কথিত 'বিশ্বজগতের কবি' নন, 'সাহিত্যজগতের কবি'। এঁদের কবিতায় 'ক্রোধ' 'ক্ষুধা' 'বিদ্রোহ' 'বিপ্লব' সবই নিছক সাহিত্যজগৎ-সম্বন্ধীয়; স্বকপোলকল্পিত ধারণামাত্র। চিত্ত ঘোষ কিন্তু সেই স্বল্পসংখ্যক সাম্প্রতিক কবিদের পক্ষভুক্ত, যাঁরা 'কবিদের কবি' নন, যথার্থ 'জগতের কবি'। বাজার চলতি ফ্যাশনের পায়ে দাসখত না লিখেও তিনি আধুনিক। এই কাব্য-বিধ্বংসী নগরিয়ানা ও কৃত্রিমতার মধ্যে তাঁর নিরাবরণ সততা ও আন্তরিকতা পাঠককে স্পর্শ না করে পারে না।

চিত্ত ঘোষের কবিতার জগৎ মানুষকেন্দ্র। বিশ্বজগতের সঙ্গে মানুষের সত্তা, ঘাত, যন্ত্রণা, হতাশা, সংশয় আর স্বপ্নের টানাপোড়েনে অস্থির, উদ্‌বেজিত রোমান্টিক অতীত থেকে বর্তমানের নরকবাস সম্পূর্ণ করে সুস্থ শুভতর ভবিষ্যতের জন্যে তীব্র আকুলতা—এই জটিল মানসপথে চিত্ত ঘোষের কবিতার গমনাগমন। আর এই কবিতার জগতে ওতপ্রোত হয়ে আছে প্রকৃতি। প্রতিবেশী প্রকৃতি নয়, মানসিক বনভোজনের, সৌন্দর্যতৃষ্ণা মেটানোর স্থান

নয় এ। এ-প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক, সম্পূর্ণ মানবিক এই প্রকৃতি। তাই চিত্ত ঘোষের কবিতায় দিনের মুখ, রাত্রির মুখ, তরঙ্গ, প্রতিবিম্ব, প্রপাত আর নীলিমা, নদী, শিশুর উদ্যান, জলধারা, পাহাড়, অরণ্য আর বাদামী বালু—এ-সব মানুষের পরিবেশ বা আবহ নয়, এরা প্রত্যেকে জীবন্ত, এরা মানুষের জীবনধারা ও মানসিকতার প্রতীক।

অতীতে একদিন ব্যক্তিক নিভৃতি থেকে তাঁর কবিতার যাত্রা শুরু। সে যেন ঘুমের আচ্ছন্নতা, যেখানে

ফুল ঝরে যায় সারাদিন :
ছায়া শুয়ে থাকে পা মেলে   [ঘুমিয়ে]

সে যেন দু-জনের নিভৃত জগৎ। যেখানে

নদী বয়ে যাবে সময়ের পাশাপাশি
হাওয়া খুলে দেবে অন্ধকারের চুল   [দুজনে]

তবু এ-জগৎ ক্রমে স্মৃতির জগৎ। যদি কখনো মনে হয়

নিরবধি কাল রাখবে কি একতিলও
স্মৃতির মাঠের একটি কোমল ঘাস

তবু তিনি জানেন,

বৃথাই কামনা, বিফল মুক্তিযোগ
দিনে দিনে শুধু জমে ওঠে ক্ষয়ভার।   [হৃদয় জ্বালায়]

তারপর নরকবাস। যেন অনাত্মস্ত। যে-নরকে স্মৃতির সমারোহ ব্যর্থ :

দিন জালি, রাত্রি চালি, ভোরবেলা অশ্রু সরোবরে
মুখ রাখি, স্মৃতি-দেহ উন্মোচিত করি অন্ধকারে   [সমারোহ]

কিংবা,

সময় আঁচড়ে দু-একটি মুখস্মৃতি।   [অভ্যেস]

প্রেম সেখানে 'হৃদয়ের সর্বাধিক পরিণত পাপ' : প্রাত্যহিক সেখানে অভ্যাসের নামান্তর :

পায়ে পায়ে হেঁটে শহর প্রান্ত শহর
জটিল জানালা কোরকে কোরকে ব্যাধি
আবর্তে ঘোরে অন্ধ আবিল শহর
সুখ সমারোহ আসঙ্গ শোক খ্যাতি ;   [অভ্যেস]

'দিনের পাথর যেন তোলা যায় না, এতো ভারি' ; 'চতুর্দিকে ভস্ম, ভস্ম,

অবশিষ্ট অঙ্গারের অগ্নিতাপ, শিখা'। আর অনবচ্ছিন্ন এই নরকের মূলকেন্দ্রে শরবিদ্ধ আত্মার প্রতীক :

মূলকেন্দ্রে শরবিদ্ধ পাখি
আমাদের সারা গায়ে তার রক্ত, তার অশ্রু,
তার শুভ্র শীতল পালক। [সময়চিত্র]

তবু এরি মধ্যে হঠাৎ কোনো কোনো মুহূর্তে যেন :

কানে শঙ্খ, গভীর ঢেউয়ের গর্জন। [রাত্রির চাউনি]

কখনো মনে হয় এ শোকাবহ নিয়তিও অমোঘ পরিণাম নয়। চিত্ত ঘোষ ভাবেন :

শোকাবহ যে নিয়তি নষ্ট হ্যুতিহীনা
সর্বদা নিকটতম, নিত্য অহরহ
সত্তার সমস্ত দানে তাকে শুদ্ধ করা যায় কিনা [সংলাপ]

কিংবা,

কবে পল্লবিত হবে
বয়স্ক বুদ্ধির ডালে আবেগের শুভঙ্কর বহুবর্ণ হ্যুতি ? [স্মৃতিতীর্থে]

তাঁর অদিষ্ট সেই 'পবিত্র নীলিমা', সেই 'অন্য তট', অন্য 'তরঙ্গ', যা ভিন্নতর শুদ্ধতর জীবনের প্রতীক। তাঁর অভীপ্সা :

আড়ালে মগ্ন শূন্য, কাতর বালু
দুরন্ত রেখা সমান্তরাল দ্বিধা—
প্রতিধ্বনির পেছনে পেছনে কান্না
গোধূলিছায়ায় আলোকিত মুখ খোঁজে
হেঁটে হেঁটে হেঁটে কবে আমি সেই
শুদ্ধ সীমায় যাব ! [শুদ্ধ সীমায় যেতে]

বারেবারে তবু থেকে যায় দ্বিধা। 'সমান্তরাল দ্বিধা'। আর প্রশ্ন :

তরঙ্গিনী প্রতিবিম্ব, বলো তুমি কার ?

... ...

বৃষ্টিতে বিস্ময় মুছে অবিরাম অভ্যাসের বোঝা
ঘুরে ঘুরে কত খুঁজব প্রত্যয়ের পিত্তল দরোজা। [প্রতিবিম্ব]

মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগে, সে-শুদ্ধতা বুঝি 'ইচ্ছার লাফ' মাত্র, নিছক ইচ্ছাপূরণ। তবু ফিরে ফিরে জয়ী হয় জীবনবাহিনী ভালোবাসা :

ভালোবাসা প্রবাহিনী। গল্প বলো আরেক নদীর
জলের বিম্বিত শঙ্খ উৎসে আর উপলে অস্থির। [প্রতিবিম্ব]

কবি এ-ও জানেন, এ ভালোবাসাকে লালন করতে হবে নির্মম, সতর্ক প্রহরায় :

> কোথায় জলের শব্দ ? ধারালো থাবার বজ্র ঝড়
> সে প্রপাত কতদূর তবে ?
> বর্শা হাতে হে পাষাণ প্রদীপ্ত প্রহর
> ঘুমন্ত বাঘের নদী পার হতে হবে।　　　　　　[এই অন্ধকার]

'একটি বিচারের দিন', 'মুমূর্ষা' প্রভৃতি কবিতা এই 'বাঘের নদী' পার হওয়ার দিনলিপি—ভালোবাসা আর সতর্ক প্রহরার প্রতিজ্ঞাচিহ্নিত। মনে হয় যেন এইখানে পৌঁছে কবি তাঁর শুদ্ধ জীবনবাসনার সঙ্গে বাস্তবের সাযুজ্য খুঁজে পেয়েছেন। অভীষ্ট শুদ্ধতার সীমান্তপ্রদেশে একবার তিনি পৌঁছেছেন বোধ হয়। তবু সন্দেহ বুঝি মিটেও মেটে না। চতুর্দিকের অন্তর্দ্বন্দ্ব আর আত্মঘাত, ভাঙন আর অবক্ষয়, ন্যায়-নীতি-মূল্যবোধের একান্ত মূল্যহীনতা যে-সমাজকে সাবালক হবার আগেই জীর্ণ, পঙ্গু করে ফেলছে সেই আশ্চর্য অবাস্তব সমাজে চিত্ত ঘোষের 'শুদ্ধ সীমা'-র সন্ধানও বিচলিত। তাই কি মাঝে মাঝে তাঁর দিব্যদৃষ্টিও আবরিত, কণ্ঠস্বর ক্লান্ত, ত্রস্ত, জীবনসাযুজ্য ক্ষীণ, শুদ্ধ জীবনবাসনা 'ইচ্ছার লাক্ষ'-এ পর্যবসিত ?—

> নিবে আসে দৃপ্ত দীপ, তবুও আবার
> মনে হয় : হয়তো হবে, কিছু একটা, আর
> কেউ আসবে, হয়ে হয়ে হবে
> যদি কিছু না-ই হয়, তবে।　　　　　　[দিনের পাথর]

স্পষ্টতই চিত্ত ঘোষ মিছিলের মানুষ নন, তাঁর কবিকণ্ঠ উচ্চগ্রামে উচ্চকিত নয়। এমন কি, প্রত্যয়ে সর্বত্র দৃঢ়ও নয়। কিন্তু তাই বলে তিনি আত্মমুখ কবিত্বের জগতে স্বেচ্ছাবন্দীও নন, তাঁর উচ্চারণ স্বগতোক্তিমাত্র নয়। স্মৃতি-স্বপ্ন-যন্ত্রণা-বাসনা-দ্বিধা-নির্দ্বিধা সবকিছু নিয়ে তিনি আমাদের অন্তরঙ্গ, তিনি বিশ্বজগতের। ব্যক্তিক নির্জনতা থেকে অভিজ্ঞতার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ মিশে যান তিনি মানুষের মেলায়। বলেন, 'মুখের আলোর মিছিল।' বলেন,

> মিশে মিশে আশ্চর্য মেলায়
> খুঁজে দেখি আর কে আছে, কে কে আছে, যাবে
> পাহাড়ের উৎস থেকে উৎসারিত নদীর প্রবাহে।　　[মেলায়]

তাঁর এই জগৎ নিজস্ব অনুভূতিতে উপলব্ধ, মানুষের প্রতি অব্যর্থ বিশ্বাসে অর্জিত। পরিশীলিত কোনো আশা বা নিরাশাবাদের পরকলার মধ্যে দিয়ে

সৃষ্ট নয় এ। এই বিশিষ্ট মানসিকতার সসীমতা যাই থাকুক, এতে অন্তত কোনো পূর্ব-পরিকল্পনা, দৃষ্টিভঙ্গির কোনো ছক বা আরোপণ নেই। কবি হিসেবে চিত্ত ঘোষের সততা অসন্দিগ্ধ। তাঁর কবি-ব্যক্তিত্ব নিজস্ব, কণ্ঠস্বর স্বকীয়।

আর ভাষা। ভাষা যে সত্তার নির্যাস, চিত্ত ঘোষের কবিতা প্রসঙ্গে এ-সত্য আর একবার উল্লেখ্য। তাঁর উচ্চারণ মৃদু, অথচ চাপা আবেগে তীব্র। চারিত্রিক সাদৃশ্যে কোনো কোনো মুহূর্তে তা অরুণ মিত্রের কণ্ঠস্বর স্মরণে আনলেও, সব মিলিয়ে তাঁর ভাষা তাঁর বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের দ্যোতক। বাক্য ও শব্দের প্রচলিত অনুষঙ্গ এবং তাদের প্রথাসিদ্ধ বিন্যাস ভেঙে প্রয়োজনমতো চিত্ত ঘোষ তাদের পুনর্বিন্যাস সাধেন। এবং এর ফলে প্রায়শই তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়। পরিবর্তনের ফলে বহুব্যবহারের একঘেয়েমি কেটে ভাষায় সজীবতা ও বিশিষ্ট স্বাদ আসে, অথচ বিকৃতির মাত্রা আত্মমুখ ও উৎকেন্দ্র না হওয়ায় স্বগতোক্তির দুর্জ্ঞেয়তা তাতে বর্তে না।

চিত্রকল্প রচনায়ও চিত্ত ঘোষ সিদ্ধহস্ত। উপরের উদ্ধৃতিগুলিতেই তার প্রমাণ উপস্থিত। 'নীলিমায় ন্যস্ত করি উড্ডীনতা', 'আত্মায় বুনেছি আস্থা', 'লাল ধুলো বাতাসের কাচে', 'অনিদ্রাআহত রাত্রি ঘুম কাটে দাঁতে', 'বৃষ্টির পায়ের শব্দ নারকোলের থরথরে পাতায়', 'বাল্যের বন্ধুরা / স্মৃতির দুর্বল জালে পলাতক মাছ' প্রভৃতি বাক্য তাঁর কাব্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। তবে প্রথাগত দীর্ঘতর চিত্রকল্পের সাক্ষাৎ তাঁর কাব্যে কম। যদিও

ছায়ার ছাউনি পড়ে মাঠে
বিকেল গা ধুয়ে এসে পুকুরের সিঁড়িভাঙা ঘাটে
সূর্যাস্তের প্রসাধন মাখে [চিত্রপট]

এ-ধরনের পংক্তিনিচয় তিনি অক্লেশে লেখেন, তবু ছোট ছোট বাক্য বা বাক্যাংশে গঠিত খণ্ড চিত্রকল্পের সমষ্টিচয়নে বা মোজেইক প্যাটার্ন রচনায় তাঁর স্পৃহা বেশি। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব চিত্রকল্প-রচনায় ততটা খোলে না, যতটা খোলে প্রতীক-ব্যবহারে। বস্তুত, 'শুদ্ধ সীমায় যেতে' বইটিতে চিত্ত ঘোষের কবিভাষা উপমা-উৎপ্রেক্ষানির্ভর প্রতিমা নয়, প্রতীক। আগেই বলেছি, তাঁর কবিতায় আত্মীয়প্রতিম নিসর্গ মানুষের জীবনধারা ও মানসিকতার প্রতিফলন। দিন-রাত্রি-প্রতিবিম্ব-প্রপাত-নীলিমা-তরঙ্গ—এসব সেই প্রতীকের উপাদান।

যখন তিনি বলেন, 'বালুতে গড়ায় জল ফুটো করা চোখের কলস' তখন আবার একই বাক্যে প্রতীক ও প্রতিমার পরিণয় ঘটান তিনি। কিংবা, যখন :

পাথরের রাস্তাগুলো বাতাসের ওপর উঠেছে
আবার নেমেছে নিচে, ভীষণ নিচের দিকে, জলে ; [দৃশ্যপ্রবাহ]

এবং :

চোখে কোনো বৃক্ষ নেই ছায়া কী পল্লব।
দৃষ্টির দিগন্তে বৃষ্টি, অবিচ্ছেদ সেতুর নির্মাণ
কাটলের শূন্যতায় চোঁয়ায় নিমগ্ন জলধারা।
খণ্ড খণ্ড দীর্ঘ গাছ, ছিন্ন শাখা, নির্বাপিত চোখ
নগ্ন চৈতন্যের ভূমি, চতুর্দিকে বেষ্টিত পরিখা [প্রতিবেশ]

তখন সমগ্র দৃশ্য জগৎ প্রতীকে রূপান্তরিত, অথবা এক বিমূর্ত মানসিকতা দৃশ্য জগতের প্রতিরূপে স্ফূর্ত।

ছন্দ ও মিলের প্রয়োগনায় অবশ্য চিত্ত ঘোষের স্বকীয়তা তেমন স্পষ্ট নয়! আর এটা খুবই স্বাভাবিক। কেননা তাঁর কবি-স্বভাবের সাদৃশ্য খুঁজে পাই চিত্রীতে, স্থপতিতে বা ভাস্করে নয়। তবু তাঁর

'কেন কেন? কিবা লভ্য? বারবার কী?
কৈশোর প্রান্তরপটে একবাঁক উজ্জ্বল জোনাকি'-র সাহসী পরীক্ষা

এবং 'উগ্রতম বিষ' বাক্যাংশের সঙ্গে 'কে ভালোবাসিস'-এর আচমকা মিল পাঠকের তাক লাগায়।

আগেই বলেছি, চিত্ত ঘোষের কবি-ব্যক্তিত্ব তাঁর নিজস্ব। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়েছে, প্রধানত পশ্চিমের দুই ভিন্ন-মেরুবর্তী কবি, টি. এস. এলিঅট ও পোল এল্যুআর-এর মিশ্র সান্নিধ্য ওই ব্যক্তিত্বগঠনে সহায়ক হয়েছে। তবে এ-সান্নিধ্যের ফলাফল পরোক্ষ এবং শুভ, অর্থাৎ কবির বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ববিকাশের অনুকূল। বিশেষত যে-সমস্ত কবিতায় এই ব্যক্তিত্ব সবচেয়ে উজ্জ্বল ও বাকভঙ্গি স্বকীয়, তার মধ্যে 'হৃদয়ের পাপ', 'অভ্যেস', 'দিনের পাথর', 'তুমি যেন পারো', 'প্রতিবিম্ব', 'মেলায়', 'প্রতিবেশ' প্রভৃতি উল্লেখ্য। তাছাড়া, 'সংলাপ' নামের অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ কবিতাটি কবির চিন্তাচেষ্টা-চৈতন্যের বিবর্তনের ইতিবৃত্ত এবং 'একটি বিচারের দিন' দৈনন্দিন বাস্তবকে আবেগবহ অথচ সংহত কাব্যরূপ দেবার সফল প্রয়াস হিসেবে স্মরণযোগ্য।

সাম্প্রতিক কাব্যচেষ্টায় বীতরুচি পাঠককে চিত্ত ঘোষের 'শুদ্ধ সীমায় যেতে' বইটি একবার পড়ে দেখতে বলি।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস

Indian Trade Union Movement : Gopal Ghose. Rs. 2.

ভারতের শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সম্পর্কে প্রাথমিক কাজ শুরু করেছিলেন রজনীকান্ত দাস, শিব রাও এবং রজনী পাম দত্ত। বর্তমান যুগে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের দ্রুত বিকাশ সহজেই চোখে পড়ে, কিন্তু বিষয়টি সম্পর্কে গবেষণা এখনো শুরু হয় নি বলে মনে হয়। এ দুর্ভাগা দেশে এই কাজের বাজার দর নেই। পণ্ডিতসমাজে ট্রেড ইউনিয়নের ইতিহাস কত দিনে মর্যাদা পাবে জানি না। ভারতীয় মার্কসবাদীরা কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেই ক্লান্ত। ব্যাপারটা অদ্ভুত, কেন না ইউরোপে ট্রেড ইউনিয়ন বহুকাল আগে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ওয়েব দম্পতি, হ্যামণ্ড দম্পতি এবং জি. ডি. এইচ. কোলের লেখা এ দেশে সুপরিচিত। শিল্প-বিপ্লবের দেশে শ্রমিক সমাজে উপেক্ষণীয় থাকতে পারে না, সে সহজেই চিন্তাশীল ব্যক্তির মনোযোগ আকর্ষণ করে। শিল্পায়নের গতি যে-দেশে অতি মন্থর সে দেশে শ্রমিকের দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা অপেক্ষাকৃত কঠিন। কিন্তু প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল যে শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিকাশ অব্যাহত তার ইতিহাস সম্পর্কে অনীহা দুর্বোধ্য।

শ্রীগোপাল ঘোষ বিষয়বস্তু নির্বাচনে সাহস দেখিয়েছেন। ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের উৎপত্তি তাঁর আলোচ্য বিষয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ১৯২০ সালে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের জন্ম। শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস অনেক পুরনো। ভারতে ধনতন্ত্রবাদের বিকাশের সঙ্গে শ্রমিক-সমস্যা আত্মপ্রকাশ করে। পশ্চাদ্‌পদ অশিক্ষিত শ্রমিকদের অনেক ছোট বড় ধর্মঘট এবং সংগঠন গড়বার প্রচেষ্টা পরিণতি লাভ করে একটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠায়। ভারতের মতো সুবিশাল দেশে প্রথম যুগের শ্রমিক-আন্দোলন স্বভাবতই সীমাবদ্ধ থাকে বড় বড় শিল্প কেন্দ্রে। ধর্মঘটগুলি প্রধানত ঘটে বোম্বাইয়ের সুতাকলে, বাংলার পাটকলে, জামশেদপুরের ইস্পাত কারখানায়, রেলে। লোকালয় থেকে অনেক দূরে আসামের চা-বাগানের মজুররাও ধর্মঘট করে। মালিক ও সরকারের আক্রমণের মুখে বেশির ভাগ ধর্মঘটই ভেঙে যায়। ট্রেড ইউনিয়নের ভিত্তিতে শ্রমিকরা সংগঠিত হয় না। শ্রমিকরা "ধর্মঘট কমিটি" গঠন করে, যে-কমিটি ধর্মঘটের শেষে বুদ্‌বুদের মতো

মিলিয়ে যায়। ফলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন পিছিয়ে থাকে। প্রথম যুগের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে উন্নত চিন্তাধারার বাহক বুদ্ধিজীবী বা শিক্ষিত শ্রমিক চোখে পড়ে না, সুযোগসন্ধানী ও সুবিধাবাদী ব্যক্তিরাই প্রধানত নেতৃত্ব করেন। ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের এই দুর্বলতা অনেকদিনের পুরনো। ট্রেড ইউনিয়নগুলির সদস্য তালিকা এবং তহবিলের গণ্ডগোল সম্পর্কে বারবার মন্তব্য করেছেন সরকারী মহল।

ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সম্পর্কে নতুন বিশ্লেষণের সূত্রপাত করেছেন রজনী পাম দত্ত। শ্রীগোপাল ঘোষ তাঁকে অনুসরণ করে এই বই লিখেছেন। কিন্তু শ্রমিকের ধর্মঘট এবং জঙ্গী মনোভাবের বিবরণ যথেষ্ট নয়। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ইতিহাস আরো গভীর বিশ্লেষণের দাবি রাখে। সে ইতিহাসের মধ্যে যেন অতীত এবং বর্তমানের যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। সে ইতিহাসে যেন ভবিষ্যতের সন্ধান মেলে।

আমার কয়েকটি জিজ্ঞাসা আছে। শ্রমিকদের মধ্যে ধর্মগত এবং সম্প্রদায়গত সমস্যা কি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে পিছনে টেনেছে? একই কারখানায় নিযুক্ত ভিন্ন ধর্মাবলম্বী এবং ভিন্ন ভাষাভাষী মজুরদের ঐক্য কী পরিমাণে রক্ষিত হয়েছে? প্রথম যুগের শ্রমিক আন্দোলন কি জাতীয় আন্দোলনের অংশ হিসাবে গড়ে উঠেছিল? জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সম্পর্ক কি ছিল? শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জাতীয় আন্দোলনে এবং সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছে, নেতৃত্ব করেছে; কিন্তু শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে বুদ্ধিজীবীর অনীহা কেন? ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিকাশে ফ্যাক্টরি আইন এবং লেবর লেজিসলেশনের ভূমিকা কি?

শ্রীগোপাল ঘোষ শ্রমিকশ্রেণীর জন্ম ও বিকাশ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু ভারতে ধনতন্ত্রের বিকাশের পর্বে শ্রমিকের অবস্থা (মজুরীর হার, কাজের ঘণ্টা, বাসস্থান ইত্যাদি) তাঁর আলোচনা থেকে বাদ পড়েছে। এই বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ কষ্টসাধ্য। অনেক সময় ফ্যাক্টরি ইনসপেক্টরদের রিপোর্টে মূল্যবান তথ্য মেলে। শ্রমিক সংগ্রহের বিবরণ, মেয়ে, পুরুষ ও শিশু মজুরের সংখ্যা, মজুরীর হার, দুর্ঘটনার বিবরণ ইত্যাদি এই রিপোর্টে পাওয়া যায়। শিব রাও এবং রজনীকান্ত দাসের বই লেখক নিশ্চয়ই দেখেছেন।

শ্রীঘোষ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর গবেষণা চালিয়ে যাবেন বলে আমরা আশা করি।

সুনীল সেন

চারুলতা-প্রসঙ্গে

এক

শ্রীসত্যজিৎ রায় আমার সমালোচনার যে-জবাব দিয়েছেন তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ এই কারণে যে সুদীর্ঘ প্রবন্ধে তাঁর চিন্তাধারা এমনই খোলসাভাবে পেশ করেছেন যে আমার সমালোচনার যথার্থতা সম্বন্ধে যাঁদের কোনো সন্দেহ ছিল এবং নিজেদের কল্পনার উপর ভিত্তি করে যাঁরা 'চারুলতা' ছবিতে নানাবিধ অন্তর্গূঢ় তাৎপর্য আবিষ্কার করছিলেন তাঁদের আর কোনো অনুসন্ধানের অবকাশ রইল না। শ্রীসত্যজিৎ রায়ের সিনেমা-সম্পর্কিত জ্ঞানই শুধু না, তাঁর সাহিত্য সম্বন্ধে, জীবন সম্বন্ধে ও প্রেম সম্বন্ধে জ্ঞান ও ধারণারও অজস্র উদাহরণ তাঁর প্রবন্ধের আগাগোড়া ছড়ান। তাঁর জীবন সম্বন্ধে জ্ঞানের উদাহরণ, "ভূপতির দীর্ঘকালব্যাপী এই marathon incomprehension-এর মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি" তিনি খুঁজে পান না। লোকে চারুর সম্বন্ধে কানাকানি করে অথচ স্বামী বুঝতে পারে না, এ কি হয়? তাই তো। প্রেম সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানের নমুনা: "তাই যদি হয়, তাহলে চারু অমলকে প্রিপেড্ টেলিগ্রাম পাঠিয়ে কি আশা করছে? অমলের ব্যস্ততার কারণ সে জানে। অমলের কুশলসংবাদ সে ভূপতিকে লেখা চিঠিতেই পেয়েছে। প্রিপেড টেলিগ্রামের উত্তর থেকে কি চারু এমন কিছু ইঙ্গিতের আশা করে যে তার প্রতি অমলের আকর্ষণ অটুট রয়েছে? দাদার অনুরোধে বিয়ে করে এবং বিলেত গিয়ে তো সে স্পষ্টই বুঝিয়ে দিয়েছে যে সে চারুর সঙ্গে সম্পর্কে ছেদ টানতে চাইছে।" তাইতো! রবীন্দ্রকল্পিত চারু অবুঝ। Irrational! কিন্তু প্রেমে পড়ে মানুষ কি অবুঝ হয়, irrational হয়? শ্রীসত্যজিৎ রায়ের জানের প্রেমিকরা বোধ হয় প্রেমে পড়ার পরও rational থাকে, তাই তিনি "চারুর মনোভাবের কোনো পরিষ্কার reciprocation-এর কোনো ইঙ্গিত অমল দেয় নি"—এই কারণে চারুকে দিয়ে অমলের হাত চেপে ধরিয়ে বলান, "যাই ঘটুক না কেন—কথা দাও তুমি এখান থেকে যাবে না।" এবং এই উদ্ভাবনের সপক্ষে তিনি যা বলেন তাতেই তাঁর সাহিত্যজ্ঞানেরও পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লেখেন, "এই কারণেই এই কান্নার দৃশ্য মূলানুগ হয় নি—এ অভিযোগের কোনো মানে আমি বুঝি না। Action-এর সাহায্যে এ দৃশ্যে যা বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তার চেয়েও কম বলা হয় নি।" রবীন্দ্রনাথের গল্পে

অমলের চলে যাওয়ার এবং সব সম্পর্ক ছিন্ন করার বহু পরে চারু যখন ধীরে ধীরে নিজের হৃদয়ের অবস্থা চিনে নিতে পেরেছে, তখন চারু অমলকে স্মরণ করে কী ভাবে কাঁদত তার যে-বিবরণ আছে তার উদ্ধৃতি দিয়ে শ্রীরায় অমলের চলে যাওয়ার অনেক আগে অমলের জামা আঁকড়ে ধরে চারুর কান্নায় ভেঙে পড়ার দৃশ্যের সমর্থন করেন। তাই তো, কোনো এক অবস্থায় উপনীত হয়ে চারু যেভাবে কাঁদতে পেরেছে সেখানে উপনীত হওয়ার অনেক আগেই বা সে তা পারবে না কেন?

শ্রীসত্যজিৎ রায় প্লট বলতে কি বোঝেন (৬৮০ পৃষ্ঠায় তৃতীয় প্যারা লক্ষণীয়) এবং থীম বলতেই যে কি বোঝেন (তাঁর প্রবন্ধের অন্তিম অংশ দ্রষ্টব্য) তার থেকেও তাঁর সাহিত্যবোধের পরিচয় পাই।

শ্রীরায় তাঁর প্রবন্ধের প্রথম এক পৃষ্ঠা জুড়ে আমাকে যে-গালিগালাজ দিয়েছেন তার কোনো প্রতিবাদ করব না। বাংলাদেশের পাঠককে শ্রীরায় যতটা নাবালক মনে করেন তাঁরা তা নন এবং এ গালিগালাজের দরুন পাঠকের চোখে আমার বিন্দুমাত্র সম্মানহানি ঘটে নি, শ্রীরায়ের নিজেরই ঘটেছে, এ বিশ্বাস আমার আছে। কিন্তু প্রতিবাদ করব একটি বিষয়ে যা পাঠকের নজরে না পড়াই স্বাভাবিক। আমি নষ্টনীড় গল্পের শেষ দৃশ্য ও সংলাপ যার শুরুতে "হঠাৎ চারু ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল" তার উদ্ধৃতি দিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম, "এই অতুলনীয় দৃশ্য ও এই সংলাপটি বর্জন করলেন কোন শিল্পপ্রেরণার তাগিদে? এর আগাগোড়াই কি সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত অবস্থায় স্ক্রিপ্ট-এর অন্তর্ভুক্ত করার কোনো অসুবিধা ছিল? এরকম অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়।" শ্রীসত্যজিৎ রায় উপরিউক্ত তিনটি বাক্যের দ্বিতীয়টিকে এমন ভাবে ব্যবহার করেন (পৃষ্ঠা ৬৮০, দ্বিতীয় প্যারা) যাতে পাঠকের মনে হতে বাধ্য "এর আগাগোড়া" বলতে আমি নষ্টনীড় গল্পের আগাগোড়া বুঝিয়েছি। আশা করি শ্রীরায় সজ্ঞানে এই বিকৃতিসাধন করেন নি।

আমার মূল সমালোচনা ছিল, "নষ্টনীড় গল্পের সূক্ষ্মতা ও জটিলতা ফুটিয়ে তোলা পরিচালকের সাধ্যের বাইরে ছিল, সুতরাং যেমনটিভাবে সাজালে তিনি ম্যানেজ করতে পারেন তেমনভাবেই সাজিয়ে নিয়েছেন।" শ্রীসত্যজিৎ রায়ের নিজের জবানীতেই এই সমালোচনার সমর্থন পাই যখন তিনি লেখেন, "রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনাবলীর মধ্যেও যে suspension of disbelief সৃষ্টি করতে পেরেছেন, তা চলচ্চিত্রকারের সাধ্যের অতীত।" অবশ্য শ্রীসত্যজিৎ রায় নিজের

সাধ্য সম্বন্ধে কোনো সন্দেহকে আমল না দিয়ে কাহিনীকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের সাধ্যের সীমারই দোহাই দিয়েছেন।

অশোক রুদ্র (দিল্লী)

দুই

শ্রীঅশোক রুদ্র 'চারুলতা'র বিস্তৃত পর্যালোচনা করেছিলেন আশ্বিনের পরিচয়-এ। তাঁর সমালোচনা হয়েছিল প্রতিকূল। কিন্তু কোনো অসংযত ভাষা, ব্যক্তিগত আক্রমণ ছিল না ; ছিল সংযত যুক্তিজাল। শ্রীরায় বলেছেন, শ্রীরুদ্র হয়তো বিলাতে দু-একটি ভালো সিনেমা দেখেছেন, কিন্তু তিনি সিনেমার কী বোঝেন—? শুধু বোঝেন না নয়, বোঝালেও বোঝেন না, "বেয়ণ্ড রিডেম্পশেন"। অন্যান্য সমালোচকদের বলেছেন,—পকেটে পাঁচসিকা থাকলেই যে-কেউ সিনেমা দেখতে পারে ও মন্তব্য করতে পাবে—ইত্যাদি।

আমি সত্যজিৎবাবুর এসব অসংযত উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করি। শ্রীরায় বিশ্ববিখ্যাত সিনেমা ডিরেক্টরদের অন্যতম ; দেশ-বিদেশে তাঁর খ্যাতি। সম্প্রতি ভারত সরকার তাঁকে উচ্চ সম্মানে বিভূষিত করেছেন। অতি সম্রমেই বলতে হচ্ছে, পাঁচসিকার আসনে বসে দেখলে সিনেমা-সমালোচনার অধিকার হবে না,—এ কথার যুক্তিবত্তা কি ? দু-একটি ভালো সিনেমা দেখলেও তুমি কী বোঝ—এ হামবড়ামি কেন ? বিশেষজ্ঞের ও অধিকারীব প্রশ্ন উঠতে পারে বটে কিন্তু সাধারণেরও রসগ্রাহিতার ক্ষমতা আছে বলেই সিনেমা প্রদর্শনের বিপুল আয়োজন। নয়তো শুধু দু-দশজন বিশেষজ্ঞের জন্ত সিনেমা দেখানোর ব্যবস্থা করলেই হয়।

কোথায় ও কেন তিনি কাহিনী পরিবর্তন করেছেন, শ্রীরায় তাঁর উত্তরে এর দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে নষ্টনীড়ে প্লট গৌণ। তার চরিত্রের মনোভাব ও সম্পর্কের সূক্ষ্ম ও দরদী বিশ্লেষণ করে সব সম্পর্ক ফুটিয়ে তুলতে প্রয়োজনমতো স্বরচিত ঘটনার সাহায্য নিয়েছেন। কয়েকটি উদাহরণও তিনি দিয়েছেন। কিন্তু প্লট গৌণ সিদ্ধান্ত করে তাকে যথেচ্ছ বা বহুল পরিমাণে ছাঁটাই ও অদলবদলের অধিকার নিশ্চয়ই পরিচালকের নেই। এ প্রসঙ্গে অশোক রুদ্রকে তিনি বলেছেন, চিত্রনাট্যের অ-আ-ক-খ জানেন না। এর অর্থ শ্রীরায় যেভাবে চিত্রনাট্যে গল্পকে বদলাবেন তার উপর কোনো কথা বলা চলবে না। এদিকে তাঁর লেখার শেষে তিনি মন্তব্য করেছেন চারুলতাকে ত্যাগ

করে মহীশূর যাওয়া রবীন্দ্রনাথ-বর্ণিত ভূপতির চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায় না। তাই তিনি রবীন্দ্রনাথকে সংশোধন করে ভূপতিকে ঘরে ফিরিয়ে এনেছেন। ব্যর্থ ও আহত হলে মানুষ যেমন ভেঙে পড়ে,—তেমনি সে কতদূর কঠিন ও নির্মম হতে পারে,—এমন কি নিজের ও প্রিয়জনের জীবন নাশ করতে পারে,—এ কথা যদি তাঁর জানা না থাকে তবে নষ্টনীড়ের মতো বিশ্ব-গল্প-সাহিত্যের এক অনুপম ট্র্যাজেডি নিয়ে ছবিতে নামা তাঁর উচিত হয় নি। অমলের বিলাত যাওয়াও তিনি সংশোধিত করেছেন। তিনি বলেছেন নষ্টনীড়ের থীম চারুলতায় অটুট আছে। সে থীম কী তারও এক আভাস দিয়েছেন, যথা—দুজনেই পরস্পরের দোষ ক্ষমা করে পুনর্মিলন ও নতুন করে সুখনীড় রচনা করা ভবিষ্যতে হতে পারে। তাই ছবিতে হাতে হাত মেলানোর ইঙ্গিত।

হাতে হাত মেলানোর দৃশ্য সম্পূর্ণ কষ্টকল্পনা ও হাস্যকর। শ্রীরায়ের সঙ্গে আমাদের এইখানেই মূল মতবিরোধ। শ্রীরায় নষ্টনীড়ের থীম, প্লট, চরিত্র,—সভয়ে বলছি, বুঝতে পারেন নি এবং বদলেছেন; সংলাপ, যা প্রায় অমূল্য, বর্জন করেছেন। শ্রীরায় শুধু নষ্টনীড় নয়, রবীন্দ্রনাথের অন্য তিনটি গল্পে, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে উপন্যাসেও অন্যাধিক হস্তক্ষেপ করেছেন। কিন্তু নষ্টনীড়ের হস্তক্ষেপ চূড়ান্ত।

চারুলতা, ভূপতি, অমল—প্রত্যেকের জীবনের নিগূঢ় মর্ম তিনি গৌণবোধে বাদ দিয়েছেন, অথচ বলেছেন তিনি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন। চারুলতা ছিলেন নিঃসন্তান; সংসারে বা স্বামীকে দেবার কিছু ছিল না। শূন্য হৃদয় পূরণের সম্বল হলো আশ্রিত দেওরের যত্ন-আত্তি, তার সাহচর্য, রচনায় সহযোগিতা ও উদ্দীপনা দান। স্ত্রীলোকের হৃদয়বৃত্তিই হলো সেবায় যত্নে দানে আত্মপ্রেরণায় নিজেকে ব্যয় করা। চারুলতা এইভাবে নিজেকে ব্যয় করে হৃদয়ের ক্ষুধা মেটালেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অমলের আত্মকেন্দ্রিক স্থূল ব্যবহারে বিপর্যস্ত হলেন।

এ ঘটনাপরম্পরা শ্রীরায় গ্রহণ করেন নি। অমল চলে যাবে বলায় তার অদর্শন আশঙ্কায় চারুলতাকে তার বক্ষলীনা দেখিয়েছেন। নারীহৃদয়ের অতি কোমল এক হৃদয়বৃত্তিকে অযথা রূঢ়ভাবে তিনি বিকৃত করেছেন। অদর্শন আশঙ্কায় চারুলতা অসংযত হন নি। যাবার সময় তিনি অমলকে সহাস্যে বিদায় দিয়ে, চিঠি দিও বলে ঘরে এসে দরজা বন্ধ করেছিলেন। নিশ্চয়

কেঁদেছিলেন ও পাছে ভূপতি দেখতে পান, এই আশঙ্কায় বন্ধ করেছিলেন দরজা। কিন্তু এ হলো আলাদা কথা। অমল বিলাত গিয়ে যখন চিঠি দিল না ও সকল সম্পর্ক ছিন্ন করল তখন অল্পে অল্পে তিনি ভেঙে পড়লেন। যে ভাবাবেগ, প্রীতি তাঁর হৃদয়ে স্পন্দিত হয়েছিল তা হলো রুদ্ধ, যে-সাহচর্য এনে দিয়েছিল মূল্যবোধ তা হলো ভগ্ন। চারুলতা জীবনের যে-স্বাদ পেয়েছিলেন তা অপহৃত হলো, কোনো অবলম্বনই আর তাঁর রইল না।

চলচ্চিত্রে অমলের চলে যাওয়া হয়েছে অর্থহীন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,—"মেঘের কুয়াশা কাটিবামাত্র পথিক যেন চমকিয়া দেখিল সে সহস্র হস্ত গভীর গহ্বরের মধ্যে পা বাড়াইতে যাইতেছিল।" শুকনো মুখে চারুলতার ঘর থেকে ভূপতির চলে যাওয়া দেখে অমলের উপলব্ধি হয়েছিল, উভয়ের লেখার উন্মাদনা ভূপতি ও চারুলতার মধ্যে এক দুরধিগম্য ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। চারুলতার সঙ্গেও তার ব্যবধান হয়েছিল লেখা নিয়ে, মন্দাকে নিয়ে। এর পর বিয়ে করে বিলাত যাওয়ার প্রস্তাব ভূপতি যখন করলেন, তখন আপত্তি না করে সে তা স্বীকার করল। এ সব অদল-বদল না করে কেন সিনেমায় দেখান যেত না, তার কোনো সংগত কারণ দেখি না। অমলের বিলাত যাওয়ার পর্বও বাতিল করেছেন কোন্ প্রয়োজনে ? উত্তরে, আমরা সিনেমার অ-আ-ক-খ বুঝি না বললে নিরুপায়।

ভূপতির চরিত্র চলচ্চিত্রে কিছুটা মূলানুগ হলেও বৃহৎ রকমের পার্থক্য ও অসংগতিও আছে। ভূপতি সরকারের সীমান্ত-নীতিকে তীব্র আক্রমণ করতেন তাঁর কাগজে। শ্রীরায় দেখিয়েছেন বিলাতে লিবারল পার্টির জয়ে ককটেল পার্টি দিলেন ভূপতি। ককটেল পার্টিও যেমন উদ্ভট, তাতে রামমোহন রায়ের গান "মনে কর শেষের সেদিন, কী ভয়ংকর"-ও তেমনি হাস্যকর।

উমাপদর প্রতারণায় ভূপতি প্রচণ্ড ধাক্কা খেলেন। অমল বিলাত চলে গেল। কাগজ তুলে দিতে বাধ্য হয়ে ভূপতি মনে করলেন এইবার নতুন করে জীবন আরম্ভ করবেন, চারুলতার সাহিত্যচর্চায় যোগ দেবেন। অমল চলে যাওয়ায় স্ত্রী একান্ত বিমর্ষ বিকল হয়ে পড়েছিলেন। ভূপতি চেষ্টা করলেন চারুলতার সঙ্গে পড়াশুনা-আলোচনা করতে। এমন কি নিজে বাংলা রচনার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সব বৃথা, চারুলতার বিমর্ষতা দূর হলো না। যখন নিজের গহনা বিক্রী করে চারুলতা প্রিপেড্ টেলিগ্রামে অমলের সংবাদ আনালেন তখন ভূপতি উপলব্ধি করলেন তাঁর নতুন জীবনের সংকল্প আকাশকুসুম

মাত্র। তাঁর ধৈর্যচ্যুতি হলো, তিনি হলেন আত্মহারা, নির্মম। তাঁর লেখাগুলি নিয়ে যেখানে চারুলতা তাঁরই জন্য কচুরি ভাজছিলেন সেই উনানে পুড়িয়ে দিলেন। চারুলতাকে রেখে মহীশূরে চাকরি নিয়ে চলে গেলেন। এদিকে চারুলতা নিজের দুর্বলতা বুঝতে পেরে দ্বিগুণভাবে স্বামীসেবায় নিযুক্ত হতে প্রযত্ন করেছিলেন কিন্তু সবই হলো বিফল।

শ্রীরায় ভূপতির ধৈর্যচ্যুতি ও নির্মমতা তাঁর চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায় না বিচার করে তাকে পরিহার করেছেন। এতে কি থীম অটুট রাখা হয়েছে? ভূপতির স্থিরচিত্ত আহত হওয়ায় স্ত্রীর প্রতি তাঁর মনোভাব পরিবর্তিত হলো এইটাই নষ্টনীড়ের ট্রাজেডির পূর্ণযোগ। চলচ্চিত্রে শ্রীরায় দেখিয়েছেন, চারুলতাকে ভূপতি নিয়ে গেলেন পুরীসৈকতে। অপরপক্ষে যে-সাহিত্যানুরাগ অমল থাকায় চারুলতার জীবনে পুষ্পিত- হয়েছিল, অমল চলে যাওয়ায় স্বয়ং সেই সাহিত্যচর্চার ভার নিতে চেয়েছিলেন ভূপতি, নষ্টনীড়ে। সে অনুরাগ কি সমুদ্রের জলে তৃপ্ত হবার? আর-এক কথা। নষ্টনীড়ের রচনাকাল ১৯০১ অব্দে। তখনও পুরী পর্যন্ত রেলপথ খোলা হয় নি। যেতে হতো স্টীমারে। স্টীমারে গিয়ে পুরীতে সমুদ্রসৈকতে হাওয়া খাওয়ার রেওয়াজ নিশ্চয় তখন ছিল না।

অভিযোগ এ নয় যে চারুলতা ভালো ছবি হয় নি। বরং সকলেই বলেন চারুলতার পরিচালনা, direction উৎকৃষ্ট, অনিন্দনীয়। অভিযোগ এই যে সত্যজিৎ রায় এতগুলি মূলগত পরিবর্তন করেছেন যে চারুলতায় আমরা নষ্টনীড়কে—বিশেষত রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড়কে পাই নে।

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য
কলকাতা ১৯

তিন

শ্রীরায় দাবি করছেন—আর সকলে, এমন কি যাঁরা শিল্পী নন তাঁরাও, তাঁর সৃষ্ট আর্ট বুঝতে চাইলে সমস্তরে উন্নীত করবেন নিজেদের। কেননা তা এতই দুরূহ যে সর্বসাধারণের জন্যে নয় ("পকেটে পাঁচসিকা পয়সা এবং হাতে ঘণ্টা তিনেক সময় থাকলে যে-কেউ যে-কোনো ছবিই দেখতে পারেন এবং তা নিয়ে মন্তব্য করতে পারেন" এই বিদ্রূপ-উক্তি দ্রষ্টব্য)।

এক সময়ে এই ভয় ছিল যে পুস্তক পাঠ করে বুঝতে হলে যথেষ্ট যুক্তি ও বুদ্ধির অধিকারী হতে হয়। কিন্তু এখন আবার দেখছি যে "চলচ্চিত্র" বুঝতে

হলেও পাণ্ডিত্য না হলেই নয়। কিন্তু প্রশ্ন হল শিল্পী কি সৃষ্টি করেন শুধু মুষ্টিমেয় পণ্ডিতের জন্যেই? তাহলে তা সর্বজনকে দেখাতে চান কেন? 'নষ্টনীড়' পুস্তকটি পাঠ করে সম্যক উপলব্ধি করতে যে মস্তিষ্কচর্চার প্রয়োজন হয়, ছায়াচিত্র দেখতে গিয়ে তার চেয়েও অগ্নিপরীক্ষায় আপামর জনসাধারণকে ব্যস্ত হতে হবে? সিনেমা কেমন করতে হয় তা জানতে হবে? (নষ্টনীড় কেমন করে ছাপা হয়েছিল, কি করে প্রুফ কারেক্ট করতে হয় তা জানতে হবে?) কেন জানতে হবে চলচ্চিত্র-নির্মাণের টেকনিক কি। একটি ছবি এঁকে দেখাতে কি দরকার হয় রং তুলি কেমন করে ঘাঁটতে হয় বা তাতে কতটা স্বাধীনতা নিতে পারেন শিল্পী সেটি বিনষ্ট না করে ছবি হিসেবে দাঁড় করাতে? আমার মনে হয় শিল্পীর স্বাধীনতা ততটুকুই, জনসাধারণকে বোঝাতে যতটুকু দরকার হয়। বিশেষত অনুবাদকের পক্ষে তো স্বাধীনতা নেবার প্রশ্ন খুবই সীমিত।

দিলীপ রায়
কলকাতা ২৯

চার

অশোক রুদ্রের আলোচনাটি ছিল প্রধানত 'পোস্টমাস্টার', 'মণিহারা' ও 'চারুলতা'কে কেন্দ্র করে। সত্যজিৎবাবু জবাব দিতে গিয়ে প্রথম দুটি সম্বন্ধে মন্তব্যপ্রকাশ সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। হতে পারে তিনি রুদ্রমশাইয়ের অভিযোগ মেনে নিয়েছেন অথবা চারুলতার মধ্য দিয়েই পরিচালকের অবাধ (?) স্বাধীনতা সম্বন্ধে নিজস্ব মতামত দাঁড় করিয়ে পোস্টমাস্টার ও মণিহারাকে তার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। চারুলতার মূল থীমটি কি? একটি নারীর পরকীয়া প্রেম? নষ্টনীড় গল্পের মূল থীমটি যদি এইটেই হত, তবে বলা চলে, চারুলতা নষ্টনীড়ের সার্থকতম চলচ্চিত্রায়ণ। অশোকবাবু ভদ্রলোক বলে এমন অভিযোগ করেন নি, কিন্তু আমি করছি-: সত্যজিৎবাবু গল্পের মূল থীমটি বুঝতেই অক্ষম হয়েছেন। বন্ধুত্ব সম্পর্কের মধ্য দিয়েই চারু ক্রমশ অমলের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। যদিও চারুর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অমল অবশ্যই সচেতন, কিন্তু চারু তো বিচারে বসতে পারে না। তাই অমলের বিয়ে করে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত চারু কখনই বুঝে উঠতে পারে নি যে সে অমলকে ভালোবাসে। চারু এইবার পদে পদে উপলব্ধি করে, কার সমস্ত মনপ্রাণ জুড়ে অমলের আসন চিরস্থায়ী হয়ে আছে। এইখানেই চারুর জীবনের আসল ট্র্যাজেডি।

প্রেমের গল্প হিসেবে নষ্টনীড়ের এইটেই বৈশিষ্ট্য। অন্য পাঁচটা প্রেমের গল্পের মতো বিবাহিত জীবনে অন্য পুরুষের প্রতি নারীর প্রেমের আকর্ষণের সমস্যা এই গল্পের বিষয়বস্তু নয়। চারুর সঙ্গে অমলের এই সম্পর্ককে যদি কেউ Biology-র উপর প্রতিষ্ঠা করতে চান তবে তিনি মারাত্মক ভুল করবেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যে ফ্রয়েডিয় মনোবিজ্ঞান কখনই কার্যকর ছিল না। অথচ অমল-চারু সম্পর্ককে সত্যজিৎবাবু Biology-র উপর দাঁড় করিয়েছেন। হায়, সত্যজিৎবাবুও শেষ পর্যন্ত ফ্রয়েড সাহেবের শিকার হলেন!

রণজিৎ মুখোপাধ্যায়
কলকাতা ৩০

পাঁচ

আমার বিশ্বাস, 'চারুলতা'র চারু ও অমল যেভাবে চিত্রিত হয়েছে তাতে তাদের চরিত্রমাধুর্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে, এবং তারা রবীন্দ্রনাথ থেকে পৃথক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে চিত্রিত হয়েছে।

'সূক্ষ্মতা ও জটিলতা ফুটিয়ে তোলা পরিচালকের সাধ্যের বাইরে ছিল, সুতরাং যেমনটিভাবে সাজালে তিনি ম্যানেজ করতে পারবেন তেমনিভাবেই সাজিয়ে নিয়েছেন' শ্রীঅশোক রুদ্রের এই মন্তব্য সহনীয় নয়, কিন্তু 'চারুলতা প্রসঙ্গে' আলোচনায় শ্রীরায় ঐ মন্তব্যটিকে প্রকারান্তরে প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করেছেন দেখে বিস্ময় জাগে।

'পোস্টমাস্টার' ও 'মণিহারা' সম্পর্কে শ্রীরায়ের বক্তব্য পেতে পারলে ভালো হত। ছবিতে এই তিনটি গল্পেরই বিষয়বস্তু ও ভাবসম্পদের পরিবর্তন ঘটেছে। এবং তাই থেকেই শ্রীরুদ্রের 'শিল্পীর স্বাধীনতা' সম্পর্কিত প্রশ্নটি এসেছে। শেক্সপীয়রের মতো রবীন্দ্রনাথকেও নিজের মনের রঙে চিত্রিত করা অনুচিত। এটা শুধুই Sentimentality নয়, সুসাহিত্যের নিজস্ব ভাবসম্পদ যথাযথ রূপায়িত হবে কি না শিল্পীর স্বাধীনতার বিচারে এইটেই প্রশ্ন। ভাবসম্পদ ও ঘটনাবৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেই চিত্রায়ণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনমতো পরিবর্তন, পরিবর্জন বা সংযোজন হতে পারে। বিতর্ক উঠতে পারে তার মাত্রা নিয়ে। কিন্তু যদি মূলের ঘটনাবৈচিত্র্য ও ভাবসম্পদ ক্ষুণ্ণ হয় তবে শিল্পীর দায়িত্ব কি বজায় থাকে?

শচীন মজুমদার
হাওড়া

ছয়

শেষদৃশ্যে যেখানে ভূপতি ও চারুকে 'স্ট্যাচু'র মতো দেখানো হয়েছে, হাতে হাত মিলতে গিয়েও মিলল না—তাতেই তো 'নষ্টনীড়ের থীম' খুব সুন্দরভাবে ফুটে ওঠার অবকাশ ছিল। অমন সুন্দর দৃশ্যে হঠাৎ 'নষ্টনীড়'-এর বিজ্ঞাপন একটি আবেদনময় মুহূর্তকে ব্যর্থ করে দিয়েছে বলে মনে হয়।

যুগলকান্তি রায়, মুক্তি রায়
কলকাতা ৪

সাত

'নষ্টনীড়ে'র চারু আর 'চারুলতা'র চারু কি এক? এই অনিবার্য প্রশ্নের সমাধান করতে গিয়ে 'চারুলতা'র দু-একটি দৃশ্য আমাদের স্মৃতিপথে উপস্থিত হয়। যেমন চারুর লেখা কাগজে বেরোনোর পর সেই কাগজ দিয়ে অমলের মাথায় বাড়ি-মারার দৃশ্যে চারুর যে উন্মত্ত কামনাহত বা passionate রূপটি প্রকট হয়ে ওঠে তা কি 'নষ্টনীড়'-এ দেখা যায়? চারুর 'অভিমান প্রকাশ'কেও রবীন্দ্ররীতিসম্মত বলে কখনোই মনে করতে পারি না।

সত্যজিৎ রায় অবশ্য সিনেমার কম্প্রেশন, আয়রণি সৃষ্টি ইত্যাদির কথা বলেন। কিন্তু রবীন্দ্রকল্পনাকে অক্ষুণ্ণ রেখে কি সিনেমাটিক করা যেত না? চেখভের গল্পের চিত্রনাট্যগত সুবিধা অবশ্য আছে। তবু সহজ ছিল না "The Lady With The Little Dog"-এর 'আনা'কে চেখভের কল্পনার সঙ্গে মেলানোর। তবু তা হয়েছে। কারণ সেখানে পরিচালক শুধু সিনেমাটিক অ্যাডাপ্টেশনের কথাই ভাবেন নি, লেখকের সৃষ্ট ঐ চরিত্রকে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন, লেখকের কল্পনার সঙ্গে নিজের কল্পনা মেলাবার চেষ্টা করেছেন। শ্রীযুক্ত সত্যজিৎ রায় এর সম্পূর্ণ উল্টোপথে চলেছেন।

অনিরুদ্ধ সরকার
কলকাতা ৪৩

আট

'নষ্টনীড়' একটু অভিনিবেশ সহকারে যাঁরাই পাঠ করেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই মেনে নেবেন যে সাহিত্য হিসেবে 'নষ্টনীড়' যত উচ্চাঙ্গেরই হোক ছায়াছবিতে এর হুবহু রূপান্তর অসম্ভব। শ্রীরুদ্রের মতে 'নষ্টনীড়' এমন একটি গল্প যার দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন পর্যন্ত বদলানো অপরাধ এবং সত্যজিৎ শুধু থীম ও প্লটই বদলে দেন নি পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ রবীন্দ্রসংলাপ বদলে স্ব-কৃত

সংলাপ পর্যন্ত বসিয়েছেন'। শ্রীরুদ্রের মতো বিদগ্ধ একজন সমালোচকের নিশ্চয়ই জানা যে চলচ্চিত্র ও কথাসাহিত্যের আঙ্গিক ও ভাষা সম্পূর্ণ পৃথক। সাহিত্যে থাকে কল্পনার অবকাশ। লেখকের চিন্তা ও পাঠকের কল্পনার একটা সঙ্গমের ক্ষেত্র সেখানে উন্মুক্ত। চলচ্চিত্রে থাকে দ্রুত অপসৃয়মান ছবির সাহায্যে বিষয়বস্তু—তার রস ও আবেদন দর্শক হৃদয়ে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা। চলচ্চিত্র স্বভাবে অধিকতর বাস্তবানুগ। সত্যজিৎকে ধন্যবাদ যে তিনি স্থূলতার আশঙ্কাকে ('নষ্টনীড়ে'র ক্ষেত্রে যা অতি স্বাভাবিক) ভুল প্রতিপন্ন করে শুধু যে শিল্পসম্মতভাবে রবীন্দ্রনাথের 'চারুলতা'কে এঁকেছেনই তা নয়, তা এত সুন্দর সুষমামণ্ডিত হয়েছে যে বাংলায় কেন ভারতেও এ-ধরনের চরিত্র-চিত্রণ ইতিপূর্বে হয়েছে কি না জানা নেই।

নন্দদুলাল মুখোপাধ্যায়
কলকাতা ৩৪

নয়

শ্রীঅশোক রুদ্রের বক্তব্যের বিপরীতে সত্যজিৎবাবু মূল রচনার পরিবর্তনের সপক্ষে যে যুক্তি বিশ্লেষণের বিশদ তালিকা দিয়েছেন, তার কিছু কিছু অবশ্যই সমর্থনীয়, কিন্তু সমস্ত কিছু নয়। যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে ছবিটির শেষাংশের কথা। 'নষ্টনীড়'-এর শেষ আর ছবিটির সমাপ্তি কিন্তু মনে এক অনুভূতির সৃষ্টি করে না। ছ'টি অধ্যায়ব্যাপী বিশ্লেষণ-শেষে রবীন্দ্রনাথ কাহিনীর ট্র্যাজেডির পরিণতি এনেছেন যেমন স্বাভাবিকভাবে, ছবির পরিণতি এসেছে কিন্তু কিছুটা আচম্বিতেই। গল্পের শেষাংশটুকুর পরিবর্তনও অপরিহার্য বলে মনে হয় না। "আমার মতে চারুকে পরিত্যাগ করে মহীশূর যাত্রা রবীন্দ্র-বর্ণিত ভূপতির চরিত্রের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে না।" সত্যজিৎবাবুর এ জাতীয় মন্তব্য কিন্তু আপত্তিকর। রবীন্দ্রনাথ যদিও সমালোচনার ঊর্ধ্বে নন, তবুও তাঁর হাতে ভূপতির চরিত্রের এমন অসংগতি সাধন হয়েছে, কল্পনাও করা যায় না। কারণ, তার ফলে রবীন্দ্রনাথের চরিত্রসৃষ্টির অক্ষমতার কথাই প্রকট হয়, যা মোটেই গ্রাহ্য নয় এক্ষেত্রে অন্তত।

সত্যজিৎবাবু নিজেই বলেছেন, "নষ্টনীড়ে প্লট জিনিষটা গৌণ।" আমিও একমত। 'নষ্টনীড়'-এ চরিত্র বিশ্লেষণ আর বর্ণনাই হচ্ছে যখন মুখ্য, তখন তা থেকে স্পষ্ট চরিত্র ও প্রত্যক্ষ ঘটনার সৃষ্টি করে চিত্ররূপ দেওয়ার শিল্পসৃষ্টি হিসেবে রসোত্তীর্ণ হলেও 'চারুলতা' ছবির কাহিনী যে মূলানুগ হতে পারে নি, সেটা

অবশ্যই সত্য। আর রবীন্দ্রনাথের সুপরিচিত কাহিনীর চিত্ররূপ বলে দর্শকের sentiment-এ আঘাত লাগতেও বাধ্য। সুতরাং subjective কাহিনীর চিত্ররূপ দেবার ইচ্ছে হলে, সিনেমার জন্যে তা সৃষ্টি করে নেওয়া সবদিক থেকে বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়।

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়
হাওড়া

দশ

'নষ্টনীড়' পড়ে আমাদের রসোপলব্ধি যে-স্তরে পৌঁছেছে শ্রীরায়ের কয়েক হাজার মিটার দীর্ঘ 'চারুলতা' এবং সাতাশ পৃষ্ঠাব্যাপী 'চারুলতা প্রসঙ্গে' তাতে কোনো নূতন যোগান দিতে পারে নি, অথচ প্রত্যাশা ছিল অনেক। আর সেই প্রত্যাশা পূরণে অকৃতকার্য শ্রীরায় যে-বক্তব্য খাড়া করেছেন তা পড়ে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ যোগসূত্রহীন অত্যন্ত দুর্বল একটা গল্প লিখে গেছেন। সেটাকে সবল করে চিত্ররূপ দিতে গিয়ে শ্রীরায়কে প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। বেচারী রবীন্দ্রনাথ!

এই প্রসঙ্গে আরেক অনন্যসাধারণ প্রয়োগশিল্পী শ্রীঋত্বিক ঘটকের কয়েকটি মন্তব্য মনে পড়ছে। কোনো-এক শারদীয় সংখ্যায় তিনি লিখেছেন: 'আমার ভরসা ছিল সত্যজিৎ রায়ের উপর। কিন্তু ক্রমশই আমার আস্থা কমে আসছে। উনি কী করছেন? কিছু কাজকর্ম তো আমরা বুঝি—আমাদের কাছে এত সহজে ফাঁকি দেওয়া যায় না!' ক্রমশই না হয় 'বেরঙ রিজেম্পশন', কিন্তু ঋত্বিকবাবুকে শ্রীরায় কি বোঝাবেন জানতে পারলে আমাদের হয়তো কিঞ্চিৎ আলোদয় হত।

সুধীন বিশ্বাস
কলিকাতা ৯

শিল্পীর স্বাধীনতা

'শারদীয়া পরিচয়'-এ শিল্পীর স্বাধীনতা বিষয়ক আলোচনায় শ্রীঅশোক রুদ্র মহাশয় যখন সত্যজিৎ রায়ের প্রতি 'সশ্রদ্ধ'দের ক্রমাগত "সত্যজিৎ রায়ের ভক্তবৃন্দ" বলে চিহ্নিত করে অশালীনতার পরিচয় দিয়েছিলেন তখন তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে আমি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম। এমনি একজন ব্যক্তির চলচ্চিত্রালোচনাকে অপরিসীম মূল্যবান বলে মনে করবার দায়ভাগে বন্ধুবর শ্রীশমীক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি যখন অশোকবাবুর 'ভক্ত' বলে চিহ্নিত করি—তখন সেটা ছিল সেই ক্রোধের ফলশ্রুতি। উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যবহার না করার দরুন ঐ কথার মধ্যে পরোক্ষভাবে শমীকবাবুর প্রতি অনিচ্ছাকৃত 'অশ্রদ্ধা' যদি প্রকাশ পেয়ে থাকে—তবে শমীকবাবু যেন এই জেনে আমায় মার্জনা করেন যে আমার ক্রোধের পাত্র আসলে ছিলেন অশোক রুদ্র মহাশয়—আর এই legitimate anger নিতান্ত 'মানবিক' মনোবৃত্তি।

শ্রীঅশোক রুদ্রের প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনাকালে তাঁর নাম যে আমি আদৌ 'অপ্রাসঙ্গিকভাবে' টানি নি এই দাবী প্রতিষ্ঠিত করবার আগে আমি তাঁর নিজের লেখার মধ্যে 'প্রাসঙ্গিকতা'টা একটু যাচাই করে নিচ্ছি। 'মহাদেশ' পত্রিকার উল্লিখিত প্রবন্ধে চারজন প্রাবন্ধিকের প্রতি 'শ্রদ্ধা' নিবেদনকালে তিনি 'ফিল্ম-সোসাইটিগুলির' 'টেকনিক্-সর্বস্ব' আলোচনাকে গালাগাল দিয়ে কতখানি প্রাসঙ্গিকতার পরিচয় দিয়েছেন—এবং কতখানি ভদ্রতার? ভারতবর্ষে ফিল্ম-সোসাইটিগুলি সবেমাত্র 'চলচ্চিত্র'কে একটি বিশিষ্ট শিল্প-মাধ্যম হিসাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে চিনে নিয়ে তার স্বরূপ বুঝবার চেষ্টা করছে—সেখানকার স্বল্প আলোচনায় চলচ্চিত্রের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু দুয়েরই প্রতি নজর নেওয়া হচ্ছে—এ অবস্থায় ফিল্ম-সোসাইটিগুলির প্রতি 'সেকেলে টেকনিক-সর্বস্ব' গালাগাল ছুঁড়ে মারার কোনো প্রয়োজন ছিল?

'Humanism' কথাটির বাংলা হিসাবে 'মানবিকতাবাদ', 'মানবিকবাদ', 'মানবতাবাদ' কত কথারই চল আছে (বাংলাতে Semantics কতদূর এগিয়েছে?) কিন্তু "মানবিকতাবাদী" (শমীকবাবুর 'মানবিকবাদী') বলতে আমি যে সেই বিশেষ দার্শনিক মতবাদকে টেনে আনি নি সেকথা বোঝা এতই অসম্ভব ছিল? শমীকবাবু লিখেছিলেন—"শিল্পবিচারে শিল্পরূপের বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর 'মানবিক' প্রশ্নগুলিকে বারবার তুলে ধরা উচিত।" অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ৭২২ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় লাইনে তিনি লিখেছেন "মানবিকবাদী মূল্যবিচার টেক্‌নিক্-সর্বস্ব আলোচনার সঙ্গে যুক্ত হলে চলচ্চিত্র-বিচার 'পরিপূর্ণতর' হবে" ("টেক্‌নিক্ সর্বস্বতা' + মানবিকবাদী মূল্যবিচার"=পরিপূর্ণতরতা, 'তর'টা কি রকম হবে?)। এখানে তিনি 'মানবিক' ও 'মানবিকবাদী' এই দুই কথার মধ্যে কোন সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করছেন?

শিল্পের 'ফর্ম' মানবিক কিনা আমিও শুধু এই প্রশ্নই তুলেছিলাম। নন্দনতত্ত্ব ঘেঁটে কোনো একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছনো আমার পক্ষে অসম্ভব। ক্রোচে বা রজার ফ্রাই প্রমুখ অনেকেই যেমন 'ফর্ম'কেই প্রায় সব মূল্য দেন, আবার 'Socialist Realism'-এর সমর্থকরা যখন 'Content'কেই বেশি মূল্য দেবেন কি দেবেন না এই নিয়েই গলদ্ঘর্ম হচ্ছেন তখন মাঝখানে পড়ে এ কথা স্মরণ করানো যেতে পারে যে দুইকেই সমান মূল্যবান বলে মনে করবার মতোও অনেক লোক আছেন, শুধু তাই নয় অনেকে বিশ্বাসই করেন না যে ঐ দুটিকে আলাদা করা যায়। শুধু বোঝবার চেষ্টার খাতিরে আলাদা করবার চেষ্টা করেন নন্দনতাত্ত্বিকেরা, প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যে (তাও কাব্যে সব সময় নয়) সে কাজ যত সহজ, Plastic art বা musicএ সে কাজ অত সহজ নয়। 'Painting' 'Music' 'Architecture' ইত্যাদি ক্ষেত্রে content-এর ব্যাপার নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। সেই সব ক্ষেত্রে 'মানবিকতা'র প্রশ্ন শমীকবাবু প্রদর্শিত কোনো equation-এর সাহায্যে হবে না। উপরন্তু এ সব ব্যাপারে প্রকৃত শিল্পী অর্থাৎ যারা শিল্পে কাজ করেন তাঁদের জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা কিন্তু কখনই এ রকম

কথা বলবেন না শিল্পকর্মের content বা matterটা 'মানবিক' তারপর সেই 'মানবিক' matter বা contentকে অমানবিক form-এর jacket পরিয়ে তারা "depersonalise" করে তাকে "objective" দ্রব্যের বাজারে ছেড়ে দেন। তাঁরা সৃষ্টিকর্মের সময় 'form' এবং 'content'কে জড়িয়েই ভাবেন এবং হৃদয় ও বোধ নিয়ে দুটোকেই হয়ে ওঠান (রবীন্দ্রনাথের এই কথাটা আমি 'সেকেলে' হলেও পছন্দ করি) তাই তাদের কাছে form এবং content দুই-ই মানবিক। আবার এক দিক থেকে দেখা যাবে content-টা অনেক সময় আমাদের কাছে নিছক একটা খবর মাত্র—form-এর সাহায্যেই সেটা 'মানবিক' হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীতের content একজন নাস্তিকের কাছে কতদূর 'মানবিক'? অথচ যখন একটি গানের মধ্যে সেই ঈশ্বরভক্তি রূপ পায় তখন সেটা ঐ বিশেষভাবে রূপ পাবার দরুনই একজন নাস্তিকের কাছেও 'মানবিক' হয়ে ওঠে—এখানে Form-কে কোন অর্থে "অমানবিক" বলা হবে?

শমীকবাবুর "তারতম্য জ্ঞান" অত্যন্ত প্রখর কিন্তু শিল্পকর্মে এ জাতীয় দাঁড়িপাল্লার দরবিভাগ over simplification-কে প্রশ্রয় দেয়, সেই মনোভাব থেকেই form বড় না content বড়, ব্যক্তি বড় না সমাজ বড়, Emotion বড় না Intellect বড় ইত্যাদি প্রশ্নের উদ্ভব—এবং শেষ পর্যন্ত Theatre বড় না Cinema বড়, সংগীত সবচেয়ে বড় শিল্প কিনা (শোপেনহাওয়ারের বিখ্যাত উক্তিটির চটকানোর কথা ভাবলে ভয় করে) এই সব অনাবশ্যক দুশ্চিন্তায় শিল্পচর্চার জগৎকে ভারাক্রান্ত করেন।

নন্দনতত্ত্ব ঘেঁটে যে-কোনো একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সত্যিই অসম্ভব এ কথার সমর্থন Morris Weitz-এর নিম্নলিখিত উক্তিতে আছে—"Is æsthetic Theory in the sense of a true definition or set of necessary and sufficient properties of art possible? ··in spite of the many theories, we seem no nearer our goal today than we were in Plato's time." সত্যই শিল্পক্ষেত্রে তত্ত্বের ব্যাপারটা এখনও নিতান্ত গোলমেলে—Brecht-এর Theory এবং Practice-এর মধ্যে বিভেদের কথা শুধু Eric Bentley নির্দেশ করেন নি, Calcutta Film Society-র আয়োজিত এক প্রদর্শনীতে Mother Courage নাটকের Film verson দেখে আমরা অনেকেই তার আঁচ পেয়েছি। তাই বলে কি নন্দনতত্ত্বকে অশ্রদ্ধা করা হবে? মোটেই না, কেননা সেটাও অনুসন্ধানের পক্ষে মস্ত বড় সহায়ক, কিন্তু নন্দনতত্ত্বের পণ্ডিত যদি শিল্পচর্চাকালে নিজেকে অনুসন্ধানী না ভেবে মাস্টারমশাই ভেবে অনিচ্ছুক ছাত্রের উপর ছড়ি ঘোরান—তবে সেটা নিতান্ত অশ্রদ্ধাজনক কাজ হবে।

ধ্রুব গুপ্ত

বর্ষ ৩৪ । সংখ্যা ১০
বৈশাখ, ১৩৭২

সূচীপত্র

সম্পাদক

গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

পরিচয় (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার দুখানি বই পেয়েছি, তার একখানি — অর্থাৎ "বিশ্বশিল্প" — কাল সায়াহ্নে বিদ্যুতদীপালোকে পড়া শেষ করলুম। — প্রথমেই পত্রের ভূমিকায় একটা কথা জানিয়ে রাখি। আজকাল কিছুদিন থেকে আমি অন্যমনস্ক হয়ে গেছি — সেটা বয়সের ধর্ম। কিছুকাল পূর্বেই আমার মন ছিল সমুদ্রতলের অষ্টপাদ জীবের মত, যে জীব তার কর্ষণগুলো দিয়ে আলোচ্য বিষয়গুলোকে আঁকড়ে ধরে তার থেকে খাদ্য শোষণ করে নিত, তার মানসিক মাংসপেশী আজ ঢিলে হয়ে পড়েছে, সেই জন্যে সে আজ এলোমেলো চরে বেড়ায়, কিছুই ধরে রাখে না। তাই হতাশ হয়ে আজকাল ছবি এঁকে থাকি আত্মসমাধির বাসা খুঁজতে চেষ্টা করে। আমি যে জগতের ছবি আঁকি তাতে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্রাবলী

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার দুখানি বই পেয়েছি, তার একখানি—অর্থাৎ "রিয়ালিস্ট"—কাল সায়াহ্নে বৈদ্যুতদীপালোকে পড়া শেষ করলুম।—প্রথমেই পত্রের ভূমিকায় একটা কথা জানিয়ে রাখি। আজকাল কিছুদিন থেকে আমি অন্যমনস্ক হয়ে গেছি—সেটা বয়সের ধর্ম্ম। কিছুকাল পূর্ব্বেই আমার যে মন ছিল সমুদ্রচর অষ্টপাদ জীবের মত, যে জীব তার কর্ষণীগুলো দিয়ে আলোচ্য বিষয়গুলোকে আঁকড়ে ধরে তার থেকে খাদ্য শোষণ করে নিত, তার মানসিক মাংসপেশী আজ ঢিলে হয়ে পড়েছে, সেইজন্যে সে আজ এলোমেলো চরে বেড়ায়, কিছুই ধরে বেড়ায় না। তাই হতাশ হয়ে আজকাল ছবি এঁকে কথঞ্চিৎ আত্মসম্মান রক্ষা করতে চেষ্টা করে। আমি যে জাতের ছবি আঁকি তাতে মনোনিবেশ বলে কোনো বালাই নেই। মাংসাশী মন লক্ষ্য সন্ধান ক'রে শিকার করে, উদ্ভিজ্জাশী মন এদিকে ওদিকে যা পায় যেমন তেমন করে খাবলে বেড়ায়। আমার ছবির লক্ষ্য নেই, যেমন তেমন করে আঙুল চালাই, যা হোক একটা কিছু হয়ে ওঠে। বুদ্ধির চতুরাশ্রমের মধ্যে এইটেকেই বানপ্রস্থ বলা চলে—এতে সঞ্চয়ের লোভ নেই, কর্ম্মের প্রয়াস নেই, যদৃচ্ছাক্রমে নিষ্কৃতির পথে চলা।

আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তোমার লেখা মাংসাশী মনের পথ্য—নখদন্তের জোর চাই, ছিঁড়ে ছিঁড়ে বিশ্লেষণ করতে না পারলে

গলাধঃকরণের উপায় নেই। তাই বোধ হয় চর্ব্ব্যপদার্থকে লেহ্যরূপে ব্যবহার করতে চেয়েছি, তাতে স্বাদ পাওয়া যায় না তা বল্‌তে পারি নে কিন্তু বাদ পড়ে অনেকখানি।

তোমার বইখানি সম্বন্ধে প্রথম নালিষ এই, পাতা কেটে পড়তে হয়েছিল। সংসারে আকাটাপাতার বই হচ্চে নববধূ, নানা দাগ পড়া খোলা পাতা পুরাতনীর। অথচ তোমার গ্রন্থের বিষয়গুলিতে খোলাখুলি ভাবের অট্টহাস্য, বয়ঃপ্রাপ্ত চিত্তের সঙ্গে তার বোঝাপড়া। কিন্তু অত্যন্ত পেকে উঠেছে যে বয়ঃপ্রাপ্ত চিত্ত সে কি গল্প শুনতে চায়? তার সমস্ত ঝোঁক সন্ধান করবার দিকে—প্রকৃতি যা সাবধানে লুকিয়ে বেড়ায় তাকে টেনে বের করতে পারলে সে ভারি খুশি; সহজবিশ্বাসী নাবালকদের পরে তার দয়ামায়া নেই। নাবালকেরা ধুলোবালি প্রভৃতি যা-তা নিয়ে সৃষ্টি করে, অর্থাৎ তারা বিশ্বসৃষ্টিকর্ত্তার নবীন শিক্ষানবীশ তাতে এমন কিছু ভঙ্গী থাকে যাতে কল্পনার দৃষ্টিতে কোনো একটা রূপের ব্যঞ্জনা নিয়ে আসে। কিন্তু বিজ্ঞান প্রমাণ করে দিতে পারে রূপমাত্রই ছলনা, আমাদের তত্ত্বশাস্ত্রেও বলে সৃষ্টিমাত্রই মায়া। গল্পও সৃষ্টি, বিশ্বসৃষ্টির মতোই সেও ছলনা। কিন্তু ভালোবেসেচি এই চিরকালের ছলাকলা,—তাই রাজার মতো আরামে বসে আমরা জাদুকরকে ডাক দিয়ে পাঠাই, ফরমাস করি ইন্দ্রজালের; বলি এমন কিছু করে তোলো ঠিক মনে হবে যেন দেখ্‌তে পাচ্চি, রূপ দেখে মজ্‌তে চাই। কেননা সংসারে চারদিকে এমন সব ব্যাপারের মধ্যে আছি ব্যবহারের ঘর্ষণে যার স্থূলবস্তু বেরিয়ে পড়েচে, যার মায়া আবরণের লাবণ্য মুছে গেছে, কালি পড়ে দাগি হয়েচে, যা মনকে ভোলায় না। কেননা বস্তু মনকে ঘা দেয় উঁচট্ খাওয়ায়, রূপ মনকে ভোলায়। অতএব জাদুকর, ভোলাও আহত মনকে, ক্লান্তকে আরাম দাও।

সাবালক বলেন নিজেকে অমন করে ভোলানো ভালো নয়, তাতে দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় মাত্র। রূপলুব্ধ বলে সংসারক্ষেত্রে বাস্তবের সঙ্গে ঠেলাঠেলি ঘেঁষাঘেঁষি নিয়তই হয়ে থাকে, সেখানে

পালোয়ানির চর্চ্চার বিশ্রাম নেই। তাতে করে মানুষকে ভুলিয়ে দেয় এই বাঁও কষাকষি, এই ঘাড় ভাঙাভাঙি; ধুলোয় কাদায় উলট্-পালট্ খাওয়াই বিশ্বব্যাপারের পরম সত্য নয়। এটাই বস্তুত ঠকানো। অর্থাৎ চরম নয় উপকরণগুলো, চরম হচ্চে অমৃত, রূপের সৌন্দর্য্য। মৈত্রেয়ী বলেছিলেন "উপকরণবতাং জীবিতং" তিনি চান না, তিনি চান "অমৃতম্"।

কত হাজার হাজার বৎসর ধরে মানুষ আপন সভ্যতার মধ্যে আপন রূপসৃষ্টির উদ্ভাবন করতে চেয়েচে। কেবলি বাইরের এবং অন্তরের সাজ বানিয়েচে। সে চায় আপনাকে শোভন দেখ্‌তে, নইলে তার লজ্জা হয়, নইলে তার চারদিকের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে। ভদ্র তাকে হতেই হবে, ভদ্র হওয়ার মানে এমন নয়, তার স্বভাবের উপাদানগুলোকে বাইরে মেলে দিতে হবে। হয় সেগুলোকে ভিতর থেকেই কোনো একটি উৎকর্ষের আদর্শে পরিণত করে তুলতে হবে, নয় বাইরের আবরণে তার রূঢ়তাকে ঢেকে রাখতে হবে। সেই ঢাকা-দেওয়া পরস্পরকে সম্মান করা, নগ্নতা অসম্মান। এমনি করে কতক সাধনা দ্বারা কতক আবরণের দ্বারা সভ্যতা আপন রূপকে পরিদৃশ্যমান করে তোলে। সভ্যতা সম্মিলিত মানবচিত্তের সৃষ্টি, এ সৃষ্টি বিজ্ঞানের দ্বারা নয়, জাদুর দ্বারা, যে জাদু রং ফলায়, রস জমায়, সুর লাগিয়ে দেয়। বিজ্ঞানপ্রবীণ একে ছেলেমানুষি বল্‌তে পারে কিন্তু এই ছেলেমানুষিই সৃষ্টি। সৃষ্টিকর্ত্তা বৈজ্ঞানিক হলে বিশ্ব বীভৎসভাবে অনাবৃত থাকত তাহলে বৈজ্ঞানিককে ছুরি চালিয়ে নাড়ি নক্ষত্র সন্ধান করতে হতো না। বাস্তব সংসারে ঘাত-সংঘাত চল্‌চে, সেখানে রূপ সম্পূর্ণ জমে উঠ্‌তে পারচে না—এই জন্যেই মানুষ আদিকাল থেকে কেবলি বলে আস্‌চে গল্প বলো। অবাস্তবের মহাকাশেই সত্যকে সে দেখ্‌তে চায়। বীণাযন্ত্রের তার যেমন-তেমনভাবে আলগা হয়েই থাকে, সেই তার বেসুরো, মানুষ বলে না সেই তারে ঝঙ্কার লাগাও, যেহেতু আমি বাস্তবের আওয়াজ শুন্‌ব, সে বলে সাধাসুরের তারে আমি গান শুন্‌তে চাই, সংসারে সেই

সুর সর্বত্র শুনতে পাই নে বলেই সত্য-আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকি। মানুষ এতকাল বলে এসেচে সাধাসুরের বীণাযন্ত্রে গল্প জমাও। আজ বলচে সাধা সুর বানানো সুর—ওতে সাহিত্যের এরিস্টোক্রেসি, তাকে মানব না, আমি চাই যদৃচ্ছাকৃত তারের ঝঙ্কার ক্রেঙ্কার হুঙ্কার—অর্থাৎ গান চাই নে, শব্দ চাই—শব্দ ডিমক্রেসি। শব্দ নির্মম বাস্তবতা, শব্দ উৎকর্ষের আদর্শে ভোলায় না।

মানবসংসারে ভোলাবারই একটা বিভাগ আছে, যাচাই বাছাইয়ের বিভাগ, মানুষের প্রকৃতিকে অতিপ্রাকৃতে নিয়ে যাবার জন্যে যুগে যুগে তার নিরন্তর আকর্ষণ, কেবলি সে সুর বাঁধচে, রস সাহিত্য সেই বিভাগেই তো পড়ে। যত কিছু রিট্রেঞ্চমেন্ট্, সে কি আজ সেই বিভাগের উপর দিয়েই যাবে? আজ রব উঠেচে আমি স্পষ্ট কথা কব—অনেকদিন থেকে মানুষ বলেচে স্পষ্ট কথা বোলো না ঠিক কথা বলো। ঠিক কথা কাকে বলে? কাঁসরে কাঠি লাগালে সে অত্যন্ত স্পষ্ট কথা কয়, তাতে বধির দেবতা ছাড়া পাড়াশুদ্ধ অন্য সকলের কান ঝালাপালা হয়ে ওঠে। জাপানী দেবমন্দিরে ঘণ্টার ধ্বনি শুনেছি, তাকে বলি ঠিক সুরের ধ্বনি—এই ঠিক সুর অনেক যত্নে তৈরি ঘণ্টায় তবে ঠিকটি বাজে। মানুষ আপন সৃষ্টির আদর্শকে অনেক যত্নে খাঁটি করে তুলবে এই ছিল কথা—সে চেয়েছিল নিজের মূল্য কমাবে না, নিজেকে অনাদর করবে না। আজ সাহিত্য কি তার কানে কানে এই কথা বলবারই ভার নিয়েচে যে, আসলে তুমি আদরণীয় নও, যথার্থই তুমি অশ্রদ্ধেয়, অতএব ভড়ং কোরো না। তুমি কত নোংরা তা দেখিয়ে দিচ্চি—নোংরা তোমার নাড়িভুঁড়ি রস-রক্ত, নোংরা তোমার মগজ তোমার হৃৎপিণ্ড, তোমার পাকযন্ত্র, তোমার চেহারাটা উপরের খোলসমাত্র, সেই চেহারার বড়াই কোরো না—যারা ছবি আঁকে তারা মিথ্যেবাদী, যারা মূর্ত্তি গড়ে তারা খোসামুদে। অতএব গল্প বলব না, জোগাব মনস্তত্ত্বের তথ্যতালিকা।

এ কথা বলা বাহুল্য মানুষ নিছক জন্তু নয় এই কারণেই মানুষের

স্বভাবে প্রাকৃতের মধ্যেই অতিপ্রাকৃত আপনাকে উদ্ভাবিত করচে—মানব-স্বভাবের এই দ্বন্দ্ব সাহিত্যে প্রকাশ না পেলে সে সাহিত্য সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য হয় না এবং তাতে তার যথার্থ উপভোগ্যতা কমে। ছেলেভোলানো সাহিত্য তাকেই বলে যাতে সমস্ত কাঁটা বেছে ফেলে পাতে মাছ দেওয়া হয়—কিন্তু শুধুমাত্র কাঁটার চচ্চড়ি রাঁধাকেই যারা ওস্তাদি বলে ক্রুর হাস্য করে মাসিক পত্র দ্বারা তাদের কৃত নিমন্ত্রণের ত্রুটি মার্জ্জনা করতে পারব না। সাহিত্য সাবালকের সাহিত্যই হোক্, কাঁটায় ভয় করব না যদি তাতে পুরো মাছটাকেই পাওয়া যায়।

গল্পের ছল করে তুমি যে কথা বলতে চেয়েছ ব্যাখ্যান করে আমি সেই কথাই বলার চেষ্টা করেছি। তোমার বইয়ের যে নাম দিয়েছ রিয়ালিস্‌ট্‌ তার মধ্যে বিদ্রূপের অট্টহাস্য রয়েছে। নিছক রিয়ালিজ্‌ম্‌ যে কত অদ্ভুত ও অসঙ্গত তা তোমার গল্পে ফুটিয়ে তুলেচ। মানুষ দুর্ব্বৃত্ত হতে পারে স্বভাবতই, কিন্তু মানুষ রিয়ালিস্‌ট্‌ হবার জন্যে কোমর বাঁধলে সেটা অস্বাভাবিক হয়ে পড়েই। অর্থাৎ সেও হয় unreal। তুমি তোমার গল্পে বারবার দেখিয়েচ আদর্শ বোধে রিয়ালিজ্‌মের যারা চর্চ্চা করে তারা একটা ভঙ্গীর সাধনা করে মাত্র। তারা নিজেও ভুলতে পারে না তারা রিয়ালিস্‌ট্‌ অন্যকেও ভুলতে দিতে চায় না ;—তারা রিয়ালিজ্‌মের পুতুলবাজি করে। এই সঙ্গে এই কথা বলাও চলে, আদর্শবাদেরও পুতুলবাজি আছে—সেইটেই যাদের একমাত্র ব্যবসা তারা ভুলে যায় মানুষ চিরকেলে অপোগণ্ড নয়,—বাস্তবের পাথরবাটিতেই সত্যের পরিবেষণ সঙ্গত—ফীডিং বট্‌ল্‌টা লজ্জাজনক।

কাল রাত সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত তোমার বইখানি পড়েচি। পড়তে পড়তে মনে হয়েচে "বাঁশরী" নামক আমার নতুন লিখিত নাটকের ভিতরে ভিতরেও অবাস্তব রিয়ালিজ্‌মের প্রতি এই রকমেরই একটা হাসির আমেজ আছে। তোমার লেখনীর প্রতি আমার একমাত্র অভিযোগ এই যে, দিনের শেষে সন্ধ্যাবেলায় যারা আরামে

অনায়াসে গল্প পড়তে চায় তাদের প্রতি ওর কোনো মমতা নেই। ইতি ১৩।১।৩৪

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার অনুরোধ, এই চিঠিটা পরিচয় অথবা তোমার ইচ্ছামতো কোনো পত্রে প্রকাশ করো। সাহিত্য সম্বন্ধে আমার বক্তব্য সাধারণের কাছে স্পষ্ট করা আমার কর্তব্য।

ওঁ

on Board
Houseboat "PADMA"

কল্যাণীয়েষু

ধূর্জ্জটি, সম্প্রতি কতকগুলো গদ্যকবিতা জড়ো করে শেষসপ্তক নাম দিয়ে একখানি বই বের করেছি। সমালোচকরা ভেবে পাচ্চেন না ঠিক কী বলবেন। একটা কিছু সংজ্ঞা দিতে হবে, তাই বলচেন আত্মজৈবনিক। অসম্ভব নয় কিন্তু তাতে বলা হোলো না এগুলো কবিতা কিম্বা কবিতা নয় কিম্বা কোন্ দরের কবিতা। এদের সম্বন্ধে মুখ্য কথা যদি এই হয় যে এতে কবির আত্মজীবনের পরিচয় আছে তাহলে পাঠক অসহিষ্ণু হয়ে বলতে পারে, আমার তাতে কী। মদের গেলাসে যদি রং-করা জল রাখা যায় তাহলে মদের হিসাবেই ওর বিচার আপনি উঠে পড়ে। কিন্তু পাথরের বাটিতে রঙীন পানীয় দেখলে মনের মধ্যে গোড়াতেই তর্ক ওঠে ওটা সরবৎ না ওষুধ; এরকম দ্বিধার মধ্যে পড়ে সমালোচক এই কথাটার পরেই জোর দেন যে, বাটিটা জয়পুরের কিম্বা মুঙ্গেরের। হায়রে, রসের যাচাই করতে যেখানে পিপাসু এসেছিল সেখানে মিলল পাথরের বিচার। আমি কাব্যের পসারী, আমি সুধোই, লেখাগুলোর ভিতরে ভিতরে কি স্বাদ নেই, ভঙ্গী নেই, থেকে থেকে কটাক্ষ নেই, সদর দরজার চেয়ে এর খিড়কির দুয়ারের দিকেই কি ইসারা নেই, গদ্যের বকুনির মুখে রাস টেনে ধরে তার মধ্যে কি কোথাও দুলকির চাল আনা হয় নি, চিন্তাগর্ভ কথার মুখে কোনোখানে অচিন্ত্যের ইঙ্গিত কি লাগল না, এর মধ্যে ছন্দোরাজকতার নিয়ন্ত্রিত শাসন না থাকলেও আত্মরাজকতার অনিয়ন্ত্রিত সংযম নেই কি, সেই সংযমের গুণে থেমে যাওয়া কিম্বা হঠাৎ বেঁকে যাওয়া কথার মধ্যে কোথাও কি নীরবের সরবতা পাওয়া যাচ্চে না? এই সকল প্রশ্নের উত্তরই হচ্চে এর সমালোচনা। কালিদাস রঘুবংশের গোড়াতেই বলেচেন বাক্য এবং অর্থ একত্র সংপৃক্ত থাকে, এমন স্থলে বাক্য এবং

অর্থাতীতকে একত্র সংপৃক্ত করার দুঃসাধ্য কাজ হচ্চে কবির, সেটা গদ্যেই হোক আর পদ্যেই হোক তাতে কী এল গেল? যাকগে এই সব তর্ক। রচনার পক্ষীরাজ ঘোড়ার পিঠে নিজের নাম ও খ্যাতিকে সওয়ার করিয়ে হাটের ভিড়ে ঘুরিয়ে বেড়াবার যে নেশা ছেলেবেলা থেকে মনকে পেয়ে বসেচে সেটাকে সম্পূর্ণ ঘুচিয়ে দেবার জন্যে আজকাল অত্যন্ত একটা ইচ্ছে হয়েছে। বড়ো কঠিন। আহার্য থেকে বিরত হয়ে উপোষ করা তেমন দুঃসাধ্য নয় মৌতাত থেকে যেমন দুঃসাধ্য। এই সাধনায় সিদ্ধ হতে না পারলে মানুষের কিছুতে শান্তি নেই। জীবনে জয়মাল্য যদি পাবারই হয় তাহলে সবার অগোচরে অন্তর্যামীর হাত থেকে নিয়ে যদি যেতে পারতুম তাহলে সার্থক হোতো জীবন। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রচ্ছন্ননামাদের সম্প্রদায়ে দীক্ষা নেবার রাস্তা আমার বন্ধ—কিন্তু লোকমুখের খ্যাতিমোহের মূঢ়তা থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্যে আমার সংকল্প যেন শেষদিন পর্য্যন্ত জাগরূক থাকে এই আমার কামনা।

একটা কবিতা পরিচয় পত্রের সম্পাদক সুধীন্দ্রকে পাঠাতে গিয়ে হঠাৎ দেখি তার বাড়ির নম্বর ভুলেছি। তোমার নম্বর মনে রাখতে মুস্কিল নেই, সেটা আমার জন্মখৃষ্টাব্দের সংখ্যা। আমি পুরোনো কবি, এক সময়ে যে সব নতুন ছন্দ বানিয়েছিলেম সেগুলো আজ পুরোনো হয়ে গেছে। তাই নিজেকে বাজিয়ে নেবার জন্যে একটা ছন্দ বানালুম, বোধ হচ্চে নতুন এবং কিছু দুরূহ। সতরঞ্চ খেলায় ঘোড়ার চাল আড়াই পদের, এ ছন্দেরও তদ্রূপ। এই কবিতার দুটো নাম আমার মনে আছে—মিষ্টান্বিতা অথবা মিষ্টান্বিতা[১]। সম্পাদককে বোলো তিনি বাছাই করে নেবেন। শান্তিনিকেতনে তোমাদের সকলের ঠিকানাসূচী আছে এখানে নেই তাই তোমার হাত দিয়ে লেখাটা চালান করচি যথাস্থানে—জানি তুমি আপত্তি করবে না। ইতি ৩ জুন ১৯৩৫

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরিচয়ের বিরুদ্ধে আমার একটা নালিশ আছে। সম্পাদক নির্বিচারে সব কবিতা এক লেবেলে মালগাড়ির এক ভ্যানে বোঝাই করে দেন। কবিতার প্রতি এই পরুষ ব্যবহার আমি তো অসম্মানকর বলেই মনে করি। বিশেষত এতে অনেক strange bedfellows-এর ঠেসাঠেসি সঙ্গ পেতে হয়॥

[১] কবিতাটি এই সঙ্গে মুদ্রিত হল :

মিষ্টান্বিতা

যে মিষ্টান্ন সাজিয়ে দিলে হাঁড়ির মধ্যে
শুধুই কেবল ছিল কি তায় শিষ্টতা।
যত্ন করে নিলেম তুলে গাড়ির মধ্যে,
দূরের থেকেই বুঝেছি তার মিষ্টতা।
সে মিষ্টতা নয় তো কেবল চিনির সৃষ্টি,
রহস্য তার প্রকাশ পায় যে অন্তরে।
তাহার সঙ্গে অদৃশ্য কার মধুর দৃষ্টি
মিশিয়ে গেছে অশ্রুত কোন্‌ মন্তরে।
বাকি কিছুই রইল না তার ভোজন-অন্তে,
বস্তুত তবু রইল বাকি মনটাতে—
এমনি করেই দেব্‌তা পাঠান ভাগ্যবন্তে
অসীম প্রসাদ সসীম ঘরের কোণটাতে।
সে বর তাঁহার বহন করল যাদের হস্ত
হঠাৎ তাদের দর্শন পাই সুক্ষণেই—
রঙিন করে তারা প্রাণের উদয় অস্ত,
দুঃখ যদি দেয় তবুও দুঃখ নেই।

হেন গুমর নেইকো আমার স্তুতির বাক্যে
ভোলাব মন ভবিষ্যতের প্রত্যাশায়,
জানি নে তো কোন্ খেয়ালের ক্রূর কটাক্ষে
কখন বজ্র হানতে পার অত্যাশায়
দ্বিতীয়বার মিস্ট হাতের মিস্ট অন্নে
ভাগ্য আমার হয় যদি হোক বঞ্চিত,
নিরতিশয় করব না শোক তাহার জন্যে
ধ্যানের মধ্যে রইল যে ধন সঞ্চিত।
আজ বাদে কাল আদর যত্ন না হয় কমল,
গাছ মরে যায় থাকে তাহার টব তো
জোয়ার বেলায় কানায় কানায় যে জল জমল
ভাঁটার বেলায় শুকোয় না তার সবটা তো।
অনেক হারাই, তবু যা পাই জীবনযাত্রা
তাই নিয়ে তো পেরোয় হাজার বিস্মৃতি।
রইল আশা, থাকবে ভরা খুশির মাত্রা
যখন হবে চরম শ্বাসের নিঃস্থতি

বলবে তুমি, 'বালাই। কেন বকছ মিথ্যে,
প্রাণ গেলেও যত্নে রবে অকুণ্ঠা।'
বুঝি সেটা, সংশয় মোর নেইকো চিত্তে,
মিথ্যে খোঁটায় খোঁচাই তবু আগুনটা।
অকল্যাণের কথা কিছু লিখনু অত্র,
বানিয়ে-লেখা ওটা মিথ্যে দুষ্টুমি।
তদুত্তরে তুমিও যখন লিখবে পত্র
বানিয়ে তখন কোরো মিথ্যে রুষ্টুমি॥

১ জুন, ১৯৩৫

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

বরানগরে তোমার অন্তঃশীলা কোথায় অন্তর্ধান করেছিল, গৃহস্বামিনীর সাধুতায় সেটা আজ পাওয়া গেছে।

আমের ভিতরে আছে একটি অনবচ্ছিন্ন শাঁষ, আর তার মাঝখানটিতে একটিমাত্র আঁঠি। দাড়িমের শক্ত খোলার মধ্যে শত শত দানা, এবং প্রত্যেক দানার মধ্যে একটি করে বীজ। তোমার অন্তঃশীলা সেই দাড়িম জাতীয় বই। বীজ বাণীতে ঠাসা। তুমি এত বেশি পড়েছ এবং এত চিন্তা করেছ, যে তোমার ব্যাখ্যান তোমার আখ্যানকে শতধা বিদীর্ণ করে বিস্ফুরিত হতে থাকে। আমার বোধ হচ্ছিল তোমার এই গল্পটি তোমারি চরিতকথা, গল্পের দিক থেকে নয় আচরণের দিক থেকে। আমাদের জীবনটা প্রধানত সুখদুঃখ জড়িত ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত। তোমার জীবনে ছোটো বড়ো অভিজ্ঞতাগুলি চিন্তা উৎকীর্ণ করবার উপলক্ষ্যরূপে প্রাধান্য লাভ করে। তোমার চিঠিতে তোমার প্রবন্ধে এই কথাই আমি অনুমান করেছি। তোমার গল্পের পাত্রগুলির জীবনযাত্রায় একটু ঠোকর খেলেই তাদের মাথা থেকে ভাবনা ছিট্‌কে পড়তে থাকে। তারা কী ভাবে সেইটেই সামনে এসে ভিড় করে দাঁড়ায়, কী অনুভব করে সেটা চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে একটু একটু দেখা দেয়। জোর করে বল্‌তে পারি নে কিন্তু আমার বিশ্বাস এটা তোমারি চরিত্র। হয়তো আমিও আমার গল্পে নিজেকে প্রকাশ করে থাকি। আমার প্রকাশ যুক্তিতে নয় চিন্তায় নয়, কল্পনায় ছবিতে সুরের ইশারায়। আমার পাত্রগুলি তাদের ভাষায় ভঙ্গিতে আচরণে কিছু না কিছু কল্পনাপ্রবণ হয়ে ওঠে। ওরা সবাই যদি রবীন্দ্রনাথের মতোই কথাবার্ত্তা কয় তাহলে হয়তো সেটা নিন্দার বিষয় হবে—কিন্তু সেটা স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া আমার গতি নেই। এ সত্ত্বেও ফাঁকি দিয়ে কিছুকালের জন্যে যদি পাঠকের মনোহরণ পারি তবে সেটা নিতান্তই আমার গ্রহের আনুকূল্যে। আমার এই সাহিত্যিক

ত্রুটি গুনজ্ঞ লোকের কাছে ধরা পড়ে না যে তা নয়, কাণাঘুষো চল্‌চে, যত দিন যাবে কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়বে, সেজন্যে প্রস্তুত হয়ে আছি। আপাতত নগদ বিদায় নিয়ে দৌড় দেব এর পরে যখন পারিতোষিক ফিরিয়ে নেবার জন্যে নালিশ উঠবে তখন শমন দিয়ে আমাকে আদালতে হাজির করতে পারবে না। আমার পাত্ররা আমারই মতো কল্পনাশীল, তোমার পাত্ররা তোমারই মতো চিন্তাশীল; তোমার দলে লোক বেশি নেই একথা মনে রেখো,—ভাবতে বল্‌লে মানুষ চটে ওঠে, অথচ এই বই-এর প্রত্যেক পাতায় তুমি লোককে ঠেলা মেরে বলেচ, ভেবে দেখো। এর ফল তুমি পাবে আমার চেয়েও সকাল সকাল, এ আমি তোমায় বলে রাখচি। মোহবর্ধণ করে মানুষের ভাবনা থামিয়ে দাও তাহলেই পুরস্কার মিলবে।

এই সূত্রে সঙ্গীত সম্বন্ধে একটা কথা বলে রাখি। সঙ্গীতের প্রসঙ্গে বাঙালীর প্রকৃতি বৈশিষ্ট্য নিয়ে কথা উঠেছিল। সেইটেকে আরো একটু ব্যাখ্যা করা দরকার।

বাঙালী স্বভাবের ভাবালুতা সকলেই স্বীকার করে। হৃদয়োচ্ছ্বাসকে ছাড়া দিতে গিয়ে কাজের ক্ষতি করতেও বাঙালী প্রস্তুত। আমি জাপানে থাকতে একজন জাপানী আমাকে বলেছিল, রাষ্ট্র-বিপ্লবের আর্ট তোমাদের নয়, ওটাকে তোমরা হৃদয়ের উপভোগ্য করে তুলেছ, সিদ্ধিলাভের জন্য যে তেজকে যে সংকল্পকে গোপনে আত্মসাৎ করে রাখতে হয় গোড়া থেকেই তাকে ভাবাবেগের তাড়নায় বাইরের দিকে উৎক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত করে দাও। এই জাপানীর কথা ভাববার যোগ্য। সৃষ্টির কাব্য যে কোনো শ্রেণীর হোক্ তার শক্তির উৎস নিভৃতে গভীরে, তাকে পরিপূর্ণতা দিতে গেলে ভাব সংযমের দরকার। যে উপাদানে উচ্চ অঙ্গের মূর্ত্তি গড়ে তোলে তার মধ্যে প্রতিরোধের কঠোরতা থাকা চাই, ভেঙে ভেঙে কেটে কেটে তার সাধনা। জল দিয়ে গলিয়ে যে মৃৎপিণ্ডকে শিল্পরূপ দেওয়া যায় তার আয়ু কম, তার কণ্ঠ ক্ষীণ। তাতে যে পুতুল গড়া যায় সে নিধুবাবুর টপ্পার মতোই ভঙ্গুর।

উচ্চ অঙ্গের আর্টের উদ্দেশ্য নয় দুই চক্ষু জলে ভাসিয়ে দেওয়া, ভাবাতিশয্যে বিহ্বল করা। তার কাজ হচ্ছে মনকে সেই কল্পলোকে উত্তীর্ণ করে দেওয়া যেখানে রূপের পূর্ণতা। সেখানকার সৃষ্টি প্রকৃতির সৃষ্টির মতোই; অর্থাৎ সেখানে রূপ কুরূপ হতেও সঙ্কোচ করে না, কেননা তার মধ্যেও সত্যের শক্তি আছে, যেমন মরুভূমির উট, যেমন বর্ষার জঙ্গলে ব্যাঙ, যেমন রাত্রির আকাশে বাদুড়, যেমন রামায়ণের মন্থরা, মহাভারতের শকুনি, শেক্সপীয়ারের ইয়াগো। আমাদের দেশের সাহিত্য-বিচারকের হাতে সর্ব্বদাই দেখতে পাই আদর্শবাদের নিক্তি; সেই নিক্তিতে তারা এতটুকু টুকু কুঁচ চড়িয়ে দিয়ে দেখে তারা যাকে আদর্শ বলে তাতে কোথাও কিছুমাত্র কম পড়েছে কি না। বঙ্কিমের যুগে প্রায় দেখতে পেতুম অত্যন্ত সূক্ষ্ম বোধবান সমালোচকেরা নানা উদাহরণ দিয়ে তর্ক করতেন, ভ্রমরের চরিত্রে পতিপ্রেমের সম্পূর্ণ আদর্শ কোথায় একটুখানি ক্ষুণ্ণ হয়েছে আর সূর্য্যমুখীর ব্যবহারে সতীর কর্ত্তব্যে কতটুকু খুঁৎ দেখা দিল। ভ্রমর সূর্য্যমুখীর সকল অপরাধ সত্ত্বেও কতখানি সত্য আর্টে—সেটাই মুখ্য, তারা কতখানি সতী সেটা গৌণ, এ কথার মূল্য তাদের কাছে নেই; তারা আদর্শের অতি নিখুঁতত্বে ভাবে বিগলিত হয়ে অশ্রুপাত করতে চায়। উপনিষৎ বলেছেন আত্মার মধ্যে পরম সত্যকে দেখবার উপায় শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা। আর্টের সত্যকেও সমাহিত হয়ে দেখ্তে হয়, সেই দেখার সাধনায় কঠিন শিক্ষার প্রয়োজন আছে।

বাঙলাদেশে সম্প্রতি সঙ্গীতচর্চ্চার একটা হাওয়া উঠেছে, সঙ্গীত রচনাতেও আমার মতো অনেকেই প্রবৃত্ত। এই সময়ে প্রাচীন ক্লাসিকাল অর্থাৎ ধ্রুব পদ্ধতির অর্থাৎ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ঘনিষ্ঠ পরিচয় নিতান্তই আবশ্যক। তাতে দুর্ব্বল রসমুগ্ধতা থেকে আমাদের পরিত্রাণ করবে। এ কিন্তু অনুশীলনের জন্য, অনুকরণের জন্য নয়। আর্টে যা শ্রেষ্ঠ তা অনুকরণজাত নয়। সেই সৃষ্টি আর্টিস্টের সংস্কৃতিবান মনের স্বকীয় প্রেরণা হতে উদ্ভূত। যে মনোভাব থেকে

তানসেন প্রভৃতি বড়ো বড়ো সৃষ্টিকর্ত্তা দরবারি তোড়ি দরবারি কানাড়াকে তাঁদের গানে রূপ দিয়েছেন সেই মনোভাবটিই সাধনার সামগ্রী, গানগুলির আবৃত্তিমাত্র নয়। নতুন যুগে এই মনোভাব যা সৃষ্টি করবে সেই সৃষ্টি তাঁদের রচনার অনুরূপ হবে না, অনুরূপ না হতে দেওয়াই তাঁদের যথার্থ শিক্ষা, কেননা তাঁরা ছিলেন নিজের উপমা নিজেই। বহুযুগ থেকে তাঁদের সৃষ্টির পরে আমরা দাগা বুলিয়ে এসেচি। সেইটাই যথার্থত তাদের কাছ থেকে দূরে চলে যাওয়া। এখনকার রচয়িতার গীতশিল্প তাঁদের চেয়ে নিকৃষ্ট হতে পারে কিন্তু সেটা যদি এখনকার স্বকীয় আত্মপ্রকাশ হয় তাহলে তাতে করেই সেই সকল গুণীর প্রতি সম্মান প্রকাশ করা হবে।

সবশেষে নিজের সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। মাঝে মাঝে গান রচনার নেশায় যখন আমাকে পেয়েছে তখন আমি সকল কর্ত্তব্য ভুলে তাতে তলিয়ে গেছি। আমি যদি ওস্তাদের কাছে গান শিক্ষা করে দক্ষতার সঙ্গে সেই সকল দুরূহ গানের আলাপ করতে পারতুম তাতে নিশ্চয়ই সুখ পেতুম, কিন্তু আপন অন্তর থেকে প্রকাশের বেদনাকে গানে মূর্ত্তি দেবার যে আনন্দ সে তার চেয়ে গভীর। সে গান শ্রেষ্ঠতায় পুরাযুগের গানের সঙ্গে তুলনীয় নয়। কিন্তু আপন সত্যতায় সে সমাদরের যোগ্য। নব নব যুগের মধ্যে দিয়ে এই আত্মসত্য প্রকাশের আনন্দধারা যেন প্রবাহিত হতে থাকে এইটাই বাঞ্ছনীয়।

প্রথম বয়সে আমি হৃদয়ভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি গানে, আশা করি সেটা কাটিয়ে উঠেছি পরে। পরিণত বয়সের গান ভাব বাৎলাবার জন্যে নয় রূপ দেবার জন্য। তৎসংশ্লিষ্ট কাব্যগুলিও অধিকাংশই রূপের বাহন। কেন বাজাও কাঁকণ কন কন কত ছল ভরে—এতে যা প্রকাশ পাচ্চে তা কল্পনার রূপলীলা। ভাব প্রকাশে ব্যথিত হৃদয়ের প্রয়োজন আছে, রূপ প্রকাশ অহেতুক। মালকোষের চৌতাল যখন শুনি তাতে কান্না-হাসির সম্পর্ক দেখি নে তাতে দেখি গীতরূপের গম্ভীরতা। যে বিলাসীরা টপ্পা

ঠুংরি বা মনোহরসাঞী কীর্ত্তনের অশ্রু আর্দ্র অতিমিষ্টতায় চিত্ত বিগলিত করতে চায় এ গান তাদের জন্য নয়। আর্টের প্রধান আনন্দ বৈরাগ্যের আনন্দ—তা ব্যক্তিগত রাগ-দ্বেষ হর্ষ-শোক থেকে মুক্তি দেবার জন্যে। সঙ্গীতে সেই মুক্তির রূপ দেখা গেছে ভৈরোঁতে তোড়িতে, কল্যাণে কানাড়ায়। আমাদের গান মুক্তির সেই উচ্চশিখরে উঠতে পারুক বা না পারুক সেইদিকে ওঠবার চেষ্টা করে যেন। ইতি ১৩ জুলাই ১৯৩৫

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অলডস হক্সলি

শিক্ষাশাস্ত্রী রবীন্দ্রনাথ

কবিরূপে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের সঙ্গে আমার পরিচয় যৎসামান্য, তার কারণ বাংলাভাষা আমার জানা নেই। এটা আমার পক্ষে আক্ষেপের বিষয় সন্দেহ নেই। তাঁর জীবনের যে-দিকটা আমায় বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে সে হলো দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে তিনি যে বড়ো বড়ো আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন সেই তাঁর কর্মজীবনের দিকটা।

বড়ো বড়ো আদর্শ নিয়ে বাগ্‌বিস্তার করা যতটা সহজ, সেইসব আদর্শকে রূপায়িত করার রীতিপদ্ধতি স্থির করা তার চেয়ে অনেক কঠিন কাজ। রবীন্দ্রনাথের মহৎ বৈশিষ্ট্য এইখানে যে তিনি একাধারে মস্ত আদর্শবাদী ছিলেন, আবার কাজের মানুষও ছিলেন। শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে বহু পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে তিনি দেখিয়ে গেছেন কী প্রণালীতে তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে কর্মের মধ্য দিয়ে প্রয়োগ করতে হয়। তিনি যেটা বিশেষভাবে চেয়েছিলেন তা হলো মানুষের প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনাগুলিকে বিকশিত করে তোলার সহায়তা সাধন। মূলত তিনি এই প্রশ্নটিকে দেখেছিলেন শিক্ষার সমস্যারূপে। এই সমস্যার সমাধানে তিনি যে-নিপুণতা দেখিয়েছিলেন তা অসাধারণ। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন আমাদের মধ্যে এমন অনেক সম্ভাবনা আছে যা আমরা কখনো কাজে খাটাই না। এ বিষয়ে আমি তাঁর সঙ্গে একমত। এই সব প্রচ্ছন্ন শক্তিকে প্রকাশ করার কি উপায়? শিশুদের মধ্যে যেসব ক্ষমতা লুকিয়ে আছে, সেগুলি যাতে বিকাশলাভ করে তার জন্য কী আমরা করতে পারি? রবীন্দ্রনাথ খুব পরিষ্কার বুঝেছিলেন আজকের দিনে শিক্ষা বলতে আমরা যা বুঝি তা নিতান্তই ভাব ও ভাষার উপর নির্ভরশীল। মানুষের একটা অ-বাঙ্‌ময় দিক আছে যা যুক্তি বা বিচারনির্ভর নয়, যা নিতান্তই তার জৈবিক দিক—আবেগ, অনুভূতি বা

কল্পনার দিক। মানুষের এই দিকটাকে শিক্ষিত করে তোলবার বিশেষ কোনো চেষ্টা দেখা যায় না প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায়। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ মানুষের এই দুটো দিককেই ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েদের এমন একটা সামগ্রিক শিক্ষা দেওয়া যাতে ভাষা ও ভাবনির্ভর সাধারণ্যে প্রচলিত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, মানুষের অ-বাঙ্‌ময় দিকটারও প্রকাশের পথ সুগম হয়।

রবীন্দ্রনাথ ভাষা ও সাহিত্য কিংবা বিজ্ঞান শিক্ষার পরিপন্থী ছিলেন যে—এমন নয়। তিনি এ-সব বিষয়ের উপর ছাত্রদের উপযোগী বহু পাঠ্যপুস্তকও রচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর লক্ষ্য ছিল ভাষানির্ভর প্রচলিত শিক্ষা ছাড়াও, মানুষের অন্যান্য বৃত্তিগুলিকে শিক্ষিত করে তোলা। এই বিষয়ে তাঁর বক্তব্য বলতে গিয়ে তিনি তাঁর এক প্রবন্ধে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ একটি কথা লিখেছেন। তিনি বলেছেন, মানুষ যদি তার মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ চায় তাহলে তার প্রাণশক্তি ও মননশক্তি—উভয়েরই সম্যক চর্চা করতে হবে; প্রাণশক্তিতে সে হবে দুর্বার এবং মননশক্তিতে সভ্য ও সংযত। দুর্বার প্রাণ-শক্তির অর্থে তিনি নিশ্চয় এ কথা বলতে চান নি যে মানুষ শক্তিপ্রয়োগের ক্ষেত্রে হিংস্র কিংবা পাশবিক হবে। তিনি চেয়েছিলেন মানুষের এই আদিম প্রবৃত্তির দিকটা যে রয়েছে, সে-কথা যেন আমরা স্বীকার করে নিই ও তাকে চালনার একটা উপায় স্থির করি। এই কথা ভেবে তিনি শরীর-মনের উৎকর্ষ সাধনের জন্য নানারকম প্রণালী ও পদ্ধতির উদ্‌ভাবন করেছিলেন। ছেলেমেয়েদের ইন্দ্রিয়চর্চা, কল্পনাবৃত্তির পুষ্টিসাধন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ছন্দোময় সঞ্চালন—এক কথায় মানুষিক বৃত্তির সামগ্রিক উন্মেষ ছিল তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির অন্যতম লক্ষ্য। তিনি চান নি কেবল ভাব ও ভাষার পরিধির মধ্যে মানুষের আত্মপ্রকাশ অবরুদ্ধ থাকে।

আমার তো মনে হয় শিক্ষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কীর্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি যে শিক্ষাসমস্যার সমাধানে একটা চরম মীমাংসায় পৌঁছেছিলেন, এমন দাবি আমি করব না। কোনো একজন ব্যক্তির পক্ষে এমন একটা অসম্ভবকে সম্ভবীকরণ হয়তো সাধ্যও নয়। তাঁর কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি এই বিশ্বব্যাপী সমস্যার সত্য রূপটুকু ধরতে পেরেছিলেন এবং সমাধানের কিছু কিছু ইঙ্গিতও দিতে পেরেছিলেন। আমাদের মধ্যে যেসব সুপ্ত সম্ভাবনা জাগিয়ে তোলা বাঞ্ছনীয়, সেগুলি বিকাশলাভ করবে কী

উপায়ে? এই প্রশ্নটি ক্রমাগত আমার মনকে আলোড়ন করে। আমার যেসব বন্ধুজন শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্রতী আছেন তাঁদের আমি নিয়ত বলি এ-প্রশ্নের সদুত্তর যেন তাঁরা খোঁজ করে বের করেন। দেখতে পাই শিক্ষা নিয়ে মানুষ প্রচুর অর্থ ব্যয় করে ও শ্রমস্বীকার করে—কিন্তু তার ফল দাঁড়ায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। কেন এমনটা হয়? আমার মনে হয় তার অন্যতম কারণ এই যে পুঁথিগত বিদ্যা ও মননের চর্চায় মধ্যে আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রকে বহুলাংশে সংকুচিত করেছি। তাই এখন দরকার মানুষের অ-বাঙ্‌ময় সত্তাকে সুবিহিত প্রণালীতে সুশিক্ষিত করে তোলা। ইন্দ্রিয়চর্চা দিয়ে এই শিক্ষা-পদ্ধতির সূচনা করা উচিত। আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয় শিক্ষার মধ্য দিয়ে উৎকর্ষ লাভ করতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে সংগীতশিক্ষার দ্বারা আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের চর্চা হয়। তেমনি আবার চিত্রকলার শিক্ষায় আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় কিছু পরিমাণে উৎকর্ষ লাভ করতে পারে। কিন্তু নিঃসন্দেহে বলা চলে কলাবিদ্যার চর্চা ছাড়াও আরো বহুতর উপায়ে চোখ, কান ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়কে আমরা সুশিক্ষিত করে তুলতে পারি। চোখে দেখা ও কানে শোনার বোধকে আমরা প্রতিক্রিয়ায় ক্ষিপ্রতর ও পার্থক্যবিচারে সূক্ষ্মতর করতে পারি। চোখ-কানের বেলা যেমন উৎকর্ষলাভের বহুতর সুযোগ ও পদ্ধতি আছে—অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের বেলাও ঠিক তেমনি সুযোগ ও পদ্ধতি আছে। ইন্দ্রিয়ের বোধশক্তি বৃদ্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিও উত্তরোত্তর উৎকর্ষ লাভ করতে থাকে। দেখা গেছে যেসব ছেলেদের ইন্দ্রিয়বোধ উচ্চমানের, তারা লেখাপড়া ও সংখ্যাগণিত বেশ দ্রুত শিখতে পারে। অপর ছেলেদের তুলনায় তাদের অভিনিবেশ বেশি, সুতরাং তারা মন দিয়ে শোনে, শুনে বুঝতে পারে এবং সেই কারণে অন্যদের তুলনায় তাদের আচরণ অনেক বেশি সুসংযত।

ইন্দ্রিয়চর্চার আর-একটা বড় দিক হল এই যে ইন্দ্রিয়বোধের শক্তি অনুভূতির সূক্ষ্মতায় যেমন যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমন তেমন আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আনন্দের ক্ষেত্রও বিস্তৃততর হতে থাকে। খুবই দুর্ভাগ্যের কথা, প্রতিনিয়ত দেখা যায় যে তরুণ বয়সের অনেক ছেলেমেয়ে এই অতি আশ্চর্য বিশ্বজগৎ সম্পর্কে নিতান্তই নিরুৎসাহ ও আগ্রহহীন। এই কাঁচা বয়সে তাদের কাছে সবই এমন নিরর্থক যে তারা নিতান্ত আজেবাজে হাসি-খেলা নিয়ে বোকার মতো মেতে থাকে। তাদের এই বিরক্তি ও অনাগ্রহের অন্যতম কারণ

হল এই যে শৈশবে তাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম শিক্ষিত করে তোলা হয় নি। আমরা চোখে দেখতে, কানে শুনতে ও চেখে দেখতে সুবিহিত শিক্ষা লাভ করি না, সূক্ষ্ম রসবোধের ক্ষেত্রে তাই আমরা অশিক্ষিত বর্বরের মতো আচরণ করি। যে-জগতে আমরা বসবাস করি তা যে নিরাপদ আরামের জগৎ নয়, এ-জগতে যে অনেক ভয় ও আশঙ্কার কারণ বর্তমান—এ কথা বোধশক্তি-সম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বীকার করবে। কিন্তু এ জগৎ একঘেয়ে ও বৈচিত্র্য-বিহীন বলে কেউ যদি মনে করে, তাহলে আমার কাছে তা অতি অদ্ভুত মনে হয়। তৎসত্ত্বেও দেখা যায় বেশ কিছু লোক আছে যারা এই দলের। সেইজন্যই বিশেষ দরকার যে আমাদের ছেলেমেয়েরা যেন প্রত্যক্ষ অনুভূতির মধ্যে দিয়ে এই বহুবিচিত্র বিশ্বের সঙ্গে পরিচয় লাভের শিক্ষা পায়। মানবসমাজে এই যে বিরক্তি ও অনাগ্রহের ব্যাধি প্রবেশ করেছে, এরই পরোক্ষ উপসর্গ হল স্নায়ুবিকার, কলহপরায়ণতা এবং সংগ্রাম।

শিক্ষাপদ্ধতির আর-এক সমস্যা হল কল্পনাবৃত্তিকে শিক্ষিত করে তোলা। এ-ক্ষেত্রেও দেখি প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় খুবই সামান্য আয়োজন। কিন্তু এ নিয়ে অনেক কিছু করা যায় এবং এদিকে রবীন্দ্রনাথের দান প্রভূত। সংগীত, নৃত্য ও চিত্রকলা -চর্চায় তিনি যে এতখানি জোর দিয়েছিলেন, সে সর্বতোভাবে অভিনন্দনযোগ্য। কল্পনাবৃত্তিকে আরো নানা দিকে সুশিক্ষিত করার উপযোগী প্রণালী কিভাবে উদ্ভাবন করা যায় সেই দিকে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। কল্পনার পুষ্টিসাধন ও তার যথাযথ ব্যবহার শিশুর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখতে পাই শিশু কল্পিত বস্তু থেকে ভয় পায়—স্বকপোলকল্পিত বিভীষিকার সৃষ্টি করে, একটা অকারণ উদ্বেগ আতঙ্কে তার দিন কাটে। এই রকম বিভীষিকার হাত থেকে শিশুকে যদি রক্ষা করতে হয় তাহলে তার কল্পনাশক্তিকে এমন সব খাতে চালনা করতে হবে যাতে শিশুর এই সহজাত কল্পনাবৃত্তি তার নিজের ও সমাজের পক্ষে মঙ্গলপ্রসূ হয়। এর জন্য প্রয়োজন বিশেষ ধরনের শিক্ষা।

এবার শরীরচর্চার সমস্যার দিকে একবার নজর দেওয়া যাক। এ-ক্ষেত্রে অবশ্য ভারতের একটি পুরাতন ও গৌরবময় ঐতিহ্য রয়েছে। খুব সম্ভব এদেশে আর্যদের আগমনের পূর্বেই যোগবিদ্যার সূচনা। হয়তো এই বিদ্যা দ্রাবিড়দের দ্বারা আবিষ্কৃত, হয়তো চার-পাঁচ হাজার বছর আগে মোহেন-জো-দারো ও হরপ্পাতেও যোগবিদ্যার প্রচলন ছিল। সব রকম যোগাসন সব শিশুকে

পুরোপুরি শেখানো যাবে না—সে তো জানা কথা। কিন্তু বহুজন যেখানে শিক্ষা লাভ করছে সেইরকম প্রতিষ্ঠানেও, বহু শতাব্দী ধরে পরীক্ষিত এই সব যোগের ব্যায়াম কিছু কিছু নিশ্চয় শিক্ষা দেওয়া যায়। তাহলে বাক্য ও ভাববিলাসী মনের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, দেহে-মনে-তৈরি সমগ্র মানুষটাকেও শিক্ষিত করে তোলা যায়। এই প্রসঙ্গে য়ুরোপের প্রখ্যাত দার্শনিক স্পিনোজার একটি উক্তির কথা আমার বিশেষভাবে মনে পড়ছে। স্পিনোজা বলেছিলেন : "শরীরটাকে বহু বিচিত্র কর্মের উপযোগী করে তৈরি করে নাও। শরীর তৈরি হয়ে গেলে পর মনেরও গঠন নিটোল হয় এবং এই দুয়ের সামঞ্জস্যের ফলে, জ্ঞান ও বুদ্ধির যোগে আমরা ভগবৎপ্রেমের দিকে অগ্রসর হতে পারি।" স্পিনোজার এই একটি মহৎ উক্তির মধ্যে অ-বাঙ্‌ময় মানবসত্তার পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার একটা ইঙ্গিত নিহিত আছে।

রবীন্দ্রনাথ যে কেবল কবি রাষ্ট্রবিদ ও শিক্ষাশাস্ত্রী ছিলেন এমন নয়। উপরন্তু তিনি ছিলেন আত্মজ্ঞানী পুরুষ। তাঁর এই আত্মজ্ঞান ছিল তন্ত্রসাধকদের মতো। বৈরাগ্য সাধনের যে ইহলোকাতীত মুক্তি—সে তার কাম্য ছিল না। তাঁর কাম্য ছিল এই পার্থিব জগতের মধ্যে থেকেই মুক্তি লাভ করা। তাই তিনি চাইতেন বহুর মধ্যে একককে দেখে নিতে, সীমার মধ্যে অসীমকে এবং অনিত্যের মধ্যে নিত্যকে। সেদিক থেকে তিনি ছিলেন হীনযানী বৌদ্ধদের মতো নয়, বরঞ্চ মহাযানী বৌদ্ধদের মতো। তাঁর মনের প্রবণতা ছিল অর্হৎ হবার দিকে ততটা নয় যতটা বোধিসত্ত্ব হবার দিকে। এই নাম, রূপ ও কর্মের জগতেই তিনি তাঁর নির্বাণের আকাঙ্খা করেছিলেন। মূলত তাঁর আত্মজ্ঞানের ভিত্তি ছিল ভারতীয় দর্শনের বুনিয়াদের উপর। তিনি বিশ্বাস করতেন জীবাত্মা হল পরমাত্মারই প্রকাশ। তাই তাঁর শিক্ষা-পদ্ধতির অন্তুষঙ্গ ও চরম লক্ষ্য ছিল মানুষের চিত্তের বিকাশ ধ্যানের মধ্য দিয়ে, শান্ত শিব ও সুন্দরকে উপলব্ধির মধ্য দিয়ে।

পরিশেষে বলা যায় রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে তিনটি বিভিন্ন উপায়ের সমন্বয় দেখা যায়—১। প্রচলিত ভাষাগত শিক্ষার উন্নততর রূপ, ২। মানুষের অ-বাঙ্‌ময় সত্তার (যাকে রবীন্দ্রনাথ প্রাকৃত বলেছেন) সম্যক বিকাশ, এবং ৩। ধ্যান ও সাধনার মধ্য দিয়ে আত্মজ্ঞানের উন্মেষ।

রবীন্দ্রনাথ এমন একজন মানুষ যাঁর বিচিত্র কীর্তির দিকে আমরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে পারি। কিন্তু পিছনে তাকিয়ে অনর্থক সময়ক্ষেপ

করলে চলবে না, তাঁর প্রারব্ধ তিনি যতখানি শেষ করতে পেরেছেন—সেখান থেকে আমাদের অগ্রসর হয়ে যেতে হবে। তিনি কি করতে চেয়েছিলেন, কতখানি করতে পেরেছিলেন—সবার আগে সেই কথা বিচার করা দরকার। তারপর আমাদের এগিয়ে চলতে হবে তিনি শিক্ষার চরম লক্ষ্য বলে যে-সিদ্ধান্ত করেছিলেন তাকে বাস্তবে রূপ দিতে। তাঁর সেই লক্ষ্য ছিল মানুষের সমস্ত শক্তি ও সম্ভাবনাকে একযোগে জাগিয়ে তোলা, নিতান্ত দৈবিক দিক থেকে শুরু করে আত্মিক দিক পর্যন্ত মনুষ্যত্বের যে-বিস্তার, সেই পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বকে উদবুদ্ধ করা।

অনুবাদ : ক্ষিতীশ রায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী-উপলক্ষে সাহিত্য অকাদেমি-কর্তৃক আহূত আন্তর্জাতিক আলোচনাবৈঠকে হুমায়ুন কবির যে-ভাষণ দেন, তারই ভিত্তিতে লিখিত তাঁর এই প্রবন্ধ Reflections on Tagore প্রকাশিত হয় অকাদেমি-প্রকাশিত ষাণ্মাষিক 'Indian Literature' পত্রিকার বিশেষ রবীন্দ্রসংখ্যায়।

জগন্নাথ চক্রবর্তী

এলিজাবেথীয় নাটক ও ভারতবর্ষ

১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে আকবর সিংহাসনে আরোহণ করেন, ঠিক দু বৎসর পর ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসেন রানী প্রথম এলিজাবেথ। আবার ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে রানী এলিজাবেথের মৃত্যু হয়, এবং দু বৎসর পর ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট আকবরের মৃত্যু হয়। অর্থাৎ এলিজাবেথীয় ইংলণ্ড ও আকবরী ভারতবর্ষ, বলা যায়, সমকালীন। ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ এই দুই দেশের সমকাল। আর এই কাল দুটি দূরান্তস্থিত দেশের গৌরবের কালও বটে। তুরস্কের সুলতান, স্পেনের রাজা ও দিল্লির বাদশাহ তখন পৃথিবীর তিনটি শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যের কর্ণধার, ইংলণ্ডের আসন এদের অনেক পশ্চাতে। তখন ভারতমহাসাগরে পোর্তুগীজদের পর সবে ইংরেজ ও ওলন্দাজ বণিকদের অভ্যুদয় ঘটছে। রানী এলিজাবেথের মৃত্যুর তিন বৎসর আগে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানির পত্তন হল এবং আকবরের মৃত্যুর অল্পদিন পর হকিন্স সাহেব আগ্রায় এলেন জাহাঙ্গীরের দরবারে, ভারতবর্ষে বাণিজ্য করবার অনুমতির প্রত্যাশায়। তাজমহলের মতো অনিন্দ্যসুন্দর সৌধ ইংলণ্ডের নেই, তখন কিন্তু ভারতবর্ষেও ছিল না। কারণ শাজাহান তখনও সম্রাট হন নি এবং শাজাহানের মর্মর-স্বপ্ন তখনও প্রাক্-স্বপ্নে। কিন্তু ইংলণ্ডের একজন শিল্পী সেই জাহাঙ্গীরের সমকালেই আশ্চর্য স্থাপত্য-প্রতিভা দেখিয়েছিলেন, তৈরি করেছিলেন আকাশচুম্বী হর্ম্য, খচিত প্রাসাদ ও ধ্যানগম্ভীর উপাসনা মন্দির (The cloud-capp'd towers, the gorgeous palaces, / The solemn temples'—The Tempest IV. i. 152-53)। তাজমহল যেমন পৃথিবীর বিস্ময় সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক তেমনি বিস্ময় সৃষ্টি করে আছে সেই 'fabrics of the vision' বা কল্পনার সৌধগুলি। এই শিল্পীকে আমরা সকলেই জানি। ইনি হচ্ছেন শেক্সপীয়র।

মধ্য ষোড়শ শতকে যখন প্রথম এলিজাবেথ ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসলেন, তখন

প্রাচ্যদেশ ও ভারতবর্ষ য়ুরোপমানসে পরম কৌতূহলের বিষয়। ধনধান্যে পুষ্পে ভরা হোক বা না হোক গজদন্ত ও 'হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটা' যে এখানে আছে এ বিষয়ে য়ুরোপ ছিল নিঃসন্দিহান। রেনেসাঁস বা নবজন্মের আনন্দে, আবেগে, উত্তেজনায় উজ্জীবিত ইংলণ্ড তখন উন্মেষের অহংকারকে ভাষা দিতে চাইছিল। তখন, মনে রাখা দরকার, পৃথিবীতে কোথাও উপন্যাসের জন্ম হয় নি, সংবাদপত্র প্রচলিত হয় নি; ইংলণ্ডেও নয়। ইংরেজরা তাদের যা কিছু আবেগ ও উত্তেজনা প্রকাশের জন্য আশ্রয় করেছিল রঙ্গমঞ্চ বা থিয়েটার। এই থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষক ছিল জনসাধারণ ও রাজসভা, অর্থাৎ সমগ্র জাতি। কিন্তু যে-ভারতবর্ষের পথ খুঁজছিল ইংলণ্ড, যেখানকার হীরামুক্তা আহরণের জন্য তাদের বণিকসম্প্রদায় সংগঠিত হচ্ছিল সেখানে রঙ্গমঞ্চের অবস্থা কি ছিল? আমরা জানি আকবর বাদশাহের কোনো ধর্মের গোঁড়ামি ছিল না, যেমন ছিল তাঁর প্রপৌত্র ঔরঙ্গজেবের। কিন্তু আকবরের দীন-ইলাহিও এক বিষয়ে নিতান্তই দীন ছিল, এর মধ্যে অভিনয়কলা বা নাট্যচর্চার কোনো পোষকতা ছিল না। মোগল দরবারে কোনো নট নাটক বা নাটমন্দির ছিল না; আকবর, জাহাঙ্গীর, শাজাহান কারো দরবারেই নয়। ভরতের নাট্যশাস্ত্র পণ্ডিতদের কুলুঙ্গিতে সযত্নেই রক্ষিত ছিল, উৎসাহ দিলে তার ফার্সী অনুবাদ ও চর্চা সহজেই হতে পারতো, যেমন হয়েছিল অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের। কিন্তু উদার ধর্মপ্রাণ আকবর বা তাঁর শিল্পরসিক, মদিরাসেবক পুত্র বা পৌত্র কেউই নাট্যকলার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত ছিলেন না। আকবরের নবরত্ন-সভায় তানসেন, বীরবল, ফৈজী, আবুল ফজল, শেখ মুবারক, বাদাউনি, ফেরিশ্‌তা এমনকি গোয়া থেকে আগত খ্রীষ্টান ফিরিঙ্গী আকোয়াভিভা ও মনসারেট ছিলেন, কিন্তু ছিলেন না কোনো দরবারী নট বা নাট্যকার। অতএব নতজানু ইংরেজ যখন ভারতের দরবারে কুর্নিশ জানাতে এল তখন ইংরেজ দরবারের পৃষ্ঠপোষিত নটকোম্পানির কোনো সন্দেশ মোগল বাদশাহের কাছে উপহার হিসাবে এল না। মোগল সম্রাট খুশি হবেন এমন সম্ভাবনা থাকলে বাণিজ্যের খাতিরে ইংরেজরা একটি ছোট অভিনেতৃদল সহজেই নিয়ে আসতে পারতো। কিন্তু আগ্রা বা দিল্লিতে তার কোনো ইঙ্গিত ছিল না। ইরানী গুলবাগের মুকণ্ঠ পাখি যদি বা কিছু খাঁচা পেল, এলিজাবেথীয় গীতিকুঞ্জের জুলিয়েট বা রোজালিণ্ডের চোখে আঁকবার জন্য কোনো সুর্মা দিল্লি বা আগ্রায় পাওয়া গেল না। ব্যবসায়ীর-সঙ্গে বাদশার সম্পর্ক স্থাপিত না হয়ে যদি দরবারে

দরবারে সম্পর্ক স্থাপিত হত তাহলে হয়তো প্লেগের দুর্বৎসরে রানী এলিজাবেথের থিয়েটারের দল গায়না বন্ধ না করে যমুনার তীরেই 'মুজরো' নিয়ে লহরা তুলতে পারতো। তাহলে রাজপুত চিত্রকলা যেমন মোগল অন্তঃপুর পর্যন্ত আদৃত হয়েছিল ইংরেজি অভিনয়কলাও সম্রাট বা সম্রাজ্ঞীর স্নেহলাভ করতে পারতো। ইতিহাসের এমনি পরিহাস যে এলিজাবেথীয় ইংলণ্ডের সঙ্গে আমাদের যখন প্রথম পরিচয় ঘটল তখন শেক্সপীয়রের ইংলণ্ডের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটল না। আরো পরিহাস এই যে ইংলণ্ডের নাট্যশালায় ভারতবর্ষের নাম বারংবার উচ্চারিত হয়েছে, মোগল বাদশাদের নিয়ে নাটক পর্যন্ত তৈরি হয়েছে এবং সেই নাটক সাফল্যের সঙ্গে অভিনীতও হয়েছে। যখন ঔরঙ্গজেব জীবিত এবং ছত্রপতি শিবাজীর সঙ্গে যুযুধান, তখনই লণ্ডনে ড্রাইডেন রচিত 'ঔরঙ্গজেব' (১৬৭৫) নামক নাটকে ঔরঙ্গজেবের ভূমিকায় ইংরেজ নট অভিনয় করেছেন। অথচ ঔরঙ্গজেব স্বয়ং তখন নাটক তো দূরের কথা, আমোদপ্রমোদ শিল্প সব কিছুকেই ধ্বংস করতে উদ্যত। ইংলণ্ডের স্টেজে ভারতবর্ষ প্রবেশ করেছে কিন্তু ভারতবর্ষের দেওয়ানি আম বা দেওয়ানি খাসের এক কোণে ব্যাঙের ছাতির মতো কোনো রঙ্গমঞ্চের আভাস পর্যন্ত ফুটে ওঠে নি। আফশোষ হয়, হকিন্স সাহেব মোগল উপেক্ষা অগ্রাহ্য করে অন্যান্য উপঢৌকনের সঙ্গে শেক্সপীয়রের কোনো অনুমোদিত বা অননুমোদিত কোয়ার্টো—শেক্সপীয়র তখনও জীবিত, কাজেই সম্পূর্ণ ফোলিও গ্রন্থের প্রশ্নই ওঠে না—কেন মোগল বাদশাহকে উপহার দেন নি, কেন বেগমদের চিত্ত জয় করবার জন্ত কোনো শখের দলকে হাজির করতে পারেন নি। পারলে রাজনৈতিক ইতিহাস কী হত জানি না। হয়তো সাহিত্য-শিল্পের ইতিহাস সম্পূর্ণ আলাদা হত। রাণী এলিজাবেথের কাছে ইংরেজি নাটক কতখানি ঋণী তা মোগল দরবারের সঙ্গে তুলনা করলে খুবই পরিস্ফুট হয়। হিন্দু বৌদ্ধ যুগের নাট্যকলার ভগ্নাবশেষগুলির কী দশা হয়েছিল তা খুব স্পষ্ট জানা যায় না। আমরা জানি, মোগল শাসনের প্রাক্কালে পাঠান যুগের শেষদিকে বাংলাদেশে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব (১৪৮৫-১৫৩৩) ঘটে। তখন বাংলাদেশে আমরা কোনো নাটকের নিদর্শন পাই না। চৈতন্যদেবের 'কৃষ্ণলীলা'-অভিনয় সম্বন্ধে যে-লোকশ্রুতি আছে তা সম্ভবত নাট্যাভিনয় নয়, একক ভাবাভিনয় মাত্র। কারণ নাটকের অভাব পূরণের জন্যই সংস্কৃত ভাষায় গোবিন্দ দাস 'সংগীতমাধব', রূপ গোস্বামী 'বিদগ্ধ মাধব' ও 'ললিত মাধব' এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'গোবিন্দলীলামৃত' রচনা

করেন। এর মধ্যে 'বিদগ্ধ মাধব' বাংলাতে অনূদিত হয়েছিল, কিন্তু তাও কাব্যানুবাদ, নাট্যানুবাদ নয়। নাটকের প্রচলন ছিল না বলেই নাট্যগুণান্বিত লৌকিক কাহিনী ও গাথা থেকে মঙ্গলনাট্য হয় নি, শুধু মঙ্গলকাব্যই রচিত হয়েছিল।

পাঠান ও মোগল আমলের যে নতুন শক্তি ও সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতের পরিচয় ঘটল এবং তার ফলে যে নতুন ভাবসংঘাত সৃষ্টি হল তা কেন নাটক ও নাট্যশালার সৃষ্টি করল না তা একটু বুঝবার চেষ্টা করা যাক। এই আগন্তুক সংস্কৃতির মূল প্রেরণা ইসলাম। গোঁড়া ইসলাম খ্রীষ্টীয় গোঁড়া পিউরিটানবাদের মতোই উৎসববিমুখ ও কৃচ্ছ্রতায় বিশ্বাসী। শুধু তাই নয়, মূল ইসলামী অর্থাৎ আরবী সাহিত্যতত্ত্বে কাল্পনিকতার প্রশ্রয় নেই, কাল্পনিক কাহিনীও নিরুৎসাহিত। আরবী সাহিত্য-সমালোচনায় কথাসাহিত্যের প্লট বা 'অ্যাকশন' সম্বন্ধে কোনো আলোচনা নেই, এই ধারণাগুলি গড়েই ওঠেনি। ইসলাম সংস্কৃতি-বিশেষজ্ঞ গ্রুনেবাউস বলেছেন, "এটি বড়ই অদ্ভুত যে আরবী সাহিত্য, যদিও টুকরো কাহিনীকথায় এত সমৃদ্ধ এবং অলৌকিক বাণী ও কর্মে এত আগ্রহী, কখনই যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে বড় রকমের কাহিনী বা নাটকের প্রতি মনোযোগী হয় নি। উপদেশমূলক আখ্যান বা ছোটগল্প ছাড়া —যার অধিকাংশই হয় বিদেশী সাহিত্য থেকে আহৃত অথবা সত্য ঘটনার যথাযথ পুনরাবৃত্তি মাত্র—আরব মুসলমানগণ সাহিত্যিক উদ্ভাবনে বীতরাগী ছিলেন।" আরবী গল্প-লেখকরা সকলেই গল্পকে সত্যকাহিনী বলে বর্ণনা করেছেন; অর্থাৎ বাস্তব সত্যের বাইরে কল্পনার দ্বিতীয় জগৎ আছে, জানলেও এ কথা তাঁরা স্বীকার করতে ভয় পেয়েছেন। আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, সর্ব বিষয়েই এক এবং অদ্বিতীয়; তাঁর সৃষ্টিশক্তির প্রতিস্পর্ধী কোনো সৃষ্টি বা স্রষ্টাকে ইসলাম স্বীকার করতে নারাজ। কবির অসামান্য প্রতিভা বা প্রেরণার কথা গ্রীকরা জানতেন। মধ্যযুগে সাধারণ লোকের ধারণা ছিল যে কবির উপর দানব ভর করে এবং 'জিন' বা শয়তান দ্বারা চালিত হয়েই তিনি কাব্য রচনা করেন। পয়গম্বরের প্রেরণা এবং কবির প্রেরণা দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস এবং কবির 'প্রেরণা' যে তুলনায় হেয় তা নানাভাবে প্রতিপন্ন করা হয়েছিল। কবি সম্বন্ধে কোরাণের উক্তি নিম্নরূপ :

"তোমরা কি জানতে চাও শয়তানরা কাদের উপর ভর করে? তারা ভর করে যারা মিথ্যাবাদী এবং অপরাধী তাদেরই উপর।...এবং কবিরা কি বানিয়ে

বানিয়ে সেই সব কথাই বলে না যা তারা জন্মেও নিজেরা করে দেখে নি?" পূর্বতন ধর্মগুরুদের মধ্যে যীশু সম্বন্ধে কোরাণে বলা হয়েছে যে যীশু একবার মাটি দিয়ে খেলনা পাখি গড়ে তার মধ্যে জীবন সঞ্চারিত করেছিলেন এবং খেলনাগুলি সব জীবন্ত পাখি হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য যীশু আগে থেকে ঈশ্বরের অনুমতি নিয়েছিলেন। রূপকার হিসাবে প্রত্যেক শিল্পীই আল্লাহ্‌র প্রতিদ্বন্দ্বী। শেষ বিচারের দিন রূপকারদের বলা হবে, তোমাদের গড়া মূর্তিতে প্রাণদান কর। কিন্তু যখন প্রাণদান করতে পারবে না তখন তারা অনন্ত নরকে নিক্ষিপ্ত হবে। এই কোরাণ-পুষ্ট আরবী ঐতিহ্যই গোঁড়া ইসলামী ঐতিহ্য। প্রশ্ন হতে পারে, নব্য পারসিক সাহিত্যে এই ইসলামী ঐতিহ্য কি পুরোপুরি মানা হয়েছিল? না, হয় নি। প্রাচীন কিংবদন্তী ও সাহিত্য থেকে 'কিস্‌সা' বা দীর্ঘ কাহিনী নিয়েই ফের্দৌসীর শাহ্‌নামা—পারসিক মহাকাব্য—রচিত হয়েছিল। রচনায় অনেক কল্পিত বর্ণনা, উচ্ছ্বাস ও আবেগ আছে, অথচ ফের্দৌসী এইসব অনৈতিহাসিক-কাহিনী উদ্ভাবনে একটুও সংকোচ বোধ করেন নি। এমন কি শেখ শাদী তাঁর ধর্মীয় মহাকাব্য—পন্দনামাতে—পর্যন্ত গোঁড়া আরবী ঐতিহ্য অনুসরণ করেন নি, আরবী অনুশাসন মানেন নি। আরবী ইসলামী সংস্কৃতি ধর্মের দিক থেকে বড় থাকলেও পারস্যে এসে স্থানীয় সংস্কৃতি ও পুরাতন ঐতিহ্যের সঙ্গে তাকে আপস করতে হয়েছে, এবং এর ফলে ইসলামী সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছে সন্দেহ নেই। মুসলমান সুফী ও মরমিয়াদের কাব্যিক আবেগ ও প্রেরণা এই পারসিক ধারা থেকেই এসেছে, গোঁড়া আরবী ধারা থেকে নয়। কিন্তু গোঁড়া ধর্মীয় মহলে আরবী ঐতিহ্যই একমাত্র স্বীকৃত ও প্রশংসিত, পারসিক নয়।

সাহিত্যের প্রকাশকে ব্যক্তিক ও নৈর্ব্যক্তিক এই দুই প্রধান ভাগে ভাগ করলে প্রথম পর্যায়ে পড়ে গীতিকবিতা ও আত্মজীবনী, এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে মহাকাব্য, আখ্যান বা উপন্যাস এবং নাটক। ইসলামী সংস্কৃতির মধ্যে আরবী, পারসিক ও গ্রীক এই তিনটি প্রধান প্রভাব লক্ষ করা যায়, এ ছাড়া মিশরীয় ও ভারতীয় প্রভাবও আছে। এর মধ্যে আরবী প্রভাবই সর্বপ্রধান, যেহেতু এটি ধর্মমূলক। গীতিকবিতা ও আত্মজীবনী রচনার ঐতিহ্য আরবের, মহাকাব্য ও নাটকীয় রচনার ঐতিহ্য পারস্যের। 'আরব্য উপন্যাসের' গল্পগুলি উভয় থেকেই পৃথক, এদের জন্ম প্রধানত গ্রীক ও ভারতীয় প্রভাব থেকে। আরবী চরিত্রবর্ণনা ছিল আড়ষ্ট, কতকগুলি চিরাচরিত অলংকারশাস্ত্রসম্মত

গুণাগুণের বর্ণনা মাত্র। আত্মজীবনীতে পর্যন্ত প্রেমের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা ছিল দূষনীয়। প্রেম সম্বন্ধে খুব উঁচুদরের সাধারণ বর্ণনা আছে, কিন্তু সবিশেষ প্রেমকাহিনী-রচনায় তাঁরা একেবারেই ব্যর্থ। উদ্ভাবনের নয় শুধু প্রকাশভঙ্গীর নূতনত্বই তাঁদের কাম্য ছিল, অর্থাৎ কাহিনী নয়, কথাই হয়ে উঠেছিল তাঁদের মূল উপজীব্য। আরবরা যেখানে দীন, পারসিকেরা কিন্তু সেখানেই ধনাঢ্য। ঘটনা, রোমান্স ও মর্মিতার সংমিশ্রণে পারসিকেরা সার্থক কাহিনী সৃষ্টি করতে জানতেন, যার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দশম শতকে রচিত ফের্দৌসীর ঐতিহাসিক মহাকাব্য 'শাহ্‌নামা'। এর পর একাদশ শতকে খুস্রব ও শিরিনের কাহিনী নিয়ে নিজামী রচনা করলেন এক রোমান্টিক মহাকাব্য, যার সুদূরতম তুলনাও আরবী সাহিত্যে নেই।

আরবী ঐতিহ্য পারস্যে এসে যেমন অনেকটা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েছিল, ভারতবর্ষে এসেও যদি তেমনি হিন্দু পৌত্তলিকদের কাছ থেকে শিল্পঋণ গ্রহণ করত তাহলে ফল ভালই হত। জাহাঙ্গীরের দরবারে যখন ইংরেজদের সঙ্গে মোগলদের পরিচয় ঘটল তখন ইংরেজি রঙ্গমঞ্চের কাছে ঋণ গ্রহণ করলে হয়তো মোগল যুগে নাট্যসাহিত্যের রীতিমতো বিকাশ ঘটতে পারত। ইংলণ্ডে যখন ঐতিহাসিক নাটকে একের পর এক ইংরেজ রাজা মঞ্চের সিংহাসনে আরোহণ করছেন, যখন রানী এলিজাবেথ স্বয়ং অধিকাংশ নাটকে বা কাহিনীতে প্রচ্ছন্ন চরিত্ররূপে বিরাজমান, তখন মোগল দরবারের দৌলতাঢ্য সম্রাটদের কাহিনী শিল্পে অনুচ্চারিতই রয়ে গেছে। যে উৎসাহ, আবেগ ও অর্থব্যয়ে তাজমহল রচিত হয়েছিল তাই দিয়ে কি একাধিক মোগল শাহ্‌নামা বা ঐতিহাসিক নাটক রচিত হতে পারত না? কিন্তু তা হয়নি। দুঃখের বিষয়, মোগল সম্রাটগণ শুধু ধর্মভীরুই ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন পারসিকের পরিবর্তে আরবী ঐতিহ্যেরই বাহক। বাবর যে আত্মজীবনী রচনা করেছিলেন তাও এই সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করে, কারণ আমরা আগেই দেখেছি যে আত্মজীবনী রচনার রেওয়াজ আরবী ঐতিহ্যের অন্তর্গত। ঔরঙ্গজেবের প্রমোদ ও শিল্পবৈরিতা এই একই ধারার অন্ত্যপ্রান্ত। কাহিনী বা চরিত্রপ্রধান কোনো শিল্পে মোগলদের রুচি ছিল না। যে-শিল্পে প্রাণ সঞ্চার করতে হয় না, শেষ বিচারের দিন যার জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হবে না, সেই শিল্পে মোগলরা চরম উৎকর্ষ দেখিয়েছেন। তাদের কীর্তি নাটক বা ভাস্কর্য নয়, স্থাপত্য; মূর্তি নয়, মানুষ নয়, প্রাসাদ।

মোগল দরবারের অনুষ্ঠানে অতিথিদের জন্ম মূল্যবান পারসিক কার্পেট বিছানোর রীতি ছিল। কিন্তু সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পারসিক নয়, আরবী প্রভাবই ছিল প্রধান। একটি উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে। পারস্যের কতকগুলি নিজস্ব উৎসব ও অনুষ্ঠান ছিল এবং তা পালন করবার উচ্ছ্বাসময় রীতিও ছিল পারস্যেরই নিজস্ব। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'নওরোজ' বা বসন্ত-উৎসব, নগরোদ্যানে সংগীত ও ফুলখেলায় মত্ত হয়ে ওঠার উৎসব। মোগল সম্রাট হুমায়ুন তাঁর সাম্রাজ্যে এই 'নওরোজ' উৎসব বন্ধ করে দেন। বলা বাহুল্য, ধর্মের অনুরোধেই তাঁর এই অনুজ্ঞা। অথচ ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ কখনই উৎসব-পরাঙ্মুখ ছিল না। ইসলামের বিষাদ-কৃচ্ছ্র মুখে হাসি ফোটাতে পারলে তারা খুশিই হত। পারস্যে যেমন ইসলামী সংস্কৃতি অনেকখানি পরিবর্তিত হয়েছিল, ভারতবর্ষেও তেমনি পরিবর্তনের প্রচুর সম্ভাবনা ছিল, কতকগুলি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেও ছিল। গোঁড়া ইসলামী দৃষ্টিতে মুসলমানের জীবনে আমোদ-আহ্লাদের অবকাশ নেই বললেই হয়। এ বিষয়ে ইংলণ্ডের পিউরিটানদের সঙ্গে তারা তুলনীয়। হজযাত্রা বা ঈদের নমাজের পরিবেশ এতই গুরুগম্ভীর ও ধর্মীয় যে তাদের উৎসব বলা কঠিন। কিন্তু ভারতবর্ষে এসে এই গুরুগম্ভীর পার্বণগুলি অনেকখানি সামাজিক উৎসবে রূপান্তরিত হয়েছিল। 'শব-বরাত' পার্বণ সম্বন্ধে কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মত এই যে, সম্ভবত এই উৎসবের বিভিন্ন অনুষ্ঠান-অঙ্গ হিন্দু 'শিবরাত্রি' থেকে নেওয়া। রাত্রি-জাগরণ উভয় অনুষ্ঠানেরই বৈশিষ্ট্য। আমীর খসরু দিল্লীর 'শব-বরাত' উৎসবের বর্ণনায় অনুযোগ করেছিলেন যে, কোরাণপাঠ প্রভৃতির বদলে দিল্লীতে রাস্তার ছোকরারা বাজী পুড়িয়ে হৈ-হল্লা করে একটা নরক বানিয়ে তুলেছে। এই উৎসব যখন একদা খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, তখন দিল্লীর সুলতানরা কিন্তু একে গ্রহণ করতে ইতস্তত করেন নি। কথিত আছে, সুলতান ফিরুজ শা তুঘলকের আমলে এই উৎসব চারদিন ধরে পালন করবার রেওয়াজ হয়েছিল। মহরম সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। শোকসভায় কারবালার শহীদদের তাজিয়া বহনের ব্যাপারটি এক ধরনের অনুকৃতি এবং অনুকৃতি ইসলামের সমর্থন থেকে বঞ্চিত। ধর্মীয় শোভাযাত্রা ভারতবর্ষে বহুল প্রচারিত। মহরমের শোক-শোভাযাত্রা এখানে সহজেই বিরাট ও ব্যাপক হয়ে উঠেছিল, যদিও শোক-বিলাপের নাটকীয় অনুকরণের প্রতি ইসলাম বরাবরই বিরূপ। রথযাত্রা ও কৃষ্ণলীলার

শোভাযাত্রা হয়তো বা মহরমের শোভাযাত্রাকে উৎসাহিত করে থাকবে। দিল্লীর সুলতানদের আমলে গোঁড়া মুসলমানরা কিন্তু মহরমের প্রথম দশ দিন শহীদ-কাহিনী পাঠ ও প্রার্থনা ছাড়া কোনোরকম উৎসব-শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করতেন না। কৃষ্ণলীলা ও রামলীলা অনুষ্ঠানগুলি এক ধরনের মঙ্গলনাট্যই। পাঠান বা মোগল শাসকরা এদের অনুকরণে কিন্তু কোনো দরবারী নাট্য-পরিকল্পনা করতে পারেন নি। ধর্মীয় নিষেধ না থাকলে তাঁরা সহজেই পারতেন। বিজিত হিন্দু বিধর্মীদের কাছ থেকেও না, বিদেশী বণিক ইংরেজদের কাছ থেকেও না, আমোদ-আহ্লাদ তাঁদের প্রিয় ছিল কিন্তু ধর্মের ভয়ে নাট্যকলায় তাঁরা উৎসাহ দেখাতে পারেন নি। যে-জীবন সৃষ্টি করতে পারবে না সেই জীবনের দৃশ্য অভিনয় করা মানুষের পাপ, কোরাণের এই নির্দেশই মঞ্চ থেকে তাঁদের দূরে রেখেছিল। অথচ এলিজাবেথীয় দরবারের মতোই মোগল দরবারে ও দরবারের আশে-পাশে মল্লযুদ্ধ, কবুতরের লড়াই, হাতীর লড়াই, 'চৌগান' বা পোলোখেলা, শরসন্ধান, শিকার, ভোজ-উৎসব, চৌপর ও চৌসর খেলা পুরোদমেই চালু ছিল। খানাপিনার আয়োজন বা রাজকীয় 'জশন'-এর সঙ্গে সম্রাট হুমায়ুন যমুনা নদীবক্ষে প্রমোদানুষ্ঠান প্রবর্তন করেন। 'জশনের' বর্ণনা দিতে গিয়ে আমীর খসরু বলেছেন যে শরাবের ঢাকনিগুলি প্রার্থনাসভার কার্পেটের চেয়েও পবিত্র বলে মনে হত! পবিত্রতার এই নূতন সংজ্ঞা নাটকের ক্ষেত্রেই শুধু প্রযুক্ত হয় নি। হলে এক নূতন ঐতিহ্য সৃষ্টি হত সন্দেহ নেই। বিদেশী পর্যটকগণ দিল্লীর দরবারের জৌলুষ দেখে অবাক হয়েছেন। জুম্মাবারে নমাজের পর দরবারে গান-বাজনা, মল্লযুদ্ধ কুস্তি হত। এখানে নাটক খুব সহজেই জমতে পারত। জাহাঙ্গীরের দরবারে সার টমাস রোর দৌত্য সফল হয়েছিল। সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে এই দৌত্য আরো গভীর অর্থে সফল হতে পারত যদি ইংরেজি নাটক, শেক্সপীয়র-ওয়েবস্টারের নাটক রো সাহেব দিল্লীতে আমদানি করতেন বা করতে উৎসাহিত হতেন।

ইংলণ্ডে গীর্জার প্রশ্রয়ে বাইবেল ও ধর্মকাহিনী নিয়ে 'মিরাকল' বা মঙ্গলনাট্য এবং পরে স্বাধীন ময়্যালিটি বা নীতিনাট্যের উদ্ভব হয়েছিল। চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতকের প্রায় শেষ পর্যন্ত এই খ্রীষ্টীয় মঙ্গল ও নীতিনাট্যের ধারা অব্যাহত ছিল। শেষের দিকে ধর্মনিরপেক্ষ, বিদ্রূপাত্মক বা মজার নানা ধরনের 'ইন্টারলিউড' নামক নাটকের প্রচলন হয়েছিল। এর পর এল

যুক্ত পেশাদারী নাটকের কাল। রাজা সপ্তম ও অষ্টম হেনরির সময় থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে একটি 'ইনটারলিউড' অভিনেতৃদল রাজসভার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আসছিল, অভিনেতাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল এলিজাবেথের সময় আট। রানী এলিজাবেথ শুধু নাটকের সমঝদার ছিলেন না, তিনি কালের হাওয়াও বুঝতে পারতেন। তাই ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ১০ মার্চ তারিখে তিনি তদানীন্তন আমোদ-প্রমোদ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত (Master of the Revels) এডমণ্ড টিলনির উপর আদেশ দেন, নাটুকে দলগুলির মধ্য থেকে বাছাই করে একটি দল গড়া হোক, এবং মহামান্যা রানী এলিজাবেথের জন্য বিশেষভাবে তা নির্দিষ্ট থাকুক। বারোজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বাছাই করে একটি দল গঠিত হল ; এই দলের নাম হল Queen Elizabeth's Men বা রানী এলিজাবেথের দল। যে আটজন 'ইনটারলিউড' অভিনেতা তাঁর পিতার আমল থেকে চলে আসছিল এলিজাবেথ তাঁদের বরখাস্ত করেন নি সত্য, কিন্তু ১৫৫৯ সালের পর আর তাদের কোনো অভিনয় হয় নি। লণ্ডনের বাইরে মফঃস্বলে এদের অভিনয়ের উল্লেখ ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পাওয়া যায়, এবং এই দলের শেষ অভিনেতার মৃত্যু হয় ১৫৮০ সালে। এর তিন বৎসর পর ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে দেখি রানীর নিজস্ব দল গঠিত হয়েছে। রানী এলিজাবেথ প্রথম দিকে ছোকরা অভিনেতাদের নিয়ে গঠিত 'বালকদলে'র খুব পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাঁর রাজত্বের প্রথম বিশ বৎসর 'বালকদল'ই সবচেয়ে বেশি বার অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু ১৫'৬ সালে 'থিয়েটার' (Theatre) ও 'কার্টেন' (Curtain) নামে দুটি পেশাদারী বয়স্ক অভিনেতাদের রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হল, এবং ১৫৮০-র পর থেকে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত নাট্যকারদের (University wits) প্রতিষ্ঠা ঘটতে থাকল। রানী এলিজাবেথ অনুকূল আবহাওয়া বুঝে বয়স্ক অভিনেতাদের নিয়ে তাঁর নিজস্ব দল 'মহারানীর দল' গঠন করলেন। অচিরেই মহারানীর দল হয়ে উঠল সেরা দল ; সব চেয়ে নামী লিস্টারের দলও ক্রমে ক্রমে নিষ্প্রভ হয়ে গেল। মহারানীর দল গ্রীষ্মকালে লণ্ডনের বাইরে ছোট ছোট শহরে ও মফঃস্বলে অভিনয় করতে যেত। ১৫৮৭ সালে মহারানীর দল স্ট্র্যাটফোর্ড শহরে অভিনয় করতে গিয়েছিল। মেলনের মতে এই সময়ই শেক্সপীয়র মহারানীর দলে যোগদান করেন।

ইংলণ্ডে মধ্যযুগ থেকে নাটকের যে-ধারাটি এলিজাবেথীয় যুগের প্রারম্ভ পর্যন্ত চলে এসেছিল তাকে বিংশ শতকের দৃষ্টি দিয়ে বিচার করা সংগত হবে না।

আমাদের দেশে যাত্রাগানের যে-ধারাটি ঊনবিংশ শতকে বেলগাছিয়ার বাগানে থিয়েটার ভূমিষ্ঠ হবার আগে পর্যন্ত চলে এসেছিল তার সঙ্গে বরং একে তুলনা করা চলে। এলিজাবেথীয় থিয়েটার সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত বর্তমান। মঞ্চের চেহারা সম্পর্কে কিছুটা মতৈক্য থাকলেও প্রেক্ষাগৃহ ও মঞ্চ মিলিয়ে তা ঠিক কেমন ছিল সে সম্বন্ধে পরস্পরবিরোধী নানা উক্তি ও বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু পূর্ববর্তী মঙ্গলনাট্য বা Miracle Play-র কথা যদি মনে রাখি তবে একটি বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হতে পারি, সেটি হচ্ছে দর্শক ও অভিনেতার সামীপ্য বা নৈকট্য। খ্রীষ্টীয় মঙ্গলনাট্যগুলি প্রকাশ্য রাস্তায় এবং হাটেবাজারে অভিনীত হত। যখন এগুলি চার চাকায় চড়ে পথের মোড়ে মোড়ে জনতার আনন্দ বর্ধন করত তখন সেই রথারূঢ় অভিনয় যে চতুর্দিক থেকেই দৃশ্যমান ছিল তা বলাই বাহুল্য। শেক্সপীয়রের সময়েও রঙ্গমঞ্চে চতুর্দিকে না হোক অন্তত তিন দিকেই যে গ্যালারির বেষ্টনি থাকত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। অবস্থান যেরকমই হোক, মঞ্চ ও দর্শকের মধ্যে যোগাযোগ যে অনেক গভীর ও বাস্তব ছিল তা সহজেই বলা যায়। রাস্তার মোড়ের অভিনেতা ও চারিপাশের নাট্যামোদী জনতার মধ্যে যে-সম্পর্ক বিদ্যমান থাকত এলিজাবেথীয় থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হবার পরও বহুকাল পর্যন্ত অভিনেতা ও দর্শকদের মধ্যে সেই একই সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল (দ্রঃ Hodges—The globe Restored 1953)। দর্শকদের কখনও কখনও সরাসরি আহ্বান করা হত মঞ্চের উপর উঠে আসতে, গানে অর্চনায় বা সমবেত আনন্দে অংশ গ্রহণ করতে। নটরা প্রয়োজনমতো প্রেক্ষালয়ের অঙ্গন বা অঙ্গনে প্রবেশের পথ নাটকের অংশ হিসাবেই ব্যবহার করত। আবার যখন নটকোম্পানি মফঃস্বল শহরে অভিনয় করতে যেত তখন কতকগুলি পিঁপের উপর সারি সারি তক্তা পেতে এক রাত্রির অভিনয়ের মতো মঞ্চ তৈরি করা হত। সে-মঞ্চের সঙ্গে যে-কোনো বাঁধা স্টেজের নিশ্চয়ই আকাশ-পাতাল তফাৎ। এ যুগের পার্কের উৎসাহী বক্তারা যেমন কেরোসিন কাঠের বাক্সের উপর দাঁড়িয়ে দর্শকদের ভীড়ে পরিবেষ্টিত হয়ে বক্তৃতা দেন, ঐ সব মঞ্চের অভিনেতাদের অবস্থা তার চেয়ে বিশেষ ভালো ছিল না। যাঁরা এখানে দেশী যাত্রাগান দেখেছেন তাঁরাই জানেন, যাত্রার মৃতসৈনিক কী কঠিন সমস্যা। চারিপাশেই দর্শক, তাদের মুখের উপর কোনো পর্দা ফেলে মৃতদেহ সরানো যাবে না। উইংসের আড়াল নেই যে পা ধরে টেনে সরিয়ে নেওয়া যাবে; বাধ্য হয়ে তাকে কাঁধে করেই বয়ে

নিয়ে যেতে হবে দর্শকদের মাঝ দিয়ে। কারণ অভিনয়স্থল দর্শকের সঙ্গে একই সমতলে অবস্থিত এবং চারদিকেই দর্শক দিয়ে বেষ্টিত। দৃশ্য বা দৃশ্যান্তর কথা দিয়ে এবং জনশূন্যতা দিয়ে বুঝাতে হবে; পটও নেই, পটপরিবর্তনের ব্যবস্থাই নেই। প্রথম যুগের একটি কমেডি থেকে দর্শক ও অভিনেতার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক:

নাটকটির নাম 'মজার নাটক' বা 'A Mery Play Between Johan Johan the husband/Tyb his wyfe/E Syr Jhan the preest'। স্বামী জোহান (Johan) দেখি নিজের মনে কথা বলে যাচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে তার নিজের স্ত্রীর সম্বন্ধেই গজগজ করছে, কারণ তার স্ত্রী একটি খাণ্ডারবাণী। এমন সময় দেখি তার স্ত্রী টিব (Tyb)-এর প্রবেশ। টিব আসা মাত্র সমগ্র দৃশ্যে তারই প্রাধান্য ও প্রভুত্ব। বেচারী স্বামী জোহান স্ত্রীর ভয়ে একেবারে কেঁচো। টিব জিদ ধরে যে জন্‌কেই যেতে হবে ধর্মযাজক জনের কাছে, তাকে নিমন্ত্রণ করতে হবে নৈশ ভোজে। খাবার আগে জন বলছে, বেশ, টেবিল গোছাও, থালাবাটি সাজাও। এরপর জন দর্শকদের সঙ্গে কথা বলছে। প্রসঙ্গ হচ্ছে খাবার আগে তার গাউনটি কোথায় রাখবে সেই সমস্যা নিয়ে। কথাবার্তা অনেকটা এইরকম:

গাউনটি খুলি।
কিন্তু এখানে রাখতে আমার ভয় হচ্ছে
কারণ কে জানে হয়তো এক্ষুনি চুরি হয়ে যাবে

... ...

যদি উনুনের পাশে খোলা অবস্থায় রেখে যাই হয়তো আমি টের পাবার আগেই এটি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে

[একজন দর্শককে লক্ষ্য করে] অতএব আমার অনুনয় আপনি যদি কষ্ট করে আমার এই গাউনটা একটু ধরেন, বেশিক্ষণ নয় আমি ফিরে আসা পর্যন্ত,

টিব ॥ [বাধা দিয়ে] না না ওর কাছে দেওয়া যায় না, কখ্‌খনো না। ও বসেছে একেবারে দরজার মুখে, সুড়ুৎ করে পালিয়ে যেতে পারে

[অন্য একজন দর্শককে লক্ষ্য করে] তার চেয়ে আপনি, আপনাকে দেখে
বিশ্বাসী মনে হচ্ছে, আপনি বরং এটা
রাখুন, যদি অবশ্য কিছু মনে না করেন।
ইত্যাদি।

পিরানদেল্লোর 'নাট্যকারের সন্ধানে ছয়টি চরিত্র' যাঁদের জানা আছে তাঁরা সহজেই বুঝবেন এ ধরনের বাস্তবাভাস কতখানি effect সৃষ্টি করতে পারে। আমাদের দেশে চলচ্চিত্রের আদিযুগে যেমন হুবহু থিয়েটারি ঢং ও রীতি রূপালি পর্দায় দেখানো হত, যেন রূপালি পর্দার উপর থিয়েটার-বিভ্রম ঘটানোই চলচ্চিত্রের কাজ, বা প্রথম থিয়েটার যখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখন মঞ্চে যেমন যাত্রাগানের আদর্শ অনুযায়ী কণ্ঠ-পৌরুষ ও অতি-বাচনকেই মঞ্চাভিনয়েও প্রয়োগ করা হত, তেমনি বলা যায় যে এলিজাবেথীয় যুগের প্রথম পর্বে মঞ্চের রীতি-নীতি ধরন-ধারণ হেউড-এর 'ইনটারলিউড' যুগের রীতি-নীতি থেকে খুব পৃথক হয়ে ওঠে নি। অবশ্য রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হবার পর অভিনয়ের চারিদিকে একটি লক্ষণের গণ্ডী অঙ্কিত হয়ে গেল এবং ক্রমশ এই গণ্ডী দুর্ভেদ্য হতে লাগল। অভিনেতারা ক্রমশ স্টেজের মধ্যে আবদ্ধ বা নিক্ষিপ্ত হলেন এবং অভিনয়ের অঙ্গ হিসাবে দর্শকদের সঙ্গে তাদের পূর্বেকার বাক্যালাপ বা dialogue ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল। কয়েক শতাব্দী এইভাবে কেটে যাবার পর আধুনিক যুগে আবার বার্ণার্ড শ প্রমুখ নাট্যকারগণ দর্শকদের সঙ্গে বক্তৃতা ও প্রচারধর্মী নতুন ধরনের সম্ভাষণ প্রবর্তন করলেন; কিন্তু দর্শক-নট সম্পর্ক আর কখনই এলিজাবেথীয় যুগের মতো হল না।

এলিজাবেথীয় ইংলণ্ডে দর্শকদের সঙ্গে নটদের সম্পর্ক পূর্ব-ইতিহাসেরই জের। বিভিন্ন ব্যবসায়ী-সমবায় (trade-guild)-এর নাট্যদল স্বভাবতই হাট ও বাজারের সঙ্গে যুক্ত থাকত, অভিনয়স্থলও ছিল হাট-বাজার বড় জোর চৌরাস্তা; অভিনেতারা নিজেরাও ছিলেন কুলেশীলে শিক্ষাদীক্ষায় জনসাধারণেরই অংশ। 'যাত্রাদলের ছোকরা' বলতে এককালে আমাদের দেশে যা বোঝাত এলিজাবেথীয় যুগে নটদের সম্পর্কে চালাও ধারণা তাই ছিল। গাঁটকাটা, ভবঘুরে, ভিখিরিদের প্রতি যে-আইন এদের প্রতিও সেই আইন প্রযোজ্য হত। সেইজন্যই উঠতি অভিনেতারা কোনো না কোনো 'বড়বাবু'র ভৃত্য বলে, পরিবারের লোক বলে, নিজেদের পরিচয় দেখাতেন, এবং এই করে আইনের হাত থেকে বাঁচতেন। এলিজাবেথের যুগে খুব দ্রুত

অভিনেতারা মাতে উঠতে থাকলেন। এর জন্য, আগেই বলেছি, রানী এলিজাবেথের কৃতিত্ব কম নয়। রানী এলিজাবেথের সবচেয়ে বড়ো কীর্তি কী, যদি এ কথা কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন আমি বিনা দ্বিধায় বলব, শেক্সপীয়র। কারণ রানী নিজস্ব নাটকের দল গঠন না করলে শেক্সপীয়রের প্রতিষ্ঠাও হত না। অবশ্য নাটক মহারানীর দয়ার দান, এ কথা বলা আমার অভিপ্রেত নয়। নট ও নাটক জনসাধারণের মধ্য থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল এবং সেই জন্ম-দাগ রেস্টরেশন বা ১৬৬০ সালে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আগে সহজে মোছে নি। নটদের পক্ষে তাই দর্শকদের প্রতি আবেদন জানানো, তাদের প্রতি লক্ষ রেখে স্বগতোক্তি করা এবং নাটকের দৃশ্য ও কথোপকথনের মধ্যেই অবলীলাক্রমে স্থানীয় ও তদানীন্তন ঘটনাবলীর উল্লেখ, পৌরাণিক প্রাচীন কাহিনীর মধ্যেই তৎকালীন বিষয়-উত্থাপন প্রভৃতি এত স্বাভাবিক ছিল। এখন ছাপার অক্ষরে আমরা যখন সেই নাটকগুলি পড়ি আমাদের কাছে ব্যাপারটি অদ্ভুতই লাগে। ম্যাকবেথ ও ডানকানের কাহিনী যত প্রাচীনই হোক না কেন, সাম্প্রতিক আয়র্ল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বা দর্শকদের পরিচিত কোনো দর্জির আত্মহত্যা বা অনুরূপ সংবাদ দ্বাররক্ষকের মুখে আমাদের শুনতে হবেই। মনে রাখা দরকার একই নাটক বিভিন্ন রুচির দর্শকরা দেখতেন। বিশেষ কোনো দর্শক বা মাননীয় অতিথির উপস্থিতি উপলক্ষে কোনো কোনো দিন হয়তো দৃশ্যবিশেষের সামান্য পরিবর্তন ঘটানো হত, হয়তো বা দু-চারটি অতিরিক্ত লাইন জুড়ে দেওয়া হত। কুশলী অভিনেতারা অভিনয়কালেই লাইন তৈরি করতে পারতেন। এমন বর্ণনাও পাওয়া যায় যে দর্শকদের অনুরোধে ও ইচ্ছা-অনুযায়ী এক নাটকের পরিবর্তে অন্য নাটক অভিনীত হয়েছে। কখনো 'টেম্বারলেন' (Tamburlaine), কখনো জু অব মাল্টা (Jew of Malta), কখনো বা প্রত্যেকটিরই অংশবিশেষ এবং তা না হলে অভিনেতৃগণ হয়তো বাধ্য হতেন তৈরি সাজপোশাক খুলে নতুন করে সাজসজ্জা করে দিনের সমাপ্তিতে হাল্কা নাটক, যেমন The Merry Milkmaids অভিনয় করতে। আর মেজাজী দর্শকদের এই দাবি মানা না হলে (And unless this were done, and the popular humour satisfied, as sometimes it so fortuned, that the players were refractory, the benches, the tiles, the laths, the stones, oranges, apples, nuts flew about most liberally, as there were

mechanics of all professions who fell everyone to his trade—Edward Gayton: 'Pleasant notes upon Don Quixote', 1654) বেঞ্চি, টালি থেকে কমলালেবু, আপেল, বাদাম সব কিছুই চতুর্দিকে ছোঁড়া হয়ে যেত; প্রত্যেকেই নিজ নিজ হাতিয়ার প্রয়োগ করত। দর্শকদের দাবি মানতে হবে। হবেই তো। অভিনেতারা যে দৃশ্যবিশেষে দর্শকদের মধ্য থেকেই উঠে আসতেন, ওদের, সস্তা টিকিটের দর্শকদের, দাঁড়াবার জায়গাটা পর্যন্ত ব্যবহার করতেন এবং জনতার দৃশ্যে এই groundlingদেরই জনতার একাংশ বলে ধরা হত। অর্থাৎ জনতার দৃশ্যে স্টেজের উপর একগাদা লোক আমদানি না করে সামনের দর্শকদের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে কথা বললেই চলে যেত। অর্থাৎ মঙ্গল-নাট্যের সেই ট্রাডিশনই সমানে চলেছে তখনও। 'যীশুর প্রলোভন' (Temptation of Jesus) নামক ইয়র্ক নাটকটি স্মরণ করুন। দানব (Devil) রাস্তা থেকে স্টেজে উঠতে উঠতে চীৎকার করে বলছে :

> পথ ছাড়ুন পথ ছাড়ুন আমায় যেতে দিন
> কারা সব এখানে, এত ভীড় কীসের ?
> এখান থেকে সটকে পড়ুন, নইলে বলছি দড়িতে ঝুলতে হবে।

কারা আর ভিড় জমাবে ? দর্শকরাই। কারণ যেখানে এই উক্তিটি করা হচ্ছে সেটি এক (wilderness) নির্জন প্রান্তরের দৃশ্য, সেখানে মাত্র তিনজন কুশীলব উপস্থিত কিন্তু তারাও দৃশ্য মাত্র, একজন যীশু, বাকি দুজন দেবদূত, সকলেই নির্বাক। 'টাউনলি'—নাটক বিচার (Judgement)-এ দেখা যায় Devil বা দানব মাঝে মাঝে নরকের প্রবেশদ্বারে যাবার সময় দর্শকদের মধ্য থেকেই দুয়েকজন বাছাই-করা শিকার ধরে নিয়ে যাচ্ছে চিবিয়ে খাবার জন্য। Coventry নাটকে অত্যাচারী Herod-এর কাছে খবর এল যে যীশু-পরিবার মিশরে পালিয়ে যাচ্ছে। তক্ষুনি হেরড্ ঘোড়া তলব করে ঘোড়া ছুটিয়ে দর্শকদের মধ্য দিয়েই সবেগে বাইরে বেরিয়ে যায়। দর্শকরা তখন সকলেই হেরডের প্রজা। পথ করে দিলেন রাজার জন্য।

এলিজাবেথীয় নাটকের একাধিক greenroom বা সাজঘর ছিল, তাদের মধ্যে একটি হচ্ছে ইতালি। হয়তো উদ্ভট শোনাবে তবু বলা যায় যে তখনকার অনেক খাঁটি ইংরেজি নাটকই আসলে ইতালীয়। সেনেকা ও ম্যাকিয়াভেলির ঋণ স্বীকার না করে এলিজাবেথীয় নাটকের উপায় নেই।

লাতিন আমলের সেনেকা এবং রেনেসাঁস যুগের ম্যাকিয়াভেলি দুজনই ইতালীয়। শেক্সপীয়রের 'জুলিয়াস সীজার' ইংরেজ না ইতালীয়? দেখুন, মৃত্যুকালীন উক্তি কখনো মিথ্যা হয় না। শেক্সপীয়রের জুলিয়াস সীজার সারাক্ষণ ইংরেজিতে কথাবার্তা বললেও মৃত্যুর মুহূর্তে বলে উঠলেন, এট্ টু ব্রুটে (Et tu Brute !)। এইভাবেই তাঁর স্বরূপটি শেক্সপীয়র প্রকাশ করে দিলেন। অধমর্ণ না হয়ে উত্তমর্ণ হওয়া যায় না, অন্তত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যায় না। এলিজাবেথীয় ইংলণ্ড ইতালীর ঋণ গ্রহণ করে করে—পেত্রার্কা, বোকাচ্চিয়োর কথা স্মরণ করুন—ঋণে জর্জরিত হয়ে তবেই ধনী। ইতালীয় রেনেসাঁস চুরি করে ইংলণ্ডের রেনেসাঁস এমনই মঞ্চসাফল্য লাভ করল যে ইতালিকেও ছাড়িয়ে গেল। এটিই নিয়ম। ইতালিকে বর্জন করলে ইংলণ্ডে চসার বা শেক্সপীয়র হতেন না, যেমন ইংরেজিকে বর্জন করলে ভারতবর্ষে মধুসূদন বা রবীন্দ্রনাথ হতেন না। যে দেশ, জাতি বা ভাষাগোষ্ঠী নিজের গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে আনে, সে বড় হতে পারে না। যে নিতে পারে না, সে দিতেও পারে না।

নাটকের মূল কথা হচ্ছে ঘটনা ও সংঘাত। জাতীয় জীবনে যখন একের পর এক ঘটনা ঘটে, একটির পর একটি সংঘাত সৃষ্টি হয় তখনই জাতীয় নাটকের আবির্ভাব ঘটে। যেমন ঘটেছিল অ্যাথেন্সে, রোমে, লণ্ডনে। কর্ম বা action-এর মধ্য দিয়ে নাটকের আবেগ ও রস প্রকাশিত হয়। জ্ঞানকাণ্ড যদি হয় য়ুরোপের হিউম্যানিজম, তবে কর্মকাণ্ড হচ্ছে রেনেসাঁস ও শিল্পে রেনেসাঁস রঙ্গমঞ্চ। এই কর্মের উন্মাদনায় ইংলণ্ড ম্যাকিয়াভেলি ও সেনেকাকে বরণ করে নিয়েছিল। ম্যাকিয়াভেলি কেন, কী অর্থে 'প্রিন্স' রচনা করেছিলেন তা কেউ মনে রাখে নি, তার গ্রন্থ থেকে শুধু চাণক্য-কূটনীতিরই সমর্থন খুঁজেছে, যেন ম্যাকিয়াভেলি নব্য য়ুরোপে ছল-বল-কৌশলের সংহিতাকার মাত্র। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের লাতিন লেখক সেনেকাকেও তেমনি লোকে সহজেই ভুল বুঝেছে। তিনি কী জন্য, কী অর্থে তাঁর নাটকগুলি রচনা করেছিলেন তা কেউ মনে রাখা দরকার বোধ করে নি। দাহ্যমান রোম নগরীর বেহালাবাদক রাজা নীরোর শিক্ষক ছিলেন সেনেকা; এই পরিচয়ই যথেষ্ট। কয়েক ডজন নিষ্ঠুর রক্তাক্ত নাটক তিনি লিখবেন না তো কে লিখবে? তাঁর নাটকের অনুবাদ পড়ে এলিজাবেথীয় উৎসাহীরা ভয়াবহ খুনখারাপিকে জয়ধ্বনি দিয়েছিল; কারণ রক্তপাত ও রক্তমোক্ষণ তো

এলিজাবেথের রাজত্বেও কম হয় নি। অতএব সহজেই, খুব সহজেই সেনেকা-নাটকের আদর্শে ইংলণ্ডে নাটক রচনার প্রচেষ্টা ফলবতী হয়েছিল। সেনেকার নাটকে রক্তপাত ছিল, নরহত্যা ছিল—এই নাটকগুলি যে মঞ্চের জন্ত আদৌ লেখা হয় নি তা এলিজাবেথীয়রা কখনো মনে স্থান দেয় নি—কিন্তু এই সব নৃশংসতার পশ্চাতে কোনো অবলম্বনীয় দর্শন বা দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না। সেই দৃষ্টি পাওয়া গেল ম্যাকিয়াভেলির কাছ থেকে। শাসকের নীতি শাসিতের নীতি থেকে পৃথক, এই ধারণা থেকে 'নীতি' ব্যাপারটারই ভিত্তিভূমি টলে গেল, virtue হয়ে উঠল তুচ্ছ জিনিস, a fig! ষড়যন্ত্র, সন্ত্রাস ও গুপ্তহত্যার বাস্তব আবহাওয়ায় সেনেকার কল্পিত ঘটনাবলী স্বাদনীয় হয়ে উঠল। অর্থাৎ এলিজাবেথীয় মানসে সফোক্লিস নয়, সেনেকাই হয়ে দাঁড়াল ট্রাজেডির আদর্শ। রানী এলিজাবেথ সিংহাসনে বসার অব্যবহিত পরে ১৫৫৯ থেকে ১৫৬৬ সালের মধ্যে পাঁচজন অনুবাদক সেনেকার বিভিন্ন নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করলেন এবং ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সমগ্র রচনার অনুবাদ প্রকাশিত হল। ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ন্যাশ গ্রীন রচিত 'মেনাফন'-এর ভূমিকায় লিখছেন: "রাত জেগে মোমবাতির আলোয় সেনেকার ইংরেজি অনুবাদ পড়ে ইংরেজ লেখকরা অনেক ভালো ভালো উদ্ধৃতিযোগ্য কথা শিখছেন।" কিন্তু সেনেকার সম্পূর্ণ অনুবাদের জন্ত অপেক্ষা না করেই ইতিমধ্যে ইংরেজিতে সেনেকার ঢঙে নাটক রচনা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। সেনেকা-প্রভাবের প্রথম ফলশ্রুতি হচ্ছে 'গরবোডাক' নামক নাটক। ফিলিপ সীডনির মতো বিদগ্ধ সমালোচকও তখন স্বীকার করেছিলেন যে এতে ("stately speeches and well-sounding phrases, climbing to the height of Seneca his style") গুরুগম্ভীর উক্তি ও বাংকৃত বাগ্‌বৈভব সেনেকার রচনাশৈলীর সমপর্যায়ে উন্নীত।

কিন্তু বাইরের প্রভাব দিয়ে এলিজাবেথীয় নাটককে ব্যাখ্যা করা যাবে না। গ্রীক পুরাণে আন্তায়ুসের একটি কাহিনী আছে। আন্তায়ুসের সঙ্গে বিখ্যাত শক্তিধর হেরাক্লেসের লড়াই হয়েছিল। হেরাক্লেস যতবারই আন্তায়ুসকে আধমরা করে মাটিতে ছুঁড়ে দেন, ততবারই সে পুনর্বলীয়ান হয়ে গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠে। মাতা বসুমতী তার জীবনধাত্রী, তাই মাটির স্পর্শ পেলেই সে আবার উজ্জীবিত, উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। এলিজাবেথীয় নাটকের বেলাতেও তাই। বাইরের যত প্রভাবই পড়ুক না কেন, দেশের মাটির ও মানুষের স্পর্শই তার জীবনরসায়ন। এলিজাবেথীয় নাটকের মূল শক্তি এই

মাটির সঙ্গে সংযোগ। একদিকে যেমন মুক্ত স্বচ্ছন্দ দৃষ্টি, আহরণে আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে তেমনি অন্ধ-অনুকরণে অনীহা, ক্লাসিক বা ধ্রুপদী অনুশাসনের চেয়ে দেশী বৈচিত্র্য ও মিশ্ররসের প্রতি স্বাভাবিক প্রীতি, ভিতর ও বাইরের এই টানা-পোড়েনের মধ্য দিয়ে এলিজাবেথীয় নাটক স্বকীয় বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেয়েছে। ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনে তখন এক দুর্বার আবেগের সঞ্চার হয়েছে। রানী এলিজাবেথের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎসাহে তখন ইংরেজ নাবিক ও জলদস্যুগণ সমুদ্র ও সসাগরা পৃথিবীকেই লুণ্ঠনের প্রয়াসী; সমুদ্রের স্বর ও তরঙ্গভঙ্গ ইংলণ্ডের হৃদয়-উপকূলে আছাড় খেয়ে পড়েছে, ফ্রবিশার ড্রেক, র‍্যালে ও হ্বাকলুটের কাহিনী তখন মুখে মুখে। স্পেনীয় আরমাডার (১৫৮৮) চূড়ান্ত পরাজয় ইংরেজ জাতিকে দিয়েছে আত্মবিশ্বাস ও মর্যাদা। সম্রাট আকবর যেমন হিন্দু ও মুসলমানের সহ-অবস্থানের উপর এক পরাক্রান্ত শাসন গড়ে তুলেছিলেন, রানী প্রথম এলিজাবেথও তেমনি ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্টদের সুষমসম্মতিতে এক পরাক্রান্ত ইংলণ্ড তৈরি করেছিলেন। এলিজাবেথ শুধু নারী বা রানী নন, তিনি হয়ে উঠেছিলেন জীবন্ত ইংলণ্ড—স্পেনসারের Faerie Queene কাব্যের মধ্যমণি, লিলির 'এনডিমিয়ন' নাটকের সুদূরের পিয়াসা। জাতীয় চেতনা বা স্বদেশীয়ানার উদ্ভব, স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা এবং রানী এলিজাবেথের স্নেহচ্ছায়া ও নাট্যানুরাগ এই তিনের সমবায়ে এলিজাবেথীয় নাটক অচিরেই গৌরবশীর্ষে সমাসীন হতে পেরেছিল। শুধু শেক্সপীয়র নন, মার্লো, কিড, লিলি, পীল, গ্রীন প্রত্যেকেই এলিজাবেথীয় ইংলণ্ডের সূত্রধার। যেমন বলা হয়, সব পথই রোমে গিয়ে পৌঁছেছে তেমনি বলতে পারি এলিজাবেথীয় যুগের শেক্সপীয়র-পূর্ব নাটকগুলি সবই শেক্সপীয়রে গিয়ে পৌঁছেছে। দেবতাদের সব চেষ্টা ও তপস্যা যেমন একদা ছিল কুমারসম্ভবের জন্য, শেক্সপীয়র-সম্ভবের জন্য তেমনি নাট্য-তপস্যা করেছিলেন মার্লো, কিড প্রভৃতি নাট্যকারগণ। শেক্সপীয়র নাটকের আবেগ, ভাষা, মঞ্চজ্ঞান, প্লটের জটিলতা, মনস্তাত্ত্বিক চরিত্র, গান, বাচনকুশলতা বা wit এ সবেরই পূর্বপ্রস্তুতি রয়েছে শেক্সপীয়রের সমসাময়িক ও পূর্বসূরী অন্য নাট্যকারদের মধ্যে। যেন এই সমকালীন ও পূর্বসূরীদের অসমাপ্ত ইচ্ছা ও চেষ্টা শেক্সপীয়রের মধ্যে এসে সম্পূর্ণ হয়েছে।

নাটক ও রঙ্গমঞ্চের বিরুদ্ধে পিউরিটানদের নালিশ ক্রমশই পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। 'নাটক থাকবে কি যাবে'—এই প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা করেছিলেন

মার্লো ১৫৮৭ সালে, তাঁর 'টেম্বারলেন দি গ্রেট'-এর প্রথম খণ্ড মঞ্চস্থ করে। দিগ্বিজয়ীর স্বর কণ্ঠে ধারণ করে মার্লো তাঁর বিখ্যাত মুখবন্ধে ঘোষণা করলেন :

From jigging veins of rhyming mother-wits
And such conceits as clownage keeps in pay
We'll lead you to the stately tent of war
There you shall hear the Scythian Tamburlaine,
Thundering the word with high astounding terms,
And scourging kingdoms with his conquering swords.

শুধু বক্তব্যে নয়, বাচনভঙ্গিতেও যে তিনি পূর্বসূরীদের থেকে পৃথক এইটিই খুব স্পষ্ট হয়ে উঠল। এলিজাবেথীয় নবনাট্যের প্রথম সোচ্চার সাহসী প্রবক্তা মার্লো তাঁর তৈমুর বা Tamburlaine-কে এক 'কলোসাস' বা সুবৃহৎ মূর্তির মতো তুলে ধরলেন, মধ্যবিংশ শতকের মানুষ যেমন করে মহাকাশে স্পুৎনিক তুলে ধরেছে। মার্লো অমিত্রাক্ষর ছন্দ শুধু ব্যবহারই করলেন না, সেই অমিত্রাক্ষরকে নাটকের প্রয়োজনে বৈচিত্র্যময়ও করলেন। 'গরবোডাক' নাটকের আড়ষ্টতার পরিবর্তে মার্লোর উদাত্ত পংক্তিগুলি কানের ভিতর দিয়ে এলিজাবেথীয় মর্মকে স্পর্শ করল। কী করে সিথিয়ার সামান্য মেষপালক আপন বাহুবলে সমগ্র প্রাচ্যদেশের বিজেতা হয়ে উঠল তা এক চমকপ্রদ কাহিনী। যে অনন্তসম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছিল রেনেসাঁস, তারই জীবন্ত মূর্তি হয়ে দেখা দিল মার্লোর টেম্বারলেন। এলিজাবেথীয় রঙ্গমঞ্চে তার প্রতিষ্ঠা এশিয়ার উপর বিজয়ী তৈমুরের আত্মপ্রতিষ্ঠার মতোই ঐতিহাসিক। অহংকার, আত্মবিশ্বাস ও কাব্য দিয়ে তৈরি এই কালাপাহাড় চরিত্রটি ইংলণ্ডকে চমকে দেবার জন্য প্রয়োজন ছিল। এ-রকম বলদৃপ্ত উক্তি ইংলণ্ডে কেন য়ুরোপে অন্য কোথাও এর আগে শোনা যায় নি :

And we will triumph over all the world :
I hold the fates bound fast in iron chains ;
And with my hand turn fortune's wheel about,
And sooner shall the sun fall from his sphere
Than Tamburlaine be slain or overcome.

মার্লো তাঁর নিজের মনের আবেগ ও প্রেরণায় মণ্ডিত করেছেন টেম্বারলেনকে। মুমূর্ষু শত্রুর কানের কাছে বিজয়ী সিথিয়ানের উক্তি অবিশ্রান্ত। কিন্তু

Still climbing after knowledge infinite

And always moving as the restless spheres.

এই আশ্চর্য উন্মাদক পংক্তিগুলির আবেদন তদানীন্তন ইংলণ্ডের কাছে অপ্রতিরোধ্য। যেন এক প্রবল ইচ্ছাশক্তির বিস্ফোরণ মার্লোর এই চরিত্রটি। মার্লো টেম্বারলেনকে ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজস্ব রেনেসাঁস-আকাঙ্খার মধ্যে স্থাপন করেছেন। বন্দিনী মিশরকন্যা জেনোক্রেটকে রানী করেই টেম্বারলেন ক্ষান্ত নয়, তার রূপকল্পনাতেও সে মুখর; জেনোক্রেট তার কাছে "lovelier than the love of Jove!" মার্লোর শ্রেষ্ঠ নাটকের কাহিনী 'Dr. Faustus' এক বহু পরিচিত জার্মান কিংবদন্তী থেকে গৃহীত। উনবিংশ শতকে গ্যয়টে (Goethe) এই কিংবদন্তী অবলম্বন করেই তাঁর অমর কাব্য Faust রচনা করেছিলেন। ফস্টাস শক্তি চায়, ক্ষমতা চায়। যেহেতু জ্ঞানই শক্তির আধার, তাই নিষিদ্ধ জ্ঞানের অন্বেষণে Faustus নিজের আত্মাকে শয়তানের কাছে বিক্রি করে দিয়ে চরম আত্মিক বিনষ্টিকে বরণ করতে উদ্যত। এই জ্ঞান-তৃষ্ণা রেনেসাঁস যুগের জ্ঞানপিপাসার মূর্ত প্রকাশ। স্বর্গ বা নরক যে মানুষের মনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত এই নতুন কথা ফস্টাস মেফিস্টোফিলিসের কাছ থেকেই শুনছে। Faustus মেফিস্টোফিলিসকে 'কোথায় তুমি চরম শাস্তি ভোগ করছ ?' জিজ্ঞাসা করছে :

মেফি : নরকে।

ফ : কী করে সম্ভব যে তুমি এখন এখানে, নরকের বাইরে ?

মেফি : কেন এই তো নরক, আমি এখন নরকের বাইরে কে বলল ?
তোমার কি মনে হয়, আমি যে কিনা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছি
স্বর্গের অনন্ত সুখের স্বাদ পেয়েছি
এখন কি সহস্র নরকের মধ্যে কষ্ট পাই না, যন্ত্রণা পাই না,
যখন চিরন্তন শান্তি ও সুখ থেকে আমি বঞ্চিত ?

মেফিস্টোফিলিসের এই মনোকষ্ট Faustus-কে বিচলিত করে না। সে জ্ঞান চায়, ক্ষমতা চায়, আত্মা চায় না। চব্বিশ বৎসর মেয়াদী এক চুক্তির বদলে সে তার আত্মাকে চিরদিনের জন্ত মেফিস্টোফিলিসের কাছে বিক্রি করে দেয়। অন্ধকারের কাছে, শয়তানের কাছে আত্মসমর্পণ করার আগে সু এবং

বু দুইই তাকে জয় করবার চেষ্টা করেছে। তারপর জীবনের শেষ ঘণ্টা যখন আসন্ন তখন Dr. Faustus-এর যে-অভিজ্ঞতা স্বগতোক্তির মধ্যে মার্লো ফুটিয়ে তুলেছেন তা অপূর্ব। ধাপে ধাপে ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে সেই চরম মুহূর্তটি ঘনিয়ে আসে। তার চারিধারে ঘিরে আসে নরকের বীভৎস অন্ধকার। মধ্যরাত্রির শেষ ঘণ্টা বাজবার মুহূর্তে শয়তানের চর আসে ফস্টাসকে নিতে। আর্তি ও প্রার্থনায় তার ভাঙা-ভাঙা কণ্ঠে এক বিদীর্ণ আত্মার ট্রাজেডি ফুটে ওঠে :

> ঈশ্বর। ঈশ্বর। অমন তীব্র ভয়ংকর দৃষ্টি আমার প্রতি হেনো না,
> বিষধর সরীসৃপ, সর্প, আমাকে একটু নিঃশ্বাস নিতে দাও!
> বীভৎস নরক, তোমার বিরাট মুখ বন্ধ কর, শয়তান তুমি এস না!
> আমার গ্রন্থ সব আগুনে দেব। আঃ মেফিস্টোফিলিস।

মার্লো শক্তির সাধক, অনন্ত আকাঙ্ক্ষার কবি তিনি ; বাইরে ও ভিতরে শক্তিমান হবার সাধনায় তিনি বিভোর।

'টেম্বারলেন' ছাড়া শেক্সপীয়র-পূর্ব যুগে টমাস কীডের 'স্প্যানিশ ট্রাজেডি'র মতো এত খ্যাতি আর কোনো নাটকই লাভ করে নি। প্রতিহিংসা, পাগলামি ও সেনেকা-নাটকের প্রেতমূর্তি কীড তাঁর নাটকে এমনভাবে প্রয়োগ করেছেন যে নাটকের মঞ্চসাফল্য অবধারিত হয়েছে। হিয়েরোনিমোর উদ্যানে তাঁর পুত্র হোরেশিওর প্রেয়সী বেল-ইম্‌-পিরিয়ার চোখের সামনে বেল্‌-ইম্‌-পিরিয়ার ভ্রাতা লোরেঞ্জো কর্তৃক নিহত হল। বেল্‌-ইম্‌-পিরিয়ার ভীত চিৎকারে মার্শাল হায়ারিনিমোর নিদ্রাভঙ্গ হল, তিনি ছুটে এলেন, দেখলেন তাঁর প্রিয়পুত্র হোরেশিও নিহত ; তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন আততায়ী যে-ই হোক তিনি প্রতিহিংসা গ্রহণ করবেন। নানা ঘটনাবর্তের পর নাটকের মধ্যে আরেক নাটকের আয়োজন হল, আর সেই নকল নাটকের অভিনয়ের মধ্যেই নিহত হল প্রায় সকলে এবং মৃতের স্তূপের মধ্যে প্রতিহিংসা সম্পূর্ণ হল। টি. এস. এলিয়ট তাঁর ওয়েস্ট ল্যাণ্ড কাব্যে স্প্যানিশ ট্রাজেডির হায়ারিনিমোর পাগলামির দৃশ্যের উল্লেখ করেছেন, যেমন তিনি উল্লেখ করেছেন হ্যামলেটের। Kyd-ই প্রথম ইংরেজিতে হ্যামলেট কাহিনীকে নাটকায়িত করেছেন কিনা সে-বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকতে পারে, কিন্তু ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মার্লোর স্প্যানিশ ট্রাজেডি রচিত না হলে শেক্সপীয়রের হ্যামলেট রচিত হত কিনা বলা কঠিন। মার্লো নিছক আবেগের রকেট ছুঁড়ে তাক লাগিয়ে দিতে পারতেন

এবং তাতে বাজিমাৎ করা যেত। কিন্তু কীডের ধারা ছিল স্বতন্ত্র। তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে জলদমন্দ্রে উচ্চারিত অমিত্রাক্ষর জলপ্রপাতের মতো অজস্র ধারায় বর্ষণ করতে পারতেন না, যেমন পারতেন মার্লো। কীডের মঞ্চবোধ এবং মঞ্চকুশলতা ছিল অসাধারণ। মার্লোর চরিত্রগুলি একরোখা ও একরঙা, জটিলতা সেখানে প্রায় অনুপস্থিত। কিন্তু কীড নাটকের চরিত্রে ও প্লটে অনেক সূক্ষ্ম জটিলতা প্রবর্তন করলেন এবং বলা যায় মনস্তত্ত্বমূলক ইংরেজি নাটক রচনায় প্রথম সিদ্ধি কীডের।

ট্রাজেডির দিক থেকে যেমন কীড শেক্সপীয়রের পূর্বপ্রস্তুতি, কমেডির দিক থেকে তেমনি লিলি। ১৫৭৯ সালে তাঁর গদ্যরোমান্স Euphues প্রকাশিত হয়। কাহিনী স্বল্প কিন্তু বন্ধুত্ব, প্রেম ও আরো নানা ইতি ও নীতি কথার খৈ ফুটিয়েছেন লিলি। সবচেয়ে চমকপ্রদ হচ্ছে তাঁর স্টাইল। গ্রীক রোমান পৌরাণিক কাহিনী ও ইতিহাসের ক্রমাগত উল্লেখ, বিদেশী সাহিত্য থেকে কারণে অকারণে উদ্ধৃতি তাঁর শৈলীর বৈশিষ্ট্য। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তার বাক্যগঠনের বিশেষ ভঙ্গি, যাকে বলে ব্যালান্সিং অর্থাৎ প্রত্যেকটি বাক্য, প্রত্যেকটি তুলনা উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের উপমান ও উপমেয়ের দিকে যাতে সমান ভারি হয় সেদিকে লিলি ভয়ানক হিসেবী। গানের তালমানের মতো লিলির রচনাও যেন একটি নির্দিষ্ট তালমানের ক্রম বজায় রেখে ঢেউয়ের মতো পর্বে পর্বে এগিয়ে চলে। শ্রুতিমধুর সন্দেহ নেই, কিন্তু বড্ড বেশি শ্রুতিমধুর। অকারণে শ্রুতিমধুর, বড্ড সুরেলা, বড্ড অস্বাভাবিক। লিলি গদ্যরোমান্সে হাত পাকিয়ে যখন নাটক লেখা ধরলেন তখন তাঁর এই মধুর পরিপাটি বাক্যের মুদ্রাদোষটিও সঙ্গে নিয়ে এলেন। লিলির এই ভাষা Euphuism নিয়ে তখনকার দিনেও হাসাহাসি হয়েছে, সমালোচনা হয়েছে, কিন্তু এ কথাও ঠিক যে সে-সময়ে খুব কমই সাহিত্যিক সজ্জন ছিলেন যাঁরা লিলির ইউফিউইজমে আচ্ছন্ন হন নি। নাটকে গদ্যরীতি ও কথোপকথনের ভাষার প্রয়োগ সিদ্ধ করে লিলি শেক্সপীয়রের রোমান্টিক কমেডির পথ পরিষ্কার করলেন। তাঁর ছ'টি কমেডি ('The Woman in the Moon', 'Campaspe', 'Sapho & Pao', 'Endimion', 'Gallathia' ও 'Midas') রানী এলিজাবেথের সামনে অভিনীত হয়েছিল। কমেডির নামগুলি থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে বিষয়গুলি সবই গ্রীক পুরাণ থেকে নেওয়া। ঘটনাসংঘাত এসব নাটকে অনুপস্থিত। 'এন্ডিমিয়ন' নাটকের অন্তরালের নায়ক-নায়িকা হচ্ছেন লিস্টার

ও রানী এলিজাবেথ এবং এই নাটকের একটি বিশেষ ব্যাপার হচ্ছে এলিজাবেথ-প্রশস্তি। এন্ডিমিয়ন চন্দ্রদেবী সিন্থিয়ার প্রতি আসক্ত এবং ধরিত্রী টেলাসের প্রতি উদাসীন এই দিয়ে কাহিনীর শুরু। এই নাটকের চরিত্রগুলি যেন এক জ্যোৎস্নালোকিত অস্পষ্ট জগতের অধিবাসী ; তারা যেন স্বপ্নের ভাষায় কথা বলে, গান গায়, প্রেমনিবেদন করে। অবাস্তব, রহস্যাচ্ছন্ন, মুগ্ধ, নিদ্রিতপ্রায় এই রক্তমাংসবর্জিত আইডিয়াগুলি দর্শকের চোখের সামনে আসে যায়, কিন্তু দাগ কাটে না। অথচ এই অশরীরী শরীরীরা প্রত্যেকেই আশ্চর্য বাকপটু। যেন প্রত্যেকেই সাহিত্যিক, প্রত্যেকেই লিলি, প্রত্যেকেরই মুদ্রাদোষ 'ইউফিউইজম'। এই সব বাকসিদ্ধ ছায়া-চরিত্রেরা কথার পৃষ্ঠে কথা সাজিয়ে শিক্ষিত এলিজাবেথীয় নাগরিকদের যে-আনন্দ দিয়েছিল, মোহ জুগিয়েছিল তা ঠিক নাটকোচিত নয় ; কিন্তু পরবর্তী শেক্সপীয়রীয় নাটকের জন্যও তার প্রয়োজন ছিল। কারণ কমেডির প্রধান অবলম্বন হচ্ছে বাক-চাতুরি। শেক্সপীয়র, শেরিডান, শ' সকলেই তাঁদের চাতুরির জন্য আদি চতুর লিলির কাছেই ঋণী। শেক্সপীয়র লিলির এই বাগ্‌ভঙ্গিকে প্যারডি করেছেন যদিও তিনি নিজেই এই রীতিকে আরো মার্জিত করে, নাট্য-গুণান্বিত করে সার্থক প্রয়োগও করেছেন। Falstaff Prince Hal-কে বলছে : (1 Hes IV. II. 4)

> "Harry, I do not only marvel where thou spendest thy time but also how thou art accompanid for though the camomile, the more it is trodden on, the faster it grows, yet youth, the more it is wasted, the sooner it wears······ For, Harry, now do I not speak to thee in drink, but in tears, not in pleasure, but in passion ; not in words only, but in woes also."

এখানে ইউফিউইজমের প্রতি বিদ্রূপ স্পষ্ট, কিন্তু ব্রুটাসের বক্তৃতায় এই ইউফিউইজমই সুন্দরভাবে প্রযুক্ত হয়েছে, যেখানে ব্রুটাস বলছেন :

> 'As Caesar loved me, I weep for him ; as he was fortunate, I rejoice at it ; as he was valiant, I honour him, but as he was ambitious, I slew him. There is tears for his love ; joy for his fortune ; honour for his valour ; and death for his ambition.'

দ্বিতীয় এলিজাবেথের ইংলণ্ড যেমন কোনো কালেই আর প্রথম এলিজাবেথের যুগে ফিরে যেতে পারে না, আমরা নাট্যামোদীরাও সম্ভবত আর কোনোদিনই এলিজাবেথীয় বা অনুরূপ এক যুগে ফিরে যেতে পারব না। জানি না পারমাণবিক বিস্ফোরণ বা বিস্ফোরণ-ভীতি মানুষকে ক্রমশ কোন দিকে ঠেলে দেবে—কল্পনার দিকে, না কল্পনার বিপরীত দিকে। কারণ এলিজাবেথীয় নাটকের প্রধান উপাদান প্লটও নয়, চরিত্রও নয়, মঞ্চও নয়, অভিনেতাও নয়, প্রধানতম উপাদান কল্পনা। এলিজাবেথীয় দর্শকেরা সকলেই জ্ঞানবান বা বুদ্ধিমান ছিলেন না, কিন্তু সকলেই হৃদয়বান ছিলেন, নাট্যকার তাদের কল্পনাশক্তির উপর নির্ভর করতে পারতেন। তারা পণ্ডিত সমালোচকদের মতো অত অসহিষ্ণু বা ছিদ্রান্বেষী ছিলেন না, তাঁরা ত্রুটি মার্জনা করতে জানতেন, রচনার শূন্যস্থান কল্পনায় পূর্ণ করে নিতেন। মঞ্চসজ্জা, আলোকসজ্জা, দৃশ্যপট ইত্যাদির জন্য খুব বেশি মাথাব্যথা ছিল না। টবের মধ্যে একটা গাছের ডাল রাখলেই অরণ্য হত, Forest of Arden বোঝা যেত, একটি মশাল পরে জ্বলে উঠলে গ্রীষ্মের রৌদ্রদীপ্ত দুপুরেও বুঝতে অসুবিধা হত না যে কোনো এক গুহার অন্ধকারের মধ্যে আমরা নিক্ষিপ্ত। পরিবর্তন-যোগ্য কোনো দৃশ্যপট ছিল না, কাজেই দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর যেমন খুশি, যতোবার খুশি করা যেত। শুধু কয়েকটি কথা দিয়ে বলে দিতে হত আমরা এখন কোথায়—এই যে বিস্তৃত প্রান্তর, অথবা এই যে দেখছ অ্যাথেন্সের রাজপথ ইত্যাদি। এগুলি কাব্য দিয়ে করা হত। কাব্য ও কল্পনা দিয়েই মঞ্চ সজ্জিত হত, আর কিছুর দরকার হত না। এখন আমাদের সব কিছু আছে, এবং আরো অনেক কিছু আছে, নেই কাব্য নেই কল্পনা। কেন শেক্সপীয়রকে কবি বলা হয়, কেন নাট্যকারকে কবিও হতে হত তা এখন আমরা বুঝতে পারি না।

এলিজাবেথীয় নাটক সবই শেক্সপীয়রের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে, সম্পন্ন হয়েছে। শেক্সপীয়র যেন এলিজাবেথ যুগের তিলোত্তমা শিল্পী। সকলের কাছেই তিনি ঋণী অথচ সকলের চেয়ে তিনি ধনী। 'ব্যাঙ্কসাইড' বা 'শোরডিচে' এলিজাবেথীয় যুগের প্রথম প্রেক্ষালয়গুলি 'থিয়েটার', রোজ, গ্লোব, ফরচুন, সোয়ান এগুলিই তার প্রকৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, লেকচার হল ও লেবরেটরি। রুশ ঔপন্যাসিক ম্যাক্সিম গোর্কী তাঁর আত্মজীবনীর প্রথম অংশের নামকরণ করেছিলেন 'আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলি।' গোর্কী কখনও

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন নি, কিন্তু জীবনের যে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাঁর প্রথম জীবন কেটেছিল, সেই অভিজ্ঞতাগুলিই তাঁর প্রকৃত শিক্ষক কাজেই সেই অভিজ্ঞতার দিনগুলিকে তিনি বলেছেন 'বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলি'। শেক্সপীয়রের বিশ্ববিদ্যালয়ও অনুরূপ অর্থে জীবন ও রঙ্গমঞ্চের অভিজ্ঞতা। গ্রীন নিজে নাট্যকার ছিলেন, তিনি ঈর্ষায় ও বিদ্বেষে শেক্সপীয়রকে "an upstart crow" উড়ে এসে জুড়ে বসা কাক বলে গালি দিয়েছিলেন। কিন্তু শেক্সপীয়র উড়েও আসেন নি জুড়েও বসেন নি, তিনি এক লাফে শেক্সপীয়র হন নি, গ্রীনের কাছ থেকেও শিখেছেন এবং সেই শিক্ষা সহস্রগুণ ফিরিয়ে দিয়েছেন বিশ্বের কাছে। 'পঞ্চম হেনরী' নাটকে যেমন তিনি বলেছেন :

There is some soul of goodness in things evil
Would men observingly distil it out.

তাঁর পূর্বসূরীদের রচনায় যা কিছু দোষ ত্রুটি অসম্পূর্ণতা থাকুক না কেন, তিনি তাদের মধ্যে যেটুকু সারবস্তু যেটুকু সার্থক তাই গ্রহণ করেছেন এবং তাকে বহুগুণিত করেছেন। শেক্সপীয়র সম্বন্ধে সারা পৃথিবী জুড়ে গত এক বৎসর এবং তার আগে চারশত বৎসর অনেক আলোচনা হয়েছে এবং পরেও আরো হবে। আজ বরং শেক্সপীয়রকে আমরা একটু বিশ্রাম দিই। প্রশংসা ও স্তুতির ফুলের মালা থেকে তাঁর কণ্ঠ একটু হাল্কা হোক। আমি বরং আমার প্রথম কথাতেই ফিরে যাই। ষোড়শ শতকের শেষপাদে দুজন ইংলণ্ডকে শাসন করেছেন, একজন এলিজাবেথ আরেকজন শেক্সপীয়র; অবশ্য দুজন দু' ভাবে শাসন করেছেন জনগণমনকে। প্রথমজনের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল বাণিজ্যদূত মারফত, মোগল দরবারে, আমরা তার জন্য সুযোগ-সুবিধাও করে দিয়েছিলাম, আর সেই সুযোগ-সুবিধার ফলেই পরবর্তীকালে অষ্টাদশ শতকে ইংলণ্ড কর্তৃক ভারতবিজয় সম্ভব হয়েছিল। দুঃখের বিষয় দ্বিতীয়জনের সঙ্গে আমাদের দেখা অনেক বিলম্বে ঘটেছে, ভারতবিজয়ের পরে, তখন আমরা নিজেরাই এত দীন, এত দরিদ্র যে কোনো রাজকীয় অভ্যর্থনার কোনো বিশেষ সুযোগ-সুবিধা এমন কি হৃদয়ের দানও পরিপূর্ণভাবে দিতে পারি নি। যদি শেক্সপীয়রের সঙ্গে মোগল সম্রাটের কোনো পরিচয় ঘটত, যদি এমন কোনো গুণী দোভাষী তাঁর বিচিত্র নাটকের সামান্য একটু অংশও ভারতবর্ষে যমুনার তীরে প্রোথিত করতে পারতেন তবে সেই বিষবৃক্ষের ফল খেয়ে ভারতবর্ষ নতুন এক নাট্যজ্ঞানে জ্ঞানী হতে পারতো। তা যদি হত তবে ঔরঙ্গজেবের ধর্মান্ধ

অনুশাসন, ভ্রূকুটি বা জিজিয়া করের ভয়েও নাটুকে লোকগুলি—হিন্দু-মুসলমান মিলিত নাট্যামোদীরা, বিচ্ছিন্ন বিদ্বিষ্ট বিভক্ত হতে পারত না। মোগল যুগের মোগল দরবারের মোগল ভারতবর্ষের চেহারা ও রুচি বদলে যেত, ভারতবর্ষের ঐক্যের জন্য হাহাকার করতে হত না। সেদিনকার নাটকের অভাব থেকে আজ আমরা হয়তো কোনো শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। এলিজাবেথীয় নাটকের মতো নব্য ভারতের জাতীয় নাটকের প্রতিষ্ঠা করে আমরা ভারতে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, ভারতীয় শেক্সপীয়রের জন্মকে সম্ভব করে তুলতে পারি।
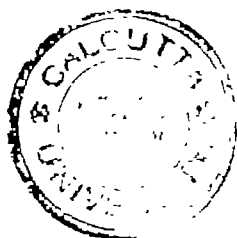
* বিগত ১১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৫ তারিখে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত 'এক্সটেনশন লেকচার' বা অতিরিক্ত বক্তৃতার সারাংশ।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

প্রদর্শনী

আমি প্রতাপচাঁদ। অনেকেই চেনেন আমাকে, অনেকে আবার চেনেনও না। প্রসঙ্গত বলে রাখি আমি সেই প্রতাপচাঁদ যে ছবি আঁকে এবং এবার কলকাতায় যার দ্বিতীয় চিত্রপ্রদর্শনীটি প্রচণ্ড অশ্লীল এবং দুর্বোধ্য বলে এখানকার কলা-সমালোচকদের ভর্ৎসনা লাভ করেছে। পরিচয়সূত্রে বলে রাখি যে যদিও আমি বাঙালি তবু বস্তুত আমি এখন দিল্লীর লোক। আমার নামের শেষে কোনো উপাধি আমি ব্যবহার করি না গত দশ বছর প্রায়। নাম থেকে আমি যে ভারতীয় তা স্পষ্টই ধরা যায়, কিন্তু কোন প্রদেশের লোক তা বোঝা যায় না, বিশেষত 'চাঁদ' কথাটা ইংরেজিতে লিখলে 'চন্দ্' পড়বারই বেশি সম্ভাবনা, ফলে ব্যাপারটা আরো গোলমেলে হয়ে যায় ঐখানে। ওটুকু আমার সতর্ক কৌশল। অবশ্য এইভাবে বেশিক্ষণ আত্মগোপন করা চলে না, বস্তুত আত্মগোপন করা আমার উদ্দেশ্যও নয়। এই সব ছোটোখাটো ব্যাপারে একটু রহস্য রেখে দিতে আমার মন্দ লাগে না। নচেৎ নিজেকে সর্বভারতীয় বলে প্রচার করবার কোনো মহৎ উদ্দেশ্যও আমার নেই। আমার প্রদর্শনীর স্যুভেনিরে আমার ছাপা ফটোর নীচে এই কটি কথা উল্লেখ করা আছে—Pratapchand. Born 1936. ব্যস্। কোথায় জন্মেছি, কোথায় কার কাছে ছবি আঁকা শিখেছি বা কোন ভাষায় কথা বলি তার উল্লেখও নেই। এই পরিচয়টুকুর নীচে অবশ্য এক বিখ্যাত কলা-সমালোচকের দেড়টি পংক্তি ছাপা আছে, অনেকটা এরকম 'এই লোকটি, যার নাম প্রতাপচাঁদ সে ছবি আঁকে। কেমন আঁকে তা আপনারা বলবেন।' বলে রাখা ভাল যে এ অংশটুকুও আমারই লিখে দেওয়া, বিখ্যাত কলা-সমালোচক শুধু এতে আপত্তিকর কিছু নেই দেখে সই করে দিয়েছিলেন।

এত কথা বলার উদ্দেশ্য কি তা সম্ভবত এখনো স্পষ্ট হয় নি। আমার নিজের কাছেও তা ঐ রকমই অস্পষ্ট। যে-আত্মপরিচয়টুকু আমি দিয়েছি অনেকের পক্ষে তাই যথেষ্ট, ওর বেশি একজন লোক সম্পর্কে জানতে চাওয়ার

মানে হয় না। আমার সম্বন্ধে যদি এর বেশি কাউকে জানতে হয় তবে তাকে আমার অনেক কাছাকাছি আসতে হবে যেটা যে-কোনো লোকের পক্ষেই অস্বস্তিকর হতে পারে। তাছাড়া সকলের জন্য সকলের এতটা করা সম্ভব কী? আমি ভেবে দেখেছি পৃথিবীর সমস্ত নারীপুরুষকে শুধু একটি কুশল প্রশ্নমাত্র করে যেতে হলেও বোধকরি একটা জীবনের আয়ুতে কুলোয় না। সুতরাং অধিকাংশ লোকই অধিকাংশ লোকের মনোযোগের বাইরে, ভালবাসার বাইরে, পরিচয়ের বাইরে থেকে যায়। আমি, প্রতাপচাঁদ এই সত্য সম্বন্ধে নিজেকে সচেতন বলে বিশ্বাস করি। কিন্তু আমি নিজে আর পাঁচজনের উপস্থিতি সম্পর্কে অতি সচেতন, যদিও তাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কী তা আমি আজ পর্যন্ত খুঁজে পাই নি। রাস্তায় ঘাটে, সিনেমাহলে, বাসের সিটে আমি সব সময়ে আমার পাশের কিংবা সামনের লোকজন সম্বন্ধে সচেতন থাকি। তাদের লক্ষ করি ও তাদের সম্বন্ধে নানা কথা ভেবে দেখবার চেষ্টা করি। আমার প্রিয় জায়গা হল কোনো জনবহুল রাস্তার নিরাপদ একটি কোণ—যেখানে দাঁড়িয়ে অবিরাম নানা কিছু দেখে যাওয়া যায়—যতখানি এবং যতদূর সম্ভব। কেউ যদি আমাকে ঠিকমতো লক্ষ করে তবে আমার ধারণা সে আমার ভিতরে বেড়াল ও গোয়েন্দার একটা সংমিশ্রণ দেখতে পাবে। প্রথমত নিঃশব্দে অতি দ্রুত হাঁটতে পারি আমি, দ্বিতীয়ত খুব অল্প সময়ে চকিতে যতটুকু দেখে নেওয়া দরকার তার সবটুকু দেখে নেওয়ার অভ্যাস করে করে আমি পাকা হয়ে গেছি, আমার তৃতীয় গুণটি হল সন্দেহপ্রবণতা।

দুই

বুধন আমার একেবারে শিশু বয়সের বন্ধু। এককালে ঘনিষ্ঠতা ছিল, এখন দেখা হলে সহৃদয় কথাবার্তার বিনিময় হয় মাত্র, এখন পরস্পরের কাছ থেকে অনেক কথাই গোপন রাখতে হয় সতর্কভাবে। এবার কলকাতায় থাকাকালীন দু একবার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে, অল্প স্বল্প কথাবার্তাও। ওর বাড়িতে নেমন্তন্ন করেছিল, আমি সময় দিতে পারি নি। একদিন বুধন আমার প্রদর্শনীতে এল অনেক রাত করে। তখন বন্ধ করবার সময়। প্রদর্শনীর ঝাঁপ ফেলে দুজনে পাশাপাশি হেঁটে গেলাম শীত এবং কুয়াশার মধ্য দিয়ে ময়দান পর্যন্ত। রেডরোডের দেয়ালের ধার ঘেঁষে ঘাসের উপর চপ্পল খুলে চপ্পলের উপর বসলাম দুজনে মুখোমুখী। ইতিমধ্যে আমরা দু ভাঁড় চা খেয়ে নিয়েছি। বুধনের শীত

করছিল, আমি দিল্লীর লোক বলে কলকাতার শীত গায়ে লাগছিল না। বুধন বলছিল 'ছবি আঁকছিস—ভালমন্দ যাই হোক একটা কিছু করছিস তবু, আমি চাকরী করলুম, খেলুম দেলুম, তারপর একদিন মরে যাবো। কেন জন্মানো আমাদের ঠিক বুঝি না।'

হাসলাম আমি। বুধন বরাবরের নিরীহ এবং খানিকটা অপদার্থ। শুনেছি ওর সঙ্গে যখন আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় তখনো আমাদের কথা ফোটে নি এবং মায়ের কোল ছাড়ি নি কেউ, সেই প্রথম দর্শনেই আমি ওর মুখ খাবলে দিয়েছিলাম বলে ও ডুকরে কেঁদে উঠেছিল। বহুকাল ওর মুখে আমার সেই নখের দাগ ছিল। পরে ওর মুখে ও দেহে এরকম আঁচড় কামড়ের দাগ আরো বেড়েছিল, কেননা হামা দিয়ে চৌকাঠ ডিঙোতে শিখেই বুধন তার প্রতিদ্বন্দ্বী বন্ধুদের সাক্ষাৎ পায় যারা ওকে নধরকান্তি ও শান্তস্বভাব দেখে নিজেদের শক্তি পরীক্ষার ও অপরকে নির্যাতন করবার লোভ সামলাতে পারত না। সেই বুধন যার শরীর থলথলে ছিল বলে আমরা ওকে খেলায় নিতাম না, পড়াশুনোয় নিতান্ত গবেট ছিল বুধন, আর ওর দারোগা বাপ ওর ভিতরে পৌরুষ সঞ্চার করবার জন্য রোজ ভোরবেলায় ঘুম থেকে তুলে পুলিশগ্রাউণ্ডে পুলিশদের সঙ্গে 'লেফ্‌ট রাইট্' করতে পাঠিয়ে দিত।

একটা মোটরের দ্রুত অপস্রিয়মান হেডলাইটের আলোয় বুধনের মুখে অন্যমনস্কতা দেখা গেল। পরমুহূর্তেই ওর মুখ অন্ধকার হয়ে গেলে ওর গলা শোনা গেল 'ভাখ্, কোথাও যাওয়ার নেই বলে আমরা ময়দানে এলুম। তুই তবু অনেক ঘুরে বেড়াস—নানা জায়গায় এগজিবিশন হয় তোর। আর আমার যাওয়ার জায়গা আমি খুঁজেই পাই না। এমন কি কলকাতা শহরেও একটা নতুন জায়গা আমি খুঁজে বের করতে পারি না। অথচ শুনি এখানে গলি ঘুঁজি অনেক, বিচিত্র সব জায়গা আছে।'

'তা আছে' আমি হাসি সামলে বললাম, 'তবে শুধু ঘুরে বেড়িয়ে বা নতুন জায়গা খুঁজে কি লাভ ?'

'সে কথা বলছি না' বুধন সংকোচের গলায় একটু ইতস্তত করে বলল 'বলছিলাম নানাভাবে জীবনকে দেখবার কথা। যেখানে জন্মেছি, যেখানে আছি তার আশ-পাশটা ভাল করে চিনলুম না আমরা। চিনবার উৎসাহও ঠিক নেই। বিদেশের কথা শুনি—যেতে ইচ্ছেও করে, অথচ জানি যাওয়ার সুযোগ এলে যাবো না। চেনা জায়গা ছাড়তে ভয়।'

ইচ্ছে হল অনেকদিন পর বুধনের কাঁধে একটু হাত রাখি। মুখে অবশ্য বে-পরোয়া জবাব দিলাম 'ঘরে আগুন লাগিয়ে রাখতে হয়। নইলে কিছুই হয় না।'

'মানে ?'

'অন্য কোনো মানে নেই। ঘরে আগুন লাগিয়ে না রাখলেই বিপদ।'

বুধন হেসে চুপ করে রইল, তারপর অন্য প্রসঙ্গে গিয়ে বলল 'কলকাতা কেমন লাগছে তোর ?'

'কলকাতা আর দেখছি কোথায়, নিজের এগজিবিশন সামলাতেই ব্যস্ত।'

'ও।'

মায়া হল বুধনের জন্য। বললাম 'কলকাতাকে টের পাচ্ছি রোজ ভোরবেলায় কর্পোরেশনের লরীর শব্দে যখন ঘুম ভাঙে, কেননা ভোরের দিকে পাতলা ঘুমে স্বপ্নের ভিতরে পরীর মতো মেয়েরা আমার কাছে আসতে শুরু করে। কর্পোরেশনের লরীর শব্দে বুঝতে পারি কলকাতা আমাকে পুরোপুরি স্বপ্নের হাতে ছেড়ে দিতে চায় না—ঠিক সময়ে কাছা টেনে ধরে।' বলেই বুঝলাম বৃথা। এ সব কথার মানে বুঝবার মতো সমর্থ বুধন নয়।

তবু বুধন হাসল। বেশ জোরেই হেসে উঠে বলল 'বেশ বলেছিস।'

বুধন হঠাৎ বলল 'তবু কলকাতাই ভাল। কখনো বাইরে গেলে টের পাওয়া যায় ফিরে আসবার জন্য যখন আকুপাকু করি।'

হাসলাম। বুধন লজ্জা পেয়ে বলে 'ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার যে কথা বললি সেটা ভেবে দেখতে হবে।'

আমি মনে মনে হিংস্র গলায় বললাম 'অত সহজ নয়, বুধন, অত সহজ নয়।' বুধন সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিল। তারপর সিগারেট ধরিয়ে বলল 'তোর বেশ নাম হয়েছে, আমাদের অফিসে সেদিন খুব আলোচনা হল তোকে নিয়ে।'

'ও।' আমি উৎসাহ দেখালাম না।

'যদিও খুব ভাল বুঝি না, তবু তোর ছবি আমার ভাল লাগে।'

আমি কষ্টে বিরক্তি চেপে রাখলাম, কেননা আমার বিশ্বাস আমার ছবি বুধনের জন্য নয়। ইতিপূর্বেও কয়েকবার বুধন আমার ছবির প্রশংসা আমাকে শোনাতে চেয়েছে—আমি খুশি হই নি।

সম্ভবত আমার নিস্পৃহতা লক্ষ করে বুধন বলল 'অবশ্য এসব ছবি আমাদের

জন্ম নয়।' ওর ভিখিরির মতো ঘ্যানঘ্যানে গলা শুনে আমি হঠাৎ চমকে উঠলাম—তবে কার জন্ম আমার ছবি? বাস্তবিক তবে কাদের জন্ম? আরো বুদ্ধিমান যারা, যারা থলথলে মোটা নয়, যাদের দেহে কিংবা মুখে আমার আঁচড় কামড়ের দাগ নেই তাদের জন্যেই কি আমার ছবি আঁকা? সন্দেহ হয় আমার যাবতীয় শিল্পোত্তম আর্টক্রিটিক ও শত্রুপক্ষের জন্যই নয় তো!

আমি তাড়াতাড়ি উঠে বললাম 'চল, উঠি।'

বুধন নিশ্চিন্ত গলায় বলল 'চ।'

তিন

আমার দ্বিতীয় বন্ধু রাজীব দেহেরা ছবি কেনাবেচার দালালী করে বেড়ায়। আমি এখানে আসছি শুনে সে বলেছিল 'তুমি কলকাতায় কেন যাচ্ছ? ওখানে তোমাকে কেউ পাত্তা দেবে না।' সে কথা আমারও জানা ছিল। তবু আমার এখানে প্রদর্শনী করার একটা উদ্দেশ্য সম্ভবত এই ছিল যে আর একবার কলকাতায় আসব। আমার এই আকর্ষণের কারণ আমার বাস্তবিক জানা নেই। তবে মনে হয় আমার যে স্বভাব ও গুণগুলির কথা উল্লেখ করেছি সেগুলির সাথে কলকাতার একটা অস্পষ্ট মিল রয়েছে। আমি কলকাতা ভালবাসি। কাজ না থাকলে আমি কলকাতার পথে ঘাটে এমনি ঘুরে ঘুরে বেড়াই। নিজেকেই মাঝে মাঝে বলি আমি 'যদি ছবি আঁকতে হয়, তবে কলকাতায় যাও। কলকাতা দুই হাতে ক্ষয়, মহামারী ও শিল্পচেতনার হ্যাণ্ডবিল বিলি করে। কলকাতা আত্মহত্যার পোস্টার সেঁটে দেয় দেয়ালে দেয়ালে। অবক্ষয়? কলকাতার জান পোঁতা আছে সেইখানে।'

কিন্তু কলকাতার খোলা জায়গায় ইজেল পেতে বসব আমি তেমন বোকা নই। বরং আমার সঙ্গে ক্যামেরা থাকে, কিন্তু সেটা খুলতে আমার ভরসা হয় না। কেননা আমি ত আর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কিংবা মনুমেন্টের ছবি তুলবো না, যা তুলবো তা তুলতে সাহস হয় না, ক্যামেরার দিকে বাড়ানো হাত দু ইঞ্চি দূরে থেমে থাকে, অথচ অদূরেই রক্তে ভেসে যাচ্ছে ফুটপাথ, পাগলী মেয়েটা দেয়ালের গা ঘেঁষে শুয়ে গোঙাচ্ছে, স্কুল-ফেরতা বাচ্চাদের ভিড় জমেছে খুব, বুড়োরাও দাঁড়িয়ে দেখছে।

গায়ে নানা রঙের চৌখুপি কাটা খদ্দরের মোটা হাওয়াই শার্ট, পরনে জলিত-গ্রীব টেরিলিনের পাৎলুন, পায়ে হকি বুট, চোখে রোদ-চশমা—নিজের

সঙ্গে মুখোমুখী হলে নিজেই হয়তো একটু থমকে যেতাম। বিকেলে হিন্দুস্থান মার্টের কাছে দাঁড়িয়েছিলাম, হঠাৎ বৈশাখীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দেখি বৈশাখী টুকটাক জিনিসপত্র কিনেছে অনেক, হাতে প্লাস্টিকের বাস্কেটের ভিতরে সে সব পোরা ছিল, ডান হাতে দলা পাকানো রুমাল। আমি 'এই যে' বলে কথায় রেশ শেষ করবার আগেই আচমকা প্রশ্ন এল 'অত দাড়ি রেখেছেন কেন, তাতে আবার বেশ পাক ধরেছে দেখছি!'

'তা ধরেছে।' আমি দাড়িতে হাত রেখে একটু হাসলাম।

পরের প্রশ্ন 'কলকাতায় এতদিন এসেছেন, কৈ বাড়িতে গেলেন না ত' একবারও।'

'তা যাইনি বটে।' সঠিক যুক্তি খুঁজে না পেয়ে বললাম।

'কাগজে আপনার এগজিবিশনের খবর পড়লাম' বৈশাখী একটু দ্বিধা করেই হেসে ফেলল, 'খুব গালাগাল দিয়েছে আপনাকে।'

'তা দিয়েছে' আমি কুঁকড়ে গিয়ে বললাম 'তোমরা গিয়েছিলে নাকি!'

বৈশাখী মাথা নাড়ে, 'আপনি যেতে বলেন নি ত'!'

'তা বলিনি।'

'কি সব অসভ্য অসভ্য ছবি এঁকেছেন নাকি! দেখা যায় না!'

আমার মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করছিল। কিন্তু বৈশাখী বেশ সহজ ভাবেই বলে গেল 'ওসব আঁকেন কেন? ভাল কিছু আঁকতে পারেন না!'

আমি তাড়াতাড়ি বললাম 'অনেকদিন পর দেখা—কিছু খাবে চল। আমার খিদে পেয়েছে।'

বৈশাখী একটু ইতস্তত করে বলল, 'আমি শুধু চা খেতে পারি।'

তারপর ভিড় ঠেলে আমরা আস্তে আস্তে এগোচ্ছিলাম। ওটুকু সময়ের মধ্যেই যতটুকু দেখবার আমি দেখে নিয়েছি। আমাকে তারিফ করতেই হয় যে আজকালকার মেয়েরা সাজগোজ করতে জানে। হলুদ জমির উপর সবুজ চিকনের কাজ করা এমন ব্লাউজ পরেছে বৈশাখী যাতে ওর দুখানা ফর্সা নগ্ন হাত বগল পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে—হাতে দু-এক গাছা কাচের চুড়ি, ঘড়ির স্ট্র্যাপটা পুরুষালী চঙের চওড়া—একটু নাড়তেই দুখানা হাতে ঢেউ খেলে যাচ্ছে। খুব হাল্কা সবুজ রঙের শাড়ির উপর হাল্কা হলুদ রঙের ছাপা বাটিকের প্যাটার্ন। কোমরের কাছে সামান্য অনাবৃত অংশ থেকে সতেজ চামড়া ও গভীর মেরুদণ্ডের খাঁজ দেখা যাচ্ছে। চুল টান করে সুকৌশলে একটা বেণীহীন খোঁপায় বাঁধা—

তাতে ওর মাথার খুলির সম্পূর্ণ গোল আকার বোঝা যায়। মুখে পাউডার বা রঙ নেই। ভেসলীনের মতো তেলতেলে কিছু একটা মাখানো আছে, ফলে মুখের সুন্দর খাঁজগুলি ও উঁচু গালের হাড় স্পষ্ট দৃশ্যমান হয়েছে। হাঁটার ভঙ্গীর ভিতরে চাবুকের মারের মতো একটা তীব্রতা রয়েছে। 'বাহবা, বাহবা' আমি মনে মনে বলছিলাম, আমার বিশ্বাস আর একটু লম্বা হলে বৈশাখী আমাদের দিল্লীর পাঞ্জাবী মেয়েদের উপর টেক্কা দিত। ঢাকুরিয়ার দিকে ওদের বাড়ি, ঠিকানা আমার কাছে ছিল, কিন্তু সেটা হারিয়ে ফেলেছি কিনা মনে পড়ছিল না। কিন্তু বৈশাখীকে দেখবার পর মনে হল ঠিকানাটা আর-একবার নিয়ে রাখা ভাল। সাবধানের মার নেই। যদিও প্রদর্শনী শেষ হয়ে গেছে, এবং কলকাতায় আমার আর অল্প কয়েকদিনই থাকবার কথা, তবু জীবনের নানা সম্ভাবনার কথা কে বলতে পারে।

বৈশাখী মুখ ঘুরিয়ে তেরছা চোখে চেয়ে বলল 'আমায় কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।'

'কেন ?'

'নইলে লোকে নিন্দে করবে আমার, 'রেবেল আর্টিস্টের' সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছি বলে।' হাসল। সেদিনও নিতান্ত খুকী ছিল বৈশাখী। গায়ের রঙ ফর্সা ছিল বলে 'ভৈঁসা ঘি' নামে ডেকে ওকে খেপিয়েছি। ওর মেটামরফসিস লক্ষ করে খুশি হয়ে উঠলাম আমি। হেসে বললাম 'কোনো কাজ নেই ত ?'

'ফেরাটাই কাজ।' ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'গগলসটা খুলে ফেলুন না, কেমন ভুতুড়ে দেখাচ্ছে। রোদ ত' নেই এখন।'

বিকেলের ভিড়ে ঠাসা একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে খোলামেলা জায়গায় বসবার চেষ্টা করতে গেলে বৈশাখী বাধা দিল 'কেবিনে চলুন না, অত লোকের সামনে বসতে পারি না আমি।'

রাস্তায় হাঁটো কি করে অত লোকের সামনে ? বললাম না, কিন্তু কেবিনে মেয়ে নিয়ে ঢুকে যেতে লজ্জা করছিল। কেবিনে ঢুকতেই সবুজ পর্দা ফেলে দিল ছোকরা চাকর। বে-আব্রু ধরনের গোপনীয়তা। ফ্যান চালু ছিল না এবং আমি দিল্লীর শীতে অভ্যস্ত বলে সঙ্গে সঙ্গে গরমে আমার ঘাম হতে লাগল। বৈশাখী মুখোমুখী বসে বলল 'অত কাঠ হয়ে আছেন কেন ? কথাটথা বলুন।'

কপালে রুমাল চেপে বললাম 'আস্তে বৈশাখী। মনে হচ্ছে এখানে গোপনে একটা টেপ-রেকর্ডার চালু আছে—আমাদের কথাবার্তা এরা তুলে নেবে সব।'

'বাব্বাঃ। কিম্ভূত একটা। থাক না টেপ-রেকর্ডার, আমরা ত সরকার-বিরোধী আলোচনা করছি না, কিংবা আমরা…' বৈশাখী হেসে ফেলল।

আমি উৎকর্ণ হয়ে ছিলাম। একটু হতাশ হতে হল। বাইরে রৈ রৈ করছে লোকজন। বৈশাখী বলছিল 'আপনার ছবি আঁকবার কথা ছিল না ত! বরং খেলোয়াড়-টেলোয়াড় হলে আপনাকে মানাত। ছবিটবি এঁকে কি হয়—আপনি ও দিকেই বা গেলেন কেন?'

উত্তর না দিয়ে আমি হাসছিলাম। কিন্তু মনে মনে ভাবছিলাম এই ভিড়ে ঠাসা রেস্টুরেন্টে বসে ঘামতে ঘামতে সকলের নাকের ডগার সামনে বসে বৈশাখীর কাছে বিয়ের প্রস্তাব করলে কেমন হয়! কোনো সুন্দরী মেয়ে দেখলেই যে হামলে পড়ব—আমি তেমন নই। কিন্তু বৈশাখী সম্পর্কে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমি ভেবে দেখলাম। কিন্তু তাড়াহুড়ো করা আমার রীতিবিরুদ্ধ—ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি করতে না পারলে আমি খুশি হই না। আমি একটি অমোঘ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করতে শুরু করলাম।

রাস্তায় বেরিয়ে দুজনে হাঁটছিলাম পাশাপাশি। দেশলাই ছিল না বলে আমি একজন চলন্ত ভদ্রলোককে থামিয়ে তার ক্যাপস্টান থেকে আমার চারমিনারটি ধরিয়ে নিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে দিলাম। বৈশাখী ভ্রূ কুঁচকে ভর্ৎসন করল 'দেশলাই কিনতে পারেন না! সিগারেটটাও চেয়ে খেলেই হয়।'

'তা হয়।' ক্ষীণ কণ্ঠে বললাম। দেখি গাঢ় রঙের চাপা সরু প্যান্ট পরা চওড়া কাঁধের হাড়গিলে কয়েকটা ছেলে বৈশাখীকে দেখতে দেখতে গেল, 'মারহাব্বা' গোছের কিছু একটা বললও বোধহয়। কিন্তু বৈশাখী লজ্জা বা ভয়ের কোনো ভাব না দেখিয়ে বেশ সম্মানজনক ভাবেই হেঁটে যাচ্ছিল রাস্তায় ঘাটে কুকুর বেড়াল দেখবার মতোই লোকজন ও ভবলম্বেকার দেখতে দেখতে। আমি বিড়বিড় করে বললাম 'বাহবা, বাহবা।' বাসস্টপে এসে বৈশাখী জিজ্ঞেস করে 'কবে আসছেন আমাদের বাড়িতে?'

'যাব এর মধ্যেই। আরো কয়েকদিন আছি কলকাতায়।'

'চলি' বলে বৈশাখী একটা সদ্য থামা আটের বি বাসের দিকে এগিয়ে গিয়ে হ্যাণ্ডেল ধরল। হঠাৎ মনে হল সেই অমোঘ মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করবার কোনো অর্থ হয় না, হয়তো এইটাই ঠিক সময়, বিশেষত নিজের অতিপরিবর্তনশীল ও সন্দেহপ্রবণ মনকে আমি বিশ্বাস করি না। ভিড় কেটে অতি দ্রুত এগিয়ে গেলাম আমি, বৈশাখী সবে তার ডান পা ফুটবোর্ডে তুলে দিচ্ছে, আমি বিনা

দ্বিধায় ওর পিঠে হাত রেখে ডাকলাম 'বৈশাখী।' চকিতে চমকে ঘুরে দাঁড়াতেই বৈশাখীর কাঁধের আঁচল খসে গেল, আমি ওর দ্রুত শ্বাস ও তীব্র দৃষ্টি লক্ষ করলাম, কয়েক মুহূর্তের জন্য এক অদ্ভুত সন্দেহ ও ভয়ে আমার বুক কাঁপল। স্খলিত হাতে বৈশাখী তার কাঁধের আঁচল তুলে দিল, সামান্য হেসে প্রশ্ন করল 'কি হল আবার!' বৈশাখীর পাশ দিয়ে হতাশ ডবলডেকারটা একটু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ধীরে ধীরে সরে গেল।

যদি ভুল হয়ে থাকে? কি জানি। আমি মাথা নেড়ে বললাম 'কিছু না।' বললাম 'পরের বাসেই চলে যেও। আচ্ছা চলি।' তারপর দ্রুত ভিড়ের ভিতরে গা ঢাকা দিলাম আমি।

চার

'এই হোটেলে আপনার ঘরটাই বোধহয় সবচেয়ে ছোটো। এত ছোটো ঘর এরা কেন দিয়েছে আপনাকে?' ভদ্রলোক জানালার কাছের চেয়ারে বসতে বসতে বললেন।

'ছোটো ঘর আমার খারাপ লাগে না। বড় ঘরে একা থাকতে আমার ছম্‌ছম্‌ করে।'

উনি রহস্যময় ভাবে হাসলেন 'একা থাকতে যখন ভয় করে তখন…'

'ভয়ের কথা বলিনি' আমি ওঁর উল্টো দিকের জানালায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, 'বলেছি ছম্‌ ছম্‌ করে, ভাল লাগে না। বড় ঘর, ফাঁকা জায়গা এসব ঠিক আমার জন্য নয়।'

'বুঝেছি।' মাথা নাড়লেন, ওঁর অর্ধেক মুখে জানালা দিয়ে বিকেলের আলো এসে পড়েছে, আর অর্ধেক ছায়াচ্ছন্ন। মোটা আধভাঙা কিন্তু উত্তপ্ত বন্ধুত্বের গলায় বললেন 'খুব বড় ফাঁকা জায়গায় নিজেকে ঠিক টের পাওয়া যায় না। বোঝা যায় আপনি খুব আত্মসচেতন। আপনার ছবিতেও এ-ব্যাপারটা আছে।'

'কি রকম?'

'আপনার নিজেরই তা জানার কথা। মনে হয় আপনি মানুষজন ভিড় খুব একটা ভালবাসেন না, আবার ফাঁকা নির্জন নিঃশব্দ জায়গাও আপনার পছন্দ নয়। অর্থাৎ শহরে আপনি খুশি নন, নির্জন পাহাড়ে বা সমুদ্রের ধারেও আপনি অস্বচ্ছন্দ। ঘর বা রাস্তা কোনোটাই আপনি খুব ভালবাসেন কি?'

'তুলনা করলে অবশ্য…' আমি ইতস্তত করি; 'না। কোনোটাই বোধ করি আমার ভাল লাগে না।'

'আমারও সেটাই সন্দেহ ছিল।' উনি বললেন। উনি জোরে হাসেন না, কিন্তু সবসময়েই হাসেন নিঃশব্দে। বললেন 'আপনার ছবি দেখে লোকে-কি বলছে শুনেছেন? অন্তত অধিকাংশ লোকের মত কি?'

'ভালমন্দ দুরকম আছে। কিন্তু বাস্তবিক ছবির জন্য আমার খুব একটা মাথাব্যথা নেই এখন। প্রশংসা বা নিন্দা কোনোটাই যথার্থ ভাল লাগছে না আমার।'

'কেন?'

'মনে হয় আমার ছবি আমি ছাড়া আর কারো জন্য নয়। অন্তত এটুকু বলা যায় যে আমিই আমার ছবি সবচেয়ে বেশি বুঝি।'

'সে কথা ঠিক। তবে 'বুঝি' না বলে আপনি বলতে পারতেন 'অনুভব করি'। আপনার আঁকায় ব্যক্তিগত অংশ একটু বেশি যা আর কেউ আপনার মতো করে অনুভব করবে না। আবার দেখুন ছবিগুলির যে সমস্ত অংশে আপনি ফাঁকি দিয়েছেন বা চালাকী করেছেন সে সব অংশও কেউ ধরতে পারবে কি? অথচ সেই অংশগুলির জন্য আপনার একটা দীর্ঘস্থায়ী দুঃখবোধ হয়তো থেকে যায়।'

'ঠিক।' আমি ওঁর দিকে আমার সিগারেটের প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিলাম, উনি তেমনি হাসিমুখে সিগারেট নিলেন। দু হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে দেশলাই জ্বালতেই ওর সমস্ত মুখটা একপলকের জন্য দেখা গেল।

'আপনি আমার কথায় কিছু মনে করলেন না ত'!'

'না।' আমি বললাম।

'আমি কলকাতার সব ছবির এগজিবিশন ঘুরে ঘুরে দেখি। আপনারটাও দেখেছি। আপনি কি মনে করেন এখানকার কলা-সমালোচকরা আপনাকে অন্যায়ভাবে গালাগাল দিয়েছেন?'

'বললাম ত' আমার পক্ষে বিচার করাই মুস্কিল, কেননা এসব সমালোচনা আমাকে এখনো ভাবনায় ফেলেনি।'

'ঠিক। তবু দিল্লীর সমালোচকদের মত কি তা আপনি অবশ্যই জানেন।'

'হ্যাঁ, তাঁরা আমার উচ্চপ্রশংসা করেছেন।'

'তাঁরা কি যথার্থ বলে আপনার মনে হয়?' উনি হাত তুলে আমাকে

কথা না বলতে ইঙ্গিত করে বললেন, 'দিল্লী ও কলকাতার আবহাওয়ার বিভিন্নতাকেও অবশ্য এজন্য দায়ী করা চলে। কিন্তু সে কথা থাক—ছবির আলোচনা হয়তো আপনার ভাল লাগছে না।'

আমি চুপ করে থাকলাম।

উনি বললেন 'যদি আমি আপনার সেল্ফ-পোর্ট্রেটটা কিনতে চাই তা হলে আপনার আপত্তি নেই ত!'

আমি ভ্রূ কুঁচকে বললাম 'না। কিন্তু কেন নেবেন?'

'ওটা আমার ভাল লেগেছে, যদিও আমার মতো আপনিও বোধহয় জানেন যে ওটা আপনার যথার্থ প্রতিকৃতি নয়।'

'বটেই ত। আমি ঠিক আমার প্রতিকৃতি আঁকবোই বা কেন, তার মূল্য কি?'

'কিছুই না, রঙীন ফটোগ্রাফের চেয়ে বেশি মূল্য তার নেই। কিন্তু আমি বলতে চাই আপনি যে-রকমের মানুষ আপনার প্রতিকৃতিও কি ঠিক সেইরকমের? ছবির যাকে আত্মা বলি আর আপনার যে-আত্মা তা বিভিন্ন কিনা ভেবে দেখেছেন কি?'

'ঠিক বুঝলাম না।'

'আচ্ছা সে কথা থাক। ছবিটা কিন্তু আমি নিচ্ছি। আজ তার দামটা দিতেই আমার এখানে আসা।'

আমি হঠাৎ বললাম 'আমার একটা ছবিও এখানে বিক্রী হয়নি।'

'তাতে কি?'

'কিছু না। ভাবছিলাম, আমি অনেক টাকা পয়সা খরচ করে দিল্লী থেকে এতদূর এসেছি এসব ভেবে আপনি আমাকে সাহায্য করছেন না তো!'

'না।' উনি হাসিমুখে মাথা নাড়লেন, 'বললাম, ত' আপনার আত্ম-প্রতিকৃতিটা আমার দরকার।'

'ঠিক আছে' আমি হাত বাড়িয়ে ওঁর হাত থেকে চেকটা নিয়ে নিলাম। উনি একবার আমার কাঁধে হাত রাখতে গিয়েও কি ভেবে হাতটা সরিয়ে নিয়ে বললেন 'চলি।'

'আচ্ছা' আমি ওঁকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম।

দরজা বন্ধ করে আমি ঠিক ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াই। হঠাৎ সন্দেহ হয়, উনি কি ভেবেছিলেন যে আমার নিজের আঁকা আমার নিজের ছবিটা আমার চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নেওয়া দরকার?

যদি তাই হয়ে থাকে তবে এবার কলকাতায় আমার দ্বিতীয় চিত্র-প্রদর্শনীটা বাস্তবিক পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে গেল।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

দুঃসময়

মাঠের শেষ শস্যকণা ঘরে উঠে গেছে। এখন চৈত্রের মাঝামাঝি। শুধু সামনে মাঠ ধূ-ধূ করছে। শুকনো জমিতে হাল বসছে না। সর্বত্র চাষবাসের একটা বন্ধ্যা সময়। যতদূর সামনে চোখে পড়ছে শাদা ধোঁয়াটে ভাব, শুকনো কঠিন মাটি ইতস্তত পাথরের মতো উঁচু হয়ে আছে। ঘাস, পাখ-পাখালী যেন সব অদৃশ্য অথবা সব জলেপুড়ে গেছে, ঝোপ জঙ্গল ফাঁকা ফাঁকা। গরীব দুঃখীরা এখন বর্ষার জন্য ঝরা পাতা সংগ্রহ করে দাওয়ায় তুলে রাখছে। আর মুসলমান চাষীবৌরা এই সব ঝরা পাতা সংগ্রহের সময়ই আকাশ দেখছিল।

জোটনও আকাশ দেখছিল কারণ তার এখন দুর্দিন। আবেদালীও আকাশ দেখছিল কারণ চাষবাসের কাজ একেবারেই বন্ধ। নৌকার কাজ বন্ধ। গয়না নৌকার কাজ শীতের মরসুমেই বন্ধ হয়ে গেছে। বৃষ্টি হলে নতুন শাকপাতা মাটি থেকে বের হবে সেজন্য জোটন আকাশ দেখছিল, বৃষ্টি হলে চাষবাসের কাজ আরম্ভ হবে সেজন্য আবেদালী আকাশ দেখছিল। এই অঞ্চলে এই আকাশ দেখা এখন সকলের অভ্যাস। কচি কাঁচা ঘাস, নতুন নতুন পাতা এবং ভিজে ভিজে গন্ধ বৃষ্টির—আহা মজাদার গাঙে নাইয়র যাওয়নের লাগান। জোটন বলল, আবেদালী আমারে নাইয়র লৈয়া যাই বি?

আবেদালী বলল, তর নাইয়র যাওয়নের জায়গাটা কোনখানে?

ক্যান আমার পোলারা বাইচ্যা নাই!

আছে, তর সবই আছে। কিন্তু কে-অ তরে খোঁজখবর করে না।

জোটন আবেদালীর এই দুঃখজনক কথার কোনো উত্তর দিল না। গতকাল আবেদালীর কোনো কাজ ছিল না। আজ সারাদিন হিন্দুপাড়া ঘুরে ঘুরে একটা কাজ সংগ্রহ করেছিল—কিন্তু পয়সা কম। তারিণী সরকার রান্নাঘরে নতুন ছাউনী দিয়েছে। আবেদালী সারাটা দিন ছৈয়ালের কাজ করেছিল সেখানে। যেহেতু কামলার সংখ্যা প্রচুর এবং মুসলমান পাড়ার

রুজি রোজগার প্রায় বন্ধ, যার গরু আছে সে দুধ বেচে একবেলা ভাত অন্য-বেলা মিষ্টি আলু সেদ্ধ খাচ্ছে—আবেদালীর গরু নেই, জমি নেই, শুধু গতর আছে। গতর বেঁচে পর্যন্ত পয়সা হচ্ছে না। সারাদিন খাটনীর পর তারিণী সরকারের সঙ্গে কুৎসিত বচসা হয়ে গেল পয়সার জন্য। দাওয়ায় বসে তারিণী সরকারকে কুৎসিতভাবে গাল দিল আবেদালী।

আবেদালীর বিবি আলালী তখনও পেট মেঝেতে রেখে পড়ে আছে। সারাদিন কিছু পেটে পড়ে নি, জব্বর আসমান্দির চরে গান শুনতে গেছে, সারাদিন পর আবেদালীর ক্লিষ্ট চেহারা উঠোনের শেষ রোদে যেন শুকোচ্ছে।

আলালী ভিতর থেকেই বলল, কিছু পাইলানি।

আবেদালী কোনো উত্তর করল না। সে তার পাশের ছোট পুঁটলীটা ঢিল মেরে মেঝেতে ছুঁড়ে দিল। তখন জোটনের ঘরের বাঁশের দরজা বন্ধ মনে হচ্ছে। এখন আলালী কাপড়টা ভাল করে প্যাচ দিয়ে পরল। আলালীর এক প্যাচে কাপড়ের ভিতর থেকে সব যেন হা করে আছে। সুতরাং আবেদালী হুঁকা নিয়ে বসল। আর আলালী ঝরা পাতা উনুনে ঠেলে ঘোলা জলে পাতিল হাঁড়ি খলখল করে ধুতে গেল।

আবেদালী উনুনের পাশে বসেই দেখল ওপাশটায় বসে আলালী চাল দিচ্ছে হাঁড়িতে। ওর খাটো কাপড়। হাঁটুর ভিতর দিয়ে পেটের খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে। সুতরাং খুব যত্নের সঙ্গে হুঁকা টানতে টানতে বিবির মুখ দেখতে থাকল। আলালীর কুৎসিত মুখ এ-সময় খুব স্নেহশীল মনে হচ্ছে। আবেদালী বেশীক্ষণ বিবিকে এভাবে বসে থাকতে দেখলে কখনও কখনও কলাইর জমি অথবা একটা ফাঁকা মাঠ দেখতে পায়। সে নিজেকে অন্যমনস্ক করার জন্য বলল, জব্বইরা কৈ গ্যাল কহিল আইক্যা ভাখ্‌তাছি না।

আলালী আবেদালীর দুষ্ট বুদ্ধি ধরতে পারছে যেন। সে বলল, জব্বইরা গুনাই বিবির গান শুনতে আসমান্দির চরে গ্যাছে। কাঠের হাতা দিয়ে ভাতের চালটা নেড়ে দেবার সময় বলল, গুনাই বিবির গান শুনতে আমার-অ বড় ইসছা হয়।

এত অভাবের ভিতরও আবেদালীর হাসি পাচ্ছে। এত দুঃখের ভিতরও আবেদালী বলল, পানিতে নদী নালা ভাইসা যাউক, তখন তরে লৈয়া ভাইসা যামু।

আলালীর এই সব কথাই যেন আবেদালীর ছাড়পত্র। মাঠে নামার অথবা জমিতে চাষ করার ছাড়পত্র।

আবেদালীর দিদি জোটন এতক্ষণ দাওয়ায় বসে সব শুনছিল। এত সুখের কথা সহ্য করতে পারছে না। সে সন্তর্পণে দরজাটা আর একটু ভেজিয়ে দিয়ে বসে থাকল। কোনো কর্ম নেই সুতরাং শুধু আলস্য শরীরে। আর চুলের গোড়া থেকে চিমটি কেটে কেটে উকুন খুঁজছিল। আর এত সুখের কথা শুনেই যেন চুলের গোড়া থেকে একটা উকুনকে ধরে ফেলতে পারল। জোটনের মুখে এখন প্রতিশোধের স্পৃহা, উকুনটাকে মারার সময় মান্দার গাছের নীচে মজুরের মুখ দেখতে পেল যেন। সে ভাল করে দেখার জন্য বেড়ার ফাঁকে উঁকি দিতে গিয়ে দেখল—উঠোন পার হলে আবেদালী। উনুনের পাশে আলালীর মুখ। আলালীকে দু হাতের ফাঁকে আবেদালী তুলে ধরেছে। তখন চৈত্রমাস, ধুলা উড়ছে, এক সময় ধুলায় ধুলায় উঠোনটা অন্ধকার হয়ে গেল এবং এর ফাঁকে জোটন সব কিছু ফেলে উঠোন অতিক্রম করে মাঠের দিকে নেমে গেল।

চৈত্রমাস সুতরাং রোদে খা-খা করছে মাঠ। পুকুরগুলোতে জল নেই। একমাত্র সোনালী বালির নদীর চরে পাতলা চাদরের মতো তখনও জল নেমে যাচ্ছে। মসজিদের পাতকুয়োতে জল নেই। গ্রামের সকল দুঃখী মানুষেরা অনেকদূর হেঁটে গিয়ে জল আনছে। সোনালী বালির নদীতে ঘড়া ডুবছে না। নমঃ পাড়ার মেয়ে-বৌরা নদীতে সার বেঁধে জল আনতে যাচ্ছে। ওরা খোডা করে জল তুলবে কলসীতে। ট্যাবার পুকুর, সরকারদের পুকুর সব ঘোলা—গরু নেমে জলে এক রকমের সবুজ রঙ। বড় দুঃসময় পাশাপাশি গ্রাম সকলের সুতরাং জোটন কাঁখে কলসী নিল। সোনালী বালির নদী থেকে এক ঘড়া জল এনে হাজী সাহেবের বাড়িতে উঠে যাবে। বুড়ো হাজী সাহেবের জন্য এত দুঃখ করে জল বয়ে আনা এবং দুঃসময় বলে বিশ্বাসপাড়াতে ওলাওঠা—জোটন গ্রাম ভেঙে মাঠে পড়ার সময় এসব দেখল, একদল লোক খা-খা রোদের ভিতর দিয়ে পালাচ্ছে। ওদের মাথায় সম্ভবত ওলাওঠার দেবী। সে এতদূর থেকে সব স্পষ্ট ধরতে পারছে না।

মাঠে পড়েই মনে হল জোটনের আলালীর কথা এবং আবেদালীর কথা। ঘরের মেঝেতে উদাস গায়ে, আর যখন চারিদিকে দুঃসময় তখন পাড়ার আগুন ঘরে ধরতে কতক্ষণ। এই সব ভেবে জোটন নদীর দিকে হাঁটছিল। চৈত্র

মাসে আগুন যেন চালে বাঁশে লেগেই থাকে। জোটনের মন ভাল ছিল না সেজন্য। সে দ্রুত হাঁটছিল। সকলেই জল নিয়ে ঘরের দিকে ফিরছে, তাকেও তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে, গ্রামে গ্রামে ওলাওঠা মহামারীর মতো। যেসব লোকেরা রোদের ভিতর পালাচ্ছিল তারা ক্রমশ জোটনের নিকটবর্তী হচ্ছে। একেবারে সামনাসামনি। জোটন তাড়াতাড়ি পাশে কলসী রেখে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। গাধার পিঠে ওলাওঠার দেবী যাচ্ছেন। মাথায় করে মানুষেরা ঢাকের বাদ্যি বাজাতে বাজাতে নিয়ে যাচ্ছে। জোটন ওদের পেছন পেছন বেশি দূর গেল না। সড়কের ধারে সব মান্দার গাছ। মান্দার গাছে লীগের ইস্তাহার ঝুলছে। জোটন সেই মান্দার গাছের ছায়ায় ছায়ায় গ্রামের দিকে উঠে গেল।

পথে ফেলু শেখের সঙ্গে দেখা। ফেলু বলল, জুটি পানি আনলি কার লাইগ্যা।

জোটন ছ্যাপ ফেলল মাটিতে। মানুষটার সঙ্গে কথা বললে গুনাহ্। মানুষটা এককোপে কালানীর মরদকে কেটে এখন কালানীর সঙ্গে ঘর করছে। কত কোর্ট-কাচারী—সব বানের জলের মতো। একদিন বসে বসে আবেদালীকে এইসব গল্প শুনিয়েছে, মানুষটার বুকের পাটা কাছিমের মতো—ডর ভয় নাই। সামসুদ্দিনের সঙ্গে এখন লীগের পাণ্ডাগিরী করছে। সুতরাং জোটন কথা কথা বলছে না। আলের পাশে দাঁড়িয়ে ফেলু শেখকে পথ করে দিল।

কিন্তু ফেলু মুচকি হেসে বলল, জুটি তর ফকির সাবত এখনও আইল না।

কি করতে কন। জোটন ফের ছ্যাপ ফেলল।

ফেলু এবার অন্য কথা বলল। কারণ জোটনের মুখ দেখে ধরতে পারছে, মুখে প্রচণ্ড ঘৃণা। সে বলল, মানুষগুলাইন মাথায় কৈরা কি লৈয়া যাইতাছেল।

ওলাওটার দেবীরে লৈয়া যাইতাছে।

মাথাটা ভাইঙ্গা দিলে হয় না।

জোটন এবারও দাঁত শক্ত করে বলতে চাইল যেন, তর মাথাটা ভাঙুক নিব্বইংশা। অথচ মুখে কোনো শব্দ করল না। লোকটার জন্য সকলের ভয় ডর। মানুষটা হাসতে হাসতে খুন করতে পারে। কোরবানীর সময় মানুষটা আরও ভয়ংকর। সুতরাং জোটন বলল, আমারে পথ দান, যাই।

ফেলু দেখল চৈত্রের শেষ রোদ বাঁশগাছের মাথায়। সামসুদ্দিন তার দলবল নিয়ে অনেকদূর এগিয়ে গেছে। এখন সামনের মাঠ ফাঁকা। কিছু

লতানে ঝোপ আর শ্যাওড়া গাছের জঙ্গল এবং জঙ্গলের ফাঁকে ওরা দুজন। ফেলু এবার গোপন কথাটা বলেই ফেলল, দিমু নাকি একটা গুঁতা।

জোটন এবার মরিয়া হয়ে বলল, তর ওলাওঠা হৈবরে নিব্বইংশা। পথ ছাড়, না হৈলে চিৎকার দিমু। বলা নেই কওয়া নেই এমন একটা হঠাৎ ঘটনার জন্য জোটন প্রস্তুত ছিল না। ফেলু হাসতে হাসতে বলল, রাগ করস ক্যান। তর লগে ইটু মসকরা করলাম। তারপর চারিদিকে চেয়ে ফের হাসতে হাসতে বলল, শীতলা ঠাইরেনের ডর আমারে দেখাইস না জোটন। কস্তু আইজ রাইতে মাথাটা লৈয়া আইতে পারি।

সামসুদ্দিন দলবল নিয়ে সঙ্গে যাচ্ছে। লীগের সভা বসবে, সহর থেকে মৌলভি সাব আসবেন। সুতরাং ফেলুকে নেতাগোছের মানুষের মতো লাগছে। পরনে খোপকাটা লুঙ্গি, গায়ে হাতকাটা কালো গেঞ্জী। আর গলাতে গামছাটা মাফলারের মতো বাঁধা। সে জোটনের পথ ছেড়ে দিয়ে তারপর আল ভেঙে হন্তদন্ত হয়ে যখন ছুটছে, যখন মাঠ থেকে ওলাওঠায় দেবীও গ্রামের ভিতরে অদৃশ্য তখন ধোঁয়ার মতো এক কুণ্ডলী গ্রাম মাঠ ছেয়ে উপরের দিকে উঠে আসছে। চৈত্রমাস, বড় দুঃসময়। জল নেই নদী-নালাতে, মাঠ শুকনো, পাতা শুকনো আর সারাদিন রোদে নাড়ার বেড়া খড়ের চাল তেতে থাকে। তখন গ্রামময় মহামারী—জোটন কাঁখের কলসী নিয়ে দ্রুত ছুটছে। সে দেখল পাশাপাশি গ্রামসকলের মানুষেরা এদিকেই ছুটে আসছে। যারা সোনালী বালি নদীতে তীর্থের জল আনতে গিয়েছিল তারা পর্যন্ত সব তীর্থের জল এই দুঃসময়ের আগুনে ঢেলে দিল।

কিন্তু এই আগুন, আগুনের মতো আগুন বাতাসের সঙ্গে মিলে মিশে অশিক্ষিত এবং অপটু হাতের গড়া সব গৃহবাস ছাই করে দিতে থাকল। জোটনের ঘরটা পুড়ে যাচ্ছে, আবেদালীর ঘরটা পুড়ে গেছে। আবেদালী জালালার অগোছাল শরীরটা সাপ্টে রেখে আগুনের হল্লা দেখছিল। আগুন গ্রামময় ছড়িয়ে পড়েছে—সুতরাং কাঁচা বাঁশ অথবা কলাগাছ এবং কাদা জল সবই অপ্রয়োজনীয়। আর চালের বাঁশ ফুটছে এবং বীভৎস সব দৃশ্য। যাদের কাঁথা বালিশ আছে তারা কাঁথা বালিশ মাঠে এনে ফেলল। জালালী তখন আমগাছের নীচে বসে কপাল চাপড়াচ্ছে। পুবের বাড়ির নরেন দাস একটা দা নিয়ে এসেছিল। সে কলার ঝোপ থেকে কলাগাছ কেটে দিচ্ছে। মানুষেরা সব হুমড়ি খেয়ে পড়ছে আগুন নেভানোর জন্য। মসজিদের জল

ফুরিয়ে গেছে। হাজিসাহেবের পুকুরে যে-জলানিটুকু ছিল তাও নিঃশেষ। মনজুরদের পুকুরে শুধু কাদা মাটি। ঝুড়ি ঝুড়ি সেই মাটি এখন সকলে তুলে আগুনের মত আগুনে নিক্ষেপ করছে। তখন দূরে ওলাওঠাদেবীর সামনে ঢাক বাজছিল, ঢোল বাজছিল। বিশ্বাসপাড়াতে হরিপদ বিশ্বাস হিক্কা তুলে মারা গেল। সাইকেল চালিয়ে গোপাল ডাক্তার বগলে সেলাইনের পেটি ভরে ছুটছে বাড়ি বাড়ি টাকার জন্য, রুগী-দেখার জন্য। সে যেতে যেতে আগুন দেখে অশিক্ষিত লোকদের গাল দিল। ফি-বছর হামেশাই কোনো-না-কোনো গ্রামে এমন হচ্ছে। হাতুরে বদ্যি গোপাল ডাক্তারের এখন পোয়াবারো। রুগী কামিয়ে অর্থ, গরীব লোকদের দুঃসময়ে সুদের টাকা আর জালের উপর ক্রীং ক্রীং বেল বাজিয়ে গোপাল ডাক্তার আগুন দেখছিল।

খড়ম পায়ে ছোট ঠাকুর পর্যন্ত এসেছিলেন। জোটন, আবেদালী এবং গ্রামের অন্য সকলে সান্ত্বনার জন্য ভিড় করে দাঁড়াল। ছোট ঠাকুর সকলের মুখ দেখলেন। সকলে জালালী এবং আবেদালীকে দোষারোপ করছে। ছোট ঠাকুর শুধু বললেন, কপাল। তারপর জোটনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ঠাকুরভাইরে দ্যাখছস ?

জোটন বলল, নাগ' মামা।

সামসুদ্দিনের দলটা অনেক রাতে সভা শেষ করে ফিরে এল। ওরাও ঘুরে ঘুরে সান্ত্বনা দিতে থাকল। আগুন নেভানোর চেষ্টায় বড় বড় বাঁশের লাঠি অথবা কাদামাটি নিক্ষেপ করে যখন বুঝল—কোনো উপায় নেই, সব জলে যাবে, তখন ওরা মসজিদের দিকে চলে গেল। মসজিদটা দাউ দাউ করে জলছে।

চোখের উপর গোটা গ্রামটা পুড়ে যাচ্ছে। বিশ্বাসপাড়াতে এখনও ওলাওঠাদেবীর অর্চনা হচ্ছে। মাঠে সব চাষের জমিতে কাঁথা পেতে যে যার ভস্ম ধন-সম্পত্তি আগলাচ্ছে। আগুনে ওদের মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। মাঠে মাঠে সব ছেলেরা ছুটোছুটি করছে, এই দুঃসময় ওদের কাছে খেলার সামগ্রীর মতো। কিছু কিছু মেয়ে পুরুষ এখনও আগুনের ভিতর থেকে খুঁচিয়ে পোড়া সামগ্রী যতটুকু পারছে বের করে নিচ্ছে।

যখন আগুন পড়ে এল এবং এক ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব—জোটন লোভে আকুল হতে থাকল। ঘন অন্ধকার চারিদিকে। থেকে থেকে ধোঁয়া উঠছে। সে অন্ধকারের ভিতর পোড়া ভস্ম ধন-সম্পত্তির আশায় চুপি চুপি হাজিসাহেবের

গোলাবাড়িতে উঠে এল। সে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছিল। সে ঘুরেও গেল কতকটা পথ। পোড়া পোড়া গন্ধ এবং আশে পাশে সব দুঃখী মানুষদের হা-হুতাশের শব্দ ভেসে আসছে। অন্ধকারে পরিচিত কণ্ঠ পেয়ে বলল, ফুফা আমার ঘরটা গ্যাল। ভালই হৈছে। ঘরটায় লাইগ্যা বড় মায়া হৈত। ইবারে যামু গিয়া কোনদিকে। পরিচিত মানুষটি বুঝল অনেক কষ্টে জোটন এইসব কথা বলছে।

পরিচিত মানুষটি কি বলতেই ফের ফিরে দাঁড়াল জোটন। বলল, হ। কারে কমু কন। পুরুষ মানুষ, দিন নাই রাইত নাই খামু খামু করে। কিন্তু তুই মাইয়া মানুষ হৈয়া আল্লুর হুকুম রাখলি না। উদাস কৈরা গতরে পানি ঢাললি।

জোটন বিড় বিড় করে বকতে বকতে গোলাবাড়িতে ঢুকে দেখল হাজিসাহেবের বড় বড় গোলা সব ভস্ম হয়ে গেছে। ধান পোড়া মশুরী পোড়া গন্ধ উঠছে। কোথাও থেকে এই দুঃসময়ের ভিতর একটা ব্যাঙ রূপ রূপ করে উঠল। জোটন আগুনের ভিতর খোঁচা মারল একটা। কিছু বের হচ্ছে না। অন্ধকারের ভিতর ছাইচাপা আগুন শুধু কতকটা ঝলসে উঠে ফের নিভে গেল। সেই আগুনে জোটনের মুখ পোয়াতির মুখের মতো। সেই আগুনে জোটন অন্ধকারে আর একটু যেন পথ চিনে নিল। তখন ঢাকের বাজনা ঢোলের বাজনা ওলাওঠাদেবীর সামনে। তখন হাজিসাহেব তাঁর তিন বিবির কোলে ঠ্যাং রেখে কপাল চাপড়াচ্ছেন আর হাজিসাহেবের উনিশ বেটার মাতাল বিবি মাঠের মধ্যে চষা জমির উপর বিছানা পেতে ওৎ পাতার মতো অপেক্ষা করছে। ভালই হল। দিয়ে থুয়ে গড়াগড়ি যাবে।

জোটনের মনে হল এই অন্ধকারে সে একা নয়। অন্য অনেকে যেন হাতে লাঠি নিয়ে পা টিপে টিপে আগুনের ভিতর ঢুকে খোঁচা মারছে। ওর দূর থেকে মনে হল হাজি সাহেবের একটা ঘর তখনও জ্বলেনি। অথবা জ্বলবে না। সে লাফিয়ে লাফিয়ে এগোল। ঘরের ভিতর সে অনেকগুলি পাট দেখেছিল। জোটনের পরান এখন ভাদ্রমাসের পানির মতো টল টল করছে। আর জোটন পায়ের শব্দে বলল, ক্যাডায় ?

অন্ধকারে মনে হল লোকটা ভয় ভয় করে কী যেন খুঁজছে।

জোটন ফের বলল, ক্যাডায় ?

আমি...আমি...।

জোটনের মনে হল ফেলু সেখ। সে অন্ধকারে সম্পত্তি চুরি করতে এসেছে।

জোটন তিরস্কারের ভঙ্গীতে বলল, নাম কৈতে পার না মিঞা! আমি ক্যাডায়?

আমি মতিউর। লোকটা যেন মিথ্যা কথা বলল।

তোমাগ আর মানুষগুলান কৈ?

আগুন দেখখ্যা পালাইছে।

তুমি এহানে কি করতাছ?

সানকিডা খুঁজতাছি।

হাজি সাব জানে না যে বৈঠকখানার টিনের ঘরটা পুইড়া যায় নাই।

আগুনে বড় ভয় হাজি সাহেবের। জোটন অনেক দূর থেকে কথা বলছিল। অন্ধকারকে এখন বড় ভয়। গলাটা স্পষ্ট নয়। গলাটা কখনও ফকির সাবের মতো, কখনও মনে হচ্ছে ফেলুই মতিউরের গলায় কথা বলছে। তারপর মনে হল অন্ধকারে লোকটা কুড়িয়ে কিছু পেয়েছে এবং পেয়েই এক দৌড়।

জোটন বলতে চাইল—ধর ধর। কিন্তু বলতে পারল না। সে নিজেও একটা সানকী খুঁজতে এসেছে, অথবা কিছু চাল, পোড়া ধান হলে মন্দ হয় না, পোড়া কাঁথা হলে মন্দ হয় না, আধপোড়া পাট হলে আরো ভালো অর্থাৎ এ সময়ে কিছু পেলেই হয়, সে এখন যা পেল তাই নিয়ে আমগাছের নীচে জড় করতে লাগল। আল্লালী সব সংরক্ষণ করছে। আবেদালী একটা গামছা মাথার নীচে নিয়ে গাছটার নীচেই শুয়ে ছিল। জোটনের এই লোভি ইচ্ছার জন্য আবেদালী থুথু ফেলেছিল কেবল।

তখন কান্না ভেসে আসছে বিশ্বাসপাড়া থেকে। তখন ওলাওঠার দেবীর সামনে আরতি হচ্ছিল। ওলাওঠাতে কেউ হয়ত মারা গেল। জোটন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে বিমূঢ়ের মতো সেই কান্না শুনছে। রাত তখন অনেক। মাঠের ভিতর দিয়ে কারা যেন নদীর পারের দিকে ছুটে যাচ্ছে। আর গাছের নীচে ইতস্তত সব লক্ষ জ্বলছিল। মাঠে একটা মাত্র হারিকেন। আগুন পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাতাস পড়ে গেছে। গরম গুমোট অন্ধকারে নিশ্চয় এতক্ষণে ফেলু সেখের ওলাওঠা, দেবী ওলাওঠার সঙ্গে তামাসা।

জোটন অন্ধকারে পা টিপে টিপে হাঁটল। দূরে হ্যারিকেনের আলোতে হাজী সাহেব অস্পষ্ট। তবু মনে হচ্ছে তিন বিবি কাঁধায় উপর পা রেখে গা টিপে দিচ্ছে। পাশে মেটে হাঁড়ি। হাজী সাহেব কেবল সোভান আল্লা বলছিলেন। তিনি ঘুমোতে পারছেন না। আর অন্ত সকলে মাঠের চষা জমিতে হোগলার উপর গড়াগড়ি দিতে দিতে ঘুমিয়ে পড়ল। সকাল হলেই রোজগারের জন্ত হিন্দুপাড়া উঠে যেতে হবে। এবং হিন্দুপাড়াতেই সব বাঁশ, কাঠ, সব শনের জমি ওদের। ওদের থেকে চেয়ে আনলে ঘরে এবং ঘর বানাতে বানাতে ঘোর বর্ষা এসে যাবে। জোটন এ-সময় নিজের ঘরটার কথা ভাবল, ফকির সাবের কথা ভাবল, ফেলু সেখ গুঁতা দিতে চায়, মজুরের মতো চোখে মুখে গরম ছিল না, চান্দের লাখান গড়বন্দি আছিল না···দিমু একদিন জরে একটা গুতা—এইসব বলে জোটন নিজের দুঃখকে জোড়াতালি দিয়ে পোড়া ভাঙা ঘরের ভিতর থেকে আর-একটা বদনা টেনে বের করেই এক দৌড়। সে নীচে নেমে জালালার পাশে বসে বলল, ছাখ কি আনছি।

জালালী ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বদনাটি দেখল। কুপির আলোতে আবেদালীর চোখ জল জল করছে। সে আর শুয়ে থাকতে পারছে না। একটা আস্ত পিতলের বদনা। সে বলল, ইট্টু পানি আনত, খাই। বলে বদনা দিয়া চক চক কৈরা পানি খাই।

জালালী বলল, আমি যামু খুঁজতে।

জোটন জল আনতে গেছে। সুতরাং আশেপাশে কেউ নেই। আবেদালী বসে এক থাপ্পর নিয়ে গেল গালের কাছে। বলল, মাগি তর এত সাহস, তুই যাবি চুরি করতে! পরে গামছা দিয়ে মুখ মুছল। ঘামে গরমে মুখ চুলকাচ্ছে। সে মুখ চুলকে আমগাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে সরে বসতেই দেখল জোটন অন্ধকারে ঝোপ ভাঙছে।

জালালী অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর কচ্ছপের মতো মুখ গলা লম্বা করে দিল এবং যেন বলতে চাইছে, তর লাইগাই তো নির্বংশা আগুন লাগল।

আবেদালী যেন বলছে উত্তরে, আমার লাইগ্যা বুঝি!

এবার জালালী খল খল করে উঠল, আমি সকলরে না কৈছিত কৈলাম কি!

কি কইবি ?

কমু তাইন আমারে ঘরে জোড় কৈরা ধৈরা নিছে।

ভাল করছি। তুই নাড়া দিয়া দিয়া মানতে মানতে মিষ্টি কৈরা হাসলি ক্যান।

তার লাইগ্যা আপনে বুঝি সময় অসময় বুঝবেন না !

গোটা ঘটনাই আগুনের মতো। চৈত্রের শেষ। আর মাঠে মাঠে চষাজমি আর সর্বত্র ওলাওঠা। সুতরাং দুঃসময়ে আলালীর মিঠা হাসি আবেদালীর শরীরে চৈত্রের ঠাণ্ডা পানির মতো। আবেদালী এবার আরও ঘন হয়ে বসল। বলল, আমার বুঝি ইচ্ছা হয় না ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করি। তারপর আবেদালী সে-দৃশ্যটা দেখল। পাঁজাকোলে করে ঘরের ভিতর নিয়ে যাওয়া এবং আলালীর মরার মতো পড়ে থাকার স্বভাব—সবই ঠাণ্ডা পানিকে বরফ করার মতো। আর তখন উঠোনে বাতাস, তখন পাখ-পাখালিরা গাছে গাছে চিৎকার করছে, তখন উনুনের আগুন সাপের মতো গর্ত থেকে বের হয়ে নাড়ার লেজ ধরে সামনে এগোচ্ছিল। ঘরের ভিতর আলালীর মরা মানুষের অভিনয়, আবেদালীর মেটে বদনা থেকে চক চক করে জল খাওয়া সবই অনর্থের সৃষ্টি করছে। চৈত্রের শেষ শুকনো পাতা উড়ছে আকাশে। অনেক উঁচুতে গাঙচিল আর কোনো দূরবর্তী পুকুরে গ্রামের সকলে পল ওছা জাল নিয়ে মাছ ধরে গেছে হয়ত—অসংখ্য চিল, বাজপাখি সেদিকটায় উড়ে যাচ্ছে।

জোটন ফিরে এসে পিতলের বদনাটা সামনে রেখে দিল। আবেদালী দেখল বদনাতে পানি নেই। সে ফ্যাল ফ্যাল করে জোটনের মুখ দেখল। অন্ধকার আর ঝোপ আশেপাশে। আবেদালী এবার নিজেই হামাগুড়ি দিতে দিতে অন্ধকারের ভিতর ঢুকে পড়ল যেখানে হাজী সাহেব, যেখানে তিন বিবি হোগলার বিছানাতে হাজী সাহেবকে নিয়ে শুয়ে আছে আর হারিকেনের আলো ঘুরে ফিরে ভোররাত্তের অন্ধকারকে সরিয়ে দিচ্ছে। অথবা আবেদালীর মনে হল—কোথাও পানি নেই, সাত রাজার ধন মানিক্যের মতো সকলে এখন পানি সঞ্চয় করে রেখেছে। সুতরাং আবেদালী পানি চুরি করার জন্য মাঠময় পাগলের মতো ঘুরে বেড়াতে থাকল।

রমানাথ রায়

ঘর

শোভনা একবার অসুখে পড়েছিল। আমি ডাক্তার ডেকে এনেছিলাম। ডাক্তার শোভনাকে দেখে ঘরের বাইরে পা দিয়ে বলেছিল, ঘরটা পাল্টানো দরকার। এ ঘরে কেউ বাঁচে না। কিন্তু শোভনা বেঁচেছিল। তবে তারপর তার শরীর দিনে দিনে খারাপ হতে শুরু করল। চোখের সামনে দেখতে লাগলাম, ওর সারা মুখ কিরকম ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ভারী ভয় হয় আমার। মনে হয়, ও হয়তো আর বাঁচবে না। আর তখন নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হয়। কেননা, এর জন্যে আমিই ত দায়ী। মনে আছে, প্রথম যেদিন ও এ ঘরে পা দেয় সেদিন এই ঘরের চারদিকে তাকিয়ে ওর মুখটা মুহূর্তের জন্যে কিরকম রক্তহীন হয়ে উঠেছিল। সেই মুখ আমি আজও ভুলতে পারি নি। তারপর অনেক বছর কেটে গেছে। এই নোনাধরা দেওয়াল, ফাটা ছাদ, ঠাণ্ডা বাতাস ওকে দিনে দিনে দুর্বল করে দিয়েছে। তবে এ নিয়ে ও কোনোদিন কোনো অভিযোগ করেনি। এটাকেই স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছে।

তবে মাঝে মাঝে ছুটির দিনে শোভনাকে ঘরের বাইরে নিয়ে যেতাম। কোনোদিন নিয়ে যেতাম ময়দানে, কোনোদিন সিনেমায়, কোনোদিন বা কারোর বাড়িতে। ভাবতাম, বাইরে বেরোলে ওর শরীরটা হয়ত সারতে পারে। একদিন ওকে বললাম, চল, দীঘা থেকে দুদিন ঘুরে আসি।

ভেবেছিলাম আমার কথা শুনে শোভনা খুশী হবে কিন্তু ও বলল, আমি যাব না।

একটু অবাক হয়ে জানতে চাইলাম, কেন?

শোভনা বলল, ভাল লাগে না। তুমি একাই ঘুরে এস। আমি আর যাব না।

আমি ওর কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে? শরীর খারাপ হয়েছে?

না।

তবে?

খুব বিরক্ত হয়ে শোভনা এবার উত্তর দিল, বললাম ত, ভাল লাগে না।

এরপর আর কোনো কথা বলা উচিত নয় মনে করে চুপ করে রইলাম।

শোভনা একদিন কাজ করতে করতে মাথা ঘুরে পড়ে গেল। আলমারির কোণায় চোট লেগে মাথার একপাশ কেটে গেল। আর এর পর থেকে মাথাঘোরা ওর একটা রোগ হয়ে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে ওর মেজাজটা পর্যন্ত রুক্ষ হয়ে উঠল। কোনো হাসি-ঠাট্টা আর সহ্য করতে পারত না। ওর সব কথার মধ্যেই একটা বিরক্তি প্রকাশ পেত। কোনো ভাল কথা বললে তার অন্যরকম মানে করে বসত। আমি রীতিমত ভয় পেয়ে গেলাম। আবার ডাক্তার ডাকলাম। সে আমায় বলল, এ ঘরে রুগীকে আর বেশীদিন রাখা ভাল হবে না। হয় ঘর পাল্টাতে হবে, নয় হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

খরচের কথা ভেবে আমি হাসপাতালের চিন্তা ত্যাগ করলাম। শোভনার জন্যে একমাত্র ঘর পালটানো ছাড়া অন্য কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যদিও জানি, ঘরের ভাড়া হয়তো একটু বেশি পড়বে, অসুবিধে হবে আমার, কিন্তু শোভনার জন্যে এটুকু অন্তত আমার করা দরকার। না হলে ওর কাছে আমি সারাজীবন অপরাধী থেকে যাব।

কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে কয়েক জায়গায় আমি দেখা করলাম। এক জায়গায় যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বলল, কিছুক্ষণ আগেই ঘর ভাড়া হয়ে গেছে। আর-এক জায়গায় বলল, ছেলেপিলে থাকলে ঘর ভাড়া দেব না। জিজ্ঞেস করলাম, কেন? উত্তর পেলাম, ঘরদোর বড় নোংরা হয়। অন্য জায়গায় দেখা করার সঙ্গে সঙ্গেই জিজ্ঞেস করল, কে ঘর নেবে? প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে না পেরে হতভম্ব হয়ে বললাম, আমি নেব। তারপর আমায় স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেওয়া হল ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার বা বড় অফিসার ছাড়া কাউকে ঘর ভাড়া দেওয়া হবে না। সেখান থেকে আমি মাথা নীচু করে চলে এলাম। কিন্তু আমাকে যে কেন ঘর ভাড়া দেওয়া হবে না তার কারণ ঠিক স্পষ্ট হল না।

এরপর প্রায় প্রত্যেককে ডেকে ডেকে ঘরের কথা বললাম। অনেকেই

প্রথমে মুখে অমায়িক হাসি এনে বলল, কথা দিতে পারছি না। তবে চেষ্টা করে দেখব। কেউ কেউ আবার বলল, তার নিজেরই ঘরের দরকার। সুতরাং…।

তবে যারা বলল চেষ্টা করবে, তাদের সঙ্গে পরে ঘন ঘন দেখা করতে লাগলাম। কিছুদিন পরে বুঝতে পারলাম, তারা আমার উপর বিরক্ত হয়ে উঠেছে। আমায় দেখলেই তারা এখন পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করে। আস্তে আস্তে আমি হতাশ হয়ে পড়লাম।

শেষে একজন আমায় এমন একটি লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল যার হাতে অনেক ঘর আছে, যে ইচ্ছে করলে যখন খুশি একটা ঘর জোগাড় করে দিতে পারে।

একদিন লোকটা আমায় একটা ঘর দেখাল। ঘরটার মধ্যে পা দিয়েই বেরিয়ে এলাম। কেমন একটা অদ্ভুত পচা গন্ধ আমার নাকে এসে লাগল। লোকটাকে এর থেকে ভাল ঘর দেখাতে বললাম।

সে আমায় আর-একদিন অন্য ঘর দেখাল। কিন্তু ওখানে জলের অসুবিধে হবে বলে মনে হল আমার। লোকটা আমায় আর-একটা ঘর দেখাল। ঘরটা তিনতলায়। ঘরে দুটো বড় বড় জানলা আছে। সারাদিন ঘরের ভিতর প্রচুর আলো থাকে। সবসময় বাইরের বাতাস আসে। এবং এখানে জলের কোনো কষ্ট হবে বলে মনে হল না।

বাড়ি ফিরে শোভনাকে ঘরটা দেখে আসতে বললাম। কিন্তু ও রাজি হল না। আমার পছন্দকে মেনে নিল। তারপর তাকে বললাম, ঘরটা বেশ বড়। হাত পা ছড়িয়ে একটু বসা যাবে। শুনে শোভনা একটু হাসল। সে হাসিতে আনন্দ না দুঃখ ছিল তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। তবে হাসিটা আমার কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয় নি।

আমি তাই জিজ্ঞেস করলাম, হাসলে কেন?

শোভনা জবাব দিল, এমনি।

না। এমনি না। তুমি কী একটা লুকোচ্ছ?

আবার একটু হেসে শোভনা বলল, তুমি কি যে বল।

ঠিক উত্তর না পেয়ে একটু ক্ষুব্ধ হয়ে বললাম, ঘরের তাহলে দরকার নেই?

দরকার নেই তো বলিনি।

তবে হাসলে কেন

একটু চুপ করে শোভনা বলল, একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?

কি ?

আমার জন্যে হঠাৎ এমন ব্যস্ত হয়ে পড়লে কেন ?

তার মানে ?

না, এমনি জিজ্ঞেস করছি।

আমি হতভম্ব হয়ে শোভনার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। ও এমন করে আমায় আঘাত করবে তা বুঝতে পারি নি।

কিছু পরে শোভনা হঠাৎ বলল, দেখো ত, কি বিশ্রী একটা অসুখ বাধিয়ে বসলাম।

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, ও নিয়ে বেশি ভেবো না। নতুন ঘরে গেলে ঠিক সেরে যাবে।

ছাই সারবে।

ছিঃ, এসব কথা বলো না।

শোভনা তারপর অন্যদিকে তাকিয়ে একটু টেনে টেনে বলল, মাঝে মাঝে ভাবি, আমার মরণ হয় না কেন ?

শোভনা, লক্ষীটি—

দেখ, আমি একটুও মিথ্যে বলছি না। যখন দেখি, আমার জন্যে তোমার একটুও শান্তি নেই, তখন খুব কষ্ট হয় আমার। নিজের ওপর কেমন ঘেন্না জন্মে যায়।

আচ্ছা, তুমি কি চাও আমি তোমার জন্যে কিছু করব না ? তুমি অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকবে, আর আমি চুপ করে বসে থাকব ?

শোভনা তারপর আমার বুকের মধ্যে ভেঙে পড়ে বলল, তুমি সত্যি করে বলো ত, ঠিক আগের মতো দেখো কি না ?

আমি তার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললাম, সত্যি বলছি, ঠিক আগের মতোই তোমায় দেখি।

ঠিক আগের মতো ?

হ্যাঁ, ঠিক আগের মতো।

আমায় একটুও ঘেন্না কর না ?

আঃ, কী যে বল। এখন ঘুমোও তো। কোনো কথা বল না।

শোভনা তারপর চুপ করল। আর কোনো কথা বলল না।

সামনের মাসের প্রথম তারিখে আমরা নতুন ঘরে চলে এলাম। শোভনা ঘরে পা দিয়ে চারদিকে ভাল করে তাকাতে লাগল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেমন হয়েছে?

শোভনা বলল, খুব ভাল হয়েছে।

তারপর শোভনা একাই ঘর সাজাতে বসে গেল। আমি ওকে বাধা দিলাম। বললাম, ওসব তোমায় করতে হবে না। তোমার শরীর খারাপ। আমিই করছি।

কিন্তু শোভনা আমার কথা শুনল না। বলল, তুমি চুপ করে বসে থাকো তো। তবে মাঝে মাঝে সাহায্য করো। তাহলেই হবে।

এই সময় ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ভারী ভাল লাগল আমার। মনে হল, ওর শরীর থেকে সমস্ত ক্লান্তি যেন মুছে গেছে। বুঝতে পারলাম কাজটা ওর খুব ভাল লাগছে।

একটু পরে শোভনা জিজ্ঞেস করল, একটা কথা বলব?

কি?

বল, রাখবে।

রাখব।

জান, আমার ভারী ইচ্ছে ঘরটা একটু নতুন করে সাজাই।

তা সাজাও না। এ ত' ভাল কথা।

শোভনা তখন ছোট মেয়ের মতো আদুরে গলায় বলল, কয়েকটা জিনিষ কিনে আনতে হবে।

কি?

একটা ফুলদানি। টেবিলের ওপর ওটা বসানো থাকবে। নইলে টেবিলটা কেমন ন্যাড়া ন্যাড়া দেখায়।

আর কি?

একটা ছবি। ঘরের দেওয়ালে টাঙানো থাকবে। জানো, ঘরে ছবি না থাকলে ঘরটা ঠিক মানায় না। আর—

আর কি আনব?

আর যদি খুব একটা অসুবিধে না হয় ত বলি।

কি বলই না! কোনো অসুবিধে হবে না।

একটা পর্দা কিনে এনো। দরজায় টাঙাবো। আমার অনেক দিনের শখ।

শোভনার কথামত একটা ফুলদানি, একটা ছবি আর একটা পর্দার কাপড় কিনে আনলাম।

সেগুলো হাতে পেয়ে খুব খুশি হল শোভনা। একবার শুধু জিজ্ঞেস করল, খুব অসুবিধে হল তোমার ?

—এতে অসুবিধে হবে কেন ? কি-ই বা দাম এগুলোর। আর এবার থেকে তোমার যা ভাল লাগবে বলো, কিনে দেব।

চোখের সামনে দেখতে পেলাম, নতুন ঘরে এসে শোভনার শরীর যেন আস্তে আস্তে ভাল হয়ে উঠল। চোখের কোল থেকে কালি মুছে গেল। মুখে আবার লাবণ্য ফিরে এল। আমি ভাবলাম, শোভনার অসুখটা তাহলে সেরে গেছে। ডাক্তার ডাকা আর প্রয়োজন মনে করলাম না।

কিন্তু বেশ কয়েক মাস পর হঠাৎ একদিন শোভনার শরীরটা যেন টলে উঠল। আর একটু হলে পড়ে যেত। কোনোরকমে দেওয়াল ধরে নিজেকে সামলে নিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি হল ?

কিছু না।

তবে অমন করলে কেন ?

না, মাথাটা একটু ঘুরে উঠল কিনা, তাই।

আমি কিছু বুঝতে পারলাম না। আমার তখন মনে হল, এটা কিছু নয়। এরকম অনেকেরই হয়ে থাকে। তবে কিছুদিন পর আমার চোখে পড়ল, শোভনার মুখটা যেন ক্রমশ শুকিয়ে যাচ্ছে। চোখের কোলে কালি পড়ছে। আর সব সময় কেমন বিষণ্ণ হয়ে থাকে। ভাল করে কথা বলে না পর্যন্ত। তখন আমার কেন যেন সন্দেহ হল, আবার হয়তো সেই রোগটা দেখা দিয়েছে।

একদিন আবার সেই ডাক্তারকে ডেকে আনলাম। ডাক্তার শোভনাকে দেখতে দেখতে একবার ঘরের চারদিকে তাকিয়ে নিল। তারপর ঘরের বাইরে পা দিয়ে বলল, ঘর পালটাতে হবে।

আমি বলে উঠলাম, আবার ?

হ্যাঁ।

কিন্তু, এই ত সেদিন পাল্টালাম।

ডাক্তার সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলল, ঘরটার দিকে একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখবেন।

আমি ফিরে এসে ঘরের চারদিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। দেখতে পেলাম গোটা ঘর তক্তপোষে, আলমারিতে, আলনায়, আয়নায়, ক্যালেণ্ডারে, টেবিলে, চেয়ারে, নানান সুটকেশে ট্রাঙ্কে এমন ভর্তি হয়ে আছে যে দম বন্ধ হয়ে আসে। কিন্তু এগুলো কখন যে আস্তে আস্তে গোটা ঘর জুড়ে বসেছে তা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

শোভনা এমন সময় জিজ্ঞেস করল, ডাক্তার কি বলল ?

আমি খুব আস্তে আস্তে বললাম, আবার ঘর পাল্টাতে হবে।

রাম বসু

হৃদয় স্বচ্ছ হলে

হৃদয় স্বচ্ছ হলে বর্শার পাশে কাঁটার আগুন জ্বলে আর অসীম ধর্মে যে পাথর গায়ে শ্যাওলার নকশা থাকে তাকে উৎকীর্ণ ফলক বলে মনে হয়। আমরা অনুশাসন এখন খোদাই করতে পারি।

মুক্ত বাতাসে মানুষের মুখের রঙ বদলায়। নির্জন সিংহতোরণে যে সূর্য প্রেমিকের অপূর্ব হিংস্রতায় স্থির তার জটিল অনুরাগে লোলচর্ম শীত অস্থি পৃথিবীতে বরবর্ণী নায়িকা। আমি যে নারীকে ভালবাসি সে দ্বিতীয় পৃথিবী। তার উদ্ভিন্ন জলরেখায় ফসলের অম্লান অবগাহন। জন্ম আর মৃত্যুর মতো প্রবল ও নিষ্ঠুর তার প্রেম আর ঘৃণা।

সারাওয়ার দীর্ঘ সুঠাম গাছ পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছে শ্রম-পুষ্ট পরিচ্ছন্ন শস্যের আর উত্তপ্ত শয্যার। চিত্রিত থামের মতো রমণীর ঊরু চূর্ণ হতে চায় বর্বর আঘাতে। উজ্জ্বলতম নারীর হাসির মতো বর্শা কুকুরের সমস্ত চিৎকারকেও ডুবিয়ে দেয়। গাছের ছায়ার নিচে মোরগী শাবককে খাওয়ায়। আমি অবাক হয়ে যাই মৃত্যুর চেয়েও পুরাতন সেই অন্ধকার জীবনের উপকণ্ঠে এসে।

সহযাত্রী, আমার শিরায় তরুণী গাছের বিহ্বল সংলাপ। উন্মত্ততায় আমার সমাধির কথা তোমরা ভেবো না। বলিরেখা আর ক্লান্তিতে পীড়িত দেহ ছায়ার নম্রতায় প্রসারিত করতে চাই যেন বাকহন্তার মুখের চেয়েও মদির হয়ে ওঠে ভবিষ্যৎ।

ঘুমিয়ে পড়লে ডেকে দিয়ো কিন্তু। জানই ত' পূবের আকাশ রক্ত-পাঁকে ডোবা। মৃত ঘোড়া পড়ে আছে। আমাদের নিশানা পোঁতা হয় নি এখনও। উন্মাদ চিৎকারে শিশুরাও ঘুমের ঘোরে আঁৎকে ওঠে। কোমল টুকটুকে জিভ দিয়ে বারুদের গন্ধ চেটে নেয়। কৃপাণগুলো ঠিক করে রাখ।

হৃদয় স্বচ্ছ হলে কাঁটার আগুনে ঝলসানো কৃপাণের পাতে পরস্পরের মুখ দেখে নিও, সহযাত্রী।

চিত্ত ঘোষ

বাহিরে

আমার শীতল ছায়া রৌদ্রকে দিয়েছি :

টলটলে জলের বিন্দু ঝরে গেছে পটভূমি থেকে
কাছে নদী, দূরে বহে যায়
ঝরে যায় মুখের পল্লব, ভালবাসা
ভেসে যায় স্মৃতির মাস্তুল।

আমের পল্লবে কেউ সিঁদুরের কৌটা দিয়েছিল
ধবল শঙ্খের ধ্বনি সন্ধ্যাকে বাজিয়েছিল সুরে।

দূরের পাহাড়ে সেই দিনকে জ্বালিয়েছিলে তুমি
রাত্রির খননে সেই দিনকে নিবিয়েছিলে তুমি
সকালের দাগগুলো ধুয়ে যায় জলে
আহত পাখির শব্দ টলটলে অশ্রু উপকূলে
সেতুহীন দূরত্বের দিকে চলে গেল।

বর্ণের বাহিরে সেই মুখ
শব্দের বাহিরে তার ছায়া

আমার শীতল ছায়া রৌদ্রকে দিয়েছি।

তরুণ সান্যাল

চন্দ্রমল্লিকা

রাত্রিগুলি নিশীথনক্ষত্রমালাবৃত
রাত্রিগুলি দূর যবনিকা ঢাকা
কুয়াশার পারাপারে
চাঁদের নৌকাটি দেখাবে কী !
অত তপ্ত নিশীথিনী আমার
চুম্বনরাগে নয়,
অত রাগী চাঁদ আমি বাসর সাজাতে পারবো না :
বড় চন্দ্রমল্লিকার চাল চাল বিষাদ সম্ভারে
আমার প্রবল শাদা করোটি কেমন করে ফোটে !

বহু সম্ভাবনা ছিল বীজের গোপন ঘরটিতে
কেমন মাঠের গন্ধ, আর্দ্র, যৌন
পেশল কোমলে—
পশ্চিমে রোদের চিক ঢাকা দিলে ঘেরা বারান্দাটি
মাঘ শেষে বৃষ্টিধারা ধকদেশে ছুঁয়ে নেয়
কালো তৃষ্ণ মাটির সম্ভ্রম
বহু সম্ভাবনা নিয়ে তিনটি চাষার ছেলে
কোমলে যে নখ আঁকে
ছিটকে ফাটে বিদ্যুতে কণ্ঠকীটে তার আলা ।

এই সব পরিণতি কেমন যথার্থ মনে হয় ?

ছোটনাগপুর ছুঁয়ে, ক্ষত নামে সমতলে গাজন ভৈরব
কেমন বাহুর বাঁধে তাকে তুমি এনেছো শয্যায়,
শ্যামল, এমন দান্ত শুভ মনে হয়,

একেক চুম্বনে ফাটে দূর লক্ষ্যে বিদায় কামান
　　　　কলকাতায় বেণ্টগুলি কনভেয়ারে ঘুরে যায়
　　　　　　কেমন ত্বরায় অবলীলায়
আমার চোখের রুক্ষ জটাজালে ফুটে ওঠে
　　　　মধ্যরাতে ভ্রমিত্ত ইস্পাতবাগে রাঙা
চারটি সাঁওতাল ছেলে পাণ্ডুয়ার অন্ধকারে
　　　　　　বাসের ভেঁপুতে নেমে গেল ট্রেন থেকে
...অথচ কর্কশ গলা চতুর্দিকে
　　　　কাজ চাই
　　　　　　খাদ্য চাই
　　　　　　　　পয়ারপতন মনে হয় ?

ঢের কুয়াশার পারে আমার জন্মের তারা চিনি ?

লগ্নগুলি দ্রুত পরিবর্তমান,
　　　　রাশিগুলি তেমনি স্থবির—
খগোলে একেক দিন বড় বেশি হা অন্ন চিৎকার
...বিপুল পুরুষ লোকোমোটিভের দুইপাশে
　　　　দৌড়ে যায় যুবতী প্রান্তর, জনপদ
গহন প্রেমিক, ওহে নিঠুর দরদী
　　　　　　　　আত্মস্মৃতি :
এই লগ্নগুলিকে কী মণ্ডলগ্রামের ভিখু মুন্সীর হাতের তালু বলে
　　　　　　　　　　ভ্রম হয় ?

ঢের বড় চাল চাল শাদা চন্দ্রমল্লিকা বাগানে
　　　　এই বার্ষিক উৎসবে
ফুলগুলি কেন যেন বড় রাগী, তপ্ত কিন্তু চাঁদ মনে হয় ?

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

সন্ধ্যায় দিলো না পাখি

শালিখের ডাকে আমি হয়েছি বাহির
রোজ ঘর থেকে
পাতায় লুকায় সে যে ঢেকে
জনশূন্য অথচ নিবিড়
এ-উঠানে শালিখেরই ভিড়।

দুপুরের শালিখের হাতে
ভাসিয়ে দিয়েছি অকস্মাতে
চেতনার পাখা—
ডাকের আড়ালে তার বেদনাই রাখা।

সন্ধ্যায় দিলো না আর প্রতি-ডাকে সাড়া
শালিখের দল
আমার জীবন যেন শ্রুতির নিষ্ফল
প্রবাসের পাড়া
সন্ধ্যায় দিলো না পাখি প্রতি-ডাকে সাড়া।

অন্নদাশঙ্কর রায়

ঋষি শোয়াইটৎসার

কান্টের উপর থীসিস লিখে চব্বিশ বছর বয়সে ডক্টরেট এমন কিছু অসামান্য প্রতিভার পরিচায়ক নয়। কিন্তু তার পরে যীশু খ্রীষ্টের ঐতিহাসিকতার অন্বেষণ, প্রচলিত ধারণার খণ্ডন ও নতুন ধারণার গোড়াপত্তন যেমন সাহসিক তেমনি সাধ্যসাপেক্ষ। ত্রিশ বছর বয়সের শোয়াইটৎসার কেবল যে দ্বিতীয়বার ডক্টর তাই নয়, দেশবিদেশের খ্রীষ্ট-জিজ্ঞাসার অন্যতম প্রসিদ্ধ জিজ্ঞাসু। স্ট্রাসবুর্গের বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্ববিভাগের অধ্যক্ষ পদে আসীন। উপরন্তু গির্জায় গিয়ে ধর্মযাজক। এটা পৈতৃক বৃত্তি।

সঙ্গে সঙ্গে চলছিল সংগীতসাধনা। অর্গানবাদনেও তিনি একজন গুণী। এই সূত্রে তাঁকে বাখ্ সম্বন্ধে একখানি বই লিখতে হয়। প্রথমে অর্গান সংগীত অবলম্বন করে, পরে বাখ্-রচিত অন্যান্য সংগীত একত্র করে। বাখ্ সম্বন্ধে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও ব্যাখ্যা তাঁকে একত্রিশ বছর বয়সেই দেশবিদেশে বিখ্যাত করে দেয়। অর্গান বাজিয়ে ও সংগীতের উপর ভাষণ দিয়েও তিনি যশ ও অর্থ অর্জন করতে পারতেন। ইউরোপ ও আমেরিকায় তাঁর জীবনের ক্ষেত্র সুদূর-প্রসারিত। কোন্ দুঃখে তিনি আফ্রিকায় গিয়ে অরণ্যবাস করবেন!

না, তখনি যান না। তার আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-পদ ত্যাগ করে আবার কেঁচে ছাত্র হতে হয়। এবার চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্র। পুরো ছ'বছরের কোর্স তাঁকে ধীরে ধীরে অতিক্রম করতে হয়। সাধারণ ডাক্তারি ছাত্রদের সঙ্গে। তাদেরি মতো। তৃতীয়বার ডক্টর হয়ে যখন তিনি বেরোন তখন তাঁর বয়স সাঁইত্রিশ বছর। ইচ্ছা করলে স্বদেশেই চিকিৎসা করতে পারতেন। কিন্তু চিকিৎসাটা তাঁর বেলা নিমিত্তমাত্র। উদ্দেশ্য খ্রীষ্টানুসরণ। খ্রীষ্টধর্ম কেবল কতকগুলো তত্ত্ব নয়। সেটা একটা পন্থা। যীশু যে-পথে গেছেন তাঁর শিষ্যকেও সেই পথে যেতে হবে। যারা সবার পিছে, সবার নিচে, সব চেয়ে লাঞ্ছিত, সব চেয়ে বঞ্চিত তাদের বোঝা কাঁধে তুলে নিতে হবে। যে ব্যক্তিগত যাতনা থেকে মুক্ত তার কর্তব্য অপরের যাতনা মোচনে সাহায্য করা।

অথচ তিনি মিশনারী নন। তিনি কাউকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে চান না। খ্রীষ্টধর্ম বলতে যীশু যা বুঝতেন বিশ শতাব্দী ধরে তাঁর

নামে প্রতিষ্ঠিত ধর্মসঙ্ঘ তাকে জটিল তত্ত্ব দিয়ে দুর্বোধ্য করে তুলেছে। শোয়াইটৎসারের নিজেরি তাতে আপত্তি। তাই নিয়ে পাদ্রীদের সঙ্গে অবনিবনা। পাদ্রীদের সঙ্গে বিতর্কে না নেমে তিনি বরঞ্চ আপনার জীবন দিয়েই আপনার বাণী ব্যক্ত করবেন। "আমার জীবনই আমার বাণী।" খ্রীষ্টশিষ্যের মতো জীবনযাপন করতেই তাঁর আফ্রিকা-যাত্রা। বাল্যকালে কোলমার শহরে একটি নিগ্রোর মূর্তি দেখে অবধি তাঁর হৃদয় ব্যথিত ছিল আফ্রিকার অত্যাচারিত মানুষের জন্তে। শ্বেতাঙ্গরা যেন বাইবেলের Dives আর কৃষ্ণাঙ্গরা Lazarus, মনে মনে তিনি অসহায় লাজারসের দিকে। লাজারসকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে হবে। এটা একজন সাধারণ মিশনারীর অন্তরের প্রেরণা নয়। শোয়াইটৎসার সাধারণ মিশনারী নন। সাধারণ খ্রীষ্টান নন। আদি খ্রীষ্টানদের মতো সাক্ষাৎ খ্রীষ্টশিষ্য।

কিন্তু যুগটা তো প্রথম শতাব্দী নয়। বিংশ শতাব্দী। ইউরোপে তাঁর জন্ম ও শিক্ষা। তাঁর স্বীয় শতাব্দীর তথা স্ব-মহাদেশের সন্তান তিনি, আফ্রিকার বা প্রথম শতাব্দীর একজন নন। তাই তাঁকে পদে পদে হোঁচট খেতে হয়েছে। আফ্রিকার গভীর অরণ্যে ভয়ানক সব রোগের সঙ্গে সংগ্রাম করে যাওয়া প্রত্যেক দিনই বিপজ্জনক। পিছনে রাজশক্তি বা মিশন সংহতি নেই। শোয়াইটৎসার মাঝে মাঝে ইউরোপে গিয়ে অর্গান বাজিয়ে বা বক্তৃতা দিয়ে বা বই লিখে টাকা তোলেন। আদর্শবাদী ডাক্তার বা নার্স সংগ্রহ করেন। কায়ক্লেশে হাসপাতাল ও আশ্রম চালিয়ে যান। রোগীরা সেখানে সপরিবারে বাস করে। কুষ্ঠরোগীদের স্বতন্ত্র উপনিবেশ। চারদিকে গাছপালা, পশুপাখি! পালিত পশুপাখিদের অবাধ গতি। জীবহত্যা নিষেধ। সব দিক মিলিয়ে শোয়াইটৎসার একজন খ্রীষ্টান সেণ্ট, সেই সঙ্গে একজন আর্য ঋষি।

তাঁর নিজস্ব মতবাদও তাঁকে প্রাচ্যের নিকটতর করেছে। আফ্রিকায় তিনি যান প্রথম মহাযুদ্ধের বছরখানেক আগে। সঙ্গে নববধূ। এক বিশিষ্ট অধ্যাপককন্যা, নিজেও বিদুষী। স্বামীর ব্রতে আত্মনিয়োগের জন্তে শিক্ষিতা নার্স। কিন্তু হাসপাতালের কাজ শুরু করে দেবার কিছুদিন বাদেই মহাযুদ্ধ বেধে যায়। তাঁদের যেটা কর্মস্থল সেটা ফরাসীশাসিত অঞ্চলে। অথচ তাঁরা আলসাসের অধিবাসী বলে তখনকার দিনে জার্মান প্রজা। ফরাসী সরকার তাঁদের বন্দী করে ফ্রান্সে চালান দেয়। শাপে বর হয়। বন্দীজীবনের অবসরকালে শোয়াইটৎসার আবার অধ্যয়নে মন দেন। মননের সময় পান।

সভ্যতার ক্ষয় ও পুনরুদ্ধার, সভ্যতা ও নীতি নামে দু'খণ্ড সন্দর্ভ লেখেন। তাঁর স্বকীয় সিদ্ধান্ত তিনি সেই সময় আবিষ্কার করেন। সভ্যতার ধারক হবে প্রাণের প্রতি শ্রদ্ধা। আমাদের ঋষিরা হলে বলতেন অহিংসা।

এমন মানুষ কখনো যুদ্ধবিগ্রহ সমর্থন করতে পারেন না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের পর থেকে তার প্রতিবাদ করে আসছেন যে কয়জন মনীষী ও সাধু শোয়াইটৎসার তাঁদের পুরোভাগে। শান্তির জন্যে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য সেটা তিনি লাম্বারেনে আশ্রমের কাজে ব্যয় করেন। বাইরে থেকে চাঁদা ইদানীং যথেষ্ট মেলে। কিন্তু তার বিপদ হচ্ছে পরের টাকায় বড়মানুষী করা ও বড়মানুষী করতে শেখানো। এ দুটি তিনি কঠোর হাতে দমন করেছেন। যেমন আদিম পরিবেশ, তেমনি আদিম জীবনধারা। আধুনিকতার সঙ্গে যেটুকু আপস না করলে নয়। গড়তে যাব সেবাগ্রাম অথচ সেটা হবে যন্ত্রযুগের শহর এতে তাঁর আন্তরিক আপত্তিকে অনেকেই আজকাল ভুল বুঝতে আরম্ভ করেছেন। এঁদের মতে তিনি একটি ফসিল। অথচ গান্ধীর পরে অত বড় খ্রীষ্টানুসারক যে আর জীবিত নেই এটাও বহুজনের স্বীকৃত।

লাম্বারেনে এখন আর অসহায় নয়। নির্যাতনের যুগ শেষ হয়ে আসছে। আধুনিকতম চিকিৎসা আফ্রিকানদেরও কাম্য। দিকে দিকে হাল ফ্যাশনের হাসপাতাল মাথা তুলছে। গ্রাম হয়ে উঠছে শহর। বন কেটে বসত হচ্ছে। আর কিছুদিন পরে চিনতে পারা যাবে না যে ওর নাম আফ্রিকা। স্বাচ্ছন্দ্যের মান পশ্চিমের মতো হবে। এই পরিবর্তনের মাঝখানে অপরিবর্তনীয় যদি কিছু থাকে তবে তা মানুষের গায়ের রং। কালো মানুষ শাদা হবে না। শাদা মানুষ কালো হবে না। এই নিয়ে যে-সংঘাত এর পদধ্বনি এখনি শুনতে পাওয়া যায়। শোয়াইটৎসার এর কী করতে পারেন? বিশ্বশান্তির জন্যে ব্যাকুল এই মহাপ্রাণ আফ্রিকার বিশেষ সংকটের বেলা অক্ষম কেন?

নব্বই বছরের এই অক্লান্তকর্মীকেও জবাবদিহি করতে হচ্ছে, কেন তিনি শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের মাঝখানকার প্রাচীর ভেঙে দেন নি? কেন তিনি সামাজিক ব্যাপারে রক্ষণশীল? তাঁর ভক্তরাও তাঁর পক্ষ নিতে দ্বিধান্বিত। শাদা আর কালো মিশ খাবে না, এই কি তাঁর নীতি? তা যদি না হয়ে থাকে তবে মিশ্রণের প্রমাণ কোথায়? তবে তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে জাপানীও আছেন, আফ্রিকানও আছেন, এক সঙ্গে কাজ করতে বাধা নেই। তার উপরে যেটুকু অর্থাৎ সামাজিক যোগাযোগ সেইখানেই প্রশ্ন। নব্য আফ্রিকানরা সেখানে নাছোড়বান্দা।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা কথাসাহিত্যের সত্যভঙ্গ

গত কয়েক বছরের বাংলা কথাসাহিত্যের অবস্থা লেখক, পাঠক এবং সমালোচক কারো কাছেই বিশেষ উৎসাহব্যঞ্জক নয়। নানাভাবে এই উৎসাহ-বিনাশক অবস্থার ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা আমরা করে থাকি। সাহিত্যের বাজার, দেশের সর্বাঙ্গীন অবস্থা প্রভৃতি একাধিক কারণের সাহায্যে আমরা গত কয়েক বছরের বাংলা কথাসাহিত্যের ব্যর্থতার বিষয়টি বোঝাতে চাই। বোঝাতে চাই কতকটা এই কথা যে বর্তমান অবস্থাটি ছিল অনিবার্য। খুব কম ক্ষেত্রেই আমরা বুঝতে চেয়েছি বাংলা কথাসাহিত্যের সাম্প্রতিক দৈন্যের অন্তর্গত সমস্যাকে। সব ক্ষেত্রেই দোষটা অবশ্য আমাদের নয়। বিষয়টির গভীরে যাবার আগে এ প্রসঙ্গে পুনরায় একটি পুরনো, কিন্তু অতিপরিচিত বলেই বিস্মৃত কথা স্মরণ করাতে চাই। কথাটি হল এই যে বর্তমানের জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ সকল কথাসাহিত্যিকই গল্প-উপন্যাস লিখতে যতটা ইচ্ছুক, তাঁদের গল্প-ভাবনা এবং উপন্যাস-ভাবনা নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে ততটাই অনিচ্ছুক। অন্যদিক দিয়েও বলা যায় বাংলা উপন্যাস-সমালোচনার ক্ষেত্রে বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের ইতিহাসের সাধারণ নিয়ম কার্যকর হয়নি। বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের সারালো অংশ গড়ে উঠেছে পণ্ডিতী সমালোচনার চৌহদ্দির বাইরে বাঙালি কবি এবং লেখকদের সৃষ্টিশীল প্রতিভার সঙ্গে যুক্ত হয়ে। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরী প্রমুখের হাতেই বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য সাবালকের মুক্তি অনুভব করেছে। পরবর্তী পর্যায়েও তার ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলা উপন্যাস-সমালোচনার সঙ্গে কোনো বাঙালি ঔপন্যাসিকের উপন্যাসশিল্প-ভাবনা যুক্ত হয়ে নেই। আমাদের ঔপন্যাসিক ও গল্পকারদের গোষ্ঠীর বাইরেই আমাদের কথাসাহিত্য-সমালোচনা গড়ে বেড়ে উঠেছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বইখানির কথা বাদ দিলে এটাই সাধারণ সত্য। তার ভালমন্দ যাই হোক একটা ফল অনিবার্য হয়েছে—তা হল লেখকে সমালোচকে

বিচ্ছেদ। কারণ বাঙালি কথাসাহিত্যিক বেশ ভাল করেই জানেন যে বাঙালি অ্যাভারেজ পাঠক দায়ে না পড়লে সমালোচনা পড়েন না। সুতরাং বাঙালি কথাসাহিত্যিকের পক্ষে সমালোচনা-নিরপেক্ষতার নাম করে সমালোচনা-বিমুখতাকে প্রশ্রয় দেওয়াই চাতুর্য-সংগত ব্যাপার। অবশ্য ঔপন্যাসিক এবং গল্পকারদের নিজস্ব কথাও বিচার্য। গবেষণামুখী পণ্ডিতী সমালোচনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে মুখে মুখে স্বীকার করেও তার সীমাবদ্ধতাকে বাঙালি কথাসাহিত্যিকেরা যে অনুভব করেছেন এ অনুমান ভিত্তিহীন নয়। তাঁরা দেখেছেন যে বাংলা কথাসাহিত্য-সমালোচনা সর্ব ক্ষেত্রেই আলোচ্য সাহিত্যের ব্যাখ্যা মাত্র। সেখানে সদাই একজনের কথা অন্য একজনে অপর একজনকে বোঝাচ্ছেন। এবং লক্ষ্য সেখানে কোনোসময়েই লেখক নন, পাঠক। তাই হেনরী জেম্‌স, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ বা লরেন্সের মতো শিল্পীর ভাষায় ও ভঙ্গিতে নিজের নিজের শিল্পভাবনার কথা যদি কোনো বাঙালি লেখকের মুখ থেকে শোনা যেত তাহলে পাঠকেরা শিল্পবিচার ব্যাপারটিকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করতেন, লেখকেরা এদেশে একমাত্র নিজের লেখা ছাড়া অন্যের লেখা পড়েন না, এই অপবাদ থেকে মুক্ত হয়ে সমালোচনা জগতে মুক্ত আকাশের হাওয়া আনতে পারতেন—এবং আমাদের পণ্ডিতী সমালোচনা তার সমস্ত জ্ঞানগাম্ভীর্য সত্ত্বেও ব্যাপারটিকে সাধুবাদ জানাত।

দুই

টমাস মানের চেখভ-ভাবনার মতো প্রতিভা-দীপ্ত শৈল্পিক অভিজ্ঞতার নিদর্শন বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক পটে অবশ্যই সহজপ্রাপ্য হবে না। কিন্তু কোনো কথাসাহিত্যিকই কি মম্‌-এর মতো আত্মগত স্বচ্ছন্দভাবেও সাহিত্য-ভাবনাকে এখানে ব্যক্ত করতে পারতেন না? নিজের ও অন্যের শিল্পভাবনা সম্বন্ধে বাঙালি কথাসাহিত্যিকের নীরবতার তা হলে একটামাত্র অর্থই সম্ভব, তা হল এঁদের সে বিষয়ে কোনো ভাবনা নেই। কয়েক বছর আগে কোনো সাহিত্য-সাপ্তাহিক তাদের রবীন্দ্রসংখ্যায় তরুণ লেখকদের আহ্বান করেছিলেন প্রবীণ প্রতিষ্ঠিতদের সম্বন্ধে আলোচনা করতে। উদ্যোগের আন্তরিকতা সত্ত্বেও সংখ্যাটির অধিকাংশ রচনাই অর্থহীন বাগাড়ম্বরে পর্যবসিত হয়েছিল। যে-কৌশলে শারদীয়া সংখ্যার লেখা সম্পন্ন হয়ে থাকে, এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা-আসরেও আমাদের তরুণ লেখকেরা ঠিক সেই কৌশলই অবলম্বন করেছিলেন।

না করে তাঁদের উপায়ও নেই। কেন না, গত কয়েক বছরের বাংলা কথাসাহিত্যের প্রধানাংশের মূল চারিত্র হল বাস্তব সম্বন্ধে অসহায়ত্ববোধ। এবং সেই অসহায়ত্ববোধ ধীরে ধীরে তাঁদের বাস্তব-সম্বন্ধীয় প্রবঞ্চনার দিকেই ঠেলে দিয়েছে। স্বদেশের উপন্যাস-সাহিত্যের একশ বছরের বিভিন্ন পর্যায়ের অভিজ্ঞতায় এ জাতীয় অবস্থা আর কখনো ঘটেছে বলে মনে পড়ে না। এমন গণনীয় উপন্যাস কোথাও কোনোদিনই লেখা হয়নি যে-উপন্যাসের কথাবস্তু একটা কোনো না কোনো তীব্র নৈতিক আকর্ষণ-বিকর্ষণের প্রসঙ্গেই চূড়ান্ত তাৎপর্য পায় নি! এবং সে নৈতিক প্রশ্ন শেষ অবধি একটি নিবিষ্ট মানবিক জিজ্ঞাসাই বটে। বর্তমান শতাব্দী এই প্রশ্নে আরো চঞ্চল এবং আরো তদ্‌গত। পিরানদেল্লো অথবা স্টাইনবেক, কিংবা ফক্‌নার ও গ্রাহাম গ্রীন, কিংবা কাফকা কি টমাস মান, অথবা সার্ত্র কিংবা কাম্যু—সকলের মধ্যেই মানুষের অস্তিত্বের মূলীভূত সমস্যার নানা রূপায়ন লক্ষ করা যায়। এদের পরস্পরের মধ্যে বিস্তর পার্থক্যের কথা স্মরণে রেখেও এ কথা বলা চলে যে অভিজ্ঞান-হারা মানবিক আত্মার অভিজ্ঞান-নির্দেশের প্রয়াস এঁদের শৈল্পিক অভিপ্রায়ের সঙ্গে যুক্ত। সাহিত্যকে এই ভূমিকায় দেখেও আমরা আমাদের সাম্প্রতিক কথাসাহিত্যে উদ্যোগ এবং চেষ্টাকে অলস করেই রেখেছি। অন্যত্র দেখা যায় টেকনিকের সাধনা লেখকের শৈল্পিক অভিপ্রায়েরই অংশ—এবং সে শৈল্পিক অভিপ্রায় ঔপন্যাসিকের মানবচেতনার সন্তান। এখানে টেকনিকের সাধনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খামখেয়ালিপনা। তাই নতুন রীতির প্রধান প্রবক্তা হঠাৎ খড়কুটো-র মতো উপন্যাস লিখে বসেন। একজন ঔপন্যাসিকের জীবনে ঋতু পরিবর্তন ঘটতেই পারে কিন্তু তারও একটা প্রাকৃতিক নিয়ম সূত্রানুসরণ অবশ্যই আছে। দেওয়াল লেখার পর খড়কুটো-র সৌখীন জগৎ লেখকের সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের অসংগতির সূচক। শিল্পে যিনি সহজকে খোঁজেন তাঁর সাধনাই দুরূহের সাধনা। সহজ হওয়া বড় শক্ত। তাই আমাদের টেকনিকের চেষ্টা বাস্তবকে করায়ত্ত করার সাধনা না হয়ে এঁদের ক্ষেত্রে টেকনিক নিয়ে খেলায় রূপান্তরিত হয়।

এবং অসংগঠিত চিন্তাজগতের নানাবিধ শৈথিল্যে তা প্রশ্রয়ও পায়। পাশ্চাত্ত্যে যেমন কথাসাহিত্যের বিভিন্ন স্তরস্তরের সঙ্গে ও পিছনে সেখানকার মনোবিজ্ঞানের এবং দর্শনের ভাঙাগড়া নিবিড়ভাবে যুক্ত, এখানে তা নয়। আমরা কেন জানি না আদপেই দার্শনিকতা-সচেতন নই। ফলে চিন্তার রাজ্যে

নতুন হেরফের, মূল্যমানের ওঠা-পড়া আমাদের বাইরে থেকে আলগোছে ছুঁয়ে যায় মাত্র। পুরুষার্থের নব তাৎপর্য সম্বন্ধে কোনো ইঙ্গিত কোনো উৎস থেকেই নির্দেশিত হয় না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর আমরা সেই মানের এমন কোনো কথাসাহিত্যিককে পেলাম না যাঁর মানুষকে দেখা একটা মানবদর্শনে রূপান্বিত হবার প্রয়াসী। বিমল করের গ্রহণ এবং খড়কুটো, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সূর্যসাক্ষী নরনারী নিয়ে গল্প—যথার্থ ভাবে শৈল্পিক অর্থে মানবদর্শন নয়।

তিন

মানবিক বাস্তবতা সম্বন্ধে বিভ্রান্তিই বর্তমান বাংলা কথাসাহিত্যে আধিপত্য বিস্তার করেছে। তারাশংকর এবং বনফুলের সাম্প্রতিকতম রচনায় তারই সাক্ষ্য প্রকট। বনফুল ব্যস্ত চরিত্র নির্মাণ করার জন্য। এর জন্য কতকগুলো ছককাটা হাইপোথেসিস তিনি অনুসরণ করেন। তারাশংকরের রচনায় বর্তমান কাল প্রায় হারিয়ে গেছেই বলা চলে। যে-কালখণ্ডকেই তিনি ব্যবহার করুন না কেন তাতে কিছু যায় আসে না। লেখককে তাঁর বিষয়ের স্বাধিকার দিতেই হয়। কিন্তু স্ব-কালের সম্মুখীন হতে ভয় পেয়ে যদি কেউ পিছনে হটেন সেটা অবশ্যই নিন্দনীয়। তবে তারাশংকরের সাম্প্রতিকতম রচনাগুলিকে কেউ গুরুত্বের সঙ্গে নেবেন না—এগুলি তাঁর পেনশন উপভোগ বলে অর্থমূল্যের স্বীকৃতিই এদের দেওয়া চলে।

তারাশংকর এবং বনফুলের তবু একটা কীর্তি-সমৃদ্ধ অতীত আছে। কিন্তু মনোজ বসু, সুবোধ ঘোষ, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, বিমল মিত্র, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে কোনো সান্ত্বনা নেই। বৃথাই আমরা গজেন্দ্রকুমার মিত্রের রবীন্দ্র-পুরস্কারপ্রাপ্তি নিয়ে বাজার গরম করছি। পুরস্কার পুরস্কারের নিয়মেই চলছে। কড়ি দিয়ে কিনলাম পুরস্কার পেয়েছিল। রম্যাণি বীক্ষ্যও পেয়েছে। রম্যাণি বীক্ষ্য পুরস্কার পেয়েছে এ কথা ভাবলে কড়ি দিয়ে কিনলাম-এর পুরস্কারপ্রাপ্তি সহনীয় বলে মনে হবে। তেমনি হয়তো পরেরবার এমন একখানি বইকে পুরস্কার দেওয়া হবে যেখানি পড়লে মনে হবে যে পৌষ-ফাগুনের পালা তো তবু পদে ছিল। কাজেই গজেনবাবুর পুরস্কারপ্রাপ্তি নিয়ে যে-প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে তাকে সচেতন পাঠকের ঘুমভাঙার হুকার না

বলে দুই প্রকাশনালয়ের আধা সামন্ততান্ত্রিক এবং আধা বাণিজ্যিক রেষারেষি বলাই ভাল।

বিক্রয়যোগ্য উপন্যাস নির্মাণের জন্যই এঁরা ব্যস্ত। এঁরা যে ক্ষমতাবান সাহিত্যিক এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এঁদের লেখায় জীবে দয়া, আর্তের সেবা, বড়লোকদের বিরুদ্ধে কটাক্ষ, প্রেমের জয়, দুঃখের গৌরব এই সব ছকের পরিপূর্ণ ব্যবহার লক্ষ করা যায়। পাঠক জনতার শেষতম পংক্তিটিকে ছোঁবার সবরকম প্রয়াসে এঁরা চিহ্নিত। তার জন্যে বিবর্ণ বহু ব্যবহৃত ছকগুলির ঝাড়ামোছা নিত্য চলে। তার জন্যই সুবোধ ঘোষ মনোজ বসুকে মুদ্রাদোষ-আকীর্ণ ভাষাকে পুরনো লক্ষীর পটের মতো আঁকড়ে ধরে থাকতে হয়। বেস্ট সেলার জন্য দেশে লিটারেচার-প্রপার ও কেবল পাল্প-ফিক্‌সনের মাঝামাঝি একটা বিরাট জায়গা জুড়ে থাকে। এখানে এখন লিটারেচার প্রপারের অবস্থা শোচনীয়। বেস্ট সেলার ও বটতলায় মিতালি ঘটেছে। আর ভাবনাই বা কিসের—পণ্ডিত সমালোচকেরা ছাড়পত্র লিখে দেবেন। ভালই। ক্রমবর্ধমান অক্ষরজ্ঞানসম্পন্নদের জন্য বাজার সাজিয়ে এঁরা বিরাজিত থাকুন এবং নিঃশেষিত হন। এক দমকা বিক্রির পর একটি দ্বৈতি বিক্রয়ের ধারা—এর মধ্যে বাস্তবতার সমস্যার কথা আবার কেন?

চার

কিন্তু নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সমরেশ বসু, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর, যাঁদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা করার কিছু কারণ একসময়ে ঘটেছে তাঁদের আমরা এত সহজে মুক্তি দিতে পারি না। আমরা যারা মনে করি যে মানবিক অস্তিত্বের কেন্দ্রগত কোনো বাস্তবতার অভিজ্ঞান ছাড়া সার্থক শিল্প রচিত হতে পারে না তারা এদেরই দিকে কখনো কখনো তাকিয়েছি, এখনো কারো কারো দিকে তাকাই। অথচ এখানেও অবস্থা আশাপ্রদ নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবস্থা এতদূর শোচনীয় যে দুই লেখকের সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের সীমারেখাও যেন মুছে যাচ্ছে। বিমল করের গ্রহণ এবং খড়কুটো স্বচ্ছন্দেই নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বিষয়-কল্পনা এবং বিষয়-ব্যাখ্যা হতে পারত। এরা দুজনেই মানুষের যে-ছবি আঁকেন তাতে মানুষ প্রতিভাত বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি হিসাবে। ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতাবোধজনিত দার্শনিকতার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এঁরা সেই বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদের দাঁড় করিয়ে থাকেন জীবনের

একটি নির্বাচিত পরিস্থিতির মধ্যে। কোনো কোনো সময়ে সে-পরিস্থিতি হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাকেই এমনভাবে নভেলের জন্য সাজানো গোছানো বলে মনে হয় যার ফলে বাস্তবের সাধারণ প্রত্যয়ও খণ্ডিত হয়।

যে-কোনো কথাসাহিত্যিকেরই দৃষ্টিকোণ মানবিক দৃষ্টিকোণ। মানুষের বিষয়ে তিনি কী বলছেন এইটাই হল তাঁর আঙ্গিক-রীতির নিয়ামক। নরেন্দ্রনাথ মিত্র এবং বিমল কর অথবা সমরেশ বসু কিংবা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী মানুষের বিষয়ে কী বলতে চান তারই টানে গড়ে ওঠে তাঁদের কথারূপ। নরেন্দ্রনাথ সূর্যসাক্ষী উপন্যাসে মানুষের অস্তিত্বের কোনো প্রশ্ন ধরেই আকর্ষণ করতে পারেন নি। তাই তাঁর উপন্যাসের কথারূপে কোনো কিছুই স্পষ্টরেখ হয়ে উঠল না। একটি প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসার কোনো সদুত্তর এই গ্রন্থে নেই। প্রশ্নটি হল, শশাঙ্ক কে? কোন চিন্তার প্রতিনিধি সে? কোন্ আর্তির? কোন্ বেদনার? কোন্ ভয়ের? লেখক সে কথা জানেন না। শশাঙ্কের প্রতিনিধিরূপ এবং ব্যক্তিরূপ যদি সমভাবে দ্বন্দ্বশীল না হয় তাহলে শশাঙ্ক কোনো প্রত্যয় উৎপাদন করে না। মন্দিরার যন্ত্রণার শক্ত ভিত্তি কিছু না থাকলে সে হয় গোপনসঞ্চারিনী প্রেমিকা মাত্র। এক নারী দুই পুরুষের চলতি প্রেমকাহিনীর বাইরে তা কখনই যেতে পারে না। তাই এ উপন্যাসের যে-সমস্যা তা কখনোই নৈতিক নয়। বিমল করের গ্রহণ বা খড়কুটো দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে লেখা কিনা বোঝা একটু মুশকিল। মানুষের অন্তরের সংগোপন একাকিত্বকে দেখাবার প্রতিশ্রুতি একদা বিমল কর দিয়েছিলেন। এখন অসহায় প্রেমের মিষ্টি চতুঃসীমায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি কখনোই নড়ে চড়ে না। দেওয়ালের মতো জনপদী চণ্ডের উপন্যাসে সে ত্রুটি অল্প হলেও একেবারে অপ্রকট নয়। না নড়ে চড়েও কার্যসিদ্ধি ঘটাতো তারা, যদি বিমলবাবু তাদের অন্তর্লোকের গূঢ়স্তরে ক্রমশ অবতরণ করতে পারতেন। কিন্তু গল্পগুলি গল্পাংশের চতুঃসীমাতেই বন্দী থাকছে। চরিত্রগুলির কোনো গভীরতামুখী গতি নেই বলেই এমন ঘটছে।

অন্যদের ক্ষেত্রে যেটা বাস্তব বিভ্রান্তি, সমরেশ বসুর ক্ষেত্রে সেটাই বাস্তব বিহ্বলতা। এই লেখকের শক্তির একাধিক নিজস্ব উৎস বিদ্যমান। সমরেশ বসু এবং জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বিষয়বস্তুর মধ্যে দুটি এমন ধরনের জোরালো স্বাতন্ত্র্য আছে যার ফলে এঁদের লেখাকে কখনো ভুল করার অবকাশ পাওয়া যায় না। সমরেশবাবু তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ জগৎকে তাঁর মিলিউ সমেত আশ্চর্য

ভাবেই উপস্থাপিত করতে পারেন। দুই অরণ্য উপন্যাসের অরণ্যাংশ তার অন্যতম নিদর্শন। কিন্তু আমরা কখনো বুঝতে পারি না তাঁর শিল্প-অভিপ্রায় কি? শিল্পীর অভিপ্রায় সম্বন্ধে তাঁর চেতনার অস্পষ্টতাই তাঁকে একটি বেড়াজালের মধ্যে ফেলেছে। তিনি এই চেতনার অস্পষ্টতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। এটাকে ঢাকবার জন্ত তাঁকেও কতকগুলি ছক তৈরি করে নিতে হয়েছে। ছক যিনিই ব্যবহার করুন, ছকের কাজই বাস্তবের স্বরূপকে ঢাকা দেওয়া। মানবিক আদিম প্রাণশক্তির বিকল্পে রিরংসাকে স্থান দেওয়া সমরেশ বসুর একটি প্রিয় ছক। যৌন-বিষয়ে মধ্যবিত্ত ট্যাবুর বিরুদ্ধে এভাবেই আঘাত হানা হয়তো সমরেশ বসুর লক্ষ্য। কিন্তু এই ধরনের আঘাত হানাটা শিল্পক্ষেত্রে সার্বিক হওয়া চাই। তা না হলে ব্যাপারটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে—এবং তখনই তা হয় অশিল্প। তিনি তাঁর বক্তব্যকে আরো ঋজু এবং স্পষ্ট করে তুললে এ থেকে মুক্তি পাবেন।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সমস্যা অন্ত দিকে। তিনি যৌনচেতনাকে মানুষের সমগ্র চেতনার তথা সৌন্দর্যচেতনার সুতরাং মুক্তিচেতনার অংশ বলে ভাবেন। ইনি বাংলাদেশের এই সময়ের দু-তিন জন কথাসাহিত্যিকের অন্যতম, যাঁদের শিল্পী-অভীপ্সার পিছনে শিল্প-ভাবনা জীবন-ভাবনাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। দুঃখের বিষয় ইনি চরিত্রপাত্রকে এত বেশি নির্বস্তুক করে ফেলেন যে সমস্ত প্যাটার্নটা সিঁড়ির কোণে রাখা টবে-লালিত ক্যাক্‌টাস বলে প্রতিভাত হয়। মীরার দুপুর এবং বারো ঘর এক উঠানের দিনগুলো যেন হারিয়ে গেছে। টেক্‌নিক-ভাবনার উত্তাপে চরিত্র ব্যক্তিত্বের সহজাত কবচকুণ্ডলগুলিকে গলিয়ে খসিয়ে ফেলে দিলে বাস্তবতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় জ্যোতিরিন্দ্রবাবু নিশ্চয় এটা জানেন। এই ভাবে কথা বলতে বলতে প্রতীকে যাবার চেষ্টা করে তিনি শেষ পর্যন্ত রূপকে সীমায়িত হয়ে পড়েন। আকাশ-লীনা-র ছোট পরিসরে সে দোষ আরো বেশি করে ধরা পড়েছে।

মানবিক বাস্তবতার শৈল্পিক রূপরেখা নির্মাণে একজন শিল্পীর সমস্যায় বস্তুত জীবনের সমস্যাই বিশিষ্ট আকারে দেখা দেয়। জীবন এবং শিল্পের গাঁটছড়াবন্ধনই তাঁর কাম্য। আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনের ব্যাপ্তি বড় স্বল্প। পাশ্চাত্ত্যের মতো সে [illegible] প্রচণ্ড আলোড়নকারী সব অভিজ্ঞতা পে আসে না। দেশ-বিদেশের সীমারেখা সেখানে যেমন অনায়াসে অতিক্রান্ত হতে পারে এখানে তেমন নয়। দি কোয়ায়েট আমেরিকান বা ম্যানস

এইট সেখানে বিংশ শতাব্দীর মানবার্থের বিশিষ্ট অন্বেষার টানেই রূপবদ্ধ হয়। আমাদের উপন্যাসে জল সহজে চলে না, পাতা সহজে নড়ে না, হাওয়া বয় না। তাই এখানে সমস্যা হয় সমস্যা নিয়ে। আশাপূর্ণা দেবী ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন। এবং তিনি বইয়ের বাজারের দমকা হাওয়াকে অনুসরণ করতে চান না। তাঁর আজ পর্যন্ত সাহিত্যিক স্বভাবে একটি সংগতির বিশুদ্ধতা বর্তমান। কিন্তু দেখা যায় তাঁর সমগ্র প্রয়াস সমস্যার অভিনবত্ব আবিষ্কারেই নিঃশেষিত হচ্ছে। এবং এর কারণ এই যে তাঁর কাছে সমস্যাগুলো জীবনের অংশ বলে পরিগণিত হচ্ছে—জীবনের গোটা চেহারাকে তিনি সেই বাতায়নে দেখাতে পারছেন না। কন্‌টেন্টের এই দুর্বলতার ফলেই তাঁর ফর্মের বিষয়ে মনোযোগ থাকছে না। কিছুদিন আগে লেখা দিনান্তের রঙ উপন্যাসটি এই কারণেই উপসংহারের অসামান্য দুর্বলতায় ব্যর্থ হয়েছে।

গুণময় মান্না, অমিয়ভূষণ মজুমদার, অসীম রায়ের লেখনী বেশ খানিকটা কৃপণই বলা চলে। অসীম রায়ের রক্তের হাওয়া কয়েকবছর আগে শেষ লেখা। জীবনের দুই বাহু প্রেম ও শিল্পের দ্বন্দ্ব এই উপন্যাসের নায়ক চরিত্রের আধারে ধৃত হয়েছে। কিন্তু সেখানেও উপন্যাসটিকে সমস্যাজীবী বলেই আমার মনে হয়েছে। অসীম রায়, গুণময় মান্না ও অমিয়ভূষণ মজুমদারের কাছে অথচ আমাদের প্রত্যাশা অনেক বেশি।
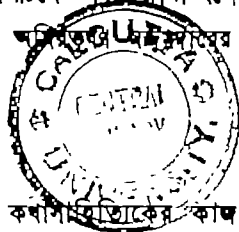
পাঁচ

বাস্তবতাকে আবৃত করা, পাশ কাটানো কথাসাহিত্যিকের কাজ নয়। বরঞ্চ বাস্তবকে আয়ত্ত করতে গিয়েই তিনি টেকনিককে অধিকার করেন। বাংলা কথাসাহিত্যের দুই মুখে বাস্তবতার লড়াই জমে ওঠার কথা। কিন্তু অমিয়ভূষণ মজুমদারদের নীরবতার কারণে বাংলা উপন্যাস-গল্পের অগ্রগতির লড়াই তরুণ ধারার লেখকদের টেকনিকের সাধনায় সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে। বস্তুত এই সীমাবদ্ধতা না ঘোচালে এঁরা বাংলা গল্প-উপন্যাসের দুষ্টচক্র ভাঙতে পারবেন না। প্রবীণদের বাস্তববিমুখতা, প্রতিষ্ঠিতদের বাস্তবতায় ভ্রান্তি এবং নূতন ধারার লেখকদের টেকনিক বিহ্বলতার উৎস বিভিন্ন। কিন্তু এই তিন প্রকার বিচ্যুতির ফল শেষটা একই থেকে যাচ্ছে। মানবিক বাস্তবতার মর্মোদ্ঘাটন শিল্পান্বিত হচ্ছে না। নিশিকুটুম্ব এবং পাপ পুণ্য পেরিয়ে নিশ্চয় একজাতীয় সৃষ্টি নয়। প্রচেষ্টার তাৎপর্যে ও উদ্দেশ্যের গভীরতার প্রশ্নে এরা অবশ্যই একে

অন্যের থেকে পৃথক। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই তরুণেরা এখনো পর্যন্ত মানুষের সমগ্র যন্ত্রণাকে আঁকতে পারেন নি। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কিছু লেখা নিশ্চয় মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। কিন্তু এঁরা টেকনিককে এমন ভাবে চূড়ান্ত বলে ভেবে বসে আছেন যে তার ফলে মানুষের বাস্তব গভীরতা আবৃত হয়ে পড়ছে। গজেন্দ্রকুমারেরা বাস্তবকে ধরতেই চান না। তরুণেরা যাঁরা ধরতে চান তাঁরা মাধ্যমের হাতেই শেষ পর্যন্ত বাস্তবকে সমর্পণ করে বসেন। এই দ্বিমুখী চাপে বাংলা কথাসাহিত্য রুদ্ধশ্বাস।

কমলকুমার মজুমদার, দেবেশ রায়ের কিছু গল্প এবং প্রথমোক্তের একখানি উপন্যাস নিঃসন্দেহে অভিনন্দনীয় প্রয়াস। কিন্তু সেখানেও টেকনিকের চরম আধিপত্য অনেক সময়ে মূল শিল্পবোধার পক্ষে প্রতিবন্ধক হচ্ছে বলে মনে হয়। কমলবাবুর 'মতি পাদরি' এবং দেবেশবাবুর 'নিরস্ত্রীকরণ কেন' এবং দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উৎসর্গ' গল্প বক্তব্যের গভীরতায় এবং পরম মানবিক নৈতিকতায় উৎকৃষ্ট গল্প। উত্তরঙ্গে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা গল্প 'রাণী ও অবিনাশ' এবং শারদীয় নতুন পরিবেশে দেবেশ রায়ের লেখা 'রঞ্জুর রক্ত' গল্পে টেকনিক-দৌরাত্ম্য অপেক্ষাকৃত কম বলেই যন্ত্রণার্ত মানুষকে এখানে সহজে অনুভব করা যায়, যদিও এ কথা গোপন করার আমি কোনো কারণ দেখি না যে আমার পক্ষপাত 'রঞ্জুর রক্ত' গল্পের প্রতি সমধিক। ছোটগল্প নবনিরীক্ষা পত্রে সমরেশ বসুর অসামান্য গল্প 'স্বীকারোক্তি' মর্মভেদী গল্প। তা আমাদের গভীরভাবে স্পর্শ করবে সন্দেহ নেই। তবু, রঞ্জুর রক্তেই আমি অনুভব করি জীবনের রক্তস্রোত শিল্পের লাবণ্য সৃষ্টি করতে পেরেছে। ঠিক এরকম না হলেও বেশ কয়েকটি গল্প উপন্যাসের কথা স্মরণ করা চলে। স্মরণ করা যায় মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের 'বায়োস্কোপের বাক্স' বা এই রকম আরো দুটি-একটি চমৎকার লেখা। হয়তো কবে দেওয়া সাফল্যের তারতম্য। কিন্তু তা হলেও তরুণ ধারার লেখকদের মধ্যে যে সংকটের গভীরতা তাকে গৌণ করা যাবে না। বাস্তবতার অতি মনস্তাত্ত্বিকভবনের ফলে এঁদের অধিকাংশ রচনায় বাস্তবতার নির্বাচন ও রূপায়ন বড় বেশি স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠছে। প্রবীণদের ব্যর্থতা এবং বিক্রয়ধন্যদের মিথ্যাচার অপেক্ষা এ সমস্যা কম জটিল নয়—শুধু সাহিত্যগুণান্বিত এই যা সান্ত্বনা। আজকের কথাসাহিত্যিকের লড়াই একই সঙ্গে দুই মুখে। তাঁকে একদিকে

দেখতে হবে বাস্তবতা যেন তাঁর কাছে রঙিন বস্তুপিণ্ড বলে মনে না হয়। আর-একদিকে তাঁকে স্থির থাকতে হবে এ বিষয়ে—যেন তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টাই একটা শৈল্পিক অভিপ্রায় বলে প্রতিভাত হয়। বৃহন্নলা বা পাপ পুণ্য পেরিয়ে বা অনিলের পুতুল বা বিপন্নসময় প্রভৃতি উপন্যাসের সমস্যা হল এই যে বাস্তবতা এসব উপন্যাসে এত বেশি কৃশ, ক্ষয়িত যে তার ফলে চরিত্র-ব্যক্তিত্বের কল্পনা হানিগ্রস্ত হয়। বর্তমান বাংলা উপন্যাসের নূতন ধারার লেখকদের প্রচেষ্টায় একটা অভিনন্দনীয় তাৎপর্য আছে এ কথা বর্তমান প্রবন্ধলেখক পূর্বে বলেছেন। কিন্তু শিল্পে বাস্তবতার সমস্যাকে শুধু সেই তাৎপর্যেই জয় করা যাবে না। বাস্তবতা বাজারচালু লেখকদের হাতে হল যেমন পৃথুলতা, নতুন পর্যায়ের লেখকদের হাতে যদি তাকে হতে হয় নীরক্ত পাণ্ডুরতা তা হলে আর দাঁড়াই কোথায়?

গোপাল হালদার

রূপনারানের কূলে

(পূর্বানুবৃত্তি)

সাধারণ পরিচয় ছাড়িয়ে বিশেষ একটা পরিচয়ও মানুষের থাকে। অন্তত কারও কারও কাছে সে পরিচয়ই বেশি গ্রাহ্য। সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের সে পরিচয় আমার কাছে স্পষ্টতর হয় সেই শেষের দিকে (১৯৩৭-১৯৪২), তা বলেছি। সকালে না হোক বিকালে-সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে মাঝে-মাঝে বেড়াতে হত—প্রায়ই লেকের ধারে। কখনো তিনি কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবেন। আমাকেও ছাড়বেন না—'চল—কি হয়েছে তাঁদের অচেনা বলে তুই? আমি চেনা হলে তুইও চেনা।' কখনো নিজেই এসে যেতেন আমাদের বাড়ি। আমার মা ভাই-বোন সকলের কাছেও স্বভাবের অমায়িকতায় তিনি নিকটতর হয়ে ওঠেন। বাড়ির খবর আগেও জানতেন। সে দিককার চিন্তাও করতেন। আমি তো জেলফেরৎ, বাড়িতেও অভাব আছে। পিতৃ-সম্বল আগেই ফুরিয়েছে। অথচ উপার্জনে উদ্যোগী নই। ফ্রি ল্যান্স-এর ল্যান্স্ শক্ত নয়, সর্বত্র চালনাতেও আপত্তি। একবার একটা ভদ্র চাকরিতে আমাকে সত্যেনদা নিয়োগ করতে মনস্থ করলেন। কাজটায় আয় সেদিনের তুলনায় ভালোই। তার চেয়েও বড়ো কথা—কারও কাছে মাথা নিচু করতে হবে না। অবশ্য রাজনৈতিক কাজ করা চলবে না। কিন্তু তখনো আমার মাথাটা তত ঠাণ্ডা হয় নি। রাজনীতি ছাড়ি কি করে? তখনো কি জানতাম আমি যদিবা ছাড়তে চাই 'কমলি' আমাকে ছাড়বে না। অসুখটা দুরারোগ্য, দুশ্চিকিৎস্য। যাক্, শেষ পর্যন্ত একদিন সন্ধ্যায় বেড়াতে-বেড়াতে সত্যেনদা কথাটা পাকা করতে চাইলেন। বলতে বাধ্য হলাম—মহাযুদ্ধ আসন্ন। স্বাধীনতা চাইলে আমাদেরও আর সময় নেই—প্রস্তুত হতে হয়। অনেক বছর তো জেলে নিষ্ক্রিয় কেটেছে। এ সময়ে সক্রিয় না থাকা কি ঠিক? কি বলেন? সত্যেনদা বুঝলেন,—সক্রিয়তা মানে সারাক্ষণের পলিটিক্স্;—ঘরের খেয়ে—অর্থাৎ না

খেয়ে—বনের মোষ তাড়ানো। একটু সময় নীরব রইলেন। সে সময়টার মধ্যে তাঁর মন যে কোন রাজ্য পরিক্রমা করে এল তা বুঝলাম পরক্ষণের উত্তরে। সহজ শান্ত কথা: "তা হলে তোকে আর এ কাজের কথা বলব না। যা করতে চাস তাই কর। কষ্ট পাবি, পা' তা, মনে খেদ থাকবে না।—কিন্তু বলতো—কাকেও চাকরিতে নেওয়া যায়? আর, তোর বাড়ির জন্য কি ব্যবস্থা করা যায়।" আজীবন যে-মানুষ রাজনীতির উজানস্রোতে সন্তরণ করেছেন, আর এখন চড়ায় ঠেকে গিয়েছেন স্রোতের বিপাকে,—সে মানুষের বিষণ্ণ মুখচ্ছবি দেখতে পাচ্ছিলাম সন্ধ্যার অন্ধকারেও। তাঁর পরিণত শক্তি ও অভিজ্ঞতার সার্থক প্রয়োগের সুযোগ পান না। একটা বিষম সংকটময় ক্ষণ সামনে। তার মধ্য দিয়ে জাতিরও ভাগ্যনির্ণয় হবে। অথচ তিনি নিরুপায়, প্রায় নিষ্ক্রিয়। জানি না, কুরুসভায় কোনো ভীষ্ম-দ্রোণের এরূপ অসহায়তা-বোধ জেগেছিল কিনা। সত্যেন্দ্রদার অবশ্য কাজের অভাব ছিল না। প্রসন্নতারও না। বিশেষত তখন দিন-দিন তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছে। ক্রমেই তা বাড়ে, দৈহিক শক্তিও আর রইল না। যখন তিনি দেহত্যাগ করেন—আমিও তখন গুরুতর পীড়িত, শেষের ক-মাস দেখাও হয় নি—বুঝলাম একটি বিশিষ্ট মানুষ বিগত হলেন। আমার কাছে তাঁর সে বিশিষ্টতা অক্ষয়। কিন্তু যা তাঁর দেয় ছিল দেশের কাছে, তা কি আমরা আদায় করে নিয়েছি? এই খেদ আমার পীড়িত দেহের অভ্যন্তরস্থ মনকেও পীড়িত করেছিল।

অমায়িকতা ও সূক্ষ্ম মানবচরিত্রবোধের, আদর্শবাদের ও বাস্তববুদ্ধির অদ্ভুত সমন্বয় ছিল সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের চরিত্রে। নানা সময়ে নানা মানুষের কথা উঠেছে। মানুষের মূল্য তিনি দিতে কুণ্ঠিত। বিচার অপেক্ষা স্বচ্ছন্দ গ্রহণই ছিল তাঁর নীতি। কিন্তু বাস্তবজ্ঞানও ছিল প্রখর।

অথচ নিকট বন্ধুর বা সহকর্মীরও দোষ সম্বন্ধে তিনি অজ্ঞ ছিলেন না। প্রতারিত হতেন না—বাইরের নামে বা রূপে। কিন্তু জানতেন—দোষটাই সব নয়, মানুষটা আরও কিছু। তাতেই সংসারের প্রয়োজন, আর সে জন্যও মানুষটা গ্রাহ্য। নীতিকথা নয়; সত্যেন্দ্রদার সহজ আচরণেই বরং কথাটা প্রকাশ পেত। নরনারী-সম্পর্ক বিষয়েও তাঁর দৃষ্টি ছিল এরূপ স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক। কী করে তিনি তা পেলেন? জানি না। সেদিনের 'স্বদেশী'; তাঁদের তো দৃষ্টিভঙ্গি এরূপ হবার কথা নয়, জীবন-বোধও নয়। কিছুটা হয়তো তা নানা দেশের, নানা সমাজের ইতিহাস পাঠের ফল। কতকটা নানা মানুষ

দেখারও ফল—মানুষের বিচিত্র রূপ ও প্রবণতা তো বাস্তব সত্য। কতকটা হয়তো তাঁর বিশ্ববোধ আর ধর্মবোধেরও ফল। মানুষের প্রতি তিনি বিরূপ হবেন কি করে—স্বয়ং সেই 'বুড়ো' (তাঁর ভাষায়) যখন বিরূপ নন? দেখতাম—এই মানুষ বলতে মেয়েরাও পুরুষের মতো সমভাবে তাঁর কাছে গণ্য। বিধাতারই যখন দুর্বুদ্ধি মেয়ে-পুরুষ দুটো জাত করেছেন। একটা জাত করলেই তো গোলমাল চুকে যেত। কিন্তু তাঁর বোধহয় খেলা জমত না। সত্যেন্দ্রদাই বা তাহলে এক জাতের থেকে অন্য জাতকে বেশি ছুঁৎমার্গীর চোখে দেখবার কে? শ্রদ্ধার চোখেই দেখবার অধিকারী। তবে শ্রদ্ধা করেন বলেই কি সুস্থ স্বাভাবিক চোখেও দেখবেন না?

মানবচরিত্রের একটা মাপকাঠিই এ দেশে গণ্য—সংযমের। আরও স্পষ্ট করে বললে যৌন সংযমের। অতি সংকীর্ণ মাপকাঠি। তবু মাপকাঠিটা নগণ্য নয়। দেশ বিদেশে দেখে শুনেও বলি—এ মাপকাঠিটা একেবারে বাতিল কোনো কালে হবে কিনা জানি না। আরও কিন্তু বেশি মানি—বাস্তবের উপর আদর্শের অত্যাচারও অসুস্থ কাণ্ড। অসম্ভব প্রয়াসও। কার্যত সে আদর্শই ভুঁয়ো হয়ে যায়। সম্ভবত আদর্শটা ভালোই। জীবনটা তার চেয়ে নিশ্চয়ই অনেক বড়ো। বিরাট, অগাধ রহস্য। জীবনের সত্যেন্দ্রদাকে সমগ্রতার থেকে সংযমের সর্বগ্রাসিতা বড়ো নয়। এই বিশ্বাসের মূল্যও সত্যেন্দ্রনাথকে কার্যত দিতে হয়েছে—তিনি যখন বিবাহ করলেন। কে জানে সুভাষ-চন্দ্রকেও দিতে হত কিনা—এ দেশে থাকলে, এ দেশের নিয়মে। সত্যেন্দ্রদার বিবাহ তখনকার দিনে শাস্ত্রসম্মত ছিল না। সমাজসম্মতও নয়—তাঁর জ্ঞাতি-গোষ্ঠিরও অনুমোদন লাভ করে নি।—কিন্তু তা ধর্মসম্মত। আর তিনি অবিচল রইলেন। নিজের বিশ্বাসের ও কর্মের দামও দিলেন। আত্মীয়দের বিরূপতা সে তুলনায় কিছু নয়—তা ক্রমে কেটে যায়। কিন্তু রাজনীতির একটা বিশেষ পথকে তিনি পূর্বে একান্ত করে গ্রহণ করেছিলেন। জীবনের এই সমগ্রতার দাবীর কাছে তা তখন একান্ত থাকতে আর পারে না। পথের দাবীকেও মানতে হয় সমগ্রতার দাবী। মানতে গিয়ে দামও আদায় করে। সত্যেন্দ্রচন্দ্র সে দাম দিলেন। পুরোগামীদের সর্বক্ষণের পথ ছেড়ে তাই পার্শ্বগামীদের সঙ্গে এসে দাঁড়াতে হয়েছে কোনো কোনো স্থলে। এ দাম দিতে সম্ভবতঃ কষ্ট হয়েছে, কিন্তু ন্যায়সংগত হলে তা দিতে তাঁর কুণ্ঠা ছিল না। আহত হয়েছেন যখন বন্ধুদের মধ্যে দেখেছেন কৃত্রিমতা বা অশ্রদ্ধা। 'কৃত্রিমতা'—তাঁর

থেকে সুযোগ সুবিধা আদায়ের জন্য। 'অশ্রদ্ধা' তাঁর মূল্যবোধের প্রতি। সেখানেও দেখেছি তাঁর দৃঢ়তা ও সহিষ্ণুতা, অনাদরে উপেক্ষা, বিরোধীর প্রতি উদারতা। মনে ক্ষোভ পোষণ করতেন না, আচরণে থাকত না ক্ষুদ্রতা।

তাঁর বয়ঃকনিষ্ঠ এক সহযোগীর কথা জানি। তিনি আজ জীবিত নেই, নাম উল্লেখ করলেও ক্ষতি হয় না। কিন্তু করতে চাই না। সরকারের বড়ো চাকরি তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু প্রথম যৌবনে রাজনৈতিক উগ্রতায় তিনি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দৃক্‌পাতহীন ছিলেন। পুলিশের কঠিন জালেও তখন জড়িয়ে পড়েছিলেন। সে জাল যাঁরা নানা দুঃসাধ্য কৌশলে ছিন্ন করে তাঁর উদ্ধার সম্ভবপর করেন সত্যেনদাই তাঁর মধ্যে প্রধান। সে যুগ কেটে গেল। তাঁরও মত সম্পূর্ণ বদলে যায়। রাজকর্মে তিনি প্রতিষ্ঠিত হন, ধনমানও লাভ করেন—সত্যেন্দ্রদার মিত্রতা তাতেও সহায়তা করেছে। একবার দিল্লী থেকে অধিবেশনের শেষে সত্যেনদা কলকাতা ফিরছেন। দেখলাম হাওড়া থেকে তাঁকে পুরোদ্গমন করে নিয়ে যেতে এসেছেন সেই ভদ্রলোক। তাঁর অতটা আত্মীয়তা একটু নতুন মনে হল। দুজনার কথা শুনে বুঝলাম তাঁদের আপিসের বিষয়ে কী কথা হচ্ছে। পরে সত্যেনদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে জানলাম কী তা। এবং এইটুকুও: 'সেবার (বছর খানেক আগে) একটা পাওনার তাগিদে জড়িয়ে পড়ে ওঁর কাছে হাজার খানেক টাকা ধার চেয়েছিলাম। উনি আমাকে লিখলেন, আমার একটা প্রিন্‌সিপ্‌ল্ আছে—আমি বন্ধুদের টাকা ধার দিই না।' আমি ফিরে জানালাম 'থাক'। অন্যত্র টাকা পেলাম—একটু দূরের এক বন্ধুর থেকে। এখন উনি আমাকে দিল্লীতে খান তিন চিঠি লিখেছেন,—আপিসে ওঁকে কোণঠাসা করছে ওঁর বড় সাহেব। দিল্লীর খোদ দরবারে সেক্রেটারিদের এখন ওঁর স্বপক্ষে টানা যায় কিনা সেজন্য একটু তদ্বির করতে হবে। আমি বললাম, "তা আপনি কী করবেন? আপনারও তো প্রিন্সিপল্ আছে। সরকার বিরোধী পক্ষ হয়ে যাবেন নাকি বন্ধুর জন্য সেই সেক্রেটারির কাছে খোসামুদি করতে?"

সত্যেনদা হাসতে লাগলেন। "আমার প্রিন্সিপল্ মতে বন্ধুদের জন্য তা করা যায়—বিশেষ যখন উপরওয়ালা বড় সাহেব, আবার তিনি দেশী অফিসারের বিরুদ্ধে লাগেন। তবে খোসামুদি-টোসামুদি করতে হয় না। আইন সভার মেম্বরে-মেম্বরে একবার কথা হলেই সেক্রেটারি বলেন, 'ইয়েস স্যর।'"—বলে হাসতে লাগলেন।

আমি বললাম, "তা কথা হয়েছে ?"

"হ্যাঁ। তবে কথাটা ভদ্রলোককে চিঠিতে জানাতে চাই নি।—চিঠিতে তা জানানো ঠিক নয়। তাই ইনি ব্যস্ত হয়েছিলেন। কবে আসব, বাড়ি থেকে জেনে একেবারে স্টেশনে এসে যাবেন, এতটা বুঝি নি। তা হলে অন্তত জানিয়ে দিতাম 'নিশ্চিন্ত থাকুন।' "

সেই "প্রিন্সিপল"-এর কথাটা আমাকে তবু বিদ্রূপ-মুখী করেছিল। আমার কথায় তা চাপা রইল না। সত্যেনদা বললেন, 'ওসব মনে রেখে কি হবে ? মানুষের কত রকমের দুর্বলতা থাকে।'

পরেকার আরেকটি ব্যাপার। সত্যেনদা তখন বাঙলা দেশের কাউনসিলের চেয়ারম্যান। অনেক দিনের মত আমি সকালবেলা দেখা করতে এসেছি। দেখা করতে এলে নিয়ম ছিল সেই ৯টা/১০টায় এসে স্নানাহার সেরে, দুপুরে বিশ্রাম করে, বিকালে চা খেয়ে তাঁতে আমাতে লেক্-এ বেড়াব। তারপরে সন্ধ্যার শেষে বিদায় নেব, আমি ফিরব বিবেকানন্দ রোডের বাসায়। সেদিনও তা'ই হচ্ছে। অপরাহ্নে চায়ের উদ্যোগ চলেছে। শুনলাম বউদি'র (মিসেস মিত্র) সঙ্গে তাঁর কী তর্ক হচ্ছে। আমি পাশের ঘরে। একটু পরেই আমাকে ডাকলেন ; "বেশ, তুই বলতো কী কর্তব্য ?"

ব্যাপারটা এই :—তাঁর এক বিরোধী সমালোচক একটা ব্যাপারে তাঁর এখন সাহায্যপ্রার্থী। সমালোচক মহাশয়ের নাম বললেন। বাঙলা দেশে এককালে প্রবল ক্ষমতাশালী ব্যক্তি, কিন্তু তখন ক্ষমতাচ্যুত কর্মীপুরুষ। আমি নিজেও জানি হয়কে নয় নয়কেও হয় করতে তাঁর দ্বিধা নেই, যদি একবার তাঁর মনে হয় তা করা দরকার। আমিও তাঁর হাতে ভুগেছি, এবং সম্পূর্ণ অকারণ সন্দেহে। যাক, সত্যেনদা একটা বড় পদের কথা উল্লেখ করে বললেন, "নিয়োগ কমিটিতে আমার কথা কমিটির অন্য সভ্যরা ফেলেন না। অ'বাবু চান ওখানে ওঁর (দূর সম্পর্কের) জামাইটি নিযুক্ত হোন। মিন্টুর মা (মিসেস মিত্র) বলেন, 'কিছুতেই না।' তুই কি বলিস্ ?"

আমি বললাম, "সর্বাপেক্ষা যোগ্য লোক কে, ?"

সত্যেনদা বললেন, "সর্বাপেক্ষা যোগ্য কে, কে বলবে ? তবে ওঁর জামাইটিও যোগ্য। হয়তো আরও যোগ্য লোকও আছেন। সে উনিশ-বিশ। এঁকে নিযুক্ত করলেও যা তাঁকে নিযুক্ত করলেও তা। তাই আমি বলছি—

এঁকে যখন জানি—ওঁর জামাই, আর-একটা স্বদেশী সম্পর্কও আছে—তখন এই যুবকটিকেই আমরা নিই।"

মিসেস মিত্র ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন, "কিছুতেই না—অমন লোকের জামাই পক্ষে তুমি কিছুতেই বলবে না। কী ক্ষতিই না তিনি তোমার করেছেন। বলুন তো এমন লোককে কেন খাতির করা?"

আমি একটু ইতস্তত করে আমার অভিজ্ঞতা জানালাম—"তারও একটা কারণ আপনার সঙ্গে আমার পরিচয়। আপনি অর্থমন্ত্রী নলিনী সরকারের থেকে নাকি আমাকে লাখ টাকা পাইয়ে দিয়েছেন।" সত্যেনদা হাসতে লাগলেন, "লাখ টাকা! নলিনীবাবুর থেকে? তা যে কত সহজ, ভদ্রলোক নিজেই তা এখন বুঝতে পারছেন। সেখানে তো তিনি এখন প্রায়ই বসে থাকেন নলিনীবাবুর সঙ্গে দেখা করবার জন্য। কাজেকর্মে টাকা চাই।" বলে সত্যেনদা' বললেন, "তার জন্যই তো বলছি। উনি এখন ক্ষমতাচ্যুত। বিপাকেই পড়েছেন। এখন আর ক্ষতি করবার শক্তি ওঁর হাতে নেই। ওঁর বিরোধিতায় আমারও তো শেষ পর্যন্ত শাপে বর হয়ে গিয়েছে। তবে আমিই বা ওঁর একটু উপকার করি না কেন? তাছাড়া, জামাইর কাজে ওঁর বা কী স্বার্থ? তবে কথাটা বলেছেন—সম্ভব যখন রাখি।"

উদারতার সুর ছিল না কথায়—সহজ একটু কৌতুকের, ক্ষোভশূন্য ও ক্লেশ-মুক্ত মনের স্বচ্ছন্দ উক্তি। এই সহজ অমায়িকতাই তাঁর মনের ধর্ম। বুদ্ধি ছিল তীক্ষ্ণ, কর্মকুশলতা অসাধারণ। রাজনীতিতে শুধু আদর্শ যথেষ্ট নয়, সে আদর্শকে কার্যক্ষেত্রে রূপ দিতে হবে। তা করতে হলে ভুললে চলবে কেন—দেশের মানুষ কোন্ পর্যায়ে আছে, কে কিরূপ, কাকে আদর্শের স্বপক্ষে টানতে হবে কোন্ কৌশলে। নিজে তিনি একটা কৌশলে পটু ছিলেন, সে তাঁর প্রকৃতিগত—সকলের সঙ্গে অমায়িক প্রসন্ন ব্যবহার।

মানুষকে আপনার করে নিতে পারা—একটা বড় মানবীয় গুণ। বিপ্লববাদের ইতিহাসে সত্যেন্দ্র মিত্রের দান কী, জানি না। কিন্তু দল-নির্বিশেষে ছোট বড়ো রাজবন্দীর এমন অকৃত্রিম বন্ধু আর বাংলা দেশে ক'জন ছিলেন, বলা কঠিন। সেই বিপ্লব অধ্যায়ই যখন দেশের ইতিহাস থেকে মুছে যাচ্ছে তখন সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের নাম আর কে মনে রাখবে—কতদিন?

মুজফ্ফর আহ্মদ্

এ কথা ভাবলে মনে হয়—মুছে যাবে না আরেকটা অধ্যায়; তাই সকলে মনে রাখবে নোয়াখালির একটা নাম—মুজাফ্ফর আহ্মদ্। তিনিই বোধহয় নোয়াখালির একমাত্র মানুষ যাঁর নাম বাঙলার বাইরে ভারতেও পরিজ্ঞাত। আর ভারত ছেড়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও পরিচিত। কারণ, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস তাঁকে বাদ দিয়ে লেখা চলবে না। আর ভারতের ইতিহাসও সে পার্টিকে বাদ দিয়ে লেখা যায় কিনা সন্দেহ—ভবিষ্যতের কথা না তুললাম।

মুজফ্ফর আহ্মদ্ অবশ্য নিজেকে সম্পূর্ণ নোয়াখালির বলে মানতে চান না। বলেন, 'দ্বীপে' বাড়ি। তিনি সন্দীপের মানুষ। সন্দীপ অবশ্য নোয়াখালি জেলারই অন্তর্গত। তবে ভূগোলে তার একদিকে যোগ চট্টগ্রামের সঙ্গে। আরেকদিকে বরিশালের সঙ্গেও। আর ইতিহাসে মোগল, মগ, পর্তুগীজ সকলের সঙ্গে তাঁদের ঘাঁটি এই দ্বীপে, নোয়াখালি সে তুলনায় অজ্ঞাতনামা। পরিবার, আত্মীয় কুটুম্ব মুজফ্ফর আহ্মদ্-এর প্রায় সকলেই সন্দীপের। কিন্তু তিনি কার্যত প্রায় ৫০ বৎসর ধরে কলকাতারই অধিবাসী।

ঠিক এ সময়ে (সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩) মুজফ্ফর আহ্মদ্ অনেকবারের মতো আবার জেলে, বিনা বিচারে বন্দী। তাঁর বয়স বোধহয় ৭৫-এর দিকে। আজকের মতামতের ঘূর্ণাবর্তে আমি জানি না তাঁর মতামতের বিশেষ ঠিকানা, সম্ভবত তিনিও জানেন না আমার। মূলত মিল থাকলেও নানা প্রশ্নে অমিল ঘটা আশ্চর্য নয়। কিন্তু মনের এই মিল-অমিল ছাড়িয়ে আরেকটা কথা আছে—সে হচ্ছে মন। আর সে মন ও সে মানুষই এ লেখার প্রধান কথা। এ মন ভাঙবেও না মচকাবেও না,—চল্লিশ বছরের পরীক্ষায় তা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। এ মানুষ ভাঙতে পারেন দেহতে, কিন্তু ভাঙবেন না, মচকাবেন না মনুষ্যত্বের হিসাবে।

আশ্চর্য এই—বাঙলা দেশের বা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কত পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত করলেন। কিন্তু মুজফ্ফর আহ্মদ্-এর একখানা ছোট জীবনীও প্রকাশিত করেন নি। কত লোকের জন্মোৎসব তাঁরা পালন করলেন, কিন্তু পার্টির এই প্রতিষ্ঠাতার ৬০।৭০ কোনো জন্মদিনেই একটি শুভেচ্ছার প্রস্তাবও গ্রহণ করবার কথা তাঁদের মনে উদিত হল না। এখানে সে দোষ ক্ষালন করা যাবেও না, আমার তা কাজও নয়। আমার

কাজ নোয়াখালির সেই মানুষকেই স্মরণ করা। অবশ্য সে পার্টি ও সে আন্দোলনের সঙ্গে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ্‌ একাত্ম হয়ে গিয়েছেন বলেই তাঁকে ইতিহাস থেকে বাদ দেওয়া যাবে না। আর মানুষ হিসাবেও তাঁকে সেই পার্টি ও আন্দোলন থেকে ছাড়িয়ে দেখাও সম্ভব নয়। কিন্তু আমার মনে হয়— তা তাঁর সবটুকু নয়। যেমন, বলতে পারি, আমার বোন লক্ষ্মী তাঁকে দেখেছেন। লক্ষ্মী কমিউনিস্ট নয়, কমিউনিজমও বুঝত না। কিন্তু ঘরের পাশে রাতদিন দেখেছিল কমিউনিস্ট ছেলেদের, সুনীল, সুশীল, সোমনাথ, মনসুর প্রভৃতিকে। আর তাঁদের গার্জেন 'কাকাবাবু'—মুজফ্‌ফর আহ্‌মদকে। তার ফলে কমিউনিস্টদের নিন্দা লক্ষ্মী সইতে পারতেন না। কারণ, তারা কেমন মানুষ, সে তো নিজের অভিজ্ঞতাতেই তা জানে।

'এই কেমন মানুষটাই' আসল কথা। তার থেকে কোনোদিকই বাদ দেওয়া যায় না। অথচ সকল দিক মিলিয়েও মানুষটা আরও কিছু—মানুষ বলেই।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ্‌-এর নামের সঙ্গে পরিচিত হই বাল্যে। তিনি তখন জিলা স্কুলে পড়েন—বোধহয় দাদাদের সমকালীন। বয়সে বোধহয় তিনিই বৎসর পাঁচেকের বড়ো। কারণ, প্রথম তাঁকে পড়তে পাঠানো হয়েছিল মক্তবে মাদ্রাসায়, মৌলবী হবেন। ক' বৎসর সেখানে কাটিয়ে তিনি এসেছিলেন ইংরেজি পড়তে। তাই বয়সের তুলনায় স্কুলে পিছনে পড়ে গিয়েছিলেন। এ সব পরে জেনেছি। আরবী ফারসিতে দেখতাম তাঁর দখলটা কাঁচা নয়। কিন্তু বাঙলাতেই কি তাঁর দখল কাঁচা। সংস্কৃত না জেনে এমন শুদ্ধ বানানে, শুদ্ধ ব্যাকরণে বাঙলা জানা সহজ কথা নয়। আমি তাঁর প্রথম পরিচয় পাই এই বাঙলার সূত্রেই। বাড়িতে যে 'প্রবাসী' আসে তাতে প্রকাশিত হয়েছে ছবিশুদ্ধ একটি লেখা—'সন্দ্বীপের পুন্নাল বৃক্ষ', লেখক "মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ্"। বোধহয় ১৩১৮ বাং-র কথা। বাবাকে দাদাই জানালেন জিলা স্কুলের ছাত্র। বাবা পড়লেন, খুশি হলেন; বললেন, 'বাঃ, বেশ সুন্দর পরিষ্কার লেখা।' ছোট হলেও আমাকে তাঁরা দিলেন 'পড়'। আমার পড়া শুনলেন। তথ্যযুক্ত একটি ছোট লেখা—পুন্নাল গাছ থেকে তেল হয়, সে তেল সন্দ্বীপের লোকেরা জ্বালায়, ইত্যাদি। সরল, তথ্যবহুল, শব্দাড়ম্বরহীন লেখা। সত্যই, 'সুন্দর পরিষ্কার লেখা'। কথাটাতে শুধু লেখাটা নয়, মানুষটির

চরিত্রের একটি দিকও প্রকাশিত। হাতের লেখা দেখলে তা আরও বলা যেত। বাঙলা ইংরেজি এমন মুক্তার মতো বড়ো বড়ো অক্ষর, পরিষ্কার, সুস্থির হস্তে লেখা আর দ্বিতীয় কারও নেই ভূভারতে। ভাষায়ও ঠিক এই গুণটি আছে—স্পষ্টতা, পরিচ্ছন্নতা, নিশ্চয়তা। আর ওই প্রবন্ধটিতেই ছিল মুজফ্‌ফর সাহেবের দৃষ্টিকোণেরও পরিচয়—অবজেক্টিভিটি বা তথ্যনিষ্ঠা। লেখা মানেই ভাবের ফোয়ারা খুলে দেওয়া আর শব্দের আড়ম্বরে ফুলে ফেঁপে ওঠা,—বাঙলা ভাষার এই ঝোঁকটা এখনো কাটে নি। তখন তো আরও বেশি ছিল। নতুন লেখকের পক্ষে তো তাই ছিল পরম সাধনা। সেইখানে একটা সাধারণ বিষয়ে তথ্য দিয়ে লেখা, আর এমন সহজ সরল ভাবে তা প্রকাশ করা, দুইই একটু নতুন। হয়তো রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের তথ্যনিষ্ঠ চোখে তাই সে লেখাটা গ্রাহ্য হয়েছে, আর বাবার ইংরেজি-পুষ্ট দৃষ্টিতেও তাই সে বৈশিষ্ট্য আদরণীয়। তখন নয়, তার অনেক পরে হয়েছিল, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হয়। কিন্তু সে পরিচয় যতই নতুন দিক খুলে দিক ওই ছোট্ট লেখাটিতে এখনো আমি এই মানুষটির চরিত্রের সূত্র পাই। যেমন, জীবনযাত্রার সাধারণ বিষয়ে দৃষ্টি, তথ্যনিষ্ঠা, সহজ সারল্য, পরিচ্ছন্নতা, লেখায়, কথায়, বেশবাসে, স্থির, ধীর নিপুণতা। আর-একটা কথাও আছে—বাঙলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা, বাঙলা সাহিত্যের প্রতি মমতাবোধ।

জিলা স্কুল থেকে পাশ করে মুজফ্‌ফর সাহেব কলকাতায় এসেছিলেন। সরকারী অনুবাদ-বিভাগে কাজও করেছেন কিছুদিন। দুটি দিকে তখন ঝোঁক—এক ওয়েলেস্‌লি অঞ্চলের 'জাহাজী'দের বিলিতি কোম্পানির জুলুম থেকে কতকটা রক্ষা করা, আর দুই, মুসলিম সাহিত্য সমিতির সহযোগে বাঙলা সাহিত্যের সেবা করা। এই ঝোঁকটাও ছাড়তে পারেন নি। সেই ঝোঁকেই 'সওগাত', 'মুসলিম ভারত' প্রভৃতির সূত্রে তিনি নজরুলের বন্ধু হয়ে পড়েন। নজরুলের হিতৈষী আর উৎসাহদাতার মধ্যে তিনি বরাবরই অগ্রগণ্য। আর নানা পলিটিক্যাল বিপর্যয়ের মধ্যেও সাহিত্য-পাঠ ও সাহিত্য-উপভোগে তাঁর প্রধান আনন্দ। অবশ্য পলিটিকসের ঝোঁকই তাঁকে অধিকার করেছে বেশি। তাই সাহিত্যেও তিনি জনসমাজের অগ্রগতির সকল চিহ্ন দেখলে আশ্বস্ত বোধ করেন।

কানপুর কমিউনিস্ট মামলার পরে তিনি যখন যক্ষা-রোগগ্রস্ত হয়ে আলমোড়াতে অন্তরীন, তখন থেকে তাঁর সঙ্গে পুনঃস্থাপিত হয় তাঁর স্কুলের সতীর্থ

ক্ষিতীশ চৌধুরীর সঙ্গে সম্পর্ক—আমি ছিলাম তাতে নেপথ্যে। আমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয় অনেক পরে—ত্রিশের গোড়ায়। তিনি তখন মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্ত আসামী। জামিন নিয়ে কলকাতা এসেছিলেন দিন কয়েকের জন্য—চিকিৎসার্থ ডাক্তারদের পরামর্শ প্রয়োজন। আইন-অমান্যের সত্যাগ্রহে তখন ব্রিটিশ সরকার বিরক্ত ও ক্রোধান্ধ, বিপ্লবী বোমা-পিস্তলে সাহেবপাড়া সন্ত্রস্ত। দু' জিনিসেই তিনি নিরাগ্রহ, তাঁর অনুগামী তরুণ যুবক আব্দুল হালিমও—'বুর্জোয়াদের অর্থহীন হৈ-রৈ।' তারপরে মুজফ্ফর আহ্মদের সঙ্গে দেখা—১৯৩৮-এ, যখন জেল থেকে মুক্তি পেয়েছি। কমিউনিস্ট নই, কিন্তু গণ-আন্দোলনের পথের সন্ধানী। তারপরে কবে যে আর দেখা হয় নি তাই মনে করবার মতো। রাজনৈতিক কারণই অবশ্য প্রধান সূত্র। কিন্তু সে সব অফুরন্ত সভা-সমিতি সম্মেলন আলোচনা ছাড়াও বাড়ি-ঘরে, দপ্তরে, পথে-প্রান্তরে কতবার কতখানে একসঙ্গে বসবাস, ভ্রমণ,—বিশেষ করে পেশোয়ার-এ কালিম্পং-এ একসঙ্গে বিশ্রাম, দিনযাপন—এ সবের হিসাব রাখা সম্ভবও নয়। রাজনীতি ছাড়াও সমাজ, সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ভূগোল, রন্ধনবিদ্যা থেকে যে কোনো মানুষের নাড়ীনক্ষত্রের তথ্য—মানুষের এমন জিনিস নেই যাতে তাঁর আগ্রহ দেখি নি, কিংবা দেখেছি কোনো জিনিসে তাঁর অবজ্ঞা। এ সকল মিলিয়ে তাঁতে-আমাতে যে অন্তহীন পরিচয় গড়ে ওঠে—মুছে যেতে-যেতেও তার যেটুকু এখনো মুছে যায় নি—শুধু তা বলে ওঠাও আমার সাধ্যাতীত। দু-দশ পৃষ্ঠায় অসম্ভব। অনেকে হয়তো বলবেন—সে তো নানা তুচ্ছ কথা। কিংবা মাত্র ব্যক্তিগত পরিচয়ের কথা, গল্প আড্ডার বিষয়। মুজফ্ফর আহ্মদ্-এর পরিচয় তো তা দিয়ে নয় তার পরিমাপ হবে রাজনৈতিক দৃষ্টিতে, কারণ রাজনীতির জন্যই তো তিনি স্মরণীয় এবং বরণীয়। তাঁদের কথা মিথ্যা নয়। সেজন্যই তো মনে করি—নোয়াখালি জেলার পরিচয় মুজফ্ফর আহ্মদকে দিয়ে। কিন্তু তারপরেও যা থেকে যায়—'কেমন মানুষ মুজফ্ফর আহ্মদ্'—তা-ও কম কথা নয়। নিশ্চয়ই বড়ো কথা—এই ক্ষীণ পীড়িতদেহ মানুষটির ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের সাধনা, নির্বাক মর্যাদায় অনাহারে দিন-যাপন, অতন্দ্র চেষ্টায় ছোট বড় আয়োজন,—মীরাট মামলার সরকারী কাগজপত্র থেকেও তার কিছু উদ্দেশ পাওয়া যাবে। তারপরে গত পঁচিশ বৎসর তাঁর পার্টি-পালন অনেকেরই দেখা। ছাপাখানার ব্যবস্থা ও দৈনন্দিন অর্থসংস্থান থেকে প্রতিটি কমরেডের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার

ব্যবস্থা পর্যন্ত যে-কর্তব্য পালন, তাতো শুধু রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন নয়, অনেকখানিই মানবীয় হৃদয়বৃত্তিতে স্নেহ-সংলিপ্ত। রাজনীতিতে লক্ষণীয়—তাঁর মতাদর্শের অবিচল দৃঢ়তা, কঠোর নৈতিকতার মতোই কঠোর শৃঙ্খলাবাদিতা। man of strong likes and dislikes, কিন্তু আত্মপ্রকাশে একান্ত বিমুখ; সভায় সমিতিতে কুণ্ঠিত; পদ-প্রতিষ্ঠায় বীতরাগ। 'পসন্দ' হলে যুক্তি ছাড়িয়ে তিনি স্নেহে মমতায় সজীব। তাঁর অপসন্দ রাজনৈতিক মত ও কাজের সম্পর্কে সেইরূপই অসহিষ্ণু, ও প্রায় সুবিচারে পরাহত-বুদ্ধি। অথচ এই তথ্যও লক্ষণীয় যে, মতের বিরূপতা সত্ত্বেও সাক্ষাতে বাক্যালাপে তিনি শান্তভাষী, নম্র, সজ্জন। বড়োদের বা ছোটদের প্রশস্তি গাইতেও তিনি অত্যুক্তি অপছন্দ করেন। কাউকেও এই বৃদ্ধ এখনো 'আপনি' ছাড়া 'তুমি' বলতে অক্ষম। সাধারণ মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে—মজুর কৃষকের সঙ্গে আচরণে—অকৃত্রিম তাঁর সৌজন্য, স্বাভাবিক তাঁর সৌহার্দ্য। মানুষের প্রতি মানুষ হিসাবেই একটা শ্রদ্ধা না থাকলে এ সম্ভব হয় না। এই শ্রদ্ধার বলেই দলের পুরনো নতুন সকল মানুষের কথা এমন করে তাঁর মনে থেকে যায়। শুধু দলই বা কেন, রাজনীতিক্ষেত্রে তারিখ শুদ্ধ প্রতিটি মানুষের ঠিকুজী-কোষ্ঠি তাঁর জানা। ভারতীয় 'রাজনীতির জীবন্ত কোষগ্রন্থ'—আমি যতদূর জানি এ নাম একমাত্র মুজফ্‌ফর আহ্‌মদকেই খাটে।

ধর্মতলা স্ট্রিটে লক্ষ্মীর পাশের ফ্ল্যাটে তাঁরা থাকতেন—মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ্‌ ও পার্টির কয়েকটি তরুণ কর্মী। লক্ষ্মী ডাক্তারী চেম্বার শুদ্ধ নিজ ফ্ল্যাটে থাকত একা। একা বলে কোনো ভাবনাই তার ছিল না—'কাকাবাবু আছেন দাদাও এর থেকে বেশি দেখাশুনা করতে পারতেন না।' দেশে-বিদেশে লক্ষ্মী বহু মানুষকে দেখেছে। আর তীক্ষ্ণ ছিল তার দৃষ্টি, দুর্বার বিচারবুদ্ধি। তাঁর কথাতেই শেষ করি—"এমন (কঠিন-প্রতিজ্ঞ) মানুষ যে এত সহজ হতে পারেন, ভালোবাসেন সকলকে, তা ভাবতেই পারতাম না কাছ থেকে তাঁকে না দেখলে।"

নোয়াখালি মুজফ্‌ফর আহ্‌মদকে কাছে থেকে দেখতে পায় নি। কাছে রাখতেও পারে নি। এবং মনে হয়, কাছে রাখতে চায়ও নি। চাইলে তার ইতিহাস অন্য রকম হয়ে যেত। তিনিও যে কারণে মৌলবী হতে চান নি, সে কারণেই নোয়াখালিতে থাকতেও উৎসাহ বোধ করতেন না। মৌলবী মওলানা না হয়ে মানুষ হয়ে উঠলেন মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ।

পুস্তক-পরিচয়

অফুরন্ত এ মহাবিস্ময়

পুণ্যস্মৃতি। শ্রীসীতা দেবী। মৈত্রী। প্রাপ্তিস্থান: জিজ্ঞাসা। দশ টাকা।

যিনি মহৎ তিনি নিজেকে বিচিত্রও করেছেন এমন ঘটনা ইতিহাসে একেবারে দুর্লভ নয়। জীবনের বিচিত্র সম্ভাবনাগুলির বিকাশের যে-উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পাওয়া যায় তাই নিয়ে বিস্ময় ও ঔৎসুক্য দেশে-বিদেশে কত লোকের মনে এখনি দেখা দিয়েছে; ভাবীকালে তা বাড়বে বই কমবে না। একদিক থেকে মনে হয় রবীন্দ্রজীবন একেবারে অনন্ত। শুধু নিজের মধ্যেই বিচিত্র নয়, এই জীবন যেসব আগ্রহ ঔৎসুক্য অনুরাগবোধ ও চিন্তাধারাকে আকর্ষণ করে নিজেকে তার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করেছে তা-ও অশেষ বৈচিত্র্যময়। রবীন্দ্রজীবনী তাই শুধু ঐতিহাসিক, তাত্ত্বিক, সাহিত্যিক, দার্শনিক বিবৃতির মধ্যেই সম্পূর্ণতা লাভ করবে না। এ ছাড়াও চাই নানা ধরনের প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তির সাক্ষ্য। এবং যাঁরা এ কাজে হাত দেবেন তাঁদের পক্ষে অন্তরঙ্গতার সুযোগও যেমন অপরিহার্য, তেমনি দরকার নিজগুণে রবীন্দ্রজীবন-সিম্ফনির কোনো-একটি সুরে নিজের সুরটি মেলাবার ক্ষমতা।

সৌভাগ্যক্রমে এই ধরনের সুযোগ ও আত্মিক যোগসাধনের ক্ষমতা ঘটেছিল কয়েকজনের মধ্যে। এঁরা প্রধানত নারী। এঁরা রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনের নানা দিক যেভাবে আলোকিত করেছেন তার জন্যে রবীন্দ্র-অনুরাগীরা চিরকাল তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন। এঁদের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজনের নাম করতে গেলে বলতে হয় ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী, প্রতিমা ঠাকুর, রানী চন্দ, মৈত্রেয়ী দেবী, নির্মলকুমারী মহলানবীশ ও বর্তমান গ্রন্থের লেখিকা সীতা দেবীর কথা। নিজস্ব চারিত্রিক প্রবৃত্তি ও দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য এঁদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য আলেখ্যও বিচিত্র, ও নিজস্ব মূল্যে মূল্যবান।

সীতা দেবী স্বতন্ত্র লেখিকা হিসাবেও যশের অধিকারিণী, কিন্তু এই 'পুণ্যস্মৃতি'তে তিনি কিছু 'লেখবার' চেষ্টা করেন নি। ১৯১১ সাল থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত তিনি নানাভাবে রবীন্দ্রসান্নিধ্য লাভের যে-সুযোগ পেয়েছিলেন তারই একটা চলন্ত বিবরণ রক্ষা করেছিলেন তাঁর দিনলিপিতে। এই গ্রন্থে সেইগুলিকেই সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে যেসব বিপদের

সম্ভাবনা ছিল তার কোনোটাই ঘটেনি। এই রচনা ব্যক্তিগত আবেগ, উচ্ছ্বাস, চিন্তা, কল্পনার সংকলন একেবারেই নয়, বরং অনেক পরিমাণে একটি ব্যক্তি-নিরপেক্ষ সত্য জীবনচিত্র ও ঘটনাপরম্পরা রচনার চেষ্টা। এই অপক্ষপাতিত্ব বা objectivity একটা কঠোর বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তি সাধনার ফল নয়, এর উৎসমূলে আছে একটি অকপট আন্তরিকতাপূর্ণ নিরভিমান মনের প্রসাদ। তাঁর ভালো লাগা মন্দ লাগাকে কোনো সমারোহের সঙ্গে উপস্থিত করে তিনি নিজের সত্যপ্রীতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান নি, বা মানুষ বা ঘটনার মর্যাদার হ্রাস বৃদ্ধি করবার চেষ্টা করেন নি। বিনা চেষ্টায় একটি সত্য সচেতন মন যা পেয়েছে আর যে মাত্রা ও পরিমাণে পেয়েছে তার স্বতঃস্ফূর্ত অর্ঘ্য এনে দিয়েছে এই দিনলিপির প্রতিটি পাতায়।

অপর দিকে এই গ্রন্থ হতে পারত অনেক পরিমাণে তথ্য ও ঘটনার এক নীরস পঞ্জিকা। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও বিপদ থেকে রক্ষা করেছে লেখিকার ঐ সূক্ষ্ম সংবেদনশীল মন, যার স্পর্শে সামান্য ঘটনার উপরও ছড়িয়ে পড়েছে একটি স্নিগ্ধ সুন্দর ঐকান্তিক শ্রদ্ধার আলো। 'পুণ্যস্মৃতি' এই স্মৃতির মহৎ বিষয়-বস্তুকেও যতটা প্রকাশ করেছে, এই স্মৃতির সাধিকাকেও ততখানি।

'গোরা'য় পরেশের সান্নিধ্য লাভ করলেন সুচরিতা, তার ফলে জীবনের সঙ্গে জীবনসংযোগের একটি সুন্দর কল্যাণময় চিত্র ফুটল; রবীন্দ্রসান্নিধ্যে সীতা দেবীরও তাই। এই শ্রদ্ধা-প্রীতির সম্বন্ধে যাঁরা এই শতাব্দীর প্রথম থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সংযুক্ত তাঁরা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি লেখিকার মনোভঙ্গী ও অনুভূতিবৈশিষ্ট্যের প্রতিধ্বনি আবিষ্কার করবেন নিজেদের মনে ও হৃদয়ে।

তা ছাড়া এই চিত্রপরম্পরার ধারাবাহিকতারও একটা বিশেষ মূল্য আছে। অনেক লেখকের স্মৃতিমন্থনে ফুটে ওঠে আলোচ্য চরিত্রের কোনো বিশেষ একটি দিক, বিশেষ স্থান কাল পাত্র বা ভাব ও উদ্যোগের সীমিত চিত্র। 'পুণ্যস্মৃতি'তে দীর্ঘকালব্যাপী সাক্ষ্য সন্নিবেশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের ঘরোয়া জীবনের, অন্তরঙ্গ সমাজের মধ্যে তাঁর সহজ সুন্দর বিচরণের, আশ্রমের কর্মী অতিথি-অভ্যাগতদের মধ্যে নানা রকম ক্রিয়াকলাপের, দেশবিশ্রুত চিন্তা ও কর্মনেতাদের সঙ্গে মিলনের। শুধু থেমে থাকা চিত্রে যা হত না সেই সিদ্ধিলাভ হয়েছে এই চলচ্চিত্রে। এতে একটা জিনিষ প্রতিপন্ন হয়েছে অতি নিঃসংশয়ভাবে যা ভবিষ্যৎকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত করে রাখা সহজ ছিল না; সে হচ্ছে এই যে

এই মহাপুরুষ মর্তবাসীর ধরাছোঁয়ার বাইরে কোনো আদর্শলোকবিহারীই ছিলেন না, ইনি ছিলেন একান্ত প্রত্যক্ষভাবে সকলের প্রাপ্তিসীমার মধ্যে আবির্ভূত অনেক মানুষের মধ্যে একটি সেরা মানুষ। আবার অপরদিকে তিনি তাঁর এইসব প্রিয় মানুষদের মধ্যে শুধু তাদের প্রেক্ষিতসীমার দ্বারাই আচ্ছন্ন ছিলেন না, ছিলেন তা ছাড়িয়ে। সঙ্গে থাকা ও ছাড়িয়ে যাওয়ার, অতি অকৃত্রিম সহজ প্রকাশের দ্বারা প্রাত্যহিক সত্যের মধ্যে অবতীর্ণ থেকেও চিরন্তনের হিল্লোল নিজের পরিবেশের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারার অপূর্ব সাধনা ও সিদ্ধির নির্ভরযোগ্য একটি রেকর্ড হিসাবে এই গ্রন্থের মূল্য অনেক। এই প্রসঙ্গে লেখিকার একটি সহজ বর্ণনা তুলে দিচ্ছি :

"দেবতাকে মানুষ যেমনভাবে ভক্তি করে ও ভালবাসে, সেই ভক্তি ও ভালোবাসা মানুষ হইয়া একমাত্র তাঁহাকেই পাইতে দেখিয়াছি, কিন্তু দেবতার মতো তিনি দুরধিগম্য ছিলেন না।"

আশ্রমসমাজে তাঁর স্থান সম্বন্ধে :

"রবীন্দ্রনাথ যেন এই বিরাট পরিবারের গোষ্ঠীপতি ছিলেন। তাঁহার প্রতি একান্ত ভালোবাসাই ছিল আমাদের মিলনের সূত্র। তিনি যদি কোনো নূতন ধর্মের প্রবর্তক হইতেন তাহা হইলে তাঁহাকে অনুসরণ করিবার লোকের কোনো অভাব হইত না। চুম্বক যেমন করিয়া লৌহকে টানে তেমনি করিয়া মানুষের হৃদয়কে আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা তাঁহার এমন অসামান্য পরিমাণে ছিল, যাহা আর কোনো মানুষের মধ্যে কোনোদিন দেখি নাই।"

এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের দৈনিক কাজের বিবরণ, তাঁর গান, নাট্যাভিনয়, রচনাপাঠ, উৎসব ইত্যাদির সম্বন্ধে অনেক তথ্য, নানা ব্যক্তি ও পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়ার অনেক অনুলিপি আছে এই গ্রন্থে। আছে তাঁর সরস কথোপকথনের উদাহরণ, শান্তিনিকেতন আশ্রমজীবনের অনেক ঘটনা। আর আছে অধুনা অপস্রিয়মান পুরানো আশ্রমের স্নিগ্ধ সুন্দর চিত্র। "শান্তিনিকেতন তখন আমাদের কাছে সত্যই শান্তির নিকেতন ছিল, মাঝে মাঝে যখন কলিকাতায় ফিরিতাম মনে হইত যেন দাবানলের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছি।"

গঠনে সজ্জায় চিত্রে 'পুণ্যস্মৃতি' একটি সযত্নে সংগ্রহ ও রক্ষা করবার যোগ্য বই। সমস্ত লাইব্রেরি ও রবীন্দ্র-অনুরাগী সমস্ত পাঠকের পক্ষে এ বই অপরিহার্য।

সুশীলচন্দ্র সরকার

বিজ্ঞান ও নানা চিন্তা

বিজ্ঞানের সংকট ও অন্যান্য প্রবন্ধ। সত্যেন্দ্রনাথ বসু। লেখক সমবায় সমিতি। টা. ৬'৭৫।

মাতৃভাষার মধ্য দিয়ে বিদ্যাশিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চার জন্য আমাদের দেশে যাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পরেই অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আশ্চর্য এই, সত্যেন্দ্রনাথের বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ের বাংলা প্রবন্ধ ও বক্তৃতা বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি সাময়িক পত্রিকায় মাত্র প্রকাশিত হয়েছে—পুস্তকাকারে কখনও মুদ্রিত হয় নি। বাংলাভাষায় সত্যেন্দ্রনাথের কোনো বই ছাপা না থাকায় গত বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' দিতে সক্ষম হন নি বলে জানি। কলিকাতার লেখক সমবায় সমিতি সম্প্রতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কতকগুলি বিজ্ঞান ও শিক্ষা বিষয়ের প্রবন্ধ ও ভাষণ একত্র সংগ্রহ করে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেছেন। এজন্য লেখক সমবায় সমিতি দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা লাভ করেছেন সন্দেহ নেই। এই পুস্তকেরই নাম—'বিজ্ঞানের সংকট ও অন্যান্য প্রবন্ধ'। এই পুস্তক প্রকাশের পরই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিনা দ্বিধায় এ বছর অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছেন।

এই পুস্তকে যে চৌদ্দটি প্রবন্ধ ও ভাষণ সংগৃহীত হয়েছে, তাদের মধ্যে নিছক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ মাত্র কয়েকটি, যথা—'বিজ্ঞানের সংকট', 'শক্তির সন্ধানে মানুষ', 'আইন্স্টাইন (১)' ও 'গণিতবিজ্ঞানী জ্যাক্ হাদামার'। অবশ্য 'আইন্স্টাইন (২)', 'গালিলিও' ও 'ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার'—এই তিনটি প্রবন্ধেও অনেক বিজ্ঞানের কথা আলোচিত হয়েছে।

'বিজ্ঞানের সংকট'-এর নামকরণ করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের বিশিষ্ট বন্ধু, সুপণ্ডিত ও সুসাহিত্যিক স্বর্গত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। প্রবন্ধটি যখন বাংলা ১৩৩৮ সালে 'পরিচয়' পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, তখনই সকলের প্রতীতি হয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের জটিলতা কাটিয়ে এমন যথাযথ ও বিশুদ্ধ জ্ঞানের পরিবেশন একমাত্র সত্যেন্দ্রনাথ বসুর পক্ষেই সম্ভব। এর পর বিজ্ঞান আরও অগ্রসর হয়েছে, বিজ্ঞানী আরও নতুন সংকটের সম্মুখীন হয়েছে।

সত্যেন্দ্রনাথের মুখে-মুখে তার বিবৃতি আমরা শুনেছি—কিন্তু মাতৃভাষায় তিনি তা লিপিবদ্ধ করেন নি। 'শক্তির সন্ধানে মানুষ' প্রবন্ধটি বহু বৎসর পরে লেখা। লেখাটি 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-পত্রিকায় ১৯৪৮ সনের মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এ লেখাটিতে পদার্থবিজ্ঞানের অনেক তথ্য ও তত্ত্ব অত্যন্ত সহজভাবে আলোচিত হয়েছে। পরমাণুর গঠন ও বিন্যাস, পরমাণুর ভাঙন ও বস্তুর রূপান্তর থেকে আরম্ভ করে মন্দগতি নিউট্রনের সংঘাতে ইউরেনিয়াম্ -২৩৫ পরমাণুর বিভাজন ও তার ফলে আইন্‌স্টাইনের ভর ও শক্তির সাম্যতা-মূলক নিয়মে পরমাণু থেকে প্রচণ্ড শক্তির সন্ধান এবং পরমাণু বোমায় সেই শক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ ইত্যাদি পদার্থ বিজ্ঞানের মূল তথ্য ও তার সহজ ব্যাখ্যা সাধারণ অবৈজ্ঞানিকের কৌতূহল অনেকখানি মিটিয়েছে। সূর্য ও নক্ষত্ররাজি সহস্র কোটি বৎসর তেজ চতুর্দিকে বিকিরণ করছে, অথচ তাদের উজ্জ্বলতা হ্রাসের কোনও লক্ষণ নেই—এই অন্তর-তেজের ক্ষতিপূরণের রহস্যও এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার পর বহু বৎসর কেটে গেছে। কাজেই শক্তির সন্ধানে বিজ্ঞানীর অতি আধুনিক প্রচেষ্টা এই প্রবন্ধে অকথিতই রয়েছে বলা যায়। ১৯৬৪ সনের অক্টোবর সংখ্যার 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-পত্রিকায় প্রকাশিত সত্যেন্দ্রনাথ বসুর 'পাউলি ও তাঁর বর্জন-নীতি' শীর্ষক প্রবন্ধটি এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হয় নি। অতি আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলি মাতৃভাষায় কি রকম সহজভাবে বোঝানো সম্ভব, এই প্রবন্ধে তার নিদর্শন পাওয়া যায়।

বাংলা ১৩৪২ সালে 'পরিচয়' পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী আইন্‌স্টাইন সম্বন্ধে যে-প্রবন্ধটি লেখেন, তাতে মূলত আপেক্ষিকতা-বাদের প্রধান কথাগুলি যতদূর সম্ভব সাধারণ পাঠকের উপযোগী করে লেখা হয়েছে। নিউটন প্রমুখ পূর্বাচার্যেরা ব্যক্তিনিরপেক্ষ দেশ-কাল মেনে এসেছিলেন। দূরত্বের মাপকাঠি দ্রষ্টার গতি ও অবস্থানের উপর যেমন নির্ভর করে না, কালের মাপকাঠিও তেমনি দ্রষ্টা-নিরপেক্ষ। নিউটনের গতিবিজ্ঞানে ও তাঁর মহাকর্ষতত্ত্বে দেশ-কালের এই ধ্রুবত্ব স্বতঃসিদ্ধভাবে স্বীকৃত। এই গতিবিজ্ঞান ও মহাকর্ষতত্ত্বই আবার গ্রহ-উপগ্রহের কক্ষপথের বিশেষত্ব ও তাদের গতিবিধির সম্যক সমাধানে সমর্থ হয়েছিল। আলোকতরঙ্গের উপর দ্রষ্টার গতিবৈশিষ্ট্যের প্রভাব সম্পর্কে যখন পরীক্ষাগত অসামঞ্জস্য দেখা গেল, আইন্‌স্টাইন তখন তা দূর করবার জন্য আপেক্ষিকতাবাদ প্রবর্তন করেন।

প্রথমে তিনি বিভিন্ন বস্তুর সমবেগের আপেক্ষিক গতি নিয়েই আপেক্ষিকতাবাদের বিচার করেন—মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবকে গণনায় অন্তর্ভুক্ত করেন নি। পরে তিনি তাঁর আপেক্ষিকতাবাদের প্রয়োগক্ষেত্র বিস্তৃত করে মহাকর্ষের এক নতুন পরিকল্পনা দিলেন। নিউটনীয় তত্ত্বের সাহায্যে যেসব প্রাকৃতিক ঘটনার হেতুনির্দেশ সম্ভব হয়েছিল—তার প্রত্যেকটির আপেক্ষিকতাবাদসম্মত ব্যাখ্যা দিতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। অবশ্য, উচ্চাঙ্গ গণিতের সাহায্য ব্যতীত এই সব ব্যাখ্যার মর্ম গ্রহণ করা দুঃসাধ্য। "জড়ের গতি-বৈচিত্র্যের কারণ দ্রষ্টার দেশ-কালরূপ প্রক্ষেপভূমির অসমতা ও বর্তুলতা"—এই উক্তি সাধারণ পাঠকের কাছে কেবল বাক্যের সমষ্টিমাত্র। কিন্তু আলোকরশ্মির উপর মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব সম্পর্কে আইনস্টাইন তাঁর নতুন তত্ত্বানুসারে যে-ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা যখন জ্যোতির্বেত্তাদের পরীক্ষায় সত্য বলে প্রমাণিত হল, তখন থেকেই আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ সর্বজনস্বীকৃত। বলা বাহুল্য, সত্যেন্দ্রনাথের নিজের ভাষায় আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাতত্ত্বের সাধারণ আলোচনা বিশেষভাবেই মূল্যবান। আপেক্ষিকতাবাদ ব্যতীত ব্রাউন্-আবিষ্কৃত অনুবীক্ষণীয় বস্তুকণার বিশৃঙ্খল আন্দোলনের বিজ্ঞানসম্মত হেতু নির্দেশ এবং আলোকের শক্তিকণাবাদও এই প্রবন্ধে উল্লেখিত হয়েছে।

আপেক্ষিকতাবাদে আইনস্টাইন ইউক্লিডীয় জ্যামিতি ছেড়ে রীমান্-কল্পিত দেশবোধতত্ত্বের আশ্রয় নিয়েছিলেন। ফলে যে-সমস্যার সৃষ্টি হয় তার আলোচনা সত্যেন্দ্রনাথ 'আইনস্টাইন (১)' প্রবন্ধটির শেষদিকে কিছু করেছেন। তাঁরই লেখা থেকে ভাষায় কিছু পরিবর্তন করে এখানে কিছু উদ্ধৃত করি :

"যে প্রত্যয় ও সংজ্ঞার সংযোজনা থেকে বৈজ্ঞানিকের প্রতীক-জগৎ গড়ে ওঠে—তার সঙ্গে মানব-অভিজ্ঞতার যদি ন্যায়সংগত নিত্যযোগ না থাকে, তবে কি বৈজ্ঞানিকের কল্পিত জগতের প্রতিকৃতির সহিত বাহ্য জগতের কোনও সম্পর্ক নেই? হেতুপ্রভব প্রতীকের সাহায্যে বহির্জগতের স্বরূপ-সত্তার উপলব্ধির চেষ্টা কি মানবের ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র?…আইনস্টাইন তা বিশ্বাস করেন না। ন্যায়ানুগত যোগসূত্র না থাকলেও কোনও অজ্ঞেয় উপায়ে বহির্জগৎ আমাদের প্রতীকজগতের প্রত্যয় ও স্বতঃসিদ্ধগুলিকে অদ্বিতীয়ভাবে সুনির্দিষ্ট করে—আইনস্টাইনের তাই দৃঢ় বিশ্বাস। সেই অদ্বিতীয় নিয়মাবলীকে আবিষ্কার করা যে মানুষের পক্ষে সম্ভব, তা-ও তিনি বিশ্বাস করেন।…

পদার্থবিজ্ঞানের নবতম সমষ্টিবাদের ফলে আজকাল অনেকেই হেতুবাদের উপর বিশ্বাস হারিয়েছেন। ফলে ঘটনার অবশ্যম্ভাবিতার পরিবর্তে তার সম্ভাবনার আলোচনাই বিজ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য বলে তাঁরা মনে করেন। এই নব মতবাদ অণু-পরমাণুর রাজ্যের অনেক জটিল সমস্যার সমাধানে সক্ষম হলেও, ভবিষ্যতে যে হেতুবাদের প্রতিষ্ঠা হবে—এই ছিল আইন্স্টাইনের দৃঢ়বিশ্বাস।" ১৯৪৭ সনের ৭রা ডিসেম্বর আইন্স্টাইন ম্যাক্স বর্নকে যে-চিঠি লিখেছিলেন, তাতে এই বিশ্বাসের কথাই স্পষ্ট। চিঠির কতক অংশ অনুবাদ করে দেওয়া গেল :

"...আমার স্থির বিশ্বাস যে বিজ্ঞানী শেষ পর্যন্ত এমন এক তত্ত্বে উপনীত হবে যেখানে নিয়মানুগত বস্তু বা ঘটনা কেবল সম্ভাবনামাত্র নয়—যেখানে তা জ্ঞানলব্ধ বাস্তব সত্য। এই বিশ্বাসের সপক্ষে কোনও যুক্তি দিতে আমি অক্ষম; আমার কড়ে আঙুলকে শুধু সাক্ষী দাঁড় করাতে পারি—আমার দেহের বাইরে যার কোনও সম্ভ্রমসূচক ও বিধিসম্মত ক্ষমতাই নেই।"

'আইন্স্টাইন (২)' প্রবন্ধটি ১৯৫৮ সনে আইন্স্টাইনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই লেখা হয়। ঐ সনে এপ্রিল সংখ্যার 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় লেখাটি ছাপা হয়। আইন্স্টাইনের জীবন ও সাধনার স্পষ্ট ও সুন্দর ছবি এই লেখায় পাওয়া যায় যা সাধারণ পাঠকের বিশেষ উপভোগ্য।

জ্যাক্ হাদামার ছিলেন ফরাসী গণিতবিজ্ঞানী। বিশেষজ্ঞদের নিকট তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি। তিনি বহু দেশ পর্যটন করেন। ভারতবর্ষেও একবার সায়েন্স কংগ্রেসে উপস্থিত হয়েছিলেন। ভারতবর্ষের বহু বিজ্ঞানী তাঁর ছাত্র। ১৯৬৩ সনে অধ্যাপক হাদামারের পরলোকগমনের পর সত্যেন্দ্রনাথ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় এই বিশিষ্ট গণিতবিজ্ঞানীর জীবন ও গবেষণার কথা সাধারণ পাঠকের জন্য লিখেছিলেন। গণিতবিজ্ঞানে উদ্ভাবন সম্পর্কে অধ্যাপক হাদামারের মনস্তাত্ত্বিক বিচার এই লেখাটিতে সংকলিত ও আলোচিত হয়েছে। অনেক বিজ্ঞানীর কাছে এই আলোচনাটি মূল্যবান মনে হবে। 'গালিলিও' সম্বন্ধে রচনাটি ১৯৬৪ সনে এপ্রিল সংখ্যার 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় গালিলিও-র চার শ' বছরের জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত হয়। এই সুন্দর জীবনালেখ্যটি বিজ্ঞানী-অবিজ্ঞানী সকলকেই সত্যের পথে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করবে সন্দেহ নেই।

'ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার' শীর্ষক প্রবন্ধটি ১৯৬২ সনে মার্চ সংখ্যায় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় ছাপা হয়। প্রবন্ধটি শুধু বিজ্ঞানসভার স্থাপয়িতা ও বিচক্ষণ চিকিৎসাবিজ্ঞানীর জীবনকথা মাত্র নয়। বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ কি নিয়তি সম্বন্ধে কিছু জানতে পারে? ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁর মৃত্যুর ২।৩ বছর আগে ১৯০১ সনে এই বিষয় নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। মহেন্দ্রলাল সরকারের এই প্রবন্ধের প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ এই বিষয়টি আধুনিক বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে আরও ব্যাপকভাবে আলোচনা করেছেন। জড় ও জৈব জগতে বিবর্তন ও ক্রমবিকাশের তত্ত্ব আজ পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত। কোন্ সুদূর অতীতে বস্তুজগতে প্রাণশক্তির আবির্ভাব হয়েছিল—তার অভিব্যক্তি ও পরিব্যক্তির মূলসূত্র সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের তর্ক-বিতর্ক আজও শেষ হয় নি। ফরাসী দেশের উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানী Pierre Teilhard de Chardin এই বিবর্তন সমস্যায় তাঁর Phenomenon of Man পুস্তকে যে-আলোকপাত করেছেন, তা সারা জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই বিজ্ঞানীর কথাই জোর দিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন :

> "বিবর্তনের ঊর্ধ্বস্তরে পৌঁছতে প্রাণশক্তি একটি বিশেষ রীতি অবলম্বন করেছে—সে হচ্ছে সহযোগিতা। প্রাণ ছিল প্রথমে দুর্বল, মাত্র একটি জীবকোষে নিবদ্ধ, বহুকোষের জীব হয়ে সে শক্তি সঞ্চয় করল। উচ্চ পর্যায়ের জীবের দেহে কত সহস্রকোটি জীবকোষ পরিপূর্ণ সহযোগিতায় তাদের কাজ করে চলেছে, পরস্পরকে সাহায্য ও পরিপূর্ণ করে তুলেছে তাদের জীবন।···সমাজগঠনে সেই একই নীতি কাজ করছে।··· মানুষের ভবিষ্যৎ মানুষের হাতে। সে যদি অনুসরণ করে ব্যক্তি-নির্বিশেষে দয়া ও সহযোগিতার মনোভাব, তাহলে যে সংঘাত ও দ্বেষের প্রকোপ আজ দেখা যাচ্ছে, তার নিরসন হবে। তাহলেই সার্বজনীন বিশ্বমানবের সভ্যতার আবির্ভাব হবে। অন্যথায় যেমন অতিকায় জীবজন্তুরা অতীতেই লোপ পেয়েছে ও সাক্ষ্য দিতে আছে মাত্র তাদের প্রস্তরীভূত কংকালের অবশেষ, ভবিষ্যতে মানবসভ্যতারও ওইরূপ বিষাদভরা পরিণাম হওয়া বিচিত্র নয়!"

উপসংহারে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন : "বিজ্ঞানোচিত মনোভাব, হিংসা-দ্বেষের পরিবর্তে সহযোগিতা ও প্রেমের প্রতিষ্ঠার দরকার, বিবর্তনের ইতিহাস এই নির্দেশ দিচ্ছে। বিজ্ঞানের পথেই জয়লাভ হবে।"

ফরাসী বিজ্ঞানী Pierre Teilhard de Chardin-এর মতবাদের উচ্ছ্বসিত সমর্থন ও প্রশংসা সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাই—সত্যেন্দ্রনাথ এক জায়গায় এসে থেমেছেন। ফরাসী বিজ্ঞানী কিন্তু তা থেকেও অগ্রসর হয়ে অনেক কথা তাঁর পুস্তকে লিখেছেন। ফরাসী বিজ্ঞানীর লেখা থেকে এখানে কিছু উদ্ধৃত করা যাক:

> "In the eyes of the physicist, nothing exists legitimately, at least up to now, except the ***without*** of things. The same intellectual attitude is still permissible in the bacteriologist, whose cultures are treated as laboratory reagents. But it is still more difficult in the realm of plants. It tends to become a gamble in the case of a biologist studying the behaviour of insects or coelentrates. Finally it breaks down completely with man, in whom the existence of a ***within*** can no longer be evaded, because it is the object of direct intuition and the substance of all knowledge.…
>
> Co-extensive with their Without, there is a Within to things."

বিশ্ববস্তুর অন্তর ও বাহির—এই দুইয়ে বিশ্বাসী কয়জন বিজ্ঞানী আছেন জানি না। সত্যেন্দ্রনাথ এ-বিষয়ে কোনও অভিমত প্রকাশ করেন নি।

কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ-উৎসবে এক আলোচনা সভা হয়। সেই সভায় প্রধান অতিথি একজন দার্শনিকের কয়েকটি উক্তির উত্তরে সভাপতি হিসাবে ও বিজ্ঞানগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসাবে সত্যেন্দ্রনাথ যে-ভাষণ দিয়েছিলেন, চৌম্বক ফিতা থেকে তা সম্পূর্ণ উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। এই অসম্পূর্ণ রেকর্ড থেকে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণের যে-রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন, 'বৈজ্ঞানিকের সাফাই' নাম দিয়ে তা ছাপা হয়েছে। তর্ক-বিতর্কের ঝাঁঝ থাকা সত্ত্বেও এই ভাষণে বৈজ্ঞানিকের লক্ষ্য ও মানুষের আদর্শ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, যা আমাদের প্রণিধানের যোগ্য। অনেকেই মনে করেন—বিজ্ঞানী আজ সত্যিকারের দার্শনিক মনোভাব হারিয়েছে, সৃষ্টির পশ্চাতে যে স্রষ্টার মন রয়েছে বিজ্ঞানী সে কথা ভাবে না, মানুষের আত্মা বা ভগবানের ধার সে ধারে না। এর উত্তরে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন:

"আমরা বিজ্ঞানীরা হয়তো স্বীকার করব যে এ-সব বিষয় আমরা বুঝি না ও তারই জন্য এ-সব প্রশ্ন আমরা এড়িয়ে চলি। হয়তো বা ভাবি, যাঁর সৃষ্টি তিনিই একমাত্র এর মর্ম ও স্বধর্ম বুঝবেন। দার্শনিক মতবাদ এতরকম উঠেছে, তার মধ্যে আমরা কোনও আশ্বাসবাণী হয়তো খুঁজে পাই না।···মিথ্যা ও সত্যের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা চালালেও জগতের মধ্যে বিকট দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার যে-রূপ প্রকট রয়েছে সেটাকে শুধু মায়া বলে কাটিয়ে দিলে চলবে না। অন্তত পৃথিবীতে মানুষ যতদিন আছে, ততদিন সে চেষ্টা করবে এই সমস্ত জিনিস কী করে মানুষের জীবন থেকে মুছে ফেলা যায়। কী করে এমন এক সমাজ গড়া যায়, যার মধ্যে এই সমস্ত আকস্মিক বিপদপাত যেন একেবারে না থাকে। তার জন্য চাই জ্ঞান, চাই বিরাট কল্পনা।··· প্রকৃত বিজ্ঞানী শুধু যে আত্মপ্রসাদ বা আত্মাভিমানের জন্য বিশ্লেষণে ব্যস্ত থাকে, তা নয়; বিশ্লেষণের পরে যে-মূলসূত্র সে ধরতে পারছে, সেই নীতি বা রীতিকে অবলম্বন করলে প্রকাণ্ড মানব-সমৃদ্ধির সৌধ রচনা করা যাবে, সেই স্বপ্ন সে সব সময়েই দেখে। আবার যে-বিজ্ঞানী পরীক্ষার টিউব হাতে নিয়ে চেষ্টা করে অজ্ঞাত রোগের হদিস করতে, সেও সেই সঙ্গে চেষ্টা করে এইভাবে হয়তো অনেক মহামারীকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার উপায় আবিষ্কার হবে।"

সায়েন্স কলেজে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ উৎসবের এই ভাষণে সত্যেন্দ্রনাথ একস্থানে বলেছেন: "বিজ্ঞানীর মনে এইটি ধ্রুব বিশ্বাস যে, কেবলমাত্র ধর্মশাস্ত্র চর্চা করলে কিছু করা যাবে না। ধর্মশাস্ত্রে মানুষ কি বা জীবনদেবতার সঙ্গে মানুষের কি সম্পর্ক, তার চর্চা ও অনুশীলন নিভৃতে হওয়া দরকার। তার ভেতর থেকেই মানুষ হয়তো পাবে তার প্রতিদিন কাজ করবার শক্তি ও প্রেরণা। কিন্তু কাজে যখন সে নামবে তাকে সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত মন নিয়ে কাজ করতে হবে, যেটা দড়ি সেটাকে সাপ বললে চলবে না।" 'ধর্মধ্বজী'দের 'পারলৌকিক পরমার্থ' নিয়ে তিনি অনেক সময় কটাক্ষ করেছেন সত্য, কিন্তু উপরের উদ্ধৃতি ও তাঁর চিঠিপত্র থেকে মনে হয় না যে তিনি অধ্যাত্মসাধনায় অবিশ্বাসী।

'প্রবোধচন্দ্র বাগচি' বাংলা ১৩৬৩ সালের (বৈশাখ-আষাঢ়) 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় ছাপা হয়। এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধটি সত্যেন্দ্রনাথের অনাবিল বন্ধুপ্রীতি

ও জ্ঞানানুরাগের পরিচয় দেয়। 'নানা চিন্তা' লেখাটি বাংলা ১৩৭০ সালের 'পরিচয়' পত্রিকার মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। হালকাভাবে লেখা হলেও জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিক্ষা, ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র—দুনিয়ার সব বিষয় নিয়েই তাঁর চিন্তা এই লেখাটিতে আমরা পাই। সত্যেন্দ্রনাথের বলবার নিজস্ব ঢঙটি এই লেখায় বিশেষভাবে উপভোগ্য।

পুস্তকের বাকি প্রবন্ধ বা ভাষণগুলি শিক্ষা ও মাতৃভাষার সমস্যা সম্পর্কে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বহু বৎসরব্যাপী অভিজ্ঞতার পরিচয় দেয়। 'শিক্ষা ও বিজ্ঞান' ১৯৬০ সনে রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যে-ভাষণ দেন তারই সংক্ষিপ্ত বাংলা রূপান্তর। 'আমাদের উচ্চশিক্ষা' ১৯৬২ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত সমাবর্তন ভাষণের ভাবানুবাদ। 'মাতৃভাষা' ১৯৬২ সনে হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত 'আংরেজি হাটাও' সম্মেলনে সত্যেন্দ্রনাথের বাংলা বক্তৃতা। 'আশুতোষ ও বাংলার শিক্ষা-সমস্যা' প্রবন্ধটি বাংলা ১৩৭১ সালের 'দেশ' পত্রিকার সাহিত্য-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই দীর্ঘ প্রবন্ধটিতে বাংলাদেশে শিক্ষা-প্রবর্তনের সুসংবদ্ধ ও ধারাবাহিক ইতিহাস এবং উচ্চ শিক্ষাপ্রসারে স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অবদানের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। আশুতোষের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে লিখিত এই প্রবন্ধটি আলোচ্য পুস্তকটিকে সমৃদ্ধ করেছে সন্দেহ নেই।

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর আরও অনেক প্রবন্ধ ও বক্তৃতা নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলিও একত্র করে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করা প্রয়োজন। এ-বিষয়ে লেখক সমবায় সমিতির মনোযোগ আকর্ষণ করি। পুস্তকটির বহুল প্রচার কামনা করি।

সতীশরঞ্জন খাস্তগীর

বাংলায় চেহভ : নান্দীকারের 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী'

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই, এই কয়েক বছরেই 'নান্দীকার' নাট্যভাবনায় ও প্রযোজনায় এমন এক পরিণত স্থানে এসে পৌঁছেছেন যে, দর্শকদের কাছে, সমালোচকদের কাছে মামুলী নিন্দাপ্রশংসার চেয়ে বেশি-কিছু তাঁদের প্রাপ্য হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশে 'দ চেরি অর্চার্ড' অভিনয়ের যুক্তি হিসেবে 'নান্দীকার' বলেছেন, "স্বভাববাদ জিনিসটা সত্যিকার কী ব্যাপার, তার উৎকর্ষ কোথায় পৌঁছতে পারে,...আবার স্বভাববাদের পঙ্গুতা কোথায়, কোন্‌খানে তার সীমাবদ্ধতা"—এইসব তুলে ধরার জন্যই এ-নাটকের প্রযোজনা। কোনো প্রযোজনার পিছনে এমন একটা তাগিদ একাধারে অ্যাকাডেমিক ও পরীক্ষামূলক। এ হেন নাট্যভাবনার দাম আছে।

মূল থেকে রূপান্তরে নতুন স্থানকালে 'দ চেরি অর্চার্ড' নাটকের নতুন প্রাণপ্রতিষ্ঠা এবং সেই নতুন নাটকের প্রযোজনার স্বকীয় সমস্যা, এই দুই ধরনের সমস্যাই নির্দেশক শ্রীঅজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনে এসেছিল। বাংলা রূপান্তরে পুরুলিয়া-মানভূমের স্থানীয় কথ্যভাষা বা ডায়ালেক্ট গ্রহণ করেও মূল নাটককে তিনি যথাসাধ্য অনুসরণ করেছেন। স্থান কালের চরিত্র প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যেখানে সংলাপ যোগ করেছেন বা সংলাপের বিষয়-পরিবর্তন করেছেন, সেখানেও তাঁর বিচারবুদ্ধি ও কল্পনাশক্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠতে হয়। লালমোহন বলে, "র‍্যাল্‌গাড়ির লেট্ করার বহর দেইখেছিস্? ঘন্টা দুয়েক লেট্ তো নির্ঘাত। আর আমি বা বুড়্‌বকি কইরলম নাই, একদম খাস্তা। তাড়াতাড়ি দৌড়ে আইলম কিনা, উয়াদের সথে ইষ্টিশনে দেখা কইরব। আর শালা পইড়লম কি মার ঘুম...? চিয়ার ত চিয়ারই রাজশইয্যা। খুব্ মাইরি, তুঁই ক্যানে ধাক্কা মারলি নাই আমাকে?" স্থানবৈশিষ্ট্যে এতই স্থানীয় যে ভাষা, মূল নাটকের ইংরেজি অনুবাদের সঙ্গে এর নৈকট্য কিন্তু তার চেয়েও বিস্ময়কর। নাট্যসংলাপ রচনায় এই দক্ষতা শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বারবার প্রমাণ করেছেন। একই দৃশ্যে লালমোহন বলে, "তা মানুষটি বড় ভাল—ব্যাশ সাধাসিধা টাইপের লক। আমার মনে আছে তখন আমি ধর বছর পনারোর—আমার বাপ এই বাড়িতেই চাকর

খাইটথ। ত একদিন বাপের সথে পুরুল্যা গেইছি মালিকের গুলদারির সওদা কইরতে—কি যে বেগরবাই হইল—মাতালের মন বিন্দাবন—আমার মুখে এক ঘুঁষি ঝাইড়লেক নাই—নাক দিয়েঁ দরদরাঁই রক্ত পইড়তে লাগল—এই গিন্নীমার তখন বয়েস কম ছিল, খুব দুবলা-পাতলা দেইখতে—আমাকে হাঁথ ধইরে, আদর কইরে ই ঘরে নিয়ে আইল···” কিংবা পরে: “আপনাদের কথা শুইনলে মন করে বিটি ছেইলাদের পারা হাত পা ছড়াঁইয়ে কাঁইদতে বসি যাইরি! আর আপনি কি? আপনি না ব্যাটাছেইলা। উনি না হয় বিটিছেইলা, যা হক বইলছেন, আপনি কি কইরে বইসে বইসে ঘাড় লাইড়ে লাইড়ে ‘হঁ হঁ ঠিক ঠিক’ বইলছেন, বইলছেন, ছিঃ! ইয়ার পরে ঐ অতবড় একট বিটিকে লিঁয়ে উনি ভাইসে গেলে আপনি দেইখবেন? সে সামথ্য আছে আপনার? কুথায় কুন ভালপালার সম্পর্কের কাকী টাকা দিবেক, সে টাকা আর শোধ দিতে হবেক নাই, সেই টাকায় জমি আর আমবাগান ছাড়াবেন, আপনি সেই আনন্দে বইসে আছেন। সেই সে গল্পে শুইনেছি পতাপসিংয়কে কে যেমন ভামশা না ভীমশা আইসে এককাঁড়ি টাকা দিয়েঁ গেইছিল, আপনি ভাইবছেন অমনি কুন লক আপনার শীচরণে লাখখানেক টাকা লামাই দিয়েঁ যাবেক? অত সস্তা লয়, বুইঝলেন? বাবা-বাছা বইলে একটা পয়সা কারুর ঠিয়ে যাইগে দেখুন দেখি।” উদ্ধৃত দুটি অংশের মধ্যে প্রথমটি অত্যন্ত মূলানুগ, দ্বিতীয়টি মূল থেকে সরে গেছে। অথচ চরিত্রের পক্ষে নাটকের পক্ষে উভয় অংশই স্বাভাবিক ও প্রায় অপরিহার্য। হিমসাগরের কর্তৃকুলের অক্ষমতার বিপরীতে লালমোহনের আত্মপ্রত্যয়ী ঔদ্ধত্য মূলের সংঘাতকে নিষ্ঠার সঙ্গে রক্ষা করেছে।

রূপান্তরকরণে অবশ্য কয়েকটি বিষয়ে প্রশ্ন জাগে। মাদাম মানেভ্স্কায়ার প্যারিস প্রেমোপাখ্যান লাবণ্যপ্রভার জীবনে অস্বাভাবিক ঠেকত; তাই এই অধ্যায়টির উল্লেখ সংগত কারণেই বর্জিত হয়েছে। অথচ সেই বর্জিত অধ্যায়ের রেশ অন্তত দুবার বিসদৃশভাবে এসে পড়েছে। প্রথমাঙ্কের শেষদিকে গিরীন্দ্রমোহন যেটুকু বলে, তাতে কী এমন অসংগতি আছে যে অণিমা অমনভাবে তিরস্কার করতে পারে? দ্বিতীয় অঙ্কে লাবণ্য নিজেই ‘পাপের’ কথা বলে, অথচ তার স্বীকারোক্তিতে এই ‘পাপ’ এমনই নেতিবাচক যে একে পাপ বলতে বাধে। দ্বিতীয়ত, চাকর ঈশ্বর। ইয়াশা স্বয়ং গায়েভ্কেও খোঁটা দিতে ছাড়ে না। “হয় ও থাকবে নয় আমি” বলে গায়েভের

ছেলেমাস্থি অভিমান, কিংবা শুনতে না পাওয়ার ভান করে "কী বলল ?"—গায়েভের এই চরম অমর্যাদা তথা অক্ষমতার প্রমাণ বাদ গেল কেন ? তৃতীয়ত, 'চিরকালীন ছাত্র' তাপস। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় নাটকটিকে যে স্থান কালে স্থাপন করেছেন, সেখানে এ জাতীয় ছাত্রেরা আদর্শের কথা কি একটা স্পষ্টভাবে বলে থাকে ? বরং আদর্শ যতই তার কাছে দামী হোক, এই মিডিঅক্রিটির সাম্রাজ্যে সে যেন তার আদর্শকে কথায় প্রকাশ করতে সংকোচ বোধ করে ; তাছাড়াও 'চেরি অর্চার্ড'-এর কালে যে-আদর্শবাদ অভিনব, এতদিনে তার জৌলুস অনেকটা কেটে গেছে ; এ আদর্শবাদের মোহ কি সত্যিই আজ আর ওভাবে টানে ? এটা কী ভাবে বদলানো যেতে পারে জানি না, বোধহয় যায় না, কিন্তু তবু একালের সঙ্গে অসংগতিটাও তো সত্যি।

'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী' দেখতে গিয়ে প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে, অতীতের যেসব অভিনয়ের কথা পড়েছি, তার থেকে একটি ক্ষেত্রে 'নান্দীকার' বেশ স্পষ্টভাবেই সরে গেছেন। অতীতে প্রায় প্রতিবারই গায়েভের চরিত্রই প্রাধান্য পেয়েছে ; অথচ এখানে লোপাখিন তথা লালমোহনই আরো সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। গায়েভের চরিত্রে যাঁরা অভিনয় করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন স্তানিস্লাভস্কি, স্যর জন গীল্‌গাড, স্যর সেড্রিক হার্ডউইক, এমনে পর্সি, লিঅন কোয়ার্টারমেন। সঙ্গে সঙ্গেই স্বভাবতই মাদাম রানেভস্কায়াও প্রাধান্য পেয়ে এসেছেন—প্রথমে চেহভ-পত্নী ওল্‌গা ক্লিপার থেকে শুরু করে পরে গ্‌ওয়েন্‌ ফ্রাংসিস্‌-ডেভিস্‌ ও শেষে ১৯৬১-র শীতের মরশুমে স্ট্র্যাট্‌ফোর্ডে রয়াল শেক্‌স্‌পীয়র থিয়েটরের প্রযোজনায় যশস্বিনী ডেম পেগি অ্যাশ্‌ক্রফ্‌ট্‌। অথচ ১৯০৩-এর ৩০শে অক্টোবর ইয়াল্টা থেকে চেহভ স্তানিস্লাভস্কিকে লেখেন : "লোপাখিন লিখবার সময়ে আমি আপনার পার্ট হিসেবেই ভেবেছি। যদি কোনো কারণে ভূমিকাটি আপনার ভালো না লাগে, তবে গায়েভের পার্ট নেবেন। লোপাখিন ব্যবসায়ী হতে পারে, কিন্তু সমস্ত দিক থেকেই সে একটি শোভন মানুষ। তার সমস্ত চালচলন হবে শিষ্ট, ভদ্র, শিক্ষিতজনের মতোই ; তার মধ্যে কোথাও কোনো হীনতা, কোনো নীচ চাতুরি থাকবে না। আমার মনে হয়েছিল নাটকের এই কেন্দ্রীয় চরিত্রটি আপনার অভিনয়ে চমৎকার ফুটে উঠবে।...এই ভূমিকায় অভিনেতা নির্বাচনের সময়ে মনে রাখবেন যে, ভারিয়ার মত গম্ভীর ও ধর্মস্বভাবা মেয়ে লোপাখিনকে ভালোবাসে ; সে কখনই কোনো এক অর্থপিশাচকে ভালোবাসতে পারে না।"

চেহভ আবার ২রা নভেম্বর তারিখেই নেমিরোভিচ্-দান্চেংকোকে লেখেন: "গায়েভ্ ও লোপাখিন—এই দুটি ভূমিকার মধ্যেই কন্স্তান্তিন্ সার্গিয়েভিচকে বেছে নিতে দিন। উনি যদি লোপাখিন বেছে নেন, ওঁর যদি ভূমিকাটি পছন্দ হয়, তবে নাটক সফল হয়ে উঠবে। কিন্তু কোনো দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিনেতা যদি অক্ষমভাবে লোপাখিনের ভূমিকা অভিনয় করে, তবে ঐ ভূমিকা ও নাটক দুই-ই ব্যর্থ হয়ে যাবে।" অথচ তবু স্তানিস্লাভ্স্কি গায়েভের ভূমিকাই বেছে নেন। চেহভের নাটকের ক্ষেত্রে মস্কো আর্ট থিয়েটারের প্রযোজনা সাধারণত এমনই প্রামাণ্য বিবেচিত হয় যে বোধহয় সেই কারণেই গায়েভের এই প্রাধান্য এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

'নান্দীকার' চেহভের নিজের আদি ব্যাখ্যাকে ফিরিয়ে এনে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, অন্যদিকে এই নতুন লোপাখিন্কে সম্পূর্ণ প্রত্যয়সিদ্ধ করে তুলেছেন। অবশ্য এক্ষেত্রে শ্রীঅজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিণত অভিনয়-ক্ষমতার অসাধারণ প্রয়োগ সমগ্র প্রযোজনাকেই চরিত্র দিয়েছে। গত পাঁচ বছরে যাঁরা প্রথম শ্রেণীর অভিনয়ে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে (এক 'কাঞ্চনরঙ্গ' নাটকে শ্রীঅরুণ মুখোপাধ্যায় ছাড়া) শ্রীঅজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো শক্তিশালী কোনো অভিনেতার কথা ভাবাই যায় না। প্রথম দিকে এই চরিত্রের স্বভাবজ আড়ষ্টতা সংলাপে ডায়ালেক্টের বৈচিত্র্যহীন টানে ধরা পড়েছে। মঞ্চের একটিমাত্র প্রান্তে নিজেকে সীমিত করে, অঙ্গচালনাকে কয়েকটিমাত্র দেহভঙ্গিতে সংকুচিত করে তিনি এই বিনয়ভীতিজড়িত আড়ষ্টতাকে দৃশ্যমান করেছেন। তারপর ক্রমে ক্রমে লালমোহনের মোহ কেটেছে। সঙ্গে সঙ্গেই ডায়ালেক্টের একঘেঁয়ে টানের ঘোর ভেঙে বার বার বাচন তীব্রতর হয়েছে, বৈচিত্র্য এসেছে। লালমোহন যখন বলে, "কিছু মনে কইরবেন নাই মা, আপনাদের মত এমন ল্যালাক্যাবলা লক আমি জন্মে দেখি নাই। ইয়াকে কী বইলতে হয় বল দেখি। অগুন্তি বার কইরে ঐ এক কথা বলছি আপনাদিগে, যে আর দুমাসও নাই, আপনাদের ঐ সাধের আমবাগান আর এই বসতবাটী নীলাম হইয়ে যাবেক—নীলাম। আর আপনারা যেমন বুইঝেও বুইঝছেন নাই, একি, বলুন তো।"—তখন ডায়ালেক্টের টান ঠিকই থাকে, অথচ কথার দ্রুততর গতিতে গুণগত পরিবর্তন ধরা পড়ে। এই গতিশীলতায় ও দৃষ্টিতে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় এমন এক অনিশ্চিতির ভাব আনেন যে বোঝা যায় যে, লালমোহন এখনও নিজের শক্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত নয়, যা

বলছে প্রয়োজন হলে তা ফিরিয়ে নিতেও সে যেন দ্বিধাবোধ করবে না। নিজের শক্তির চেতনা ও পুরনো হীনমন্যতা তথা আনুগত্যের এই বিরোধ তৃতীয় দৃশ্যের শেষে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ক্ষমতার গুণে এক অসাধারণ নাট্যমুহূর্ত তথা এই নাটকের শীর্ষবিন্দু রচনা করেছে। প্রথমে নিতান্তই ব্যক্তিত্বহীন বৈচিত্র্যহীন ঘটনাবিবৃতি থেকে ক্রমশই আত্মপ্রত্যয়ে উত্তরণ, স্তর থেকে স্তরে, পর্ব থেকে পর্বান্তরে সেই বিবর্তনের নাট্যমূর্তি শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় আশ্চর্য ক্ষমতার সঙ্গে রচনা করেছেন। বাচনে শক্তি এসেছে, সঙ্গে সঙ্গেই কায়িক অভিনয়ও আরো গতিশীল হয়ে উঠে অভিনয়ক্ষেত্রকে এতক্ষণের একটিমাত্র প্রান্ত থেকে প্রসারিত করে প্রায় সমগ্র মঞ্চে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছে। একটি দীর্ঘ ভাষণের ভাববৈচিত্র্যের মধ্যে তিনি কখনও আত্ম-প্রত্যয় ("উনি পাঁচ উইঠলে, আমিও পাচ উঠি। উনি দশ উইঠলে আমি দশ।...উনি হাঁকলেন এক লাক পনারো...আমি হাঁইকলম বিশ—ব্যস্ বিশ রাম...বিশ দুই...বিশ তিন। হইয়ে গেল ছ'কুড়ি হাজারে সব আমার হইয়ে গেল—এখন ই বাড়ি আমার। ঐ আমবাগান, ঐ নদীর ধার তক্‌ৎ জমি...আমার আমার।...আরে বাইসারে, বাইসারে, বাইসারে বাইসা—এই বাড়ি, ঐ আমবাগান, ঐ জমি সব আমার।"—দুই হাতে দিঙ্‌নির্দেশ করে বুকে হাত ঠুকে), কখনও প্রায় ছেলেমানুষের আনন্দ ("আমার চাদ্দিকে যেমন মায়ের অষ্টমীপূজার বাজনা বাইজছে হে, শুন্‌ ছ্যাড়্‌রা ড্যাডাং, ছ্যাড়্‌রা ড্যাডাং, ড্যাং ড্যাং ড্যাং"), কখনও নবলব্ধ ক্ষমতার অমর্যাদার আশঙ্কা ("এই খবদ্দার কেউ হাঁইসবেক নাই বইলে দিচ্ছি..." হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে অথরিটির সুরে), কিংবা পিতৃপুরুষের পূর্বস্মৃতি, ভবিষ্যতের কল্পনায় নিয়ে গেছেন; তারপর সহসা সেই পুরনো আনুগত্যের অদম্য তাড়নায় লাবণ্যপ্রভার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে বিলাপ, "ক্যানে তখন আমার কথা কানে তুইললেন না মা?" তারপরেই আবার "লালমন বাবু...বাবু... নয়াবাবু...বাবুমশাই" বলতে বলতে পুরনো ফুলদানি উল্টে দিয়ে নিক্রমণ, "ভাঙ শালা ভাঙ...নয়া জিনিস হবেক...দাম দিয়েঁ দিব"—অনেকগুলি পৃথক পৃথক মুহূর্তকে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় যুক্ত করে একটি অখণ্ড আত্মনিদর্শনের মুহূর্ত রচনা করেছেন। এতগুলি বিচিত্র ভাব থেকে ভাবান্তরে কায়বাক্যে এই সহজ সঞ্চরণ দর্শক হিসেবে আমাদের কাছে বহুমূল্য অভিজ্ঞতা।

অন্য এক ভারিয়ার উল্লেখে চেহভের ছোট গল্পের অনেক বাকিন

মন্তব্য করে, "আমি লক্ষ করে দেখেছি ইউক্রেনীয় মেয়েরা হয় হাসবে নয় কাঁদবে, মাঝামাঝি কোনো-কিছুতে নেই।" 'চেরি অর্চার্ড'-এর ভারিয়া তথা 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী'-র তুটু প্রায় এই ধারণার উপরই প্রতিষ্ঠিত। আল 'ন্যাচরালিজম'-এ অভ্যস্ত দর্শকের কাছে এহেন একটি চরিত্র সাধারণত্বে হাস্যকর হয়ে উঠবার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু শ্রীমতী মায়া ঘোষ মুখজ অভিনয়ে যে-সংযমে নিজেকে বেঁধেছেন তাতে প্রতিটি ভাবান্তর স্বাভাবিক সাবলীলতায় প্রত্যয়সিদ্ধ হয়ে উঠেছে। শ্রীমতী ঘোষ ন্যাচরালিজম-এর স্বভাবজ 'আণ্ডার-অ্যাকৃটিং'-এ যে-শক্তির প্রমাণ রেখেছেন, তাতেই দ্বিতীয় দৃশ্যে তাপসের দীর্ঘ বক্তৃতার সময়ে লালমোহনের সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময়কে কিংবা পরে লালমোহনের বিবাহপ্রস্তাবের প্রত্যাশাকালে অর্থহীন কথার মধ্যে নিহিত চাঞ্চল্যকে তিনি অতটা অর্থপূর্ণ করে তুলতে পারেন।

লালমোহন ও তুটুর তুলনায় গিরীন্দ্রমোহন ও লাবণ্যপ্রভা বড় নিষ্প্রভ। চরিত্র হিসেবে এঁদের দুর্বলতা প্রথম থেকেই এমন স্পষ্ট যে নাটকের সংঘাত কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলা যায়। সংলাপে আভাস আছে যে, সবকিছু হারিয়েও হার না মানার প্রচণ্ড চেষ্টায় এঁরা যুগপৎ সহানুভূতি ও করুণা আকর্ষণ করেন। অথচ স্থানে স্থানে পুরনো দম্ভের ক্ষীণ প্রকাশ (যেমন লাবণ্যের তাপসকে তিরস্কারে) ছাড়া তার আর কোনো চিহ্ন নেই। অথচ শুরুতে এঁদের অর্থহীন আত্মসন্তুষ্টি রচনা করতে পারলে পরে লালমোহনের নবলব্ধ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে একটা স্পষ্ট বিবাদী সম্পর্ক লক্ষ করা যেত। এঁদের সমগ্র জীবনযাত্রার মৌল অসংগতি লালমোহনের কাছে প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের কাছেও প্রকাশ পেতে পারত। লাবণ্য বলেন: "মনে হচ্ছে বোঁ করে একপাক আনি-মানির মতো ঘুরে যাই," কিন্তু বাচনের দৌর্বল্যে মনে হয় যে, মনে হওয়াটা বোধহয় তাঁর নিজের কাছেও সত্য নয়। আরো একটা কথা মনে হয়। গিরীন্দ্রমোহনের ইংরেজি উচ্চারণটা আরেকটু পরিশীলিত করা যায় না কি? অ্যাক্‌সেন্টগুলো আরেকটু নিখুঁত ও স্বচ্ছন্দ করতে পারলে তাতে হয়তো জমিদারী মেজাজের কাল্‌চারের গর্বটা আরেকটু স্পষ্ট হতে পারে। বিলিতি কালচারের প্রলেপ ঐ অ্যাক্‌সেন্ট বাঁচাতেই সবচেয়ে উদ্যোগী হয়।

তাপসের ব্যর্থতা অবশ্য আরো দুঃখজনক। স্মরণ রাখা দরকার যে, মস্কো আর্ট থিয়েটারে ত্রোফিমভের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন বিশ্রুতকীর্তি

অভিনেতা কাচালভ; পরে অন্তত একবার, ১৯২৪-এ জে. বি. ফ্যাগানের প্রযোজনায়, এই ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন স্যর জন গীলগাড। তাপস যা বলে, তাতে সে বিশ্বাস করে বলেই তার নিজের ধারণা। অথচ চেহভ তার প্রতি নির্মম। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের বিবৃতির পর সিঁড়িতে পদস্খলন, কিংবা নতুন জীবনের উপান্তেই চশমা হারিয়ে ফেলার দুর্গতি, এই ছোট ছোট ইঙ্গিতগুলি দিয়ে চেহভ তাকে এমনভাবে রচনা করেন, যাতে অক্ষমতায় সেও গিরীন্দ্রমোহন-লাবণ্যপ্রভার সগোত্র হয়ে পড়ে। অথচ একটি আদর্শবাদী যুবকের প্রতি মমতাও চেহভের আছে। তাপসের এই দ্বৈত রূপের জটিলতা শ্রীবিভাস চক্রবর্তী আনতে পারেন নি। মনে হয়, কণ্ঠস্বরের নাটকীয় মডিউলেশনে তাপসের বাচনকে যদি আরেকটু 'ডিক্ল্যামেটরি' বা বক্তৃতাধর্মী চরিত্র দেওয়া যেত, তাতে তাপসের থেকে তাপসের ধ্যানধারণার একটা দূরত্ব রচনা করে এই আয়রনি সৃষ্টি করা যেত। আসলে স্বাভাবিকতা ও বক্তৃতাধর্মিতার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রচনা করাই এই চরিত্রের অভিনেতার দুরূহতম দায়িত্ব। শেষ দৃশ্যে অনিমা ও তাপসের 'গুডবাই, ওল্ড লাইফ, গুডবাই' এবং 'ওয়েলকাম নিউ লাইফ, ওয়েলকাম' কথাগুলোয় ঐ সামান্য একটু নাটুকেপনার ছোঁয়াচ না থাকলে ব্যাপারটা যে-কোনো 'মিডিওক্র' নাট্যকারের শেষ দৃশ্যের আশাবাদী উপসংহারের 'ষ্টিরিওটাইপ' হয়ে দাঁড়ায়।

চেহভ ১৯০৩-এর ২রা নভেম্বরের পূর্বোক্ত চিঠিতে নেমিরোভিচ-দানচেংকোকে লেখেন: "আনিয়া যে-কেউ করতে পারে, একেবারে অপরিচিতা কোনো অভিনেত্রীও—শুধু বয়সটা যেন অল্প হয়, আর দেখলেই যেন সেটা ধরা পড়ে। তার কণ্ঠস্বরও যেন অল্পবয়সিনীর মতো উৎসাহদীপ্ত ও স্পষ্ট হয়। ভূমিকাটি মোটেই খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়।" অনিমার ভূমিকায় শ্রীমতী শেলী পালের বিশেষ সুযোগই নেই। তবু প্রথম দৃশ্যে চেহভের নাটকের একটি বিশেষ চেহভীয় গুণ—ইন্‌কন্‌সিক্‌ওয়েনশিয়্যালিটি বা সংলাপের নিঃসম্পর্কতা তথা চরিত্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক সমমর্মিতার অভাব—তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে রচনা করেছেন। এই দৃশ্যাংশে শ্রীমতী পাল (ও শ্রীমতী ঘোষ) উৎসাহ-অনুৎসাহের এই ওঠাপড়ায় আরোহ-অবরোহের এক চমৎকার প্যাটার্ন রচনা করেছেন। এই অংশে উভয়েই বাচনে ও অভিনয়ে যে সংযত প্রয়োগের নৈপুণ্য দেখান, তাতে পরে দ্বিতীয় দৃশ্যে তাপসের সঙ্গে নিভৃত কথোপকথন

কালে ও তৃতীয় দৃশ্যের শেষে লাবণ্যপ্রভাকে সান্ত্বনাদান কালে তাঁর বাচনের আড়ষ্ট রুক্ষতা বিস্ময়ের কারণ হয়, শ্রুতিকটু ঠেকে।

চারটি টাইপ চরিত্রে রাধারমণ তপাদার, তাপসী গুহ, চিন্ময় রায় ও নিমাই ঘোষ উল্লেখ্য অভিনয়ক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছেন। শেষ দৃশ্যের একটি ছোট্ট ভাষণের মধ্যেই শ্রীনিমাই ঘোষ আণ্ডার-অ্যাক্টিঙের ক্ষমতায় বেদনা গোপনের উল্লেখনীয় অভিনয়রূপ রচনা করেছেন। ফ্যালারামের ভূমিকায় বরুণ সেন গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে আরেকটি টাইপ চরিত্রের অপরিবর্তনীয় বার্ধক্য ও অতীতানুগত্যকে অনুসরণ করেন। তাঁর বাচনে বার্ধক্যের স্বরদৌর্বল্য ও নাটকের দাবির আনুপাতিক স্পষ্টতার নিখুঁত সামঞ্জস্য উল্লেখযোগ্য।

মঞ্চসজ্জা সম্পর্কে চেহভের সঙ্গে স্তানিস্লাভস্কির মতপার্থক্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। চেহভ ইয়াল্টা থেকে ১৯০৩-এর ৫ই নভেম্বরের চিঠিতে স্তানিস্লাভস্কিকে লেখেন, "বাড়িটা প্রাচীন, জৌলুস আছে।...আসবাবপত্র পুরনো, কেতামাফিক, ভারি। পতন ও ঋণের দুর্দশার কোনো চিহ্ন পরিবেশে ধরা পড়বে না।" অথচ স্তানিস্লাভস্কি তার আগেই মঞ্চসজ্জা স্থির করে ২রা নভেম্বর চেহভকে লেখেন, "ঘরটা দীর্ঘকাল অব্যবহৃত থেকেছে, তার চারদিকেই একটা শূন্যতার ভাব।" গত বছর লণ্ডনে মে মাসে মস্কো আর্ট থিয়েটারের প্রযোজনায় কিংবা ১৯৬১-তে মিশেল সেঁ৷ দেনিসের পরিচালনায় রয়াল শেক্স্পীয়র থিয়েটারের প্রযোজনায় লম্বা জানলার পর্দায়, দেয়ালের গায়ে ঝালরে, দেয়ালের গায়ে কাঠের কাজে চেহভ-অভিলষিত সাবেকী জৌলুসের চরিত্র ভারি পুরনো আসবাবপত্রের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল। হিমসাগরের কর্তৃকুলের দিন ফুরিয়েছে, অথচ দেমাক কাটেনি, এই অ্যানাক্রনিজম্ বা অসংগতি প্রতিষ্ঠায় নান্দীকারের বিবর্ণ দরিদ্র মঞ্চসজ্জা সহায়ক হয় নি। মঞ্চপরিকল্পনায় উইংস্ বর্জন করে তিন দেয়ালের ঘেরে স্বাভাবিক প্রবেশ-প্রস্থান স্বভাববাদের নীতিকে অনুসরণ করেছে, সেই হেতু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আলোকসম্পাতে জালের ছায়ার তাৎপর্যময়তা কি স্বভাববাদের কোথায়ও জোর না দিয়ে বাস্তবকে অনুসরণ করার নীতিকে কিছুটা ক্ষুণ্ণ করে না?

নান্দীকারের 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী' একটি সমকালীন বাস্তবধর্মী বাংলা নাটক ও চেহভের রচনার স্বাদ একই সঙ্গে এনে দিয়েছে। ১৯১৫-য় মস্কো আর্ট থিয়েটারের পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্তানিস্লাভস্কি

চেহভের রচনায় সংলাপের পিছনে এক 'হিউমান মেলডি'র অস্তিত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। নান্দীকারের প্রযোজনায় সংলাপের শব্দার্থ পেরিয়ে এই হিউমান মেলডি বা মানবজীবনযাত্রার সংগীত সৃষ্টিতে নাট্যমুহূর্তগুলির পারম্পর্য ও অভিনেতাদের 'আন্‌এম্‌ফ্যাটিক্‌' অভিনয় লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে।

অমিতাংশু ভট্টাচার্য

মঞ্জরী আমের মঞ্জরী। আন্তন চেহভের 'দ চেরি অর্চার্ড' অবলম্বনে। রূপান্তর ও নির্দেশনা—অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। মঞ্চ—নিমাই ঘোষ। আলো—স্বরূপ মুখোপাধ্যায়। মুক্ত অঙ্গন, ২০ এপ্রিল, ১৯৬৫। প্রযোজনা—নান্দীকার।

হাঙ্গারীর তিনটি ছবি

কিছুদিন আগে কলকাতায় হাঙ্গেরীয় ছবি দেখে মনে হল পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট দেশগুলি বোধ হয় এতদিনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে ভুলবার চেষ্টা করতে শুরু করেছে। এটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ। কারণ, শুধু ট্যাঙ্ক, কামান, ভেঙে-পড়া শহর, নাৎসী বর্বরতা, ধর্ষণ, খুন আর কিছু কালো ধোঁয়া দিয়ে যে কোনো ছবি হয় না এটা বোঝা খুব শক্ত ব্যাপার নয়। আর বিশ বছর আগে যার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া গেছে সেই হিটলার জার্মানীকে এখনও ছবির বিষয়বস্তু করার মানে একদিক থেকে শুধু হিটলারের শক্তিকে বড় করে তুলে ধরা—বাঁচিয়ে রাখা।

হাঙ্গেরীয় ছবি ছিল তিনটি—The Land of Angels, Swan Song ও The Man with the Golden Touch. শেষের ছবিটি সম্বন্ধে শুধু এইটুকুই বলা যায় যে বিষয় নির্বাচন এবং চিত্রায়ন সব দিক দিয়েই এটি হিন্দী বইয়ের হাঙ্গেরীয় সংস্করণ। বোম্বাই চিত্রের সব কটি উপকরণই এতে আমরা পেয়েছি।

বাকী দুটির মধ্যে Gyorgy Revesz-এর The Land of Angels নিঃসন্দেহে অনেক উচ্চস্তরের কাজ। প্রাক্-যুদ্ধ বুদাপেষ্টের বস্তিবাসীদের নিয়ে তৈরী এই ফিল্ম বাস্তবধর্মী শিল্পের একটি নিখুঁত নিদর্শন। প্রধান চরিত্র এক বুড়ো বাজনাদার। তার বাজনার মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে বস্তিবাসীদের সব ক্লান্তি, গ্লানি আর ধিক্কার। যখন ভাড়া না দেওয়ার অপরাধে এদের এক এক করে ঘর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয় পোড়ো জমিতে তখন বুড়োর অর্গ্যানে বেজে ওঠে এক করুণ সুর—ভাষা পায় হৃতসর্বস্ব শত শত মানুষের অন্তর্নিহিত যন্ত্রণা। আবার ছবির শেষে সেই একই যন্ত্র বেজে ওঠে বিজয়ীর বেপরোয়া ঝঙ্কারে যখন মজুরেরা ফিরে পায় ঘর, মালিকপক্ষ হয় পরাজিত। আর এর সঙ্গে সঙ্গে আছে যুবক মিত্রোভানত্স—তার বড় বড় চোখ ভবিষ্যতের স্বপ্নে উজ্জ্বল। সে ভালোবাসল আরাঙ্কাকে—যাকে সে উদ্ধার করে এক শ্বাসরোধক পরিবেশ থেকে আর এই ভালোবাসার মধ্য দিয়েই সে খুঁজে

পেলো এক নতুন জীবনের স্বাদ। ব্যথা, অত্যাচার আর হতাশামুক্ত এক জীবন।

আঙ্গিকের দিক থেকে ছবিটি নিখুঁত। রিলিফ খুব বেশি না থাকার জন্য পুরো ছবিটিই ধূসর রঙে আবৃত হয়ে এক বিষাদময় আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। এর বিরুদ্ধে আপত্তি করার কিছু থাকতে পারে না। কারণ, সময়টাই ছিল তাই। বরঞ্চ পরিচালকের এটাই কৃতিত্ব যে এরকম আবহাওয়া সত্বেও তিনি একটি কাব্যধর্মী, লিরিক্যাল ছবি তৈরী করতে পেরেছেন—যে-লিরিসিজম্ প্রকাশ পায় বছরের পর বছর নিপীড়িত জনগণের ঐকান্তিক প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে।

Swan Song (পরিচালক Martni Keleti) বইটিতে একটি সুন্দর বিষয় মার খেয়ে গেছে অতি সাধারণ পরিচালনার জন্য। তিন বন্ধু—এক গীটারিস্ট, এক একদা-ট্রাকচালক ও এক ছাত্র—একসঙ্গে বাউণ্ডুলে জীবন যাপন করে। সারাদিন শুধু টো টো করে বেড়ানো আর মাঝে মাঝে যে-কোনো উপায়ে টাকা কামানো ছাড়া এদের আর কোনো কাজ নেই। কিন্তু বেশি দিন এভাবে চলল না। ট্রাকচালক ফিরে গেল তার ট্রাকে আর ছাত্রটি গীটারিস্টকে ছেড়ে চলে গেল এক বান্ধবীর সঙ্গে। কিছুদিনের মধ্যেই তাদের আধখাওয়া আস্তানাটিও গুঁড়িয়ে গেল বুলডোজারের তলায়। জায়গাটা দরকার নতুন যেসব শ্রমিকভবন হবে তার জন্যে।

কমিউনিস্ট দেশের ছবির পক্ষে বিষয়টি খুবই নতুন। তিন বন্ধু যাপন করে এক জীবন যেখানে শৃঙ্খলা না থাকলেও সুখ আছে। যেমন গীটারিস্ট গান গায়, "আমি চাই না কোনো মাইনে কিংবা পেন্সন···।" ওরা থাকতে চায় বাউণ্ডুলে হয়ে কিন্তু বাস্তববাদী সভ্যতায় তা সম্ভব নয়। কাজেই দল ভেঙে যায়। ছবির শেষে যখন বুলডোজার এসে ওদের আস্তানা ভেঙে দিচ্ছে তখন তার চলার ভঙ্গিতে এবং আওয়াজে এক অদ্ভুত প্রতিবাদ প্রকাশ পায়—প্রতিবাদ regimentation-এর বিরুদ্ধে। আর যেসব হালকা ব্যঙ্গোক্তি করা হয়েছে ঈশ্বর ও ধর্মের বিরুদ্ধে, আপাতদৃষ্টিতে কমিউনিস্ট ধারা অনুযায়ী হলেও মনে হয় সেগুলি আরও গভীর অর্থবহ।

কিন্তু বিষয়টি বলিষ্ঠ হলেও মনে হয় পরিচালক Keleti মন দিয়ে বইটি করেন নি। ক্যামেরার মন্দগতি এক এক সময় অস্বস্তিকর লাগে। তিন বন্ধুর প্রাণে যে স্ফূর্তি, এর ফলে তা অনেক সময়েই আবহাওয়ায় খুঁজে পাওয়া

যায় না। Imre Bozari-র সংলাপ রচনায় রসজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। দু-একটি ভাল গানও আছে। কিন্তু সবই কেমন ছাড়া ছাড়া, অবিন্যস্ত—কেমন একটা সমন্বয়ের অভাব। মনে হয় পরিচালক তাঁর idea নিয়েই এত ব্যস্ত ছিলেন যে execution-এর দিকে মন দিতে পারেন নি। অভিনয় মাঝারি ধরনের, এক Antal Pagar-এর ছাড়া। এঁকে নিঃসন্দেহে Chevalier অথবা Boyer-এর শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে।

সুমন্ত সেন

সংস্কৃতি-সংবাদ

একদিন প্রাতে

৮ই মে, পঁচিশে বৈশাখ, সকাল সওয়া ছ'টায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। কোথায় যাই? ভাবলাম জোড়াসাঁকোয় গিয়ে কাজ নেই, মুখ গোমড়া করে বসে থাকতে হবে যেন এগজামিন দিতে এসেছি। তার চেয়ে বরং দেখেই আসি ভণ্ডুল মামার বাড়ি। অর্থাৎ পশ্চিম বাংলার রবীন্দ্র স্মরণী।

সেই ষাট সালে প্রথম শুনেছিলাম রবীন্দ্র স্মরণী গড়ে তোলার কাজ আরম্ভ হয়েছে। তারপর এল রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকীর বৎসর। তারপর আরো এক বছর, আরো এক বছর, এমনি করে ছ' বছর গড়িয়ে গেল। বরাবর একই কথা শুনে এলাম, তৈরি হচ্ছে, হচ্ছে, হচ্ছে, হচ্ছে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে রবীন্দ্র স্মরণী ভবন বহুপূর্বেই গঠিত হয়েছে। হায়দরাবাদে ১৯৬১ সালেই। শুধু তিনি বাঙালি, এই সার্টিফিকেটের জোরেই বেচারী প্রফুল্ল সেনকে মহারাষ্ট্রের রবীন্দ্র স্মরণীর উদ্বোধনে পৌরোহিত্য করে আসতে হলো। কিন্তু তাঁর নিজের রাজ্যে রবীন্দ্র স্মরণী গড়ার কাজ এখনও 'হচ্ছে'!

আর তর সইতে না পেরে এবারে নাট্যসম্মেলনের কর্তৃপক্ষ পশ্চিম বাংলা সরকারের কাছে আর্জি পেশ করলেন, তাঁরা রবীন্দ্র স্মরণী ভবনে কবিগুরুর জন্মদিন পালন করতে চান। কোনো জবাব এল না, এমন কি সরকারী অসম্মতি জানানোর এই চিরাচরিত ফরমুলা অনুসারেও না: "আপনাদের আবেদন সরকারের মনোযোগ লাভ করিতেছে।" যাঁরা নাচ, গান, অভিনয়, গল্প, কবিতা নিয়ে থাকেন তাঁরা বোধ হয় একটু অভিমানী হন। ভিক্ষার ঝুলিতে একমুঠি 'সৌজন্য' নিক্ষিপ্ত হলেই তাঁরা অকারণে খুশি হয়ে ওঠেন। এটুকু 'পলিটিকস' অন্তত সরকার করতে পারতেন, বিশেষ করে রবীন্দ্রলাল সিংহের মতো নামকরা সজ্জন ব্যক্তি। তা তাঁরা করেন নি। তাই বিধান সভায় ও বিধান পরিষদে হতভাগ্য বিরোধী দলগুলির সভ্যদেরই কথাটা তুলতে হলো।

তখন সরকার মুখ খুললেন। না, রবীন্দ্র স্মরণীর গড়ার কাজ এখনও সম্পন্ন হয় নি। এ তো আর সেই প্রথম দিককার আড়াই লাখ টাকার পরিকল্পনা নয়, একেবারে প্রায় আধ কোটি টাকার পরিকল্পনা। সত্য বটে,

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২

নেহরুচরিত : সুনীল সেন

অরসিকেসু : সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

ফসল ওঠার আগে : শচীন বিশ্বাস

রামানন্দ স্মৃতিরেখা : গোপাল হালদার

খাদ্যসংকটের ইতিবৃত্ত : ভবানী সেন

কবিতা, চলচ্চিত্র-প্রসঙ্গ, চিত্র-প্রসঙ্গ, বিবিধ-প্রসঙ্গ,
পুস্তক-পরিচয়, পত্রিকা-প্রসঙ্গ

প্রেক্ষাগৃহে লণ্ডন সীম্ফনি অর্কেস্ট্রার এক প্রদর্শনী এবং ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ার্স-এর একটা ছয়দিনব্যাপী অনুষ্ঠান ঘটে গেছে। প্রেক্ষাগৃহটিকে কি ভেঙে ফেলে আবার নতুন করে গড়া হচ্ছে? না, তা নয়, তবে ওখানে এখন চারুচিত্রের সূক্ষ্ম কারুকার্য চলেছে। ওখানে এখন জনসাধারণকে কিছুতেই ঢুকতে দেওয়া চলতে পারে না। তখন বলা হলো, বেশ, খোলা প্রাঙ্গনেই রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী পালন করার অনুমতি দিন। উত্তর এল, না, তাও চলতে পারে না, সেখানে ইট কাঠ চুণ সুরকি বোঝাই হয়ে রয়েছে। অর্থাৎ সরকারের এক কথা, না, না, না।

জেদ চেপে গেল। রবীন্দ্র স্মরণীর প্রাঙ্গনেই কবিগুরুর জন্মদিন পালিত হবে। সরকারি গড়িমসি আর সহ্য হয় না। কি ভাবেন সরকার? রবীন্দ্র স্মরণী কি তাঁদের একচেটে সম্পত্তি? ব্যথিতচিত্তে রবীন্দ্র সিংহ বললেন, ছি, ছি, আপনারা অবশেষে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে 'পলিটিকস' করতে চাইছেন?

তাই মজা দেখতে গেলাম। হাজার লোক ক্যাথিড্রাল রোডে সমবেত হয়েছে। জায়গাটা একটা বিরাট পুলিশ শিবিরে পরিণত হয়েছে। অসংখ্য পুলিশ-ভ্যান। রবীন্দ্র স্মরণীর প্রাঙ্গনে বেটনধারী পুলিশ ঘুরে বেড়াচ্ছে। লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্র স্মরণীর দিকে এগুতেই পুলিশ বাধা দিল, অমনি সবাই রাস্তাতেই ও তার চারপাশে বসে পড়ল। লরিটাই মঞ্চ। তাতে মাইক ফিট করা ছিল, সরকারের বিনা অনুমতিতে। বাস্তবিক, ভারি লজ্জার কথা! পরে মনে পড়ল। তখন কি আর ওসব ভাববার সময় ছিল। পলিটিক্যাল রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী! দীর্ঘ রাজনৈতিক কর্মসূচী। শেষ করতে দু' ঘন্টার বেশি সময় লেগে গেল। কি কি রাজনৈতিক অপকর্ম করা হলো তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিই। যতটা মনে আছে। ভয় হচ্ছে, অনেক কিছু এবং অনেকের নাম বাদ পড়ে যাবে।

সভাপতি নাট্যকার মন্মথ রায় উদ্বোধন করলেন। সবিতাব্রত দত্ত সরকারের সৌজন্যের অভাব সম্বন্ধে দুঃখপ্রকাশ করলেন। পর পর কি ঘটল তা অবশ্য ভুলে গেছি। তবে গোলমেলে ভাবে কিছু কিছু মনে আছে। অমলা শংকর আবৃত্তি করলেন, 'কে লইবে মোর কার্য, কহে সন্ধ্যারবি', এই চার লাইনের কবিতা। সৌম্যেন ঠাকুর মহর্ষি ভবন ও রবীন্দ্র ভারতী সম্পর্কে সরকারের 'ভালগার' দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে বিলাপ করলেন এবং তারপর আবৃত্তি

করলেন, 'ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা' কবিতাটি। প্রেমেন্দ্র মিত্র আবৃত্তি করলেন, 'তোমার ন্যায়ের দণ্ড', সবিতাব্রত দত্ত 'বিপুলা এ পৃথিবীর', সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় 'রুদ্র, তোমার দারুণ দীপ্তি', নন্দগোপাল সেনগুপ্ত 'আজি হতে শতবর্ষ পরে', নাট্যকার সোমেন নন্দী, 'হায় রে দুরাশা'। কাজী সব্যসাচী ও আবুল কাশেম রহিমুদ্দিন, এঁরাও আবৃত্তি করেছিলেন।

সবচেয়ে রাজনৈতিক ঘটনা যা ঘটল তা হলো কবিগুরুর গান। গান, গান ও গান। সুচিত্রা মিত্র গাইলেন 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয়' এবং 'তবু মনে রেখো', চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় 'তোমায় চেয়ে আছি বসে' ও 'নাই নাই ভয়', সবিতাব্রত দত্ত, 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি', রুমা গুহঠাকুরতার ইউথ কয়ার 'এক ডোরে বাঁধিয়াছি', 'সর্ব খর্বতারে দহে' এবং আরো অনেক গান, রাখাল রক্ষিত, 'করি না আর ভয়', চিত্ত মুখোপাধ্যায়, 'যাবার বেলায় পিছু ডাকে' ইত্যাদি ইত্যাদি।

অনেক বেলায় এলেন সত্যজিৎ রায়। মেপে দু-চার কথা বললেন: "আশা করি পরের বছর আমরা রবীন্দ্র স্মরণী ভবনেই কবিগুরুর জন্মদিন পালন করতে পারব", এই ধরনের কিছু। উৎপল দত্ত ও শোভা সেন উপস্থিত ছিলেন।

বেশ কেটে গেল সকালটা। খুব মজা লাগছিল। যাক, অবশেষে পলিটিকসই করে ফেললাম কবিগুরুর পুণ্য জন্মদিনে রাস্তায় বসে তাঁর গান ও কবিতার আবৃত্তি শুনে। রাস্তায় বসাটাই যে পলিটিকস! কিন্তু যাঁরা রবীন্দ্রজন্মদিনের পালনকে ল অ্যাণ্ড অর্ডারের ব্যাপার করে তুললেন তাঁরা কি আর পলিটিকস করতে পারেন! ও কথা বললে পাপ হবে। তাঁরা সবাই পলিটিকসের ঊর্ধ্বে বিশুদ্ধ সংস্কৃতির এক তুরীয়লোকে বাস করতেন। অত উঁচুতে বাস না করলে কি আর রবীন্দ্র স্মরণীর প্রাঙ্গনে বেটনধারী পুলিশের জমায়েত ঘটিয়ে চক্ষুলজ্জা এড়ানো যেতে পারত! এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে পুলিশের লোকেদের উপর একটু মায়াও হলো। ওঁরাও তো চান রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়ার ও কবিতা আবৃত্তি করার জন্ত রবীন্দ্র স্মরণীর দরজা খুলে দেওয়া হোক। হঠাৎ একটা অদ্ভুত কথা মনে এল। এখানে রবীন্দ্রলাল সিংহকে দেখছি না কেন? তিনিও তো ওই সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে আমাদের দু-চার কথা শোনাতে পারতেন। তাতে কি মন্ত্রীদের মর্যাদা ধুলোয় লুটিয়ে যেত? হবেও বা। মন্ত্রীদের ব্যাপারস্যাপার কিবা বুঝি। তবে রাজার বা মন্ত্রীর খোলস ছেড়ে তার ভিতরকার মানুষটি জেগে উঠুক, এ-শিক্ষা তো রবীন্দ্রনাথ নিজেই দিয়েছিলেন। ভুল করেছিলেন নিশ্চয়ই। এইখানটাতেই রবীন্দ্রনাথ আনমনা হয়ে পলিটিকস করে ফেলেছিলেন। তাই তাঁকেই ওই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হলো ১৩৭২ সনের ২১শে বৈশাখ প্রাতে।

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

গোপাল হালদার

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় : স্মৃতিরেখা

(জন্ম ৩১শে মে, ১৮৬৫)

কী ছিল সেই বৎসরগুলো যখন এই বাঙলা দেশ লাভ করলে রবীন্দ্রনাথের মতো সর্বকালীন প্রতিভাকে, আর তাঁর আগে ও পরে প্রায় একই কালে আপনার কোলে জন্মলাভ করলে জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বিপিনচন্দ্র পাল থেকে স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতো মনস্বীদের ? 'রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ' এই বলে যুগটাকে আমরা নাম দিই, মানুষের মতো মানুষের নাম তাতে কি গণে শেষ করা যায় ? বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমের নামও তো করিনি। যে-কোনো জাতি এমন ভাবগুরু, চিন্তাগুরু ও কর্মগুরুদের দান একসঙ্গে পেলে পৃথিবীর স্বীকৃতিলাভ করে। শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্মশতবার্ষিকে এই বিস্ময়ও তাই মনে জাগে—কী ছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের সেই বৎসরগুলো ! এ কি শুধু দৈবের ঘটনা ? না, কার্যপরম্পরা সূত্রে রচিত এক এমন পরিবেশ যাতে ইতিহাসের অভিপ্রায়কে সফল করতে করতে সার্থক হয়ে উঠেছেন এসব ব্যক্তিপুরুষ আর প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে জাতির অন্তর্নিহিত সত্তা ?

সাধ্য কি বলি এ সব ব্যক্তিপুরুষ শুধু দৈবের সৃষ্টি বা কালের হাতে খেলার পুতুল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় এ বিস্ময়ের একটা উত্তর এই, কবি ও শিল্পী প্রভৃতির শক্তির প্রসঙ্গেই তিনি কথাটা বলেছিলেন, "হইতে পারে যে এক-এক জন মানুষ কেমন করিয়া অসামান্য শক্তিসম্পন্ন হয়, তাহার সমস্ত কারণ কোনোকালেই জানিতে পারিব না। যাহাকে জ্ঞানের অভাবে 'দৈব' বলা হয়, এরূপ কিছু কারণ অজ্ঞাত থাকিয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই

দৈবেরও লীলাক্ষেত্র সাধারণ মানুষদেরই আত্মা।" (প্রবাসী, কার্তিক ১৩২৩)। সাধারণ মানুষকে শুধু সাধারণ (বা তুচ্ছ) মনে করতে নেই আর অসাধারণ মানুষকেও কেবলি অসাধারণ (বা অতি উচ্চ) বলে মানা চলে না। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে তেমনি বাস্তবদৃষ্টিও ছিল, মানব-চরিত্রবোধও ছিল। অন্তত নিজের অসাধারণত্বকে ঢেকে রেখে এমন সাধারণ হিসাবে পরিগণিত হবার চেষ্টা আর কারো বড়ো দেখি নি। বিশেষ রকমে অসাধারণরাই এতটা সাধারণরূপে চলতে জানেন, এটা বিশেষ অসাধারণত্ব। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তি-চরিত্রের এটি প্রধান লক্ষণ।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের যে-ভূমিকাটা আমরা আমাদের দেশের ইতিহাসে জানি তাতে প্রধানত আমরা তাঁকে জানি তাঁর কালের যোগ্যতম এক সম্পাদকরূপে। আরও একটু তলিয়ে দেখলে বুঝি যে মহান্ সম্পাদকেরা ইতিহাসের দ্রষ্টা ও স্রষ্টা। অন্তত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাই ছিলেন। এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিককার বাঙলা দেশ ও ভারতবর্ষের জীবন্ত ইতিহাসের রূপ তিনি ধরে রেখে দিয়ে গিয়েছেন 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিয়্যু'তে। আর প্রায় চার দশক ধরে তিনি সেই জীবন্ত ইতিহাসকে সৃষ্টি করতেও প্রাণপণ যত্ন করেছেন। একটু সাহস করে বলতে পারি—ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক ব্রত ছিল স্বাধীনতালাভ। ১৯৪৫ সালে স্বাধীনতার যে-রূপ দেখছি তাতেও এ কথাটা অস্বীকার করতে পারব না। এই ব্রতকে রামানন্দবাবু প্রায় সিদ্ধির সমীপে পৌছে দিয়ে যান তাঁর কর্মজীবনে। এই সময়েই বিশেষ করে আবার বাঙলা দেশের ব্রত ছিল এই স্বাধীনতার ব্রতকে এক সর্বাঙ্গীণ সৃষ্টির সাধনায় যুক্ত করে স্বাধীন তার সুদৃঢ় পাদপীঠ প্রতিষ্ঠা আর তার সমুজ্জ্বল পরিপ্রেক্ষিত রচনা। এ ব্রত কতটা সফল হয়েছে তা এখন না বলাই ভালো। কিন্তু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর জীবনকালে এই বিশিষ্ট তপস্যাতেও তাঁর আপনার জাতিকে অবহিত করতে কোনো সময়ে বিন্দুমাত্র অবহেলা করেন নি। সেজন্য সন্দেহ ও পরিহাস কখনো কখনো তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে। নিশ্চয়ই ইতিহাসের বিচারে তাঁর এ সব পরিচয়ই প্রধান, সসম্মানে তাঁর এই দান স্মরণীয়। কিন্তু সেখানেই সেই ব্যক্তিপুরুষটির সমস্ত পরিচয় নিঃশেষ হয় না। মানুষ হিসাবে এসব ক্ষেত্রেও তাঁর কাছাকাছি এসে তাঁর যে-পরিচয় সমসাময়িকরা পেতেন, তা সেই প্রধান পরিচয়েরই পরিপূরক। কিন্তু মানবীয় চরিত্রেরও রসে অভিষিক্ত তা; আরও তা প্রাণময়। এ মানুষের সেই রূপটি তাঁর নিকটতম আত্মীয়রাই জানেন

আরও বেশি। তবে আমরা যাঁরা কর্মসূত্রে সময়ে-অসময়ে কিছুটা তাঁর নিকটে এসেছি তাঁরাও তাতে মানবরসের একটা বিশিষ্ট আস্বাদন লাভ না করতাম তা নয়। তাঁর অনেকটাই কিন্তু সেই সাধারণ কথা যাতে অসাধারণত্ব ম্লান হয় না, বরং সম্পূর্ণ হয়।

'শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়'র সঙ্গে আমার বরাবরের পরিচয়। সম্ভবত 'শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের' সঙ্গেও পরিচয় সেরূপ। সাত ছেড়ে আটে যে পৌঁছচ্ছে, তাকে বালকই বলা চলে—'অবোধ' বলা অসংগত হবে না, শিশু বললে কিন্তু অন্যায় হবে। বাড়িতে প্রবাসী আসছে, তার মলাটেই দেখতাম 'শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত'। পাতা খুলতেই প্রথমে চোখে পড়ত "সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।" "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" তারপরই 'গোরা', আর তার লেখক শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শুধু নামের সঙ্গেই কি পরিচয় হয়েছিল ? তা ঠিক নয়। তখনো 'গোরা' পড়ি নি। অখণ্ড মনোযোগে বাবাকে পড়তে দেখতাম মাসের পর মাস। সে অখণ্ড মনোযোগের কারণ বুঝতে পারি আরও চার পাঁচ বৎসর পরে ; তখন প্রথম 'গোরা' পড়ি। ঘরের আলোচনায় 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'-এর সম্পূর্ণ অর্থ বুঝতাম কিনা জানি না। কিন্তু কালটা 'স্বদেশী'র যুগ, আলীপুরের বোমার মামলার পর্বে তা তখন শেষ হচ্ছে। স্থানটা পূর্ব বাঙলা। সেই স্থান-কালের মতো করে 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ' কথাটার অর্থগ্রহণ করা এই বালকের পক্ষেও অসম্ভব হত না। বাড়িতে অবশ্য আমাদের বুদ্ধি বা বিদ্যার সম্বন্ধে বিশেষ আশা কেউ পোষণ করতেন না। কিন্তু আবহাওয়াটা উপেক্ষার নয়, কড়াকড়িও নয়—স্বচ্ছন্দ নীতি-নিয়মের, অনুগ্র স্বাধীনতার। তাই 'প্রবাসী' হতে পেরেছিল অবোধের বন্ধু, তার ঔৎসুক্যের মাঝে-মাঝে স্বীকৃতিও মিলত। বাবার ও দাদার কাছে বসেই প্রথম পড়েছিলাম 'সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ' (প্রবাসী, বৈশাখ ১৩১৬)। বোধহয় আমার পাঠ-শক্তিরও পরীক্ষা হচ্ছিল ছুটির দিনের এক মধ্যাহ্নে। হয়ত বয়স তখন অত কম নয়। কিন্তু ঔৎসুক্য জেগেছিল সেই সংখ্যার আরেকটি জিনিসেও 'বিক্রমপুরের প্রাচীন কীর্তি ও দর্শনীয় স্থান সমূহ।' তার কারণ, বিক্রমপুর আমাদের বাড়ি, 'রাজাবাড়ির মঠকে' স্টিমারে বাড়ি ফেরার পথে আমার মেজ জ্যেঠামশায় বলতেন 'টেম্পল্ অব গুড্ হোপ্'—ও অঞ্চলের নিশানা। তার চেয়েও কিন্তু ঔৎসুক্য জেগেছিল ছবিতে—(নন্দলাল বসুর আঁকা) 'মহাদেবের তাণ্ডব নৃত্য' ও

(শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সিংহের আঁকা) 'যম ও নচিকেতা' দুই রঙীন চিত্র। মাদ্রাজ মিউজিয়ামের সেই নটরাজ মূর্তিও পরে সাক্ষাৎ দেখে নতুন করে মনে করেছি। পুলম্যান গাড়ি প্রভৃতির বিচিত্র কথাও চিত্রের জন্যই তখন থেকে মনে গাঁথা হয়ে আছে ('ভারতবর্ষ ও আমেরিকার রেলগাড়ি'—বৈশাখ, ১৩১৬)। কিন্তু যা পড়ে তখনো আনন্দিত হই স্বভাবতই তা গল্প। আর সে কোন্ গল্প? প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'প্রত্যাবর্তন', পর সংখ্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরও যার উল্লেখ করলেন 'ডাঙায় বাঘ জলে কুমীর' নাম দিয়ে। আজ সেই সংখ্যা 'প্রবাসী' হাতে নিলে অবশ্য কৌতূহলের আরও অনেক জিনিসই পাই—অবনীন্দ্রনাথের লেখা, তাঁর চিত্রের ভাব-ব্যাখ্যা, রবীন্দ্রনাথের 'শব্দতত্ত্বের' আলোচনা, বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের লেখা। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় ঠিক সেই বয়সে শুরু হয়েছিল কিনা মনে নেই। তবে বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের 'প্রতিবাদ' আমার এখনো কিছুটা মুখস্ত—

> পেঁচিয়ে কথা বলে রূঢ় বুঝতে পারি ; নইক মূঢ়
> ঠারেঠোরে 'পৌঢ়' শব্দে বুড়ো বলে চোখ টেপা।
> চাপা হাসি দিবে দাঁতে আঙুল নেড়ে ইসারাতে,
> নেলিয়ে দিয়ে চ্যাংড়া ছেলে দিচ্চ হুকম,—"খুব খেপা।"

(আষাঢ়, ১৩১৬)

সেদিন ছন্দেই টেনেছিল, আর বক্তব্যও সাক্ষাৎ অদ্ভুত। মিসেস প্যাঙ্কহার্স্ট প্রভৃতির চিত্র সহ 'রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভে রমণীর প্রচেষ্টা'র মতো লেখা, যোগেশচন্দ্র রায়ের 'ধূমকেতু', জগদানন্দ রায়ের 'হ্যালির ধূমকেতু', কিংবা আরও অনেক সমসাময়িক গল্প এই বালকমনের এখনো অবিস্মরণীয় পুঁজি। অবশ্য তা জমতে পেরেছে কখনো-সখনো বড়োদের কাছে আমাদের বাঙলা পাঠের না-বলা পরীক্ষার উপলক্ষ্যে, আবার বড়োদেরও ওসব বিষয়ে কথাবার্তা আলোচনার মধ্য দিয়ে। সেদিন 'সংকলন ও সমালোচন' বিভাগের ছোট হরফের অনেক বিষয়ই পড়তাম না, পরে তাও হয়েছিল আশ্চর্য কৌতূহল ও আনন্দের খনি। এখন তো বুঝি সে বিষয়ের অনেক কথা যে 'র' বা 'অ'র লেখা পৃথিবীতে তা মাত্র একজনারই মন থেকে ও কলম থেকে বেরুতে পারে—শিক্ষার নতুন আদর্শ, (যেমন, শ্রাবণ সংখ্যার 'একটি দৃষ্টান্ত'-র) বা সাহিত্যের গভীর বোধ (যেমন, ঐ সংখ্যার 'আধুনিক সাহিত্য' 'অ।' ও 'রচনার অপূর্বতা' 'র'।) সেই সংকলন ও সমালোচনায় বহু বাক্যে আর ভাবের সমগ্রতায় তাঁর মনের

অভ্রান্ত ছাপ। বছর পাঁচ সাত পরেও বাঁধানো 'প্রবাসী' থেকে সে সব পড়েছি। চমৎকৃত হলেও তখনো জানতে পারিনি—কে তিনি। মনে কথাটা ঘুরত।

'স্মৃতির সৌরভ' বা নোস্টাল্‌জিয়া ছাড়িয়ে যাই—না হলে, সেই 'প্রবাসী'র পাতায় দেখা এই ট্রেজার আয়ল্যাণ্ডের কথা আর শেষ হবে না। 'প্রবাসী'তে সব থেকে কম দেখতাম একটি নাম—শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু তার অর্থ বুঝতাম বড়োদের কথায়—সম্পাদকই পত্রিকার মূল শিল্পী। তিনি নেপথ্যবাসী। এক-আধবার দেখা দেন সূত্রধারের মতো। বড়োদের সে সময়কার দু' একদিনের আলোচনা কেমন করে মনে গেঁথে আছে। 'বিবিধ প্রসঙ্গে' দেখি (শ্রাবণ, ১৩১৬) গোখলে একটি বক্তৃতাতে বলেছিলেন স্বাধীনতার ভাবকেও (ব্রিটিশ) সরকার নিষ্ঠুর ভাবে দমন করতে বাধ্য; কারণ, (গোখলে মনে করেন) সে ভাব থেকে বিদ্রোহ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটবেই। 'বিবিধ প্রসঙ্গে' গোখলের এই উক্তি তুলে দিয়ে সম্পাদক প্রথমেই বললেন, "গোখলে মহাশয়ের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম।" তারপর সংযত, মর্যাদাপূর্ণ, যুক্তিপূর্ণ ভাষায় স্বাধীনতার ভাবের সপক্ষে আরও দুই বড়ো বড়ো পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনা। সে যুক্তি অমুগ্রপন্থী আমার পূর্বজদের প্রত্যেকেরই যেন নিজের মন-বুদ্ধি-চেতনার সুস্থ খোরাক। উৎসাহিত সমর্থন, আলোচনা। বুঝলাম 'বিবিধ প্রসঙ্গ' গল্প-উপন্যাসের থেকে তাঁদের কাছে কম মূল্যবান নয়। তারপর,—সে বোধহয় 'টাইটানিক' ডুবির পরে—তাঁদের মুখে জানলাম 'বিবিধ প্রসঙ্গে' আর 'মডার্ণ রিভিয়্যু'র নোটস নাকি মহামতি উইলিয়াম স্টেড্‌-এরই রিভিয়্যু অব রিভিয়্যুজ-এর কথা মনে করিয়ে দেয়—সেই উঁচু আদর্শ, সেই ন্যায়নিষ্ঠা, আর যুক্তিনিবদ্ধ ভাষার সেই স্বচ্ছতা। 'মডার্ণ রিভিয়্যুর' সম্পাদকের সঙ্গে এরূপ পরিচয় হতে অবশ্য তখনো দেরী ছিল—প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যভাগে বা শেষ ভাগেই আমার সেই সৌভাগ্য ঘটে। 'প্রবাসীর' কৃপায় যে-পরিচয়, 'মডার্ণ রিভিয়্যুর' পরিচয়ের ফলে সে পরিচয়ে আরও সম্ভ্রমবোধ বৃদ্ধি পায়।

প্রায় বিশ বৎসর এ রূপেই পূজনীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে মাসের পর মাস আমার পরিচয় চলেছিল। ইতিমধ্যে কলকাতায় পড়তে এসে কদাচিৎ তাঁকে দেখেছি দূর থেকে। তিনি 'দর্শন' দেবার জন্য মোটেই আগ্রহান্বিত নন, আমিও দূর থেকে ছাড়া কারও দর্শনে সংকুচিত। ব্যবধান দুস্তর ছিল। থাকতেও পারত চিরদিন। তথাপি বলতে চাই সেই সাত-আট বৎসর বয়স থেকে আমি শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচিত। এ অত্যুক্তি নয়।

তবে একটু শার্ধার কথা। একলব্যের মতো অনন্যচিত্ত আমরা নই। কিন্তু মাসের পর মাস ছ' খানি পত্রের পাতায় আমরা কেউ কেউ দিনের পর দিন অস্ত্রশিক্ষার মন্ত্রলাভ করেছি। তাতে গুরুর অন্য মূর্তিগঠন নিষ্প্রয়োজন ছিল। 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিয়ু'ই যথেষ্ট। তারপর একদিন সত্যই দর্শন যখন ঘটল, তখনো এ দ্রোণাচার্যকে দক্ষিণা দিতে হয় নি। তিনিই দান করেছেন সস্নেহ দাক্ষিণ্য।

নিকটে এসে গেলাম একদিন—সম্ভবত ১৯২১ সাল। যোগাযোগের প্রধান কারণ বন্ধুবর সজনীকান্ত দাস। দ্বিতীয় কারণ—শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়। কলকাতায় এসেছিলাম বাঙলা ভাষায় গবেষণা করব। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের শিষ্যত্ব লাভ করলাম। নিজের খরচ নিজেই চালাব—লেখার যৎসামান্য দক্ষিণা দিয়ে। ছাত্রজীবনে কয় বৎসর আগেই 'প্রবাসী' থেকে লেখার দক্ষিণা পেয়েছিলাম। সেই আমার লেখা থেকে প্রথম উপার্জন—সম্ভবত জীবনেরও প্রথম উপার্জন। ১৯২১-এ সজনী জোগাড় করে দিলে নিয়মিত একটা চাকরি—এই আমার প্রথম চাকরি। 'প্রবাসী' আপিস থেকে অশোক চট্টোপাধ্যায় তখন 'ওয়েলফেয়ার' চালাচ্ছেন। তাতেই আমার আংশিক কাজ। 'প্রবাসী' কার্যালয় আমার আবাল্যপুষ্ট বহু স্বপ্নের জন্ম-স্থল। 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিয়ু'র নির্মাণ-কৌশলও ছিল কল্পনার ও কৌতূহলের বিশেষ বিষয়। তখনো বুঝতাম প্রতিমা গড়তে খড়কুটো লাগে। এখনকার মতো চাহিদামতো প্রতিমা জোগানোর আর্ট পত্রিকার কুমোরটুলিতে তখনো আয়ত্ত হয় নি। সে কাজে দেনা-পাওনা ছাড়িয়ে কিছু গড়বার খুশীও জুটত। তার উপরে—হয়তো বা সেই খেয়াল-খুশীর সুযোগেই—'শনিবারের চিঠি'র জন্ম। তার আসরটাও অচিরেই 'প্রবাসী' আপিসে জমল। কাজের ফাঁকে ফাঁকে অকাজের আশাতীত অবকাশ থাকত, আর কাজের শেষে বিরামের অমৃতযোগ; অর্থাৎ আড্ডা। কখনো বা অশোক চাটুজ্জের উৎসাহে রাগপ্রধান সংগীতের আসর জমত। চা-এর সঙ্গে চীনেবাদাম হতো চাট্, মাঝে-মাঝে ন্যাশনাল হোটেল থেকে আসত ফাউল কাটলেট। নেশা না লাগাই তাই অসম্ভব। 'প্রবাসী' ও 'শনিবারের চিঠি'তে মিলে যে-পরিবেশটা সৃষ্টি হল তাতে আমার কাছে 'ওয়েলফেয়ারের' ঠিকে কাজ প্রাত্যহিক হয়ে উঠল—গবেষণার জন্য লাইব্রেরিতে পাঠের সময়টা কাটা যে পড়ল না তাই আশ্চর্য। সকলের সঙ্গে

আমিও জমে গেলাম। এবং কখন যে 'ওয়েলফেয়ারে'র কাজ করতে করতে পুরো সময়ের কর্মী হয়ে 'প্রবাসী' 'মডার্ণ রিভিয়্যু'রও কিছুটা করে কাজ করতে আরম্ভ করলাম তা আর মনেও পড়ে না। তারই মধ্যে সকলের সঙ্গেই পরিচয় হয়—ওখানকার সকল কর্মীর সঙ্গে, অনেক লেখকের সঙ্গে, আর স্বয়ং আপিসের 'বড়বাবু'র সঙ্গেও।

বেলা ১১টা-১২টায় সময়ে রামানন্দবাবু আপিসে আসতেন—শুভ্রকেশ, শুভ্রশ্মশ্রু, শুভ্র বেশবাস, গৌরবর্ণ সৌম্য মূর্তি অনপরিচিত সেই সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। ধীরপদে প্রাঙ্গণ থেকে এক গাদা লেখা হাতে নিয়ে নিচের ঘরে প্রথম যেতেন। বিষয়কর্ম তখন অশোকবাবুই দেখতেন, বহুগুণে তিনি সুকুশলী। 'প্রবাসী'র লেখা-নির্বাচন কিছুটা শ্রীযুক্তা শান্তা দেবী করতেন, কিছুটা সম্পাদক নিজে। কিন্তু 'মডার্ণ রিভিয়্যু'র প্রায় সমস্ত কাজই করতেন সম্পাদক স্বয়ং। নিচের ঘরের আপিসে বিষয়কর্ম বিষয়ে তাঁর কিছু উপদেশ দেবার থাকলে দিতেন, দেখতেন, শুনতেন। কিন্তু যতদূব জানি অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ কবতেন না। নিচে থেকেই প্রেসে অনেক সময়ে নিজের লেখা 'বিবিধ প্রসঙ্গ' বা 'নোটস্' ছাপতে পাঠিয়ে দিতেন। তারপর দেশী-বিদেশী সাময়িকপত্রের তাড়া হাতে নিয়ে আসতেন উপরে—শান্ত স্থির পদে এসে দাঁড়াতেন তাঁর সম্পাদকীয় সহকারীদের ঘরে। কাগজগুলো তাঁদের দিতেন। সে-সব কাগজ থেকে তাঁদের কারও তৈরী করবার দায়িত্ব ইংরেজি বাঙলা 'গ্লিনিংস্' 'পঞ্চশস্য' প্রভৃতির অন্তর্ভুক্ত লেখা। কিছু কিছু তিনি পড়ে আগেই দাগ দিয়েছেন ; সহকারীরাই বেশিটা নির্বাচন করবেন। লেখার কাজ তাতে সামান্য —যেমন, 'ইণ্ডিয়ান উম্যানহুড'-এ দরকার হোত। কাজটা আসলে লেখার নয়, কাঁচির ও আটার ব্যবহার। তার সঙ্গে থাকত ছবি—আসলে ছবিই কথা বলত—লেখা তার সূত্র ধরিয়ে দিত। 'ইণ্ডিয়ান্ পীরিয়ডিক্যাল' ও 'ফরেন পীরিয়ডিক্যাল' অনেকটা তাতেই সম্পন্ন হয়ে যেতে পারত—তার প্রধান উৎস বেশির ভাগই ছিল ইংরেজি। 'দি লিটরারি ডিজেষ্ট', 'দি পপুলার সায়েন্স্ মান্থলি', 'পপুলার মেকানিক্স্', 'কারেন্ট্ হিষ্ট্রি', 'দি লিভিং এজ্' (একখানা আশ্চর্য সংকলন পত্র 'দি লিভিং এজ্') 'দি নিউ রিপাবলিক' 'দি নেশন' জাপানের 'দি ইয়ং ঈষ্ট', 'দি জাপান ম্যাগাজিন্', জেনেভার 'ইণ্টারন্যাশনাল লেবর রিভিয়্যু', প্রভৃতি। এ সব কাগজ থেকেই প্রবাসীর 'পঞ্চশস্য'ও তৈরী হত। আর বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য ইংরেজি দু-একটি প্রবন্ধ কদাচিৎ অনুদিতও হত। কিন্তু 'প্রবাসী'র

'কষ্টিপাথর' বাঙলা সাময়িকপত্রের বাঙলা রচনারই নির্বাচিত উদ্ধৃতি, তাতে বৈচিত্র্য কম কিন্তু সাহিত্যগুণে তা বিশিষ্ট বেশি। যাই হোক, এ কাজগুলি করার জন্য সহকারীদের বেগ পেতে হত একটা কারণে। সম্পাদক সব নির্বাচিত করতেন না। যাঁর উপরে দায়িত্ব দিয়েছেন তাঁকেই সংকলনের অধিকারও দিতেন। সে জন্যই প্রয়োজন হত পড়াশুনায়, বুদ্ধি-বিবেচনায়, আর কতকাংশে রুচির। কারও রুচি বৈজ্ঞানিক টুকিটাকির দিকে, বা আজব কারুবস্তুর দিকে। কারও বা চারুকলা ও নতুন তথ্যের দিকে। দেখতাম সম্পাদক বিজ্ঞানের কল্যাণকর দানের কথা বোঝাতে বেশি আগ্রহী। তিনি বিজ্ঞানে বিশ্বাসী। যোগ্যতা থাকলে আর ইচ্ছা থাকলে এই কাজের সূত্রে সহকারীর চোখ খুলে যাওয়া অনিবার্য, মনও সরস না হয়ে পারে না। কাজটাতে রস যদি বা না থাকত, অবহেলা করবার মতো কারণ থাকত না। বিরক্ত হবারও হেতু জুটত না। কারণ, আমি আমার কবছরের অভিজ্ঞতায় দেখেছি—রামানন্দবাবু কখনো কারও সম্বন্ধে বিরক্তি প্রকাশ করতেন না। সহকারীদের কখনো কারও জবাবদিহি করবার প্রয়োজন হয় নি, ডাকও পড়ে নি। সম্পাদক ধীর ভাবে এসে নিজে দাঁড়াবেন সহকারীদের টেবলের সামনে। শান্ত কণ্ঠে হয়তো বলবেন, 'এ কাগজগুলো আপনারা নিন, দেখবেন।' (সকলেই তাঁর কাছে 'আপনি'।) অস্বচ্ছ কণ্ঠে হয়তো জিজ্ঞাসা করবেন—কোন লেখা কতদূর ছাপা হয়েছে। অথবা তাঁর দেখবার মতো প্রুফ আছে কিনা। প্রুফ দেখলে তাঁর কখনো বিরক্তি নেই। লেখায়ও না। কিংবা জানাবেন কবে পর্যন্ত 'বিবিধ প্রসঙ্গ' বা 'নোটস্' তিনি দেবেন বা কবে তা শেষ করবেন। এর বেশি কথা সেই স্বল্পভাষী মানুষ বলবেন না। খানিকটা দাঁড়িয়ে থেকে, কথা বলে, আবার তেমনি ধীরে নিচে নেমে যেতেন।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সহকারীরা বরাবরই তাঁর কাজ করতে স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন। কারণ, স্বাভাবিক ভাবেই সম্পাদক জানতেন—প্রত্যেককে মানুষ হিসাবে মর্যাদা দেওয়াই হচ্ছে সুস্থ স্বাভাবিক মানবতা। বয়ঃকনিষ্ঠ সহকারীরাও তাঁর কাছে সে অকুণ্ঠ মর্যাদা সর্বদা পেয়েছে। দ্বিতীয়ত, পরিচালক হিসাবেও হয়তো তিনি একটা কথা জানতেন—কাজের ভার দেবার আগে বিবেচনা করা চলে কেউ সে ভারের উপযুক্ত কিনা। একবার ভার দিলে কোনো কারণেই তার উপরে কর্তৃত্ব করা চলে না। প্রথমত তা অশোভন, আর তার চেয়েও বড় কথা—কাজের পক্ষে ক্ষতিকর। তৃতীয়

একটা ধারণাও তাঁর ছিল—দায়িত্ব মানুষকে যোগ্য করে তোলে। যোগ্যতা প্রায় প্রত্যেকেরই মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে, তার স্ফুরণের জন্ত অনুকূল অবকাশ পেলেই হয়। অন্তত মানুষকে তাড়না দিলে তার থেকে ভালো কাজ পাওয়া অসম্ভব।

কর্মচারীদের প্রতি অকৃত্রিম সহৃদয়তা ও আর সুস্থচিত্ত বুদ্ধিমান মানুষের মতো এই সুস্থ শান্ত ব্যবহার—আমার মনে হয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বৈষয়িক সাফল্যের দুটি অন্যতম প্রধান কারণ। আরও কারণ নিশ্চয়ই ছিল তাঁর কর্মনিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি। তখন সে সকল গুণের বিশেষ পরিচয়ের অবকাশ ছিল না। কারণ, কার্যভার দিয়েছেন ছেলেদের হাতে, আর তার যখন দিয়েছেন তখন তাদেরও উপরে তিনি কথা বলবেন না। তবে পরিশ্রম, কর্তব্যনিষ্ঠা স্বভাবগত, তখনো অভ্যস্ত।

নিজেই তিনি কর্মচারীদের কাছে কর্তব্যনিষ্ঠার ও পরিশ্রমের জীবন্ত দৃষ্টান্ত। যেদিন যখন যে-লেখা তাঁর তৈরী করবার কথা তাতে বিন্দুমাত্র নড়-চড় হবে না। নিজেই লেখা নিয়ে উপস্থিত হবেন। না হয় বাড়ি থেকে তা ঠিক সময়ে পাঠিয়ে দেবেন। কী পদ্ধতি অনুসরণ করে তিনি লিখতেন তা জানবার সুযোগ সাক্ষাৎভাবে আমার বেশি হয় নি, বাড়িতে বসেই তিনি বেশি লিখতেন বলে। কিন্তু বুঝেছি অদ্ভুত তাঁর ভাবনা ও যুক্তির শৃঙ্খলা। 'বিবিধ প্রসঙ্গের' ও 'নোট্‌স্‌'-এর পাণ্ডুলিপি যখন আসত তাতে কোনো দিন কোনোখানে একটি আঁচড়ও দেখি নি। সব যেন পূর্ব লিখিত কোনো এক লেখার দ্বিতীয় বা তৃতীয় কপি—অথচ তা নয়, তা একবারেই লেখা। যত বস্তুনিষ্ঠ, তথ্যনিষ্ঠ লেখার উপকরণ একবারেই সব সংগৃহীত। যুক্তির ও ভাবনার অমন আরোহ বা অবরোহ ক্রম-নির্মাণ একবারেই অবাধে সাধিত। শুধু মনের শৃঙ্খলাই না, তাঁর লেখার ছাঁদেও সেই সুস্পষ্টতারও ছাপ দেখা যেত।—বড় বড় অক্ষর। স্থির বহমান পংক্তি। ছাপাখানার পক্ষে এমন আদর্শ কপি আর হয় না। সমস্ত পদ্ধতিতে লেখকের পরিচ্ছন্ন কর্মের ও সুশৃঙ্খল মনের সুস্পষ্ট প্রমাণ।

রামানন্দবাবু কি মনে করতেন জানি না, কিন্তু আমার তো বিশ্বাস সব শক্তি নিয়ে সবাই জন্মায় না। শক্তি কারও কারও জন্মগত না হোক, স্বভাবগত। অন্তত সকলের তা কর্মগত হয়ে উঠতে পারে। তাই মহৎ জর্ণ্যালিষ্টের যে সব গুণ তা শুধু ঘষে মেজে আয়ত্ত হয় না। ঘষা মাজা নিশ্চয়ই চাই—

কর্মনিষ্ঠা চাই, কিন্তু মনের বিশেষ ধর্ম ও বিশেষ গঠনও থাকা চাই। আমরাও তো তাঁকে কিছুটা দেখেছি। আরও বেশি দেখেছেন তাঁর নিকট আত্মীয়রা। কিন্তু অন্তের কথা জানি না—অমন শৃঙ্খলাবোধ, অমন কর্তব্যনিষ্ঠা, অমন লেখার ও কাজের স্থির পদ্ধতি,—চোখের সম্মুখে দেখেও তো নিজেকে শত বাজে কাজে ও কথায় ছড়িয়ে দিয়ে, ঠেকে-ঠেকে, ভেঙে-চুরে—আমরা গুঁড়িয়ে গেলাম কেন? দেখেও কেউ কেউ শেখে না।

অনেকদিকেই চোখ খুলে দেবার আয়োজন ছিল তখনকার 'প্রবাসী' আপিসের অভ্যন্তরে। আর তা মূলত তার প্রতিষ্ঠাতারই আয়োজন: শুধু সম্পাদক বলে তাঁকে তাই গণ্য করা অসম্ভব। সম্পাদনার সূত্রেই তিনি 'প্রবাসী' 'মডার্ণ রিভিয়্যু'কে আকর্ষক করেছিলেন চিত্র-সম্ভারে। তিনি যেন ছবি দিয়েই পৃথিবীর সঙ্গে সকলের পরিচয় করাতে চাইতেন। কিন্তু তার জন্তও তো রঙীন চিত্রে পত্রিকা সাজানো দরকার ছিল না। আর সাজালেও, তাঁর পত্রিকা দুটিকে ভারতীয় চিত্রকলার এমন সজীব চিত্রশালা করে তোলাও অনিবার্য ছিল না। ছবি শুধু বুদ্ধির বাহন নয়। তিনি জানতেন, তা বোধেরও উদ্বোধক। সেদিকে ছিল তাঁর রুচির তাড়না, সৌন্দর্যবোধের প্রেরণা, দেশের কালচরের প্রতি শ্রদ্ধা ও দায়িত্ববোধ। তাতে করে তিনি দেশবাসীরও চোখ খুলে দিয়েছিলেন। তিনিই এদিকে প্রথম অগ্রসর হন। 'প্রবাসী' 'মডার্ণ রিভিয়্যু'র সেই চিত্রাবলী আমাদের অনেকেরই অন্তত সৌন্দর্যচর্চার প্রথম উৎস, এবং প্রধান অবলম্বন ছিল। আমি তো সে সব রঙীন ছবি কেটে-কেটে বাঁধিয়ে একটা নিজের মত মতো এলবামের বই তৈরী নিয়েছিলাম—নিজের মতো করে। জিলের কোঠায় যখন বৎসরের পর বৎসর জেলে কাটে, তখন সেই ছবির বাঁধানো বই ছিল আমার নিত্য সঙ্গী—রূপলেখা পড়তে পড়তে ক্লান্ত হতাম। বন্দীশালায় একই গাছপাতা দেখে দেখে মন চোখ বুজে থাকতে চাইত। তখন সেই ছবিগুলো সামনে নিয়ে বসে বসে আবার ফিরে সংগ্রহ করতাম দৃষ্টির স্ফূর্তি, মনের মুক্তি। যেমন, অজন্তার নানা চিত্র, কাংড়ার সেই 'নববধূ', সেই মোলরামের 'উৎকণ্ঠিতা', 'কালীয়দমন', 'হর-পার্বতী' প্রভৃতি, পারসিক-মোগল পদ্ধতির 'সরোবর তীরে সারস' সূক্ষ্ম বর্ণসুষমা, আর একালের শিক্ষাগুরু অবনীন্দ্র, নন্দলাল, প্রমুখের চিত্রের প্রতিলিপি স্মৃতিতে এখনো সঞ্চিত। 'প্রবাসী'র কৃপায় সে সব চিত্র চোখে দেখতে না পেলে

ইংরেজ জেলখানাটা আরও অনেক বেশি প্রাণঘাতী হয়ে উঠত। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ই কি জানতেন—বন্দী মানুষের কতখানি বন্ধুর কাজ করেছেন তিনি? চিত্তকে দিয়েছেন প্রশান্ত স্থিরতা।

স্বল্পভাষী, সকল রকম আত্মপ্রসঙ্গে বিমুখ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যে কতখানি স্নেহসরস মানুষ তার পরিচয় নিকট আত্মীয় পরিজন ছাড়া অন্যের বিশেষ জানবার কথা নয়। যে মানুষ অমন স্থির গতি, স্থির বুদ্ধি, জীবনের প্রারম্ভ থেকেই সেবাকে করেছেন জীবনের ব্রত—আর জীবন যাপন করেছেন যেন কর্তব্যবোধে উৎসর্গিত চিত্ত—as in the Task Master's eye—আমরা দেখতাম দু'এক সময়ে তিনিও এসে কাজের অবসরে আমাদের সঙ্গে সহজভাবে গল্প করতে চান। তাঁর সামনে সহজ হওয়া আমাদের পক্ষে কি সহজ? বুঝে তিনি ঘুর-ঘুর করেন। নিষ্প্রয়োজনীয় দু-একটি কথা বলেন, দু-একটা নিষ্প্রয়োজনের কথা আমাদের মুখেও শুনতে চান—চান একটু আমাদের নিকট হতে, আমাদের নিকট করতে। শুভ্রকেশ, শুভ্রশ্মশ্রু, শুভ্র খদ্দর পরিধানে সেই চির শুভ্রতার সাধক—হায়! তাঁর কাছে স্বচ্ছন্দ বোধ করব কি করে? মুখ খোলা, মন খোলা তাঁর সম্মুখে কি সহজে সম্ভব?

কিন্তু সহজই ছিল, সে অভিজ্ঞতাও আমার হয়—আরও বছর নয়-দশ পরে। তার আগে, সেদিনে কখনো তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন আমাকে—'ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈর কোনো বাঙলা জীবনী আছে কি?'—তাঁর এক পৌত্রীকে তিনি তা পড়তে দিতে চান। কোন্ এক নতুন পাড়ার খবর যেন এই ছোট্ট কথাটির সুরে আমার কানে বাজল। তা মনে রয়ে গিয়েছে এখনো। সে পৌত্রীটিরই কাজ কিনা জানি না—একবার তাঁর খদ্দরের পাঞ্জাবীতে বড়ো কাঁচা সেলাইর ও রিফুর কাজ দেখিয়ে আমাকে ও নীরদবাবুকে সহাস্যে বললেন 'এটি তাঁর (পৌত্রীর) কীর্তি। তিনি এখন সেলাই শিখেছেন তো। তাই আমার জামা-কাপড় না ছিঁড়লেই চলে না।'—আমি একদিন সাময়িক-ভাবে অসুস্থ হয়ে বাড়ি চলে যাই। পরদিন আপিসে তিনি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন, "গোপালবাবু কেমন আছেন?" আমি আপিসেই ছিলাম—গিয়ে বললাম সম্পূর্ণ সুস্থ আছি। আমারই মনে ছিল না অসুস্থতার কথা।—আমার পিতার মৃত্যুর পরেও নিজে থেকেই তিনি টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আমাকে—আমার অবশ্য প্রাপ্য ছিল। কিন্তু তাঁর পক্ষে ছিল তা সহানুভূতি সহৃদয়তা।

শুধু স্নেহ নয়—মার্জনাও লাভ করেছি নিজেরও অজ্ঞাতে। আমি তখন 'প্রবাসীতে' কাজ করি না—বোধ হয় ১৯৩১ সাল। কংগ্রেসের লবণ সত্যাগ্রহ চলছে, বিপ্লবীদের বোমা-পিস্তলে ত্রাস ও চমক লাগাচ্ছে। দেশ তখন জ্বলছে, আমারও মাথাটা যে ঠাণ্ডা নয়, সে কথা বোধ হয় রামানন্দবাবুর কানেও পৌঁছেছিল। কিন্তু প্রবাসী আপিসে তখনো আমার নিত্য গতায়াত। আড্ডার নেশা দুর্মর। নানা কর্মের মধ্যে চট্টগ্রামের বিদ্রোহী শহীদদের একখানা ছবির অ্যালবাম প্রকাশিত হয়। তাতে আমারও কিছু হাত ছিল সত্য। কিন্তু 'প্রবাসী প্রেসে' কখনো আমি বে-আইনী কিছুই ছাপি নি, বে-আইনী কাজ করি নি। প্রতিষ্ঠাতা ও কর্তৃপক্ষের প্রতি তা অবিশ্বাসের কাজ হত, এ সুবুদ্ধি আমার ছিল। অথচ যতদূর বুঝলাম পুলিশের সন্দেহ সেই ছবির আলবাম ওখানেই ছাপা হয়েছে। আর তার ফলে একদিন বহু ঘণ্টা ধরে তারা প্রবাসী প্রেস ও কার্যালয় উৎকটভাবে খানাতল্লাসী করলে। সে নাকি এক বিষম কাণ্ড। 'বিবিধ প্রসঙ্গে' রামানন্দবাবু তা উল্লেখ করলেন। কিন্তু আমার জন্য সে আপিসের দ্বার তখনো তেমনি অবারিত রইল বরাবর। আমাকেই তাঁরা করাচী কংগ্রেসের অধিবেশনের প্রত্যক্ষ বিচার-আলোচনা লিখে পাঠাতে বললেন। আর আমিও তা লিখে পাঠালাম, ছাপাও হল,—দক্ষিণা পেয়েছিলাম একটু বেশি হারেই। পরে আরেকবার—ত্রিপুরী কংগ্রেসের সম্বন্ধেও আমাকে তিনি সেরূপ একটি নিবন্ধ লেখার ভার দিয়েছিলেন। লিখেছিলাম। আর তখন তাঁর সঙ্গে কথাও হয়েছিল। শেঠ গোবিন্দদাস সেখানে 'মুসোলিনীর মতো নেতা' বলে গান্ধীজীর প্রশস্তি গান করেন। আর গোবিন্দবল্লভ পন্থ বার দশ একই যুক্তি উত্থাপন করেন শান্ত চাতুর্যে, 'গান্ধীজী'র ওপর 'বিস্‌ওয়াস্' রাখো,—গান্ধীজীও তখন রাজকোটে অনশনে। আর রাজাগোপালাচারী সভাপতি সুভাষ বসুকে ত্যাগ করার জন্য কলাও করে রচনা করলেন নীতিগল্প—সুভাষ বোস্ ফুটো নৌকো। কালের স্রোতে এ সব হারিয়ে গিয়েছে। যারা গান্ধীজীর নৌকোয় নদী পার হয়েছেন, রাজাগোপালাচারীর মতো 'ফুটো নৌকো' বলে গান্ধীজীকে ত্যাগ করতে তাঁদেরও দেরী হয় নি। তবে সব কথাই লোকে ভুলে যায়, আর যাওয়াই হয়তো ভালো। কিন্তু রামানন্দবাবুর সেদিনের মনের ব্যথিত রূপ দেখতে পেয়েছিলাম—তাঁর লেখায়ও তা ব্যক্ত হয়েছে। তার থেকে বেশিও বুঝেছিলাম—সুভাষবাবুর প্রতি অবিচারে তিনি

দুঃখিত। অথচ, সুভাষবাবুর তিনি বরাবর সমর্থকও ছিলেন না। বেশি সময়েই তাঁর সমালোচনা করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু ভুল হোক্, ত্রুটি থাক, রামানন্দ বুঝতেন—সুভাষবাবু নির্ভীক দেশভক্ত। তাঁর প্রতি রামানন্দবাবুর তাই অকৃত্রিম স্নেহও ছিল। ভ্রান্তবুদ্ধি অন্ত দেশকর্মীরাও ঐরূপ তাঁর মনের স্নেহ থেকে বঞ্চিত হত না—যদিও তাঁদের কর্মে ও পদ্ধতিতে ছিল তাঁর আন্তরিক আপত্তি। এ কথার আমি অনেক প্রমাণ পেয়েছি ত্রিপুরীর আগেও, ত্রিপুরীর পরেও।

জেল থেকে বাড়ি এসেছিলাম ১৯৩৭-এর বোধ হয় ৯ই সেপ্টেম্বর। স্বগৃহে অন্তরায়িত। কারও সঙ্গে দেখাশুনা নিষেধ। পরদিনই 'প্রবাসী' আপিসের লোক এসে হাজির—বড়বাবু দেখা করতে বলেছেন—যদি সুস্থ থাকি। অসুস্থ থাকলেও যেতাম এ কথার পরে। মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল। এমন করে কেউ ডাকেন কি? কিন্তু নিষেধাজ্ঞার কথা জানালাম, যেদিনই মুক্তি পাব, আমি গিয়ে দেখা করব তাঁর সঙ্গে। পাঁচ মাস পরে মুক্তি পেলাম। আর পরদিনই গিয়ে আপিসে তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম। স্বল্পভাষী সেই মানুষের মুখে আবেগ বাহুল্য নেই। কিন্তু কুশল প্রশ্নাদির মধ্যে স্নেহের স্পর্শ অনুভব করা যায়। এখন কী করব? নিজে থেকেই তারপর বললেন, আমার আপত্তি না থাকলে সে আপিসের যতটা সম্ভব উপার্জনের সুযোগ আমাকে তিনি দিতে চান। পরদিন যেন কেদারবাবুর সঙ্গে দেখা করি—তিনিই তখন আপিস দেখেন শোনেন। বহু গুণান্বিত মানুষ কেদার চট্টোপাধ্যায় বরাবর আমার প্রতি স্নেহশীল। (এ লেখা মুদ্রণকালে গত ১৬ই জুন তিনি গত হলেন)।

'প্রবাসী'র লেখা থেকেই যেমন আমার প্রথম দক্ষিণালাভ হয়েছিল, 'প্রবাসী' থেকেই আমার বন্দিদশার পরেও দাক্ষিণ্যলাভ প্রথম হয়। আর যে-কাজে আমার রুচি ঠিক তেমন বিষয়েই আমার উপর লেখবার ভার পড়ল—মাসে মাসে প্রবাসীতে 'বহির্জগৎ' ও মডার্ণ রিভিয়্যুতে 'ওয়ার্লড এব্রড্'—লেখা চাই। বিষয়টাতে আমারও ঝোঁক তখন। জেলখানায় দেশী কাগজপত্র প্রায়ই নিষিদ্ধ ছিল—প্রবাসী মর্ডার্ন রিভিয়ু তো নিশ্চয়ই। তত কড়াকড়ি ছিল না বিদেশী কাগজ সম্পর্কে—'কারেন্ট হিস্টরি' 'লিভিং এজ' থেকে সাপ্তাহিক 'ম্যাঞ্চেষ্টর গার্ডিয়ান', লিটারারি সাপ্লিমেন্টপ্রভৃতি কাগজগুলো

গোগ্রাসে গিলতে পেয়েছি। প্রবৃত্তি একরকম ছিল। এখন পেলাম আরও পড়ার ও লেখার আমন্ত্রণ। তখন যুদ্ধ আসছে। আমার ধারণা—স্বার্থেরই দ্বন্দ্ব যুদ্ধ। অপঘাতও তাই অনিবার্য। তবে দ্বন্দ্বটা এবার ফ্যাসিজম্-এর সঙ্গে সোশ্যালিজম্এরও দ্বন্দ্বে পরিণত না হয়ে যাবে না। তার মধ্য দিয়ে শোষিত শ্রেণীর ও শোষিত জাতির মুক্তিটা আয়ত্ত না করলেই নয়। কমিউনিজম্ মানি বা না মানি, চাই তো শোষিতের মুক্তি। এই দৃষ্টিতেই লাগলাম তথ্য বিশ্লেষণে। আমার এই বুদ্ধি, এই দৃষ্টি, এই মূল রাজনৈতিক প্রবণতা—কিছুই অজ্ঞাত ছিল না কর্তৃপক্ষের। কিন্তু তা তাঁরা উদার চিত্তে প্রশ্রয় করেছেন মাসের পর মাস। সব সময় সুবুদ্ধির বা স্থির দৃষ্টির পরিচয় ছিল না সে সব লেখায়। কিন্তু মোটামুটি একটা সুস্থ চেতনা হয়তো ছিল। যুদ্ধ কয়েকমাস চললে অবশ্য এ ধরনের বিশ্লেষণ প্রকাশ ও মুদ্রণ বিপদসংকুল হয়ে উঠল। এ বিষয়ে লেখাও তখন বাদ দিতে হয়। কিন্তু প্রায় দু বৎসরের সম্পর্কটা আরও নানাদিকেই তত দিনে প্রসারিত হয়ে গিয়েছে। প্রথমত বলতে হয়—আন্তর্জাতিক বিষয়ে লেখার কথা। আগেও ওরূপ বিষয়ে লেখা হত। কিন্তু সেই দু বৎসরের 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়্যু'র ওই বিভাগ সাময়িকপত্রের জগতে আন্তর্জাতিক আলোচনা সুপ্রতিষ্ঠিত করে তোলে। আসন্ন যুদ্ধের সেই মহামুহূর্তই তার প্রধান কারণ। ও দুই পত্রের আলোচনাও যে অনেক বুদ্ধিমান পাঠককে আকৃষ্ট করত, তা বুঝেছিলাম। কারও কারও কাছে ঐ সূত্রেই আমি পরিচিত হয়েছি—এটিও আমার সৌভাগ্য। আর মূল কথাটাও তো স্বীকার্য—সেই মাসে মাসে চল্লিশ টাকার দক্ষিণা মুখ্যত অবলম্বন করেই আমি রাজনীতির ঝড়ের মুখে এগিয়ে যেতে সাহস পেয়েছিলাম। জেল-ফেরতা মানুষকে এমন ডেকে এনে কে দিয়েছে এত লেখার সুযোগ—আর এত উদার স্নেহ?

এদিকে আমি তো ঝড়ের মুখে এগিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু রামানন্দবাবু তাতে স্বস্তি পেতেন কিনা জানি না। তাঁর হয়তো আশা ছিল আমরা লেখার কাজই প্রধান কাজ করব। আমরা জেলের কয়েক বন্ধুতে মিলে প্রথমে ঠিক করলাম—'কী করা যায়' প্রশ্নটার উত্তর খুঁজব একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করে। মতবাদ তখনো কারও সুস্থির নয়। অতীন্দ্র বসু ছিলেন এ চেষ্টার প্রাণ। বোঝাটা সকল রকমেই তাঁর উপর পড়ে, বিশেষ করে আর্থিক দায়িত্ব। 'ভারত' প্রকাশিত হলে রামানন্দবাবুকে তা পাঠাই।

যা মনে করি নি—তাই। তিনি আগাগোড়া পড়ে বললেন আমাকে জিজ্ঞাসা করতে—ছাপার উন্নতি, লেখার উন্নতি, মতামতের সম্বন্ধে আমরা কি ভেবেছি। তাঁর অভিজ্ঞতার ফল, আমাদের পীড়াপীড়ি না করে, দিতে তিনি উৎসুক—আমরা রাজবন্দীরা কাগজ বের করছি। বুঝলাম তাঁর আশা অনেক। কিন্তু সে অভিজ্ঞতা গ্রহণের মতো প্রস্তুতি আমাদের কোথায়? আমাদের তখন মাথার ঠিক নেই, কাজের ঠিক নেই, চাল-চুলোও নেই। আর সবচেয়ে নেই সুস্থির ভাবে সাপ্তাহিক পত্র চালাবার মতো সংকল্প, অনন্যচিত্তে তা গড়বার মতো ধৈর্য। আমরা তো 'ষ্টর্ম পেট্রল', ঝড়ের পাখি। তিনি চাইছিলেন—এই কাজের মতো কাজটা আমরা করি—সত্যই তাতে দেশেরও কাজ হবে, নিজেদেরও কর্মসংস্থান হবে। অন্তত তিনি ছাড়া তখন ও কাগজ সম্বন্ধে এতটা আগ্রহ আর কারও দেখি নি।

সে সময়ে—সে বোধহয় ১৯৩৯—একবার তাঁকে নাথ ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ আমন্ত্রণ করে নিয়ে যান নোয়াখালিতে। আমার উপর ভার পড়ল তাঁর সঙ্গে যাবার। আর তাই সেখানে আমার নোয়াখালির সহকর্মী রাজবন্দীদের পরিচালিত স্কুলটির উদ্বোধনও রামানন্দবাবু তখন করেন। আমি তাঁর সঙ্গে চললাম। এই উপলক্ষে আমি তাঁর একেবারে নিকটে এসে গেলাম। শিয়ালদহ থেকে দেখলাম তিনি একগাদা সংবাদপত্র হাতে নিয়ে উঠছেন। ঘণ্টা কয় পরে খোঁজ করতে দেখলাম—সব লাল নীল পেন্সিলে দাগিয়ে পড়া শেষ করছেন, 'বিবিধ প্রসঙ্গ' ও 'নোট্স'-এর জন্যই সে দাগ-দেওয়া। মাঝে-মাঝে তাঁর খোঁজ করি। তিনি ফার্ষ্ট ক্লাশে। বেলা বাড়ছে, ট্রেনে ক্লান্ত হচ্ছেন। কিন্তু কথায় সুমিষ্ট আত্মীয়তা—"আপনাদের গাড়িতে ভিড় না থাকলে আমিও তো যেতে পারতাম। কথা বলতে বলতে যাওয়া যেত।" তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ করা সম্ভব নয়। বিষম অন্যায় হত। তখন বয়স তাঁর চুয়াত্তরের দিকে। দেহ তত শান্ত নয়। আমার তো সব সময়েই ভয়—মুখে তিনি বলবেন না জানি, কিন্তু সত্যই হয় তো কষ্ট হচ্ছে। পরদিন সকালে নোয়াখালিতে যখন পৌঁছালেন তখন স্বভাবতই যথাসম্ভব তাঁকে আরামে রাখবার চেষ্টা হয়। নদীতে ভেঙে সে শহর তখন হতশ্রী, অসহায়। কিন্তু আরামে তাঁর আগ্রহ নেই—তাও আমার জানা। দু দু'খানা মোটর যাঁর আপিসের, তিনি সময়মতো মোটর না পেলে ভবানীপুর থেকে আপার সার্কুলার রোড-এর আপিসে আসতেন-যেতেন বাসে। তখনই সত্তরের দিকে তাঁর বয়স। তাঁর একটিই

হল তাগিদ—'আপনিও আমার সঙ্গে থাকুন এখানে।' সে আদেশ মেনে নিই—দেখাশুনার লোক থাকলেও, আমারই তো তা প্রথম কর্তব্য। তারপরেই তাঁর সস্নেহ আহ্বান, 'আসুন না আমার ঘরেই—এক ঘরে দুজনাতে কথা বলা যাবে, গল্প করা যাবে।' সিগারেট খাই না, তা বোধহয় জানতেন। কাজেই আমার পক্ষে কোনো সংকোচের কারণ নেই। তবু তা ছিল—ওঁর বিশ্রামের ব্যবস্থা অবাধ থাক। সেটুকু সময় ফাঁক দিয়ে আমি ওঁর কাছেই কাটাতে লাগলাম সর্বক্ষণ। দশ বৎসর আগেও যা ছিল অসম্ভব, তাই দেখলাম সহজ হয়ে গেল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সহজভাবে গল্প করা, কথা বলা, স্থানীয় নানা বিষয়ে তাঁর কৌতূহল মিটানো, তথ্য সরবরাহ করা। সাধারণ অর্থনৈতিক তথ্য জানতেন।—বই-পড়া জ্ঞান তাঁর আছে। স্থানীয় ভদ্রলোকদের সঙ্গে আলাপ করতে চান,—যে-রাজবন্দীরা একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়কে হাইস্কুলে পরিণত করে তুলেছেন তাঁদের কর্মশক্তিতে, উদ্যোগে তাঁর অকপট আনন্দ—আর তাঁদের উপর আশীর্বাদ। এ সব এক দিকে। অন্য দিকে আমার সঙ্গে কথা। আমার বাড়ির কথা, তাঁরও নিজের কথা মাঝে মাঝে। কোনো বিষয়ে উচ্ছ্বাস তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ, অধিক উৎসাহ অনভ্যস্ত। কিন্তু শান্ত সুমিষ্ট সকল কথাতেই ছিল পিতৃকল্প স্নেহের স্পর্শ, এমন কি কৌতুকেরও স্পর্শ। জীবনের শেষ দিকে যাঁরা তাঁর স্থির প্রসন্ন ধৈর্যে অসহনীয় যন্ত্রণার মধ্যে মৃত্যুর প্রতীক্ষা দেখেছেন, তাঁরা সেই তাপস-স্বভাব মানুষের অসাধারণ রূপ দেখেছেন। তা কখনো ভুলবার নয়, অবশ্য তা তাঁর প্রত্যাশিত রূপ। কিন্তু স্নেহপ্রবণ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে তাঁর পুত্র কন্যারা ব্যতীত বেশি লোকে দেখবার অবসর পায় নি। আমি যে পেলাম—সে আমার পুণ্যফল। আমার কাছে সে রূপ আরও অবিস্মরণীয়। শুধু যুক্তিবাদী, শুধু ন্যায়বুদ্ধিতে প্রণোদিত, ধর্মনিষ্ঠ, দেশের মুক্তি সাধনায় একাগ্রচিত্ত তপস্বীকে দেখলেও সব দেখা শেষ হত না। পিতৃপ্রতিম স্নেহসরস এই মানুষকে সেইবার অমন করে না দেখতে পেলে নিজেরই অভিজ্ঞতা অপূর্ণ থেকে যেত—অসম্পূর্ণ থাকতো বোঝা—অসাধারণ মানুষের এই সাধারণ মানবীয় রূপ।

শচীন বিশ্বাস

ফসল ওঠার আগে

দু'টি মানুষ জমির আলের উপর বসেছিল। আকাশে শাওনে মেঘ জমেছে, সূর্যের তেজ নেই। তবুও ওরা এখন আর ঘুরতে পারছে না। চরকির মতো ঘুরে ঘুরে এখন ক্লান্ত মানুষ দু'টি, চোখ মুখ শুকিয়ে গেছে, মেঘলা আকাশের ছায়া মুড়ি দিয়ে বিস্তৃত মাঠের প্রান্তে মুখোমুখি বসেছিল। রহমান হাঁটুর উপর মুখ গুঁজে হাঁফাচ্ছে। সেই কোন সকালে চারখানা রুটি আর এক লোটা পানি খেয়ে বেরিয়েছে। মাঠে ঘুরতে ঘুরতে একটা শাঁসাল বাইল থেকে ধান চেকায়ে ক্ষুধার মাত্রা তার আরও বেড়ে গেছে। অথচ এখন ঘরে ফেরা মানেই বেসরকে খিস্তি করা, তাই রতনের বকবকানি তেমন ভালো না লাগলেও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। রতন ওর গায়ে একটা ঠেলা দিয়ে, 'একটা বিড়ি দে দিনি' বলে দূরে অদূরে মাঠে মাঠে ধানের শীষ ছুঁয়ে ছুঁয়ে দৃষ্টিকে কখনও বিস্তৃত এবং কখনও সংকুচিত করতে লাগল। বাম প্রান্ত ঘেঁষে হরপুকুরের আমবাগান, বাগান পেরিয়ে হাসখালির পাকা সড়ক। আউসের ক্ষেত দেখতে দেখতে সে এখন দৃষ্টিকে প্রসারিত করে বলল, বুঝলানি রহমান, এমুন না হইলে কি চাষা কয় মাইনষে। দু' দশ বিশ ফসল উঠব, গোলা বাইব ভইরা, তবেই না।

এ সব কথাতেও রহমানের মনে বিশেষ কোনো আশার সঞ্চার হল না। চিন্তা করা তার স্বভাব। রতনের কাছে গালাগালিও কম খায় না, অত ভাইবা ভাইবাই যদি চলুম ত চাষা হইলাম ক্যান ক' দিনি। হ, ধান ত উঠতাছেই, এখন ফুর্তি কর না ক্যান্ পরাণ ভইরা—

আউসের জমির আলপথ ধরে এগিয়ে এল পঞ্চানন। গায়ে সাদা চাদর, গলায় কন্ঠি, হাতে একটা রেক্সিনের ব্যাগ, ছাতা এবং পায়ে ওয়াটারপ্রুফ জুতো। মাঠ দেখতে বের হয়েছে সে।

রতন বলল, আসেন ঠাকুর, বসেন এহানে। কেমুন ছাখলান মাঠের অবস্থাখান? মন ভইরা যায় না, কন?

সত্যি, পঞ্চানন সায় দিল, এমন না হলে চাষ, স্বয়ং লক্ষ্মী মাঠে এসে অধিষ্ঠান। তোদেরই ত এবার পোয়াবারো।

রহমান হাঁটুর উপর থেকে মুখ তুলে বলল, ঠাকুর, বন্যার কথা শুনছি বটে। উত্তর বঙ্গ বইয়ে নাকি এদিক পানেই এইল—

পঞ্চানন তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিল কথাটা, তোরা বড় গুজবে কান দিস, বুঝলি রহমান। কে বলল চিলে কান নিয়ে গেল, অমনি তোরা চিলের পিছে পিছে ছুটলি। মহামূর্খ না হলে এমন কথা বলে? কিন্তু এসব কথাতেও ওরা উৎসাহিত বোধ করে না দেখে বাম হাতের ব্যাগের উপর ছাতা ঠুকতে ঠুকতে সে বলল, আমার কাছ থেকে শিখে নিতে পারিস তোরা। সময়ের একটা নিজস্ব গতি আছে হে, নিরঙ্কুশ খারাপ বলে কিছু থাকতে পারে না। এবার যদি মাঠে ধান না হয়, মানুষ না খেয়েই মারা পড়বে, সে খেয়াল আছে?

তা আছে। কিন্তু ওদের বিশ্বাসও তেমন পাকা নয়। রহমান বলল, বলছেন বটে ঠাকুর। সেবারও ত হয়েল এমনি ধান পাট দুই-ই মাঠে লক লক করে উঠেল। দুধও এয়েল ধানে, কিন্তু বন্যার পানিতে সব ভেইসে গিয়েল না?

ভেসে যে গিয়েছিল তা অস্বীকার করা যায় না। সেবার বন্যাটা বেশ জোরেই এসেছিল। সে রকম তোড়ের বন্যা এ তল্লাটের কেউ কখনও দেখেনি। ডোবা নেই, নালা নেই; খাল খন্দ কিছুই নেই। শুকনো কাঠ-ফাটার দেশে ও রকম বন্যা হতে পারে কেউ বিশ্বাস করতে পারে নি। লোকের দুর্দশার সীমা ছিল না। কিন্তু তবুও সেবার আর এবারে অনেক তফাৎ। তখন আকাল ছিল না। এবারে ধান চাল বাজারে একদম নেই। মাছ উধাও। তেলে বিষ মেশানো হচ্ছে। নুনটাও সময় সময় পাওয়া যায় না। তরী তরকারীর অগ্নিমূল্য। লোক না খেয়ে শুকিয়ে মরছে।

পঞ্চানন বলল, না রে সেরকম হবে না। ঘর পোড়া গরু ত আগুনে মেঘ দেখে ভয় হয়, বার বার বন্যা হলে চলবে কেন? এবার যেমন আকাল পড়েছে, ধানও হবে তেমনি, কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, বাকি বকেয়াগুলির কথা মনে থাকে যেন। এবার ত আর বলতে পারবিনে ফসল ভালো হয় নি—

রহমান ও রতন জমির আলের উপর বসে বিড়ি টানতে লাগল। পেছনে তালবৃক্ষের সারির মধ্যে পঞ্চানন অদৃশ্য হয়ে গেলে রতন বিড়ির টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, শালা—

রহমান বলল, মানুষে কি করেল ভাই, দোষ যত এই নসিবের।

এ রকম কথায় রতনের রাগ বেড়ে গেল। রহমানের উপরে বিরক্ত হয়ে সে বলল, দেখ রহমান, যা বুঝতে পারস না, তা লইয়া কথা কইতে আসিস না। পঞ্চা শালা মাঠে নামে কোন আল্লাদে? ও কি ভাবে যে ওর পাওনা আমরা দিমু না। আসলে অবিশ্বাস বুঝলি, ও তগ আমাগো বিশ্বাস করে না।

রহমান বলল, বিশ্বাস করবেই বা কেমুন কইরে ক। গত সনের তিন মন ধান আধ মন চোত ফসল বাকি পড়ে রয়েল না?

হ, জীবন ভোর যাগ মুরদে কষ্টি নষ্টি কইরা বেড়াইল তাগ দিকটাও দেখন লাগে বুঝলি? মহাজন সাদে কয় না মাইনষে, আপদে বিপদে বাঁচাইতে হয়। রতন রীতিমত উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

রহমান আর কথা বাড়ালে না। সে রতনের মেজাজ জানে। এমনিতে মাটির মানুষ; বরো ধানের মতো সরল এবং বরবরে। কিন্তু রাগ হলে তার জ্ঞান গম্যি থাকে না। গত সনে অজন্মা গেছে। খরায় পুড়ে ফসল ওঠেনি ঘরে। তার উপর বিবির হল বাচ্চা। শালার বিবিও হয়েছে ভদ্দরলোকের বাড়া। রতন যদি জোড়জোর করে হাসপাতালে না নিয়ে যেত সে বাঁচত না। দাওয়াইয়ের পর দাওয়াই, পথ্যির পর পথ্যি। সত্যি সেদিন রতন পাশে না থাকলে বেসরকে বাঁচানোই কঠিন হত। টাকা দিয়ে শরীর দিয়ে সাহস দিয়ে লোকটা ওর বিবিকে ভালো করে তুলল। আবার সেই মানুষটাই—

রতন বলল, কি ধুকধুক করতাছস্, চল আগাইয়া যাই। ছুলে মাগীগুলো কিন্তু ফাঁক পাইলাই ঘাস কাইটতে সুরু কইরা দিব—

রহমানের আবার মাঠে নামার ইচ্ছে হচ্ছিল না। কিন্তু রতনের ঠেলাঠেলিতে উঠতেই হল।

আলপথের রাস্তা মাঠের মধ্যে এসে শেষ হয়ে গেল। আউসের জমিতে বুক সমান ধান গাছ। ঢোকার ফাঁসা নেই। সুপুষ্ট বাইলগুলি বিলি দিতে দিতে আগু পিছু ওরা এগিয়ে চলল। ভুসভুসে নরম মাটিতে পা বসে যেতে থাকল। মাঝে মাঝে কাদা ফ্যাস ফ্যাস করে ওঠে।

কে করেলরে জমিটা? জব্বর চাষ দিয়েল বটে—

বৈকুণ্ঠ সড়কের পিতম ঘোষগ। রতনের মুখে ধানের ফুল মাকড়সার জাল জড়িয়ে যাওয়ায় সে কিছুক্ষণ থু থু করে বলল, হইব না কেন ক? তিন

তিনখানা হাল কিষাণ, অতগুলো হালে বলদ। তাগ জমি চাষ হইব না ত কি তগ আমাগো জমি চাষ হইব—

রহমান তখন ধানের শীষগুলি বুকের কাছে টেনে আনছিল, বুকে চেপে ধরে আঘ্রাণ পেতে পেতে হাত উপরে তুলছিল। রতন সেদিকে তাকিয়ে বলল, ধানের বাইল ত্যাখছস রহমান, কি পেল্লাই পেল্লাই,—মুঠা হাত কইরা হইব মনে কয়—

সাদা ধানের ফুল রহমানেরও মুখে লেগেছিল। এখন ক্ষুধার কথা ভুলে গেছে সে। কয়েকটি ধানের শীষ মুঠা করে ধরে মুখ চেপে চুমু খাওয়ার মতো চুক চুক শব্দ করল, তা হয়েল বটে—

আউসের মাঠ পেরিয়ে পাট ক্ষেত। অপেক্ষাকৃত উঁচু এবং শুকনো জমিতে লাল পাট, ডাঁটাগুলি শক্ত হয়ে উঠেছে। হেলতে চায় না। পাটের ক্ষেত পার হয়ে হরপুকুরের পুব প্রান্তে উঠল। একটা বিরাটাকৃতি ব্যানা ঝাড়ের পাশে বুনো শুয়োর ডাদাল ঘাসের মুথা খুঁড়ছে বলে মনে হল। ভাগর গোছাগুলি এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে যাচ্ছে। রতন রহমান থমকে দাঁড়াল। একটু পরে সন্ধানী দৃষ্টিতে দেখতে পেয়ে রতন অপেক্ষাকৃত ছোট এবং ক্ষীণজীবি পাটের ডাঁটায় বিলি দিতে দিতে দ্রুত এগিয়ে গেল, এ্যাই, এ্যাই, কি করতাছস তুই ওহানে—এবং ওর অনেক কাছে এসে বলল, এঁ্যা, করছস কি, এ যে দেহি সব উপড়াইয়া ফেলাইছস।

মেয়েটি ভয় পেয়েছিল। কাঁচিখানা হাতে নিয়ে সে একপাশে জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তাড়াতাড়িতে সে ধানের গোছার দিকে নজরে দিতে পারে নি। এদিকে ওদিক হেলে পড়েছে। সে কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে বলল, গোঁসা করিস না রে, মুই গাছগুলিরে ঠিক কইরে দিমু—

রতন বলল, আর আদিখ্যেতা দেখান লাগব না। যা যা সইরা পড়। এ ক্যামনতর মাইয়া লোক রে, এটুক বিবেচনাও করন লাগে, ছি ছি—রতন গজর গজর করতে লাগল।

রহমান রগড় দেখছিল। এগিয়ে এসে বলল, আহা হা, রাগিস ক্যেন রতন, তুই বড় রগচটা। ঘাস কেটেল ত হয়েল কি?

আহা আমার পীরিতির নাগর আইচে রে, অত উদার হইলে আর মহাজনের ধার শোধ করন লাগব না। অগ তুই চিনস না রহমান, ফাঁক পাইল কি তর ধানের গাছের দফা রফা কইরা দিব।

মেয়েটির চোখে মুখে হাসি দেখা গেল। ঘাসগুলি গুছিয়ে সে ঝটপট বোঝা বেঁধে বলল, নে তুইলে দে দিকিন, বিক্রীর লেগে শহরে যেইতে হবে না ?

হ, যাওন ত লাগবই, আমাগো মাঠের মধ্যে ফেলাই যাবা কই ? বস একটা বিড়ি খাও। জমির আলের উপর ব্যানা ঝাড়ের পাশে বসল রতন। ট্যাক থেকে বিড়ির কৌটো বের করল।

মেয়েটি পরনের ছোট কাপড় আরও একটু গুটিয়ে নিয়ে ওদের সামনে বসল। গুমোট গরমে ঘাস কাটতে কাটতে সে রীতিমতো ঘেমে উঠেছে। ধানের ধারাল পাতায় ওর শরীর আঁচড়ে গেছে। ঘাম লেগে আঁচড়গুলি বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নিরাবরণ সুঠাম দেহের মেয়েটিকে দেখতে দেখতে ওরা বিড়ির ধোঁয়া ছাড়ল।

রতন বলল, খলস্তার বিলের দিক যাইতে চাইলা না দোস্ত ?

হঁ, ওদিক পানে যাইলে ত ভালই হয়—

ত যাও না। বুঝলা না, শরীলটা য্যান আমার চলতাছে না। এহানেই একটু জিরাইয়া লই না ক্যান—

তাই লও। আমি এইল বলে।

বুক সমান ধানের গাছ বিলি দিতে দিতে রহমান এগিয়ে গেল। এক সময় ওর মাথাটাও ধানের শীষের অন্তরালে মিলিয়ে গেল।

হরপুকুরের মাঠ ঘুরে ওরা যখন আমবাগানের মধ্যে উঠল সূর্য তখন পাটে বসেছে। এখন রাস্তার দুই পাশে জঙ্গল, মটমটে আর নাটাগাছের ঝোপ। কর্দমাক্ত সরু পথ ধরে আরও কিছুটা এগিয়ে এসে রহমানের চালা ঘর। পাটখড়ির চেড়ায় ঢাকা একখানা বিচুলির চালা। ওরা আগে ছিল উদ্বাস্তু কলোনীর প্রান্ত ঘেসে, রতনদের বাড়ির কাছাকাছি। হঠাৎ একদিন তোড়জোড় করে দল ধরে গ্রাম ছেড়ে পাকিস্থানে চলে যাওয়ার পর ওদের পাড়ায় নতুন আসা শরণার্থীদের বসতি পত্তন হয়ে গেল। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ওরা দলবল সহ ফিরে এল। হাড়সর্বস্ব, নিঃস্ব, রোগগ্রস্ত। আরেক ধরনের উদ্বাস্তু।

রতন ওদের জিজ্ঞেস করেছিল, যাওনেরই বা কাম কি আবার ফিইরা আয়নই বা ক্যান।

রহমান হাউ হাউ করে কেঁদেছিল, দোস্ত, ওদের সাথ মোদের মিলেল না, ওরা ঘ্যান ক্যামুন।

আমাগো ভাশের নিন্দা করতাছস রহমান?

রহমান জিব কেটে বলল, ছিঃ ছিঃ দোস্ত, এ্যামুন কথা কে বলেল তোমারে। দেশ ত ভালই, কিন্তু ঐ যে বলেল মানুষগুলি ঘ্যান ক্যামুন।

মাঠের প্রান্ত ঘেঁসে রহমানদের নতুন উপনিবেশ গড়ে উঠল। এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পনের ষোলখানা চালাঘর।

রহমানের ক্ষুদে ক্ষুদে বাচ্চাগুলো বারান্দায় গড়াচ্ছিল, আশে পাশে কিছু মুরগির বাচ্চাও খুঁটে খুঁটে কি যেন খাচ্ছে। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এক ঝাঁক বাচ্চা ঝুড়ি দিয়ে ঢাকা। বেসর বারান্দায় বসে ডাল বাছছে। রহমান উঠোনে পা দিয়েই হাঁক দিল, দোস্ত এয়েল রে বেসর, বসতে দে।

না না থাক, বসনের কাম নাই—

কেন বইসে যাও না এট্টুক। মেহনত ত হয়েল জোর। একটু জিইরে লও। একখানা চটের টুকরো এগিয়ে দিয়ে সে ঘরের মধ্যে ঢুকল।

রতন বসল না। এগিয়ে গিয়ে মুরগির বাচ্চাগুলোর কিচির মিচির শব্দ শুনতে লাগল। গায়ে ধুলো-মাটি মাখা রহমানের একটি মেয়ে এসে পাশে দাঁড়াল। রতন ওর চিবুক ধরে একটু আদর করল, যাবি আমাগো বাড়ি, ভাই আছে—

ভাই—

ঘর থেকে বের হয়ে রহমান বলল, দোস্ত কিছু চাউলের দরকার হয়েল যে—

ক্যান রেশন তোলস নাই?

না। পারেলাম কই। টাকার জোগাড় হয়েল না—

রতন বলল, বিডিওর অফিসেও বোধ করি যাস নাই?

গিয়েল; ওরা সামনের হপ্তায় যেইতে বলেল। কিছু গম দিব মনে কয়—

রতনকে নীরব দেখে রহমান বলল, পুলাপানরে আজ কি খেইতে দিব রে, বড় বিপাকে পড়েল ত—

হ, তাই কও। ধান ত পাইকাই আইল। ত হন ত খাওনের কাম চইলাই যাইব। কিন্তু অহনইত চলা ভার—

পুলাপানেরে বড় কষ্ট। কাল উদের মা ছু'ভি মস্থর সেদ্ধ দিয়েল বোধ করি। ব্যাস, তারপর আর কিছুই পেটে পড়েল না।

বেসর দরজার ঝাঁপ ধরে দূরের মাঠের দিকে তাকিয়েছিল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ইয়ের খোঁজ কে নিয়েল। সবই মোর নসিবের দোষ—

রহমান বলল, এমুন কথা কও কি কইরে। শুনলে দোস্ত আমার নাকি কোন গরজই নাই—

নাইই ত। গায়ে হাওয়া লাইগে ঘুরছ। ইদিকে পুলাপানরে নিয়া সামলাই কি কইরে তা আল্লাই জানে—

রতন বলল, হ, আর ঝগড়া করনের কাম নাই। চল দেহি কি করতা পারি। রেশন কাডখান লইয়াই চল—

অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছে। ঝোপঝাড়ের মধ্যে ছড়ান ছিটান চালাঘরে এক আধটা কেরোসিনের কুপি মিট মিট করে জ্বলছে। পথে মাদার গাছটার নিচে অন্ধকার। জোনাকিরা বাসা বেঁধেছে। পায়ের তলায় কাদা ফ্যাস ফ্যাস করছে। মেঠো পথটুকু পার হয়ে উদ্বাস্তু কলোনীর ইট ফেলানো পথে উঠল ওরা।

রতন বলল, ফসলডা উইঠা গেলে যাহোক বাঁচন যায়। এত তাপ জ্বালা আর সয় না রে। শালার বাজার ত নয় য্যান আগুন। কিছুতেই হাত দেওন যায় না—

রহমান বলল, তাতেই বা হয়েল কি রতন। পঞ্চা ঠাকুর হাঁ করেল ত সব ফসল ওর গব্বরে ঢুইকে গিয়েল। দেনার কথাডা মনে লয় না ক্যান?

রতন বলল, মনে লয়; কই না কারো। পরাণডা শুকাইয়া যায় যে। জমিত আমাগো নাই। ভাগ বরাত দিয়া থাকব যা তা ত বুঝতাই পারতাছি।

রহমান নীরবে পথ চলে। তার চালাঘরখানায় এবার বিচুলি কিছু দিতে হবে। খুঁটি ও বেড়া পচে গেছে। তাই কয়েকখানা বাঁশও কেনার প্রয়োজন। বৃষ্টি নামলে পুলাপান আর বিবিকে নিয়ে সারারাত বসে কাটাতে হয়। তা ছাড়া মনে একটা ক্ষীণ আশা বড় ছেলেটাকে সে স্কুলে দেবে। ওদের পাড়াতেই নতুন স্কুল গড়ে উঠেছে। মাস্টারমশাই রোজই রহমানকে বলছে। সে আজ নয় কাল বলে পিছিয়ে দিচ্ছে। ছেলেকে স্কুলে পাঠালেই ত হল না; তার জামা চাই, প্যান্ট চাই। না হলে সে হিন্দুর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পড়বে, মেলামেশা করবে।

রতন বলল, অত ভাবস্ ক্যান দোস্ত। মুনিষ খাটার কাম ত দ্যাশ থেইকা উঠ্যা যায় নাই। গতর খাটাইয়া খাইলে ভাতের অভাব হইব না।

রেশনের দোকানে ভিড়। মানুষ গিজ গিজ করছে। লাইনে এখনও অনেক লোক।

রহমান বলল, কন্‌টোলে কি এয়েল ভাই?

গম।

কেন চাউল আইসে নাই?

শক দেইখা বাঁচন যায় না, চাউল খাইতা চায়,—ভিড়ের মধ্য থেকে কে একজন মন্তব্য করল। আশেপাশের সকলেই হেসে উঠল; বেশ একটা মজার কথা শুনেছে যেন ওরা।

রতন বলল, লইবা নাকি দোস্ত?

লইতেই ত হয়।

কয় কেজি পাইবা?

ছয় কেজি।

যাও জমা দিয়া আইস তোমার কার্ডখান। আমার ঘরে চল, তিন টাকা তোমারে দিয়া দিমু। অনটন খাইটা শিগ্‌গিরই শোধ কইরা দিবা। আমাগো অবস্থাডাও ত বুঝতাছ—

রহমানের চোখে মুখে একটা খুশির চেহারা দেখা গেল। সে ঘাড় নেড়ে রতনের কথা সমর্থন করল।

রতন বলল, ভাবনের কিছু নাই দোস্ত, দ্যাশের সব লোক যদি বাঁচে, বুঝলা না, আমরাও বাঁচুম।

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্

যে কোনো ভাষায় নতুন কথার সৃষ্টি হয় ঘটনার চাপে। ইংরেজি ভাষায় 'ফিলিস্টাইন' কথাটির ব্যাপক প্রচলন ভিক্টোরিয় যুগ থেকে। খুব সম্ভবত ম্যাথিউ আর্নল্ড্ই কথাটির প্রথম ব্যবহার করেন পারিপার্শ্বিক নির্মননশীলতা ও স্থূল স্বার্থসর্বস্বতার বর্ণনায়। কথাটির সঙ্গে বাইব্‌ল্-এ বর্ণিত ফিলিস্টাইন জাতির বড় একটা যোগ নেই। বোধ হয় জর্মান 'ফিলিস্টর' শব্দটির সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। জর্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবা, বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোকপ্রাপ্ত নয় যে শহরে অর্থসচ্ছল মধ্যবিত্ত, তাদের প্রসঙ্গে কথাটির ব্যবহার করতেন। সেই থেকে শিল্পরসে বঞ্চিত অশিক্ষিত ধনী—এই অর্থে কথাটির প্রয়োগ শুরু। ইংরেজি 'ফিলিস্টাইন'ও এই একই অর্থব্যঞ্জক এবং তার প্রচলন খুব সম্ভবত 'ফিলিস্টর' থেকেই অনুপ্রাণিত।

বাংলা ভাষায় এতদিন পর্যন্ত এ কথাটির প্রতিশব্দ তৈরী হয় নি। হয়তো তৈরীর প্রয়োজন ছিল না বলেই। কিন্তু সম্প্রতি বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চেহারাটা যে-রূপ পরিগ্রহ করছে তাকে যথার্থভাবে নামকরণ করতে গিয়ে বাংলা শব্দমালা উপযুক্ত বর্ণনামূলক নামের ক্ষুধায় হাঁপিয়ে উঠছে।

'ফিলিস্টিনিজমের' ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ম্যাথিউ আর্নল্ড্ যা বলেছিলেন, তা আজ এ দেশের সর্বস্তরে প্রকটভাবে উপস্থিত—

"…On the side of beauty and taste, vulgarity; on the side of morals and feelings, coarseness; on the side of mind and spirit, unintelligence—this is Philistinism."

সৌন্দর্যবোধ ও রুচির ক্ষেত্রে ইতরতা; নীতিবোধ ও অনুভূতির ক্ষেত্রে অমার্জিত স্থূলত্ব, মন ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে অজ্ঞানতা—এইসব প্রবণতা নিয়ে আত্মসন্তুষ্ট অরসজ্ঞদের সামনে আমাদের দেশের সত্যনিষ্ঠ শিল্পী-সাহিত্যিকেরা যখন তাঁদের সৃষ্টিকর্ম পরিবেশন করেন, তখন তা বেনাবনে মুক্তা ছড়ানোর নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়।

এই রুচিবিকার ও উচ্চমানের শিল্পের রসগ্রহণের অক্ষমতা বিশেষ কোনো শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, আর্থিক উপার্জনক্ষমতার উপরও নির্ভর করছে না। 'উল্টোরথ-জলসা'র পাঠক ও হিন্দী ফিল্মের দর্শক—শ্রমজীবী ও মালিক, উভয় শ্রেণীভুক্ত। পুজোর সময় প্রতি পাড়ায় জনপ্রিয় চটুল গানের মাইকের মধ্য দিয়ে শব্দ-বিবর্ধন বা ট্রামে-বাসে, মাঠে-ময়দানে ট্র্যানজিস্টর বাজিয়ে নিজের অধিকারভোগের বিজ্ঞাপন প্রদর্শন বা আদব-কায়দার রেস্তোরাঁর 'বীট্‌ল'দের শ্রুতিকর্কশ সংগীত শুনে উচ্ছ্বসিত উন্মাদনার অভিনয়—এ সবের মধ্যে যে লোক-দেখানো গোছের উদ্ভট মানসিকতা প্রকাশ পাচ্ছে, তা শ্রেণীনিরপেক্ষ।

এক এক সময় মনে হয়, ব্যক্তিগত অর্থের পরিমাণের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভেদ যে-যুগে শেষ হবে, হয়তো দেখা যাবে নতুন দুটো শ্রেণী মাথা চাড়া দিয়েছে। এক শ্রেণী স্থূল হালকা আমোদপরায়ণ, আর-এক শ্রেণী সূক্ষ্ম মননশীলতাসম্পন্ন। কে কতখানি অর্থ উপার্জন করবে, এর ভিত্তিতে আর শ্রেণী বিভক্ত হবে না, কে কিভাবে উপার্জিত অর্থব্যয় করবে—বই কিনে, কলাশিল্পের রসাস্বাদনে ও বুদ্ধির চর্চায় না ব্যয়বহুল সামাজিক অনুষ্ঠানে ও বিলাসিতায়—এর মাপকাঠিতে ভবিষ্যতে শ্রেণীবিচার হবে।

পাশ্চাত্যের সমৃদ্ধশালী দেশগুলিতে এই প্রবণতার পার্থক্যের চেহারাটা অনেক পরিস্ফুট। অর্থসচ্ছল শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যেও ফাটলটা স্পষ্ট। মুষ্টিমেয় বুদ্ধিবাদী শ্রমিক ও তার নির্মনন সহকর্মীদের মধ্যে ব্যবধানটা কত বিস্তীর্ণ তার পরিচয় পাওয়া যায় হাল আমলের ইংরেজ নাট্যকার আর্নল্ড্ ওয়েস্কারের Roots নাটকে। নায়িকা শ্রমিক সন্তান বীটি ব্রায়ান্টের প্রবণতা আধুনিক চিন্তাশীলতার দিকে; সস্তা রুচিতে অভ্যস্ত তার পরিবারের অন্যান্যরা তাকে ঠাট্টা করে বলে—"What's alive about a person that reads books and looks at paintings and listens to classical music?" এ জাতীয় মনোবৃত্তি আমাদের দেশেও সরব। যদিও তার ভিত্তিতে স্বতন্ত্র শ্রেণী তৈরী হবার সময় এখনও হয় নি, কারণ আর্থিক অসাম্য এখনও এ দেশে এত ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ যা অন্য সমস্যার উত্থানের সম্ভাবনাকেও ছায়াবৃত করে রেখেছে।

নিজেকে সুসংস্কৃত করা ও চিন্তা দিয়ে নতুন মূল্যবোধকে যাচাই করে তাকে আয়ত্ত করার যে কঠিন পথ, তার থেকে দূরে সরে গিয়ে হাল্কা আমোদ-আহ্লাদ নিয়ে সুখে জীবন কাটিয়ে দেবার এ প্রবণতা সব দেশেই সব

যুগে ব্যাপক। আমাদের দেশে এর সঙ্গে একটা অনুকরণস্পৃহা যুক্ত হয়ে ব্যাপারটাকে প্রায় হাস্যকর করে ফেলেছে। 'ড্রেনপাইপের' পরিধান বা মেয়েদের কেশবিন্যাসের 'বুক' রীতি সম্বন্ধে আমি আপত্তি করি না। কারণ এ ব্যাপারগুলো নেহাতই ব্যক্তিগত। অনেক সময় দেখতে ভালোই লাগে পরিধানকারীর দৈহিক শ্রীর সঙ্গে যদি স্টাইলটা মানিয়ে যায়। বা কোনো বাঙালি পিতা যদি মনে করেন ইংরেজি বা ফরাসী ভাষাই ভাব প্রকাশের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত এবং যদি সেই চিন্তা থেকে তিনি তাঁর সন্তানদের বাংলা না শিখিয়ে ছোটবেলা থেকেই কোনো বিদেশী ভাষায় ভাবতে, কথা বলতে ও স্বপ্ন দেখাতে শেখান, তাতেও আমার আপত্তি নেই। কিন্তু প্রীতিটা কেবল অন্য ভাষা ছেড়ে শুধু ইংরেজির প্রতি কেন? এবং ইংরেজির প্রতি এই অনুরক্তি তার সাহিত্য-শিল্পকে কেন্দ্র না করে মাত্র উচ্চারণভঙ্গী এবং চাল-চলনের প্রতি কেন্দ্রীভূত কেন? তখনই সন্দেহ জাগে এই ইংরেজিপ্রীতির পিছনে কোনো ব্যবহারিক বা কাজে লাগানো মনোবৃত্তি রয়েছে। এক বিশেষ কায়দায় ইংরেজি উচ্চারণ এবং হালকা চালচলনের সঙ্গে ক্রমশই এক জাতীয় smartness বা ওপর-চালাকির অনুষঙ্গ যুক্ত হচ্ছে, যেটা আজকের বড় চাকরিতে কাজে লাগে। এবং বড় চাকরির অর্থ যেখানে মোটা মাহিনা, তখন উপার্জনকারীর ভাবনাজগতে আর গুরুগম্ভীর চিন্তার কি প্রয়োজন? একটা gay irresponsibility বা সদাপ্রফুল্ল দায়িত্বশূন্যতার মধ্যে গা ভাসিয়ে দেওয়া যায়।

কারণ, আমাদের দেশে গুরুগম্ভীর চিন্তার মূল কেন্দ্র এখনও আর্থিক অসাম্যের সমস্যা। যাদের জীবনে দারিদ্র্য যত কম, তাদের জীবনে serious চিন্তা বা দায়িত্বের সমস্যা তত কম। দারিদ্র্যমোচন বা আরও অর্থ রোজগারের চিন্তা ছাড়াও যে আরও গভীর মানবিক সমস্যা অর্থসচ্ছল মানুষের চিন্তার খোরাক হতে পারে—এ ধারণাটা ক্রমশই যেন লুপ্ত হতে চলেছে। পাশ্চাত্যের সমৃদ্ধশালী দেশেও দেখা যাচ্ছে দৈনন্দিন জীবনে আর্থিক সাচ্ছল্য এসে গেলেই একটা হাল্কা মানসিকতা জন্ম নিচ্ছে। আমাদের দেশেও আজ যারা দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত এবং ফলে serious ও দায়িত্বসচেতন হতে বাধ্য, তাদেরও আদর্শ উচ্চশ্রেণীর সমাজে কোনোরকমে একটা জায়গা করে নিয়ে হাঁফ ছেড়ে সমস্ত চিন্তা থেকে মুক্তি পাওয়া। সবাই, শ্রেণীনির্বিশেষে, একটা চিন্তাশূন্যতার দিকে ছুটে চলেছে।

রাষ্ট্রশাসন কর্তৃপক্ষ

তবে প্রত্যেক দেশেই অর্থসর্বস্ব নির্মননশীলতার সবচেয়ে সার্থক মুখপাত্র সেদেশের শাসকগোষ্ঠী। কী ধনতান্ত্রিক, কী সমাজতান্ত্রিক—উভয় শাসনতন্ত্রই যেহেতু দেশের অগ্রগতি নির্ধারণ করেন কটা ইস্পাত নির্মাণের কারখানা, কত ধানচাল, কটা উড়োজাহাজ ও কামান তৈরী হোল—এর ভিত্তিতে, সেরকম সংস্কৃতি ও শিল্পচর্চার ব্যাপারে তাদের উদাসীনতা এবং মাঝে মাঝে প্রতিকূলতা প্রায় স্বাভাবিক বলে সবাই মেনে নিয়েছেন।

শাসনতন্ত্রের সুস্থিতির জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও বাঞ্ছনীয় জনসাধারণের অনুবর্তিতা বা এক নির্দিষ্ট ভাবধারার প্রতি অনুক্রম বা 'কন্‌ফর্মিটি'। মার্কিন দেশে অ্যামেরিকান ওয়ে অফ লাইফ, ব্রিটেনে এক সাংবাদিকের ভাষায় telly-viewing, bingo-playing welfare state, ও সোবিয়েত ইউনিয়নের সংস্কৃতিতে সোস্যালিস্ট রিয়্যালিজম্—প্রতিটি দেশেরই সরকারের নির্দেশিত চিন্তা বা জীবনধারণের ছক, যার প্রতি সে দেশের জনসাধারণের অনুবর্তিতা রাষ্ট্রশাসনের এক বিরাট খুঁটি। এই ছকের প্রতি আনুগত্যলাভের জন্য শাসকগোষ্ঠিকে আজ আর totalitarian পদ্ধতির শরণাপন্ন হতে হয় না, কারণ প্রতিটি ছকেই সহজভাবে বেঁচে থাকার কয়েকটা সস্তা লোভনীয় তাগিদ রয়েছে। সোবিয়েতের শিল্পকলায় সোস্যালিস্ট রিয়্যালিজমের জনপ্রিয়তার ইতিহাসটা একটু বিচিত্র ও স্বতন্ত্র। শিল্পকে সমস্ত জনসাধারণের গ্রহণযোগ্য করে তুলবার জন্য শুরু থেকেই সোবিয়েতের শাসকগোষ্ঠি একজাতীয় পোস্টারধর্মী চিত্রকলা ও শিশুপাঠ্য নীতিবোধমূলক সাহিত্যের লালন পালন করেছিলেন। ফলে আজ পর্যন্ত সেদেশের জনসাধারণের শিল্পবিষয়ক মূল্যবোধ অপ্রাপ্তবয়স্কের স্তরেই রয়ে গেছে। চিন্তাশীল বিতর্কপ্রধান বা সূক্ষ্ম, দ্যোতনামূলক শিল্পের কদর সোবিয়েত জনসাধারণের কাছে কতখানি রয়েছে, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সরকার অনুমোদিত এই 'সোস্যালিস্ট রিয়্যালিজ্‌মের' ছকের আকর্ষণ থেকে বিচ্যুত হয়ে যখন কিছু লোক সেদেশে টুইস্ট নাচে বা বীট্‌ল্‌দের সংগীতে মত্ত হয়, বা আওয়ারা ফিল্‌ম্ নিয়ে হৈ চৈ করে, আমি আশ্চর্য হই না। কারণ এই নতুন আকর্ষণ তাদের মৌলিক রুচির পরিবর্তন সূচিত করে না ; সেই পুরোন সস্তা প্রবণতারই ভিন্ন রূপ প্রকাশিত হচ্ছে।

ইন্টালিজেন্ট্‌সিয়া :

যাই হোক, প্রতি দেশেই এই চিন্তাধারা বা জীবনধারার সরকারী ছক থেকে যখনই কেউ বিচ্যুত হয়ে স্বতন্ত্রভাবে নিজের চিন্তার ভিত্তিতে ভাবতে বা বাঁচতে শুরু করে, তখনই সেদেশে 'ইন্টালিজেন্ট্‌সিয়ার' জন্ম হয়। সমাজের এই মুষ্টিমেয় স্বাতন্ত্র্যবাদীরা, কী ধনতান্ত্রিক, কী সমাজতান্ত্রিক, যে কোনো শাসকগোষ্ঠির চক্ষুশূল। অতীতে বিদ্রোহী ইন্টালিজেন্ট্‌সিয়া ছিলেন বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকেরা। তাদের প্রতি শাসকগোষ্ঠির অত্যাচারের ইতিহাস সর্বজনবিদিত। তার চরম পরিণতি আজ দেখতে পাই ; যদিও এ শতাব্দী বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতির যুগ, সঙ্গে সঙ্গে এ যুগটা বৈজ্ঞানিকের নৈতিক পরাজয়ের যুগ। এক কথায়, বিজ্ঞানের নিত্যনতুন আবিষ্কার থেকে আবিষ্কারক স্বয়ং, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক বিচ্ছিন্ন বা alienated। মার্কস্‌ দেখেছিলেন ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রমজীবী তার শ্রমফল থেকে কিভাবে alienated। সেই একই উপায়ে বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার আজ শাসকগোষ্ঠির পদানত ; তার ব্যবহারের উপর স্রষ্টার কোনো অধিকার নেই।

নিঃসন্দেহে ঊর্ধাকাশের রহস্য উন্মোচনের জন্য বৈজ্ঞানিকেরা স্পুটনিক উড়িয়েছেন ; অন্য গ্রহে হয়তো নিকট ভবিষ্যতে জীবনের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হবে। কিন্তু এই বিপুল ব্যয়সাধ্য গবেষণা ও আবিষ্কারের নেপথ্যে সরকারী অর্থানুকূল্য রয়েছে বলেই তার সার্থকতা সম্ভব হয়েছে। এবং এই সরকারী সাহায্য নিঃসন্দেহেই নিঃস্বার্থ নয়। ভবিষ্যতে এই আবিষ্কারও সরকারের সম্পত্তি হবে এবং তাকে শাসকগোষ্ঠি নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনে ব্যবহার করবে যেমন করেছে পারমাণবিক অস্ত্রকে।

সৃষ্টিশীল আবিষ্কারের পাশাপাশি আজকের বৈজ্ঞানিককে নিত্যনতুন মারণাস্ত্রের প্রতিযোগিতায় নেতৃত্ব দিতে হচ্ছে। কত স্বল্প সময়ে শত্রুপক্ষ এবং মানবজাতির এক বিরাট অংশকে নিশ্চিহ্ন করতে পারা যায় এর গবেষণার বিনিময়ে আধুনিক বৈজ্ঞানিক বহির্বিশ্বের রহস্য তদন্তের অধিকার পেয়েছেন। ধ্বংসকারী গবেষণা বা আবিষ্কারে অসম্মতি জ্ঞাপনের অধিকার আজ বৈজ্ঞানিকের নেই, নিজের বৈজ্ঞানিক অস্তিত্ব যদি তাঁকে বজায় রাখতে হয়। চিন্তার রাজ্যে দাসত্বের এত বড় নজির ইতিহাসে বিরল।

যুক্তি দিয়ে সমাজে সাহিত্যে শিল্পকলায় প্রচলিত রীতি, নীতি ও মূল্যবোধকে যাচাই করার দায়িত্ব তাই আজ অনেকাংশে অর্পিত হয়েছে শিল্পী-

সাহিত্যিকদের উপর। ইন্টালিজেন্ট্‌সিয়ার এই অংশের পক্ষে এখনও সম্ভব শাসকগোষ্ঠির নির্দেশের বা চাহিদার প্রতি নিরপেক্ষ হয়ে স্বতন্ত্র ইচ্ছানুসারে শিল্পসৃষ্টি করা। একটা উপন্যাস বা চলচ্চিত্র সারা সমাজে সাড়া জাগাতে পারে, নির্দেশিত মূল্যবোধ ও ছককে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতে পারে। তাই শক্তিশালী দেশগুলির রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ পারমাণবিক অস্ত্র বে-আইনী করতে যতটা দ্বিধাগ্রস্ত, একটা বিতর্কমূলক উপন্যাস বা চলচ্চিত্র নিষিদ্ধ করতে ততটা তৎপর। কারণ, শিল্প সাহিত্যের মধ্য দিয়ে এমন মূল্যবোধ পরিবেশন করা সম্ভব যা সরকারের সুস্থিতির পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে। চিন্তাজগতে এখনও কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যক্তি শিল্পীর লড়াই সম্ভব। মাত্র কয়েক বছর আগে আমাদের দেশে শিশির ভাদুড়ি সরকারী পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করে যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা এ যুগের সত্যনিষ্ঠ শিল্পী-সাহিত্যিকদের পক্ষেই সম্ভব।

রাজনৈতিক আদর্শ ও সংস্কৃতি

আসলে ইন্টালিজেন্ট্‌সিয়ার প্রতি শাসকগোষ্ঠির যে-মনোভাব তা রাজনৈতিক নেতাদের বিজ্ঞান বা শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক মতবাদেরই জের। রাজনৈতিক আন্দোলনে সমস্ত ঘটনাকেই স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহারে অভ্যস্ত নেতারা সংস্কৃতিকেও সেইভাবে দেখতে প্রয়াসী। দেশের আশু উপযোগিতা ছাড়া বৈজ্ঞানিকের নিজস্ব প্রবণতানুযায়ী গবেষণা করাকে এরা উদ্দেশ্যহীনতা বা অপ্রয়োজনীয় ভাবেন। রাজনৈতিক মতকে জনসাধারণের সামনে উপস্থাপিত করা ছাড়া শিল্প-সাহিত্যের স্বতন্ত্র কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে সে বিষয়ে এঁরা অনুৎসাহী ও উদাসীন। আজকে প্রশ্ন রাখা দরকার, সত্যনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বা শিল্পীর প্রাথমিক বাধ্যবাধকতা তার নিজের দেশের প্রতি, শাসনকর্তৃপক্ষ ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি, না নিজস্ব যুক্তি ও মানসিকতা প্রণোদিত বিষয়ের প্রতি। এই বাধ্যবাধকতা বা দায়িত্বের আকর্ষণ-বিকর্ষণই চিরকাল রাজনীতির সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ককে জটিল করেছে। যখন শিল্পীর প্রবণতা রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দের ইচ্ছার অনুকূলে গেছে তখন তাঁর সৃষ্টিকর্ম কর্তৃপক্ষের আশীর্বাদ পেয়েছে। যে-মুহূর্তে শিল্পীর কল্পনা নেতাদের অনুমোদিত পথ থেকে স্বতন্ত্র পথ অনুসরণ করেছে (যেমন আমাদের দেশে স্বদেশীযুগে রবীন্দ্রনাথের কিছু উপন্যাস বা প্রবন্ধ) বা রাজনীতিবিমুখ হয়েছে

(যেমন সোবিয়েত ইউনিয়নে), তৎক্ষণাৎ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বা রাষ্ট্র-শাসকগোষ্ঠি রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছে।

এ যুগের ছুটি ভিন্ন মতাদর্শের নেতা, যাঁদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী মানবতাবাদী—লেনিন ও গান্ধীর সংস্কৃতিবিষয়ক মত অনুধাবন করলেই বোঝা যাবে যে এ বিষয়ে রুচি সবসময়ে রাজনৈতিক বিচক্ষণতা বা মানবিক মহত্ত্বের উপর নির্ভর করে না। লুনাচার্স্কির স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় রাশিয়ায় জারতন্ত্রের আমল থেকে প্রতিষ্ঠিত বলশয় থিয়েটার সম্বন্ধে লেনিনের তীব্র আপত্তির কথা। লেনিন মনে করতেন যে যখন অর্থের অভাবে গ্রামে বিদ্যালয় পরিচালনা সম্ভব হচ্ছে না, তখন অত অর্থ ব্যয় করে একটা জমিদারী যুগের সংস্কৃতিকে ভরণ-পোষণের কি দরকার? মনে হয় লুনাচার্স্কির পৌনঃপুনিক অনুরোধ ও হস্তক্ষেপের ফলেই আজও বলশয় থিয়েটার বর্তমান।

লেনিনের উদার নীতি তাঁকে সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত মতবাদকে কখনই দলীয় নির্দেশের পর্যায়ে নিয়ে যেতে দেয় নি। প্রায়শ আধুনিক শিল্প-সাহিত্য বিষয়ে রায় প্রদানে নিজের অক্ষমতা প্রকাশের সৎসাহস লেনিনের ছিল। কিন্তু তাঁর পরবর্তী শিষ্যরা এই ব্যক্তিগত রুচিকে লেনিনবাদ আখ্যা দিয়ে সোবিয়েত সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের নিয়ম বেঁধে দিয়েছিলেন।

আমাদের দেশেও আজকে হয়তো অনেকেই সুবিধাজনকভাবে বিস্মৃত হয়েছেন যে একবার জাতীয় কংগ্রেসের কোনো অধিবেশনের পূর্বাহ্ণে কিছু কংগ্রেস নেতার পরামর্শে গান্ধীজী নির্দেশ দিয়েছিলেন কোনারকের ভাস্কর্যকে অশ্লীলতার অভিযোগে সিমেণ্ট দিয়ে বুজিয়ে দেবার। নন্দলাল বোসের হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত এই বর্বরতা সংঘটিত হতে পারে নি।

যদিও গান্ধীজীর শিল্প-বিষয়ক রুচিকে এদেশের সাংস্কৃতিক নীতি বলে ঘোষণা করা হয় নি, তাঁর ব্যক্তিগত মতবাদের বিরুদ্ধে কোনো সংগঠিত প্রতিবাদ বা তার পুনর্মূল্যায়নের অভাবে আজকে কংগ্রেস সংগঠনের সঙ্গে স্থূল-রুচিবোধের অনুষঙ্গটা প্রায় অবিচ্ছেদ্য। স্ফীতকায় নির্মননশীলতার এমন যথার্থ প্রতিরূপ জগতে বোধহয় দুর্লভ। যেখানেই নিম্নস্তরের চলচ্চিত্র, সাহিত্য বা সংগীতের সমাদর, সে সমাদরের নেতৃত্ব দেয় কংগ্রেস। এই স্থূলদর্শী নির্বুদ্ধিতার চূড়ান্ত প্রতীক সরকারী সেন্সর বোর্ড যার কর্তব্য চলচ্চিত্র-বিবাচন। চলচ্চিত্রে নর-নারীর দৈহিক সম্পর্ককে যে-দৃষ্টিভঙ্গীতে এই বোর্ডের কর্তৃপক্ষ দেখেন তা রক্ষণশীলতা এবং ইতরামির এক অপূর্ব সমাবেশ। কোনো বিদেশী চলচ্চিত্রে

বক্তব্য ও আঙ্গিকের দিক থেকে উচ্চমানের হলেও যদি তাতে শয়নাগারে প্রেমালাপের দৃশ্য থাকে, তা বক্তব্যের দিক থেকে যত প্রয়োজনীয়ই হোক না কেন, সেন্সরের গোঁয়ার কাঁচিতে তা কর্তিত হবে। অপর পক্ষে, হিন্দী ফিল্মের স্থূল যৌন-আবেগ সংবলিত মূর্খতাপ্রসূত কাহিনীতে বিদেশী চলচ্চিত্র থেকে চুরি করা দৃশ্যের আমদানী বিনা আপত্তিতে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কিছু কিছু দেশে এই জাতীয় ভারতীয় ফিল্মের আকর্ষণ প্রবল বলেই বিদেশ থেকে অর্থ আয়ের দিকে লক্ষ রেখে এই ফিল্মগুলিকে সেখানে পাঠানো হয়। ভারতীয় সংস্কৃতির যথার্থ পরিচয় বিদেশীরা পেলেন কি না সে বিষয়ে সরকারের সাংস্কৃতিক উপদেষ্টারা উৎসাহিত নন যতটা তাঁরা অনুপ্রাণিত হন সস্তা জনপ্রিয়তার বিনিময়ে সরকারী কোষাগার পূর্ণ করায়।

আসলে, প্রায় শুরু থেকেই কংগ্রেসনেতৃত্বের প্রায় অধিকাংশই এসেছেন সমাজের গোঁড়া রক্ষণশীল সম্প্রদায় থেকে। ফলে কখনও কখনও সামাজিক সমস্যা এবং প্রায় সব সময়ই সংস্কৃতির বিচারে এঁরা এক জাতীয় আধুনিক-বিরোধী, বস্তাপচা নীতিজ্ঞানপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করে থাকেন। এক কথায় এ দেশের সংস্কৃতিতে যা কিছু পুরাণধর্মী, পচনশীল, লঘু এবং ফাঁপা যুক্তিশূন্য, তারই ভিত্তিতে কংগ্রেসের সাংস্কৃতিক নীতি দণ্ডায়মান। অতীতের জের টানা এই রক্ষণশীলতা ও রুচিহীনতার সঙ্গে আজকে যুক্ত হয়েছে রাষ্ট্রক্ষমতার নির্বোধ দম্ভ। ফলে মত্ত হস্তীর মতো এ দেশের শাসকগোষ্ঠী সংস্কৃতি সম্বন্ধে যথেচ্ছাচার করছেন। এঁরা মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথকে সম্মান প্রদর্শন করে থাকেন। কিন্তু বর্তমান কংগ্রেসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নামের যুক্তিকরণের মতো অসংগতি আর কিছু হতে পারে না। শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেস সংগঠন সম্বন্ধে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছিলেন: "পৃথিবীতে যে দেশেই যে কোনো বিভাগেই ক্ষমতা অতিপ্রভূত হয়ে সঞ্চিত হয়ে ওঠে সেখানেই সে ভিতরে ভিতরে নিজের মারণ-বিষ উদ্‌ভাবিত করে। ইম্‌পিরিয়ালিজম্ বলো, ফ্যাসিজম বলো অন্তরে অন্তরে নিজের বিষ নিজেই সৃষ্টি করে চলেছে। কংগ্রেসের অন্তঃসঞ্চিত ক্ষমতার তাপ হয়তো তার অস্বাস্থ্যের কারণ হয়ে উঠেছে বলে সন্দেহ করি।" (অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠি, ১৯৩৯)। এ সন্দেহ আজ সত্যে পরিণত হয়েছে। তাই ক্ষমতার তাপে স্ফীতকায় এই অসংস্কৃত সংগঠনটির জাতীয় অধিবেশনে যখন রবীন্দ্রনাথের গান গীত হয় বা নৃত্যনাট্য

অভিনীত হয় তখন মনে হয় যা সবচেয়ে সুন্দর তার সবচেয়ে কুৎসিত অপমান হচ্ছে।

বাঙালি বুদ্ধিজীবীসমাজ

এ দেশের দুর্ভাগ্য যে এই ব্যাপক অর্থ রোজগারপ্রণোদিত নির্মননশীলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে আমাদের বুদ্ধিজীবীরা ব্যর্থ হয়েছেন। এ শতাব্দীতে খুব অল্প বুদ্ধিজীবীকেই দেখেছি আমাদের দেশের সমসাময়িক মূল্যবোধকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নিজস্ব বিচারবুদ্ধির উপর ভরসা করে কিছু সৃষ্টি করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় জনসাধারণের চাহিদার দিকে লক্ষ রেখে না হয় কর্তৃপক্ষের পৃষ্ঠপোষকতায় আমাদের শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে।

ফলে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সংস্কৃতিজগতে একজাতীয় ফাঁপা বাচালতা ও সুবিধাবাদের নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। বেশ কিছুদিন আগে কলকাতার অ্যাকাডেমি অফ্ ফাইন্ আর্টসে একজন খ্যাতনামা ঔপন্যাসিকের চিত্রপ্রদর্শনী হয়ে গেল। তাঁর চিত্রাঙ্কনের চর্চার ইচ্ছা সম্বন্ধে কারুর কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু শিল্প-বিচারে অনুপযুক্ত এই অপটুত্বের প্রমাণগুলি জনসমক্ষে উপস্থিত করার কী দরকার ছিল? সবাই যদি রবীন্দ্রনাথের মতো নিজেদের সংস্কৃতিক্ষেত্রে সব্যসাচী বলে মনে করতে শুরু করেন তাহলে ব্যাপারটার শোচনীয়তা তার হাস্যকতার নিচে চাপা পড়ে যাবে। আসলে উক্ত ঔপন্যাসিকটির এই প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে তাঁর অন্য পরিচয়টা জাহির করার ইচ্ছাটা এত প্রকট ছিল যে এতে তাঁর স্থূল রুচিরই পরিচয় পাওয়া গেল যা তাঁর উপন্যাসেও অধিকাংশ সময়ে প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

নিজস্ব চিন্তাপ্রণালীর ধারা অনুসরণ করে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার পরিবর্তে কোনো মহৎ ব্যক্তির কিছু প্রবণতা বা খামখেয়াল অনুকরণ করার এই যে ছেলেমানুষী, এটা আমাদের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ব্যাপক। এই বাংলাদেশেরই আর-একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক বার্নাড শ'র কায়দায় আত্ম-পরিচয় দেন নিজের নামের আদ্যাক্ষর সাজিয়ে। শ'র Plays, Pleasant and Unpleasant-এর ঢঙে নিজের গল্পের সংকলনকে ভাগ করেছেন উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট শ্রেণিতে। অবশ্য তাঁর রচিত সমগ্র সাহিত্যকর্মকেই নিকৃষ্ট শ্রেণীভুক্ত করলেই বোধ হয় সৎসাহসের পরিচয় দিতেন।

লক্ষ করার বিষয় যে এই উভয় সাহিত্যিকই কংগ্রেসের গর্ব। অবশ্য

অ-কংগ্রেসী বা অন্য দলভুক্ত বা নির্দলীয়—সমস্ত বুদ্ধিজীবীদেরই মধ্যে এই সব প্রবণতা কম-বেশি উপস্থিত। সাহসী বিচারদক্ষতার অভাবের ফলে এদেশের সমালোচকেরা নন্দনতাত্ত্বিক বিচারে কোনটা ভালো ও কোনটা খারাপ পার্থক্য করতে গিয়ে প্রায়শঃই গোলমাল করে ফেলেন। চলচ্চিত্র-বিচারে এ প্রবণতাটা ভীষণ চোখে পড়ে। মামুলি গল্প নিয়ে তোলা, টেকনিকের অনেক মারপ্যাচ সংবলিত ও কিছু কিছু কায়দা করে বলা সংলাপ ছড়ানো কোনো বাংলা ফিল্ম্ বাজারে মুক্তিপ্রাপ্ত হলেই সমালোচকেরা তাকে হয় 'নিউওয়েভ' নয় 'এগ্‌জিস্টেন্‌শিয়ালিস্ট' বলে সমাদর জানাবে।

বর্তমান বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যাঁরা অগ্রগণ্য, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীতে আধুনিকতা খুব অসম্পূর্ণ ভাবে উপস্থিত। এমন কবি আছেন জানি, যিনি কাব্যরচনায় আধুনিক কিন্তু উপন্যাস বা ফিল্ম্ নির্বাচনে রক্ষণশীল। কলাশিল্পের বিভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধে সুসমন্বিত রুচি আয়ত্তের অক্ষমতা ছাড়াও, আমাদের বুদ্ধিজীবীদের আধুনিক মূল্যবোধের প্রতি সপ্রশংস আকর্ষণ এবং দৈনন্দিন জীবনে ঠিক তার বিপরীত আচরণের যে দ্বন্দ্ব, তা এ দেশের বুদ্ধিভিত্তিক আন্দোলনকে পঙ্গু করে রেখেছে। বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে একই ব্যক্তির অসম মনোভাব এবং যুক্তির প্রবণতা অনুসারে কাজ করার সাহসের অক্ষমতা এত শোচনীয়রূপে আর কোনো দেশে উপস্থিত কিনা জানি না। বার্ট্রাণ্ড রাসেল বৃদ্ধ বয়সেও নিজের বিশ্বাসের সমর্থনে রাস্তায় নেমে সত্যাগ্রহ করতে পিছু পা হন নি। আলজিরিয়ার মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতির জন্য সার্ত্র'র স্বার্থত্যাগের কথা সর্বজনবিদিত; প্রচলিত রীতি ও কর্তৃপক্ষের বিচারক্ষমতার প্রতি তাঁর বেপরোয়া অবিশ্বাসের চূড়ান্ত নিদর্শন নোবেল পুরস্কার গ্রহণে অস্বীকৃতি। এ জাতীয় নজির আমাদের দেশে বিরল। সাম্প্রতিক কালে একমাত্র শিশির ভাদুড়ির কথাই মনে পড়ে, যিনি নিজের শিরদাঁড়া শক্ত ও সোজা রেখে নাট্যশিল্প ও নিজস্ব বিশ্বাসের প্রতি সর্বাগ্রে আনুগত্য প্রদর্শন করে ব্যবসায়ী স্বার্থকে পদাঘাত করেছেন।

আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় যে এ দেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এক জাতীয় শ্রেণীবিভেদ স্পষ্ট। উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজের সুশিক্ষা, সুরুচি, সুসংস্কৃত আচার-বিচার ইত্যাদি মূল্যবোধকে কেন্দ্র করে একটা শ্রেণী গড়ে উঠেছে। মার্জিত, আকর্ষক বহু গুণ থাকা সত্ত্বেও একজাতীয় উন্নাসিকতা ও গোষ্ঠীবদ্ধতা এই শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের দেশের আপামরসাধারণ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে

দিয়েছে। অপর দিকে সাধারণ মধ্যবিত্ত ও বিশেষ করে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দারিদ্র্য ও স্বল্পশিক্ষার মধ্য দিয়ে যে-বুদ্ধিজীবী গড়ে উঠেছে তাদের জীবনে ও শিল্প-চর্চায় বা শিক্ষানবিশিতে এক জাতীয় বিশৃঙ্খলা আছে। কিন্তু তাদের মানসিকতায় যে নিঃস্বার্থতা, যে প্রাণ-প্রাচুর্য, যে দরদ তা উচ্চশ্রেণীভুক্ত বুদ্ধিজীবীদের জীবনে সংযমশিক্ষায় প্রকাশে বাধা পায় এবং হয়তো অতিনিয়মের শিক্ষার ফলে হারিয়ে গেছে। একদিকে আধুনিক মূল্যবোধ আয়ত্তের অবাধ সুযোগ এবং তজ্জনিত উন্নাসিকতা ও কাঠিন্য; অন্যদিকে সুশিক্ষার শৃঙ্খলার অভাব এবং হৃদয়বৃত্তির প্রাচুর্য।

এই দ্বিধা-বিভক্ত, পঙ্গু বুদ্ধিজীবী এ দেশের ক্রম ব্যাপক স্থূল নির্মননশীলতার বিরুদ্ধে কোনোদিনই হয়তো সংঘবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে 'ইন্টেলিজেন্ট্‌সিয়া' রূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন না। কারণ স্বার্থ, ফাঁপা বাচালতা, সুবিধাবাদ, ইত্যাদি 'ফিলিস্টাইন' বহু দোষ এঁদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে। তাই এঁদের সৃষ্টিকর্মে ভেজাল; সংস্কৃতির প্রয়োজনীয় গুণাবলীর পরিবর্তে ব্যবসাগত বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যর গোপন অপমিশ্রণ ঘটেছে। এ দেশের সত্যনিষ্ঠ যে মুষ্টিমেয় বুদ্ধিবাদী ও শিল্পী-সাহিত্যিক এখনও মাঝে মাঝে চোখে পড়ে, হয়তো কেবলমাত্র তাঁদের সৃষ্টিই 'ফিলিস্টিনিজ্‌মের' বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হতে পারে। কারণ, সৌন্দর্যসৃষ্টিই শিল্পের প্রাথমিক কর্তব্য। অতীতে, বহু সময়ে দেশের জন্য বা কোনো ন্যায় আদর্শের জন্য শিল্পীরা তাঁদের তুলি বা কলমকে তরোয়ালের মতো ক্ষুরধার করেছেন। আন্দোলনের জোয়ারে অনেক সময় শিল্পী তাঁর প্রাথমিক কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। সে বিচ্যুতির ফল বোধহয় আমাদের দেশে আধুনিককালে সবচেয়ে মারাত্মক হয়েছে। কারণ, সেই প্রাথমিক কর্তব্য থেকে শিল্পী অনেক দূরে সরতে সরতে স্বধর্ম হারাতে বসেছেন।

সৌন্দর্যসৃষ্টির অর্থ ললিতলবঙ্গলতার প্রলেপ নয়। আত্ম-সন্তুষ্ট স্ফীতকায় ব্যবসায়ী মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে বোদলেয়ারের কলাকৈবল্যবাদ ছিল দুঃসাহসিক সংগ্রামের হাতিয়ার। কিংবা রবীন্দ্রনাথের কথাগুলি স্মরণীয়, "যথার্থ সৌন্দর্য জিনিসটি মোহ নয়, মায়া নয়, তা দশজনের চোখ ভোলাবার ফাঁদ নয়— সৌন্দর্য হচ্ছে সত্য। যতক্ষণ সৌন্দর্যসৃষ্টির মধ্যে সত্যের সেই স্বাভাবিক দৃঢ়তা প্রশস্ততা কঠোরতা পাওয়া যাবে না, ততক্ষণ তার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর স্থাপন করা যেতে পারবে না।" (মুকুল দে-কে লেখা চিঠি, ১৯১৩)। সত্যের

এই কঠোর মূর্তি সৃষ্টি করতে সাহসের প্রয়োজন, শিল্পীর নিজেকে সস্তা চোখ-ভোলানো অসুন্দরের মোহ থেকে মুক্ত করা দরকার। ধনী-দরিদ্রের শ্রেণী সংগ্রামের নেতৃত্বপদে একমাত্র শ্রমজীবী সম্প্রদায়কে কার্ল মার্ক্‌স্‌ নির্বাচন করেছিলেন এই কারণে যে তারা একেবারে নিঃস্ব, কোনো বন্ধন নেই, একমাত্র ধনতন্ত্র-আরোপিত শৃঙ্খল ঘোচানো ছাড়া আর কোনো কর্তব্য নেই। ভবিষ্যতে 'ফিলিস্টাইন'-দের বিরুদ্ধে ইণ্টালিজেণ্ট্‌সিয়ার সংগ্রামের নেতৃত্ব নিতে হবে শিল্পী-সাহিত্যিকদের। সত্য ও সুন্দর, সে যত রুক্ষই হোক, তাদের প্রতি আনুগত্য ছাড়া আর কিছুর প্রতি যেন তাঁদের বশ্যতা না থাকে, কারণ নিজেদের চিন্তা থেকে অসুন্দরের মোহ বন্ধন ঘোচানো ছাড়া তাঁদের আর কোনো কর্তব্য নেই।

কল্যাণ রায়

পঞ্চমী

এক

বসন্ত—

সবুজে সবুজে একাকার।

শুধু কাঞ্চনজঙ্ঘা

হিমে ঢাকা।

দুই

বার্ধক্য আসবে

আগে যদি জানতাম

তাহলে—

দরজা বন্ধ করে রাখতাম

আর বলতাম—

"বাড়ি নেই, বাড়ি নেই

দেখা হবে না"।

তিন

তুমি আসবে

না

আমি যাব—

ভাবতে ভাবতে

ঘুমিয়ে পড়লাম

দরজাটা কিন্তু

খোলাই ছিল।

চার

গভীর রাত্রি।

সে লিখেই চলেছে
খাতার পর খাতা।
পাশে স্ত্রী
সামনে স্তূপাকার
পাড়া পড়শীর
সেলাইর জামা আর কাঁথা।

পাঁচ

আমার ছোট ছেলে
বয়েস কত আর ?
কুড়িও হয়নি।
পাকা জুয়াড়ী
যদিও ফেরার।
তবুও দেখি তার
জননী রোজ যায়
গভীর রাত্রিতে
শিবের মন্দিরে
প্রভু ও যেন কভু জুয়োতে না হারে
পুলিশ যেন ওর নাগাল পায় না।
থাক্‌ ও চিরকাল ফেরার হয়ে।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

তোমার ক্ষমায় স্নাত

মেঘের খোঁপায় ফুটেছে আলোর ফুল
তোমাকে কি দেব অনন্ত উপহার
কোন ঘাটে পার
হতে চেয়েছিলে খুঁজে অনুকূল হাওয়া
নাবিক বাহ নি, এ নৌকা বেয়ে যায় কি সুদূরে যাওয়া

ভাব নি, নরম অঙ্গুলি খুলে ফুল
ভাসালে তোমারে রাজহাঁস বলে—সব ভুল সব ভুল।

কথায় কথায় বয়ে গেল বেলা
জল ঝরে গেল মেঘে
বুকের গভীরে কি শঙ্কা ছিল জেগে
বলেনি বাচাল মুখ,
কথার সাঁকোয় হৃদয়ের আসা-যাওয়া
হয় নি, সমুৎসুক
অধীরতা প্রাণে এসে ফিরে গেছে পাহাড়তলীর হাওয়া :

এখন জেনেছ নীরবতা কত ভাল
ক্ষীণ সম্বল
নিবিড় আঁচলে ঢেকে দিলে অনুপমা
বুঝেছ আমার সকল চাতুরী ছল
জলপ্রপাতে প্লাবিত তোমার চোখের তরল ক্ষমা।

তপন মুখোপাধ্যায়

ছাই

বেড়াতেই গিয়েছিলাম ওদের বাড়িতে।
অ্যাসট্রেতে সিগারেটটা শোয়ানো ;
গালে হাত, কোনও কথা নেই
আমরা মুখোমুখি বসে
আমাদের কোলে খেলা করছে ছেলেমানুষ স্মৃতি।
কানায় কানায় জীবনটা যখন তলানিতে এসে ঠেকেছে
আমি উঠে পড়লাম
দরজা খুলতে যাব হঠাৎ ও আমাকে বলল :
'তোমার সিগারেট?'
প্যাকেটটা খালি।
তাকালাম :
অ্যাসট্রেটা ভরে গেছে ছাইয়ে।

শক্তি হাজরা

ভবিতব্যের তিথি

কলকোলাহল ক্রমশ নিকট হয়,
উপক্রমের সোপানে চরণ চিহ্ন ;
অলস বিলাসী মন্থর যতি নয়,
গ্রথিত সূত্রে সহস্র বিচ্ছিন্ন।

মৃদু মেঘ তবু জলসঞ্চারী হাওয়া,
তরঙ্গ-তটে আহত অবিশ্বাস,
স্ফীত সঞ্চয় উজানী নৌকা বাওয়া
অতলে লুব্ধ গুপ্ত তিমির ত্রাস।

প্রচলিত নদী সুস্থির পারাপারে—
বহতা নিয়মে বিগত রাত্রি দিন ;
সহসা পালের গর্বিত বিস্তারে,
আসন্ন ঝড় আকাশে সম্মুখীন।

অতএব যত পণ্য প্রাণীর মুখে
আর্তি ব্যাকুল ধন সম্বল ধ্বনি ;
তীক্ষ্ণ তিক্ত নিষ্ঠুর সম্মুখে,
অতলান্তিক গম্ভীর মারণ খনি।

যেহেতু যাত্রা নতুন তীর্থপথে,
বহমানতার দু'পাশে সবুজ তীর,
অযুত যাত্রী অপ্রতিরোধ্য রথে,
সে হেতু লক্ষ্যে লক্ষ মুখের ভিড়।

তোমাকেও ডাকি রাখীবন্ধনে, যার
শ্রমের সত্যে স্বপ্নের চারুকলা ;
শস্যে পুষ্পে মাণিক্য সম্ভার,
রত্নে স্বর্ণে ধরণী সমুজ্জ্বলা।

কলকোলাহল ক্রমশ নিকটতর।
রাখীবন্ধনে সেতুনির্মাণ শেষ—
ভাঙবে শিলার অক্ষয় নির্ভর,
উর্বর হবে উজ্জ্বল মহাদেশ।

শুধু জবাব দিত ছাত্তে, খোকার কাছে রেণু আছে। যেমন হঠাৎ আসতো তেমনি হঠাৎ একদিন খোকা বলতো—"আজ কলকাতা যাবো মা, অনেক ক্লাস কামাই হচ্ছে।" আমি বুঝতাম—বিশ্রামে-বিশ্রামে ভেতরে-ভেতরে খোকা ক্লান্ত হয়ে উঠেছে। তাই আবার ঝড়ে, আবার কলকাতায়।

এখন আমার মনে হয়, বাবা হিসেবে তো খোকার অস্থিরতায় আমার খুশি হওয়া স্বাভাবিক ছিল না। চিরকালই তো শর্তহীন বশ্যতায় আমি অভ্যস্ত। খোকা যদি শান্ত-শিষ্ট গোবেচারা হয়ে কলকাতায় থেকে পড়াশুনা শেষ করে ফিরে আসতো তবেই তো আমার খুশি হওয়া উচিত ছিল। এমন উট্‌কো অস্থির, টালমাটাল খোকাকে দেখে আমার গোপন আনন্দ হতো কেন। বোধহয় এক খোকার কাছ থেকেই আমি অধীনতা চাই নি। জ্যেষ্ঠপুত্র সে। তার কাছ থেকে বোধহয় আমি নিজেকেই ফিরে পেতে চেয়েছিলাম। শাজাহান ভোগী ছিলেন, তাই শিল্পী হতে পেরেছিলেন। মমতাজ ব্যতীত দ্বিতীয় নারীতে তিনি আকৃষ্ট হন নি। এবং তার মূল্য হিসেবে এক মমতাজের গর্ভেই ষোলটি সন্তান উৎপাদন করেছিলেন। শুনেছি ষোড়শ সন্তান প্রসবকালে মমতাজ মারা যান। এত ভোগী ছিলেন বলেই শাজাহান দারাশিকোহ্ বা সুজার চাইতে অনেক বেশি অন্ধ ছিলেন ঔরংজেবের প্রতি। কেন না ঔরংজেবের ভোগক্ষমতা ছিল শিল্পীর কল্প—সুজার মতো কাপুরুষোচিত নয়। ঔরংজেবের বৈরাগ্য ছিল সম্রাটের বৈরাগ্য—দারার মতো দার্শনিকোচিত নয়।

যৌবন নিয়ে খোকার আলোড়ন আমাকে তাই আনন্দ দিত, খুশি করতো। কলকাতা থেকে এলে, সে ছুটিছাটাতেই হোক, আর হঠাৎ-ই হোক—খোকা ছাতেই থাকতো বটে, তবে দু' একবার লক্ষ করেছি ও এ-বাড়ির কিছু কিছু বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করছে। এ বাড়িতে সমস্ত কিছুই আমি নির্ধারণ করি—সপ্তাহে কদিন ক-টাকার বাজার হবে থেকে শুরু করে, জলের পাম্প কখন খোলা হবে, কখন বন্ধ হবে। নূতন কাপড়িশ বের করতে হলেও রেণু এসে আমাকে জিজ্ঞেস করে, এমন কি গ্রামোফোন ও রেকর্ডও আমার আলমারিতে চাবি দেয়া থাকে, কোনো বাল্‌ব বদলাতে হলেও আমিই বাক্স থেকে বের করে দিই। সেক্ষেত্রে পরিবারের আর আর সবারই স্থান ছিল গৌণ। নেহাতই তারা পরিবারের অন্তর্গত মাত্র, তার অতিরিক্ত এক বিন্দুও নয়। অথচ দু' একবার খোকাকে দেখেছি বাড়ির সামনে বাগানে সকালে-বিকেলে কাজ করছে। বলা বাহুল্য সেই বাগানটির প্রতিটি ঘাসের উপরও একমাত্র আমারই কর্তৃত্ব।

আজ মনে হয়, ঠিক আজ না, খোকা যখন বাগানে একটু-আধটু আগ্রহ প্রকাশ করতো তখনই মনে হয়েছিল, বাগানটা ঠিক আমার কর্তৃত্বে না রাখলেই ভালো হতো। কারণ, বাড়ির সামনে একটু বাগান থাকবে—এর বেশি কিছু আমার মাথায় ছিল না। লোহার গেট পেরিয়েই সিঁড়ির একটু আগে দু' পাশে দুটি ফার্ন গাছ লাগিয়েছিলাম। দুদিকের বাগানের মাঝখানে দুটো পাম বোনা হয়েছিল। দুদিকের বাগানের সীমানায় মেহেদি গাছের বদলে চা-গাছ একসার, কলমছাঁটা হলে দেখতে সুন্দর, তাদের মধ্যে কিছু কিছু মরে গেছে, কিছু কিছু বড় হয়ে গেছে; বাগানের সীমাটা একটু অতিক্রম করে সারি-সারি নারকেল গাছ—এখন তার পাতার ঝালর, ছাতে বসলে, দোলে। এটা একটা নেহাতই বাগানের প্রথা মাত্র, বাগান নয়। সত্যিকারের বাগানের অন্য চরিত্র দরকার। বাগানের দিকে তাকালেই মুহূর্তে প্রকৃত স্রষ্টার কাছে রচয়িতার চরিত্র ধরা পড়ে। চারিত্র্য চিরকালই আমার কাছে অনুপস্থিত। বাগানটার কথা ভাবলে সেটা ধরা পড়ে—ধরা পড়ে যে দুটো অযত্নপালিত পাম, কি, বাগানের উপান্তে একটা কাঠগোলাপের গাছ—এটা বাগানের সংজ্ঞা নয়, সংজ্ঞার অনুকরণ। ধরা পড়ে আরো বেশি করে যখন খোকার আকস্মিক, অনিয়মিত, খামখেয়ালি বাগানচর্চার কথা মনে আসে বা তার দু একটা স্মৃতিচিহ্ন—যা আজও বাগানে ছড়িয়ে—চোখ যায়। খোকা একটা স্থলপদ্ম গাছ পুঁতেছিল, আজো সেটাতে ফুল ফোটে, কিন্তু গাছটা এমন একটা ছায়াতে যেখানে কোনো সময়ই আলো পৌঁছয় না। তাই গাছটাতে ফুল ফোটে, কিন্তু সে ফুলের রং বদলায় না। চারিত্র্যের কথা বলছিলাম। গাছটাতে কোনো চরিত্র নেই। চরিত্র আছে গাছটির স্থান নির্বাচনে। রৌদ্রে যে-ফুল রক্তে নিরতগভীর হয়, তাকে এমন ছায়ায় খোকা রোপণ করলো। ফুলগুলির নিরক্তিমতা খোকাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। লোহিতকণিকা নেই ফুলগুলির, খোকা শোষণ করেছে। সিঁড়ির পাশে এক শেফালি ফুলের চারা বুনেছিল। ফুল ঝরে ঝরে সিঁড়ির ডানদিকটা বেদীর মতো হয়ে ওঠে, আর দোতলায় আমার শোবার ঘরের বারান্দা থেকে সুবাস পাওয়া যায়। সে গন্ধে খোকাকে মনে পড়ে না, অথচ সারাটা বছর পাতাশূন্য, নিষ্ফুল গাছটির শুকনো কুৎসিত ডাল অবধারিত খোকাকে মনে পড়ায়। আর বেশি কিছু বলতে পারছি না—খোকার বাগান নিয়ে।

বাড়ির একেবারে পশ্চিম-দক্ষিণ সীমার বিন্দুটিতে একটা কদম গাছ।

শুনেছি সেটা নাকি খোকারই বোনা। অথচ গাছটার কোথাও বপনকারীর স্বাক্ষর নেই। বিশেষভাবে না তাকালে বোঝাই যাবে না শেকড়টা আমার জমিতে। পথের পাশের গাছের মতো তার হাবভাব। কিন্তু যতবার বাড়ি থেকে বেরোই, আর যতবার বাড়িতে ফিরি সেই কদমের ছায়া, ঝরা-পাতা, দু' একটা ছোট ডাল, পাখিরা খোকাকে মনে পড়িয়ে দেয়, যেন খোকা দেয়ালের ওপাশ থেকে মুখ বাড়িয়ে আমাকে চমকে দিচ্ছে। আর বর্ষায় কদমের ভারি গন্ধে আমার রক্তস্রোত মন্দ হয়ে আসে,—খোকার জন্মের পর দুক্কলকারে রেণুর স্তন এমনি ভারি হয়ে উঠতো বোধহয়। ফুলের নাম বললে নাকি ভাগ্য গণনা করা যায়। ফুলে-ফুলে খোকা নিজের ভাগ্য লিখে রেখে গেছে। এই বাগানটি খোকার করকোষ্ঠি।

আমার এই বাগানটিতে গোটা কয়েক ফুলগাছ বুনে খোকা যে-পাদটীকা লিখে রেখে গেছে তা কি নিয়ত এই বলে যে—আমার চরিত্র নেই! অথচ এই চরিত্র নামক একটা ধারণা তৈরি করতে আমাকে কত কিছু আয়ত্ত করতে হয়েছে। যে-প্রতিষ্ঠানের আমি একজন সামান্য বেতনভুক্ কর্মচারী ছিলাম, আজ সেই প্রতিষ্ঠানেরই আমি অন্যতম মালিক। তার একমাত্র কারণ আমার চরিত্র সম্পর্কে ধারণা,—সে ধারণা আমি সযত্নে সৃষ্টি করেছিলাম। পড়াশুনা তো মিথ্যে শিখি নি। এই ব্যক্তিগত শিল্প-প্রতিষ্ঠানে চাকরি নেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই শিল্পটির ঐতিহাসিক পরিবেশ বুঝতে পেরেছিলাম। প্রায় একশ বৎসর আগে এই বিশেষ শিল্পটিতে যখন ভারতীয় মূলধন প্রথম প্রবেশ করে তখন তার পেছনে বিদেশী মূলধনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একটা অনেক বড়, প্রায় একমাত্র তাগিদ ছিল। পরে যখন লাভও পাওয়া গেল, তখন একই সঙ্গে বিদেশী মূলধনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর ভারতীয় মূলধন বিনিয়োগের নতুন পথ একাকার হয়ে গেল। এবং পরে যখন ক্রমে ক্রমে আরো বেশি পরিমাণ ভারতীয় মূলধন এই শিল্পে বিনিয়োজিত হতে লাগলো, তখন বিদেশী মূলধনের সঙ্গে লড়াই করে স্বদেশী মূলধনের লাভ বাড়ানোটা জাতীয় আন্দোলনেরই অংশ হয়ে গিয়েছিল। বর্তমান মালিকদের পিতাগণ সেই সময় এই শিল্পটিকে সম্প্রসারিত, সংগঠিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত আকার দিয়ে যান। বর্তমান মালিকগণের অধিকাংশই সেই স্থায়ী শিল্পের উত্তরাধিকারী হয়েই ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। ফলে এদের সময় শিল্প ও উৎপাদনের সঙ্গে মালিকদের সম্পর্ক ক্রমশ শিথিল হয়ে এসেছে। আজ মালিকদের সঙ্গে এই

শিল্পের উৎপাদনগত সম্পর্ক কিছু নেই। আছে মাত্র শেয়ারগত সম্বন্ধ। অপরদিকে এই শিল্পের সম্প্রসারণের ঋজু-রেখা একটা চরমবিন্দুতে গিয়ে ঠেকেছে।—বর্তমান পরিবেশে সেটাকেই চরমবিন্দু বলা যেতে পারে। তার অধিকদূর অগ্রসর হতে হলে সমস্ত কাঠামোর এই বিশেষ উৎপাদনের বাজারের ভৌগোলিক সম্প্রসারণ দরকার। সুতরাং সম্প্রসারণের পথরুদ্ধ মূলধনের মালিকানাই এখন প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র। বাজারে ছড়ানো শেয়ারগুলিকে যে যত পারে এখন নিজের অধীনে আনার চেষ্টা করছে। আর কোম্পানির উপর যখন যার কর্তৃত্ব, সে তত বেশি করে লাভের বখরা নিচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে আর কেউ এর কর্তৃত্ব নিতে পারে—এই ভয়ে। ঐতিহাসিকভাবে এই শিল্পকে তিনভাগে ভাগ করা যায় :

প্রথম পর্ব—১৮৮৫ থেকে ১৯০২-৩ সাল—বিদেশী মূলধনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা, দেশী মূলধনের প্রবেশ।

দ্বিতীয় পর্ব—১৯০২-০৩ সাল থেকে ১৯৪০-৪২ সাল—দেশী মূলধনের ক্রম-সংহতি, ক্রম-স্থিরতা ও স্থিতি-স্থাপকতা লাভ। লাভের নিয়মিত হার। ফলে ক্রমসম্প্রসারণ।

তৃতীয় পর্ব—১৯৪০-৪২ সাল থেকে বর্তমানকাল—উৎপাদনের সম্প্রসারণশীলতা-রোধ, ফলে মূলধন সঞ্চারের পথরোধ, ফলে মূলধনের মালিকানাগত প্রতিযোগিতা।

এই তৃতীয় পর্বে অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবে আমি এক কোম্পানিতে চাকরি নিই। কোম্পানিটি প্রায় প্রথমদিকে এই শিল্পে যে-কটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাদের একটি। যাকে—সাধারণত এই সব পুরোন কোম্পানির ক্ষেত্রে যা হয়,—কোম্পানিটির প্রাথমিক মালিকানা ছিল পারিবারিক। শুনেছি বসু-রা ছিল পাঁচভাই। দেশের জমিজমা বেচে এখানে এই কোম্পানির প্রতিষ্ঠা করেছিল। পরে গত পঞ্চাশ বৎসরে ঐ পাঁচ ভাইয়ের পরিবার হয়ে দাঁড়িয়েছে পাঁচ শ' জনের। তাদের মধ্যে সবাই তো আর এ ব্যবসাতে আগ্রহী ছিল না। ফলে অনেকে তাদের অংশ বেচে দিয়েছে। এই করতে করতে অবস্থাটা তখন এমন যে যদিও তখন পর্যন্তও কোম্পানির উপর বসু-পরিবারের, পরিবারের বলা উচিত নয়, আসলে মনোমোহনবাবুর কর্তৃত্ব ছিল, তবে সেটা

যে-কোনো সময় চলে যেতে পারতো। বিশেষত এই বিশেষ শিল্পের ক্ষেত্রে নবাগত একজন মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী যেখানেই এই কোম্পানির শেয়ার পাচ্ছিলেন, সেখান থেকেই শেয়ার কিনছিলেন। সুতরাং নিয়ামক-শেয়ার যে-কোনো সময়ই মনোমোহনবাবুর হাত থেকে খসে যেতে পারে।

আমি যখন চাকরিতে ঢুকি তখন কোম্পানির সঙ্গে মনোমোহনবাবুর সম্পর্ক দ্বিবিধ। প্রথম—যে-কোনো প্রকারে ও যত প্রকারে হোক্ কোম্পানির কাছ থেকে টাকা নিতে হবে। দ্বিতীয়—তাঁর নিজের অর্থবল ছিল না, সুতরাং তাঁর বশংবদ ব্যক্তিদের দিয়ে বন্ধু-পরিবারের অবিক্রীত শেয়ারগুলি কিনিয়ে ফেলতে হবে। এইভাবে কোম্পানির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সেই বৎসরই শেষ হয়ে যেতে পারে এই আতঙ্ক থেকে তিনি যত পারেন কোম্পানিকে শুষছিলেন। আর যাতে শেষ না হয়ে যায় তাই ছিদ্রপথ সামলাচ্ছিলেন। এই দুই কাজেই তিনি আমাকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাই আমি ধনী। তাই আমি আজ ঐ কোম্পানির অন্যতম মালিক।

সমস্ত ঘটনাকে এত বৎসরের ব্যবধান থেকে যখন লক্ষ করি আমি মনোমোহনবাবুকে তারিফ না করে পারি না। কী অসামান্য পর্যবেক্ষণশক্তি! নইলে আমাকে আবিষ্কার করলেন কী উপায়ে? বেচারা খোকা, আমার সঙ্গে লড়তে এসেই হেরে গেল। মনোমোহনবাবুর মতো প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতে পড়লে তো ও গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যেত। নিজের অনুমানকেই বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে মেনে নিয়ে নির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করা আমার রীতি। তাই পাশাপাশি অনেককে আমি ঠেলে সরিয়ে নিজের পথ পরিষ্কার করে নিতে পেরেছি। কিন্তু আসলে তেমন কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি হলে আমাকে যে, একবার কেন সাতবার ভাবতে হয় তার প্রমাণ খোকাকে নিয়ে আমার এই ভাবনার স্রোত। কিন্তু মনোমোহনবাবু নিজের মতটাকেই একমাত্র সত্য বলে বিশ্বাসই শুধু করতেন না; এক দ্বিধাহীন নিষ্ঠুরতায় সমস্ত বিকল্প পথের চিন্তাকে হত্যা করতেন। নইলে আমাকে উনি বেছে নিলেন কী করে। সাধারণভাবে এই সমস্ত অফিসে যাঁরা কেরানির কাজ করেন তাদের মধ্যে গ্রাজুয়েটই খুঁজে পাওয়া যায় না। আমি ছিলাম এম-এ। সাধারণত এই কাজ করতে গেলে কোনো একজন ডিরেক্টরের বশংবদ মোসাহেব হয়ে থাকতে হয়। আমি তা ছিলাম না। সাধারণত এই সব অফিসে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা অধিকাংশই স্থানীয় পরিচিত লোক। আমি বাইরের লোক, স্থানীয় ভাবে অপরিচিত।

ঠিক এই সমস্ত কারণেই মনোমোহনবাবু আমাকে বেছে নিয়েছিলেন। স্থানীয় পরিচিত কারো মাধ্যমে শিল্পের একেবারে হৃৎপিণ্ডে নল বসানোয় অনেক অসুবিধে ছিল। আমার উচ্চশিক্ষা, অপরিচয়, গাম্ভীর্য, অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্নতা—ইত্যাদিতে বোধহয় মনোমোহনবাবু বুঝতে পেরেছিলেন যে আমি শক্ত মাটি, এবং কষ্ট করে নল যদি আমার মধ্যে দিয়ে একবার প্রবেশ করানো যায় তবে তা নিশ্চিতরূপে কোম্পানির বুকের রক্ত টেনে বের করে আনতে পারবে। পরে আমি অনেক ভেবেছি মনোমোহনবাবু এই বোঝাটা বুঝতে পারলেন কী করে। পরে আমি অনেক ভেবেছি মনোমোহনবাবু আমাকে যেভাবে বুঝতে পেরেছিলেন আমি যদি অন্যকে সেই অব্যর্থ বুঝতে পারতাম। পরে আমি অনেক ভেবেছি মনোমোহনবাবুরা তিন-চার পুরুষের শিল্পপতি, তাই এই বোঝার ব্যাপারটা মজ্জাগত হয়ে গেছে। আমি তা নই, সুতরাং আমার কাছে এটা বিস্ময়কর। যদি আমার পরে খোকা এই সম্পত্তির মালিক হতো, খোকা আমার চাইতে অনেক ভালো বুঝতে পারতো। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় গড়ে ওঠে বংশগতভাবে।

কিন্তু সেই প্রথম সূত্রপাতের ঘটনার দিকে যদি তাকাই তা হলে তাকে অন্যরকম ভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়। তা হলে মনোমোহনবাবুর মধ্যে কোনো চরিত্র-অনুধাবনশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। শুধু পাওয়া যাবে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রতি একনিষ্ঠা। ঘটনাটা এই। আমার চাকরির মাস চার-পাঁচ পরে কোম্পানির জেনারেল মিটিং হলো। সেবারও মনোমোহনবাবুই কর্তা রয়ে গেলেন। কোম্পানির বাজেটে কিছু নূতন যন্ত্রপাতি কেনার ও কিছু নূতন উৎপাদন শেড বাড়ানোর ব্যবস্থা ছিল। আমি ঠিক এগুলো খেয়ালও করি নি। মিটিং হয়ে যাওয়ার মাস দু' তিন পর একদিন গোটা বারোর সময় মনোমোহনবাবু ফোনে বললেন অফিস থেকে ফেরার সময় যেন তাঁর বাড়ি হয়ে যাই। আমি যাব বলে দিলাম। এবং বিকেলে খানিকটা অনিচ্ছুক মন নিয়েই গেলাম।

মনোমোহনবাবু তাঁদের বাইরের লম্বা বারান্দাটাতে হেলানো বেঞ্চির উপর লুঙ্গি পরে বসে আরো দুচারজনের সঙ্গে গল্প করছিলেন। আমি গেট দিয়ে ঢোকার পর থেকেই উনি আমাকে দেখতে পেয়েছিলেন, কিন্তু আজো আমার মনে আছে বারান্দার বেশ কাছাকাছি চলে আসার পরও যখন আমি মুখে একটা নীরব হাসি ফুটিয়ে তুলেছি, তিনি আমার দিকে

তাকান নি, অথচ আমার পাশ দিয়ে তাকিয়েই কথা বলে যাচ্ছিলেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠে বেঞ্চির কাছে পৌঁছতে-পৌঁছতে আমার আজো মনে পড়ে, একটু অপ্রস্তুতভাবেই হাসিটা মুছে ফেলেছিলাম। মনোমোহনবাবু ও অন্যান্যরা এক বেঞ্চেই বসে ছিলেন। পাশাপাশি অন্য কোনো আসন ছিল না। মোট চারজন ছিলেন। আমাকে নিয়ে পাঁচজন। বেঞ্চিটা বড় ছিল। স্বচ্ছন্দে ছজন বসা যায়। কিন্তু মনোমোহনবাবু দু' পা তুলে বসেছিলেন, শুধু তাই নয়, বাঁ হাতটা একটু ছড়িয়ে খানিকটা হেলান দিয়ে। ফলে বাকি তিনজন পরস্পর সংলগ্ন হয়ে বেঞ্চির বাকি অংশে ছিলেন। আমি যখন বেঞ্চির একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, বাকি তিনজন নীরবে একটু চাপাচাপি করে জায়গা দিলেন, আমি তার মধ্যে বসলাম। সেটাকে ঠিক বসা বলা উচিত নয়; একজন এগিয়ে, একজন পিছিয়ে, ন্যূনতম জায়গায় অধিকতম লোকের অবসংস্থান বলা যায়। আজো মনে পড়ে একটু অপ্রস্তুত বোধ করেছিলাম। ছাতাটা দুই হাঁটুর মাঝখানে রেখে তার হাতলের উপর এক হাতের পাঞ্জার উপর আর-এক হাতের পাঞ্জা রেখে তার উপর থুতনি দিয়ে বসেছিলাম।

মনোমোহনবাবু কী প্রসঙ্গে কথা বলছিলেন, কিছুই খেয়াল করি নি। বাকি তিনজন হেসে ওঠায় আমি খানিকটা সন্ত্রস্ত হয়েছিলাম। তখন একটু মনোযোগ দিয়ে বুঝলাম, গল্প হচ্ছিল কোনো একটা পুরোন ঘটনা নিয়ে। আমি আরো একটু অপ্রস্তুত হলাম। গালগল্পে যোগ দিয়ে নিজের অপ্রস্তুত ভাবটাকে যে একটু দূর করবো তারও উপায় ছিল না। অথচ সমবেত হাসির মধ্যে নিজের নীরবতা আরো পীড়াদায়ক। যতদূর আন্দাজ করতে পারছিলাম প্রায় আধঘণ্টা-পঁয়তাল্লিশ মিনিট আমাকে অনুরূপ বসে থাকতে হয়েছিল। এর মধ্যে মনোমোহনবাবু একটা কথাও আমাকে বলেন নি। শুধু একজন ভদ্রলোক উঠে গেলেন বলে আমরা একটু ঠিক হয়ে বসতে পেরেছিলাম। যে-মুহূর্তে বেঞ্চির পিছনে হেলান দিয়ে হাতলে হাত রাখতে পেরেছিলাম, সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল, যাক্ এখন অনেকক্ষণ বসে থাকা যাবে। হঠাৎ একসময় মনোমোহনবাবু উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের দিকে যেতে-যেতে বলেছিলেন "গিরিজাবাবু শুনুন।" আমি কথাটা শুনে বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে ঘুরেছিলাম, কিন্তু অনুসরণ করি নি। বারান্দার কোণার ঘর থেকে ডাক এসেছিল। "গিরিজাবাবু।" আমি ঘরটার দিকে এগিয়ে

গিয়েছিলাম। ঘরের চৌকাঠটা ডিঙোনোমাত্রই তিনি আমার দিকে ছুটো কাগজ বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন—"নতুন মেশিনারি সাপ্লাই গেছে, এই যে অর্ডার স্লিপ, চালান, ম্যানেজারের রিসিট করা আছে, সঙ্গে বিল আছে, আপনি এগুলো এনট্রি করে নিয়ে কালকেই বিলটা পেমেন্ট অর্ডারের জন্ত সার্কুলেট করবেন। আর কাল এই সময় এসে খবরটা আমাকে একটু জানিয়ে যাবেন।" কাগজগুলো ভাঁজ করে বুক পকেটে ভরতে-ভরতে আমি "আচ্ছা" বলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসার পর একই সঙ্গে আমার মাথায় ছুটো চিন্তা এসেছিল।

এটা খুব সাধারণ নিত্যি-নৈমিত্তিক ব্যাপার। এর জন্ত আমাকে দরকার ছিল না। বেয়ারার হাত দিয়ে যেমন অন্তান্ত কাগজপত্র যায় তেমনি যেতে পারতো। অথবা এই সব কোম্পানির কাজের রীতিই বুঝি এইরকম। ভাবতে খারাপ লেগেছিল। আর একটা ভাবনা আমার মাথায় মাঝেমাঝে খোঁচা মারছিল এর মধ্যে কি অন্ত কোনো ব্যাপার আছে, এমন কিছু ইঙ্গিত কি মনোমোহনবাবু করেছেন যা আমি বুঝি নি, মেশিনারি সাপ্লাইয়ের বিল, বিলটা মোটা অঙ্কেরই, সর্বমোট সাড়ে চার হাজার টাকা, একদিনে বের করে দিতে হবে, উনি তো ফোন করলেই হত, আর বিল ম্যানেজারের রিসিট সহ তাকে সোজা হেড-অফিসে আসার কথা, ম্যানেজিং-ডিরেক্টরের হাত দিয়ে তো আসার কথা না।

ঘটনার ধারাবাহিকতা আজ আর মনে নেই। ঘটনা হলে মনে থাকতো। ঘটনা তো নয়। আমার মনের ব্যাপার। এই ঘটনা থেকে কী অর্থ নিষ্কাশিত করে মনোমোহনবাবুর সঙ্গে আমার আচরণের কী তফাৎ এনেছিলাম মনে নেই। এটুকু মনে আছে সেই প্রথম বিলের সময়ই মনোমোহনবাবুর সঙ্গে আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্ক পাকাপাকি স্থিরীকৃত হয়েছিল। সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্থিরতার দিকেই আমার দৃষ্টি। যে-সম্পর্ক আছে কি নেই, সর্বদাই দুলছে, টলছে, উপছোচ্ছে, সে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাওয়া বরঞ্চ ভালো। নিয়ত অস্থির সেই সম্পর্ক দিয়ে কিছু নির্মাণ করা যায় না। সম্পর্ক হবে শক্ত ইটের মতো, যার পরস্পরসংস্থানে একটা নির্মাণ গড়ে উঠতে পারে। হতভাগা খোকা এই কথাটাই বোঝে নি, বোঝে না। নইলে পিতাপুত্রের মতো এত দৃঢ়, স্থিরীকৃত, নির্ধারিত, ও নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত সম্পর্ককেও ও কিনা নরম, অস্থির, অনির্দিষ্ট ও পরিবর্তনক্ষম করে তুলতে চায়। আমাদের পিতাপুত্রের সম্পর্কটা

যেন তার দৃঢ়তা, স্থিরতা ও কঠিনতার জন্তই ওর কাছে একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছিল। ওস্তাদ কারিগররও এ-চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় না, পাশ কাটিয়ে যায়। কিন্তু খ্যাপা ষাঁড়ের মতো শিঙ উঁচিয়ে শিল্পী নাকি বারবার এই চ্যালেঞ্জের সামনেই দাঁড়ায়। যা দৃঢ়, কঠিন ও অপরিবর্তনীয়, শিল্পী নাকি তাকে জলের মতো তরল করে ফেলতে চায়—সর্ব আকার গ্রহণক্ষম। পিতা-পুত্রের সম্পর্ককে খোকা শিল্পী হিসেবে চ্যালেঞ্জ করেছিল। সব করতল কি আর ব্রহ্মার করতল যে খোকা? সব মাটি থেকেই কি দুর্গাপ্রতিমার মুখ তৈরি হয়?

(ক্রমশ)

গোপাল হালদার

রূপনারানের কূলে

(পূর্বানুবৃত্তি)

(ঘ) ইস্‌লাম ইন্‌ ডেঞ্জার

নোয়াখালি মৌলবী-মওলানারই জায়গা। হিন্দুদের মধ্যে গুরু-পুরোহিতদেরও প্রতিষ্ঠা ছিল। কিন্তু ইংরেজিশিক্ষায় হিন্দুদের উপর তাঁদের বিষক্রীড়া ক্রমেই কমে, আর মৌলবী-মওলানাদের প্রভাব বাড়ে। ফিউডালিজম্‌-এর এই জট ওখানকার মুসলমানদের মধ্যে পাকা ছিল—কারণ রেনেসাঁস, রিফর্মেশন মুসলমানসমাজে প্রায় দেখা দেয় নি। গোঁড়ামি বরং আরও প্রবল হয় নন-কোঅপারেশন-খেলাফত্‌ আন্দোলনের সময় থেকে। তবে বরাবরই মক্তব-মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল অনেক। সাধারণ মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস ছিল সরল ও গভীর, বিচারবোধ সেদিকে খর্বিত। ওহাবী আন্দোলন প্রত্যক্ষভাবে তাদের স্পর্শ করে নি বলেই জানি। পরোক্ষে বোধ হয় তা জাগায় অনুরূপ কোরানকেন্দ্রিকতা। ইসলাম ইন্‌ ডেঞ্জার বলে ডাক দিলে সাধারণ মুসলমানও সেখানে বিনা প্রশ্নে জীবন-পণ করতে পারে, তা বুঝতাম, রোজা-নমাজ-জাকত-হজ কেন, দাড়ি না রাখলেই সেখানে গোণাহ্‌। শোয়া বসা, কাজ কারবার সব জিনিসেই কোরান্‌ হাদিসের দোহাই। এতই ওসব কথা শুনতাম যে আমরা শহরের মানুষ, ব্রাহ্মণ ঘরের ছেলেরাও গায়ত্রী মন্ত্র শিখবার অনেক আগেই মুখস্ত বলতে পারতাম: "আল্লাহ লায়েলাহা লিয়াল্লাহ মহম্মদ্‌-এর রসুলালাহ্‌।" অনেকে তো গোঁড়ামির কারবারেই সহজ বৈষয়িক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার পথ গ্রহণ করেন; মুসলমান শিক্ষিতরা অপরেরাও খুব স্বচ্ছ দৃষ্টি আয়ত্ত করতে পারলেন না।

আমার একটি মুসলমান সহপাঠী ছিলেন। তিনি সুশিক্ষিত পদস্থ পরিবারের ছেলে। তাঁর কাছে আমি কম কৃতজ্ঞ নই। তাঁর থেকেই আমি প্রথম যুগের মুসলমানদের ধর্মশিক্ষা ও আরব্য সভ্যতার কথা শুনি। বাঙলা সাহিত্যেও তাঁর অনুরাগ ছিল এবং তার থেকেই বাঙালি মুসলমান লেখকদেরও

আমি নাম জানি। কবি কাইকোবাদ, মোজাম্মল হক্-এর কিছু লেখাও পড়ি; তখনো ১৯১৬-১৭র কথা, নজরুলের উদয় হয় নি। স্থানীয় কবি ছিলেন আবদুল বারি। রায়বাহাদুর ছিলেন তাঁর পৃষ্ঠপোষক। যে-কোনো ছোটলাট এলে বা ম্যাজিস্ট্রেট বিদায় নিলেই আবদুল বারি সাহেব 'উচ্ছ্বাস' ছাপাতেন। রায়বাহাদুর খরচ দিতেন। রায়বাহাদুরের খরচেই ছাপা হয় তাঁর 'কারবালা' কাব্য। নিতান্ত মন্দ লেখা ছিল না। যাক, কথাপ্রসঙ্গে একদিন আমি আমার সহপাঠী বন্ধুকে বললাম, "আমরা ধর্মের অর্থ ঠিক বুঝি না। না হলে দেখুন—ঈশ্বর তো সকলেরই ঈশ্বর। সব ধর্মই তাঁর ধর্ম, সবই সমান।" বাড়ির ধারায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব থেকে অন্নদেবও যত শিক্ষা আমরা পেয়েছি তাতে এ কথা আমার পক্ষে ছিল সহজ কথা। আমার বন্ধু কিন্তু প্রবল স্বরে প্রতিবাদ করলেন, "না। মুসলমান হয়ে আমি এ কথা মানতে পারব না। মুসলমান ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম ধর্ম নয়।" যে-তীক্ষ্ণতা তাঁর কণ্ঠে ছিল তা পূর্বে অন্য আলোচনায় কোনোদিন দেখি নি। আমি কেমন বিমূঢ় হলাম। 'যত মত তত পথ'—আমার বিশ্বাস ছিল এ কথাটায় শিক্ষিত মানুষের অনুমোদন স্বাভাবিক। বুঝলাম তা ঠিক নয়; অন্তত নোয়াখালিতে নয়। না হলে বন্ধুটি ছিলেন শিক্ষিত, সৎ স্বভাব এবং উদার প্রকৃতিরও। এরূপ গুণযুক্ত মুসলমান শিক্ষিত লোক নোয়াখালিতে আরও বলেছেন। কেউ কেউ তাঁরা ধন মান খ্যাতিও অর্জন করেছেন। কিন্তু মুসলমানসমাজের 'আস্থা' লাভ করতে হলে "গোঁড়ামি"কেও যথেষ্ট মেনে চলতে হয়েছে—অন্তত সেখানে। না হলে, যাঁরা নিজ সমাজের হিতৈষী, দেশেরও হিতৈষী—এমন লোকও শেষ পর্যন্ত পরাহত হয়ে যেতেন।

(৩) নামহারা মুসলমান : চুন্নু মিঞা

চুন্নু মিঞার কথাই ধরা যাক। ছেলেবেলা তাঁকে জানতাম—শিক্ষিত বড়ো মুস্লিম পরিবারের যুবক, আর ফুটবল খেলায় সিদ্ধ। তারপর নন-কো-অপারেশন এল। আন্দোলনে ভাঁটি পড়ল; তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করলেন। মুসলমানদের নিয়ে 'তাঞ্জিম' 'তবলীগ'-এ মন দিলেন। অসাধারণ দেখেছি তাঁর সাধারণ মুসলমানের জন্য দরদ, আর কর্মনিষ্ঠা। মুসলিম সংগঠন তাঁকে ছাড়া চলে না। ক্ষিতীশ চৌধুরী ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গতুল্য বন্ধু, খেলার সাকরেদ। তাঁকে চুন্নু মিঞা বলতেন—'মুসলমানরা সবল না হয়ে তোমাদের

সঙ্গে চলতে পারবে না।' যে-বিভেদ হিন্দু-মুসলমানে বাড়ছিল তা চুন্নু মিঞা সাহেব দূর করা দরকার মনে করেন নি। তিনি তখন এম-এল-এ, মিউনিসিপ্যালিটি, জিলা বোর্ড সবখানেই প্রতিষ্ঠাপন্ন। এল ত্রিশের পর্ব— একদিকে লবণ-আইন অমান্য করে কংগ্রেসকর্মীরা পুলিশের লাঠি মাথা পেতে নিচ্ছে আর দিকে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরে বিপ্লবীরা গুলি করছে, গুলি খাচ্ছে, প্রাণ দিচ্ছে। চুন্নু মিঞা সাহেব ক্ষিতীশদাকে বললেন, 'আমরা মুসলমানরা কী করে তোমাদের সঙ্গে চলব বলো? তোমাদের কংগ্রেসের ভলেন্টিয়ারের মতো লাঠি খেয়েও হাত তুলব না, এমন সাধ্য আমাদের নেই। তোমাদের বিপ্লবী ছেলেদের মতো পুলিশের অত্যাচারেও মুখ খুলব না কিন্তু প্রাণ দোব, এমন শক্তিও আমাদের নেই। কি করে আমরা তোমাদের সঙ্গে যোগ দোব? মুসলমানদের শক্তি সঞ্চয় করতে দাও।' বললেন বটে, যোগও দিলেন না। কিন্তু সেই ত্রিশের সময় থেকে চুন্নু মিঞা সাহেব ক্রমেই পৃথক করে মুসলমান সংগঠনের চেষ্টা ছেড়ে দিতে থাকেন। ক্রমেই গরীব মুসলমানদের করেন তাঁর লক্ষ্যস্থল, কৃষক বা সাধারণ মানুষের সমবেত সংগঠনের দিকেই পড়ল তাঁর ঝোঁক। এমন কি, বিপ্লবীদেরও সাহায্য করার কাজে গোপনে গোপনে চেষ্টা করতে থাকেন। অ্যাসেমব্লি, কাউন্সিল, মিউনিসিপ্যালিটি, সবখানে তখনো আছেন, কিন্তু কোনোখানেই এসবে উৎসাহ নেই। তাঁরই তৈরী মুসলিম আন্দোলন চলে গেল নতুন গজানো জিন্নাহ্‌পন্থী স্থানীয় মুসলিম নেতাদের হাতে। তাঁর তাতেও দুঃখ নেই। তিনি সে রকম লীগও চান না, ওরকম কংগ্রেসও না। সাধারণ মানুষের বিপ্লবী চেষ্টা দেখলে তিনি আশ্বস্ত বোধ করেন। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত কেউ তাঁকে অনুসরণ করবার মতো রইল না। মৃত্যুর কিছু পূর্বে তিনি এসে উঠলেন ক্ষিতীশ চৌধুরীর গৃহে। অর্থের অভাব তাঁদের নেই, লোকজনও আছে। কিন্তু আপনার মনমতো লোক 'ক্ষিতীশ'। হিন্দুবাড়ির সেবা, আতিথেয়তা, পথ্যগ্রহণ— এ যে অন্য মুসলমানদের চোখে একটা বিষম গোণাহ্‌। কিন্তু কে শোনে তা? অবশ্য ক্ষিতীশও মুসলমানের প্রথা অনুযায়ীই মুসলিম বন্ধুর খেদমতের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তাতে চুন্নু মিঞার তখন তেমন রুচি আর নেই। ধর্মে তাঁরও বিশ্বাস ছিল। কিন্তু বিশ্বাস ছিল না লেবেল-এ।

চুন্নু মিঞার নাম নোয়াখালিতে আর করবে কে? তবু তো তিনি ছিলেন শহরে সুপরিচিত। সিরাজকে মনে করবার কোনো কারণই নেই। দীর্ঘ একহারা চেহারা এই মুসলিম যুবকটিও ছিল সন্দীপের লোক। বোধ হয়

সাধারণ ঘরের ছেলে। যখন কংগ্রেসে কেউ নেই—হিন্দু নেতারাও অনেকেই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত, তখনো সে এবং ক্ষিতীশ চৌধুরী ফুলনাতে কংগ্রেস ও স্বাধীনতার আদর্শ আঁকড়ে থাকত। নম্র, বিনয়ী, বুদ্ধিমান, ধর্মপরায়ণ মুসলমান সে, কিন্তু চাই দেশের স্বাধীনতা, মানুষের মতো জীবন, সম্ভবত ক্ষিতীশ চৌধুরী ত্রিশের সময়ে জেলে গেলে আর সে তিষ্ঠোবার মতো ঠাঁই পায় নি—দেশেই ফিরে গিয়েছে। হানাহানি কাটাকাটির মধ্যে তার মতো নিরীহ খাঁটি মানুষের স্থান কোথায়? নাম-হারা কেন, এঁরা স্বজন-হারা।

(চ) যাদের কেউ চেনে না

যাদের কেউ চেনে না এমন মানুষের কারও কারও চেহারা কিন্তু আমি ভুলি নি। হিন্দুও আছে, মুসলমানও আছে। অসাধারণ তারা কেউ নয়, সাধারণ মানুষ, ভালো মন্দে মেশানো। আমাদের বৈঠকখানা উকিলের বৈঠকখানাও, অবশ্য দেওয়ানী মামলার উকিল। কিন্তু মামলাবাজ লোকই কি কম দেখেছি? শিক্ষিত অশিক্ষিত, হিন্দু মুসলমান—কোনো প্রভেদ নেই। ঘোষ কামতার ঠাকুরমশায়রা বুদ্ধিতে সুচতুর, কিন্তু মামলা তাঁদের শেষ হোত না। আলিমা বানু মুসলমান মেয়ে, এই দীর্ঘদেহী শ্যামবর্ণ প্রৌঢ়াকে দেখে বুঝবার উপায় নেই মেয়ে বা মুসলমান। গ্রাম থেকে আসে মামলা করতে শহরে। বৈঠকখানার এক পার্শ্বেই রাত্রিতে অনেক সময় শুয়ে থাকত। ভাইপোদের হয়ে সম্পত্তি রক্ষা করে। যদি বলা যায়—এ মামলা টিকবে না। ভারী অসন্তুষ্ট। সাহস নেই কেন? সত্য কথা, সম্পত্তি সে রক্ষা করেছিল। অনেক-অনেক মানুষের মিছিলে হারিয়ে যাওয়া এক-একটা মুখ এক-এক সময় চোখে ভেসে ওঠে—অথচ তারা কেউ উল্লেখযোগ্য নয়। যেমনি নোয়াখালির পুরনো কথা মনে পড়ে। নোয়াখালির তিন রজনীর কথা। 'বড় রজনী' প্রথম আমাদের বাড়িতে কাজ করতে এসেছিল। গৌরবর্ণ, দৃঢ় দেহ, সুপুরুষ। রান্নায় সিদ্ধহস্ত। মুরগী রান্নার জোরেই সে সরকারী চাকরি পেয়ে যায়। আর তাতে উন্নতিও করে। আমাদেরও মুরগীতে হাতেখড়ি তার কাছে—উপযুক্ত হোতাই পেয়েছিলাম। তাছাড়া বুদ্ধিমান, এমন করিৎকর্মা লোক বড় চোখে ঠেকে নি। ইনিমিটেবল ক্রিকটন। দাদা বলতেন—'বিলেতে হলে ও দুদিনে মিলিটারিতে অফিসর হয়ে যেত।' দ্বিতীয় রজনী চারুদের বাড়ির পরিচারক;

প্রিয়ভাষী। এ রজনী বাড়ির ছেলেদের বুকে পিঠে করে মানুষ করেছে। আর আমরা দেখেছি বছরের পর বছর তার বিশ্রাম—অর্থাৎ নাতি-উচ্চকণ্ঠে বারবার বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পাঠ। তৃতীয় রজনী—আমাদের 'রজনী ভাই' কঠিন পরিশ্রমী, কটুভাষী—মা, জ্যেঠাইমাদেরও স্পষ্ট কথা বলতে অভ্যস্ত—'আপনার কথা হবে না ঠাইন্।' আমরা তাঁকে 'আপনি' বলে বলতাম, তিনি বলতেন 'তুমি।' পূর্বে এক দারোগার কাছে কাজ করতেন—তুলে দিতে হোত সে দারোগার গল্প। মদ মাংস শুদ্ধ সে দারোগার জীবন যে কেন চল্লিশে পৌছতে না পৌছতেই শেষ হয়, তা আমাদের বুঝতে দেরী হোত না। "ও দারোগা খাবে কি? ওতো অচৈতন্য", রজনী ভাই বলতেন, "আমি বলতাম ঠাকুরকে 'ও খাক, ওভাবে চিৎ হয়ে। যা পেটে দিয়েছে আজ খাক, কালও তার ব্যথায় নড়তে-চড়তে পারবে না।. এখন নাও—আমাদের মাংস ভাত।" কী উৎসাহ তাঁর সেই সব গল্পে—'একশ নম্বর ওয়ান্'-এর নাম তো তাঁর মুখেই প্রথম শুনি। সুবিধা পেলেই আমরাও তুলে দিতাম, আর তিনি বলতেন 'একশ নম্বর ওয়ানের' মাহাত্ম্য-কথা। অনেক-অনেক পরে ১৯২৮-২৯ সালে—তাঁর দিন শেষ হয়ে আসে। সবাই বললে, 'বাড়ি যাও।' বাড়ি বিক্রমপুরে, পুত্র-পুত্রবধূ শুদ্ধ সংসার আছে সেখানে। কিন্তু রজনী ভাই বাবা-মাকে বললেন, "আপনাদের কাছে ছিলাম। এখানেই মরব—আপনাদের কাছে।" ইচ্ছা পূর্ণ হল কিছুদিনের মধ্যেই।

এ সব মানুষের সঙ্গে পরিচয় পর্ব থেকে পর্বান্তরে বিস্তৃত। তা ও রকম ঘড়ীর মাপে শেষ হয় নি। যাঁদের আশ্রয় করে মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় আরম্ভ হয় তাঁরা অনেকেই গিয়েছেন পিছনে সরে। মনে করতে গিয়ে এই কথাই মনে হয়—ছোট বড়ো, ভালো মন্দ,—কিংবা স্বদেশী বা সাহিত্যিক, কোনো একটা ছকের মধ্যে তাদের পুরতে পারা যায় না। জীবনটা ছক কেটে আরম্ভ করতে পারি নি বলেই এই বিপদ, ঘাটে-ঘাটে ভেসে ভেসে চলেছে॥

ভবানী সেন

খাদ্যসংকটের ইতিবৃত্ত

ভারতের খাদ্যসংকট রীতিমত একটা জটিল অবস্থা সৃষ্টি করেছে। দেশের সামগ্রিক উন্নতি ঠেকে আছে যে সমস্ত কারণে তার মধ্যে খাদ্যসংকটই প্রধান। বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানির জন্য যে বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় হচ্ছে তাতে অন্যান্য বহু অবশ্য-প্রয়োজনীয় শিল্পজাত পণ্যের আমদানি কমাতে হচ্ছে। পি. এল ৪৮০-তে আমেরিকার গম-সাহায্য ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শুধু নয়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও বিদেশীদের নিকট অনেক বাধ্যবাধকতার জন্য দায়ী। ১৯৫৮-৫৯ থেকে বিদেশ হতে গমেরই বেশি আমদানি হচ্ছে এবং প্রধানত আমেরিকা থেকে। ঐ বৎসর ভারতে যত গম উৎপন্ন হয়েছিল তার এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ গম আমেরিকার পি. এল ৪৮০ অনুযায়ী আমদানী করা হয়। ১৯৬০-৬১ সনে ঐ আমদানির পরিমাণ ভারতীয় উৎপাদনের অর্ধেক। ১৯৬০-৬৩ সালের মধ্যে বিদেশ থেকে মোট ১ কোটি ২০ লক্ষ টন খাদ্য শস্য আমদানী করা হয়। তার অধিকাংশই গম।

এই বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানির অর্থনৈতিক ফলাফল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। আমাদের দেশের বৈষয়িক অগ্রগতির মূলধন এই দেশের ভিতর থেকে তুলতে হলে তার প্রধান উপায় কৃষিতে অতিরিক্ত উৎপাদন; ১৯৬৩-৬৪ সালেও হাল সনের মূল্যমানের নিরিখ-অনুসারে ভারতের বাৎসরিক জাতীয় আয়ের শতকরা ৪৭ ভাগ পাওয়া গেছে কৃষি থেকে। কৃষিই ভারতের জাতীয় আয়ের প্রধান উৎস। সুতরাং কৃষিক্ষেত্রে সঞ্চয় যোগ্য উদবৃত্ত পণ্য না ফললে জাতীয় আয় থেকে সঞ্চয়ের হার যতই বেশি হোক—তা উন্নয়ন পরিকল্পনার পক্ষে নিতান্তই অপ্রচুর হতে বাধ্য।

উন্নয়নের ক্ষেত্রে মূলধনের অভাবের জন্যই ভারত বৈদেশিক ঋণ এবং অন্যান্য সাহায্যের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। অথচ ১৯৫১-৫২ থেকে ১৯৬০-৬১ এই দশ বছরে জাতীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ যা বেড়েছে তা নেহাৎ তুচ্ছ নয়। ১৯৫১-৫২ সালে ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রগত এই উভয় ধরনের

সংস্থায় নূতন লগ্নীর পরিমাণ দাঁড়ায় জাতীয় আয়ের শতকরা ৪ ভাগ, ১৯৬০-৬১ সালে এই অনুপাতটি বেড়ে হয়েছে শতকরা ৮·৮ ভাগ। অধ্যাপক কে, এন রাজের হিসেব অনুসারে এই দশ বছরে বাৎসরিক সঞ্চয়-বৃদ্ধির পরিমাণ বর্ধিত জাতীয় আয়ের প্রায় এক চতুর্থাংশ, অন্তত এক পঞ্চমাংশের কম তো নয়ই। কিন্তু যেহেতু আধুনিক শিল্প থেকে জাতীয় আয়ের মাত্র এক অষ্টমাংশ উৎপন্ন হয়, এবং যেহেতু সঞ্চয়ের প্রধান ক্ষেত্র শুধু এইটেই, সেহেতু কৃষির বিপুল উন্নতি ছাড়া সঞ্চয়ের হারবৃদ্ধির অন্য কোনো উপায় নেই।

সুতরাং কৃষিক্ষেত্রই একমাত্র ক্ষেত্র যেখানে সঞ্চয়ী মূলধনের পরিমাণ যে বাড়েনি মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ভারতের পক্ষে স্বাবলম্বী হওয়া সম্ভব নয়। অথচ এই ক্ষেত্রেই চলছে ঘাটতি, যা বিদেশী আমদানি দ্বারাও পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। এইসব কারণেই বলা হয়ে থাকে যে কৃষিসংকটই ভারতের সমস্ত সংকটের মূল।

কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনের ঝোঁক

এই সংকটের স্বরূপটা ভাল করে বোঝা দরকার। উৎপাদন যে একেবারে বাড়ছে না এমন নয়। ১৯৫২-৫৩ সাল থেকে ১৯৬১-৬২ এই দশ বছরে কৃষির উৎপাদন প্রতিবৎসর গড়ে শতকরা ৩ ভাগ করে বেড়েছে। অর্থকরী ফসলের চেয়ে খাদ্যশস্য বৃদ্ধির হার অপেক্ষাকৃত কম—বাৎসরিক শতকরা আড়াই ভাগ মাত্র। পশ্চিমবঙ্গে বৃদ্ধির হারটা একেবারেই নগণ্য। এই রাজ্যে কৃষিজাত সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির হার বাৎসরিক শতকরা এক ভাগেরও কম। এই জন্য খাদ্যসংকটও এই রাজ্যেই সবচেয়ে বেশি। কৃষিক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চরম দৈন্য এতেই নগ্নভাবে ধরা পড়ে।

যাই হোক, সারা ভারতে খাদ্যশস্যের বাৎসরিক বৃদ্ধির হার শতকরা আড়াই ভাগ কিন্তু জনসংখ্যার বৃদ্ধিও শতকরা আড়াই জন। সুতরাং উৎপাদনের বৃদ্ধি আর জনসংখ্যার বৃদ্ধি সমান সমান। তার ফলে উদ্‌বৃত্ত মূলধন কৃষি থেকে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু ভোগের সঙ্গে উৎপাদনের এমন কোনো ব্যবধান নেই যার জন্য খাদ্যশস্যের দর ক্রমাগত চড়তে পারে। প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদনের ঘাটতি গড়ে বরাবর সমান থেকে যাচ্ছে। এই ঘাটতি পূরণের জন্যই বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়।

১৯৬০-৬১ সালে মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল ৮ কোটি ১০ লক্ষ টন,

১৯৬২-৬৩ সালে তা কমে হলো ৭ কোটি ৯০ লক্ষ টন, কিন্তু ১৯৬৩-৬৪ সালে আবার তা ৮ কোটি টনে ওঠে। তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল প্রায় ১০ কোটি টন। সে লক্ষ্য এখনও বহুদূরে।

তাহলেও উৎপাদনের ধারার মধ্যে খাদ্যশস্যের ক্রমবর্ধমান মূল্য বৃদ্ধির কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। যদিও খাদ্যের চাহিদা সম্পূর্ণ মিটছে না এবং সঞ্চয়যোগ্য উদ্বৃত্ত সৃষ্ট হচ্ছে না।

খাদ্যশস্যে মূল্যসংকট কেন

গত কয়েক বছর ধরে যে-খাদ্যসংকট চলেছে তার উৎপত্তিস্থল যে মূলত উৎপাদনের ক্ষেত্রে নয়, এ কথা পরিষ্কার। এখন সরকার পক্ষও স্বীকার করছেন যে মজুতদার-মুনাফাখোরেরা খাদ্যশস্য মজুত করে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করছে। এখন প্রশ্ন হলো—কারা এই মজুতদার এবং কেন তারা মজুত করতে পারছে?

খাদ্যশস্য মজুত হয় প্রধানত দুইটি ক্ষেত্রে—জমির বৃহৎ মালিকদের হাতে এবং পাইকার কারবারীদের আড়তে।

ভূমিসংস্কার আইন সত্ত্বেও কৃষি ক্ষেত্রে অধিকাংশ জমি এখনও মুষ্টিমেয় মালিকের কুক্ষিগত। যাদের হাতে পরিবার পিছু ১০ একরের বেশি জমি আছে তারাই নিজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফসলের অর্থাৎ বিক্রয়যোগ্য শস্যের মালিক। এখন চাষের জমির শতকরা ৫৬ ভাগই এইরকম জোতের অন্তর্ভুক্ত এবং তাদের মালিকরা মোট কৃষ্যামীদের শতকরা মাত্র ১০ জন। অন্যেরা, অর্থাৎ গরীব কৃষকরাও যে ফসল বিক্রী করে না এমন নয়, প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য ঘরে না রেখেও তারা ফসল বিক্রী করতে বাধ্য হয়। বছরের শেষদিকে আবার তাদেরই কিনে খেতে হয়। কৃষকদের শতকরা ৯০ জন এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তাদের সরবরাহ দ্বারা বাজার দর প্রভাবিত হয় না, বাজার দর প্রভাবিত হয় বৃহৎ ভূস্বামিগণ কর্তৃক, সংখ্যায় যারা দেশের শতকরা ১০ জন মাত্র।

কৃষিজীবীদের অল্পাংশের হাতে কী পরিমাণ জমি কেন্দ্রীভূত তার একটা বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় ১৯৫৩-৫৪ সালের পরিসংখ্যানে। এই বৎসর গ্রামাঞ্চলে উপরের দিকে শতকরা ১টি পরিবারের হাতে ছিল শতকরা ১৭ ভাগ জমির মালিকানা, ৫টি পরিবারের হাতে শতকরা ৪১ ভাগ এবং ১০টি পরিবারের হাতে শতকরা ৫৮ ভাগ। অর্থাৎ শতকরা ৯০টি কৃষি পরিবারের মধ্যে মোট জমির শতকরা মাত্র ৪২ ভাগ ছিল।

এর পর ১৯৫৯-৬০ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে সর্বোচ্চ শতকরা ১টি পরিবারের মালিকানায় ছিল জমির শতকরা ১৬ ভাগ, ৫টি পরিবারের মালিকানায় ৪০ ভাগ এবং সর্বোচ্চ ১০ টি গ্রাম্য পরিবারের মালিকানাধীনে ছিল সমস্ত জমির শতকরা ৫৬ ভাগ।

[মহলানবিশ কমিটির রিপোর্ট]

এই দুটি বিবরণ থেকে দেখা যাচ্ছে ১৯৫৩-৫৪ এবং ১৯৫৯-৬০ এই পাঁচ বছরে ভূমিসংস্কার আইন সত্ত্বেও জমির মালিকানার বিশেষ কোনো তারতম্য ঘটে নি।

গ্রামাঞ্চলে শতকরা যে ১০ জনের হাতে চাষের জমির অধিকাংশ কেন্দ্রীভূত, বহুক্ষেত্রে তারাই আজকাল গ্রামের চাষীদের ঋণদাতা মহাজন এবং খাদ্যশস্যের পাইকারী কারবারী। নিজ মালিকানায় তাদের হাতে যে-জমি আছে তার ফসল ছাড়াও ঋণের বিনিময়ে গরীব কৃষকদের ক্ষেতের ফসলেরও একাংশ তারা দখল করে এবং তা ছাড়া আরও কিছু ফসল তারা কিনে জমায়। জমির মালিকানা, ঋণদান এবং পাইকারী ব্যবসায় এই তিন পদ্ধতিতে তারাই হয় বিক্রয়যোগ্য ফসলের একচেটিয়া মালিক। ফসলের বাজারের এই একচেটিয়া রূপটি খাদ্যশস্যের চোরাবাজারের প্রধান উৎস।

গ্রামীন্ অর্থনীতির রূপান্তর

অল্প সংখ্যক লোকের হাতে অধিক সংখ্যক কৃষিজাত পণ্য যখন কেন্দ্রীভূত, তখনই আবার গ্রামীন্ অর্থনীতিতে ঘটেছে বাজারের প্রসার। অর্থাৎ অর্থের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় এখন এত ব্যাপক যে সঞ্চিত এবং ভোগযোগ্য সমস্ত ফসলই অর্থের বিনিময়ে হস্তান্তরিত হয়ে থাকে। খেতের ফসল ক্রয়বিক্রয় বা সাধারণভাবে বাণিজ্য যাদের পেশা তাদের সংখ্যাটা গেছে বেড়ে এবং খাদ্যশস্যের গ্রামীন্ বাজারে তারা হলো শক্তিশালী খরিদ্দার। তারাই সাধারণ কৃষকের সর্বপ্রকার পণ্য মুষ্টিমেয় হাতে কেন্দ্রীভূত করছে বাজারের বিনিময়ের মারফত। এই ভাবে কৃষিক্ষেত্র ধনতান্ত্রিক বাজারের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ায় মুনাফার জন্য মজুতের প্রবণতা এত বেশি হয়েছে।

বিশ্বভারতীর অধীনে কৃষির অর্থনীতি-বিষয়ক গবেষণায় কয়েকটি

উল্লেখযোগ্য তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। ২৪ পরগণা জেলায় নাচনগাছায় ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন গ্রামের শতকরা ১০ জনের উপর। এদের বেশির ভাগই কৃষক ভূস্বামী বা জোতদার। বীরভূম জেলার সহজপুরে ১০ জন ব্যবসায়ীর ৯ জনই এইরূপ। ২৪ পরগণায় নাচনগাছা গ্রামের ব্যবসায়ীদের এক বৎসরে মোট আয় ২১,০০০ টাকা, তার মধ্যে ১২,০০০ টাকাই গেছে ৫ জন পাইকারের হাতে। এই নাচনগাছাতেই মাত্র দুটি পরিবারের হাতে ঐ গ্রামের সমস্ত জমির শতকরা ৪২ ভাগ কেন্দ্রীভূত।

আধুনিক পল্লীসমাজের ছবিটি এইরূপ : জমি, বাণিজ্য এবং আয় মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত, অধিকাংশ কৃষক ভূমিহীন অথবা নামমাত্র জমির মালিক ; কৃষিজাত ফসল ধরে রাখবার ক্ষমতা তাদের নেই, এমন কি বৎসরের প্রথম দিকে তাদের অবশ্য প্রয়োজনীয় ফসলও তারা বেচে কেনে। এদিকে পাইকার মারফত যে-মূলধন সঞ্চিত হচ্ছে তার একটি বড় অংশ মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে খাদ্যশস্য মজুত রাখবার কাজে নিযুক্ত। এমনিভাবেই তৈরি হয় খাদ্যশস্যের গ্রামীন্ মজুত।

গ্রামের এই মজুতদারদের সঙ্গে শহরের একচেটিয়া পাইকারদের কোনো ঘনিষ্ঠ সংযোগ যদি না থাকত তা হলে খাদ্যশস্যের বাজারে মজুতদারদের প্রভাব হতো খুব সীমাবদ্ধ। সেক্ষেত্রে এক অঞ্চলের মজুত অন্য অঞ্চলে চালান হতো না এবং কোনো-না-কোনো সময় মজুতকারীকে জমানো মাল ছাড়তেই হোত স্থানীয় খরিদ্দারদের কাছে।

কিন্তু প্রকৃত অবস্থা অন্যরূপ। ধনতান্ত্রিক বাজারের মাধ্যমে খাদ্যশস্যের পাইকারী কারবার সাধারণ পাইকারী কারবারের মধ্যে মিশ্রিত। সাধারণ পাইকার ব্যাপারীরা গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন মজুত করায়ত্ত করে কেন্দ্রীভূত করছে। এইভাবে মজুত শস্য চলে যায় স্থান থেকে স্থানান্তরে। কাজেই সর্বপ্রকারের মজুতদার একত্রে মজুত ধরে রাখতে পারে দীর্ঘকাল। সেজন্য যে আর্থিক সমর্থন আবশ্যক তা আসে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ; কখনও প্রত্যক্ষভাবে, কখনও পরোক্ষভাবে। এইভাবেই বাজারের উপর মজুতের সর্বগ্রাসী ক্ষমতা প্রভাবিত হয়েছে। গ্রামের বিভিন্ন স্থানের মজুত একটি কেন্দ্রীয় স্রোতের অংশমাত্র।

এই অবস্থার ফলে সাধারণভাবে উৎপাদনের ক্ষেত্র থেকে সঞ্চিত মূলধন সরে যায় অনুৎপাদক ক্ষেত্রে, কারণ উৎপাদনের মুনাফার চেয়ে চোরাকারবারে

মুনাফা অনেক বেশি এবং সহজ। জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে এই অবস্থাটাই প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রথম পরিকল্পনাতে জাতীয় আয়ের লক্ষ্য স্থির করা হয় কৃষি থেকে শতকরা ৫৭ ভাগ এবং শিল্প থেকে শতকরা ২৭ ভাগ। কিন্তু ১৯৫৫-৫৬ সালে কৃষি থেকে হলো শতকরা ৪৬·৯ ভাগ এবং শিল্প থেকে শতকরা ১৬·৮ ভাগ। জাতীয় আয় লক্ষ্যের চেয়ে বেশি হলো কৃষি-শিল্প বাদে অন্যান্য ক্ষেত্রে। ব্যবসায়, বাণিজ্য ও পরিবহন প্রভৃতি থেকে জাতীয় আয় সৃষ্ট হলো শতকরা ১১ভাগ লক্ষ্যের স্থলে ১৮·৮ ভাগ, আর বিবিধ শ্রম থেকে শতকরা ৪ ভাগের জায়গায় শতকরা ১৭·৫ ভাগ। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অর্থনীতির এই অনুৎপাদক ঝোঁকটি গেল আরও বেড়ে। ১৯৬০-৬১ সালে জাতীয় আয়ের লক্ষ্য ছিল শিল্পে শতকরা ৩৪ ভাগ, কৃষিতে শতকরা ৩৫ ভাগ, ব্যবসায় ইত্যাদিতে শতকরা ১৫ ভাগ এবং বিবিধ শ্রমে শতকরা ১৫ ভাগ। কিন্তু কার্যত পাওয়া গেল এইরূপ—শিল্পে শতকরা ১৬·৬ ভাগ, কৃষিতে শতকরা ৪৬·৪ ভাগ, ব্যবসায় ইত্যাদিতে শতকরা ১৯·৩ ভাগ এবং বিবিধ শ্রমে শতকরা ১৮·১ ভাগ। এই সমস্ত হিসেব করা হয়েছে ১৯৪৮-৪৯ সালের মূল্যমানের ভিত্তিতে।

এই তথ্যের অর্থই এই যে কৃষি ও শিল্পে লগ্নীযোগ্য মূলধনের তুলনায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মজুত সঞ্চয়ই অধিকতর মাত্রায় বর্ধিত হচ্ছে। অর্থনীতির গতিবেগ উৎপাদন ক্ষেত্রের তুলনায় অনুৎপাদক ক্ষেত্রেই বেশি দেখা যাচ্ছে। তাই সর্বপ্রকার পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে গতিশীলতার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

ভোগের জন্য ব্যয়

এই গতিশীলতার অভাবের জন্য ভোগের চাহিদা যে পরিমাণে বাড়ছে, ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন সে পরিমাণে বাড়ছে না। ভোগের জন্য ব্যয়বৃদ্ধির কথা শুনে কেউ যেন মনে না করেন যে সর্বসাধারণ সমভাবে এর জন্য দায়ী। এক বছরে গ্রাম-সমাজের সকলে মিলে ভোগের জন্য যত টাকা ব্যয় করেন তার মধ্যে উপরের দিককার শতকরা ১০ জন শতকরা ৩৩·৬ ভাগ ব্যয়ের জন্য দায়ী আর নীচের দিককার শতকরা ১০ জন দায়ী শতকরা মাত্র ০·৭ ভাগ ব্যয়ের জন্য। শহরাঞ্চলে উপরের শতকরা ১০ জন ব্যয় করেন সামাজিক একুন ব্যয়ের শতকরা ৪২·৪ ভাগ আর নীচের শতকরা ১০ জন

করেন ১৩ ভাগ। অর্থাৎ ভোগের জন্ত বাজারে অর্থচলন এবং অধিকাংশ লোকের অভাববৃদ্ধি একই সঙ্গে চলেছে।

আয়ের অসম বণ্টনের জন্তই ব্যয়ের ক্ষেত্রেও বৈষম্য দেখা দেয়। সুতরাং ভোগের জন্ত চাহিদার বৃদ্ধি ঘটছে প্রধানত সমাজের উপরতলার অংশ থেকে। এ হিসেব আর-এক ভাবেও করা যায়। কেননা জাতীয় আয়ের মোটা অংশ উপর-তলাতেই যায়। ট্যাকস দেবার পর যে ব্যক্তিগত আয় অবশিষ্ট থাকে তার এক তৃতীয়াংশ পড়ে শতকরা ৭০ জনের ভাগে আর বাকি দুই তৃতীয়াংশ যায় শতকরা ৩০ জনের পকেটে। সর্বোচ্চ শতকরা ১০ জন পান শতকরা ৪০'৪ ভাগ।

এখন উপরের দুটি তথ্য মিলিয়ে দেখুন। জাতীয় আয়ের বেশির ভাগটা ওঠে তাঁদের হাতে যাঁরা বাণিজ্যে কিংবা বিবিধ চাকুরীতে নিযুক্ত—অর্থাৎ যাঁরা সৃষ্টিশীল উৎপাদনে নিযুক্ত নন। তার মধ্যে আবার অতি অল্প-সংখ্যক ধনীর হাতেই বিপুল পরিমাণ অর্থ জমে। শুধু তাঁদের ব্যয়ই বাজারের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। অথচ সেই চাপ সামলাবার মতো উৎপাদক মূলধনের বৃদ্ধি ঘটে না।

কিন্তু এইটেই যদি হতো সমগ্র সমস্তার চাবিকাঠি তা হলে তার সমাধান করা যেত বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিতরেই। বড় বড় শিল্পপতিরা এইরকম একটা সমাধানের জন্তই বলে থাকেন যে উৎপাদনের ক্ষেত্রে মূলধন লগ্নী করার উৎসাহ বাড়াও এবং সেজন্ত মূলধন লগ্নী কারবারের ক্ষেত্রে ট্যাকস হ্রাস কর, ট্যাকস বাড়াও সাধারণ লোকের উপর—অর্থাৎ যারা ব্যয় করে শুধু ভোগের জন্ত। তাঁদের প্রস্তাব অনুসারে কর-নীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত ভোগ্য ব্যবহার ক্ষেত্র থেকে সঞ্চয়ের স্রোত উৎপাদনের লগ্নী কারবারে ঠেলে দেওয়া। তাই তাঁদের স্লোগান হলো ভোগনিয়ন্ত্রণ, আর ঠিক এই জন্তই তাঁরা দাবী করেন যে ব্যক্তিগত উৎপাদনী সংস্থাকে বন্ধাহীন করে দিতে হবে। এই চিন্তাধারার মধ্যে বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল কাঠামোটা পড়ে হিসেবের বাইরে।

একচেটিয়ার ভূমিকা

উৎপন্ন ফসল কি করে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে মজুত আকারে জমা হয় তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে জমির অসম বণ্টন এই

অবস্থার মূলে বর্তমান। অর্থাৎ জমি মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত। আমরা এও দেখেছি যে বৃহৎ ভূস্বামীই কৃষকের প্রধান ঋণদাতা হওয়ায় ঋণের মারফতও খাদ্যশস্য বৃহৎ ভূস্বামীদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। ফসল যদি মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হয় তা হলে তারা দাম বাড়াতে পারে; এই মূল্যবৃদ্ধি ভোগের জন্য অধিক ব্যয় থেকে সম্ভূত নয়, বরং এই মূল্যবৃদ্ধি থেকেই ভোগের জন্য অধিক ব্যয় অবশ্যকৃত্য হয়ে দাঁড়ায়। স্বভাবতই যাদের আয় বেশি তারা উৎপাদনের জন্য সঞ্চয় না করে জীবনধারণের মানের জন্য অধিক ব্যয় করে থাকে।

আমরা এও দেখিয়েছি যে মজুত এবং মূল্যবৃদ্ধির একমাত্র কারণ এই নয় যে গ্রামের মুষ্টিমেয় ভূস্বামীর হাতে বেশি ফসল মজুত হয়। সারা ভারতের বৃহৎ ভূস্বামীদের মধ্যে এমন কোনো বাণিজ্যিক সংগঠন নেই যা নানা স্থানের নানা মজুত একত্র করে সর্বভারতীয় মজুত সৃষ্টি করতে পারে। এ কাজ হলো আর্থিক মূলধনের কাজ এবং সে মূলধন আছে পাইকার ব্যবসায়ীর হাতে। পাইকারেরা শুধু খাদ্যশস্য কেন্দ্রীভূত করে না, সর্বাধিক পণ্যই কেন্দ্রীভূত করে। কয়েক হাজার কোটি টাকা এই কাজেই খাটছে।

পাইকার ব্যবসায়ীরা যদি শুধু বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই বিচ্ছিন্নভাবে থাকত তা হলেও বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করা অত সহজ হতো না। কারণ প্রচুর পরিমাণ মজুত আটক রাখতে হলে যে ক্রমবর্ধমান মূলধনের প্রয়োজন হয়, সেই প্রয়োজনীয়তাই মজুতদারীর একটা স্বতঃস্ফূর্ত সীমারেখা। পণ্য-সম্ভারের দ্রুত বিক্রয়ই মূলধন সঞ্চয় করার আদিম উপায়। কিন্তু এখন, ব্যাঙ্ক, বৃহৎ শিল্প এবং পাইকারী কারবার কয়েকটি হাতে সমবেতভাবে কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলেই, মজুতকারী মূলধনের আত্মকলেবর স্ফীত হচ্ছে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে। সুতরাং বাজারের উপর তার ক্ষমতাও হয়েছে তীব্র এবং তীক্ষ্ণ।

পরিসংখ্যানের সাহায্যে এই ক্ষমতার মোটামুটি একটা আন্দাজ দেওয়া যেতে পারে। কোম্পানি-আইন সংক্রান্ত প্রশাসনিক বিভাগ ৭৪টি পাইকার ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সমীক্ষা দ্বারা দেখিয়েছেন যে এই ৭৪টি কোম্পানির মোট ৩৪১ জন ডিরেক্টরের মধ্যে ২৩৩ জন অন্যান্য ১১১১টি কোম্পানিরও ডিরেক্টর এবং তাঁদের মারফৎ ৭৪টি সওদাগরী কোম্পানি অন্যান্য ১১১১টি কোম্পানির সঙ্গে সংযুক্ত। ঐ ১১১ টি কোম্পানির মধ্যে ৪১৪টি কারখানার

উৎপাদনে নিযুক্ত, ১১৩টি নিযুক্ত ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ে, ১৯টি বিদ্যুৎ শিল্পে, ১৮৩টি বিবিধ শিল্পে এবং ৩৮২-টি বাণিজ্যে।

মহলানবিশ কমিটির এই তথ্য থেকে বোঝা যায় কি ভাবে ব্যাঙ্ক, কারখানা এবং পাইকারী ব্যবসায় একচেটিয়া মালিকের অধীনে সংযুক্ত ও কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে।

এই একচেটিয়া মূলধনই বর্তমান ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রধান শক্তি এবং এই শক্তিই মজুত ও মূল্যবৃদ্ধির দক্ষতা সৃষ্টি করছে। এই একচেটিয়া মূলধনই কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে দাম বাড়ায়। ভারতে একচেটিয়া মূলধনের এই বিশিষ্ট রূপটিই সমাজের উদ্বৃত্ত সঞ্চয় থেকে উৎপাদনের ক্ষেত্রকে বঞ্চিত করছে। বিনা ঝুঁকিতে সর্বোচ্চ মুনাফার আকর্ষণ জাতীয় আয়ের একটি বৃহৎ অংশ টেনে আনছে পাইকার ব্যবসায়ে। আবার উচ্চ মূল্য বাধ্য করছে উচ্চবিত্তদের বর্ধিত আয় ভোগের জন্য ব্যয়ে—এই দ্বার দিয়ে তাদের বর্ধিত আয়ও চলে যাচ্ছে পাইকার ব্যবসায়ের গহ্বরে। এমনিভাবেই কালোবাজারের কালো মূলধন স্ফীত হয়। এখন খোলাবাজার নিয়ন্ত্রিত হয় কালোবাজার কর্তৃক।

ব্যাঙ্ক এবং পাইকারী কারবারের জাতীয়করণই এই সমস্যার সর্বপ্রথম সমাধান। উৎপাদনের ক্ষেত্র ক্রমবর্ধমান মূলধন সৃষ্টির কোনোই সম্ভাবনা নেই, যতক্ষণ কালোবাজারের প্রতিপত্তি বর্তমান থাকবে। ব্যক্তিগত হস্তে ব্যাঙ্ক ও পাইকারী কারবারের কেন্দ্রীভূত সংযুক্তি ব্যতীত কালোবাজারের অবস্থান অসম্ভব। এই সিদ্ধান্ত সর্ববিধ পণ্য সম্পর্কেই প্রযোজ্য, খাদ্যশস্য সম্পর্কে তো বটেই।

ভূমিসম্পর্ক ও উৎপাদন

খাদ্যসংকটের সমাধানকল্পে অবশ্যই উৎপাদনের বিপুল বৃদ্ধি আবশ্যক, কিন্তু বণ্টনের ক্ষেত্র একচেটিয়াদের হাতে থাকলে জাতীয় অর্থনীতির উপর তার প্রভাব উৎপাদনের সমস্যাকেও জটিল ও কঠিন করে তোলে। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি উৎপাদন বাড়লেও তা প্রধানত মজুতদারদের হাতেই জমা হয় সুতরাং সংকটের তীব্রতা দেখা দেয় উৎপাদনের বৃদ্ধি সত্বেও। আমরা এও দেখেছি যে উৎপাদনের তুলনায় বণ্টন ব্যবস্থায় সহজলভ্য মুনাফা এত বেশি হয় যে সামাজিক সঞ্চয় উৎপাদনের ক্ষেত্র এড়িয়ে বণ্টনের ক্ষেত্রেই ভিড় করে

আসে। কাজেই বণ্টন-ব্যবস্থার মধ্যে মূলধনের গতি রুদ্ধ করেই উৎপাদন ক্ষেত্রে তার প্রবেশদ্বার সৃষ্টি করতে হবে। এই কথা মনে রেখে এখন উৎপাদন ক্ষেত্রের আভ্যন্তরীণ সমস্যা আলোচনা করা যাক।

উৎপাদনের বৃদ্ধি নির্ভর করে দুইরকম বিষয়ের উপর: (১) ভূমিসম্পর্ক (২) উৎপাদনের বাস্তব উপকরণ। এই দুইটি বিষয়ই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল অথবা বলা যেতে পারে—অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলেই উভয়ের সম্পর্ক বুঝতে পারা যাবে।

ভারতে বর্তমানে ভূমিসম্পর্কের দিক থেকে তিনরকম খামার বিদ্যমান। (১) যে-সমস্ত খামারে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও উৎপাদনপদ্ধতি পূর্ণমাত্রায় অবস্থিত। এই সমস্ত খামারে জমির মালিক কৃষির জন্য কিছুই করে না, চাষীরা হয় বর্গাদার অথবা অন্য কোনো প্রকারের স্বত্বহীন প্রজা। ঠিক কতটা জমি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তার কোনো যথাযথ বিবরণ পাওয়া যায় না। মোটামুটি এক চতুর্থাংশ পরিমাণ চাষের জমি নানা প্রকার লীজ বা ঠিকাদারী প্রথার অধীনস্থ। কিন্তু লীজ আছে দুইরকমের; একরকম, গরীব চাষী লীজ দেয় আর ধনী চাষী লীজ নেয়। আর-একরকম, জমিদার জোতদার অথবা ধনী চাষী লীজ দেয় এবং গরীব চাষী লীজ নেয়। প্রথমোক্ত জমিতে লীজধারীই অবস্থাপন্ন এবং মালিক হলো দুর্বলপক্ষ। এক্ষেত্রে সামন্তবাদী শোষণ অনুপস্থিত। দ্বিতীয় প্রকার জমিতে প্রকৃত চাষী নিজ খরচায় ও নিজ মেহনতে চাষ করে—মালিক হলো সামন্তবাদী শোষণকারী। এই সমস্ত জমির চাষীরাই নানা ধরনের ভাগচাষী বা ঠিকা প্রজা। কৃষি থেকে মুনাফা তো দূরের কথা, নিজ শ্রমের পুরো মজুরীও তারা উঠোতে পারে না।

স্বভাবতই উন্নত কৃষির জন্য তারা কোনো বৈজ্ঞানিক উপকরণ ব্যবহার করতে অক্ষম। চাষের জন্য তারা একান্তভাবেই প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। এই প্রকার ভূমিসম্পর্কের ভিতর কৃষির উন্নতি অসম্ভব। এইরকম জোতের পরিমাণ এখনও নেহাৎ কম নয়। সরকারী হিসেবে জমি লীজের যে-তথ্য দেওয়া হয় তার মধ্যে এরূপ অনেক জমিই ধরা হয় না। বহু গ্রামে যে-সমস্ত বেসরকারী তদন্ত হয়েছে তাতে দেখা যায় যে স্থানে স্থানে চাষের জমির অর্ধেকও অসম মালিকের অধীনে, নানা ধরনের ভাগচাষীরা ঐ জমি চাষ করে। সার কিংবা সেচের কোনো সুবিধা তারা সচরাচর গ্রহণ করতে পারে না।

এই সমস্ত জোতে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রথম শর্ত জমিতে প্রকৃত চাষীর মালিকানা। দুই ভাবেই এটা করা যায়—যে-জমি যে-চাষী চাষ করছে তাকে সেই জমির মালিকানা স্বত্ব দেওয়া এবং তার বর্তমান মালিক যদি কৃষক বা সাধারণ মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোক হয় তাহলে তাকে ঐ জমির বিনিময়ে অন্যত্র জমি দেওয়া। অথবা, জমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ দ্বারা যে উদ্বৃত্ত জমি সরকারের হস্তগত হবে তা থেকে ঐ চাষীদের জমি দেওয়া যেতে পারে। এ সম্পর্কে যে-সমস্ত আইন তৈরি হয়েছে তার পুনর্বিবেচনা, সংশোধন এবং দৃঢ়ভাবে তার প্রয়োগ আবশ্যক।

(২) অধিকাংশ চাষের জমিই ছোট ছোট জোতে বিভক্ত এবং তার মালিকেরা কৃষক। এই কৃষকেরা নিজেরা মেহনত করে, আবার খেতমজুরও নিয়োগ করে। এই খেত-খামারের চাষীরা অতি অল্প জমির মালিক, ঋণের জন্য তাদের হাত পাততে হয় মহাজনের কাছে, ফসলের ন্যায্য দরও তারা পায় না। ফলে কৃষি থেকে তাদের এমন আয় হয় না যার জন্য উপযুক্ত সেচ, সারের ব্যবস্থা করতে পারে। এদের জন্য দরকার সমবায় সমিতি, উপযুক্ত কৃষিঋণের জন্য ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ এবং ফসলের ন্যায্য দর, সুতরাং কৃষিজাত পণ্যের পাইকারী ব্যবসায়ের জাতীয়করণ।

(৩) জমির মালিক প্রধানত খেতমজুর নিয়োগ করে চাষ চালায় এমন জমির পরিমাণ প্রায় এক তৃতীয়াংশের কাছাকাছি হবে। এই ধরনের খামার ধনতান্ত্রিক কৃষির পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু এই অংশটিও ধনতান্ত্রিক বিকাশের এমন আদিম স্তরে অবস্থিত যে মূলধন নিয়োগ দ্বারা উন্নত প্রণালীর চাষ খুবই সীমাবদ্ধ। প্রাক্তন জমিদার ও ধনী চাষীরাই এই জমির মালিকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কৃষির জন্য সরকারী সাহায্যের মোটা অংশ এদেরই হাতে যায় এবং কৃষির উৎপাদন যেটুকু বেড়েছে তা এদের খামারেই বেড়েছে। যেহেতু সরকারী সাহায্যের সুবিধাগুলি শুধু এদের হাতেই পৌঁছয়, সর্বস্তরের প্রকৃত চাষীর হাতে পৌঁছয় না, সেই জন্যই দুই-তৃতীয়াংশ জমিতে উন্নতির কোনো ব্যবস্থা নেই। আবার ঐ এক-তৃতীয়াংশের মালিকেরাও কৃষির জন্য মূলধন খাটানোর চেয়ে মহাজনী মজুতদারীতেই বেশি খাটায়। কৃষির উন্নতিকল্পে সেচ, সার, বীজ ও আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্য যাতে সর্বস্তরের কৃষকেরা পেতে পারে তার জন্যই ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তন চাই। স্বত্বহীন চাষীর জন্য মালিকানা, মালিক চাষীদের জন্য সমবায় এবং কৃষিঋণ ও ফসলের ন্যায্য দরের গ্যারান্টির জন্য ব্যাঙ্ক ও পাইকারী কারবারের জাতীয়করণ দ্বারাই সেই পরিবর্তন আনতে হবে।

সুতরাং ঘুরে ফিরে আমরা একই কথায় এসে পৌঁছই। কি বণ্টনে, কি উৎপাদনে সর্বক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক ও পাইকারী কারবার উন্নতির উৎস রুদ্ধ করে বসে আছে।

পুস্তক-পরিচয়

চিরযৌবনজয়গান

The Gentle Colossus. Hiren Mukerjee. Manisha. 15·00

পেশাদার ঐতিহাসিক অনেক সময় জীবনী নিয়ে ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছেন। মানুষ এবং সমাজ নিয়ে ইতিহাসের কারবার; জীবনী ইতিহাসের অঙ্গ। পেশাদার সাংবাদিকও জীবনী লেখেন। তাঁদের লেখা সুখপাঠ্য এবং সাধারণ পাঠকের কাছে আকর্ষক, কিন্তু অনেক সময় তাঁদের লেখা ঐতিহাসিক গবেষণার স্তরে পৌঁছয় না। শ্রীহীরেন মুখোপাধ্যায় ঐতিহাসিক; ঐতিহাসিকের অন্তর্দৃষ্টি এবং বিশ্লেষণ তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু মনে হয় জীবনী লিখতে গিয়ে তিনি সাংবাদিকের পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। তাঁর অনেক বক্তব্য অসমবদ্ধ। অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া দুঃসাধ্য।

জওহরলাল নেহরু মহান চরিত্রের মানুষ: "This was a Man"। গভীর আন্তরিকতা নিয়ে শ্রীমুখোপাধ্যায় নেহরু-চরিত্রের গুণাবলী আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এই মান্ধাতাগন্ধী দেশে নেহরু গতিশীল জীবনের প্রতীক। প্রথম যৌবনে তিনি অনুভব করেছেন, "কোথাও যেন আমার ঘর নেই, সর্বত্রই আমি খাপছাড়া"। পরে তিনি দেশের মধ্যে তাঁর ঘর খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে যে-মহিমা সুপ্ত ছিল তাকে জাগিয়ে তুলতে প্রধানত সাহায্য করেছিলেন গান্ধীজী। স্বাধীনতা-সংগ্রামে নেহরুর যোগদান ইতিহাসে একটি বড় দরের ঘটনা।

নেহরু ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতা, গান্ধীর পরেই তাঁর স্থান। কিন্তু কী ভাবে তিনি তাঁর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন? জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে তাঁর সময় আরো অনেক নেতা এসেছিলেন। লাহোর কংগ্রেসে সভাপতি-পদের জন্য তাঁর নাম প্রস্তাব করেছিল মাত্র তিনটি প্রাদেশিক কমিটি, দশটি কমিটি গান্ধীর নাম এবং পাঁচটি প্যাটেলের নাম প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু স্বাধীনতা-আন্দোলনের তরঙ্গশীর্ষে তাঁর নেতৃত্বই প্রতিষ্ঠিত হল। তিনি ছিলেন উন্নত চিন্তাধারার বাহন এবং সংগ্রামী রণনীতির প্রবক্তা। লাহোর কংগ্রেসে তিনি ঘোষণা করেন, "আমি সমাজতন্ত্রী এবং

প্রত্যাত্মী"। নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে তিনি সভাপতিত্ব করেন। কংগ্রেসের পুরনো নেতাদের কাছে তিনি ছিলেন 'চরমপন্থী'। দেশে ক্রমবর্ধমান বামপন্থী চিন্তাধারার প্রবক্তা এবং বামপন্থী অংশের নেতা-রূপে তিনি (এবং সুভাষচন্দ্র) পুরোভাগে আসেন। ইতিহাস নেতা সৃষ্টি করে। নেহরু ভারত-ইতিহাসের সৃষ্টি।

বামপন্থী চিন্তাধারা এবং কর্মপদ্ধতির দিকে নেহরুর আকর্ষণের পটভূমি কি? শ্রীমুখোপাধ্যায়ের বইতে এই পটভূমি ফুটে ওঠে নি। নেহরুর 'আত্ম-জীবনী' এবং 'বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ' এ বিষয়ে আলোকপাত করে। ১৯২৭-৩২ পর্বের গুরুত্ব ইতিহাসের ছাত্রদের জানা থাকবার কথা। সোভিয়েত বিপ্লবের প্রভাবে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রসার এবং শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগতি এই পর্বের বৃহত্তম ঘটনা। ১৯২৯ সালে বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের সুরু। বিশ্ব ধনতন্ত্রবাদ এক গভীর সংকটের মুখে। ১৯২৭ সালে নেহরুর সোভিয়েত রাশিয়া ভ্রমণ, রলাঁ এবং আর্নস্ট টলারের সঙ্গে পরিচয়, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে আলোচনা (আত্মজীবনী পড়ে মনে হয় মানবেন্দ্রনাথ রায় নেহরুর মনে গভীর ছাপ ফেলেছিলেন) এই পর্বের ঘটনা। দেশের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা হয়েছে। যুবসমাজ চঞ্চল। এই পটভূমিতেই নেহরু সমসাময়িক অনেক বুদ্ধিজীবীর মতো সমাজতন্ত্রবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েন। নেহরু সেই যুগের সৃষ্টি।

দক্ষিণপন্থী নেতারা বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনী ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। শ্রীমুখোপাধ্যায় অতি সংক্ষেপে ১৯৩৬-৩৭ সালের ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন, যদিও *'A Bunch of Old Letters'* থেকে আরো বেশি তথ্য দেয়া যেত। ১৯৩৬ সালে ওয়ার্কিং কমিটি থেকে রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বল্লভভাই প্যাটেল এবং রাজাগোপালাচারীর নেতৃত্বে সাতজন সভ্য পদত্যাগ করেন। নেহরুর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এটা তাঁদের প্রথম বড় আক্রমণ, যে আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য বামপন্থী আন্দোলন। পরবর্তীকালে এই আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র। গান্ধীজীর হস্তক্ষেপের ফলে ব্যাপারটা মিটে গেলেও দক্ষিণপন্থীদের মনোভাব আদৌ অস্পষ্ট থাকে না। এদের কাছে নেহরু ছিলেন, তাঁর নিজের ভাষায়, "an intolerable nuisance" (পৃ. ৭৩)।

দক্ষিণপন্থীদের সম্পর্কে নেহরু ঠিক কি নীতি অনুসরণ করে গেছেন?

তিনি বার বার ('বেদনা এবং নৈরাশ্যের' সঙ্গে হলেও) এক দুর্বোধ্য আপস নীতি অবিচলভাবে অনুসরণ করে গেছেন। এই প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ির বিষয় এসে পড়ে। দুই নেতার মধ্যে আদর্শগত বিরোধ একেবারে ছিল না তা নয়। ইওরোপে ফাসিস্ট শক্তির বিশ্ব-রাজনীতিতে যে গভীর পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল, সুভাষচন্দ্র তা বুঝতে পারেন নি বলে মনে হয়। মূলত জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সুভাষচন্দ্র রাজনীতিকে বিচার করতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু ১৯৩৯-৪০ সালে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী রণকৌশল অনুসরণের প্রশ্নে তিনি অবিচল ছিলেন। দক্ষিণপন্থী ষড়যন্ত্র এবং আক্রমণের মুখে তিনি নতুন দল ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করেন। তাঁর নেতৃত্বে 'Left Consolidation Committee' স্থাপিত হয়, যার মধ্যে কমিউনিস্ট এবং সমাজতন্ত্রী দল ছিলেন। কী ভাবে এবং কেন বামপন্থী ঐক্যস্থাপনের এই প্রচেষ্টা অতি দ্রুত ভেঙে গেল তা জানা দরকার। শ্রীমুখোপাধ্যায় এই ঘটনার কোনো উল্লেখ করেন নি। বর্তমান লেখকের মতে দেশের সেই ঐতিহাসিক অবস্থায় বামপন্থী ঐক্যের অনেক সম্ভাবনা ছিল যা অঙ্কুরেই শুকিয়ে গেল।

সুভাষচন্দ্রের অপসরণের পরে যে ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হয়, নেহরু তাতে যোগ দেন নি। কিন্তু রামগড় কংগ্রেসে মৌলানা আজাদের নেতৃত্বে যে ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হয়, নেহরু তাতে যোগ দেন। তখন থেকে ক্ষমতা হস্তান্তর পর্যন্ত নেহরু দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে মূলত আপস নীতি অনুসরণ করে চলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগের গণঅভ্যুত্থানের সেই বড়ো দিনগুলিতে নেহরুর ভূমিকা দুর্বোধ্য। লাহোর কংগ্রেসের উত্তপ্ত নেহরু তখন অনেক ঠাণ্ডা, অনেক ভদ্র। মনে হয় গান্ধীজী নেহরুকে ভালো বুঝেছিলেন। তাঁর মতে নেহরু "an extremist in thinking for ahead of his surroundings but he is humble and practical enough not to force the pace to the breaking point" (পৃ. ৭৫)। নেহরু বাস্তববাদী, শেষ সীমা লঙ্ঘন করতে তিনি নারাজ।

কেন নেহরু দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে আপস করে চলেছিলেন? তাঁর মনে হ্যামলেটসুলভ অস্থিরতার কারণ কি? এটা কি শুধু গান্ধীর প্রভাব? শ্রীমুখোপাধ্যায়ের মতে সামাজিক পরিবর্তনের জন্য যে 'কঠিন মূল্য' দেবার প্রয়োজন হয়, নেহরু তা দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। শ্রীমুখোপাধ্যায়ের

কাছে লিখিত নেহরুর দুটো চিঠি পড়ে মনে হয়, তিনি কংগ্রেসের বাইরে চলে আসতে ভরসা পান নি। কাদের নিয়ে তিনি কাজ করবেন? তাঁদের সঙ্গে তাঁর মতে মিলবে? জয়প্রকাশ তাঁর প্রিয়, কিন্তু নেহরু-নীতির প্রতিটি বিষয়ে তিনি ভিন্ন মত পোষণ করেন (পৃ. ১৩৯)।

এই প্রসঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের দুর্বলতার বিষয়টি এসে পড়ে। শ্রীমুখোপাধ্যায় অবশ্য ভারতের ইতিহাসে বিগত চল্লিশ বছরে "tinge of poetry in political life" দেখেছেন (পৃ. ৩১)। এই বক্তব্য অবাস্তব। বাস্তব কি? বিগত চল্লিশ বছরের রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাসে যেমন আছে অসংখ্য মানুষের সাহস, ত্যাগ, নিঃস্বার্থ সেবার দৃষ্টান্ত, তেমনি আছে ক্ষমতার জন্য কাড়াকাড়ি, উপদলীয় চক্রান্ত, কূপমণ্ডূকতা, প্রাদেশিকতা এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা। রাজনৈতিক আন্দোলনের এই দুর্বলতা (যা দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতার প্রতিফলন) নেহরুর মানসিক অস্থিরতার মধ্যে প্রতিফলিত। মনে হয় অপেক্ষাকৃত সুস্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে নেহরুর মধ্যে সুপ্ত সম্ভাবনা আরো বেশি বিকশিত হতে পারত। তাঁর দুর্বলতা বুদ্ধিজীবীর প্রকৃতিগত। গান্ধীর পথে তিনি আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিলেন।

ব্যক্তিগত মূল্য তাঁকে দিতে হয়েছে। মানসিক দ্বন্দ্বে তিনি বিদীর্ণ হয়েছেন। *Whither India*-তে যে-ভারতের চিত্র তিনি গড়েছিলেন তাঁর জীবিতকালে তা দৃশ্য হয় নি। চতুর্থ পরিকল্পনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে পিছনের দিকে ফিরে তাকালে অনেক ফাঁকি ও ব্যর্থতা চোখে পড়বে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির গতি অতি মন্থর। কৃষিসংস্কার প্রহসনে পরিণত। কৃষকসমাজের যে দারিদ্র্যের কথা ডিগবি এবং রমেশ দত্তের লেখায় ফুটে উঠেছিল, যে-দারিদ্র্য দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের পথে বড় বাধা, আজও সেই দারিদ্র্য অক্ষুণ্ণ। সমাজদেহে দুর্নীতি দুরন্ত ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়ছে। ভুবনেশ্বরে সমাজতন্ত্রের আদর্শ ঘোষিত হয়েছে, কিন্তু সেই আদর্শ দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার হিংস্র আক্রমণের সম্মুখীন।

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে নেহরুর অসাধারণ সাফল্য স্বীকৃত। শ্রীমুখোপাধ্যায় এই নীতিকে 'ভারতের মধ্যপন্থা' বলে বর্ণনা করেছেন। বান্দুং সম্মেলনে এবং কোরিয়া, ইন্দোচীন ও সুয়েজ প্রশ্নে নেহরুর নীতি প্রগতিশীল এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী। ১৯৬২ সালে চীনের আক্রমণের মুখে

ইঙ্গ-মার্কিন ব্লক এবং ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রবল চাপ সত্ত্বেও তিনি জোট-নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণে অবিচল ছিলেন। বিশেষ মহলের পাক-ভারত 'যুক্ত প্রতিরক্ষার' পরামর্শ তিনি নাকচ করেছেন। পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তিনি গোয়ায় সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর 'মধ্যপন্থা' সেই পথ যার 'উজ্জ্বল শিখা সহজে নিভবে না' (পৃ. ২১১)।

নেহরু সম্পর্কে ইতিহাসের রায় কি হবে? শ্রীমুখোপাধ্যায় এই প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেছেন। এই প্রসঙ্গে টয়েনবির মত বর্তমান লেখকের কাছে মূল্যবান মনে হয়েছে। টয়েনবির মতে নেহরুর ব্যক্তিগত গুণাবলীর স্মৃতি সময়ে ম্লান হয়ে যাবে, তারপর হয়তো মুছে যাবে। কিন্তু ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে থাকবেন এই কারণে যে তিনি মনুষ্যজাতির কল্যাণ কামনা করে গেছেন: "He did care intensely for mankind's welfare and destiny, and his vision of this will be the thing in him for which he will be remembered by posterity if the verdict of history faithfully reflects the fundamental truth about him" (Encounter, আগস্ট ১৯৬৪)। সমসাময়িক পৃথিবীতে নেহরু সেই মুষ্টিমেয় রাজনৈতিক নেতাদের অন্যতম যাঁরা কর্মে ও কথায় মনুষ্যজাতির আত্মীয়তা অর্জন করেছেন এবং তার শুভ কামনা করে গেছেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই চিন্তা অসাধারণ ধৈর্যের সঙ্গে আঁকড়ে ধরেছিলেন। মনের যে আবেগ ও প্রসারতা থাকলে রাজনৈতিক নেতার মধ্যে এই চিন্তা বিকশিত হয় এ দুনিয়ায় তা সুলভ নয়; নেহরুর স্মৃতি অনির্বাণ দীপশিখার মতো উজ্জ্বল থাকবে। নেহরুর এই মূল্যায়ন মেনে নিতে অনেকের অবশ্যই অসুবিধা হবে।

সুনীল সেন

বক্তব্যপ্রধান উপন্যাস

Hungry Hearts : By D. C. Home. Kathashilpa, Calcutta—12. Bound Rs. 10.00 ; Paper back Rs. 7.00

উপন্যাসটির নায়ক রণজিৎ রায় সতর বছর বয়সেই ময়মনসিং জেলার রাজপুরের কিষাণ বিদ্রোহের নেতা। তখনই আধা-কমিউনিস্ট। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলো কিন্তু ফাঁসি হলো না। মা সুরমা দেবী তাঁকে বাঁচিয়ে দিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধে নামার পর বন্দীমুক্তির হিড়িকে রণজিৎ জেল থেকে বেরিয়ে বোম্বাইয়ে এল এক জাতীয়তাবাদী ইংরাজি পত্রিকায় শিক্ষাধীন রিপোর্টারের কাজ নিয়ে। মতলব ছিল কিছুদিন সব ব্যাপার তলিয়ে চিন্তা করার পর আবার কমিউনিস্ট বিপ্লবী জীবন শুরু করবে। কিন্তু অবিকল সেই ব্যাপারটিই আর ঘটে উঠল না। 'ভারত ছাড়ো' অভ্যুত্থানের মধ্যে দেশপ্রেমের যে-অভিব্যক্তি সে দেখতে পেল তাকে শুধু 'হ্রীগ্‌লওয়ালা' ও 'বিপথগামী দেশভক্ত'-দের ভুল কার্যকলাপ বলে উড়িয়ে দিতে পারল না। বিনা নোটিশে পনর দিন ছুটি নিয়ে ঘুরে ঘুরে সব ব্যাপার দেখতে লাগল। কিন্তু বিয়াল্লিশের সংগ্রামে সে যোগ দেয় নি। মনে মনে বন্ধু আবু হসেনের মতো সেও বিশ্বাস করত, সারা পৃথিবীর মানুষ ফ্যাশিবাদকে পরাস্ত করতে পারলে তবেই ভারতে বিপ্লবের মুহূর্ত আসবে এবং ভারত স্বাধীনতাসংগ্রামে জয়ী হতে পারবে। কিন্তু সেই মুহূর্তের জন্য ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রস্তুতি কোথায়? শুধু কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে দূতিয়ালি করা এবং Dizzy-র কথামতো কোনো না কোনো একটা 'কাজে' নিজেকে ডুবিয়ে রাখাই কি যথেষ্ট? পাকিস্তান দাবী কি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আওয়াজ? না, কমিউনিস্ট পার্টি কেবল মার্কসবাদের বুলি আওড়ায় কিন্তু মার্কসবাদকে দেশের ও আন্তর্জাতিক জগতের এক জটিল অবস্থায় সৃষ্টিশীলভাবে প্রয়োগ করতে পারছে না। পার্টির নেতৃত্ব চলে গিয়েছে মধ্যশ্রেণীর ও উচ্চ মধ্যশ্রেণীর অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ ফেরত অতি-শিক্ষিতদের হাতে। এই ধরনের চিন্তায় জর্জরিত হয়ে রণজিৎ কমিউনিস্ট পার্টির একজন অনুরাগী সহচর, বিশস্ত বন্ধু এবং কিছুদিনের জন্য প্রার্থীসভ্য হওয়া সত্ত্বেও কোনোদিন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারল না। অবশেষে পথচারিণী গার্গীর সঙ্গে তার যৌন সম্পর্কের ব্যাপার নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তার শেষ ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

স্বাধীনতালাভের কিছু আগেই রণজিৎ খবরের কাগজের চাকরি ছেড়ে ফিরে গেল নিজের গ্রামে। এল পাকিস্তান। পাকিস্তানি জেলে সাত বছর কাটিয়ে রণজিৎ আবার এল বোম্বাইয়ে। কিন্তু কোনো পত্রিকায় তার কাজ জুটল না। সাংবাদিক জগতে সম্পাদকের ক্ষমতার দিন চলে গেছে, কায়েমী হয়েছে স্বত্বাধিকারী পাণিপুরিওয়ালাদের একচ্ছত্র প্রভুত্ব। ব্যর্থ রাজনৈতিক জীবনের বোঝাকে সাহিত্যের হাটে নামিয়ে হাল্কা হতে চাইল রণজিৎ। সঙ্গে সঙ্গে যদি কিছু অর্থও জুটে যায়। ইতিপূর্বেই সে ইংরাজিতে একটা বই লিখেছিল কমিউনিস্টদের উদ্দেশ করে। কাটেনি। এবারে লিখল ইংরাজি উপন্যাস। কাটল না। অর্থের দিক থেকে ফতুর হয়ে গেছে রণজিৎ। এমন সময়ে এক অত্যন্ত লোভনীয় চাকরির প্রস্তাব এল গীতাঞ্জলির কাছ থেকে। গীতাঞ্জলি! কুমারী বয়সে সে ছিল স্কার্ট ও স্ল্যাক্‌স্‌ পরা কুমু। তারপর কলকাতার নৈশ জগতের ঝিকমিকে তারা। অতঃপর বোম্বাইয়ের প্রগতিশীল মহলে খ্যাতনাম্নী লেখিকা-অপ্সরা! সেই সময়েই রণজিতের সঙ্গে এক রাত্রির সহবাস ঘটে এবং সন্তান-সম্ভবা হয়। কিন্তু বিয়ে করে রণজিৎকে নয়, রণজিতের বন্ধু কোটিপতির ছেলে জিথুকে, যদিও রণজিৎ আত্মহত্যা করার চেষ্টা বিফল হওয়ার পর গীতাঞ্জলিকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। জিথুরই শিল্পসাম্রাজ্য আত্মসাৎ করে গীতাঞ্জলি অবশেষে হলো ভারতের বেসরকারি শিল্পোদ্যোগের একজন মহিলা অধিনায়ক। গীতাঞ্জলির কৃপার দানকে প্রত্যাখ্যান করল রণজিৎ। একে একে সব বাঁধনই খসে গেল রণজিতের। গান্ধীর সঙ্গে কায়েম্মাদের পালাটা এর আগেই সাঙ্গ হয়েছিল। গীতাঞ্জলির সঙ্গে শেষ বোঝাপড়ার পর মাত্র দারিদ্র্যের অহংকারকে সম্বল করে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়ল রণজিৎ। 'পথ কৈছু ঘর'। জল্লাদের ফাঁসির দড়ি আড়াই মিনিটের জন্য রণজিতের গলায় এঁটে বসল না বটে কিন্তু সারাজীবন সেটাকে গলায় পরে থাকতে হলো। ফাঁসির মঞ্চকে ফাঁকি দিয়েছে বলেই সে কাপুরুষ, নিষ্কর্মা হয়ে পড়েছে, এই অপরাধবোধ থেকে সে কোনোদিন পরিত্রাণ পেল না।

রণজিৎকে খাড়া করতে পারা এবং একটা বোধগম্য পরিণতি পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া কম কথা নয়। গীতাঞ্জলি কিঞ্চিৎ অবিশ্বাস্য চরিত্র। রণজিতের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকারে গীতাঞ্জলির আধ্যাত্মিক আত্মগরিমা কেমন ফাঁকা ফাঁকা শোনায়। জিথুকে নিয়ে লেখক ছেলেখেলা করেছেন। হলোই বা কোটিপতির

ছেলে। অমন নিষ্ঠাবান কমিউনিস্টরা অত সহজে এবং অকারণে কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়ে দেয় না। জান মালহোত্রার সঙ্গে পার্টির 'বিপ্লবী' কমরেডরা জেলে যেরকম অমানবিক ব্যবহার করেছিল, সে ধরনের ঘটনা ৪৮-৪৯ সালে ঘটেছিল ঠিকই। তবে পার্টি লাইন বদলাবার পর জান পার্টি সভ্যপদের পুনরারম্ভে রাজী হলো না কেন? নৈতিক আপত্তি? খুব ভাল কথা। কিন্তু পার্টি থেকে বিতাড়ন কি কেবল বহিষ্কৃতকে কিছুকাল পরে 'rehabilitate' করার জন্যই হয়? কোনোদিন তো এমন কথা শুনি নি।

সবিতা দেবীটেবী গোছের চরিত্র। তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু প্রথম দিকে দেখি; সবিতা জানকে লেখা মালতী প্রধানের এক তাড়া গোপন প্রেমপত্র রণজিৎকে দেখিয়ে বলছে: "It has never occurred to me all these years that he was so beastly"। রণজিৎই মহাত্মা সেজে সবিতাকে বিবাহ বিচ্ছেদের অভিপ্রায় থেকে নিরস্ত করেছিল। শেষ দিকে সবিতা জান সম্বন্ধে বলছে: "If there was any such thing between him and any other girl, he would've never concealed it from me।" এই ধরনের পূর্বাপর অসংগতি আরো আছে। গোড়ার দিকে রণজিৎ গীতাঞ্জলিকে বলছে, এতো ভাববার কি আছে, এখন তো শুধু রেজিষ্ট্রারের কাছে যাওয়াটাই বাকী। শেষ সাক্ষাৎকারের সময়ে রণজিৎ গীতাঞ্জলিকে বলছে, কি জানো, এখন আমার মনে হচ্ছে, 'আমরা' রেজিষ্ট্রার বা পুরুতের কাছে গেলেই সব ল্যাঠা চুকে যেত। ভারত ছাড়ো অভ্যুত্থানের যোদ্ধা এবং সোশ্যালিজম-মাইনাস-রাশিয়া দলের একজন নেতা, ঘোরতর কমিউনিজম বিরোধী পাণিক্করের চিত্তাকর্ষক চরিত্র, কিন্তু লেখক তাকে ওই দল ছাড়িয়ে স্বাধীন ভারতে বেসরকারি শিল্পোদ্যোগের একজন চাঁই করে তুললেন কেন? ফলে চরিত্রটি যাথার্থ্য হারিয়ে ফেলেছে।

সুরমা দেবী, আবু হুসেন, মিস্টার নিউম্যান ও গান্ধী, এই ছোটখাটো চরিত্রগুলি সত্যই উতরেছে। সুরমা দেবী 'অগ্নিযুগ'-এর সেই সব বাঙাল মায়েদের প্রতীক যারা ইতিহাসের উপেক্ষিতা। গোঁড়া কমিউনিস্ট আবু হুসেনকে ভারত ছাড়ো বিপ্লবীরা পিটিয়ে প্রায় শেষ করে দেওয়া সত্ত্বেও সে যখন তাদেরই বাঁচানোর জন্য মেশিন গান হাতে নিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল, সেই মুহূর্তটি সম্বন্ধে লেখক বলেছেন: "It was patriotism at its most transcendent moment।" বিয়াল্লিশের কালে

দেশপ্রেমের দুই বিপরীত ধারণা দেখা দিয়েছিল, এক ধারণার সঙ্গে আর এক ধারণার বিরোধ ছিল, আবার মিলনও ছিল। এই মূল সত্যের এত সুস্পষ্ট উপলব্ধি বিয়াল্লিশের যুগ সম্বন্ধে এই উপন্যাসটি ছাড়া অন্য কোনো উপন্যাসে দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না। সম্পাদক মিস্টার নিউম্যান অবিস্মরণীয়। শেষ রাত্রে গান্ধীর রেগুলেশন পোশাক পরে রণজিতের যৌনকামনা চরিতার্থ করার প্রয়াসটা দেখলে হাসি পায় আবার মেয়েটির জন্য মায়াও হয়। রণজিৎকে সে ঠিকই বুঝেছিল, বলত, বাচ্চা।

বক্তব্যপ্রধান উপন্যাস, ইতিহাসের পৃষ্ঠপটে লেখা। কমিউনিস্ট পার্টির বহু সমালোচনা আছে রণজিৎ, আবু হুসেন, জান মালহোত্রা ও পাণিক্করের চিন্তাধারায়। একটা রসালো তত্ত্বেরও সাক্ষাৎ পাই, যথা, 'division of the gains of revolution'। তত্ত্বটির মাথামুণ্ডু অবশ্য কিছুই বুঝি নি, কিন্তু তাতে কি ? গোলমেলে চিন্তা তো বাস্তব জগতে আছে। উপন্যাসে তার প্রতিফলন দেখলে খুশিই হই। এই যেমন পাণিক্কর বলছে, পরমাণুর যুগে Madame Force-এর দিন গত হয়ে গেছে, ক্যাপিট্যালিজম ও কমিউনিজমেব শেষ যুদ্ধে তিনি আর ইতিহাসের ধাত্রীরূপে কাজ করবেন না, তাই ভারতীয় বিপ্লব হবে 'সম্মতিদত্ত বিপ্লব' এবং সরকারি ক্ষেত্রের সঙ্গে বেসরকারি ক্ষেত্রের প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়েই এই 'বিপ্লব' সাধিত হবে!! 'সম্মতিদত্ত বিপ্লব' সোনার পাথরবাটি, শান্তিপূর্ণ বিপ্লব বলতে আদৌ তা বোঝায় না, সরকারি ক্ষেত্রের সঙ্গে বেসরকারি ক্ষেত্রের অবাধ প্রতিযোগিতা একটা স্ববিরোধী ধারণা এবং তার ফলে দেশে অর্থনৈতিক নৈরাজ্য ছাড়া আর কিছুই আসতে পারে না, এসব কথা বলাই বাহুল্য।

লেখক ভারতীয় হয়েও ইংরাজি ভাষায় উপন্যাস লিখেছেন, এটা আমার কাছে কোনো বিবেচনার বিষয়ই নয়। লিখুন। তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় না আবার জাতীয় সংহতির পথ প্রশস্তও হয় না। কিন্তু বইটিতে এমন অনেক কথা বলা হয়েছে যা পড়ে মনে হয়, লেখকের ধারণা এই যে, জাতীয় ঐক্যের খাতিরে উপন্যাস মাতৃভাষায় না লিখে ইংরাজিতে লেখা উচিত। খুবই ভুল ধারণা। আসল কথা, উপন্যাসটি কলাকৃতির দিক থেকে উচ্চাঙ্গের না হলেও ভাল হয়েছে। নতুন ধরনের উপন্যাস, মননশীল, চিত্তাকর্ষক, এক যুগের ও যুগাবসানের আলেখ্য।

প্রশান্ত রায়

কয়েকটি বাংলা উপন্যাস

শেষ বসন্ত—অজিতকৃষ্ণ বসু। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা ১২। ৪.০০
চৈত্রের প্রহর—শৈলেন চৌধুরী। আন-বিতান, কলকাতা ৩৭। ২.০০
ঘূর্ণবেড়িয়ার কড়চা—রবি সেন। মিত্রালয়, কলকাতা ১২। ৪.০০
একই সমুদ্র—সুরজিৎ দাশগুপ্ত। ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা ৬। ৩.৫০
দিনরাত্রি—সুরজিৎ দাশগুপ্ত। ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা ৬। ৩.৫০

যে-কোনো বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে উপন্যাস রচনা করা সম্ভব কিনা, সম্ভব হলেও তা সংগত কিনা, সে-প্রশ্ন মুলতুবি রেখেও বলা যায়, যে-সমস্যা বৃহত্তর সমাজজীবনের পক্ষে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, উপন্যাসের উপযুক্ত বিষয়বস্তু হওয়ার যোগ্যতা অন্তত তার কণামাত্র নেই। অজিতকৃষ্ণ বসুর উপন্যাস 'শেষ বসন্ত' পড়ে পাঠকের মনে এ-সিদ্ধান্ত জাগা বিচিত্র নয়। কিছুকাল আগে সমস্ত কলকাতা শহর, অন্যান্য ছোটবড় অনেক নগর উপনগরও আলোড়িত হয়ে উঠেছিল এ-আশঙ্কায় যে অনেকগুলো গ্রহের একত্র-সমাবেশের ফলে পৃথিবী এবার ধ্বংস হবেই। হোমযজ্ঞ ইত্যাদি নানাবিধ শান্তি-স্বস্ত্যয়নেরও ব্যবস্থা হয়েছিল পার্কে পার্কে। বলা বাহুল্য, প্রতিক্রিয়াটা একদল মানুষকে চিন্তিত করে তুললেও, সব মিলিয়ে যাগযজ্ঞের হাস্যকর অনুষ্ঠানগুলো শিক্ষিত সমাজের মনে বিন্দুমাত্র আঁচড়ও কাটতে পারে নি। কিন্তু আশ্চর্য, শেষ বসন্তর প্রধান চরিত্র অধ্যাপক অনিমেষ রায়ের প্রথমাবধি এইটেই শেষ সিদ্ধান্ত যে পৃথিবীর শেষ দিন আর বেশি দূর নয়, শুধু খানিক সময়ের অপেক্ষা মাত্র। যদিও লেখক অধ্যাপকের অনুভাবনাকে মনস্তত্ত্বের নিগূঢ় জটিলতার মধ্যে প্রসারিত করতে চেষ্টা করেছেন, তথাপি দেখা গেল বস্তুত তিনি একটা ঘটনাসর্বস্ব কাহিনী তৈরী করতেই চেয়েছিলেন। এবং সে-কাহিনী কতকগুলো অসংবদ্ধ ঘটনার সমাবেশ ভিন্ন আর কিছু নয়। ভণ্ড সন্ন্যাসীর বুজরুকি, ম্যাজিকের মঞ্চে রহস্যময় আত্মহত্যা, একজন সম্ভাবিত স্ত্রীর সঙ্গে যৌবনোত্তর যুবকের প্রণয় প্রচেষ্টা এবং সর্বোপরি ছাত্রছাত্রীর ব্যর্থ প্রেমের নিষ্ঠুর পরিণতি—সবই আছে শেষ বসন্তে, নেই শুধু সাহিত্যসৃষ্টির একাগ্র আগ্রহ। প্রধানত, লেখকের লেখার অভ্যাস ভিন্ন আর কিছুর সন্ধান আমরা এ উপন্যাসে খুঁজে পেলাম না, সংবাদটা দুঃখের হলেও সত্যি।

'চৈত্রের প্রহর' উপন্যাসে শৈলেন চৌধুরী বিষয়বস্তুর দিক থেকে কেন্দ্রচ্যুত

হন না, এটা বড় আশার কথা। কিন্তু তবু প্রশ্ন থাকে, বস্তিজীবনের যে বাস্তবতার ছবি তিনি এঁকেছেন, তা বাংলাসাহিত্যে যখন নতুন কিছু নয় এবং একটি নারী-জীবনের সফলতাকে যখন শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেলেন অফিসের সীমায় এবং সহকর্মীর ভালবাসায়, তখন তথাকথিত একটি প্রেমোপাখ্যান তৈরী করতে গিয়ে লেখক শেষ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ বাস্তব সত্যকে অগ্রাহ্য করলেন কিসের ভরসায়! একটি জটিল সমস্যাকে বড় সহজ সমাধানের পথে টেনে এনে তিনি বাস্তবতাকে হারিয়েছেন, অথচ নবতর কোনো আদর্শের কিনারায় নিয়ে তাঁর গল্পকে ভিড়াতে পারেন নি।

যা পেরেছেন রবি সেন তাঁর 'সূর্যবেড়িয়ার কড়চা'য়। ক্ষণে ক্ষণে বিভূতিভূষণ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এ উপন্যাসের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে দেখলেও একটা বড় আশার কথা এই যে লেখক গতানুগতিক একটি নিছক সামাজিক জীবনচর্চায় নিজেকে ভাসিয়ে দেন নি। হতে পারে শহরের সহস্র শিক্ষিত পাঠকের সঙ্গে সুন্দরবন অঞ্চলের এই সব নীচজাতির অপ্রত্যক্ষ পরিচয়ও কোনোদিন ঘটে নি, কিন্তু লেখকের সত্যনিষ্ঠা এখানে এত বেশি প্রত্যক্ষ যে সূর্যবেড়িয়া তার সমস্ত চরিত্রকে নিয়ে শহরের মানুষের চোখের সামনে সুস্পষ্ট স্বচ্ছতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পেরেছে। কিন্তু স্থান কাল পাত্রের ভিন্নতা সত্ত্বেও দক্ষিণ অঞ্চলের ঐসব নীচজাতির মানুষ বাস্তবিক যে মানুষই সে-সত্য লেখক মুহূর্তের জন্যও ভোলেন নি বলেই যারিক থেকে রাঘব ভিজাল পর্যন্ত সকলেই এখানে এমন জলজ্যান্ত হয়ে উঠতে পেরেছে। যদিও সোনামনি-চরণকে দৃষ্টান্তরে দুর্গা-অপু বলে মনে হয়েছে, তবু জীবনের অভিজ্ঞতায় সোনামনি-চরণ যে তাদের তুলনায় অনেক বেশি বয়স্ক হবেই তাতে আর বিচিত্র কি! কিন্তু শুধু মানুষই নয়, এ-উপন্যাসের বাস্তব পটভূমিকে এড়িয়ে গেলে বস্তুত কাহিনীটিকেও হারিয়ে ফেলতে হবে। সুতরাং অত্যন্ত সচেতনভাবে সুন্দরবন অঞ্চলকে তুলির টানে টানে এঁকে তুলতে চেষ্টা করেছেন লেখক। সার্থক যে হন নি এমন কথা বলছি না, তবু আপত্তি না জানিয়ে উপায় নেই যে প্রকৃতি-বর্ণনা যত সফলই হোক, প্রয়োজনকে অতিক্রম করে গেলে সে গতিকে ব্যাহতই করে, অন্তত রবি সেন প্রলোভনকে ত্যাগ করতে না পেরে বারবার এ-প্রমাণই দিয়েছেন। তা না হলে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো চকিতে জ্বলে উঠে হঠাৎ মিলিয়ে যেত না অনেক দুর্লভ মুহূর্ত। কমলার সন্তানজন্মের ক্ষণে রতিকান্ত শ্যামলের অমানুষিক মানসিক যন্ত্রনা এবং তার

একান্ত স্বাভাবিক নিস্তেজ পরিণতি, দারিকের অসহায় অক্ষমতার সুযোগে সোনামনির গৃহত্যাগ, দিদির বিয়ের আয়োজনে চরণের বালকসুলভ উদ্বেগ —এক একটি আশ্চর্য সুন্দর অংশ, কিন্তু সে-সব লুকিয়ে আছে যেন সূর্যবেড়িয়ার নিত্যদিনের অন্ধকারের মধ্যে। সম্ভবত, দারিকের শেষ জলে-ওঠার ঘটনাটিকে অনেক বেশি উজ্জ্বলতায় ফুটিয়ে তোলার জন্যই এ অন্ধকারের আস্তরণকে তৈরী করতে চেয়েছেন লেখক, কিন্তু তবুও বলব দারিককে আমরা বাংলা সাহিত্যে আনাগোনা করতে দেখেছি ইতিপূর্বে অনেক-অনেকবার, বরং আমাদের কাছে সূর্যবেড়িয়ার মতোই নূতন ঐ রতিকান্ত শ্যামল, সোনামনি আর রাজসবজি ঘাটের ঝুমুর বিবি।

লেখক-স্বভাবে একেবারেই ভিন্ন পথিক সুরজিৎ দাশগুপ্ত এবং তাঁর পরপর রচিত দুটি উপন্যাস 'একই সমুদ্র' এবং 'দিনরাত্রি' বস্তুত একই স্বভাবের প্রতিফলন। উদাহরণ, দুই গ্রন্থের দুই নায়কচরিত্র, সুচেতন ও সুমন। একজন যুবক, অন্যজন কিশোর। বস্তুত দুটি ভিন্নমুখী চিন্তাসূত্রের মানব রূপায়ণ তারা দু'জন। পরিপ্রেক্ষিতের বাকী সবটাই উপলক্ষ্যমাত্র। সুচেতন সমাজ জীবনের অলক্ষিত অনিয়মের সচেতন প্রতিবাদ, অন্যপক্ষে ভবিষ্যতের উজ্জ্বলতর প্রভাতের নিস্তব্ধ কাকলীও বটে। তাই সে শিল্পের উপাসক হয়েও ক্ষণেক অবসিত, কিন্তু উল্লাস তখনই ঘটবে যখন পারমিতা আসবে প্রেরণা হয়ে। সুমনও তাই, সে অচেতন স্বপ্ন মাত্র। এ জন্যই বাস্তব জীবনের ভলিমাসীরা আসে সে সুকোমল স্বপ্নের বুকে ধ্বস নামাতে। কেননা সুমন বাঁচতে আসে নি পৃথিবীতে, যেহেতু আজকের দুনিয়ায় স্বপ্নরা বাঁচে না। বস্তুত সুরজিৎ দাশগুপ্তর দুটো উপন্যাসেই আমি বিশেষ অর্থে রূপকের সন্ধান পেয়েছি; নতুবা চিরাচরিত পদ্ধতি দিয়ে তাঁর রচনাকে চিনে নেওয়া সম্ভব হত না। সে অর্থে, আমার মনে হয়, উপন্যাস দুটি সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে একে অন্যের পরিপূরকও। প্রসঙ্গত সুরজিৎ দাশগুপ্তের রচনাশৈলী সম্পর্কেও শেষ কথাটি না বললে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকবে। লেখকের প্রথম পাঠকেরও বুঝতে অসুবিধে হবে না যে তিনি মুখ্যত কবি। তাঁর কবিমন যেন মূর্তিধন্য হয়ে উঠেছে সুচেতন আর সুমনের মনের আয়নায়। রচনার ভঙ্গিতে তাই এমন একটা সহজ সাবলীলতা প্রবহমান যা পাঠকের মনকে ভাবিত করেও রসের শ্রাবণে সিক্ত করে।

অমিল চক্রবর্তী

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

সাম্প্রতিককালের বাঙলা কবিতা বিশেষ কোনো সন্ধিক্ষণের সূচনা করে না এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তর গত চার-পাঁচ বছর যাবৎ প্রায় স্তব্ধ। এ কয় বছরে ভালো, সুখপাঠ্য কবিতা লেখা হয়েছে অনেক, এবং তরুণ কবিদের কাছ থেকেই তার বেশির ভাগ পাওয়া গেছে। ছন্দব্যবহারে কিংবা শব্দচয়ন কুশলতায় তরুণ কবিদের ক্ষমতা যেমন কোনো প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, তেমনি ভাবগত পৌনঃপুনিকতা সাম্প্রতিক কবিতাকে বেশ কিছু পরিমাণে আক্রান্ত করেছে এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে। এমনকি চিত্রকল্প ইত্যাদির প্রয়োগে ক্লিশে-কণ্টকিত বহু কবিতার নমুনাও পাঠকের চোখে পড়তে পারে। আধুনিক বাঙলা কবিতাকে পাঠকসমাজে জনপ্রিয় ও সমাদৃত করে তুলতে হবে, কারণ 'দুর্বোধ্য' আখ্যা দিয়ে বাঙলা সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ এই ধারাটিকে অপাংক্তেয় রাখবার চেষ্টা রীতিমত প্রতিক্রিয়াশীল রক্ষণমূলকতার পরিচায়ক। 'পাখি সব করে রব' জাতীয় স্বভাবোক্তি যে বাঙলা কাব্যের শ্রেষ্ঠ রূপ নয়, তা প্রমাণের দায়িত্ব শক্তিমান তরুণ কবিদের উপরেই ন্যস্ত। প্রকাশকমণ্ডলীর সহযোগিতা ভিন্ন তা সম্ভব নয়, এবং ইদানীং বেশ কিছু কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে যাতে আশা করা অন্যায় হবে না যে জমানো তুষার বুঝি বা অদূর ভবিষ্যতে গলিত হয়ে ধারা-মন্দাকিনী সৃষ্টি করতে পারে। সাম্প্রতিক কালের তিনজন পরিচিত তরুণ কবির তিনখানি গ্রন্থ বর্তমানে আলোচিত হবে। এদের মধ্যে দুর্বলতা থাকতে পারে কিন্তু immaturity যে নেই তা যে-কোনো কবিতা উদ্ধৃত করে দেখানো যেতে পারে।

কথানীরবতা। শ্যামসুন্দর দে। বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী। দেড় টাকা।

এই গ্রন্থে যে উনিশটি কবিতা সংকলিত হয়েছে তার সবকটিই নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

কবিতাগুলি গদ্যছন্দে রচিত। বর্তমানকালে গদ্যকবিতা রচনার প্রাচুর্য যদিও চোখে পড়ে, তবু সার্থকভাবে গদ্যছন্দ ব্যবহারের নমুনা বেশ বিরল। এদিক দিয়ে শ্রীযুক্ত দে সার্থকতা দাবী করতে পারেন। বৃষ্টির পরে, ইতিহাসের কাল, চিরকাল, আমি দেখেছি ইত্যাদি কবিতা সুখপাঠ্য। কবির কোনো কোনো রচনায় প্রকাশভঙ্গির দিক দিয়ে অনেক প্রখ্যাত কবির প্রচ্ছন্ন প্রভাব হয়তো চোখে পড়তে পারে, এবং আমার মতে তা দুর্বলতা; আশা করব, ভবিষ্যতে কবি এই দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠতে পারবেন।

শবযাত্রা। পবিত্র মুখোপাধ্যায়। কবিপত্র প্রকাশ ভবন। দু' টাকা।

সনেট রচনায় আধুনিকদের মধ্যে পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের কিছু প্রতিষ্ঠা আছে। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থটি পড়ে দেখা গেল দীর্ঘ কবিতা রচনাতেও তিনি সমান দক্ষ। মহাকাব্য রচনা বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। আধুনিক কবিরা সে ধরনের আকাশকুসুম কল্পনা করতেও স্বভাবতই নারাজ হবেন। পবিত্রবাবুর এই দীর্ঘ কবিতাটিতে মহাকাব্য রচনার বিন্দুমাত্র প্রয়াস না থাকলেও তাঁর সাহসের পরিচয় মেলে। গোটা কাব্যটি জুড়ে এমন একটি ক্ল্যাসিকাল মেজাজ অব্যাহত রয়ে গেছে যা আজকের কবিতায় নিতান্ত দুর্লভ। কাব্যটি পাঁচটি সর্গে বিভক্ত (পতন, আর্তনাদ, শবযাত্রা, সহমরণ ও প্রার্থনা) এবং কবির বিশ্বাস, অহংকার, করুণা, বিষাদ ইত্যাদি নানাভাবে গ্রন্থে বিধৃত। কবির কাব্যের প্রেরণা মহান শিল্পবোধ, এই শিল্পবোধ কবির কাছে মূর্ত আত্মশক্তি।

"শিল্পের মহান দেবতার
পদতলে সকলি অঞ্জলি
দিতে হবে অমর আত্মার
নির্দেশে,..."

ছন্দপ্রয়োগে কবি বিশেষ দক্ষ। ধ্বনিপ্রধান, তানপ্রধান এবং কোথাও কোথাও ছড়ার ছন্দ সার্থকভাবে প্রযুক্ত হয়ে এই সুদীর্ঘ কবিতায় গতিসঞ্চার করেছে, ফলে কোথাও তা ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে নি। শব্দচয়ন অপূর্ব। তথাকথিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা না চালিয়েও এই কবি পাঠকদের আকর্ষণ করতে পারবেন স্বকীয়তার জোরে—এ বিশ্বাস অমূলক নয়।

বনানীকে কবিতাগুচ্ছ। গণেশ বসু। কবিপত্র প্রকাশ ভবন। দু' টাকা।

এই গ্রন্থটিতে ২৮টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। অধিকাংশ কবিতাই চতুর্দশপদী এবং কোনো কবিতারই নামকরণ করা হয় নি। সাধারণভাবে প্রেম, স্মৃতি, বিষণ্ণতা অধিকাংশ কবিতার বিষয়বস্তু। ছন্দগ্রন্থনায় ও শব্দমাধুর্যে এই কবি বেশ দক্ষ। এই দশকের কবিতায় নৈঃসঙ্গ্য, যন্ত্রণা ইত্যাদির ব্যাপকতা বেশ লক্ষণীয়; শ্রীযুক্ত বসুও এর থেকে মুক্ত নন। অবশ্য কোথাও কোথাও প্রেমিকার ঘৃণিতা রূপ তাঁকে পীড়িত করে: "হায় নারী। শুদ্ধতম প্রেমিকের ঘৃণিতা শিকারী!"

কবিতাগুলি পাঠ করবার পর এর অন্তর্নিহিত বিষণ্ণতার সুরটি অত্যন্ত মধুর মনে হয় এবং কবির আন্তরিকতা হৃদয় স্পর্শ করে।

চিন্ময় গুহঠাকুরতা

চারটি চিত্র-প্রদর্শনী

সাহিত্যসেবী বা সাধারণ বিদগ্ধজনের অনুরাগভাজন না হতে পেরে আমাদের আধুনিক চিত্রকলা একদিকে যেমন শিল্পে স্বল্পশিক্ষিত দর্শক-বিচারকের অযৌক্তিক কটূক্তিতে জর্জরিত, অপরদিকে তেমনি নিয়ত নতুনত্ববিলাসী, সহজপথসন্ধানী শিল্পীর নিষ্ঠাহীন, দায়িত্বহীন চিত্ররচনায় গড্ডলিকায় ভাসমান। শিল্পচর্চা নামক যে কঠিনের সাধনা, তা একদিন যেমন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রশিষ্যদের তুলিকায় উত্তাপহীন অতীত-অনুকরণের নামান্তর হয়ে উঠেছিল, তেমনি তা আজকের দিনে বর্তমান-অনুকরণের কাজে লিপ্ত হয়েছে। পশ্চিমের নকল কথাটি পুরনো হলেও নিজেরই নিজের নকলিয়ানায় শিল্পী আজ পারদর্শী হয়ে উঠে কখনো রঙ রেখার মাতামাতি কখনো বা শুষ্ক জীবনরসরহিত নন্দনতাত্ত্বিক গবেষণাকেই শিল্পচর্চার আখ্যায় ভূষিত করছেন। একটি প্রেরণা মুকুলিত হতে না হতেই রূঢ় বিচারের আঘাতে কখনো বা অপরিমেয় অর্থপ্রাপ্তির মোহে ঝরে পড়ছে; একটি শিল্পী আপন স্বভাবে তন্ময় হবার আগেই আপন সৃষ্টির জৌলুষে আপনিই মুগ্ধ হচ্ছেন কিংবা অহেতুকরূপে আত্মসচেতন, আত্ম-সমালোচক হয়ে উঠছেন। এই সংকটে কোনো মহৎ অনুভব বা জীবনবোধ শিল্পের মাটিতে জন্ম নেবে এ-আশা একান্তই দুরাশা। তথাপি বিগত তিন মাসের মধ্যে কলকাতায় প্রদর্শিত পাঁচজন শিল্পী, যথা হিম্মৎ শা, রবীন মণ্ডল, গোপাল সান্যাল, রামকুমার ও দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের চিত্রকলা বক্তব্যের স্পষ্টতায়, ভাব ও ভঙ্গির গুণগত বৈশিষ্ট্যে বিজ্ঞ দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছে।

পার্ক স্ট্রীটের আর্টস্ এণ্ড প্রিণ্টসের ক্ষুদ্রপরিসর গ্যালারিতে গুজরাটের শিল্পী হিম্মৎ শার বহুনিন্দিত ও বহুপ্রশংসিত স্কেচগুলি এমন একটি শিল্পীর পরিচয় দেয় যিনি শিল্পকে জীবনধারণার অভিব্যক্তিরূপে গ্রহণ করে সভ্য মানসিকতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার উপর প্রত্যক্ষ মন্তব্যপ্রকাশে সাহসী হয়েছেন। যৌনতাভিত্তিক অভাবনীয় বীভৎসরসের সৃষ্টি (macabre) একদিকে শিল্পীর ভাবগুরু এফ. এন. সুজার শিল্পকর্ম, অপরদিকে পিকাসো-অঙ্কিত শিঙবিশিষ্ট মানবদৈত্যের ছবি স্মরণে আনে। একটি সংস্কারহীন

জীবনবোধ যেমন নরনারীর যৌনলীলাকে অবলীলায় চিত্রের বিষয়ীভূত করতে সহায়তা করেছে, একটি উদ্ভাবনী মন তেমনি নানা শিল্পরীতির সংমিশ্রণে (যেমন স্যুরিয়ালিস্ট রহস্যের সঙ্গে চিত্রপটের স্থাপত্য, শিল্পসম্মত বিকৃতির সঙ্গে বস্তুর বিন্যাস) এই কালি-কলমের স্কেচগুলিকে যথার্থ শিল্পকর্মের পর্যায়ে উন্নীত করতে পেরেছে।

আর্টিস্ট্রি হাউসে প্রদর্শিত রবীন মণ্ডল ও গোপাল সান্যাল এই দুই অতি দক্ষ শিল্পীর নানা রঙের তৈলচিত্রগুলি নিরন্তর সন্ধান, শিল্পের দুরূহতায় অভিনিবেশ প্রভৃতি শিল্পের সৎ লক্ষণের দ্বারা চিহ্নিত। রবীন মণ্ডলের সাম্প্রতিক ছবিগুলি নয়নসুখকর হলেও তাতে ভাবের অভাব আছে। ক্যান্‌ভাসের মধ্যস্থিত চিত্রিত কাহিনীর সঙ্গে চতুষ্পার্শ্বের অলংকরণের গুরুতর অসামঞ্জস্য চিত্রগুলির কোনো সংহত ভাবরসে উত্তীর্ণ হবার পথে প্রতিবন্ধক। তবে পূর্বের ছবিগুলিতে ব্রাক-পিকাসোর Analytical Cubist আমলের দুরূহ চিত্ররাজির প্রত্যক্ষ প্রভাব সত্ত্বেও রঙের ব্যবহার ও আকার-সংস্থাপনে বিস্ময়কর সংযম আমাদের এই চিন্তার উদ্রেক করে যে যে-কোনো শিল্পীর শিক্ষানবিশীর কালে কোনো প্রখ্যাত শিল্পীর নকলিয়ানা দূষনীয় নয়।

গোপাল সান্যাল অঙ্কিত দীর্ঘায়িত মুখ, উদ্গত চক্ষু, বিন্দু-সদৃশ অক্ষিগোলক ও বিশীর্ণ দেহগুলি নিঃসন্দেহে এক তাৎপর্যপূর্ণ জীবনচিন্তার ধারক যা শিল্পীর আপন অবয়ব, স্বভাব, আচরণ ও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ওতপ্রোতবন্ধনে জড়িত। শিল্পের এই নিতান্ত ব্যক্তিগত গুণ (personal element) থেকে মুক্তি ভিন্ন নৈরাশ্য থেকে মুক্তি নেই এবং নিরাশার চিত্রের মধ্যেও স্ফূর্তি, ব্যাপ্তি ও সচলতা সুদূরপরাহত।

ভাবনিষ্ঠ শিল্পী রামকুমার। পার্ক স্ট্রীটের অধুনানির্মিত শেষোক্ত চিত্রগৃহে এই অতি পরিশ্রমী শিল্পীর অনাড়ম্বর চিত্রগুলি গত বৎসর গ্রাণ্ড হোটেলের কুমার গ্যালারিতে প্রদর্শিত তাঁর অপর কয়েকটি ক্যান্‌ভাসের সঙ্গে তুলনার অপেক্ষা রাখে। প্রাকৃতিক দৃশ্যকে সীমিত রঙ (যথা কালো, ধূসর বা ফিকে হলুদ) ও সংক্ষিপ্ত প্লেনে চিত্রিত করেছেন দুবারেই, তবে কুমার গ্যালারির চিত্রে শুভ্র পটভূমিকায় স্বচ্ছ কালো রঙের লোলুপ যে বলিষ্ঠতার সঞ্চার করেছিল, তা বর্তমান চিত্রগুলিতে বহুলাংশে স্তিমিত হলেও শিল্পী নগরদৃশ্যকে পরস্পর-বিজড়িত জটিল রৈখিক প্লেনে আবদ্ধ করে এমন একটি গাঢ় ভাবনার রসে অভিষিক্ত করেছেন যা চিত্রগৃহ ত্যাগের পরেও বহুকাল স্মরণে থাকবে।

আধুনিক চিত্রকলার উগ্রতম সমর্থকও স্বীকার করবেন যে আধুনিকতা ও সৃষ্টিশীলতা সমার্থক নয়। শিল্প হচ্ছে একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রাণময় সত্য যা প্রতিক্ষণে নতুনত্বপ্রাপ্তির অপেক্ষা রাখে। তবু নতুনতম শিল্প-মাধ্যমও কল্পনাহীন চেতনায় মৃত এবং অতি পুরাতন রীতিও সৃজনক্ষম চিন্তার উত্তাপে সঞ্জীবিত হতে পারে। নতুন পুরাতন যে-কোনো ধারাই সৃজনের খাতে বইলে শিল্পরূপ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা ঘটে। তাই শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের জলরঙের নিসর্গচিত্রগুলি (Alliance Francaise-তে প্রদর্শিত) সুপ্রাচীন বাস্তবরীতিতে অঙ্কিত হলেও এক আশ্চর্য প্রাণরসে সিক্ত হয়ে শিল্পস্তরে উন্নীত হয়েছে। যদিও কোনো-কোনো চিত্রের ভাবালুতা দৃষ্টিকটু (যেমন *Loneliness : Digha*), তবু বারাণসী, চিত্তরঞ্জন, রাজগীর, দেওঘর, কার্শিয়াং, দার্জিলিং, উজ্জয়িনী প্রভৃতি স্থানে অঙ্কিত দৃশ্যাবলীর রমণীয় জলরঙের দীপ্তিতে ও কাব্যিক সুষমায় দর্শকমাত্রেই মুগ্ধ হবেন। পল্লী ও পার্বত্যভূমির চারিত্র্যচিত্রণে শিল্পী যতখানি দক্ষ, নগরচিত্র অঙ্কনে ততটা নন (তাঁর *Chowringhee* ও *Calcutta Tea-shop* এই ভাবনার উদ্রেক করে যে আজও কলকাতা কাব্য ও গল্পের মতো আমাদের চিত্রকলার সার্থক উপজীব্য হল না)। শিল্পী ড্রয়িঙে পারদর্শী হয়েও তুলিকালি ও কালি-কলমে যথাক্রমে শিশিরকুমার ও সাতুলের প্রতিকৃতিচিত্র রচনায় অমনোযোগী হয়েছেন।

মণি জানা

গ্রাহকদের প্রতি

এখন থেকে চাঁদার মেয়াদ শেষ হবার আগেই প্রত্যেক গ্রাহকের কাছে চিঠি যাবে। গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ তাঁরা যেন সঙ্গে সঙ্গে চাঁদা পাঠিয়ে গ্রাহকজীবনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেন। চাঁদার মেয়াদ শেষ হলে পুনরায় চাঁদা বা সে সম্পর্কে কোনো নির্দেশ না পেলে আর কাগজ পাঠান হবে না।

কর্মাধ্যক্ষ
পরিচয়

ঘুমভাঙার গান

ছাড়পত্র পাওয়ার বহু আগে থেকেই ঘুমভাঙার গান ছবিটির নাম ছড়িয়ে পড়ে। বোধ হয় এর প্রধান কারণ, পরিচালক উৎপল দত্ত—যাঁর সঙ্গে সব সময়েই এক নতুনত্বের অথবা অদ্ভুত একটা কিছুর আভাস জড়িয়ে থাকে। দ্বিতীয় কারণ, ছবিটির পোস্টার। রাস্তায় রাস্তায় ল্যাম্প-পোস্টে ল্যাম্প-পোস্টে লেখা ছিল, "শেখর রায়, শোভা সেন, অনিল চ্যাটার্জি ও পাঁচ হাজার শ্রমিক।" লোকে স্বভাবতই মনে করেছিল—অজারের অভিজ্ঞতার পরেও—যে উৎপলবাবু ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ে একটি বলিষ্ঠ ছবি করেছেন, যে ধরনের ছবির প্রয়োজন আজকের ধনতান্ত্রিক যুগে খুব বেশিমাত্রায় আছে।

এ ধরনের আশা যাঁরা পোষণ করেছিলেন তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। ছবিটি মুক্তি পাওয়ার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই শোনা যাচ্ছিল যে সরকার মহল থেকে এটি চেপে রাখা হয়েছে। এবং এ তথ্য যাঁরা সরবরাহ করেন তাঁরা এও বলেন যে ছবিটি রিলিজ করতে দেওয়া হচ্ছে না, কারণ কারখানার মালিকপক্ষের সব কারসাজিই এতে ফাঁস করে দেওয়া হয়েছে।

ছবিটি মুক্তি পেতে সত্যিই দেরী হয়েছে। কিন্তু তার কারণ সরকারী কারচুপি না পরিবেশকদের শ্রীদত্তের ছবির ব্যবসায়িক সাফল্যের প্রতি সন্দেহ (তাঁর এর আগের 'মেঘ' ছবিটিও ভীষণভাবে মার খায়) তা সঠিক বলা কঠিন। তবে এটুকু বলা যায় যে বিদূষক গোষ্ঠী, ছবিটির প্রযোজক, যে কারসাজি ফাঁস করার কথা বলেছেন তা অর্থহীন; ছবিটি একেবারেই ছকে বাঁধা এবং শ্রীদত্ত মালিকপক্ষের এমন কোনো চাতুরীর নমুনা দেখান নি যা আমরা আগে পাই নি। এবং এ ধরনের ছবিতে কোনো পক্ষেরই ক্ষতি বা লাভ হয় বলে মনে হয় না।

ছবিটি সহজ। মূল ঘটনা গড়ে উঠেছে এক ছোট পরিবারকে কেন্দ্র করে। বাবা কারখানায় কাজ করে এবং ছেলে বেশির ভাগ সময়ই কাটিয়ে দেয় বাঁশি বাজিয়ে। একটি সুখী পরিবার, যেখানকার লোকেরা কারখানার গ্লানিময় জীবনের নৈকট্য সত্ত্বেও সুস্থভাবে বাঁচবার চেষ্টা করে। কিন্তু বেশিদিন এভাবে চলে না। ঘটনাচক্রে, ছেলেটিকেও, যে কিছুদিন আগেও

বাঁশি বাজানো আর প্রেম করা ছাড়া কিছু জানত না, কারখানায় ঢুকতে হয়। এবং ঘটনাচক্রেই সে আর একজনের সঙ্গে কারখানায় মধ্যে খুন হয়, যে খুনকে মালিকপক্ষ বলবেন দুর্ঘটনা। ছবির শেষে যে খুন করেছিল, সে উর্ধ্বতন কর্মী, বিবেকের জ্বালায় পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে—এবং উৎপল দত্তকে এজন্য ধন্যবাদ দেওয়া দরকার যে তিনি আর আমাদের, এ ধরনের ছবির রীতি অনুযায়ী, একটি আদালতের দৃশ্য দেখিয়ে কষ্ট দেন নি।

এই হল ছবির বিষয়বস্তু এবং এই নিয়ে মোটামুটি ভালো ছবি করা যেত। কিন্তু শ্রীদত্ত তা করতে পারেন নি।

তাঁর বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ, মাত্রাজ্ঞানের অভাব। তাঁর উগ্র রাজনৈতিক মতবাদের জন্যই হোক বা যে-কোনো কারণেই হোক তিনি ধরে নিয়েছেন মালিক মানেই খুব খারাপ, শ্রমিক মানেই খুব ভালো। অতএব, মালিকপক্ষ যেখানে ধর্মঘট মেটাতে চায় ভাড়াটে গুণ্ডা লাগিয়ে, শ্রমিকরা সেখানে জয়োৎসব করে গান গেয়ে। ট্রেড ইউনিয়নিজ্‌ম্‌-এর অভিজ্ঞতা তাঁর নিশ্চয়ই নেই, থাকলে জানতেন যে এরকম শ্রমিকসঙ্ঘ প্রায় নেই-ই যেখানে বিভেদ নেই। তিনি যে দেখিয়েছেন শ্রমিকরা সঙ্ঘবদ্ধ তা এখনও এ দেশে হয় নি। উৎপলবাবুর বোধহয় সবটাই পুঁথিগত বিদ্যা।

অবশ্য তাঁর পক্ষেও কিছু বলবার আছে। যেমন, ছবিটির খারাপ সম্পাদনার জন্য তিনি দায়ী নন। ছবিটির যা কিছু গুণ ছিল সব চাপা পড়ে গেছে খাপছাড়া কাঁচি চালানোর জন্য। অনেক জায়গায়ই দর্শকদের বুঝে নিতে হয় কি হচ্ছে, কারণ দুটি Sequence-এর মধ্যে যোগসূত্রটি প্রায়শই খুঁজে পাওয়া যায় না।

আঙ্গিকের দিক দিক দিয়ে ছবিটি খারাপ না। পোস্টার ফেলে ফেলে title এবং নামঘোষণার মধ্যে নতুনত্ব আছে, ছবিটির বিষয়ের সঙ্গেও খাপ খেয়ে গেছে। কারখানার দৃশ্যগুলি নিখুঁত। ক্রমান্বয়ে অনেকগুলি যন্ত্রের ঘরঘরানি, আগুনের ফুলকি, বড় বড় মেসিন,- সব মিলিয়ে দর্শকেরা সচেতন হয়ে ওঠে এক বিশাল শক্তির সম্বন্ধে যার কাছে মানুষ ধীরে ধীরে মাথা নত করছে। এবং এর সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকটি চরিত্র, যারা জীবনে আনন্দ পেতে চায়, নদীতে বড় বড় জাহাজ যাদের স্বপ্ন দেখায় এক বৃহত্তর পৃথিবীর। কিন্তু বণিকসভ্যতায় মুক্তি সম্ভব নয়। সব স্বপ্ন গুঁড়িয়ে যায় যন্ত্রের তলায়।

অভিনয় এক অনিল চ্যাটার্জি ছাড়া আর সকলেরই মোটামুটি ভালো। সিরিয়াস চরিত্রে অহর রায়ের অভিনয় প্রশংসনীয়। একটি মামুলি চরিত্রকে শেখর চ্যাটার্জি যথেষ্ট প্রাণবন্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে শুধু একটিই অভিযোগ। কঠোর চরিত্রের মানুষ হলেই কি মুখের পেশী নিয়ে ওরকম নাড়াচাড়া করতে হয়?

কিন্তু সবকিছু মার খেয়ে গেছে ছবিটির propagandist মনোভাবের জন্য। ঘুমভাঙার গান দেখতে দেখতে মনে হয়েছে উৎপলবাবু বোধহয় শিল্প মানেই মনে করেন একটা কিছু প্রচার করা। কিন্তু শিল্পমাত্রেই প্রচার হলেও প্রচার-মাত্রই শিল্প নয়।

সুমন্ত সেন

চলচ্চিত্রের এক মহৎ অসমাপিকা

তার অসমাপ্ত চিত্রে যে-পরিণতি অকথিত রেখে গিয়েছিলেন অক্রেই মুঙ্ক, তার সতীর্থের অনীহা ছিল সে কথা শোনাতে; যদিও সামগ্রিক শিল্পকৃতি উপস্থাপনায় বিশ্বস্ততা উপস্থিত। চলচ্চিত্রের প্রয়োগকলায় মুঙ্ক পরিবর্তনবাহী পরীক্ষা-নিরীক্ষা পথের শিল্পপথিক। পরিবর্জন ও পরিমার্জনের পদচারণ অন্তে যার পারফেকশনের সূক্ষ্মতায় উত্তরণের প্রয়াস। তাই, পূর্ব চিত্রনাট্যের ধারা অনুগামী হলে 'ম্যান অন দি ট্র্যাক্স্' প্রচলিত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না; 'ব্যাড লাক' সম্পর্কে স্রষ্টা উক্তি করেন, 'if I should remake I would change quite a lot' এবং চিত্রগ্রহণের পর 'এরোইকা'-র একটি আখ্যান অনায়াসেই পরিত্যক্ত হয়। 'প্যাসেঞ্জার' সমাপ্তিকরণ ও সম্পাদনকালে লেমিভিচ সম্ভবত শিল্পীর এই অন্তরঙ্গ মেজাজটির কথা কখনও বিস্মৃত হন নি। এ জন্যে তিনি ধন্যবাদভাজন।

মুঙ্কের চলচ্চিত্র সম্পর্কিত চারিত্রিক পরিপ্রেক্ষিতে 'দি প্যাসেঞ্জার'-এ দুটি বিস্ময়কর বৈপরীত্য নজরে পড়ে। অন্যান্য মহৎ শিল্পীর মতোই মুঙ্ক জীবনসত্যের অন্বেষ্টা। কিন্তু তাঁর অনুসন্ধানী ব্যক্তিমানস ব্যঙ্গের তির্যক পথরেখাবাহী। চতুর বুদ্ধিময়তার মননে আলোকিত মাধ্যমের কারুকৃতিগুলি আবেদনে কখনও সোজাসুজি আবেগপ্রধান নয়। যদিও বিলম্বিতভাবে হার্দ্য। পরিচালকের পূর্ববর্তী চিত্রাবলীতে যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর পোল্যাণ্ডের সমাজচিত্রে যে cult

of heroism এবং বীরত্ব সম্পর্কিত myth-গুলির উপর তার তীব্র কশাঘাত (এবং সেই কারণে অন্তর্নিহিত আদর্শগত অবক্ষয়ের প্রতি একপ্রকার দৃষ্টি আকর্ষণ) দেখা যায়, 'প্যাসেঞ্জার' চিত্রে তার অনুপস্থিতি আছে। যদিও লিজার চরিত্রায়ণে যেখানে মার্টার প্রতি তার আকর্ষণ গড়ে উঠেছে (কিছুটা প্রভুত্ব বিস্তারের সঙ্গে যেখানে লেসবিয়ানিজম্-এর প্রশ্নটিও অবান্তর বলে মনে হয় না) এবং শেষের genocide-এ মুখরক্ষার প্রসঙ্গে জার্মান cult of heroism-এর প্রতি একটা মৃদু স্যাটায়ারের ভঙ্গি দেখতে পাওয়া যায়। এবং উল্লেখ্য যে সব রূপদক্ষ স্রষ্টার যা ধ্যানবস্তু সেই নির্লিপ্ত এক শৈল্পিক প্রশান্তি (আন্তোনিওনিকে বর্তমান পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকাররূপে পরিচিত করার পিছনে যা অন্যতম কারণ রচনা করেছে) 'প্যাসেঞ্জার'-এর বহিরঙ্গে বিরাজমান।

দ্বিতীয়ত ওয়াজুর (the most 'Japanese') মতোই মুঙ্কের সৃজনধর্মী প্ররোচক শক্তির উৎস ('Film about Poles for the Poles') সর্বাংশে দেশজ। এমন কি প্রতীকের সতর্ক প্রাত্যহিক ব্যবহারও আলোচ্য গণ্ডীর বাইরে পড়ে না। কিন্তু, 'প্যাসেঞ্জার' চিত্রকাহিনীর পটভূমি এবং বক্তব্যের ভাব কল্পনা আন্তর আবেদনে সহজেই আন্তর্জাতিক। ডেমোক্লিসের খড়্গ তো এখনও সভ্যতার মাথার উপর থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় নি। তাই, কালের সমুদ্রে ভাসমান দুই তরণী হঠাৎ মুখোমুখি হলে প্রস্তরীভূত বর্তমান (অত্যন্ত সুনির্বাচিত স্থিরচিত্রের সম্পাদনায় যার static ইমেজগুলি dynamic ফলশ্রুতি-প্রাপ্ত) অতীতের দুঃস্বপ্নময়তার মাঝে চঞ্চল হয়ে ওঠে। স্মরণের বিভিন্ন প্রবাহ পার হয়ে এসে খণ্ডিত সত্য সমগ্র সত্যে প্রকাশিত হয়। যেন নিস্তরঙ্গ বর্তমানে একটি সূক্ষ্ম আঘাতে একে একে স্মৃতিচারণের বৃত্তগুলি রচিত হতে থাকে। প্রথমটি কিছু এলোমেলো। ক্রমে প্রত্যয়ের গভীরে। কনশেনট্রেসন ক্যাম্পের ছাউনিতে অতীতের আলেখ্য দর্শনকালে লিজার স্বীকৃত কথনে ও অ-কথনে নারী-মনস্তত্ত্বে নারীত্বের চূড়ান্ত অবমাননা-উপভোগের বিচিত্র প্রতিক্রিয়া এখানে ক্রমে ক্রমে উন্মোচিত।

লাইনার-এর ডেকে মার্টাকে (বা তৎসনোচিত কাউকে) দর্শনের পর বিগত স্মৃতির অতলে ফিরে যেতে যে প্রাথমিক তিনটি ফ্রেম (একটি কেবল দু'বার) ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি আলোকময়তায় ইচ্ছাকৃত ভাবে overtonal। প্রসঙ্গত, স্মর্তব্য যে স্মৃতি-বিস্মৃতির বিভিন্ন স্তরগুলির ভার-

সাম্যতায় সমগ্র চিত্রে আলোকচিত্রণের শুভ্রতা ও ধূসরতা বিশেষ চিহ্নিত। বৃত্তাকারে দাঁড়ানো বন্দীদের মধ্যে এক বিবসনা নারীর আকুলতা, দীর্ঘ সার দিয়ে বসা প্রতীক্ষারত নিশ্চুপ শিকারী কুকুরের দল (যারা গাঢ় কালো ছায়ায় নেকড়ের মতো দৃশ্যমান) এবং লাঠির বাঁকানো মুখ গলায় লাগানো একটি বিকৃত নারী-মুখের ক্লিপস-শট—এগুলি নির্বাচনে পরিচালকের পূর্ব-পরিচিত সংযমের পরিচয় মেলে। মাত্র তিনটি আঁচড়েই দান্তের 'ইন্‌ফার্নো'-র ছবি এঁকে দেওয়া যায় মুঙ্ক তা প্রমাণিত করেছেন। যেমন প্রমাণিত করেছেন 'ডেথ ব্লক'-এ চিত্রকল্পের কতগুলি স্বল্পতম আভাসে (মৃতদেহবাহী গাড়ির বাইরে ঝুলে থাকা শুধু একটা হাতকে পরম ঔদাসীন্যে ভিতরে ঠেলে দেওয়া), অথবা বন্দীশিবিরে শূন্য প্যারাম্বুলেটরগুলি পর পর গড়িয়ে যাবার পরে একটি পুতুলের কান্নায়, কিংবা মৃত্যুর কিনারে দাঁড়িয়ে বিরাট এক কুকুরকে ছোট মেয়েটির আদর করা প্রভৃতি দৃশ্যগুলিতে অনির্বচনীয় শিল্প-বৈভব রচনার কথা। আলোচ্য বিষয়বস্তুর পূর্বদৃষ্ট আঙ্গিকের চলতি পথগুলি যেন আবশ্যিকভাবেই পরিহার করে যাওয়া হয়েছে।

'প্যাসেঞ্জার'-চিত্রে ধ্বনিপ্রয়োগ—মুঙ্কের পূর্বচিত্রে যা বিশেষ প্রশস্ত নয়—মাধ্যমগত সমৃদ্ধির এক অনবদ্য প্রকাশ। যেমন, প্রহরী কুকুর যারা অসহায় এক বন্দীর আক্রান্ত হবার শট্-এর সমাপ্তিতে ক্রুদ্ধ পশুর গোঙানিকে ঠিক পরবর্তী শট্-এর প্রারম্ভিক জাতীয় সংগীতের সঙ্গে 'মিক্‌স' করে দেওয়া হয়েছে। অনুরূপভাবেই, পরবর্তীকালে সেই কুকুরের বিদ্যুতাহত হয়ে মৃত্যু ঘটায় লিজার সঙ্গিনী এস. এস. অফিসারের শোকার্ত গুমরে ওঠা কান্না পরের শট্-এর শুরুতে পুনর্বার জাতীয় সংগীতে মিলিত। অর্থাৎ, পশুশক্তি ও তার বিনাশ-জনিত ক্ষোভ জাতীয় সংগীতের (জাতীয়তাবাদের ?) establishing sound-এর কাজ করেছে যথাক্রমে। কাহিনীর কোনো বিশেষ 'মুড্'-এর দাবীতে বাক্-এর সুরগম্ভীর ঐক্যতানকে যেভাবে ইঞ্জিনের তীক্ষ্ণ বাঁশীতে এবং পরে ট্রেনের খণ্ড খণ্ড আওয়াজে চুরমার করে দেওয়া হয়েছে তার সমকক্ষতা ইদানীংকালের পোলিশ চলচ্চিত্রে এক বিরলপ্রায় দৃষ্টান্ত। চুখরাই-কৃত 'ক্লিয়ার স্কাই'-এর বহু আলোচিত 'ট্রেন প্রসঙ্গ' অপেক্ষা এই ধ্বনিতরঙ্গের প্রযুক্তি যেন আরও শ্রুতিবিজ্ঞাননির্ভর। Low-pitch-harmony এবং high-pitch ইঞ্জিনের বাঁশীর শব্দ সংমিশ্রিত ভাবে কোনো chaos-এর সৃষ্টি না করে পরিচালকের প্রয়োগ-উদ্দেশ্য সাধিত করে দিয়েছে।

'প্যাসেঞ্জার'-এর ফ্ল্যাশব্যাক অংশে চরিত্রগুলির লাইন অফ ট্রিটমেন্ট কিছুটা নৈর্ব্যক্তিক। ছবি শেষ হয়ে যাবার পরেই তাৎক্ষণিক মূল্যে লিজা ও মার্টাকে এক সমান্তরালে আনা হয়তো অসম্ভাব্য নয়। কিন্তু, বৈত-কাহিনীর সংহত ঐ পরিবেদনের অন্তরালে মানবিক বৃত্তিগুলি মুকুলিত। সেই ভয়ংকর নিষ্পেষণের আবর্তেও তারা পুষ্পিত। তাদের অকাল বিনষ্টির ফাঁকে ফাঁকে যেন তারা বলে উঠেছে, 'আছি'। এই মানবিকবোধ মুঙ্কের আলোচ্য ছবির পরম সম্পদ। 'প্যাসেঞ্জার' নির্মিতকালে একষট্টি সালে মুঙ্ক লোকান্তরিত হন। তখন চলচ্চিত্রে আন্তোনিওনি এসেছেন, এসেছেন বেয়ারিম্যান, ফেলিনি, বুন্যুয়েল বা কুরসোয়া। এবং এসেছে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর সমাজভাবনা, যা যুদ্ধভিত্তিক নয়। হয়তো বা যুদ্ধ-পরিকেন্দ্রিক কিছুটা। পোলিশ স্কুলে বিষয় বৈচিত্র্যের আভাসও তখন কিছু দূরে নয়। কিন্তু, মুঙ্ক ভাইদার মতো একটি 'সোর্সারার্স', বা কাভালেরোভিচের মতো একটি 'জোয়ান', বা পোলানস্কির মতো একটি 'ওয়ার্ড্রোব' নির্মান করলেন না। অসুইৎসের এক স্মরণশেষে তিনি একটি 'প্যাসেঞ্জার' নির্মানে ব্রতী হলেন। তার কারণ-স্বরূপে রেনের ছবির নায়কের সেই প্রথম কথার মতো উক্ত হতে পারে: 'you have seen nothing at Hiroshima, nothing. I saw everything, everything.' যদিও, তার শেষ কথা জানা নেই।

দিলীপ মুখোপাধ্যায়

---

* প্যাসেঞ্জার (ক্যামেরা ফিল্ম্ ইউনিট, পোল্যাণ্ড, ১৯৬৩)। পরিচালনা—অন্দ্রেই মুঙ্ক্ ও ভিতল্ড লেজিয়েভিচ্। চিত্রনাট্য—অন্দ্রেই মুঙ্ক্ ও জোফিয়া পসমিৎস্। আলোকচিত্র—ক্রিস্তফ্ ভিনিয়েভিচ্। অভিনয়ে—আলেক্সান্দ্রা স্লাস্কা, আনা সিয়েসিয়েলিউস্কা প্রমুখ। কলকাতার পোলিশ দূতাবাসের সহযোগিতায় ক্যালকাটা ফিল্ম্ সোসাইটি ও সিনে ক্লাব অফ ক্যালকাটা কর্তৃক প্রদর্শিত।

প ত্রি কা - প্র স ঙ্গ

অতএব

বাংলা দেশে—যেখানে ব্যর্থ কবি থেকে শুরু করে অসুখের কারবারি পর্যন্ত সকলেই সাময়িকপত্র প্রকাশে উদ্যোগী হয় আর যেহেতু নানা ফন্দী-ফিকির করে বিজ্ঞাপনও কিছু সংগ্রহ করা যায় এবং তাই প্রতিদিনই কোনো-না-কোনো পত্রিকার জন্ম এবং মৃত্যু হয়—সে দেশে নতুন পত্রিকার প্রকাশ এমন কোনো বড় ঘটনা নয় যা নিয়ে কালি এবং কাগজ খরচ করা চলে। কথাগুলি আরও বিশেষ করে সত্য এই কারণে যে, এই সব পত্রিকাগুলি অনেক সময়ই হয় বৈশিষ্ট্য-বর্জিত, উদ্দেশ্যহীন, চলিত পত্রিকাগুলির (এমন কি নাম এবং ডিসাইনের পর্যন্ত) অক্ষম অনুকরণ মাত্র।

সুখের বিষয় কচিৎ-কখনও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। 'অতএব' পত্রিকাটি এমনি ধরনের একটি ব্যতিক্রম।

এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাটির যে তিনটি সংখ্যা আমরা এ-পর্যন্ত পেয়েছি—তা থেকেই এর চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ-পত্রিকাটিতে গল্প বা কবিতা ছাপা হয় না এবং প্রধানত সমাজবিজ্ঞানই এর উপজীব্য। সমাজবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসাবে অর্থনীতিরই আবার এর মধ্যে প্রাধান্য। কয়েকজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদের কয়েকটি প্রবন্ধ এই তিনটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু তার চেয়েও আমাদের বেশি আশান্বিত করে অখ্যাতনামা তরুণ লেখকদের শ্রমসাধ্য রচনাগুলি। তাদের সকলের সব বক্তব্যের সঙ্গে আমরা একমত হই তা নয়, কারো কারো রচনায় ভারসাম্যের অভাব চোখে পড়ে, পরিণতবুদ্ধির প্রাজ্ঞতা অনেকক্ষেত্রে অনুপস্থিত, কিন্তু তাদের প্রায় সকলের মধ্যেই এমন একটা সজীব মন, অনুশীলনশীল অধ্যবসায় এবং চিন্তার সাহসের পরিচয় পাই যে ওসব ত্রুটি অনায়াসে উপেক্ষা করতে পারি।

স্থানাভাবে প্রত্যেকটি রচনার বিশদ আলোচনা এখানে করা সম্ভব নয় তবু কয়েকটি প্রবন্ধের উল্লেখ না করলে পত্রিকাটির (এবং 'পরিচয়' পাঠকদেরও) প্রতি অবিচার করা হবে। আর 'অতএব' পত্রিকার কোনো লেখকের নাম

করতে হলে প্রথমেই নাম করতে হয় শ্রীনীরেন সেনের। তাঁর ধারাবাহিক রচনা 'কলকাতার বস্তিজীবন' পথিকৃতের সম্মান পাবে। শহর কলকাতার শতকরা চব্বিশ জন মানুষের বাস বস্তিতে; তাদের সম্পর্কে এত বিশদ সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা বাংলাভাষায় তো বটেই, অন্য কোনো ভাষাতেও ইতিপূর্বে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। 'বহরমপুর' শীর্ষক সমীক্ষাটিও বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। 'অতএব'গোষ্ঠী যদি বাংলা দেশের বিভিন্ন মফঃস্বল শহর সম্পর্কে এ-ধরনের সমীক্ষা প্রকাশ করতে পারেন তাহলে তাঁরা একটা কাজের কাজ করবেন। 'রাজনীতির বাঙালিপন্থা' প্রবন্ধটিতে কিন্তু দায়িত্বহীন হঠকারী মন্তব্যের প্রাচুর্য বিরক্তি উৎপাদন করে। ধীরেশ ভট্টাচার্য, কল্যাণ দত্ত ও সুব্রতেশ ঘোষ প্রতিষ্ঠাবান অর্থনীতিবিদ এবং তাঁদের রচনা সার্টিফিকেটের অপেক্ষা রাখে না। নিছক পরিসংখ্যানের মধ্যে আবদ্ধ না রাখলে 'তরুণ ভারত' রচনাটি আরও মূল্যবান হতে পারত। 'দুই কালচার' বিতর্কের মূল্যবান পর্যালোচনাটির মাত্র একাংশ বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে; প্রবন্ধটির শেষাংশের জন্য তিন মাস অপেক্ষা করে থাকা ছাড়া গতি নেই। অন্তত, ত্রৈমাসিক পত্রে প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করলে তাতে পাঠকদের প্রতি, এবং লেখকদের প্রতিও, অবিচার করা হয়।

'অতএব'-এর সাহিত্য-বিষয়ক রচনাগুলি কিন্তু পত্রিকাটির সুনামবৃদ্ধির সহায়ক নয়। 'বাংলাদেশের সাহিত্য-মনন ও শেকস্‌পীআরের একটি নাটক' দৈনিক পত্রিকার রবিবাসরীয় বিভাগ-শোভন অগভীর ও অপটু রচনা। 'শুধু নীরক্ত শ্বেতাজ রৌদ্র' ততোধিক অক্ষম রচনা। বিষ্ণুবাবুর কাব্যসাধনা ও কবিকৃতির কোনো পরিমাপই এই প্রবন্ধের লেখক করতে পারেন নি; তদুপরি প্রবন্ধের শেষে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার আলোচনা টেনে এনে লেখক সম্ভবত রাজনৈতিক অসূয়া চরিতার্থ করবার জন্যই যেসব মন্তব্য করেছেন তাতে এই সিদ্ধান্তই অনিবার্য হয়ে পড়ে প্রবন্ধ-লেখক সাহিত্যব্যাপারে সম্পূর্ণ অব্যাপারী।

এই স্পেশালাইজেশনের যুগে 'অতএব' পত্রিকা যদি সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদির আলোচনাতেই নিজেদের কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ রাখে—তাহলেই পত্রিকাটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকট হবে। কেননা বাংলাদেশে সাহিত্য-পত্রিকার ছড়াছড়ি—অভাব এ-ধরনের পত্রিকারই।

ছোটগল্প : নবনিরীক্ষা

'ছোটগল্প : নবনিরীক্ষা' অবশ্য নিরঙ্কুশ সাহিত্য সাময়িকীই। আর নাম থেকেই বোঝা যায় ছোটগল্পই এই পত্রিকাটির উপজীব্য। ভূমিকায় এই গ্রন্থমালার নীতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন : "আমরা এখানে বলবার চেষ্টা করব 'সাহিত্য মানুষের হয়ে ওঠার অভিব্যক্তি।' ...আমাদের এই গ্রন্থমালায় প্রকাশিত গল্প ও প্রবন্ধ একদিকে যেমন সেই অভিব্যক্তির নিদর্শন অপরদিকে তেমনি সেই অভিব্যক্তির স্বরূপ নির্ণয়।"

আলোচ্য সংকলনে গল্প আছে দুটি—সমরেশ বসুর ও দেবেশ রায়ের। অন্তত এই গল্প দুটির ক্ষেত্রে সরোজবাবুর দাবি মেনে নিতে আমাদের দ্বিধা নেই। এবং তাঁর সঙ্গে আমরা এ-বিষয়েও একমত যে সমরেশ বসুর 'স্বীকারোক্তি' "গল্পটি নিঃসন্দেহে তাঁর গল্পধারায় উল্লেখযোগ্য সংযোজন।" সমরেশবাবু নাম না করে যে রাজনৈতিক দল এবং যে পর্বের কথা বলেছেন আমরা অনেকেই সে দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এবং সে পর্বের নির্মম অভিজ্ঞতার অংশীদার—এ-গল্প আমাদের তাই গভীরভাবে নাড়া দেয়। তবু একটা কথা না-বলে পারা যায় না—শুধু এক ব্যক্তিবিশেষের চোখ দিয়ে দেখায় গল্পের বক্তব্য কিছুটা একদেশদর্শী হয়ে পড়ে। কেননা, এ কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়, যে-অভিজ্ঞতা সমরেশবাবু এই গল্পে উপস্থিত করেছেন তা নির্মমভাবে সত্য হলেও, সেই রাজনৈতিক আদর্শের তা সাময়িক বিকৃতি মাত্র এবং সে আদর্শ সত্যই মানব-কল্যাণের মহত্তম আদর্শ।

সরোজবাবুর নীতি-বিষয়ক বিবৃতি ছাড়া সংকলনে প্রবন্ধ আছে আর-একটি —নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'কমলকুমার মজুমদারের ছোটগল্প'।

—শচীন বসু

বিবিধ প্রসঙ্গ

শিক্ষায় যৌথদায়িত্ব

স্বাধীনতা-উত্তর যুগে কলেজী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিমাণগত ভাবে বিস্তার লাভ করেছে। আগে যেখানে ছিল ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ছাত্রসংখ্যা দু' লাখ তিরিশ হাজার আজ সেখানে ৫৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা প্রায় বার লাখ। এই ছাত্রসংখ্যার মধ্যে কলেজের ছাত্ররাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

পরিমাণের বিস্তার ঘটলেও গুণগত উৎকর্ষের দিক থেকে এবং পরিকল্পিত অগ্রগতির মাপকাঠিতে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে আশানুরূপ সাফল্য অর্জিত হয় নি। প্রদেশে প্রদেশে রেষারেষি করে, অনেকখানি রাজনৈতিক কারণে, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কলেজে শিক্ষকদের স্বল্প বেতন, উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের অভাব, ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা, বিভিন্ন প্রদেশের উচ্চতর শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, সব মিলিয়ে উচ্চতর শিক্ষায় স্বাস্থ্যের লাবণ্য আজও পরিস্ফুট নয়।

ভারতীয় সংবিধান-অনুযায়ী শিক্ষা রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়। কিছুকাল যাবৎ দাবী উঠেছে উচ্চতর শিক্ষার পরিকল্পিত সর্বভারতীয় অগ্রগতির স্বার্থে শিক্ষাকে যৌথতালিকায় (concurrent list) দেওয়া হোক। এ দাবী নিখিল ভারত শিক্ষকসংস্থা (A. I. F. E. A.) পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (W. B. C. U. T. A.) অনেকদিন থেকেই করেছেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীচাগলা ও সপ্রু কমিটিও এ দাবীর ন্যায্যতা স্বীকার করেছেন।

শিক্ষাকে যৌথ তালিকায় নেবার পক্ষে প্রধান প্রতিবন্ধক অধিকাংশ রাজ্য সরকার। 'টাকা নেই' এই অজুহাতে অনেক কাজে তাঁরা হাতও দেবেন না আবার কেন্দ্রের সঙ্গে যৌথ দায়িত্ব নিয়ে শিক্ষার পরিকল্পনাসম্মত অগ্রগতির সহায়কও হবেন না। শুধু রাজ্যসরকার সমূহেরই যে আপত্তি তাও নয়; নানা আঞ্চলিক ও খণ্ড স্বার্থের প্রভাবে জনমতও এ বিষয়ে অনেকখানি বিভ্রান্ত।

সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

পশ্চিমবঙ্গ যুব উৎসব

গত ২২শে থেকে ৩০শে মে রণজি স্টেডিয়ামে পশ্চিমবঙ্গ যুব উৎসবের ষষ্ঠ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। কয়েক হাজার লোক এসেছিলেন, কয়েক শত লোক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। খ্যাতিমানেরাও অনেকেই এসেছিলেন। কিন্তু তবু, এবার অনেকেই অনুভব করেছেন যে, শেষ পর্যন্ত এ উৎসব বাংলাদেশের সুস্থ যুবসমাজের উৎসব হয়ে উঠতে পারে নি। প্রস্তুতিকালে প্রস্তুতি কমিটি এ বিষয়ে একমত হয়েছিলেন, যে, যুব উৎসব যেহেতু রাজনৈতিক সম্মেলন নয়, সাংস্কৃতিক উৎসব, সেই হেতু ভিয়েতনামের প্রশ্ন আন্তর্জাতিক তাৎপর্য বিবেচনায় উত্থাপিত হবে, কিন্তু বন্দীমুক্তির দাবীতে স্লোগান উঠবে না—ভারতে গণতন্ত্রের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনাকালে প্রশ্নটি সংগতভাবেই উঠতে পারে। সব দলের প্রতিনিধিরাই এই নীতি মেনে নিয়েছিলেন। অথচ প্রথমদিনই একদল লোক মঞ্চে উঠে এসে মাইক দখল করে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবী করে স্লোগান দেন। এই ব্যাপারে বাধা দিতে গিয়ে অনেকেই সেদিন অপমানিত হয়েছেন। এই ইতরতার পুনরাবৃত্তি ঘটে সেইদিনই শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতাশেষে—আমি দেখেছি, কিছু তরুণ মাঠে বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন, এঁরা একবারও শ্রীমুখোপাধ্যায়ের ভাষণ শোনার চেষ্টাও করেন নি; কিন্তু বক্তৃতাশেষে এঁরাই মঞ্চের দিকে ছুটে এসে দাবী জানাতে থাকেন যে, শ্রীমুখোপাধ্যায়কে ঐ মঞ্চে দাঁড়িয়ে ভিয়েতনামের কথা বলতে হবে (ভাষণে তিনি আগেই কিন্তু ভিয়েতনামের কথা বলেছেন), বন্দীমুক্তির দাবী সমর্থন করতে হবে। সেদিনকার এই অশালীনতাকে রাজনৈতিক আন্দোলন বলে মানতে পারব না।

তারপরেও অবশ্য মুক্ত মঞ্চে বেশ কয়েকবার জঙ্গী স্লোগান উঠেছে। স্থান-কাল-পাত্র বোধের বালাই ছিল না। যে-উৎসবে আমরা আশা করেছিলাম, জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাংলাদেশের তরুণদের ভাবনার প্রমাণ দেখব, সে উৎসব শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়াল দুটি বিবদমান দলের বিবাদ ও আপোষরক্ষার অদ্ভুত খেলা। এই খেলায় ব্যস্ত ছিলেন বলেই বোধহয় উৎসবের কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানের মানবৃদ্ধি, সাংগঠনিক সফলতা ও ব্যাপকতম যোগদানের নীতিরক্ষায় দৃষ্টি দিতে পারলেন না।

বাংলাদেশের নাট্য-আন্দোলনে যাঁদের কোনো স্থান নেই, পরিচিতি নেই, এমন বহু নাটকের দল সুযোগ পেলেন অথচ 'বহুরূপী' আমন্ত্রিত

হলেন না। 'সুন্দরম্' অভিনয় করতে চান বলে চিঠি লিখেও প্রত্যাখ্যাত হলেন; গন্ধর্ব, চতুর্মুখ, গ্রুপ থিয়েটার, রূপকার, বহুরূপী, শতায়ন প্রভৃতি নতুন নাটকের দলগুলির একটিকেও দেখা গেল না। আরো বিসদৃশ ব্যাপার ঘটল, থিয়েটার সম্পর্কে এক আলোচনাসভায় দেখা গেল, মাত্র দুজন বক্তা—শ্রীউৎপল দত্ত ও শ্রীশেখর চট্টোপাধ্যায়; সভাপতি শ্রীজ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় কার্যত নীরব থাকলেন। দুজন বক্তাই কলকাতার একটি থিয়েটার গৃহের লোক। তাই বাংলাদেশের সমগ্র নাট্য-আন্দোলনকে নস্যাৎ করে দিয়ে তাঁরা নিজেদের ব্যবসায়িক প্রচারের সুযোগ নিলেন (বহুনিন্দিত বিশ্বরূপাও তো এতটা প্রকটভাবে তাঁদের ব্যবসায়িক আত্মপ্রচার চালান না।) অবশ্য সেই প্রসঙ্গে যখন বক্তারা নিজেদের গণনাট্য আন্দোলনের ধারক বলে ঘোষণা করলেন, তখন বিস্মিত না হয়ে উপায় ছিল না। বাংলাদেশে গণনাট্য সংঘের সৃষ্টিপর্বে কিংবা আটচল্লিশ-উনপঞ্চাশের সংকটকালে যাঁরা গণনাট্য সংঘের ছায়াও মাড়ান নি, গণনাট্য সংঘের স্বাচ্ছন্দ্যকালে যাঁরা হয়ত বছর-খানেক এই আন্দোলনের মঞ্চে দাঁড়িয়েছিলেন, পরে আবার সন্তর্পণে কমার্শিয়াল থিয়েটারে সরে গেছেন, তাঁদের ইতিহাসবিকৃতি যুব উৎসবের মঞ্চ থেকে এবার প্রচারিত হলো। শ্রীচট্টোপাধ্যায় অন্য দলগুলির সরকারী দাক্ষিণ্যলাভ ও শীতাতপনিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষাগৃহে অভিনয়ের নীতি সম্পর্কে কটাক্ষপাত করেছেন; তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে, নিউ এম্পায়ারে অভিনয়ের রেওয়াজের অন্যতম পথিকৃৎ আদি লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপ, এবং এই গোষ্ঠীর সরকারী অর্থলাভের হিসাব আমাদেরও জানা আছে। যে-কোনো পেশাদারী থিয়েটারের মালিকেরা নিজেদের পাবলিসিটির নানা পন্থা বেছে নেবেন এ তো স্বাভাবিক, সংগত। কিন্তু যুব উৎসবের মঞ্চ কেন সেই প্রচারের মঞ্চ হবে? বাংলাদেশের নাট্য-আন্দোলনকে তাঁরা কেন এভাবে কুৎসা ও অসত্যে লাঞ্ছিত করবেন?

সাংগঠনিক দৌর্বল্যের পরিচয় বারবার দেখা গেল। নকল নিরাপত্তা পরিষদে এগারোটি দেশের মধ্যে দুটি স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রসহ তিনটি দেশের আসন শূন্য রয়ে গেল। থিয়েটার সম্পর্কে গোলটেবিল বৈঠকটি বাতিল হয়ে গেল, কারণ, নির্দিষ্ট সময়ে দেখা গেল কেউই আসেন নি। নাট্যগোষ্ঠীগুলি কি যথাসময়ে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন? ক্রীড়াবিষয়ক আলোচনাসভাও একই কারণে অনুষ্ঠিত হল না। কবি সম্মেলনেও মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র

এসেছিলেন; কবি নির্বাচনেও কী নীতি অবলম্বন করা হয়েছিল, বোঝা যায় না (তবু কামাক্ষীপ্রসাদের পৌরোহিত্যে—তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণটিও উল্লেখযোগ্য—সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে সংবর্ধনাজ্ঞাপন প্রশংসা করব)। উৎসবের স্মারকপত্রটি মাত্র দুদিনে নিঃশেষ হয়ে গেল। এই আকর্ষক (বিশেষত থিয়েটার ও চলচ্চিত্র সম্পর্কে দুটি 'ফোরাম' উল্লেখযোগ্য) স্মারকপত্রটি লোকে কিনতে চেয়েও কিনতে পেলেন না, এর জন্ম কাকে দায়ী করব?

যুব উৎসবে কয়েকটি আলোচনাচক্রই বোধহয় এবারকার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। বিশেষত আজকের আফ্রিকা, আজকের চলচ্চিত্র ও সামাজিক দায়িত্ব এবং জাতীয় সংহতির সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা অত্যন্ত উচ্চ মানে পৌঁছেছিল। স্থানীয় আফ্রিকান ছাত্রেরা এখানকার ছাত্রদের সঙ্গে এক গোলটেবিল বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন; এই আফ্রিকান ছাত্রগোষ্ঠী পরে সেদিনকার অনেকগুলি অনুষ্ঠান উপভোগ করেন, কিন্তু তারই মধ্যে একটি নাটকে আফ্রিকান নৃত্য বলে কথিত 'হলিউডী' রুচিবিকার দেখে আহত হন। আফ্রিকা, পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি ও কলকাতা শহর সম্পর্কে পোস্টার প্রদর্শনী বক্তব্যের দিক থেকে ও শিল্পগুণে মূল্যবান। চলচ্চিত্র মণ্ডপে কয়েকটি বিখ্যাত দেশী ও বিদেশী চিত্র প্রদর্শিত হয়েছিল। 'উপেক্ষিতা' পালায় নাট্যভারতী তাঁদের সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, যদিও স্বনামধন্য পঙ্কু সেনকে আমরা অন্যরকম চরিত্রে দেখতেই অভ্যস্ত এবং দেবব্রতের ভূমিকায় ছোট রুণীবাবুকে হুবহু অনুকরণের চেষ্টা পীড়াদায়ক। পঙ্কু সেন, ফিরোজাবালা, দেবেন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিবেকের ভূমিকাভিনেতার সু-অভিনয় চোখে পড়ে।

উৎসবের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে ক্যালকাটা ইয়ুথ কোয়ার, ন্যাশনাল ইয়ুথ কোয়ার, শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ (রবীন্দ্রনাথের হাসির গান), ক্ষিতীশ বসু ও সম্প্রদায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও সম্প্রদায়, চলাচল, নান্দীকার, রূপকার, প্রান্তিক, শৌভনিক, দক্ষিণ পরিষদ ও এডুকেশন কর্মীদের অনুষ্ঠান দর্শকশ্রোতাদের ভালো লেগেছিল। শিল্পীমন প্রযোজিত 'দীপ' নাটকটিতে প্রগতিবাদের নামে শ্রমিকশ্রেণীর যে-চরিত্র রচিত হয়েছে, তাতে নাট্যকার শ্রীউৎপল দত্ত ও প্রযোজকদের সমাজচেতনা ও নাট্যচেতনার যে মর্মান্তিক দীনতা প্রকাশ পেয়েছে, তাতে এ নাটক মঞ্চায়নের যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রথমত, নাটকের প্লট তো শিশুসুলভ; দ্বিতীয়ত, অশালীন ভাষাব্যবহারই কি শ্রমিকশ্রেণীর একমাত্র শ্রেণীপরিচয়?

আমেরিকার বুদ্ধিজীবীরা কি এই সহজ কথাগুলি বোঝেন না? তাঁরা কি এতই মোহগ্রস্ত? তাঁদের মোহনিদ্রা কি ভাঙবে না?

সাম্প্রতিক ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে, এই সকল সংশয় অমূলক। প্রখ্যাত মার্কিন কবি রবার্ট লাওয়েল ভিয়েতনামে মার্কিন নীতির প্রতিবাদে হোয়াইট হাউসে আসার জন্য রাষ্ট্রপতি জনসনের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং তাঁর এই কাজকে সমর্থন করেছেন আমেরিকার আরো কুড়িজন লেখক, যাঁদের মধ্যে অনেকে পুলিটজার পুরস্কারবিজয়ী। মিশিগ্যান, হার্ভার্ড, ইয়েল, কলাম্বিয়া, চিকাগো, বার্কলে প্রভৃতি অসংখ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যে-সকল Teach-in সমাবেশ এবং অবশেষে ১৫ই মে তারিখে ওয়াশিংটনে যে জাতীয় Teach-in সমাবেশ অনুষ্ঠিত হলো, এই সকল সমাবেশে সহস্র সহস্র অধ্যাপক ও লক্ষ লক্ষ ছাত্রেরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ও লাতিন আমেরিকায় মার্কিন শাসকদের প্রতিক্রিয়াশীল, উপনিবেশবাদী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছেন। ছাত্রেরা দাবি করেছেন, ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন সৈন্যবাহিনীকে ফিরিয়ে আনা হোক। তাঁরা ১০০ লিটার রক্তদান করে বলেছেন, জনসন ভিয়েতনামে পাঠাচ্ছেন নাপাম বোমা, আমরা সেখানে পাঠাবো আমাদের ভ্রাতৃরক্ত। ভিয়েতকং বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক ব্রিগেড গঠন করে ভিয়েতনামে পাঠানোর কথাবার্তাও তাঁরা বলেছেন। আমেরিকার এই সব অবাধ্য সন্তানদের নমস্কার করি। এঁদের আবির্ভাব শুধু আমেরিকার পক্ষেই নয়, সমস্ত পৃথিবীর পক্ষেই একটা অত্যন্ত শুভ সংবাদ। আশা করা যেতে পারে, এখন থেকে দুই আমেরিকার দুই কণ্ঠস্বর শোনা যাবে, মার্কিন রাজদরবারকে বিদ্রোহী আমেরিকার সঙ্গে মোকাবিলা করে চলতে হবে। পৃথিবীতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিকে সফল করে তোলার জন্য আমেরিকার জনসাধারণের দায়িত্বই সব চেয়ে বেশি। তাঁদের কাজও সবচেয়ে কঠিন। এই কঠিন কাজে যাতে তাঁরা সাফল্য লাভ করেন তার জন্য পৃথিবীর সকল শান্তিকামী মানুষের সঙ্গে একযোগে আমরাও তাঁদের শুভেচ্ছা ও সমর্থন জানাচ্ছি।

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

...ষ্ঠানগুলির শিল্পী মনোনয়ন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হতাশ করেছে। শোনা গেল, কয়েকটি নাটকের দলকে স্থান দেওয়ার জন্য উচ্চাঙ্গ সংগীতের একটি অনুষ্ঠান শেষ মুহূর্তে বাতিল করে দেওয়া হয়; এতে শিশিরকণা ধর চৌধুরী, মানস চক্রবর্তী, আশীষ খাঁ, ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য প্রমুখের যোগ-দেবার কথা ছিল।

সব দেখে-শুনে মনে হলো, সংস্কৃতিক্ষেত্রে মাথা গলাবার সামান্যতম অধিকার যাঁদের নেই, তাঁদেরই হাতে পড়ে বাংলাদেশের এই উৎসবটির এমন দুর্গতি ঘটল।

অমিয়কুমার ভট্টাচার্য

আমেরিকায় নবপ্রভাতের সূচনা

মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ, জাতির উপর বিশ্বাস হারানোও পাপ। বারবার এ কথা ভুলে যাই, বারবার ইতিহাস এই সত্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ভিয়েতনামের গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করে, দক্ষিণ ভিয়েতনামে গ্যাসযুদ্ধ ও বিষযুদ্ধ চালিয়ে, আগুনে বোমার দ্বারা সেখানে একটা ব্যাপক ও নির্বিচার হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে এবং সেখানকার স্থানীয় যুদ্ধকে উচ্চগ্রামে তুলে একটা বিশ্বযুদ্ধ বাধাবার তোড়জোড় করে আমেরিকার শাসকেরা যে সমগ্র মানবজাতির ভয়ংকর শত্রুরূপে কাজ করছেন, এ বিষয়ে কোনো শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মনে লেশমাত্র সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু মনে এই প্রশ্ন জেগেছিল, আমেরিকার বুদ্ধিজীবীরা ও সাধারণ মানুষেরা তাঁদের শাসকদের এই সকল কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন না কেন? মার্কিন শাসকদের সর্বনাশা দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় নীতির দ্বারা আমেরিকার লোকেদের স্বার্থও তো কম বিপন্ন হয়ে পড়ছে না। এশীয়দের দিয়ে এশীয়দের লড়িয়ে দিতে গিয়ে আমেরিকা নিজেকে এমন একটা অবস্থায় ফেলেছে যে, অবিলম্বে ভিয়েতনামে চার লক্ষ মার্কিন সৈন্য পাঠানো আবশ্যক হয়ে পড়েছে। কি চায় আমেরিকা? ভিয়েতনামের ক্রোমিয়াম বা অন্য কোনো ধাতু? তা তো ভিয়েতনামের গণসরকারের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তির দ্বারা আমেরিকা অনায়াসেই পেতে পারে। তার জন্য ভিয়েতনামের ও আমেরিকার সন্তানদের অজস্র রক্তক্ষয় ঘটানোর তো কোনোই প্রয়োজন নেই। এবং ওই রক্তক্ষয়ের শেষ কোথায়?

সত্যজিৎ রায়ের সম্মান

পুরস্কারে শিল্পসৃষ্টির মর্যাদা বাড়ে কি না তা নিয়ে মতভেদের অবকাশ থাকতে পারে কিন্তু যোগ্য ব্যক্তিকে সম্মানিত করলে যে পুরস্কারেরই সম্মান বাড়ে তাতে সন্দেহ নেই। সত্যজিৎ রায় এমন একজন যোগ্য ব্যক্তি। বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পকে তিনি আন্তর্জাতিক মানচিত্রে সম্মানের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 'চারুলতা' ছবির জন্য এবারে তাঁকে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক দিয়ে, বলতেই হয়, রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের নির্বাচকমণ্ডলী সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। 'চারুলতা'-য় সত্যজিৎ রায় রবীন্দ্রনাথকে কতটা অনুসরণ করেছেন তা নিয়ে কোনো কোনো মহলে মতভেদ থাকতে পারে এবং তার সপক্ষে এবং বিপক্ষে অনেক যুক্তিই হয়তো দেওয়া যায়, কিন্তু এ-বিষয়ে মতভেদের অবকাশ কম যে 'চারুলতা' সত্যজিৎ রায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র-সৃষ্টি, এ-বছরের শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ছবি তো বটেই।

সত্যজিৎ রায়কে আমরা পরিচয়গোষ্ঠীর একজন বলেই জানি। তাঁর প্রতিটি সাফল্যে তাই আমরা গর্ব অনুভব করি। আজকের এই আনন্দের দিনে তাই তাঁকে আমরা জানাই আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন। কামনা করি তাঁর প্রতিভার প্রসন্ন দানে বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্প উত্তরোত্তর ঐশ্বর্যশালী হোক।

প্রদ্যোৎ গুহ

বাট বছরে শোলোখফ

গত ২৩ মে মিখাইল শোলোখফের ষষ্টিতম জন্মদিন উপলক্ষে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী তাঁকে "অর্ডার অফ লেনিন" সম্মানে ভূষিত করেন। শোলোখফের এই ষষ্টিতম জন্মদিন উপলক্ষে মস্কোর ও অন্যান্য অঞ্চলের সমস্ত সংবাদপত্রে ও সাহিত্য-পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। দেশের সমস্ত অঞ্চল থেকে শোলোখফের অনুরাগী পাঠকরা তাঁকে কয়েক সহস্র অভিনন্দনবাণী পাঠান।

বিদেশ থেকে যাঁরা শোলোখফের দীর্ঘায়ু কামনা করে অভিনন্দনবাণী পাঠিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন লুই আরার্গঁ, পাবলো নেরুদা, জন স্টাইনবেক,

পল রোবসন, ফিনল্যাণ্ডের লেখক-সংঘের সভাপতি মার্ত্তি লারনি, বহু দেশের লেখক, প্রকাশক ও সাংবাদিকদের জাতীয় সংঘ এবং সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সেই সব দেশের সাংস্কৃতিক সংযোগ-সমিতি।

এই উপলক্ষে খ্যাতনামা সোভিয়েত অভিনেতা ও প্রযোজক বোরিস বাবোচ্‌কিন জানিয়েছেন যে তিনি শীঘ্রই মালি থিয়েটারে শোলোখভের "অ্যাণ্ড কোয়ায়েট ফ্লোজ দি ডন" উপন্যাসের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করবেন। ইতিমধ্যে, পুশকিন থিয়েটারে বিপুল সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হচ্ছে "ভার্জিন সয়েল আপটার্নড"। শোলোখভের "ফেট অফ এ ম্যান" এবং "দি ডন স্টোরি"র চলচ্চিত্ররূপ পৃথিবীর বহু দেশে দেখানো হয়েছে ও দর্শকসাধারণের উচ্চ প্রশংসা পেয়েছে। কলকাতার ও ভারতের অন্যান্য শহরের চলচ্চিত্রানুরাগীরাও এই ছবি দুটি দেখার সুযোগ পেয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, শোলোখভের উপরিলিখিত এই চারটি রচনার মধ্যে প্রথমোক্ত তিনটি বাংলায় অনূদিত হয়েছে। সম্প্রতি বিশ্ববিখ্যাত সুরকার দ্‌মিত্রি শোস্তাকোভিচ "অ্যাণ্ড কোয়ায়েট ফ্লোজ দি ডন" অবলম্বনে একটি সংগীতালেখ্য রচনা করেছেন।

বিয়োগপঞ্জী

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

সত্যই এ এক বেদনাদায়ক ঘটনা—স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ-পূর্তির আয়োজন যখন চলেছে তখনি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় পিতার অনুগামী হলেন। এ সংবাদ জেনে ব্যথিত ও স্তব্ধ না হয়েছেন এমন লোক কেদারনাথের সুবৃহৎ পরিচিত সমাজে কেউ নেই। তাঁর বিদায়কালে তিনি ৭৪ বৎসর অতিক্রম করেছিলেন, তাই বাঙালির তুলনায় তাঁকে অকালে গত হয়েছেন বলা চলবে না। কিন্তু সংবাদটা এসেছিল আকস্মিক। চিরদিনের স্বাস্থ্যবান, প্রিয়দর্শন এবং প্রিয়ভাষী এই পুরুষের বিদায়ের জন্ত কেউ প্রস্তুত ছিলেন না।

সুরুচিবান ও সুশিক্ষিত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় বিলাতে ফলিত রসায়নের উচ্চবিভার ছাত্র ছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞান বা সুকুমার শিল্পের কোন বিভাগ যে তাঁর আয়ত্ত ছিল না, তাই ভাবতে হয়। পিতার জীবনের শেষদিকেই তিনি 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়্যু'র কার্যভার গ্রহণ করেছিলেন; রামানন্দবাবুর পরে তিনিই নেন এই দুই পত্রের সম্পাদনার ভার। সর্বদিকেই তিনি ছিলেন সুযোগ্য অধিকারী। পত্রকার হিসাবে তাঁর বিদ্যা ও অভিজ্ঞতার কিছুটা প্রমাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্ররাও পেতেন; কিন্তু সে সামান্ত। 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়্যু'তে লিখিত তাঁর সম্পাদকীয় আলোচনাতে অবশ্য তাঁর পরিচয় আরও একটু বেশি পাওয়া যেত; কিন্তু তাও যথেষ্ট নয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পারস্ত ভ্রমণের যে-বিবরণ তিনি লিখেছেন, তাতেই বরং আরও একটু বেশি তাঁর দৃষ্টি ও শক্তির পরিচয় আছে। সবশুদ্ধ তবু দুঃখ করতে হয়—তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় লেখায় তিনি স্থায়ী করে গেলেন না। হয়তো এক হিসাবে তা লেখায় স্থায়ী হবার মতো জিনিস নয়। প্রথমত তিনি ছিলেন উদারমনা। তাঁর সদাশয়তা ও হিতৈষণা বহুলোকের অযাচিত সেবায় ও সহায়তায় কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করে গিয়েছে। দ্বিতীয়ত, এই উদারতা এবং বহুবিস্তৃত অধ্যয়ন ও জিজ্ঞাসা সর্বাপেক্ষা চমৎকাররূপে প্রকাশিত হত তাঁর বন্ধুগোষ্ঠীতে আলাপ-আলোচনায়, আড্ডায়-মজলিসে। তাঁর মতো

এমন বহু তথ্যবিদ ও স্বচ্ছন্দ প্রিয়ভাষী মানুষের সঙ্গ যে-কোনো সভ্যসমাজের একটা সম্পদ। আসলে তিনি ছিলেন বৃত্তিতে আড্ডারসিক আর রুচিতে শিক্ষারসিক। এই চিত্তোৎকর্ষই রবীন্দ্রনাথকেও মুগ্ধ করত। কিন্তু সৌজন্য ও স্নেহসরস এই মানুষটির কাছে অখ্যাত অনুজরাও পেত অকুণ্ঠ উৎসাহ। আর সেই সঙ্গে যখন মনে পড়ে সকলের সঙ্গে তাঁর সহজ স্বচ্ছন্দ আচরণ ও কৌতুকবোধ, তখন স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে—এমন লোক বাঙলা দেশে আর কয়জন রইলেন?

গোপাল হালদার

রবীন্দ্রনাথের চিঠি

গত বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলি পাওয়া গেছে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সহধর্মিনী শ্রীমতী ছায়া দেবী ও পুত্র শ্রীকুমার মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে।

—সম্পাদক, পরিচয়

আষাঢ়, ১৩৭২

আকাশ থেকে মহাকাশ : দিলীপ বসু

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা

মেক্সিকোর প্রতিকৃতি : মণি জানা

বাংলা কবিতা প্রসঙ্গ : অশোক মিত্র

ভারতের সরকারী ভাষা : গোপাল হালদার

কবিতা, গল্প, উপন্যাস, বিবিধ-প্রসঙ্গ, নাট্য-প্রসঙ্গ,
চলচ্চিত্র-প্রসঙ্গ, পুস্তক-পরিচয়, পাঠকগোষ্ঠী

পরিচয়

বর্ষ ৩৪ । সংখ্যা ১২
আষাঢ়, ১৩৭২

সূচীপত্র

প্রচ্ছদপট : সুবোধ দাশগুপ্ত

সম্পাদক

গোপাল হালদার ॥ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

পরিচয় (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

পরিচয়
বর্ষ ৩৪ । সংখ্যা ১২

অশোক মিত্র

ভয়ে-ভয়ে কয়েকটি কথা

এই বছরের শুরুতে এলিয়টের মৃত্যুসংবাদ আমাদের কাছে পৌঁছয়। কিংবদন্তী কবিতার দেশ বাংলা, কিন্তু যে-কোনো সাধারণ প্রসঙ্গের মতোই, এলিয়টের মৃত্যুও আমাদের আদৌ বিচলিত-উত্তেজিত করতে পারে নি। সামান্য কয়েক দশকে আমরা কতদূর স'রে এসেছি এটা তার পরিচায়ক। উত্তরএলিয়টের জীবনদর্শনে অবশ্যই আমাদের অধিকাংশের শ্রদ্ধা নেই; তাছাড়া, গত কুড়ি বছরে তেমন-কোনো প্রগাঢ় দ্যোতনাসম্পন্ন কবিতা লেখেন নি এলিয়ট। তবে, সবচেয়ে বড়ো কথা, কবিতা থেকেই আমরা অনেকদূর স'রে এসেছি। যে যা-ই বলুন, শুদ্ধতা-তাত্ত্বিকরা যত মন্ত্রই উচ্চারণ করুন, আসলে দেশ, সমাজ, আশেপাশে সংস্থিত-সংঘটিত-উন্মোচিত আবেগ-অভিজ্ঞতা-অনুভূতির উদ্বেলতা-বিষণ্ণতা-বিশীর্ণতা অতিক্রম ক'রে কবিতা অসম্ভব: কাব্যরচনা অসম্ভব, কাব্য-উপভোগও। দেশ ম্লান থেকে ম্লানতর হচ্ছে, সমাজ শতচ্ছিন্ন, সুবিধান্বেষণ-চতুরালি-বিবেকহীনতার কাছে আমি-আপনি-সবাই আত্মসমর্পণ ক'রে আছি, সাম্প্রতিক ক্রিয়াকর্মে সততার ব্যাপ্তি নেই, আবেগের অভিজ্ঞানও অনুপস্থিত। পৃথিবী টুকরো-টুকরো হয়ে এসেছে, মহৎ সুষমার প্রতি মনোনিবিষ্ট হবার মতো চিকীর্ষা কোথাও নেই। সুতরাং কবিতার ঋতু শেষ, কবিতার প্রতি প্রেম মরে গেছে। কবিতার বইয়ের কাটতি এমনিতে বেড়েছে, এমনকি এই বাংলাদেশে পর্যন্ত বেড়েছে, কবিকুল এখনো ক্রমবর্ধমান, ছন্দে ভুল নেই, প্রকরণে-সপ্রতিভতা এমনধারা প্রচুর কবিতা লেখাও হচ্ছে। অথচ, আলাদা ক'রে বিচার করা হোক, কিংবা সম্মিলিত সভায় মাল্যপুষ্পাঞ্জলির আয়োজন করা হোক, গত পাঁচ-দশ বছরের বাংলা

কবিতায়, ভেবেচিন্তেই ঢালাও মন্তব্য করছি, কোনো আনন্দেরই আভাস নেই : হতাশায়-কান্নায় উৎসমূল থেকে ছিটকে-বেরোনো যে-আনন্দ, তার স্পর্শ নেই ; নিবিড়তার হৃৎপিণ্ড ছুঁয়ে আসার সাফল্যে যে-আনন্দ, তা-ও নেই : নিরাভরণ-নিরাড়ম্বর কোনো অপাপবিদ্ধা মেয়ের হাসির ঝিলিমিলির মধ্যে যে-আনন্দ, তা পর্যন্ত নেই। দক্ষতা আছে, কিন্তু দক্ষতার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য আমরা কবিতা পড়ি না, তাহ'লে তো তরবারি-ঘুরোনো তত্ত্বালোচনায় খোঁজ করলেই হয়। কবিতার নির্ভরে যে-গ্রহান্তরকামনা আমরা চরিতার্থ করতে চাই, সেই বিস্ময়লোক বাংলা কবিতায় আর ধরা দেয় না : সায়াহ্নসয়ে প্রতিহত হয়ে ফিরি।

আশঙ্কা হয়, যে দুঃসাহসী যুবকের দল এখনো কবিতা লিখছেন, তাঁদের মনেও আর আশা নেই, তাঁরাও ধরে নিয়েছেন এখন থেকে শুধু প্রহর-গোণা। 'কবিতা' পত্রিকা যদিও বন্ধ হয়ে গেছে, তরুণতরদের কবিতার পত্রিকা ইতস্তত এখনো অনেকগুলি প্রকাশিত হচ্ছে। এরকম কোনো পত্রিকারই একটি বিজ্ঞাপন সেদিন হঠাৎ চোখে পড়ল, বাংলাতে সবশেষের ভালো কবিতা-ক'টি তাঁরা ছাপাচ্ছেন, আমরা যেন কিনে পড়ি। এই চাতুর্য ভালো লাগল, কিন্তু ভালো-লাগাকে ছাপিয়ে আচ্ছন্ন করে রইল আসন্ন মৃত্যুর বিষাদরেশ।

ইচ্ছা করেই 'কবিতা' পত্রিকার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম : করলাম এটা স্মরণ ক'রে যে আজ থেকে ঠিক তিরিশ বছর আগে 'কবিতা'র জন্ম। বছর পাঁচেক হতে চলল 'কবিতা'র প্রকাশ বন্ধ হয়েছে, আমার সন্দেহ, প্রকৃতির নিয়ম মেনে নিয়েই হয়েছে। তারও আগে, খুব সম্ভব ১৯৫০ সালে, পত্রিকাটি উঠে যাবার উপক্রম হয়েছিল ; জোড়াতালি দিয়ে পুনঃপ্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথই ঠিক, যা ফুরোবার, তাকে ফুরোতে দেওয়াই ভালো। 'কবিতা'র ধুঁকে-পুকে শেষ দশ বছর বেঁচে থাকার কোনো সার্থকতা ছিল না। বড়ো কষ্টের মধ্যে 'কবিতা'র ঐ শেষের কয়েকটি বছর কেটেছিল, ঋতু পেরিয়ে বেঁচে থাকার কষ্ট, স্রেফ শারীরিক অর্থে বেঁচে থাকার গ্লানি। বুদ্ধদেব বসু কয়েক বছর ধরে প্রবাসী, এবং ধ'রে নেওয়া যেতে পারে 'কবিতা' আর নবপর্যায়ে প্রকাশিত হবে না। তাই, অনেকটা আবেগ-নিরপেক্ষ হয়ে এখন 'কবিতা'র বিশ্লেষণ সম্ভব।

এই বিশ্লেষণের প্রয়োজন যথেষ্ট। বাংলা কবিতা বিগত কয়েক দশকে কোথায় পৌঁছেছে, কী করে পৌঁছল, কী হয়েছে, কী হতে পারল না,

এবংবিধ সকল বৃত্তান্ত, আমার ধারণা, 'কবিতা' পত্রিকার ইতিহাসে বিধৃত হয়ে আছে। এই ইতিহাসের অন্যতম প্রধান পুরুষ সম্পাদক হিশেবে বুদ্ধদেব বসু নিজে নিশ্চয়ই, কিন্তু অভিভাবকত্রিয়তার ভূমিকায় যাঁদের আসন সর্বাগ্রে মনে পড়ে, তাঁরা একদিকে জীবনানন্দ দাশ, অন্যদিকে সমর সেন-সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

প্রেমেন্দ্র মিত্র-সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-বিষ্ণু দে-অজিত দত্ত-অমিয় চক্রবর্তীকে আমি ইচ্ছা ক'রেই অবহেলা করছি, যেমন করছি বুদ্ধদেব বসুর কবিকর্মকে। অনেক রাত্রি-উতল-করা কবিতা উল্লিখিত প্রত্যেকের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি, অনেক উজ্জ্বলতার অভিজ্ঞান, শত-সহস্র পংক্তি যেগুলি এখন আমাদের চেতনার সঙ্গে সুমিশ্রিত। কিন্তু মনে হয় না, আরো কয়েক দশক পেরিয়ে যাবার পর, এঁদের কারোরই কাব্যকলার কোনো বৃহদংশ বুকে চমক দিয়ে ডাকবে, অথবা বুদ্ধিতে নতুন কোনো দীপ্তির দৌত্য নিয়ে আসবে। সময়ের প্রভাবে বাংলা কাব্যপাঠকের আবেগে-বিচারে ধৃতিনিষ্ঠার ছোঁয়া লাগবে : তখন অনেকের কাছেই সম্ভবত মনে হবে রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-মোহিতলালের প্রবাহের পর, পশ্চিমের কবিতার পাশাপাশি নিঃশ্বাসের পর, বুদ্ধদেব বসু-বিষ্ণু দে-সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সবাই-ই সহজবোধ্য, সহজগ্রাহ্য। ✓কিন্তু প্রবাহের ভিড়ে হারিয়ে যাবেন না জীবনানন্দ দাশ, উদ্ধত বিদ্রূপের মতো পংক্তি-বিভক্ত হয়ে থাকবেন সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়।✓

'কবিতা' পত্রিকার অভাবে বরিশালের কবি জীবনানন্দ হয়তো চুপচাপ কবিতা লিখে চুপচাপই তাদের ঘুম পাড়িয়ে রাখতেন, চিরকালের জন্য তারা আমাদের অনুভবের অন্তরালে থেকে যেত। বুদ্ধদেব বসু যদি কোনো-দিন আত্মজীবনী লেখেন, আরো একটু বিশদ করে আমরা জানতে পারব কত পরিমাণ আশ্বাস ও উৎসাহ দিয়ে, কত উপরোধের উপান্তে জীবনানন্দের কাছ থেকে নিয়মিত কবিতা সংগ্রহ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। অন্যদিকে, 'কয়েকটি কবিতা'-পর্যায়ের প্রায় সমস্ত কবিতাও প্রথম দু-বছরের 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, এবং পত্রিকাটির প্রথম পাঁচ বছর সমর সেন সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম ছিলেন, কলেজের ছাত্র থাকাকালীন অবস্থাতেই ছিলেন। প্রায়-নাবালককে এই সম্মানদানের পিছনে অবশ্যই ছিল বুদ্ধদেব বসুর ঔদার্য ও বিচারতীক্ষ্ণতা। এরই কয়েক বছর বাদে সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে সমপরিমাণ উৎসাহসহকারে 'কবিতা' পত্রিকার সাদরসম্ভাষণও স্মরণ করতে

হয়। সুভাষ হয়তো কবিতা লিখতেনই, লিখতেন বেপরোয়া প্রাণের আবেগে, কিন্তু 'কবিতা' পত্রিকার অভাবে, 'পদাতিক'-এর সংহতি হয়তো অনেকটাই অপচয়ভ্রষ্ট হতো।

অবশ্য এমনকি জীবনানন্দের কবিতায় পর্যন্ত মাঝে-মাঝে ইয়েটসের ঈষদাভাস, সমর সেনের আদি কবিতায় এলিয়ট অথবা পাউণ্ডের ইতস্তত অনুরণন, সুভাষের প্রারম্ভোক্তিতে কচিৎ-অকস্মাৎ মায়াকভস্কির ইংরেজি অনুবাদের সুপঠিত ইঙ্গিত। কিন্তু এ-সমস্ত বাদ; মাত্র কিছুদিনের মধ্যে এই কবিত্রয়ের সৃষ্টিতে যুগপৎ যে আবেগ ও ওজস উদ্ভাসিত হতে শুরু হল, তার তুলনা নেই। একদিকে জীবনানন্দের ছায়া-ছায়া উপমা-চিত্রকল্প-রূপকথা, অন্যদিকে সমর সেনের বুদ্ধিক্ষিপ্র নাগরিকতা, কিছু পরে সুভাষের দীপ্ত আশার ঘোড়সওয়ার বাংলা কাব্যে এক অভাবনীয় ঐশ্বর্য জড়ো করল।

'কবিতা' পত্রিকার প্রথম দশ বছর এই সুখসৌভাগ্যে কেটেছে। কিন্তু তারপরেই অঘটনের পালা। দুর্যোগ এল প্রধানত তিনটি দিক থেকে। প্রথম থেকেই সমর সেন-সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনুরাগী-অনুকারকের সংখ্যা প্রচুর। অনুরাগাধিক্যের উচ্ছ্বাসে শেষোক্তরা এত পরিমাণ নকলনবিশি নিকৃষ্ট কবিতা লিখতে ব্যাপৃত হলেন যে তন্নিষ্ঠমনারা ভড়কে গেলেন: রাজনৈতিক ধুয়ো, যা সস্তা, কবিতায় বৃহদায়তন দখল করে রইল, কবিত্ব ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হল। সুভাষ মুখোপাধ্যায় বরাবরই আদর্শবৎসল, অচিরেই তিনি অনুকারকদের অনুকরণে কবিতা মক্সো আরম্ভ করলেন। সমর সেন, সম্ভবত আতঙ্কগ্রস্ত হয়েই, গদ্যছন্দ বর্জন করে কিছু সময় ঈশ্বর গুপ্তের পয়ারের আড়ালে আত্মগোপন করলেন, তারপর একদিন তাঁর লেখা বন্ধ হয়ে গেল। অক্ষম অনুকারকদের খর্পর থেকে উদ্ধার পাবার জন্যই তিনি নীরবতা অবলম্বন করলেন কিনা সেটা বাংলা কাব্যের ইতিহাসে একটা মস্ত প্রশ্ন থেকে যাবে। তাছাড়া, যে-আবেগের তাড়নায় শাণিত, ক্লান্ত, বিদ্রূপঅবিশ্বাসছড়ানো লিরিকের উত্তরসময়ে নতুন সমাজের স্বপ্নবুননে তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন, গোঁজামিল স্বাধীনতাপ্রাপ্তি-দেশবিভাগ-শরণার্থী সমস্যার রক্তরোলে তা আস্তে-আস্তে সম্পূর্ণ মিলিয়ে আসে। পেশাদার আশাবাদী হ'লে তদ্‌সত্ত্বেও সমর সেন লিখে যেতেন, কিন্তু, হয়তো তিনি ভেবে ঠিক করলেন, কবিতা-লেখার প্রস্তাব অতঃপর প্রক্ষিপ্ত।

দেশ ও সমাজকে বাদ দিয়ে বৈদেহী কাব্য রচনা সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়,

প্রথমদিকের জীবনানন্দ তার প্রমাণ। কিন্তু আদর্শ হিশেবে এ ধরনের প্রতীপপ্রত্যয় বিপজ্জনক, কারণ যে-নারীকে ভালোবাসা কিংবা অবহেলা করা যায়, তারও চোখের নীলিমায় সমাজের ভাবনায় অনুকম্পা যুক্ত হবেই। যে-কেউই স্বীকার করবেন, শেক্সপীয়রের সনেটসমষ্টির অভিষ্টার সঙ্গে ব্রাউনিঙের লীলাসঙ্গিনীর শতাব্দীর ব্যবধান। ঠিক যে-মুহূর্তে সুভাষ মুখোপাধ্যায় স্লোগানের গহনতায় ডুবে গেলেন, এবং সমর সেন নীরব হবার সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন, বাংলাদেশের পাঠকেরা, প্রায় অতর্কিতভাবেই যেন, জীবনানন্দ দাশকে আবিষ্কার করলেন। নিজের মনে বহুদিন ধ'রে জীবনানন্দ বাংলাদেশের মফস্বলে কবিতা রচনা করে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ১৯৫০-এর প্রত্যন্তে পৌঁছেই তবে তাঁর প্রাপ্য পেতে শুরু করলেন। এই জীবনানন্দ-আচ্ছন্নতা আবেগশীর্ষে পৌঁছুল তাঁর শোকাবহ মৃত্যুর পর, কিছুটা, আমার সন্দেহ, ঐ শোকাবহ মৃত্যুর জন্যই।

জীবনানন্দের কাব্য সত্যিই কুহকিনী। রবীন্দ্রনাথের পর এতটা দ্যোতনা বাংলা কবিতায় আর সঞ্চারিত হয় নি। সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পৃথিবী, আমূল অন্যরকম এক ভাষা; যে-পৃথিবী তার মায়া দিয়ে কাছে ডাকে, একবার কাছে গেলে আর ঘুরে স'রে আসা যায় না চট ক'রে—মৃত্যুর মতো, নিবিড়তম প্রেমের মতো যা ছেঁকে ধরে। এবং ভাষা, তা-ও তাই—কখন নিজেদের অজ্ঞাতে সবাই সে-ভাষা ব্যবহার করতে শুরু করেন, কিন্তু বৃথা, সেই জাদু অতটা অবলীলার সঙ্গে ঝলক দেয় না, প্রত্যেকেই ব্যর্থ হয়ে ফেরেন, অথচ ব্যর্থতা থেকে পুনরায় রোখ চেপে বসে, সেই ভাষার আবহে কাতারে-কাতারে কবি-কবিযশপ্রার্থীরা ফিরে-ফিরে যান। যে-মায়া কোনোদিন ধরা পড়বে না, যাতে জীবনানন্দের একারই শুধু মহত্তম, অখণ্ডতম অধিকার, সেই সোনার হরিণের অন্বেষণ উদ্‌ভ্রান্ত উৎসাহের সঙ্গে অবিশ্রান্ত চলেছে, এখনো চলছে।

আজ থেকে অর্ধশতাব্দী আগেকার রবীন্দ্রানুসৃতির মতোই, বর্তমানের জীবনানন্দীয় ঘোর, আমার ধারণায়, বাংলা কাব্যকে একজায়গায় আটকে রেখেছে, জীবনানন্দকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে না-আসতে পারলে মুক্তি অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা কবিতায় জীবনানন্দের সৃষ্টি জ্যোতির্ময়তম, কিন্তু, সেজন্যই বলছি, তাঁর সর্বসমাচ্ছন্ন-করা প্রভাব পরম সর্বনাশের ব্যাপার। এই সর্বনাশের প্রথম আভাস আজ থেকে পনেরো-ষোল বছর আগে প্রথম

ধরা পড়ে। অপ্রিয়বাদের অভিযোগের আশঙ্কা সত্ত্বেও বলব, এই প্রবণতার অশুভ পরিণাম সম্ভাবনা সম্বন্ধে তখন থেকেই বিবেকবান সমালোচকদের ভাবা উচিত ছিল, এবং সবচেয়ে বেশি ক'রে ভাবা উচিত ছিল 'কবিতা'-সম্পাদক বুদ্ধদেব বসুর। নিজের উপর বুদ্ধদেব অনেকটা দায়িত্ব নিয়েছিলেন, সম্পাদক হিশেবে তাঁর প্রধানতম কর্তব্য ছিল অকম্পিত, অবিচলিত, সম্পূর্ণ আবেগনিরপেক্ষ সমালোচনা। বাংলা কবিতার পক্ষে মস্ত দুর্ভাগ্য, ঐ মুহূর্তে 'কবিতা'-সম্পাদক সে-দায়িত্ব পালন করলেন না। রাজনীতিপরাঙ্মুখতা থেকে সমর সেন-স্থভাষ মুখোপাধ্যায়-স্থকান্ত ভট্টাচার্যের কাব্যকলার বিরূপবিচারে বুদ্ধদেব সে-সময় মহা উৎসাহের সঙ্গে ব্যস্ত-ব্যাপৃত। সমাজের অভিজ্ঞান বাদ দিয়ে কাব্য যে অসম্ভব, এমনকি প্রেমের কবিতাও, বুদ্ধদেব সম্পাদক হিশেবে সে-অনুজ্ঞা জানাতে তাই আর উৎসাহী রইলেন না। জীবনানন্দের কবিতার গভীরে যে-প্রেম, যে জ্ঞানমিশ্র আস্তিকতা, তারও যে সুষমাউজ্জ্বল এক সামাজিক পটভূমি আছে, 'কবিতা' পত্রিকার মারফৎ সে সতর্কবাণী সংকটসময়ে অনুচ্চারিত থাকল।

স্লোগানে আস্থা হারিয়ে যে মানসিক আবর্তনের শুরু, তার আকর্ষণে বুদ্ধদেব শেষ পর্যন্ত অন্য-এক স্লোগানে অন্ধ বিশ্বাস আরোপ করে পরিতুষ্টি পেলেন। সমাজ নয়, আজ-কাল-পশুর সংঘটনা নয়, চোখকান বুজে, বহির্পৃথিবীর সঙ্গে সংবেদনার দরজা-জানালা বন্ধ ক'রে নিজের ভিতরে তাকাও, সেখানেই কবিতার উৎস। জীবনানন্দীয় সম্মোহনের সঙ্গে এই সম্পাদনা-আদর্শের কাকতালীয় মারাত্মক নৈরাজ্যের বন্যা উপস্থিত করল। জীবনানন্দের পারমিতাবোধ প্রায় সকলেরই উপলব্ধির অনায়ত্ত, অথচ তাঁর নিভৃত, নিজস্ব ভাষাসম্ভারের উচ্ছৃঙ্খল লুণ্ঠনে প্রত্যেকেরই যেন অপরিমিত অধিকার। সেই থেকে শুরু কথা-সাজানোর সানুনাসিক ক্লান্তিকর খতুর: আবেগ নেই, অনুভূতি নেই, উচ্চকিত প্রেম নেই, স্বদেশ-সমাজের প্রতি অনুরাগ নেই, ভাষার নিরালম্ব বায়ুভূত নিরাশ্রয় ব্যবহার আজ পর্যন্ত বাংলা কবিতাকে আবিল ক'রে রেখেছে।

দুঃখ হয় অরুণকুমার সরকার-বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-নরেশ গুহ প্রমুখ কয়েকজনের জন্য, যাঁরা এই প্রায়োন্মত্ত ভিড়ের মধ্যেও আলাদা স্বর ফোটাবার চেষ্টা করেছিলেন, ছন্দের শিহরিত বৈচিত্র্যের উৎস-অনুসন্ধানে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন তাঁদের কারো কাব্যই তেমন আর আমল পেল না:

একদিকে জীবনানন্দের বিলম্বিত অতিভাব, অন্যদিকে বিদেশী সমুদ্রের প্রতিধ্বনিত অস্থিরতা, তাঁদের কয়েকজনের অন্তরঙ্গ, অথচ বিশিষ্ট, কণ্ঠস্বর মিলিয়ে গেল।

কারণ ঠিক এই সময়েই, 'কবিতা' পত্রিকার মধ্যবর্তিতাতেই, আরেকটি বুদ্বুদের আবির্ভাব ঘটল। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বহু বছর ধ'রে চেষ্টা করছিলেন বাঙালি পাঠকদের সঙ্গে ইওরোপীয়, বিশেষ ক'রে ফরাসি ও জর্মন, কাব্যের পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়ার। কিন্তু ইংরেজির বাইরে আমাদের ভাষাচর্চা মোটেই অগ্রসর নয় ব'লে আমাদের ইংরেজি-অতিরিক্ত কাব্যাস্বাদও যথেষ্ট সময়ের ব্যবধান অতিক্রম করেই তবে পরিপূর্তি পায়। অনুবাদে, কিংবা অনুবাদের অনুবাদে, বাংলাদেশে র‍্যাঁবো, বোদলেয়ার, ভের্লেন প্রভৃতির কবিতার ঢেউ এসে ঠেকল বিংশ শতকের ষষ্ঠ দশকের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে। সমরেশ সেনরা, অন্নদাশঙ্করের ছড়াতেই আছে, যখন যা পড়েন, তখন তা লেখেন। তিরিশের দশকে পাউণ্ড-এলিয়ট-মায়াকভস্কির প্রতিধ্বনিত আবেগ মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের তৎকালীন মানসিকতার সঙ্গে চমৎকার মিলে গিয়েছিল। কিন্তু দু-টুকরো-হয়ে-যাওয়া শরণার্থীসমস্যাদীর্ণ বিপ্লবের ঘোর-লাগা বাংলাদেশে ১৯৬০ সালের আবর্তে র‍্যাঁবো-বোদলেয়ার ঘোরতর বেমানান। যাঁরা জীবনানন্দীয় ভাষাকুহেলিতে নিজেদের জড়িয়ে রেখেছিলেন, তাঁরা এবার বোদলেয়ারের পাপবোধমূর্ছিত বিষণ্ণতা কায়দা করতে মহা উৎসাহে লেগে গেলেন: এই ব্যাপারে তাঁদের পথিকৃৎ হলেন স্বয়ং বুদ্ধদেব বসু। মেকি আর আসলে ভেদাভেদ রইল না, অনুবাদ আর অনুকরণ পরস্পরের সঙ্গে মিশে গেল।

বাংলা কাব্যকে ঠিক এই অবস্থায় পৌঁছে দিয়ে 'কবিতা' পত্রিকা বন্ধ হয়েছে। আমি কোনো অভিযোগ করছি না, নিতান্তই আক্ষেপ করছি: অবরোহণের রাস্তা দেখানো সোজা, পুনরুত্থানের নির্দেশ দেওয়া অনেকগুণ দুরূহ। এই আদর্শহীন নৈরাজ্যের মধ্যে আপাতত অধিকাংশ কবিরা বিরাজ করছেন: তাঁদের রচনায় কোনোরকম বিশ্বাস কিংবা আবেগের দ্যুতি নেই। ইতিহাসের বিবর্তনে আগ্রহশূন্য, সমাজ ও রাজনীতি তাঁরা এড়িয়ে চলেন, যে-কোনো প্রেমে তাঁদের আরূঢ় অনীহা, ভাষাসৌকর্য সম্বন্ধে নিরুৎসুক, ছন্দের—এমনকি প্রবহমান কিংবা গদ্যছন্দের পর্যন্ত—প্রকরণ নিয়ে আদৌ অধ্যবসায়ী পরীক্ষা হচ্ছে না। যেন কাব্যকলা নিষ্ক্রিয়তার ব্যাপার, যেন ভগ্নাংশিক ভাবনাই কবিতা, চিন্তার এলায়িত বিশৃঙ্খলাই সৃষ্টি। এ এক ভয়াবহ ক্লান্তিপ্রান্তে আমরা উপনীত: ভাষা-ছন্দ বিসর্জিত, আদর্শ অবলুপ্ত, যে-কোনো

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

তোমাকে বলি নি

আকাশে তুলকালাম মেঘে
যেন বাজি ফোটানোর আওয়াজে
কাল
তোমার জন্মদিন গেল।

ঘরে বৃষ্টির ছাট এলেও
জানলাগুলো বন্ধ করি নি—
আলোনেভানো অন্ধকারে
থেকে থেকে ঝিলিক-দেওয়া বিদ্যুতে
আমি দেখতে পাচ্ছিলাম তোমার মুখ।
আর মাঝে মাঝে
হাওয়া এসে নড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছিল
তোমাকে ভালবেসে দেওয়া
টেবিলে-রাখা গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল।

কাল কেন আমি ঘুমোতে পারি নি
তোমাকে বলি নি—
আমার ফেলে দেওয়া লেখার কাগজটা নিয়ে
শয়তান বেড়ালটা
কাল সারা রাত খেলেছে।

তোমাকে বলি নি—
দেয়াল ঘড়িটা

একদিন আমাকে বাজিয়ে দেখে নেবে ব'লে
টিক টিক শব্দে শাসিয়েছে।

তোমাকে বলি নি—
মাটিতে মিশে যাবার পর
আমরা দুজনে কেউই কাউকে চিনব না।

আর দেখ,
তোমাকে বলাই হয় নি
এবার রথের মেলায়
কী কী কিনব—

মেয়ের জন্যে তালপাতার ভেঁপু
তোমার জন্যে ফলফুলের চারা
আর বাড়ির জন্যে
সুন্দর পেতলের খাঁচায়
ছোটো বদরিকা পাখি।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

একা বসে থাকি

ঘুমা তুই।
তোর চোখে নীল হ্রদে
কতদিন বিকেলের শুশ্রূষা চেয়েছি।
একটি মুহূর্ত লাগে সবকিছু স্মৃতি হয়ে যেতে
তা যদি জানতাম।
ঘুমা তুই।
নিশান্তের শেফালির মতো সৌরভ অক্ষুণ্ণ রেখে ঘুমা—
আমরা জাগিয়া থাকি।

নিরাশ্বাস সূর্যোদয়ে দূষিত দিনান্তে গড়ি, ভস্মে রাখি মুখ,
এরই মাঝে আমরা বেড়াই ঘুরে বিভ্রান্ত বঞ্চক
এবং বঞ্চিত দুই-ই,
আমাদের নৈবেদ্য অঞ্জলি
বারে বারে ভিক্ষাপাত্রে পরিণত হয়—
এ কথা বলে না কেউ পরাভবে গ্লানি নেই
আপসেই গ্লানি ও গঞ্জনা যত,
আপসেই বৃহন্নলা হতে হয় সেকালে একালে।

মন্দিরে ময়লার স্তূপ
পায়রা আর চামচিকের বিষ্ঠায় বোঝাই,
বিগ্রহের দুই হাতে, পরিয়ে গিলটির গয়না
নামাবলি আঁকড়ে বসে থাকা—
আমাদের বিপ্লবের ইতিবৃত্তে গোঁজা আছে চোট্টামির চোথা।
ওদিকে
বহু পরিচর্যা করি
পুঁটিমাছ তিমিঙ্গিল হয়
ক্লাউন ভণ্ডরা সেজে এবেলা বানায় ঋষি ওবেলা দেবতা।

প্রতিদিন বিকেলে আমতলার মাঠে
যৌবনকে পারাবার করে তুলে তারি তীরভূমে
তোমার বন্ধুরা করে খেলা—
হয়তো বা সান্ত্বনা সেখানে শুধু।
মেঘফাটা বৃষ্টি নামে তখনই কেবল।
তা নইলে
মন্ত্রহারা পুরোহিত যেন, বেদি নেই সম্মুখে আমার,
কিংবা এক বিফল বিপ্লবী
কোনোদিন ব্যারিকেড বানাতে পারি নি।

অনাদৃত অন্ধকারে একা বসে থাকি।

তরুণ সান্যাল

সব বেদনার নামে ভিয়েৎনাম

সব বেদনার নামে আনন্দকে অভ্যর্থনা দায়,
আনন্দ কাহার নাম,
কার গৃহে ফোটাও মল্লিকা
অমন মল্লিকা সন্ধ্যামালতী ও আলপনার শৈশব কুটির
ছায়াচ্ছন্নতায় ঘেরা, কলাবাগানের নম্র আমন্ত্রণ—
দীঘির সবুজে হীরাস্ফুরিত দুপুর
আমার হৃদয়ে কাটে,
কাটে শত জলস্তম্ভে—
সব বেদনার নামে তোমাকে না-নাম দিলে
আনন্দ এমন পীড়া এত অশ্রুপ্রপাতের হীরা
কেমনে কাটায় লুপ্তি, পাথর গ্রানিটে
এ্যাক্ এ্যাক্ আকাশে অবা, ধূমপুচ্ছ, কার নাম, তুমি
ভিয়েৎনাম।

দুঃস্বপ্নে কখনও মধ্যরাতে জাগি, রৌদ্রালোক খুঁজি
হায় রৌদ্র, কলকাতায় চক্ষুস্থির
জীবনযাপনে এত স্থবির উৎসব
সকালে রেডিয়ো খোলা রৌদ্র অবধারিত শানাইয়ে
দুঃস্বপ্নে আবার ফিরে যেতে সাধ হয়

যখন বুকের রক্তে মৃদঙ্গের রোলে উৎস নারী
অথবা ইচ্ছার নাম চায় অঙ্কে আরাম কেদারা
বাৎসরিক সম্মেলনে হাওয়ায় স্ফুলিঙ্গ হল্লা বুঝি
শেষবার ডুবে যেতে, চক্ষের সম্মুখে সব পর্দা পড়ে যেতে
সব চাতুরীর নিষ্ঠা এত ফাঁকা
এত ধূলিম্লান হয়ে লাগে

কোথায় কাদের গৃহে আম্রপল্লবের তলে
　　　　সবুজ সম্ভ্রমে ঘটে আসন্ন বোধন :
ঢের পথ ভাঙা নয়, সামান্য দু কদম দু পায়ে
　　　　ক্লান্তি, এত ক্লান্তি মনে হয় :
　　　　বামনের রাজ্যে শুধু
　　　　　　দীর্ঘদেহ পিপুলচূড়ায় দেখা
　　　　　　　　জ্যোৎস্নায় হাওয়ায় ঢেউ
আমাদের রুদ্ধশ্বাস গুমোটে খিলখিল হাসি
　　　　　　　　　　দক্ষিণ দরিয়া

এপার ওপার বাঙলাদেশে কোটি জোয়ান বজরায়
　　　　উদ্দেশ্যবিহীন হালে বাম ও দক্ষিণ তীর
　　　　উচ্ছল জলের দাঁতে ফেনার হল্লোড়ে
　　　　　　　　　　ভেসে যায়

আনন্দ
　　　　কপালে তুমি পারো না পরাতে অমৃত
　　　　　　　　　　জীবন তিলক ?
বেদনা
　　　　পারো না এই বুকের প্রতিটি হাড়ে
　　　　　　মৃত্যু হয়ে মঞ্জীর বাজাতে ?
মৃত্যু
　　　　তুমি কোনোদিন সভ্যতার নাম হয়েছিলে ?
জীবন
　　　　বাছারে আয় কোলে নিয়ে
　　　　　　বাঁধে ফিরে যাই

আনন্দ আমার ঐ মাথায় কাঁটার চূড়ো
　　　　কাঁধে ক্রুশ পিঠে কোড়া
　　　　　　　　কোথায় চলেছো

কোন বোধিবৃক্ষ, কোন গলগোথায়
মেকও কিশোর
আমার হাতের নীচে শুধু খোলে বিপুল লাটাই
সুতো খোলে সুতো ফিরে আসে
কোন অদৃষ্টের দিকে প্রবল হাওয়ায়
মহিষ বানালে ঐ ওদিকে রাখাল রাজা রক্তিম সূর্যের ঘুড়ি
একাকী উড়ায়
কত সহজেই তিনি খেলা খেলা ব্রজধুলা ছেড়ে
মথুরায় চলেছেন, তাঁর
রথের চাকার শব্দ নিদ্রাঘোরে মেঘে গরজনিঃ

শুধু মেকওের চলে নীল পদ্ম, যমুনা আমার,
তাসাই একান্ত স্মৃতি, দুঃখপুঞ্জ, উদ্দেশ গাগরী
হে দুঃখ, আমার সুখ,
আনন্দ আমার
ভিয়েৎনাম।

মৃণাল বসুচৌধুরী

ঝড়

উঠল হাওয়া অন্ধকারে ভয়াবহ
চতুর্দিকে দুর্বিনীত ছায়া দোলে,
কতক্ষণ খরস্রোতা অভিলাষে
নির্বাসিত রাখবে প্রিয় পরমায়ু।

অবিশ্বাসী ঢেউ উঠেছে জলাশয়ে
ঠিকরে পড়ে অনাত্মীয় সুধা, স্মৃতি,

কৃষ্ণচূড়া রক্তে স্থির বিভীষিকা,
প্রতিচ্ছবি গোপন রাখো কলরবে।

অতর্কিতে উঠল হাওয়া এলোমেলো
যাত্রাশেষে রিক্ত আমি, গোপনতা
ভেসে বেড়ায় ধুলায় শোকে অশরীরী
যন্ত্রণাতে বর্ণা বয়ে অনুভবে।

ইতস্তত উঠল হাওয়া অবশেষে
অনারণ্যে স্বপ্নগুলি ভেঙে পড়ে;
তীব্রতম আর্তনাদে কারে ডাকি,
প্রতিধ্বনি ভেসে বেড়ায় নীলাকাশে।

ঝড় উঠেছে হঠাৎ প্রিয় মনে রেখো,
প্রতিবিম্বে কাঁপন লাগে অহরহ,
গোপন গুহা জুড়ে বিশাল প্রিয় স্মৃতি,
অন্তিমতা ডাক দিয়েছে মনে রেখো।

গৌরী চৌধুরী

যাত্রা

মাথার ওপর নীল চাঁদোয়া
ভিড় হয় নি বেশি
কাজ গুছিয়ে বেশি রাতে
আমরা এলুম যাত্রা দেখতে
আমি তুমি বাঁশি
জানি নীলকণ্ঠ অধিকারীর নেই আর তেমন নাম
গেঁটে বাতে রাধা কাবু
শ্রীদাম স্থদাম কোন অপিসের ছোট নাকি কুট্টিবাবু

কেউ গাঁয়ের মোড়ে দিয়েছে বেনে মশলার দোকান
অধিকারীর আজকাল আর নেই কো তেমন সুনাম

তবু তিনপাড়ায় নেমন্তন্নে গিয়ে কানাঘুষোয় শুনেছিলুম—

নীলকণ্ঠ নাকি বেঁধেছে এবার নতুন পালা
অনেক খুঁজে পেয়েছে দুটি-একটি নতুন গলা
তাই এসেছি আশায় আশায়
তালাচাবি এঁটে বাসায়
আমি তুমি বাঁশি
নাটমন্দির মোছা ধোওয়া
মাথার ওপর নীল চাঁদোয়া
ভিড় হয় নি বেশি।

গোপাল হালদার

ভারতের সরকারী ভাষা : কয়েকটি প্রস্তাব

সুস্থ আলোচনা এখনো হয়তো দুরাশা। তবে গণ-হিস্টিরিয়া আপাতত একটু স্তিমিত, আত্মবলির উন্মাদনাও এখন অবসন্ন। তাই ভারতরাষ্ট্রের সরকারী ভাষার প্রশ্নটা আরেকবার আলোচনা করা যেতে পারে। তার আগেই কিন্তু বলে নিই—এই প্রশ্নটা এত গুরুত্বলাভ করলেও ভারতের সাধারণ মানুষের পক্ষে মোটেই তার গুরুত্ব নেই। ভাবলে ধৈর্যচ্যুতি ঘটে যে, আমাদের কি সমস্যার অভাব যে আমরা এখন ভাষার প্রশ্ন নিয়ে মারামারি করা ছাড়া করবার মতো কোনো কাজ পাই না? সত্যই 'বিচিত্র এ দেশ'—খাদ্য, স্বাস্থ্য, আত্মরক্ষার ও জীবনযাত্রার উপযোগী শিল্প-গঠনের আয়োজন করতেও যারা অক্ষম,—বিদেশের কাছে যারা এ জন্যে ধার করে-করে দেশকে বিকিয়ে দিতে বসেছে, কোন্ ভাষায় কেন্দ্রীয় দপ্তরের ফরমান জারি হবে এখনি তাদের তা স্থির না করলেই নয়! এ সিদ্ধান্তটা এখনি স্থির না করলে কি মানুষ খাদ্য পেত না! অবশ্যব্যবহার্য ভোগ্যদ্রব্যের দাম আরও বাড়ত, স্বাস্থ্য আরও খোয়াত! দেশের আত্মরক্ষা বিপন্ন হত? না, মানুষের শিক্ষাদীক্ষার সংস্কৃতিরই দেশব্যাপী যে-দানসাগর চলেছে, তাতে দোষস্পর্শ ঘটত? আশ্চর্য মনে হয়—দেশের শতকরা ৭৫টি মানুষ নিরক্ষর। সংবিধানের মূল নির্দেশ অমান্য করেই যে-দেশে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এখনো অবৈতনিক ও আবশ্যিক করার কোনো সত্যকার আয়োজন নেই; এমনকি সরকারী পরিসংখ্যানের হিসাবেই দেখি যে, দেশে নিরক্ষরতা দূর করার চেষ্টা যে-গতিতে চলেছে তাতে আগামী একশত কেন, দেড়শত বৎসরেও সকল মানুষের সাক্ষর হবার সম্ভাবনা নেই, এই অবস্থায়ও ১৯৬৫-এর ২৬শে জানুয়ারি থেকেই কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মে ইংরেজির স্থলে হিন্দীকে রাজপাটে শাসকদের না বসালেই নয়। অথচ দু-দশ বৎসর কেন, তাতে এক-আধ শতাব্দী দেরি করলেই কি কিছু যেত আসত? না, দেশের মানুষের খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষার ও প্রাথমিক প্রয়োজন মিটানোর থেকে তা বেশি প্রয়োজন?

ভারতের শতকরা ৭৫টি নিরক্ষরের কাছে তো হিন্দীও যা ইংরেজিও তা। এমনকি চারটি হিন্দীরাজ্যের নিরক্ষরেরাও (সেখানে নিরক্ষরতার হার আরও বেশি—শতকরা ৮০ ছাড়িয়ে যায়) সেই হিন্দী পড়তে পারবে না। এবং পড়ে শোনালেও সেই সরকারী দপ্তরের 'রাষ্ট্রভাষা' বুঝবে এমন সাধ্য তাদের দশ জনেরও হবে না। কেন্দ্রের সরকারী ভাষা হিন্দী হবে না ইংরেজি হবে, এর থেকে হিন্দী রাজ্যসমূহের শতকরা ৮০ জনের ও ভারতরাষ্ট্রের শতকরা ৭০ জনের অনেক বেশি দরকার মাতৃভাষার অক্ষরজ্ঞান, প্রাথমিক শিক্ষার সামান্য সুযোগ। দিল্লীর পথের মানুষ নাগরী লিপিও চেনে না, রোমক লিপিও জানে না, আরবি-ফারসি লিপি (যাতে উর্দু লেখা হয়) তাই বা চেনে তারা ক'জন? রোমক অক্ষরে নাম-লেখার বিরুদ্ধে জেহাদ দিল্লীতে তাহলে কাদের সপক্ষে কাদের বিপক্ষে?—সপক্ষে কারোর নয়; বিপক্ষে—মুষ্টিমেয় 'টুরিস্ট' বিদেশীর ও কিছু দিল্লী-প্রবাসী নাগরী না-চেনা ভারতীয়ের। আর বিপক্ষে পৃথিবীর প্রায় সাধারণ সভ্যজাতির—যারা রোমক অক্ষরই চেনে। 'ইংরেজি হটাও'-পন্থী শাসকগোষ্ঠীর পুত্রকন্যারা দিল্লীর ইংরেজি-মাধ্যম যে ফিরিঙ্গি বিদ্যালয়ে ধর্না দিচ্ছে, সে সব বিদ্যালয়ে হিন্দী-মাধ্যম করার জন্য অভিযান নেই কেন? ইংরেজি ও রোমক হরফ যদি 'জাতীয় সম্মানে'র পরিপন্থী হয় তাহলে সরকারী দপ্তরখানায় এই নর্তন-কুর্দনের সঙ্গে নতুন-নতুন শিল্পবাণিজ্য স্ফীত ইংরেজি-মেডিয়াম বিড়লা-সিংঘানিয়াদের আপিসে ইংরেজি ভাষায় চিঠিপত্র, কথাবার্তা বয়কট করা তো আরও প্রয়োজন।

কথাটা এত করে বলার উদ্দেশ্য এই—আমাদের প্রথমেই বোঝা দরকার এই কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষার প্রশ্নটা জনসাধারণের প্রশ্ন নয়—বিশেষত রাজ্যের যখন রাজ্যভাষায় কাজ চালাবার অধিকার এখন আয়ত্ত হয়েছে—প্রশ্নটা আসলে মুষ্টিমেয় শিক্ষিতদের, প্রশাসনের মধ্যে প্রাধান্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন-ভাষী শিক্ষিতদের আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম। বছরে বোধহয় হাজার দশ লোকও কেন্দ্রীয় সরকারে চাকরি পায় না; তবু হিন্দীর আধিপত্য হলে সে চাকরির পরীক্ষায় হিন্দীভাষীদের আধিপত্য স্থাপিত হবে, ইংরেজি-জানাদের (ইংরেজিভাষী তো নগণ্য) আধিপত্যের স্থলে এইটিই প্রধানতম কথা। অর্থাৎ সেই পুরাতন কথা—'চাকরির লড়াই'। তা বলে তার গুরুত্ব খাটো করতে চাই না। কারণ, এই চাকরেরাই ইংরেজ আমলে দেশের শাসক ছিলেন, এখনো আছেন, তাদের গোষ্ঠীর মুষ্টিমেয় শিক্ষিতরাই নানা পথে দেশের

মানুষকে চালায় এবং যতটা চালায় তার চেয়েও বেশি তাদের ভাষায় বিপথচালিত করে। কাজেই যতক্ষণ জনশিক্ষা ও জনায়ত্ত শাসন প্রচলিত না হচ্ছে ততক্ষণ এই 'শিক্ষিত'দেরই প্রধান ক্ষমতা থাকে। আর সে বহুভাষী শিক্ষিতদের ক্ষমতার লড়াইতে সরকারী ভাষারও গুরুত্ব স্বীকার্য। এ জন্যই ভাষার কথা আলোচ্য। তথাপি আরও অনস্বীকার্য—মূলত: (১) **সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রশ্ন আরও অনেক-অনেক বেশি গুরুতর। তার তুলনায়, তার পটভূমিতে দেখা যায় কেন্দ্রের সরকারী ভাষার প্রশ্ন প্রায় অবাস্তর প্রশ্ন—ঘোড়ার আগে গাড়ি যোতা।** শিক্ষাই নেই, তা কী করে হিন্দী শেখাতে হবে সে জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি টাকা খরচ। কাজে-ই অকর্মণ্য, কিন্তু কোন ভাষায় কাজ চালাব তার জন্য খুনোখুনি!

আরও লক্ষণীয় এই—কেন্দ্রের সরকারী ভাষা নিয়ে এই খুনোখুনি হচ্ছে। অথচ ভারতীয় ভাষাগুলির নিজ নিজ রাজ্যে প্রচলনের জন্য কি তেমন উদ্যোগ আছে? আমরা জানি, ইংরেজি ভাষা সর্বব্যাপী রাজভাষা হিসাবে প্রসারে আমাদের বাঙলা, হিন্দী, তামিল, মরাঠী প্রভৃতির স্বাভাবিক বিকাশ ব্যর্থ হয়েছিল। এমন কথা বলব না—ইংরেজি শুধু অভিশাপই বহন করে এনেছে। 'ইতিহাসের অচেতন অস্ত্র'রূপে ইংরেজ শাসনের মতোই ইংরেজি ভাষাও আমাদের কোনো-কোনো দিকে সহায়ক হয়েছিল—জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথ, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ, এমনকি, আমাদের জাতীয় ঐক্যবোধ ও আমাদের একালের সাহিত্যবোধ, এসব ইংরেজি ভাষা বহু পরিমাণে সুগম করেছে, এখনো করছে, করতে পারে, কোনো-কোনো দিকে করবে। উচ্চ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাহন হিসাবে বা আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ভাষা হিসাবে, এমন কি, বিশ্বসাহিত্যের প্রধান প্রতিনিধি হিসাবে কে হবে তার সমকক্ষ? এসব কারণে ইংরেজি বরাবর ভারতে থাকবে। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারেরও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ও উচ্চ বৈষয়িক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষাকে চিরদিনই প্রধান ভাষারূপে প্রয়োগ করতে হবে। তাই কেন্দ্রীয় ভাষা হিসাবে তাকে সম্পূর্ণ বিতাড়ন অসম্ভব। উচ্চ সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক যোগাযোগের জন্য ভারতের উচ্চ শিক্ষার্থীদের পক্ষে তাই ইংরেজি আরও বেশি সযত্নে শিক্ষণীয় ভাষা হবে। এসব দিকে হিন্দী কেন, কোনো ভারতীয় ভাষাই তার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। ইংরেজির স্থলাভিষিক্ত হতে পারে

ভারতীয় ভাষাসমূহ মাত্র আভ্যন্তরীণ কাজে-কর্মে—রাজ্যসরকারের (হাইকোর্ট ছাড়া) নানা এলাকায়। সেসব স্থলেও রাজ্যভাষাগুলির স্বাভাবিক বিকাশে ইংরেজি একদিন বাধা দিয়েছিল, সেইটাই ইংরেজির বিরুদ্ধে অভিযোগ। কিন্তু আজ যখন রাজ্যের সরকারী কর্মে আমাদের বাঙলা, হিন্দী প্রভৃতি ভাষাগুলির প্রয়োগের অধিকার স্বীকৃত তখন আমরা কতদূর সেদিকে অগ্রসর হচ্ছি। কতদূর বেসরকারী নানা কাজেই বা আমরা রাজ্যের মধ্যে এসব ভাষার বিকাশ, সাহিত্যের বিকাশ ত্বরান্বিত করছি? আমার তাই দ্বিতীয় কথা—**(২) কেন্দ্রীয় ভাষা যাই হোক, রাজ্যের ভাষাগুলির বিকাশের যথাযোগ্য চেষ্টা না করে কেন্দ্রীয় ভাষার নামে খুনোখুনি আমাদের আরেকটা আত্মছলনা।**

উপরের এই দুইটি মূল কথা মনে রেখে আমরা ভারতের সরকারী ভাষার প্রশ্ন আলোচনা করছি—এই সত্য দুটির পাশ কাটিয়ে নয়। ভাষার আলোচনা 'পরিচয়'-এ পূর্বে বিশদভাবে হয়েছে। এখন সে আলোচনার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। শুধু ভারতের সরকারী ভাষার প্রশ্নে যে-সমস্যার উদয় হয়েছে, তাই বিচার্য। আর সেই সূত্রে নতুন কোনো তথ্য যা হস্তগত হয়েছে তা-ও অবশ্য উল্লেখযোগ্য। সেজন্য আরেকটি কথাও স্মরণীয়। সর্বকালের মতো সমাধান করা এখনো অসম্ভব। ভারতীয় রাষ্ট্র-প্রয়োজন লক্ষ রেখে দেখতে হয়—কী আমাদের চাই। আমাদের **প্রথম চাই, ভারতের সাধারণ মানুষের মধ্যে যোগাযোগের ভাষা (link language)।** শিক্ষিতদের যোগাযোগের ভাষা আছে, ইংরেজি। কিন্তু তা সাধারণের যোগাযোগের ভাষা হয়ে উঠতে পারে না। এ বিষয়ে আমরা দৃঢ়মত। সাধারণত কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ যেসব প্রতিনিধিরা ও কর্মচারীরা নির্বাহ করেন তাঁদের ইংরেজি এখনো জানতে হয়, চিরদিনই জানতে হবে। কাজেই, সেখানে ইংরেজির প্রচলন এখন আছে—ভবিষ্যতে যে থাকবে না, এমন কথা আপাতত বলা অসম্ভব। তবে, এ কথা ঠিক—কেন্দ্রীয় সরকারের কাজকর্মও দেশের সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষায় হওয়া এই গণতন্ত্রের দিনে বাঞ্ছনীয়। অতএব, সাধারণের বোধগম্য করতে হলে কোন্ ভাষায় কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ চালানো উচিত? অথবা (ইংরেজিতে যখন উচ্চস্তরের কিছু কাজ চলবেই), **সাধারণের নিকট কি করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ বোধগম্য করে তোলা যায়।** শুধু ইংরেজিতে করলে যে তা যায় না,

তা ইংরেজও জানত। আমরা ভুলে যাই শাসন চালাতে গিয়ে—ইংরেজি ভাষা রাজভাষা করলেও—**প্রত্যেকটি প্রধান ভারতীয় ভাষাতেই প্রায় প্রত্যেকটি প্রধান আইন বা ঐরূপ ব্যবস্থা, আয়োজন প্রভৃতি অনুবাদ করাত, প্রকাশিত করত, প্রচারিত করত**। এই বহুভাষিক দেশে কেন্দ্রীয় শাসনে এই প্রয়োজন চিরদিন থাকবে। ইংরেজি বাদ দিয়ে হিন্দী হলেই কি কেন্দ্রীয় সরকার তার প্ল্যানিং প্রভৃতি নানা উদ্যোগ, আয়োজনের কথা দেশের চোদ্দটি ভাষায় না জানিয়ে পারবে? অবশ্য কেন্দ্রের সব জিনিসের অনুবাদ প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আবশ্যকমতো সব জিনিসেরই আবার চোদ্দ ভাষায় অনুবাদ করতেও হবে। এই অবস্থাটা মনে রেখে এখন আমরা বুঝতে চেষ্টা করতে পারি এই বাস্তব অবস্থাকে কী ভাবে আমরা ভারতের সংহতির অনুকূল করে তুলতে পারি। অবাস্তব কোনো আদর্শ বুদ্ধি বাত্‌লিয়ে লাভ নেই। বাস্তব অবস্থায় যা করা সম্ভব, এর প্রারম্ভিক হিসাবে যা করলে সম্ভবত আমরা একটা সত্যকার মঙ্গলদায়ক অবস্থায় উন্নীত হতে পারব, তাই শুধু আমরা এখানে নির্দেশ করছি—বিশদ করে তা ব্যাখ্যা করারও স্থান নেই।

তারও আগে একটা বাস্তব সত্য আমাদের এখানে জানা দরকার। আদমসুমারির (Census 1961, Vol. I, India Part II-C (ii)) সাম্প্রতিক রিপোর্টে ভারতের ভাষাগত অবস্থা সম্বন্ধে একটা দিগদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। ১৯৩১-এর পরে এই আবার 'মাতৃভাষা' হিসাবে ভারতের অধিবাসীদের হিসাব নেওয়া হল। তার বিশেষ বিশ্লেষণ এখানে অসম্ভব। একটি ভিন্ন প্রবন্ধে তা আলোচ্য হতে পারে। কিন্তু তার থেকে যা বোঝা যায় তা এই—হিন্দীকে যারা মাতৃভাষা বলে বলেন তাদের মোট সংখ্যা ১৩ কোটি ৩৪ লক্ষ, অবশ্য তার মধ্যে বিহারের ২ কোটি ৫৫ লক্ষ লোক, রাজস্থানের ৮০ লক্ষ লোকও ধরা হয়েছে। আর, 'আবধি' (৫ লক্ষ ২৮ হাজার), 'বাঘেলখণ্ডী' (৫ লক্ষ ৫১ হাজার), 'ছত্তিসগড়ী' (২৯ লক্ষ ৬২ হাজার) প্রভৃতি যারা হিন্দী থেকে স্বতন্ত্র করে নিজেদের মাতৃভাষা বলে উল্লেখ করেছেন, তাঁদের সকলকেই ঐ ১৩ কোটি ৩৪ লক্ষের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আসলে হিন্দী ভারতবর্ষে **সম্ভবত ১০।১১ কোটি লোকের মাতৃভাষা, সমগ্র ভারতের মাত্র—২৫% লোকের তা মাতৃভাষা, ৩০%রও নয়**। দ্বিতীয় আরেকটি কথাও এই লোকগণনায় প্রকাশিত হয়েছে। যথা : মাতৃভাষা ছাড়া দ্বিতীয় ভাষা

হিসাবে কোন্‌টি সর্বাপেক্ষা বেশি ভারতে চলতি? দেখা যাচ্ছে **তা হিন্দী নয়, ইংরেজি। ভারতে দুই ভাষা যারা জানে তাদের মধ্যে ইংরেজি জানে ১ কোটি ১০ লক্ষের উপর লোক, হিন্দী জানে ৯৩ লক্ষ ৬৩ হাজারের মতো লোক।** হিন্দী, বাঙলা, তামিল ও মালায়ালী মাতৃভাষার পরেই অন্য কোনো ভাষা শিখতে হলে প্রধানত শেখে ইংরেজি। এই হিসাব থেকে হিন্দীর বহুস্ফীত দাবি কতকটা মিথ্যা হয়ে যায়। কিন্তু আমরা আরেকটা কথা মনে রাখতে পারি—**সমগ্র ভারতে সর্বাপেক্ষা বেশি লোক সর্বাপেক্ষা সহজে যদি কোনো-একটি ভাষা শিখতে পারে তা হচ্ছে সহজ চালু হিন্দী—আর তাই সাধারণের যোগাযোগের ভাষা (link language)।** প্রকৃতপক্ষে শিল্প এলেকায়, রেলওয়ে প্রভৃতি যোগাযোগে চলচ্চিত্রের মারফতে হিন্দী স্বাভাবিকভাবে সেই যোগাযোগের ভাষা হতে চলেছে। এ স্বাভাবিক বিকাশ কল্যাণকর। অবশ্য তাই বলে সেই হিন্দী উচ্চ রাজকার্য বা আলাপ-আলোচনার ভাষা হয়ে উঠতে পারে না—অন্তত হলে তা হবে বহু দেরিতে। আপাতত সে কাজে ইংরেজিই প্রধান শরণীয়—তাই প্রধান দ্বিতীয় ভাষা।

বেশি কথা না বাড়িয়ে এখন যদি আমি বর্তমান পরিস্থিতিতে কি করা যায় তা বলি, তাহলে আশা করি কেউ তা অন্যায় মনে করবেন না। দুটি মূল নীতির কথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি :

(১) সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা মাতৃভাষায় সর্বত্র প্রবর্তন।

(২) প্রতি রাজ্যে রাজ্যভাষার প্রবর্তন ও প্রসার ও বিকাশ।

(৩) ভারতের কটি প্রধান ভাষাকে নীতি হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষার স্থান (status) দান, এবং প্রয়োজনমতো তার ব্যবহার (if and when necessary)। ভারতের মতো দেশে ১।২টি ভাষায় সর্বকাজ কখনো চলে নি। এই আনুষ্ঠানিক ঘোষণাতেই অনেক সংশয় বিদূরিত হবে। কার্যত অবশ্য ১৪টি ভাষায় দপ্তরের কাজ করা হবে না—কেবল আবশ্যকমতো অনুবাদ সরবরাহ করাই যথেষ্ট হবে।

(৪) ইংরেজিকে আপাতত প্রথম কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষারূপে স্বীকার ও হিন্দীকে দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকার। দপ্তরের কাগজপত্র ইংরেজিতেই এখন রাখতে হবে। প্রয়োজনমতো অন্য ভাষায় অনুবাদ যোগাতে হবে। এ অবস্থা কালক্রমে হয়তো ২০।২৫ বা আরও পরে উল্টে

যেতে পারে, অ-হিন্দীভাষীরা চাইলে তখন হিন্দীই হবে প্রথম কেন্দ্রীয় ভাষা আর ইংরেজি দ্বিতীয়। কিন্তু তখনো ইংরেজি থাকবে আন্তর্জাতিক-ক্ষেত্রে সরকারী ভাষা। আর তখনো ১৪টি ভাষার সেই কেন্দ্রীয় মর্যাদা অটুট থাকবে।

(৫) চাই কেন্দ্রে ও রাজ্যে একটি বৃহৎ অনুবাদক বিভাগ (Translation Service) রচনা। (ক) এর জন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ-তে ভারতীয় ভাষা ফ্যাকালটির প্রবর্তন—অর্থাৎ শুধু চারটি ভারতীয় ভাষা ও ইংরেজি এই পড়েই একটি বি-এ (ল্যাঙ্গ) পাশ অনুবাদকগোষ্ঠী গড়ে উঠতে পারবে। (খ) তাৎক্ষণিক (Simultaneous) অনুবাদের আরও প্রসার।

(৬) ভারতীয় ভাষায় রোমক লিপি ব্যবহারে উৎসাহদান। প্রথমত, কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত ভারতীয় ভাষায় (বইপত্রে) রোমক লিপি ব্যবহার প্রথম আরম্ভ করা যেতে পারে।

(৭) কেন্দ্রীয় চাকরির পরীক্ষার ব্যাপারে (ক) এখনো একমাত্র ইংরেজি মাধ্যমই চালু রাখা, কারণ বড় চাকুরের এখনো ভালো ইংরেজি জানাই দরকার। (খ) বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে মাতৃভাষায় উচ্চতম (বি-এ অনার্স) পাঠ ও পরীক্ষা প্রবর্তিত হলে তার অন্তত পাঁচ বৎসর পরে কেন্দ্রীয় চাকরি-পরীক্ষায় ঐসব ভাষায় মাধ্যম প্রবর্তিত হতে পারে। (গ) কিন্তু কোনো কারণেই 'কোটা', রাজ্যগত বা ভাষাগত কোনোরূপ বরাদ্দ প্রথা গ্রাহ্য না করা এবং (ঘ) কেন্দ্রীয় চাকরি-পরীক্ষা বর্তমানের মতো সরাসরি না দিয়ে রাজ্যসরকারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পাঁচ বৎসরের চাকরেদের মধ্যে সে পরীক্ষা নিয়ে সর্বভারতীয় সার্ভিস গঠন করা উচিত। যারা পরীক্ষায় পাশ করে তারাই ভালো কর্মচারী হয় এ কথা কে বললে? বরং যারা বছর পাঁচ কাজ করে ভালো কর্মচারী বলে প্রমাণিত হয়েছে তাদেরই পরীক্ষা নিয়ে প্রতিযোগিতায় উন্নতি করবার পথ করে দেওয়া উচিত।

নিশ্চয়ই তর্ক করবার মতো অনেক যুক্তি এসব প্রস্তাবের বিপক্ষে আছে। কিন্তু কাজ চালাবার পক্ষে এসব ব্যবস্থা এখনকার উপযোগী বলেই মনে হয়। জানি—প্রশ্নের সমাধান হল না। কিন্তু এখনি সকল প্রশ্নের সমাধান আমাদের করতে হবে—করা অসম্ভব হলেও করতে হবে, এমন অধিকার বা দিব্যিই বা কে দিয়েছে। যা সম্ভাব্য তাই করা হোক। দুয়ার খোলা থাক ভবিষ্যতের সুদিনের আশায়। আমরা স্বাধীনতার বিশ বছরের মধ্যে এই আড়াই হাজার বৎসরের প্রাচীন সভ্যতার সব 'অসংগতি' চুকিয়ে দিব, এমন অহংকার না করে, না হয় কিছুটা সেই ভার আমাদের ভাবী পুরুষদের জন্তই রাখি—তাদেরও তো কিছু করবার চাই।

হিমাদ্রি চক্রবর্তী

গঙ্গার ঘাটে পিণ্টু

বুড়ো বেতো ঘোড়ার মতো নড়বড়ে রিক্সাটা রাস্তার খানা-খোন্দলের উপর দিয়ে ঠকাশ ঠকাশ করে এগিয়ে আসতে আসতে শেষ পর্যন্ত টাল সামলে ঘাটের সামনে এসে দাঁড়াল। পাশের ডাস্টবিনের ধারে গোটাছুই ঘেয়ো কুকুর সারাটা রাস্তা জুড়ে কামড়া-কামড়ি করে বেড়াচ্ছিল, রিক্সাওয়ালার তাড়া খেয়ে পালাল।

পর্দাটা ফাঁক করে পিন্টু ঘাট দেখল। নোনাধরা এক পাঁজা ইঁট হুমড়ী খেয়ে পড়েছে মরা গঙ্গার উপর। পাশেই পলস্তারা-খসা হাড়গোড় বের-করা দালানে শিবমন্দির। সামনের চাতালটা এঁটো কলাপাতা, ভাঙা মালসা, যজ্ঞের আধপোড়া প্যাকাটি আর গঙ্গার এঁটেল মাটির কাদায় মাখামাখি।

হাতলছেঁড়া পেটমোটা ছটো রেশনব্যাগ পায়ের গোড়া থেকে সরিয়ে পিন্টুই আগে নামল। তারপর পর্দাটা তুলে ধরে কোরা থান কাপড় পরা কলা বউয়ের মতো নিথর নিস্পন্দ মাকে ডাকল। ডান হাতের দু আঙুল দিয়ে ওর মা মুখে শক্ত করে কাপড় চেপে ধরে বসেছিল। হাঁটুতে ঠেলা দিয়ে পিন্টু ডাকল, মা, ও-মা, এই তো মন্দিরের ঘাট, নেমে পড়। ন' কাকারা এসে পড়বে এখুনি। পিন্টুর মার মুখাবয়বটা এতক্ষণ ভাবলেশহীন অবস্থায় ছিল। মুখটা এখন যেন বিকৃত হল। রুক্ষ চুলের কিছু অংশ মুখের উপর জমা হয়েছিল। কাপড়-চাপা মুখটা সবলে চেপে ধরে কাঁপা কাঁপা পায়ে রিক্সা থেকে নামল সে। পিন্টু ততক্ষণ পোঁটলা-পুঁটলী নিয়ে জড়ো করছে ঘাটলার রোয়াকে। রিক্সাভাড়া ছ-আনা। রিক্সাওয়ালা গাঁইগুঁই করল, রাস্তা খারাপ, সোয়ারী দু-জন। কোঁচার খুঁট থেকে বার করে চকচকে আধুলিটাই ওর হাতে গুঁজে দিল পিন্টু। ন কাকা দেখতে পেলে কি হতো সে কথা ভেবে পিন্টু মনে মনে একচোট হাসল। কমসে কম আধঘণ্টা দরাদরি করে হয়তো ঠিক সাড়ে পাঁচ আনায় একটা রফা করত ন কাকা। তা নয়? ফুলদির বিয়েতে মণিদার হাতে এগার ছকুনে বাইশ নয়া পয়সা।

খুঁজে দিয়ে ন কাকা বলেছিল, ওয়েলিংটনের মোড়ে নেমে মাত্র কয়েক মিনিটের রাস্তা বরের বাড়ি, ওটুকুর জন্য আবার তিন নয়া পয়সা বেশি দিবি কেন; হেঁটেই চলে যা: মণিদা বাড়ী ফিরে এসে নাকে খৎ দিয়েছিল সেদিন।

ন কাকা বড়দিকে নিয়ে আসবে। পুরুত ঠাকুরের এখানেই কাছাকাছি কোথায় বাসা। আগে থেকে বলা আছে, খবর দিলেই একটা ছোট কাঠের বারকোশের উপর কোশাকুশী, চন্দন-তুলসী আর ফুল বেলপাতা চাপিয়ে চলে আসবে এখানে। দূরে একটা খড়ম পায়ে চলার কড়াৎ কড়াৎ আওয়াজ শুনতে পেয়ে পিণ্টু ফিরে তাকাল। নাঃ, এ ভটচায মশাই নয়। ওই গড়ুর পাখির মতো নাক তিন মাইল দূর থেকে চেনা যায়। এদিকটা ঘুরে চারপাশ তাকিয়ে দেখল পিণ্টু। ভোরের কুয়াশাটা তখনও ভালো করে যায় নি। রোদ্দুর উঠেছে ওপারটাতে। ওদিকটা বুঝি চেৎলা। দূরে কাঠের পোলটা কেমন গিরগিটির মতো ঝুলছে। মাঝখানে সরু খালের মতো গঙ্গা। কাদাগোলা জলে বাসী ফুল বেলপাতা, আধপোড়া কাঠ থেকে বিষ্ঠা পর্যন্ত ভেসে যাচ্ছে। ঘাটের গায়ে ঠেকে আছে ওটা কি? পিণ্টু ঝুঁকে পড়ে দেখল, একটা মরা কুকুর। ফুলে ঢোল হয়ে আছে। নাক কোঁচকাল পিণ্টু। এখানে চান করতে হবে? নাচার ভাবে মার দিকে তাকিয়ে দেখল, ন্যাতার পুঁটলীর মতো দলা পাকিয়ে বোয়াকে হেলান দিয়ে বসে আছে মা। পিণ্টু একদৃষ্টে কিছুক্ষণ মাকে দেখল। এ ক-দিনের মধ্যে কেমন বুড়ী হয়ে গেছে মা। গায়ে হাত-পায়ে খড়ি উঠছে, মুখের চামড়া টেনে কাটা পড়া হাতের তালুর মতো হলদে মেরে গেছে।

বেশ শীত শীত করছে। কাচাটা গায়ে ভালো করে জড়িয়ে নিল পিণ্টু। মোটা মার্কিন কাপড় মাড় উঠে গিয়ে চটের মতো হয়ে গেছে। চিতায় জল ঢেলে ঘাটে গিয়ে ডুব দিয়ে উঠে হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে এসে ন কাকার হাতে এ কাপড় দেখে কান্না পেয়েছিল পিণ্টুর। গলায় কাচা দিয়ে যারা রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়ায় তারাও এত মোটা কাপড় পরে না। কিন্তু ন কাকা অমনই। বড়দি কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ন কাকা ততক্ষণে ঠাকুরমশায়ের সঙ্গে দক্ষিণা নিয়ে দরদস্তুর করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। শুদ্ধদশার মধ্যে ঐ এক উড়ুনী আর ধুতি পালা করে শুকিয়ে পড়েছে পিণ্টু। গলায় ন্যাকড়ার কিতের সঙ্গে ঝোলান লোহার চাবিটা

যতবার পেট আর বুকের মাঝামাঝি জায়গাটা ছুঁয়েছে, চমকে উঠেছে পিন্টু। অন্ধকারে, আবডালে যেতে ওকে মানা করে দিয়েছিল সবাই, কিন্তু পিন্টু কিছু দেখতে পায় নি। তবুও রাত্রিবেলা অন্ধকার হাতড়ে বাথরুমের লাইটের সুইচ খুঁজতে খুঁজতে বুক এক আধ বার হ্যাঁৎ করে উঠেছে। আলোটা জ্বালবার পরেও পিন্টু কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে থেকেছে, যেন কিছুর অপেক্ষা করেছে।

ঘাটের সিঁড়ির উপর উবু হয়ে বসে পিন্টু গত এগারটা দিনের কথা ভাবছিল। ভবানীপুরে ওদের পুরোনো ভাঙাচোরা দোতলা বাড়িটার কথা। কদিন ধরেই বাড়াবাড়ি যাচ্ছিল বাবার। হার্টের ব্যামো। সেদিন রাত আড়াইটে নাগাদ হঠাৎ কয়েকবার হেঁচকি তুলে স্থির হয়ে গেল বাবা। পিন্টুর সেই সময় ঝিমুনী এসেছিল। বাবার গলায় অমন ঘড় ঘড় আওয়াজ শুনে ধাক্কা দিয়ে মাকে তুলে দিতে গিয়ে লক্ষ করল মা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে বাবার চোখের দিকে। মা কিন্তু কাউকে ডাকে নি। ভোরের দিকে বাড়িশুদ্ধ সবাই জানল। মণিদা ছুটল বড়দিকে খবর দিতে। ন কাকীমা মেঘের মতো মুখ করে ঘরের বাসনকোসন সব নামিয়ে দিতে লাগল ঝিকে, ছোট বোন তিনটে কিছু বুঝতে না পেরে কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছিল, ন কাকার ধমক খেয়ে ভয়ে-ভয়ে চুপ করে গেল। মা কিন্তু পাথরের মতো বসে রইল বাবাকে ছুঁয়ে। নিঃশব্দে কাজকর্ম এগিয়ে চলছিল। জগুবাজার থেকে খাট এল, কিছু ফুল আর নারকোলের দড়ি। রিক্সাওয়ালার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ন কাকা গম্ভীরভাবে ঘরে ঢুকে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কি মনে করে আবার বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে পিন্টু কয়েকবার বাবার মুখটা দেখল। মুখের সেই কোঁচকান ভাঁজগুলো মিলিয়ে গেছে সব। বাবাকে দেখতে সুন্দর লাগছে। বয়স যেন অনেক কমে গেছে। পাশের বাড়ির ঘোষাল মশাই শ্লেষ্মাজড়ান গলায় ন কাকাকে একবার জিজ্ঞেস করলেন, কত বয়েস হয়েছিল ওনার। ন কাকা ছাদের ট্যাঙ্কটা লক্ষ করছিলেন। ফুটো হয়ে জল পড়ছে। অস্পষ্ট গলায় বললেন, তা' প্রায় ষাটের কাছাকাছি। পিন্টু শুধরে দিতে যাচ্ছিল, বাবা তেপান্ন পেরিয়ে চুয়ান্নতে পা দিয়েছেন গত আশ্বিনে। সেদিন বাবা নিজেই হিসেব করছিলেন। ন কাকার মুখের দিকে তাকিয়ে সে কথা বলতে আর সাহস পেল না পিন্টু।

কোলকুঁজো বুড়োদের মতো হাঁটুতে শক্ত করে মুখ গুঁজে উবু হয়ে

বসেছিল পিন্টু। মাঝে মাঝে বকের মতো গলা বাড়িয়ে পিছনে তাকাচ্ছিল, ন কাকারা দেরী করছে। বড়দির ছেলেটার বুঝি আবার অসুখ। সামনে ঘাটের হাঁটুজলে একটা ভিখিরী মেয়েছেলে তখন থেকে কী যেন হাতড়ে বেড়াচ্ছে। সোনার দুল, আংটি নাকি কুড়িয়ে পাওয়া যায় অনেক সময়। এই নোংরা ঘাটে কেউ চান করে? শ্রাদ্ধটা বাড়িতে করবার কথা কেউ বলে নি—কেউ না। মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে এই ভাঙাচোরা ইঁটের পাঁজা যেন বাবাকে গ্রাস করেছে। এই শ্যাওলা-ধরা ঘাটের বড় বড় ফাটলগুলো হাঁ করে সবাইকে গ্রাস করতে চাইছে। আমাদেরও ও একদিন এমনি করে গিলে ফেলবে, পিন্টু মনে মনে ভাবল।

এতক্ষণে পিছন থেকে ন কাকার ভারী গলার আওয়াজ পেল পিন্টু। চারদিক নিস্তব্ধ ঘাটে ন কাকার গলার স্বর গম্ গম্ করে ছড়িয়ে গেল। তোমরা···কতক্ষণ? কথাটা সম্ভবত পিন্টুর মাকে লক্ষ করে বলা, কিন্তু সেটা যেন একটা যান্ত্রিক আওয়াজের মতো শোনাল। ন কাকার এক হাতে একটা আধপো ওজনের দই-এর খুড়িতে খানিকটা কাঁচা দুধ, আর-এক হাতে একটা বড় মাটির মালসায় খুচরো জিনিসপত্র। মলমের শিশিতে ঘি, মধু, তিল, কুশ, ধূপকাঠি ইত্যাদি। রেশনব্যাগে আগেই আতপ চাল, কলা, নূতন গামছা আরও অন্যান্য জিনিসপত্র আনা হয়েছে। ন কাকা হাতের জিনিসপত্র সাবধানে নামিয়ে রেখে বললেন, রেণুর আসতে একটু দেরী হবে। ছেলেটার জ্বর আজও ছাড়ে নি, ডাক্তার আসবে বোধহয়। রেণু মানে পিন্টুর বড়দি, থাকে টালীগঞ্জের ওদিকে। সংসার সামলে আসাও এক ঝক্কি। ন কাকা চাতালে পায়চারি করতে করতে ইতিউতি করছিলেন, একটা নাপিত যদি পাওয়া যায়। পিন্টুর মাথা কামাতে হবে। ভটচায মশায়েরও এতক্ষণ এসে পড়বার কথা, না হলে একবার যেতে হবে। লটবহর নিয়ে ট্রেনে কোনো দূরের রাস্তা যেতে গিয়ে মাঝপথে হঠাৎ যেন সব গণ্ডগোল হয়ে গেছে, অবস্থাটা এমনি। পিন্টু একবার আড়চোখে মাকে দেখল, সেই যে কাঠ হয়ে বসে মুখের উপর শক্ত করে কাপড় চেপে বসে আছে তারপর আর নড়ে নি।

ন কাকা যাবার উদ্যোগ করছিলেন, এমন সময় খড়মের খটাশ্ খটাশ্ আওয়াজ তুলে ভটচায মশাই শশব্যাস্তভাবে উপস্থিত হলেন। একটা কানাভাঙা কাঠের বারকোসের উপর তামা তিল তুলসী চন্দন বেলপাতা

আর কমণ্ডলুতে বিশুদ্ধ গঙ্গাজল, বাঁ হাতে কোশাকুশী। ভটচায মশাই বাক্যব্যয় না করে ঘাটলার একটা নিরিবিলি কোণ বেছে নিয়ে কাজে লেগে গেলেন। জায়গাটা একটা কুশাসন দিয়ে ঝেড়ে নিয়ে নিজ হাতে গঙ্গামাটি তুলে এনে বেদী সাজালেন। তারপর প্যাকাটি দিয়ে নানারকম আঁকি বুকি করে সারি সারি কতগুলো গর্ত করলেন তার মধ্যে। বেদীর পাশেই প্যাকাটি দিয়ে একটা ত্রিপদ মাচা তৈরী করে খুঁটির কাঁচা দুধের সঙ্গে জল মিশিয়ে একটা ছোট সরাতে ক্ষীর তৈরী করে ঐ মাচার উপর বসিয়ে রাখলেন সাবধানে। তারপর পিন্টুকে চান করে আসতে বললেন। ঐ ভেজা কাপড়েই তিন ইটের উনুনে বড় মালসাটাতে আতপ চাল সেদ্ধ করতে হবে। পিণ্ডের অন্ন আধগলা হলেই হল। কলা, তিল, ঘি আর মধু সহযোগে ওটাকে মেখে পিণ্ডের দলা তৈরী করতে হবে অনেকগুলো। কাজ অনেক, দেখতে দেখতে বেলা গড়িয়ে গেছে দশটার কাছাকাছি।

কাদার মধ্যে বকের মতো পা তুলতে তুলতে পিন্টু এগিয়ে চলল চান করতে ঐ নর্দমাসদৃশ গঙ্গায়। পিছনে মা পা-দুটো একরকম হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে টেনে আনছিল। বালতি একটা সঙ্গে ছিল ওদের, সেটা নামিয়ে রেখে এক আধ পা এগিয়ে নাক মুখ কুঁচকে ঝুপ ঝুপ করে দু-তিনটে ডুব দিল পিন্টু। অভ্যাসবশে কুলকুচো করতে যাচ্ছিল, হাতে একটা পচা ডুমুরের সঙ্গে জলে ভিজে টইটম্বুর কিছু খই উঠে এল। হাত ঝাঁকিয়ে সব ফেলে দিয়ে এক বালতি জল তুলে ভেজা ধুতি লটপট করতে করতে পিন্টু তাড়াতাড়ি উঠে আসতে যাচ্ছিল, চোখে পড়ল মা হাঁটু ভেঙে কোমর ভিজিয়ে চুপ করে নীল-ডাউনের মতো বসে আছে। পিন্টু তাড়া দিল, তাড়াতাড়ি কর মা, শীত করলেই শীত বাড়বে। মা অন্যমনস্ক গলায় অস্পষ্টভাবে বলল, শীত! পিন্টুর মনে পড়ল, বছর দুই আগে পড়ে গিয়ে মার কোমরে একটা চোট লেগেছিল, প্রতি বছর এই শীতের সময় ব্যথাটা বাড়ে। কতদিন-ও নিজে বেলেডোনা মালিশ করে দিয়েছে। নরম গলায় পিন্টু বলল, তাড়াতাড়ি ডুব দিয়ে নাও মা, ওরা আর কতক্ষণ বসে থাকবে। ন কাকা হয়ত এতক্ষণ...। পিন্টুর মা অদ্ভুত ভঙ্গীতে মাথাটা ডুবিয়ে দু হাতে জল ছড়িয়ে দিতে লাগল। সাদা থানের আঁচলটা জলের উপর ফেঁপে থাকল কিছুক্ষণ বেলুনের মতো। কাঁপতে কাঁপতে উঠে এসে ঠকাশ করে বালতি নামিয়ে হাঁটুর উপর কাপড় তুলে পিন্টু জল নিংড়ে ফেলল। তারপর উবু

হয়ে বসে প্যাকাটিতে আগুন ধরিয়ে উনুনে মালসাটায় পিণ্ডের চাল চাপিয়ে দিল। মাঝে মাঝে আগুনের আঁচে ঠাণ্ডা হাত-পা সেঁকে নেবার চেষ্টা করছিল পিণ্টু। মা মন্দিরের দেওয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে কাপড় ছেড়ে, রুক্ষ ভেজা চুলের জটে হাত না দিয়েই পিণ্টুর পাশে এসে গুটিসুটি মেরে বসল। তখনও লোক নেই বিশেষ, প্রায় নির্জন ঘাট। গঙ্গার ঘাটের চাতালে ইঁটের উনুনে বাবার পিণ্ডের অন্ন জ্বাল দিতে দিতে পিণ্টু মার সঙ্গে একটা গভীর আত্মীয়তা বোধ করল। আগুনের আঁচে ওদের দেহ থেকে থেকে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। উনুনের ভিতর প্যাকাটি গুঁজে দিতে দিতে পিণ্টুর মনে হলো যেন অনন্ত কাল ধরে ও আর মা এই উনুন জ্বালিয়ে রেখে এমনি ভাবে বাবার পিণ্ড রাঁধছে।

ভটচায মশাই যজ্ঞের বেদীর একপাশে কোশাকুশীতে জল ভরে কুশাসন বিছিয়ে অন্য ধারে শ্রাদ্ধের দানসামগ্রী সাজালেন। আতুড়ের বাচ্চার ব্যবহারের মতো লেপ তোষক বালিশ। অন্নপ্রাশনের ছোট ছোট থালা বাসন ধুতির বদলে গামছা। না দিলে নয় তাই। ভটচায মশাই উঁকি মেরে মালসার ভিতর এক নজর দেখে নিয়ে বললেন, নাও, এখন কলাপাতায় ঐ তণ্ডুল নামিয়ে কলা ঘৃত মধু তিল ইত্যাদি সহযোগে ওটা ভালো করে মেখে দশটি পিণ্ড তৈরী কর। ঠাকুরমশাই-এর বিশুদ্ধ কথা পিণ্টুর কানে যাচ্ছিল না। অনভ্যস্ত হাতে খুব বড় রকমের একটা দায়িত্বশীল কাজ নেবার মতো অপ্রতিভ কুণ্ঠায় মুখ চোখ লাল করে পিণ্টু বাবার পিণ্ড মাখিয়ে ড্যালা পাকিয়ে পাশাপাশি সাজিয়ে রাখতে লাগল কলাপাতায়।

পিণ্টু হাঁটু মুড়ে উবু হয়ে বসল। ভটচায মশাই ওর দু হাতের মধ্যমাতে কুশের আংটির মতো দুটো জিনিস পরিয়ে দিলেন। পিণ্টুর পৈতে হয়েছিল গত বছর। কোনোরকমে গায়ত্রী জপ শেষ করে বদ্ধাঞ্জলী হয়ে বাধ্য ছেলের মতো আদেশের অপেক্ষা করতে লাগল। ঠাকুরমশাই মন্ত্র বলতে শুরু করেছেন অনেকক্ষণ। পিণ্টু অধিকাংশ শব্দের অর্থ না বুঝে যন্ত্রচালিতের মতো প্রতিধ্বনি করে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর কানে এলো, আনন্দচন্দ্র দেবশর্মণঃ ···প্রেতযোনী··। বাবাকে প্রেত বলছেন ভটচায মশাই! দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাবা এখন প্রেতাত্মা! পিণ্টুর অস্বচ্ছ দৃষ্টির সামনে ধীরে ধীরে ভেসে উঠল মহাশ্মশান। ছোটবেলায় একবার দেশের বাড়িতে গিয়েছিল পিণ্টুরা—কিছুদিন থেকেছিল। দূর থেকে দেখে এসেছিল শ্মশান—ফাঁকা

ধু-ধু মাঠের প্রান্তে মরা নদীর সোঁতা। সেখানে রাত্রে মড়ার মাথার খুলি আর হাড়গোড় নিয়ে ভূত-প্রেত শাকচুন্নীরা গোভুয়া খেলে···শিয়ালের আকুল কান্না শুনতে পেল পিন্টু। গা-টা শিউড়ে উঠে কুঁকড়ে গেল ভয়ে। এদের মধ্যে বাবা—না—না। একটা ত্রাসে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠছিল পিন্টুর। মন্ত্র উচ্চারণে ভুল করতে লাগল। ভটচায মশাই স্থির দৃষ্টিতে পিন্টুকে এক নজর দেখে শান্ত গলায় বলে যেতে লাগলেন—

"মধুবাতা ঋতায়তে, মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ, মাধ্বীর্ন সন্তোবধীঃ,
মধুনক্তো মুতোশসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ···"

পিন্টু লাইন থেকে টেনে উঠেছে এবার। সংস্কৃত আছে ওর, এ মন্ত্রের মানে কিছু কিছু বুঝতে পারে। বাবাকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে, তুমি যেখানে আছ সেখানে মধুময় বাতাস বইছে, মধু ক্ষরিত হচ্ছে বসুন্ধরায়, বিশ্বনিখিলে। মন্ত্র শুনতে শুনতে একটা আশ্বাসে পিন্টুর মন ভরে উঠছিল আবার। পৃথিবীর ধূলিকণা মধুময়, জগৎ মধুময়। রোগ-শোক, দুঃখতাপের মালিন্য তুচ্ছ হয়ে শস্যশ্যামল ফলন্ত পৃথিবী ভেসে উঠবে অপার স্নেহে। ক্লাশের সংস্কৃত মাস্টারমশাই-এর কথা মনে পড়ল পিন্টুর। রোগা চশমা-পড়া ভদ্রলোক, মণিদাদের বয়েসী হবে বোধহয়। কালিদাসের রঘুবংশম থেকে আবৃত্তি করতে করতে আবিষ্ট হয়ে যেতেন উনি। এমনি করে স্বপ্নের ঘোরে কথা বলতেন।

মাটির বেদীর উপর এক এক করে পিণ্ড সাজিয়ে রেখে বদ্ধাঞ্জলীতে জল নিয়ে কনুই দিয়ে নিঃসৃত জল প্রতিটি পিণ্ডের উপর সিঞ্চন করতে হবে। গণ্ডুষপূর্ণ জল নিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে পিন্টু মন্ত্রোচ্চারণ করে যেতে লাগল। ভটচায মশাই-এর গম্ভীর গলার আওয়াজ শুনল পিন্টু আবার, 'শ্মশানানল দগ্ধোঽসি পরিত্যক্তোঽসি বান্ধবৈঃ'।···শুনতে শুনতে পিন্টুর বুকের ভিতর থেকে ন্যাকড়ার পুটুলির মতো একটা যন্ত্রণা গলার কাছে জমা হতে লাগল আস্তে আস্তে। একটা অস্বস্তিকর যন্ত্রণা। বাবাকে আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব সবাই ত্যাগ করেছে। চারিদিকের এত আলো, এত বাতাস। এই রূপে রসে ভরা পৃথিবীর সব কিছু ত্যাগ করেছে বাবাকে। চিতার লকলকে আগুনে বাবার ভারী দেহটা পুড়ছে।

বাবাকে ত্যাগ করেছিল সবাই অনেকদিন আগেই। হোমিওপ্যাথিক পাশ করেছিল বাবা, পশার জমাতে পারে নি। মার মুখে শুনেছে, প্রথম প্রথম

ওষুধবোঝাই কাঠের চৌকো বাক্সটা, মেটেরিয়া মেডিকা সাজিয়ে বৈঠকখানার ঘরে নিয়মিত বসত বাবা। বাইরের দরজায় বড় বড় করে নেম-প্লেট লাগান হয়েছিল, আনন্দমোহন চৌধুরী, এম. বি. (হোমিও)। কিন্তু ঐ পর্যন্তই, কালে ভদ্রে এক-আধজন রোগী হয়তো আসতো। বাবা কস্মিনকালেও খুব মিশুকে প্রকৃতির লোক ছিল না। পাড়ার সমবয়েসী দু চারজন ভদ্রলোক এসে আগে আগে আড্ডা জমাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তারা কেউই বাবার বন্ধু হয়ে উঠতে পারে নি। নিরুৎসাহ হয়ে তারা সরে গেছে আরও জমাটি আড্ডার সন্ধানে। নির্জন ঘরে একা বসে থাকতে থাকতে হাই তুলতো বাবা। মাঝে মাঝে একটা বাঁধান মোটা খাতা টেনে নিয়ে কি সব যেন লিখতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা। খাওয়া-নাওয়ার খেয়াল থাকতো না তখন। রোজগার যত কমছিল বাবা যেন ততই নির্লিপ্ত আর উদাসীন হয়ে উঠছিল সংসার সম্বন্ধে। শেষদিকে নিচে নামাই বন্ধ করে দিয়েছিল বাবা। প্রকাণ্ড ছাদটায় পায়চারি করে সময় কাটত। পৈত্রিক বাড়িটা ছিল তাই রক্ষা, নইলে সকলের হাত ধরে রাস্তায় দাঁড়াতে হতো। মা আর ন কাকার মধ্যে সদ্ভাব কোনোদিনই ছিল না, কিন্তু এ সম্পর্কে দুজনেই একমত। মামাবাড়ি থেকে প্রথম প্রথম তত্ত্ব তল্লাশ হতো। ইদানীং কচিৎ কাজে কর্মে পিণ্টুদের ডাক পড়ে ও-বাড়িতে। সংসার থেকে যত দূরে সরে যাচ্ছিল বাবা ততই মার আক্রোশ বাড়ছিল তার উপরে। মার অবিশ্রান্ত নিষ্ঠুর গালিগালাজের মধ্যে বাবার পরাজিত ক্লান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে পিণ্টুর বড় কষ্ট হতো। ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছে মা যেন বাবাকে দাঁতের উপর রাখছে, উঠতে বসতে গালমন্দ। ইদানীং সামান্য কিছু হলেই কর্কশ গলায় চিৎকার করে মা বাবাকে অভিশম্পাত পাড়ত, মর্ মর্ বুড়ো শকুন, সারা জীবন আমার হাড় ভাজা ভাজা করে খেল। মা একবার আরম্ভ করলে আর সহজে থামতো না। ঘণ্টাখানেক ধরে চলত এই ঝড়। কোনো জবাব দিত না বাবা, আর জবাব পেত না বলেই হয়তো মা এমন নির্মম হয়ে উঠত। শেষ পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে বাবা ঘরের কোণের খাট থেকে নেমে মাথা নিচু করে ছাদের সিঁড়ির দিকে পা বাড়াত। প্রথম প্রথম বড়দি এবং পিসতুতো ভাই মণিদা মাকে থামাবার চেষ্টা করত। শেষদিকে সবারই গা সহা হয়ে উঠেছিল ব্যাপারটা। কেবল পিণ্টুই যেন দিনের পর দিন বাবার এ নরকযন্ত্রণার অংশীদার হতে চেয়েছে। পিণ্টু বুঝতে পারে বাবার রোজগার নেই, তাই মার এত রাগ,

এত ঘৃণা। বড়দি আইবুড়ো হয়ে ঘরে বসে আছে, বিয়ে দেবার ক্ষমতা নেই। মার গয়নাগুলো এক এক করে সব গেছে। বলতে গেলে আজকাল ন কাকার আশ্রিত ওরা। পিন্টু ভয়ার্ত বিস্মিত চোখে দেখেছে মার হিংস্র মুখ। তুচ্ছ কারণে বাবাকে গালমন্দ করতে পারলে মা যেন আনন্দ পায়। শেষদিকে হার্টের ব্যায়রামটা যখন ধরা পড়ল, বাবার বুঝি তখন পঞ্চাশও পেরোয় নি। এ নিয়ে কেউ দুশ্চিন্তা করে নি। কেবল শীতকালে যখন বাঁ হাতটা শক্ত করে বুকের উপর চেপে ধরে বাবা ছাদে অবিশ্রান্ত পায়চারি করত, পিন্টুর বুকের ভিতরটা যেন কেমন করত। খেলার ফাঁকে ফাঁকে বাবাকে একদৃষ্টে দেখত পিন্টু, দীর্ঘ ভারী দেহটা যেন অতিকষ্টে বয়ে বেড়াচ্ছে বাবা।

ভটচায মশাই-এর তাড়া খেয়ে চমক ভাঙল পিন্টুর। অস্পষ্ট গলায় আওড়াতে লাগল, "যেনাননেন দগ্ধোঽসি যেন তাপেন তাপিতঃ। নীরং স্নাত্বা ক্ষীরং পীত্বা স্নাত্বা পীত্বা সুখী ভব।" পিন্টুর দেওয়া এক গণ্ডুষ জল আর ঐ প্যাকাটির টঙে চাপান মাটির সরায় জল মেশান কাঁচা দুধের ক্ষীর চান করে খেয়ে বাবাকে সুখী হতে বলছে সবাই। তবুও পিন্টু কায়-মনোবাক্যে প্রার্থনা করল অস্নাত অভুক্ত বাবা যেন স্নান করে খেয়ে তৃপ্ত হয়। বাড়িতে বাবার স্নান খাওয়া দাওয়ার কথা কারও মনে থাকতো না। অনেক বেলায় বড়দি আবিষ্কার করতো বাবাকে। ছাদে জলের ট্যাঙ্কের আড়ালে চুপ করে বসে আছে ধ্যানী বুদ্ধের মতো। গালে খোঁচা খোঁচা আধপাকা দাড়ি, রক্তাভ চোখ। অপ্রতিভ-সন্ত্রস্ত পায়ে বাবাকে নেমে আসতে দেখে মার শানানো জিভ লক্ লক্ করে উঠত, মরণ, বলি কোন লাটসাহেবের সঙ্গে দরবার ছিল এতক্ষণ, কোন যমের বাড়ি যাওয়া হয়েছিল? এমনি করেই দিনের পর দিন চলছিল। বাবার অক্ষমতার কথা সবাই জেনে গিয়েছিল অনেকদিন আগেই। বাবার কাছ থেকে সকলের প্রয়োজন ফুরিয়েছে, তাই পুরোনো অব্যবহার্য আসবাবের মতো তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে ছাদের কোণে। গণ্ডুষের জল কনুই দিয়ে গড়িয়ে প্রত্যেকটি পিণ্ডের উপর সযত্নে ধরতে লাগল পিন্টু।

ভটচায মশাই ফুত করে একটা বিড়ি ধরিয়ে গোটাকয়েক সুখটান দিলেন। তারপর মুখ ফিরিয়ে পাশে বসা ন কাকার সঙ্গে দানসামগ্রী নিয়ে কী সব কথা বললেন ভালো করে কানে গেল না। ততক্ষণে বেশ ভিড় জমে উঠেছে

চারপাশে। একটা বুড়ী তখন থেকে তারস্বরে চিৎকার করে চলেছে, পিন্টুর কানে যায় নি। নাভিকুণ্ডে তেল ডলতে ডলতে দু চারজন চান করতে নেমেছে ঘাটে। হাক্ হাক্ করে চারপাশে থুথু ছিটিয়ে হুশ্ হুশ্ করে ডুব দিয়ে উপরে উঠে আসছে সব। চারপাশ থেকে জলের ধারা এগিয়ে আসতে আরম্ভ করেছে ওদের দিকে। পিন্টু বিপন্ন মুখে ভট্‌চায মশাই-এর দিকে তাকাল। কিন্তু তার এদিকে কোনো খেয়াল নেই। চোখ বুজে বিড়িতে শেষ সুখটানটি দিয়ে গল্ গল্ করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে হেকুঁর হেকুঁর দু চারবার কেশে অবরুদ্ধ গলায় আবার মন্ত্র আওড়াতে আরম্ভ করলেন। পিন্টু মন্ত্রচালিতের মতো মন্ত্র উচ্চারণ করে যাচ্ছিল। ঠাকুরমশায়ের গলায় উত্থানপতনের সঙ্গে কানে ভেসে আসতে লাগল, "আকাশস্থ নিরালম্ব; বায়ুভুতো··· নিরাশ্রয়—।" নিরালম্ব মানে জানে পিন্টু—অবলম্বনহীন। বাবার তবে এখন কোনো অবলম্বন নেই। আকর্ষণ বিকর্ষণ রহিত অবস্থায় বাতাসের সঙ্গে ভেসে বেড়াচ্ছে বাবা···নিরাশ্রয়ের মতো। পিন্টুর বুক ঠেলে এতক্ষণের জমাট কান্নাটা যেন এখন বেরিয়ে আসতে চাইল। পিন্টুর মনে পড়ল বড়দির বিয়ের দিন বাবাকে বাড়ি থাকতে দেয় নি মা। বরপক্ষের লোক এসে পড়বার আগেই বিকেলের পড়ন্ত রোদ্দুরে বাবা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। যার মেয়ে বিয়ে দেবার মুরোদ নেই তার বাড়িতে থাকার কি দরকার। তাছাড়া কখন বেফাঁস কি বলে বসে ঠিক কি! বাবার অবশ্য শেষদিকে কথাবার্তায় কোনো খেই ছিল না। আপন মনেই হয়তো কোনো একটা অবান্তর কথা একা-একা বকে যেত। ন কাকা প্রথমটা মৃদু আপত্তি করেছিল কিন্তু সাত পাঁচ ভেবে চুপ করে রইল। গায়ের তুষটা অগোছালভাবে জড়িয়ে বাবা আস্তে আস্তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল সবার সামনে দিয়ে। কেউ থাকতে বলল না তাকে। পিন্টু সিঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে কলাপাতা ধুয়ে সাজিয়ে রাখছিল একপাশে। বাবার করুণ শান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে পিন্টুর বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। ওর খুব ইচ্ছে হলো বাবার সঙ্গে সে-ও চলে যায়। ছোটবেলায় পার্কে বেড়াতে গিয়ে বাবা চিনেবাদাম, ঝালমুড়ি কিনে দিত, হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলে সাপটে কোলে তুলে নিত। অনেক দিন বাবার সঙ্গে যায় নি পিন্টু। বড়দির বিয়ের আনন্দটা যেন একেবারে মরে গেল ওর। মোড়ের মাথায় যতক্ষণ না পর্যন্ত বাবার তুষের চাদরের প্রান্তটা মিলিয়ে গেল, পিন্টু একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সেইদিকে।

সেদিন বাবা ফিরেছিল অনেক রাতে। ফিরেছিল মানে ফিরিয়ে আনতে হয়েছিল। মণিদা আর পিন্টু গিয়েছিল খুঁজতে। পশ্চিমদিকে অনেকটা দূর গিয়ে সাউদের খাটাল ছাড়িয়ে আরও আধ মাইলটাক গেলে কানোরিয়াদের ফাঁকা মাঠ। সেই নির্জন রাত্রির অন্ধকারে হিমে-ভেজা ঘাসের উপর বাবা ঘণ্টার পর ঘণ্টা একা-একা পায়চারি করে বেড়াচ্ছিলেন। রাস্তার লাইটপোস্টের আলোর নিচে বাবাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। টাক পড়া মাথার সাদা পাতলা চুলগুলো হিমে ভিজে স্যাতপেতে হয়ে কপালের সঙ্গে আটকে আছে। ভুরুর উপর শিশির জমেছে বিন্দু বিন্দু। গায়ের তুষটাও ভিজে নরম হয়ে গেছে। দূর থেকে বাবাকে দেখে তখন পিন্টুর মনে হচ্ছিল বাবার যেন কেউ নেই, কোনওদিন ছিল না কেউ। একা-একা নিরাশ্রয় কাঙালের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে বাবা। পিন্টুর কান্না পেয়েছিল তখন। আজকেও গঙ্গার ঘাটে বাবার পিণ্ড দিতে দিতে পিন্টু ঝাপসা দৃষ্টিতে দেখল, বাবা আশ্রয় পায় নি কোথাও—বাতাসের সঙ্গে মিশে বাড়-জলের রাত্রেও বাবা নিরাশ্রয়ের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে আকাশের প্রকাণ্ড মাঠটাতে। টপ টপ করে কয়েক ফোঁটা তপ্ত চোখের জল গড়িয়ে পড়ল পিণ্ডগুলির উপর। নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল পিন্টু।

ভটচাযমশাই এতক্ষণে যেন সজাগ হলেন। পিন্টুকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একনজর দেখে নিয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেলে নরম গলায় বললেন, নাও, এবার হাতজোড় করে বল :

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ ॥"

পিন্টু বুকভরে নিঃশ্বাস নিয়ে স্পষ্ট সতেজ গলায় পুনরাবৃত্তি করল মন্ত্রটি।

মা মন্দিরের দেওয়ালের একটা কোণ বেছে নিয়ে হাঁটু মুড়ে তখনি মুখে কাপড় গুঁজে বসেছিল। পিন্টু একবার ঘাড় ফিরিয়ে অনেকক্ষণ পরে মাকে দেখল। ঘসা কাঁচের মতো নিষ্প্রভ দৃষ্টি। মার চোখের সেই হিংস্র দীপ্তি আর নেই। প্রদীপটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল মা। এই প্রথম যেন মাকে বাবার থেকেও ক্লান্ত আর অসহায় দেখাচ্ছে। সারা জীবন বাবার সঙ্গে ঝগড়া করেছে মা। লাঞ্ছনা আর অপমানে ক্ষতবিক্ষত করেছে বাবাকে। তবুও মা হেরে গেছে, সমস্ত মুখে চোখে যেন হেরে যাওয়ার চরম ক্লান্তি, আর ক্লান্তি। দাঁতে দাঁত শক্ত করে চেপে ধরে পিন্টু মাকে দেখল অনেকক্ষণ। বিদ্যুৎ-চমকের মতো পিন্টুর হঠাৎ মনে হল, মা বাবাকে একদম বুঝতে পারে নি, কোনও দিন নয়।

দিলীপ বসু

আকাশ থেকে মহাকাশ

"জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।"

সুদীর্ঘ আশী বছরের জীবনসাধনার প্রান্তে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মানুষের সভ্যতার সংকটের ভয়াবহ অভিব্যক্তির মুখোমুখি হয়েও কবিগুরু মহামানবের মহাজয়ের মন্ত্রকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন—আর আজ তার মাত্র চব্বিশ বছর পরে, মহাকাশের উদার পটভূমিতে পৃথিবীর জল-স্থল-আকাশকে জুড়ে মানুষের বিজ্ঞানের সাধনা প্রসারিত, লক্ষ্য তার চাঁদে, গ্রহান্তরে, সুদূর ভবিষ্যতে হয়তো-বা নক্ষত্রলোকের দিকে। অথচ মানুষের সভ্যতার সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক মানবগোষ্ঠী তৈরি করার অনুকূল নয়। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে তার প্রস্তুতির সূচনা রয়েছে নিশ্চয়ই, ভবিষ্যৎও সেইদিকেই। কিন্তু তাহলেও বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্রায় পৃথিবী-বিধ্বংসী মারণাস্ত্রের সমাবেশ ঘটেছে প্রভূত পরিমাণে।

দোষ অবশ্য বিজ্ঞানের নয়। আগুনের ব্যবহারের দ্বারা মানুষের সভ্যতার ইমারত গড়ে উঠেছে; তাই বলে আগুনকে দোষ দেওয়া যাবে না নিশ্চয়ই, যদি সেই আগুনের অপপ্রয়োগ করা হয় জনপদকে পুড়িয়ে ছারখার করার জন্য।

যাই হোক, আকাশ ছাড়িয়ে মহাকাশে পাড়ি জমানোর রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার আলোচনা এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়—সেটা আমাদের আলোচ্য বিষয়বস্তুর পটভূমি মাত্র।

আকাশ ও মহাকাশের সীমানা কোথায়—ইংরেজিতে যাকে স্পেস্ ফ্রন্টিয়ার বলে, ঠিক কোথায় তার শুরু?

ভূপৃষ্ঠ বা সমুদ্রতল থেকে যত উঁচে যাওয়া যাবে, বায়ুমণ্ডল ততই পাতলা

থেকে আরও পাতলা, তারও থেকে তনুতর হতে হতে শেষ অবধি মিলিয়ে যাবে; যেমন গানের সুর, গায়কের কাছ থেকে যত দূরে যাওয়া যাবে, ততই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে মিলিয়ে যাবে। অর্থাৎ ঠিক কোনো-একটি নির্দিষ্ট দূরত্বের আগের ইঞ্চি অবধি শোনা যাচ্ছে আর তারপরে আর-এক ইঞ্চি এগোলেই শোনা যাবে না—এরকম নিশ্চয়ই নয়।

যেমন গানের সুর তেমনি বায়ুমণ্ডল কতদূর অবধি বিস্তৃত তার একটা চলতি হিসাব ধরে নিতে হয়। সেইভাবে দেখলে, বলতে হয় সমুদ্রতল থেকে 200/250 মাইল উঁচু অবধি বায়ুমণ্ডল বিস্তৃত। তারও উপরে বায়ুকণার ছিটেফোঁটা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে—সেখানে বায়ুর (অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের) একক কণাগুলি পরস্পর থেকে প্রায় মাইলখানেক দূরে দূরে অবস্থিত এবং সেগুলি প্রত্যেকটি যেন নিজেরাই এক একটি স্পুটনিকের মতো পৃথিবীর মহাকর্ষে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে চলেছে। এই অঞ্চলের নাম দেওয়া হয়েছে এক্সোস্ফীয়ার—কার্যত এতখানি ভ্যাকুয়াম আমাদের পৃথিবীতে বসে গবেষণাগারে আমরা তৈরি করতে পারি না।

মহাকাশের প্রান্তভাগ বা স্পেস্ ফ্রন্টিয়ার 200/250 মাইল থেকেই শুরু। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, সমুদ্রতলে বা ভূপৃষ্ঠে আমাদের মাথার উপর রয়েছে 200/250 মাইলব্যাপী গভীর বায়ুসমুদ্র, যার একেবারে তলাতে আমরা বাস করি। অথবা পৃথিবীকে গোল কমলালেবুর মতো ভাবলে (আসলে কমলালেবুর থেকে আকৃতি একটু আলাদা—অনেকটা বিলাতী পেয়ার ফলের মতো) মনে করা যেতে পারে যে, কমলালেবুর শাঁসের গায়ে বায়ুমণ্ডলরূপী একটি পুরু খোসা যেন পরানো রয়েছে। পৃথিবীর ব্যাস আট হাজার মাইল, আর তার উপরে 200/250 মাইল পুরু বায়ুমণ্ডল—অর্থাৎ শাঁসের তুলনায় খোসাটি মাত্র $\frac{1}{40}/\frac{1}{32}$ পুরু। আমাদের মাথার উপরে নীল চাঁদোয়ার মতো বিছানো রয়েছে যে বায়ুমণ্ডল, সেটা হল আমাদের আকাশ; আর এই নীল চাঁদোয়ার উপরে হল নিকষ কালো মহাকাশ। এই নীল চাঁদোয়ারূপী আকাশ দিয়ে মহাকাশের আসল রূপকে আমাদের চোখ থেকে ঢেকে রাখা হয়েছে।

ঘরে-বাইরে

1957 সালের 4 অক্টোবর প্রথম সোভিয়েত বৈজ্ঞানিকদের হাতে-গড়া একটি ছোট গোলক (ব্যাস তার মাত্র 180 ইঞ্চি) এই নীলাকাশকে পার

হয়ে অনন্ত মহাকাশের বুকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ শুরু করলো। 1957 থেকে 1965—এই আট বছরে সোভিয়েত ও আমেরিকান বৈজ্ঞানিকদের যুক্ত প্রচেষ্টায় মহাকাশের বহু রহস্য উদ্‌ঘাটিত—চাঁদে মানুষের সশরীরে পৌঁছবার প্রস্তুতি চলছে এবং আমাদের বাসভূমি পৃথিবী সম্পর্কেও বহু নতুন তথ্য পাওয়া গিয়েছে।

এই শেষোক্ত পয়েন্টটি নিয়ে প্রথমে আমরা আলোচনা করব, কারণ একটু আশ্চর্য মনে হলেও 1957 সালের 4 অক্টোবর মহাকাশে স্পুটনিক ছোঁড়ার আসল উদ্দেশ্য ছিল—আমাদের বাইরের মহাকাশ অপেক্ষা আমাদের নিজেদের ঘর পৃথিবীকে আরো ভালো করে জানা। কেন?

পৃথিবীর গায়ে আমাদের বাস, যেন-ঘরের মধ্যে; আর ঘরের দেওয়াল বা ছাদ দিয়ে যেন ঘেরা রয়েছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল। মনে করা যাক, আমরা বরাবর ঘরের মধ্যেই যদি বাস করি, ঘর থেকে বাইরে কখনও না বেরিয়ে থাকি—তাহলে আমাদের নিজের ঘর সম্পর্কে জ্ঞানও কি পূর্ণাঙ্গ হতে পারে! নিশ্চয়ই নয়। ঘরের মধ্যে রোদের তাপ বাড়লে গরম লাগবে, তুষার পড়লে লাগবে ঠাণ্ডা, কিন্তু যে-মানুষ ঘর ছেড়ে কোনোদিন বাইরে বেরোয় নি, সে কি ঠিক বেশি গরম বা ঠাণ্ডা লাগবার কার্যকারণ সম্পর্ক বুঝতে পারবে? নিশ্চয়ই নয়।

তেমনি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলরূপী দেওয়াল বা ছাদের ওপারে যে মহাকাশ রয়েছে, যেখানে সূর্যনিঃসৃত অতিবেগুনি রশ্মির (ultra-violet rays), মহাজাগতিক রশ্মির (cosmic rays) অথবা সূর্যনিঃসৃত কণিকা-স্রোতের (corpuscular radiation) প্রভাবে প্রতিনিয়তই আমাদের পৃথিবীর আবহমণ্ডল তথা পৃথিবীর আবহাওয়া এবং জীবন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। সেই মহাকাশের সঙ্গে পৃথিবীর জীবনের যে নিবিড় ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে, তাকে সম্যক না জানতে ও বুঝতে পারলে আমাদের নিজেদের ঘর পৃথিবী সম্পর্কেও জ্ঞান-পূর্ণাঙ্গ হবে না, বাইরের মহাকাশ সম্পর্কে তো নয়ই। কাজেই কৃত্রিম উপগ্রহের অভ্যন্তরে যন্ত্রপাতি বোঝাই করে তাকে মহাকাশে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করানোর প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আমাদের বাসভূমি ধরিত্রীকে আরও ভালো করে জানা।

সূর্য এবং মহাকাশ থেকে তড়িৎচুম্বকীয় যে বর্ণালী বিন্যাস (electro-magnetic spectrum) প্রতিনিয়ত আমাদের পৃথিবীকে প্রভাবান্বিত করছে,

সেই বর্ণালী বিন্যাসের মাত্র একটু যেন ছোট জানলা (রামধনুর সাতটা রঙ) আমাদের চর্মচক্ষে ধরা পড়ে ; আরও সামান্য কিছু ধরা পড়েছে আমাদের যন্ত্রের সাহায্যে। কিন্তু আবহমণ্ডলের জন্ত তার অধিকাংশই আটকে যাচ্ছে বা রূপ পরিবর্তন করছে।

অবশ্য করছে বলেই আমাদের প্রাণিজীবন ধারণ করা সম্ভব হয়েছে। কারণ অতি-বেগুনী রশ্মির সরাসরি আঘাতে আমাদের চোখ নষ্ট হয়ে যেত, আমাদের দেহের চামড়া পুড়ে ছারখার হত ; আর মহাজাগতিক রশ্মি যদি উপর-আকাশের বায়ুকণার সংঘাতে তার প্রাথমিক চরিত্র না বদলে সরাসরি নেমে আসত, তাহলে আমাদের জীবকোষে জৈবিক পরিবর্তন এমন ভাবে ঘটত যাতে আমরা 'অমানুষ' হয়ে যেতাম।

1957 সালের 4 অক্টোবরের পূর্বে আমাদের অবস্থা ছিল কূপমণ্ডুকের মতো। মানুষের আকাশ থেকে মহাকাশে উত্তরণে তাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের নবদিগন্ত আজ উদ্ভাসিত। মহাকাশের বিরাট প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে মানুষ তার নিজের ঘর পৃথিবী সম্পর্কে যেমন দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছে, তেমনি বাইরের মহাকাশে জয়যাত্রার পথও তার কাছে আজ উন্মুক্ত।

একে একে দেখা যাক পৃথিবী সম্পর্কে নতুন কি আমরা জেনেছি,—চাঁদে আমরা কি করে যাবো এবং কেন যাবো—তারপরে অবশ্য চাঁদে পৌছে আমাদের আসল যাত্রা হবে শুরু—গ্রহান্তরে, নক্ষত্রলোকে—এই জয়যাত্রার শেষ নেই।

আয়নমণ্ডল

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকেই প্রফেসার ব্যালফোর স্টুয়ার্টের পরীক্ষার দ্বারা নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল যে, উপর-আকাশ তড়িতাবিষ্ট। বেতার তরঙ্গ আলোর মতোই সরল পথে চলে ; কাজেই 1901 সালে মারকনি প্রথম যখন ইংলণ্ড থেকে অষ্ট্রেলিয়া বেতারবার্তা পাঠাতে সমর্থ হলেন, তখন বোঝা গেল যে, উপর-আকাশ থেকে তারা প্রতিফলিত হচ্ছে (তা না হলে অবশ্য ধরে নিতে হয় যে পৃথিবী গোল চাকার মতো, বলের মতো নয়, অর্থাৎ দ্বিমাত্রিক গোলাকার, ত্রিমাত্রিক নয়)। এই তড়িতাবিষ্ট অঞ্চলের নাম দেওয়া হয়েছে আয়নমণ্ডল।

কৃত্রিম উপগ্রহদের সাহায্যে আমরা বেশ ভালো করেই জানি যে, সূর্য-

নিঃসৃত অতি-বেগুনী রশ্মির প্রচণ্ড শক্তির আঘাতে উপর-আকাশের বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন পরমাণু ভেঙে চুরমার হয়ে পরমাণুকেন্দ্রীণের হাঁ-ধর্মী বিদ্যুৎ শক্তিবিশিষ্ট প্রোটন থেকে কক্ষপথে ঘূর্ণমান না-ধর্মী বিদ্যুৎ শক্তিবিশিষ্ট ইলেকট্রন (এক বা একাধিক) বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ইলেকট্রনের স্বাধীন অস্তিত্ব বেশিক্ষণ বজায় থাকে না, সে এর পার্শ্ববর্তী পরমাণুর মধ্যে ঢুকে পড়ে। প্রথম পরমাণুটিতে ধনাত্মক বিদ্যুৎশক্তি, আর পার্শ্ববর্তী পরমাণুটিতে ঋণাত্মক বিদ্যুৎশক্তির আধিক্য হওয়াতে দুটি পরমাণুই তড়িতাবিষ্ট বা আয়নিত হয়ে যায়।

এইভাবে বায়ুকণাতে আয়নিত গ্যাসের পরমাণুর ঘনত্ব অনুসারে আয়ন-মণ্ডলকে মোটামুটি চার স্তরে—D, E, F ও F_2 নামে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে E স্তরটি (Heaviside layer) থেকেই সাধারণত আমাদের বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে গোলাকার পৃথিবীর দুই বিপরীত দেশের মধ্যে বেতারবার্তার আদান-প্রদান সম্ভব হয়েছে। F ও F_2 স্তরটি রাত্রির আকাশে অনেক সময়ে মিলে গিয়ে একটি F স্তরে পরিণত হয়।

D থেকে F স্তরের উচ্চতা জমি থেকে 40 মাইল থেকে 120/130 মাইল। তা হলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো? প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে সূর্যনিঃসৃত অতি-বেগুনী রশ্মি উপর-আকাশের অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন পরমাণুকে ভেঙে চুরমার করে নীচে নামতে আরম্ভ করল। উপর-আকাশের বায়ুকণার ঘনত্ব অনুসারে আয়নিত গ্যাসের স্তরভাগ তৈরি হয়ে যাচ্ছে। ভূপৃষ্ঠ থেকে 40 মাইল উপর অবধি নেমে আসতে অতি-বেগুনী রশ্মির বেশির ভাগ শক্তি ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, যেটুকু বাকী থাকছে সেটুকু আরো নীচে নেমে একুশ থেকে বারো মাইলে একটি ওজোন (ozone) গ্যাসের স্তর তৈরি করছে। এখানেই অতি-বেগুনী রশ্মির শক্তি ক্ষয় হয়ে প্রায় নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। সামান্য অবশিষ্ট ছিটেফোঁটা একেবারে সমুদ্রতল অবধি নেমে আসে এবং ভোরের বা অস্তগামী সূর্যের রশ্মি যখন আরো লম্বা তেরচা ভাবে পৃথিবীর বুকে পড়ে, তখন তা থেকে আমরা আমাদের অতি-প্রয়োজনীয় D ভিটামিন পেয়ে থাকি।

এক কথায় আমাদের বায়ুমণ্ডল সূর্যনিঃসৃত অতি-বেগুনী রশ্মিকে যেন ছেঁকে শোধন করে মাত্র সামান্য একটু দরকারী অংশ আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেয়, বাকি সবটাই শুষে নিয়ে আয়নিত এবং আরো নীচের দিকে ওজোন গ্যাসে রূপান্তরিত হয়।

এই প্রণালীতেই মহাজাগতিক রশ্মির প্রাথমিক চরিত্রের রূপান্তরিত দ্বিতীয় রূপ (মেসন) নিয়ে বৃষ্টির ধারাপাতের (cascade showers) মতন আমাদের উপর বর্ষিত হয়; কিন্তু সে বর্ষণ আমাদের পক্ষে মারাত্মক নয় বা আমাদের জীবকোষের বিবর্তনকে ব্যাহত করে না।

তেজঃক্রিয় বলয়

সূর্যনিঃসৃত কণিকাস্রোত পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের দুই মেরুদেশ থেকে প্রতিঘাত হয়ে সারা বিষুবরেখা অঞ্চল জুড়ে বিরাজমান। এইরকমের দুটি তেজঃক্রিয় বলয়ের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে—প্রথমটি পৃথিবী থেকে এক হাজার পাঁচশ থেকে তিন হাজার পাঁচশ মাইলের মধ্যে, দ্বিতীয়টির দূরত্ব পঁচিশ হাজার মাইলের কাছাকাছি থেকে আরম্ভ। মজার কথা, প্রথম বলয়টি প্রায় সম্পূর্ণ হাঁ-ধর্মী বিদ্যুৎশক্তি বিশিষ্ট প্রোটন দিয়ে আর দ্বিতীয়টি না-ধর্মী বিদ্যুৎশক্তি বিশিষ্ট ইলেকট্রন দিয়ে গঠিত। প্রথমটির শক্তি 100 মেগাভোল্ট এবং দ্বিতীয়টির শক্তির পরিমাণ 100 কিলোভোল্টের বেশি নয়। কিন্তু তা হলেও বলয়দুটিতে প্রোটন ও ইলেকট্রনের পরিমাণ খুবই বেশি—যথাক্রমে $2\times10^4/cm_2/sec$, এবং $10^{11}/cm_2/sec$; এদের পরিমাণ যে খুব বেশি সেটা আরো বোঝা যায় যখন দেখি যে মহাজাগতিক রশ্মির ভারী নিউক্লিয়াসে মাত্র দুটি প্রোটন রয়েছে প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে।

উপরিউক্ত অনেক তথ্যই নতুন পাওয়া গিয়েছে স্পুটনিক বা কৃত্রিম উপগ্রহদের দৌলতে, তবে শেষোক্ত তেজঃক্রিয় বলয় দুটি মহাকাশচারীদের বিশেষ দুঃসংবাদের কারণ। তেজঃক্রিয়তার পরিমাণ বেশি নয়, কিন্তু তেজঃক্রিয় কণার সংখ্যা অত্যধিক হওয়াতে প্রতি ঘণ্টায় তেজঃক্রিয়তার পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় দশ হাজার রনজেন—সাধারণ মানুষ যতখানি তেজঃক্রিয়তা সইতে পারে তার প্রায় পাঁচ হাজার গুণ বেশি।

মনে রাখা দরকার যে আমাদের মহাকাশচারীরা এ পর্যন্ত তেজঃক্রিয় প্রথম বলয়ের বহু নীচে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছেন। চাঁদে যাবার পথে এই বলয় দুটি বিশেষ বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক বর্ষ

1957 সালের 4 অক্টোবর থেকে এই রকমের অনেক নতুন তথ্যই আমাদের বহু পুরনো ধ্যানধারণাকে বহুলাংশে, অনেক ক্ষেত্রে একেবারে বাতিল করে দিয়েছে।

1957 সালের 1 জুলাই থেকে 1958 সালের 31 ডিসেম্বর অবধি পৃথিবীকে ভালো করে জানবার জন্য 18 পয়েন্টের এক বিরাট পরিকল্পনা নিয়ে আ-ভূ-বর্ষের সূচনা হয়েছিল। এই দেড় বছরকে ধরে হিসাব করার প্রধান কারণ ঠিক ঐ সময়েই সূর্যের কলঙ্কের (sunspot) পরিমাণ সবচেয়ে বৃদ্ধি পাবে। এগার বছর অন্তর এটি হয়।

আসলে সূর্যের অভ্যন্তরে বিরাট প্রবাহের (কেন্দ্রে প্রায় চার কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) মধ্যে কোনো-কোনো স্থানে কোনো কারণে তাপমাত্রার কিছু হ্রাস হলে সেগুলিকে অপেক্ষাকৃত কালো রঙের কলঙ্কের মতো দেখায়। এই কলঙ্কের মুখ দিয়ে যেন পিচকিরির মতো সূর্যকণিকা স্রোত আমাদের পৃথিবীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে অনেক সময়েই পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রে বিরাট বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে।

পৃথিবীকে জানবার 18 পয়েন্টের এই বিরাট পরিকল্পনায় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও চমকপ্রদ অংশ ছিল মহাকাশ থেকে পৃথিবীকে 'নিরীক্ষণ' করা। আমরা এখন জানতে পেরেছি যে, পৃথিবীর সূর্য-প্রদক্ষিণের কক্ষপথ 9,30,00,000 মাইল দূরে থাকলেও আমাদের পৃথিবী সূর্যের আবহমণ্ডলের মধ্যেই অবস্থিত। তার মানে সূর্যের প্রতিটি ঘটনার সঙ্গে আমাদের জীবন ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত আর ঠিক সেই কারণেই গত প্রায় বছরখানেক "শান্ত সূর্যের বৎসর" (অর্থাৎ যখন সূর্যকলঙ্কের ক্রিয়াকলাপ সর্বাপেক্ষা কম থাকবে) পালন করা হচ্ছে। 1970-71 সালে আবার আ-ভূ-বর্ষ পালন করা হবে এবং এইরকমের বার কয়েক পৃথিবীকে জানবার প্রচেষ্টার দ্বারা একদিন সত্য সত্যই আমাদের বাসভূমি ধরিত্রীকে আমরা যথার্থ জানতে পারব।

অবাক হতে পারি আমরা, কিন্তু এ কথা সত্য যে পৃথিবী সম্পর্কে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না। চার ভাগের তিন ভাগ জল বা সমুদ্র আমাদের কাছে প্রায় অজানা; পাতাল—মাইল চারেকের নীচে কি হচ্ছে আমরা জানি না, যেতেও পারি না; আকাশ এতোদিন প্রায় আমাদের কাছে অজানা ছিল।

পৃথিবীর চার ভাগের এক ভাগ স্থলের প্রায় অর্ধেক অংশে মাত্র আমরা বাস করি।

এটা নিশ্চয়ই পরিষ্কার যে, পৃথিবীকে জানতে হলে সারা পৃথিবী জুড়ে কাজ করতে হবে। আনন্দের সঙ্গে লক্ষ করতে পারি যে, 1957-58 সালের তীব্রতম স্নায়ুযুদ্ধের সময়েও অতলান্তিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগর, উত্তর থেকে দক্ষিণ মেরু এবং মহাকাশে কৃত্রিম গ্রহগুলি নিয়ে পাঁচ হাজার রিসার্চ স্টেশনে পৃথিবীর সাতষট্টিটি দেশের দশ হাজার বৈজ্ঞানিক একত্রে একযোগে কাজ করেছিলেন।

জানবার অদম্য প্রেরণাও যে মানবগোষ্ঠীকে একক প্রচেষ্টায় সমবেত করতে পারে—এ তার একটি জলন্ত উদাহরণ।

চাঁদে অভিযান

নিজের বাসভূমি পৃথিবীকে ছাড়িয়ে মহাকাশের পথে মানুষ আজ চাঁদের দিকে পা বাড়িয়েছে। রকেট বিজ্ঞান, মহাকাশে ওজনবিহীন অবস্থায় মানবদেহের ক্রিয়াকলাপ, ব্যোমযানের মধ্যে মানুষের বাসোপযোগী একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নকল 'পৃথিবী' তৈরী করা, কেবল অক্সিজেন বা খাদ্যাবলীর সমস্যা নয়, একেবারে একটা স্বয়ংক্রিয় বাস্তব ব্যবস্থাকে (ecological system) চালু রাখা—এ সমস্তই একেবারে নবতম বিজ্ঞানের পর্যায়ে পড়ে। বারান্তরে এ সমস্ত আলোচনা করা যেতে পারে। এখানে আমরা স্বল্প পরিসরে চাঁদে মানুষের অভিযানের কিছু সমস্যাবলী আলোচনা করব।

চাঁদে আছাড় খেয়ে পড়তে হলে পৃথিবী থেকে ঘণ্টায় পঁচিশ হাজার মাইল গতিবেগ নিয়ে যাত্রা করতে হবে। তাহলেও লক্ষ্যটি নিখুঁত হওয়া দরকার; কারণ চাঁদ একটি ভ্রাম্যমাণ বস্তু, পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে ঘণ্টায় প্রায় তিন হাজার ছ'শ মাইল বেগে—পৃথিবীও সূর্য প্রদক্ষিণ করছে ঘণ্টায় ছেষট্টি হাজার মাইল বেগে। তাহলে পৃথিবী থেকে চাঁদকে আঘাত করা মানে চলন্ত মোটর গাড়িতে বসে উড়ন্ত পাখিকে গুলি করা।

চাঁদের ব্যাস দু হাজার, এক শ' ষাট মাইল, পৃথিবী থেকে দূরত্ব গড়পড়তা 2,40,000 মাইল—তুলনামূলকভাবে একটি প্রমাণ সাইজের ফুটবল গ্রাউণ্ডের অপরপ্রান্তে একটি রুপোর আধুলি রাখলে যা দাঁড়ায় পৃথিবী থেকে চাঁদের গোলকটি ততই বড়ো। সামান্য অঙ্কের হিসাবে বোঝা যাবে যে পৃথিবী থেকে

চন্দ্রগামী রকেট যদি তার নির্দিষ্ট গতিপথ থেকে মাত্র অর্ধ ডিগ্রির অধিক বিচ্যুত হয় তাহলেই তার চাঁদে পৌছানো সম্ভব হবে না।

1957 সালে প্রথমে সোভিয়েত, তারপরে আমেরিকার বৈজ্ঞানিকরা এই অপূর্ব লক্ষ্যভেদ করেছেন—চন্দ্রজয়ই তার বীর্যশুল্ক—চাঁদে প্রথম মানুষের পদার্পণের দিন আজ আগত।

তাহলেও বহু সমস্যার সমাধান এখনো বাকি। প্রথমত, চাঁদের বুকে মানুষ পাঠাতে হলে ব্যোমযানকে (বা চন্দ্রগামী রকেটকে) ধীরে ধীরে অবতরণ করতে হবে।

পৃথিবী ও চাঁদ আসলে যেন যুগল গ্রহ; প্রথমটির ভর দ্বিতীয়টির অপেক্ষা 81 গুণ বেশি। তাহলে পৃথিবী-চাঁদের মধ্যবর্তী 2,40,000 মাইলের মধ্যে 10 ভাগের 9 ভাগ, অর্থাৎ 2,16,000 পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের আওতায় পড়ে, আর শেষ 10 ভাগের 1 ভাগ, অর্থাৎ 24,000 মাইল পড়ে চাঁদের মাধ্যাকর্ষণের আধিপত্যে। মনে করা যেতে পারে যে, পৃথিবী থেকে চাঁদে যাওয়া যেন একটি ন'শ ফুট উঁচু পাহাড়ের শীর্ষে উঠে অপরদিকে মাত্র এক শ' ফুট নামা।

পঁচিশ হাজার মাইল গতিবেগে যাত্রা করতে পারলে পাহাড়ের শীর্ষদেশকে (যেখানে পৃথিবী ও চাঁদের পারস্পরিক মাধ্যাকর্ষণ একে অপরকে নাকচ করে দিচ্ছে—এই পয়েন্টটির আসলে অস্তিত্ব অঙ্কের হিসাবেই আছে, কারণ প্রতি মুহূর্তেই পৃথিবী-চাঁদের অবস্থান বদলে যাচ্ছে) কোনোরকমে অতিক্রম করে তারপর ঢালু পথে চাঁদের জমির দিকে ব্যোমযান পড়তে থাকবে। একেবারে শীর্ষদেশ থেকে অবাধে চাঁদের জমিতে অবতরণ করলে চাঁদের জমিতে আছড়ে পড়বে ঘণ্টায় 5,250 মাইল বেগে।

তাহলে এই একই 5,250 মাইল গতিবেগ লাগবে চাঁদের টানকে কাটিয়ে মহাকাশে ফিরে আসতে এবং পৃথিবীতে নিরাপদে অবতরণ করতে লাগবে আরো ঘণ্টায় 25,000 মাইল গতিবেগ। তাহলে সর্বসাকুল্যে গতিবেগের প্রয়োজন—25,000+25,000+5,250+5,250=60,500। আরো কিছু বাড়তি হাতে রাখা দরকার, অর্থাৎ চন্দ্রগামী ব্যোমযানকে সর্বসাকুল্যে প্রায় সত্তর হাজার মাইল গতিবেগ তৈরী করার মতো রকেট চালাবার জ্বালানী ভরে নিতে হবে। মনে রাখা দরকার, কোনো এক সময়ে এতো বেশি গতিবেগের দরকার নেই।

আমাদের রোজকার একটা সাধারণ অভিজ্ঞতার কথা ধরা যাক।

কলকাতা থেকে দিল্লী যাব—কিন্তু এমন কোনো রেলওয়ে ইঞ্জিন বা মোটরগাড়ি তৈরি করা সম্ভব নয় যে, সোজা নিয়ে যেতে যত জালানী (অর্থাৎ রেলওয়ে ইঞ্জিনের জন্ত কয়লা ও জল, মোটরের জন্ত পেট্রোল) দরকার সব তার কয়লার গাড়িতে বা পেট্রোল ট্যাঙ্কে ভরে নিয়ে যেতে পারে। অতএব কি করা হয় ? মাঝপথে, যেমন আসানসোল, মোগলসরাই, এলাহাবাদ ইত্যাদি রেলওয়ে স্টেশনে আমাদের দিল্লী যাবার প্রয়োজনীয় জালানী ভরে নি।

চাঁদে যেতেও ঠিক তাই করব। পৃথিবী আর চাঁদের মধ্যে কোনো-এক জায়গায় একটা স্টেশন তৈরি করে সেখানে জালানী মজুদ রাখব। তারপর পৃথিবী থেকে সেই মহাকাশ স্টেশনে গিয়ে সেখান থেকে আবার নতুন করে জালানী ভরে চাঁদে পৌছব, নিরাপদে চাঁদে অবতরণ করব এবং আবার পৃথিবীতে ফিরে আসব।

মহাকাশ স্টেশন

ব্যাপারটা অবশ্ত বেশ জটিল, তবু পৃথিবীর টানে যদি একটি কৃত্রিম উপগ্রহকে একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করাতে পারি, তাহলে একই কক্ষপথে একটি স্টেশনের অংশবিশেষকে ছুঁড়ে দিয়ে তারপর তাদের জুড়ে জুড়ে স্টেশন তৈরি করা নিশ্চয়ই অসম্ভব নয়।

অবশ্তই এই জোড়বার কাজটা করতে হবে মানুষকে, মহাকাশের বুকে, তার ব্যোমযান থেকে বেরিয়ে এসে। সম্প্রতি সোভিয়েতের লিওনভ ও আমেরিকার হোয়াইট ঠিক এই কাজটিই সম্পন্ন করে আমাদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করেছেন।

মহাকাশ স্টেশন কোথায়, অর্থাৎ কোন কক্ষপথে স্থাপিত হবে—তা এখনও স্থির করা, আমরা যতদূর জানি, সম্ভব হয় নি। বেশ কয়েক বছর আগে ওয়েরনার ভন ব্রাউন হিসাব করেছিলেন যে, পৃথিবী থেকে 1,075 মাইল দূরে, ঘণ্টায় 15,560 মাইল বেগে প্রতি দুই ঘণ্টায় একেবারে গোলাকার কক্ষপথে স্টেশন স্থাপন করা যায়।

কিন্তু আমরা পূর্বে যে তেজঃক্রিয় বলয়ের (আমেরিকার বৈজ্ঞানিক ভ্যান এলেন আবিষ্কৃত) কথা বলেছি, এক হাজার পঁচাত্তর মাইল দূরে এই স্টেশনটি সেই প্রথম বলয়ের বেশ নিকটে অবস্থিত হবে। সেটা বিশেষ বিপদের কথা। হয়তো দুই মেরুদেশ জুড়ে পৃথিবীর ব্যাসের তলে করা যেতে পারে। মনে রাখা

দরকার যে, যে-কোনো কৃত্রিম উপগ্রহ তথা স্টেশনকে যে উপবৃত্তের আকারে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে হবে তার একটি কেন্দ্র হবে পৃথিবীরই কেন্দ্র অর্থাৎ তার কক্ষপথকে পৃথিবীর বৃহৎ বৃত্তকে (plane of the great circle) ভেদ করে প্রদক্ষিণ করতে হবে।

এই মহাকাশ স্টেশন কালে কেবল জ্বালানী ভরে দেবার কাজেই ব্যবহৃত হবে না, মানুষের বাসোপযোগী করে তোলা যাবে। সেখান থেকে পৃথিবীকে পর্যবেক্ষণের অভূতপূর্ব সুবিধা হবে।

হয়তো প্রথম চন্দ্র অভিযানে আমরা চাঁদের বুকে না নেমে চাঁদকে পরিক্রমা করে চলে আসতে পারি। কারণ আমেরিকান রকেটের সাহায্যে চাঁদের জমির যে-সমস্ত ছবি তোলা হয়েছে, তাতে চাঁদে নামবার উপযুক্ত শক্ত জমি পাওয়া যাবে কি না তা আমরা এখনও জানি না। চাঁদে কোনো বায়ুমণ্ডল নেই, কাজেই উল্কাপিণ্ডগুলি সরাসরি চাঁদের জমিতে আছড়ে পড়ে। যুগযুগান্ত ধরে চাঁদের বুকে হয়তো উল্কাপিণ্ডের ছাই জমে রয়েছে, যাতে আমাদের ব্যোমযান চোরাবালির মধ্যে তলিয়ে যাবে।

চাঁদে কেন যাব ?

চাঁদ অবশ্য আছে বলেই আমরা যেতে চাই—অজানাকে জানবার আমাদের অদম্য কৌতূহল। ঠিক এই জবাবটিই এভারেস্টের শহীদ ম্যালোরি দিয়েছিলেন 1924 সালে, যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—এভারেস্ট গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করতে চাও কেন ?

কিন্তু শুধু কৌতূহল নয়—চাঁদ যেন আমাদের আদিম পৃথিবী; তার কোনো বায়ুমণ্ডল নেই বলে বিশেষ কোনো ক্ষয় হয় নি। তাছাড়া চাঁদ থেকে অন্য গ্রহাদি তথা পৃথিবীকে পর্যবেক্ষণেরও অভূতপূর্ব সুযোগ। হয়তো চাঁদে কোনো ভাইরাস জাতীয় প্রাণেরও সন্ধান পাওয়া যেতে পারে এবং তাহলে প্রাণের উৎপত্তির নিবিড় রহস্যের সমাধানের চাবিকাঠি পাওয়া যাবে।

একমাত্র মানুষের শুভবুদ্ধি যদি জাগ্রত থাকে, পৃথিবীকে সে যদি ধ্বংসের দিকে না ঠেলে দেয় তো আগামী বছর দশেকের মধ্যেই আমরা চাঁদে পাড়ি জমাচ্ছি। আর সেটা হবেই, কারণ "মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব।"

দেবেশ রায়

যযাতি

(পূর্বানুবৃত্তি)

মনোমোহনবাবুর তখনকার মানসিকতার স্বরূপ নিয়ে আমি যে এতো ভাবছি,—আমি যে মনোমোহনবাবুকে অতিশয় ধূর্ত, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও নিষ্ঠুর মনে করি, আমি যে অনুমান করি মনোমোহনবাবুর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামলে খোকা গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যেত—মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়—এগুলো বোধহয় ঠিক নয়। মনোমোহনবাবু সম্পর্কে এত কিছু ভাবার প্রাথমিক কারণ—তিনি আমাকেই বেছে নিয়েছিলেন। এর পেছনে তাঁর চরিত্রজ্ঞান আবিষ্কার করে আমি খুশি হই। এমনও তো হতে পারে চরিত্রজ্ঞানের ব্যাপার-স্যাপার কিস্সু নেই। আর সবাই অফিসের পুরনো লোক, মনোমোহনবাবু সবাইকে জানেন। আমি নতুন লোক, অনভিজ্ঞ, ফলে আমাকে নিয়ে সুবিধে হবে ভেবেছিলেন। আমি অ্যাকাউন্টাণ্ট, সুতরাং আমাকে দিয়েই এ-কাজ করানোর সবচেয়ে সুবিধে। মনোমোহন-বাবুর পক্ষে অতি সুবিধাজনক কতকগুলি বিষয়ের সঙ্গে আমি মিশে গিয়েছিলাম, সবাইকে ছেড়ে আমার দিকে তাঁর নজর পড়েছিল। এ থেকে একটা জিনিস প্রমাণ হয় যে মনোমোহনবাবু নিজের সুবিধে বোঝেন। আমার শ্রীমান্ ব্যতীত সেটা তো পৃথিবীর সবাই-ই বোঝেন। মনোমোহনবাবুর চরিত্র সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত যদি মেনে নিতে হয় তাহলে আমার নিজের সম্পর্কে আবার একটা সিদ্ধান্ত নিতে হয়—যে, মনোমোহনবাবু যেটা নিজের পক্ষে সুবিধাজনক বলে করেছিলেন, সেটাকে আমি আমার পক্ষেও সুবিধেজনক করে তুলেছিলাম। তাহলে অবিশ্যি শেষ পর্যন্ত ঐ একই বিষয় প্রমাণ হয় —আমি আমার সুবিধে বুঝি। এবং সেটা কিছু ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু মনোমোহনবাবু ও আমার নিজের সম্পর্কে এই দুই সিদ্ধান্ত মিলে অন্য একদিকে ইঙ্গিত করে। তবে কি আমি যে নিজেকে খুব নির্মম শক্তি হিশেবে কল্পনা করি ও মনোমোহনবাবুকে নির্মমতর শক্তি হিশেবে—সে সবই অর্থহীন। আসলে নির্মম খোকা, সে নিষ্ঠুর ও কঠিন।

এত কিছু জানার দরকারটা কি। হায়রে, হাতাতে খোকা ঐ বিরাট আকাশটাকে নিজের চন্দ্রাতপ করে নিয়েও কি আমার এই চারতলা বাড়ির নিশ্চিন্তিকে বিম্বিত করছে। আমি কি মনে মনে হেরে গেছি বলেই এত বেশি করে মনোমোহনবাবুকে, নিজেকে, খোকাকে যাচাই করছি।

হ্যাঁ, ঘটনাটা তো এই, যে,—ঐ একই পদ্ধতিতে নূতন মেশিনারির অর্ডার যেত, সাপ্লাই আসত, সাপ্লায়ারের বিল আর ম্যানেজারের রিসিট আসত আর টাকা পেমেন্ট হতো—এবং এই চক্রের মধ্যে ফাঁক ছিল শুধু এইটুকু যে নূতন মেশিনারি সত্যি-সত্যি আসত না। কোম্পানি অনেকদিনের পুরনো। বসুপরিবারের সঙ্গে কোম্পানিটার যোগাযোগ দুই পুরুষ ছাড়িয়ে তিন পুরুষে পড়ছে। ম্যানেজারের সঙ্গে মনোমোহনবাবুদের পরিবারিক সম্পর্ক—নায়েবদের সঙ্গে জমিদারদের যেমন। সুতরাং, মনোমোহনবাবুই যখন ম্যানেজিং ডিরেক্টর, তখন অর্ডার, অর্ডারসাপ্লাই—রসিদ ও পেমেন্ট—এই চক্রটির চংক্রমণে সামান্যতম বাধাও ঘটতো না। ম্যানেজার ও আমি প্রায় সমান সমান অংশ পেতাম। সাপ্লায়ার কোম্পানির যে-মালিকের সঙ্গে মনোমোহনবাবুর ব্যবস্থা ছিল, তিনি কত পেতেন জানি না। মনোমোহনবাবুর টাকার অঙ্কটাও আমার ঠিক জানা ছিল না। মাত্র এক বৎসরের মধ্যে মনোমোহনবাবু ম্যানেজার আর আমার মধ্যে এমন একটা গভীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল—যেখানে কারো দু এক হাজার টাকা বেশি পাওয়া বা না-পাওয়ায়—কিছুই এসে যেত না।

আমাদের তিনজনের এই সৌহার্দ্য শেষদিন পর্যন্ত ছিল। তিনজনের এই বন্ধুত্বকে,—বন্ধুত্ব বলাটা বোধহয় ঠিক নয়, কারণ মনোমোহনবাবুর সঙ্গে বন্ধুত্ব ঠিক গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না,—এই ঘনিষ্ঠতাকে শুধুমাত্র টাকা-পয়সার ব্যাপার বলে ব্যাখ্যা করলে ছোট করা হয়। টাকা-পয়সার ব্যাপার একটা নিশ্চয়ই ছিল, এবং সেটা খুব ছোটখাটো ব্যাপারও ছিল না, কিন্তু সেই হেতু শুধু টাকাপয়সা দিয়ে সম্পর্কটা ব্যাখ্যা করাও বোধহয় যাবে না। যাবে না, যদি সত্য সন্ধান করতে হয়। আমার এই জমিটা যখন কিনি, মনোমোহন-বাবুর সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তিনি নিজে একবার দেখতে চেয়েছিলেন। শেষে একদিন সন্ধ্যাবেলায় এসে দেখলেনও। একটু গলির মধ্যে ও বর্ষার পথে কাদা হবে বলে তাঁর একটু আপত্তিও ছিল। সে আপত্তি যে আমার

ছিল না। তা নয়। আমি ইচ্ছে করেই ওটুকু খারাপ জমি পছন্দ করেছিলাম। ঐটুকু খারাপের জন্যই আমার জমিতে মালিকদের দৃষ্টি যাবে না। বড় রাস্তার উপর হাঁক-ডাক করে জমি কিনতে গেলে প্রথমেই প্রশ্ন উঠত টাকা পেলাম কোত্থেকে। মনোমোহনবাবুকে না বললেও উনিও বিষয়টা বুঝতে পেরেছিলেন। এবং সেইজন্যই এই জায়গাটাই কিনতে বলেছিলেন। এটা কি শুধু আর্থিক সম্পর্কের ব্যাপার? কেউ কি শুধু আর্থিক সম্পর্কের খাতিরে অধীনস্থ একজন- কর্মচারীর জমি পছন্দ করতে যায়। তাছাড়া তখন আমার আর্থিক ক্ষমতা এমন যে জমির জন্য দেয় টাকাটা আমি নিজে থেকেই দিয়ে দিতে পারি। কিন্তু মনোমোহনবাবু আমাকে চট্ করে কিছু করতে নিষেধ করেছিলেন। এবং কয়েকদিন ভেবে বলেছিলেন আমি যাতে জমি কেনার জন্য ধার চেয়ে কোম্পানির কাছে আবেদন করি। তাতে ব্যাপারটায় কোনো লুকোচুরি থাকবে না, ও কোম্পানি কিছু বলতে পারবে না, কিন্তু যদি আমি গোপনে ব্যক্তিগতভাবে কাজটা সেরে ফেলি তবে কোম্পানির কানে কথাটা উঠবেই এবং ঘটনাটায় কিছু ষড়যন্ত্র আবিষ্কারের চেষ্টা হবে।

মনোমোহনবাবুর পরামর্শমতোই মাসিক পঞ্চাশ টাকা কিস্তিতে পরিশোধ্য তিন হাজার টাকার ঋণ আমি কোম্পানির কাছ থেকে নিই। এই ব্যক্তিগত সচেতনতা—এর মূল্য কি অর্থে পরিমাপ করা যায়। এমনকি বেশ কিছুদিন পর যখন আমি এই বাড়ি তুলতে শুরু করি তখন ম্যানেজারবাবু বাগান থেকে কী দিয়েছেন আর কী দেন নি। কখনো এক গাড়ি সিমেন্ট, কখনো লোহার শিক, কখনো শালের খুঁটি, কখনো ফুলের চারা। এতদিন পর আমার মনে নেই এই জিনিসগুলোর জন্য কোনো টাকা আমাদের তিনজনের ব্যবসায় থেকে কাটা হয়েছিল কি না, বা কী ভাবে হয়েছিল। তবু যদ্দূর মনে পড়ছে অধিকাংশই এসেছিল বিনা মূল্যে। আমার যে বাথরুম এত বিখ্যাত সেটা তৈরি হওয়া তো এক মজার কাহিনী। আর হঠাৎ সমস্ত রকম আমদানি কিছুদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। বাড়িটা তখন আমার নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমস্ত ভালো ভালো জিনিস চাই। বাথরুমের মেঝে আর বাথটাব করার জন্য ইটালিয়ান মোজেইক আর পাই না। পাই না তো পাই-ই না। শেষে বাড়ি প্রায় শেষ, অথচ বাথরুমের জন্য সব টাকাটা আটকা পড়ে গেল। শেষে আবার এক বাথরুমের জন্য ম্যানেজারবাবু আর মনোমোহনবাবু কী করলেন আর কী না করলেন। ম্যানেজারবাবু

বাগান থেকে নোট পাঠালেন যে ইনস্পেকশন বাংলোর বাথরুমটা অনেকদিন ধরেই নষ্ট হয়ে গেছে, সেটা সারানো দরকার। মনোমোহনবাবু সেটাকে খুব কড়া সুপারিশ করে বোর্ড-মিটিঙে রাখলেন। ব্যস, খুব বড় অর্ডার স্যাংশন হয়ে গেল। এক মাসের মধ্যে বোম্বাইয়ের কোন্ এক ফার্ম ইটালিয়ান বাথরুম-সামগ্রী বাগানে পাঠিয়ে দিল। বাগান থেকে সেটা আমার বাড়িতে চলে এল। আর আমার অর্ডার দেওয়া ভারতে তৈরি ইটালিয়ান জিনিস আমার বাড়ি থেকে বাগানে চলে গেল।

আমি জানি সমস্ত ঘটনাগুলোকেই অন্যরকম ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। খোকার সঙ্গে সেই চরম কলহ হয়ে যাওয়ার পর থেকে এটা আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। নিজেই একটি ঘটনাকে খোকা কী ভাবে দেখতো সেইভাবে দেখার চেষ্টা করি। এইখানেই কি খোকার জিত। এইজন্যই কি আশ্রয়হীন অন্নহীন সেই যুবকটির সঙ্গে নিজের অজান্তেই আমাকে সওয়ালে নামতে হয়েছে। এই কারণেই কি সেই বিদ্রোহী উদ্ধত পুত্রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজেকে আমার মাঝে মাঝে পরাজিত ঠাহর হয়। অথচ এমন হওয়ার কথা নয়। পুত্র হিশেবে খোকা আমার রক্ত লাভ করেছে। এবং সেই রক্তের প্রবণতাগুলিকে। বিদ্রোহী খোকার বুকের আড়ালেই তো ভোগী গিরিজামোহনের লোভ ছোবল মারবে। তা না করে আমারই বুকের আড়ালে খোকার বৈরাগ্য আমাকে দংশন করে কেন? যেন-বা আমিই খোকার উত্তরাধিকারী। যেন-বা খোকাই পূর্বগামী। অবিশ্যি আমার ভোগবাসনা থেকে খোকা নিষ্কৃতি পায় নি। খোকা প্রায় যৌবনে আমার ভোগের তাড়া রক্তে বহন করেই তো হঠাৎ-হঠাৎ কলকাতা থেকে এখানে ছুটে এসে নীল আকাশের মদ পান করত অথবা বাগানের এধার ওধার ফুলের গাছ বুনে বুনে ভাগ্যচক্র আঁকত। তেমনি খোকার উত্তরাধিকার থেকেও আমার পরিত্রাণ নেই। হা রে উত্তরাধিকার— যখন পুত্রের উত্তর পিতা, যখন পিতা পুত্রের ভারবাহী।

আমি জানি ঘটনাগুলোকে এ-ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় আমি যখন জমি কিনতে চাইলাম, মনোমোহনবাবু এই ভেবে খুশি হলেন যে, যে-টাকা আমি উপার্জন করছি সেটা বিনিয়োগের প্রশ্নও আমার মাথায় আছে, নিজে দেখতে গেলেন এই কারণে যে জমি কেনা সংক্রান্ত কোনো ফাঁক দিয়ে যদি ম্যানেজার-আমি-মনোমোহনবাবু—এই চক্রের রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়ে

তবে সেটা মনোমোহনবাবুর পক্ষেও মারাত্মক এবং এই বিবেচনা থেকেই কোম্পানিতে ধার চাইবার পরামর্শদান। আমি জানি এই রকম বৈষয়িক ব্যাখ্যার বদলে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও করা চলে যে মনোমোহনবাবুর মাথায় তখনই ছিল তিনি আমাকে দিয়ে কোম্পানির শেয়ার কেনাবেন, ও ধীরে ধীরে আমাকে ডিরেক্টর-বোর্ডে ঢোকাবেন, তাই জমি কিনিয়ে, বাড়ি তুলিয়ে তিনি আমাকে ডিরেক্টর হবার উপযুক্ত বাস্তব পরিস্থিতির সৃষ্টি করছিলেন। মনোমোহনবাবু আমাকে রক্তের স্বাদ দিচ্ছিলেন যাতে আমি রক্তছাড়া বাঁচতে না-পারি এবং আরো রক্ত-আরো রক্ত করে ধীরে ধীরে জটিলতা থেকে জটিলতায় প্রবেশ করে যেতে পারি—এমন ব্যাখ্যাও যে করা চলে আমি জানি। জানি—এই পর্যন্তই। জানি এই ব্যাখ্যাগুলোর কোনো-কোনো অংশ সম্পূর্ণ সত্যও হতে পারে—এই পর্যন্তই। জানা-র কী নিদারুণ মূল্য। সাধে কি য়িহুদি পুরাণে জ্ঞানবৃক্ষের ফলের কথা বলা হয়েছে। ভারতীয় মতে বয়স আমার অবিশ্যি বৈরাগ্যেরই। তাই বোধহয় এখন স্বোপার্জিত ভোগ্যদ্রব্যে নিমজ্জিত থেকেও এমন উদাসীন প্রশ্ন নিজের কাছেই উত্থাপন করে ফেলি—জানা, তার বেশি মানুষ কিছু করতে পারে না, অথচ সত্যকে জানতে হয়, এ-ই-ই মানুষের নিয়তি। সত্যের মুখ আবৃত হতো যদি, আর যদি সত্যকে না জানতে হতো! জ্ঞান মানুষের অভিশাপ। সত্য মানুষের নিয়তি।

আমাকে দিয়ে মনোমোহনবাবু যখন প্রথম শেয়ার কেনানো শুরু করলেন—আমি জানতাম আমার শেয়ার কেনা আসলে মনোমোহনবাবুরই কেনা, আসলে এটা আমার হাত দিয়ে মনোমোহনবাবুর জুয়ো খেলা। তাদের পুরনো পরিবারে এমন সংখ্যক শেয়ার ছড়িয়ে ছিল যেগুলো একত্রে একজনকে ডিরেক্টর করে দিতে পারে। তাদের সম্মিলিত শক্তির দৌলতেই তো মনোমোহনবাবু ম্যানেজিং ডিরেক্টর। অথচ পরিবার থেকে শেয়ারগুলো ক্রমাগতই বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে, কখনো মনোমোহনবাবুর জ্ঞাতসারে, অধিকাংশ সময়ই অজ্ঞাতসারে। নগদ টাকা হাতে নিয়ে সেই অবাঙালি ব্যবসায়ী মনোমোহনবাবুদের পরিবারের শেয়ারগুলোর আশেপাশেই ঘোরাঘুরি করছিলেন। মনোমোহনবাবুর হাতে এমন টাকা নেই যে সব শেয়ার কিনে নেবেন। আর তিনি স্বনামে শেয়ার কিনতে আরম্ভ করলে সেই অবাঙালি ব্যবসায়ীও স্বনামে শেয়ার কিনতে আরম্ভ করবেন অধিকতর দাম দিয়ে।

তাঁর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার মতো আর্থিক ক্ষমতা মনোমোহনবাবুর ছিল না। সুতরাং আমার মতো আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ অথচ দূরদৃষ্টিতে ধূর্ত একটি লোকের প্রয়োজন ছিল। শেয়ার কেনার ব্যাপারে মনোমোহনবাবু যখন আমাকে প্রথম বলেছিলেন তখন আমার বাড়ি তোলা প্রায় শেষ। আর্থিক বা মানসিক কোনো দিক থেকেই আমি তৈরি ছিলাম না। এত টাকা নিয়ে শেয়ার কেনার মতো এত দায়িত্বসম্পন্ন কাজে ঢুকতে গেলে যে মানসিক ধৈর্য দরকার, তখন আমার তা ছিল না। বাড়িটা উঠে গেছে, কিছুদিন পর গৃহপ্রবেশ করব—এই সব নিয়েই তখন আমার মাথা ভর্তি। কিন্তু দু-চারদিনের মধ্যেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম—সেবারের জেনারেল মিটিংএ মনোমোহনবাবু ডিরেক্টর থাকতে পারবেন না, যদি এই মুহূর্তে বাড়ির যে-শেয়ারগুলো অবাঙালি ব্যবসায়ীটি কিনতে চাইছেন সেগুলো তিনি আটকে না ফেলেন। ব্যাপারটা বুঝে যাওয়ার পর আমার আর না বলার উপায় ছিল না। আমার টাকায় তখন থেকে শুরু হলো মনোমোহনবাবুর ব্যবসায়। আমার সঙ্গে তখনো বাগানের সম্পর্ক ছিল চাকরির-ই। আর শেয়ারের সম্পর্ক ছিল, মনোমোহনবাবু আমাকে খবর পাঠান একটা শেয়ার আছে সংবাদ দিয়ে, প্রথম প্রথম আমি নিজেই টাকা নিয়ে যেতাম, পরের দিকে কারো হাত দিয়ে টাকাটা পাঠিয়ে দিতাম, ট্রান্সফার ডিড সই করিয়ে শেয়ার সার্টিফিকেট আমার কাছে উনি পাঠিয়ে দিতেন। সব শেয়ারগুলোই রেণুর নামে কেনা হচ্ছিল। পর পর কয়েকবারের জেনারেল মিটিঙে প্রক্সি-ফর্ম সই করা ছাড়া রেণুর আর কোনো কাজ ছিল না এবং শেয়ারের টাকা আর প্রক্সি-ফর্ম মনোমোহনবাবুর কাছে পৌঁছে দেয়া ছাড়া আমার আর কোনো কাজ ছিল না। আমাদের কোম্পানি ডিভিডেন্ট যা দিত সে নামমাত্র; তাতে আমার কিছু এসে যেত না।

ঘটনাটার এ-রকম একটা চেহারা ছিল: মেশিন পার্টস, বা ফ্যাক্টরি এক্সটেনশন ইত্যাদি নানাবিধ ছুতোয় মনোমোহনবাবু-ম্যানেজার-আমি টাকা পাচ্ছিলাম এবং বেশ ভালো অঙ্ক; এই টাকাটা আমি পেতাম না যদি মনোমোহনবাবু আমাকে পাইয়ে না দিতেন; আমাকে মনোমোহনবাবু পাইয়ে দিতেন না যদি আমি অ্যাকাউন্ট্যান্ট না হতাম; আমি অ্যাকাউন্ট্যান্ট থাকতে পারতাম না যদি আমি টাকাটা না নিতাম; সুতরাং আমার এই টাকার উপর মনোমোহনবাবুর অধিকার আছে, সুতরাং টাকাটা

কী ভাবে বিনিয়োগ করা হবে সে বিষয়েও তাঁর কিছু বলার অধিকার আছে—প্রথমে জমি ক্রয় তারপর শেয়ার ক্রয়; সুতরাং সেই অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া ছাড়া আমার কিছু করার নেই।—সমস্ত ঘটনাটাকে যদি এইভাবে সাজানো যায়, তাহলে, আমার কেমন ভয় হয়। আমার যেন মনে হয়—একটি বৃত্তে আবদ্ধ কয়েকটি পরস্পরচ্ছেদী সরলরেখার সমাবেশে গঠিত নয়টি কক্ষে আকাশের নয় গ্রহের অবস্থানে রচিত জন্মকুণ্ডলীতে এক-ধরনের আন্বিক অনিবার্যতা যেমন অনিশ্চিত ভবিতব্যের সঙ্গে মিশে যায় তেমনি, ঘটনার এই পরম্পরায় আর সংহতিতে, ঘটনাগুলোর এই কার্যকারণসূত্রে, আর বিন্যাসে, ঘটনাগুলোর এই বেগে আর পরিণতিতে, এমন এক আমি-নিরপেক্ষ অনিবার্যতা আছে, যা, হাজার চেষ্টা করেও আমি ঠেকাতে পারতাম না, যা শত প্রতিরোধ সত্ত্বেও আমি বদলাতে পারতাম না। এই ঘটনার সূচনা, বিকাশ আর পরিণতির সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নিষ্ক্রিয় গ্রাহকের মাত্র। বাঙালি হিন্দু বাড়ির বিয়ের কনের মতো,—বিয়েটা তারই অথচ তারই কিছু করার নেই, ঘুরিয়েও দিচ্ছে আর পাঁচজন। নদীর তটভূমির মতো—নদীর গতি আর পরিণতির সে শুধু বাহকমাত্র। ঘটনার সবটুকুই যে আমার অনুকূলে তা যেমন যুক্তিহীন, তেমনি যুক্তিহীনভাবেই সমস্তটা আমার বিরুদ্ধেও যেতে পারে। গেলও তো তাই শেষ পর্যন্ত। এত বৈভব, এত ঐশ্বর্য নিয়েও তো আমি শেষ অবধি আমার পুত্রের প্রেতাত্মা। এত দূর এসে, এত ঘোরা পথে, এতদিন পরে সমস্ত ঘটনা আমার বিরুদ্ধে চলে গেল। অথচ কী দৈব, ঘটনার কোনো জায়গায় আমার কোনো হস্তক্ষেপ করারও সুযোগ থাকলো না। নিজেকে খুব বেশি নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় কল্পনা করতে পারলে মনে হয়—একদিকে মনোমোহনবাবু আর-একদিকে খোকা আমাকে মাঝখানে রেখে লড়ে গেল। নপুংসক মধ্যস্থতার মূর্তি শিখণ্ডী চিরকালই উপহাস্য। অথচ তার চরিত্রের কারুণ্যটা কেউ কোনোদিন দেখে নি। ঘটনার উপরে তার নিয়ন্ত্রণ অপ্রতিরোধ্য অথচ সমস্ত ঘটনায় তার সক্রিয় ভূমিকাটুকু শুধু নিষ্ক্রিয়তার; শুধু নিষ্ক্রিয়তার। শিখণ্ডীকে দেখে শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের মুখে অর্জুন ভোগবতীকে এনে দেয় তীরের ডগায়,—শিখণ্ডী তখন কুরুক্ষেত্রের অরণ্যে কোথায়? বিশেষত খোকা যেন শেষে আমাকে এটিই জানিয়ে দিয়ে গেছে যে আমি একটা পূর্বনির্ধারিত চক্রের মধ্যে আটক, আমার কোনো ব্যক্তিত্ব নেই, কোনো চরিত্র নেই।

আমার না-হয় নেই, এতদিন জানতাম ব্যক্তিত্ব বা চরিত্র আমার কিছু আছে, আজ জানলাম নেই। তাতে ক্ষতি কি? নিজের সম্পর্কে জন্মসূত্রে কোনো উচ্চবিশ্বাস জন্মাবার সুযোগ আমার ছিল না। কর্মসূত্রেও নিজের কোনো অসামান্য গুণের পরিচয় আমি আবিষ্কার করি নি। ব্যক্তিত্ব, চারিত্র্য, সাহস, বুদ্ধিমত্তা, দৃঢ়তা—সব কিছুই আমার সামনে এক মনোমোহনবাবুর চেহারা ধরে আসতেই অভ্যস্ত। কিন্তু আজ মনে হয় মনোমোহনবাবু আমার চাইতে কিছু এমন বড় নন। জন্মসূত্রে উচ্চবিশ্বাস জন্মাবার সুযোগ তাঁর ছিল। জন্মেও ছিল। সেই উচ্চবিশ্বাসের মর্যাদা রাখবার জন্য ম্যানেজারের সঙ্গে বড় করে তাঁকে চুরির টাকা ভাগাভাগি করতে হয়েছে। এতে কি চারিত্র্য আছে? মর্যাদা রাখবার জন্য সংগ্রামের দুঃসাহসিকতা আছে? জন্মসূত্রেই মনোমোহনবাবু মালিক। মালিকানা রাখার জন্য আমার মতো এক অজ্ঞাতকুলশীলের অর্থ তাঁকে ব্যবহার করতে হয়। এতে কি ব্যক্তিত্ব আছে? এতে কি জন্মগত অধিকার রক্ষার সংগ্রামের মহত্ব আছে। মনোমোহনবাবুর মাত্র একপুরুষ আগে বসু-পরিবারের সেই পাঁচ ভাই দেশের জমিজমা বেচে শিল্পের পত্তন করে কতকগুলি অনিবার্য আত্মিক পরিণতির বীজ বপন করেন। আজ একশত বৎসর পরে সেই পরিণতির ভারবহন করতে হচ্ছে মনোমোহন বসুকে। একপুরুষ আগে নদীবিধৌত পূর্ববঙ্গের নরম মাটি ছেড়ে শিল্প-বাজার আর উৎপাদনের জটিলতায় এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন পাঁচ বসু,—সেই আশ্রয়ের ঋণ রক্তে বহন করে মনোমোহন বসু সেই শিল্পের উপর অর্পিত। একে ভবিতব্য বলবো না তো কী বলবো। একশ বৎসর আগে নির্ধারিত হয়েছিল একশত বৎসর পরে মনোমোহন বসু কী হবেন। আমি কোন্ ছার। কার্য-কারণের এই বারিধিতে স্বয়ং মনোমোহন বসুই যে এক বুদ্বুদ!

আমি ঠিক জানি না খোকার অভিযোগটা কি? সঠিক জানি না বলেই বা খোকা সঠিক বলে যায় নি বলেই, আমি এখন আমার অতীতের সব কিছুকেই নানাভাবে নাড়াচাড়া করে দেখি। বাগানে খোকা ফুলগাছ বুনে গেছে, সেই ফুলে ফুলে খোকার কোনো ইঙ্গিত পড়তে চাই। যাতে আমার সমস্ত জীবনটাই আমার কাছে প্রশ্ন হয়ে দেখা দেয়—সেজন্যই কি খোকা কিছু পরিষ্কার করে গেল না, কেন সে এই বাড়ির প্রতিটি ইঁটকে পাপ মনে করে, কেন সে এ-বাড়ির প্রতিটি খুদের কণাকে পাপ মনে করে।,

পাপ পাপ, খোকা শুধু বিকার দিয়ে বলে গেল, পাপ, পাপ। আর আমি তোর বুড়ো বাপ ষাট বৎসরের বার্ধক্যের শয্যায় সেই পাপ খুঁজে বেড়াই। লজ্জা।

পাপ কথাটা খোকার মাথায় ঢুকলো কবে? সুন্দর চেহারা আর স্বাস্থ্য নিয়ে যৌবনের শুরুতে তো দিব্যি সুখের সন্ধানেই বেরিয়েছিল। একবার কী একটা কাজে একেবারে হঠাৎ আমাকে কলকাতা যেতে হয়েছে। খোকাকে টেলিগ্রাম করেছিলাম, সেটা পৌঁচেছিল আমি পৌঁছনর পর। খোকাব হস্টেলে দেখা করতে গিয়ে অপ্রস্তুতের একশেষ। দেখি খোকার চৌকিতে একটি মেয়ে শুয়ে শুয়ে বই পড়ছে, আমি ঢোকাতে মেয়েটি প্রথমে চোখ থেকে বই সরাল, তার পর উঠে বসলো, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইল। আমি খোকার নাম করতেই বললো—খোকা নাকি নিচে চা খাবার আনতে গেছে। তারপর আমাকে বসতে বলল। আমি খোকার বাবা এটা জানিয়ে আমি আসন নিয়েছিলাম। খোকা আসা পর্যন্ত মেয়েটির সঙ্গে কথা বলে জেনেছিলাম ওরা একই সঙ্গে পড়ে—ইত্যাদি। সিঁড়ি দিয়ে খোকা উঠে আসছিল, আমি জুতোর শব্দেই বুঝতে পারছিলাম। ঘরে ঢুকে আমাকে দেখে ও এত অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল যে আমারও হঠাৎ মনে হয়েছিল খবর না দিয়ে খোকার হস্টেলে আসা ঠিক হয় নি। মেয়েটিকে দেখে আমার খুব ভালো লেগেছিল। চমৎকার ফিগার। সুন্দর স্বাস্থ্য। নাকমুখ অবাঙালিসুলভ। খোকা সম্বন্ধে খানিকটা স্বস্তি নিয়েই সেবার কলকাতা থেকে ফিরেছিলাম। খোকার রূপে যৌবন এসেছে, খোকা ভোগের স্বাদ পেয়েছে। সেই যৌবনের তাপে আর ভোগের ছাঁচে আমার উত্তরাধিকারী গঠিত হচ্ছিল। এইজন্যই বোধহয় কোনো পুত্র আঠার বছর বয়সে বাইরে রাত না কাটালে জমিদারবাবুরা আতঙ্কিত হতেন। এইজন্যই বোধহয় স্বামী প্রতিরাত্রিতে বাড়িতে থাকলে ঊনবিংশ শতকের বাবুদের স্ত্রীগণ লজ্জাবোধ করতেন। খোকা যে নারী আস্বাদে উন্মুখ—এতে আমি আনন্দিত হয়েছিলাম। আমার সম্পদ আমি দৈববলে অর্জন করেছি। কিন্তু খোকা তো আইনবলে অধিকার করবে। সেই সম্পদের অধিকারী যদি ভোগের মন্ত্র না জানে তবে কি পৃথিবীর রূপরসকে আস্বাদ করবার অধিকার ও যোগ্যতা নিয়ে বসে-বসে সে বীজমন্ত্র জপ করবে। আমার বাবা যদি আমাকে এ-হেন অবস্থায় দেখতেন লজ্জায়-ঘৃণায় তিনি কপালে

করাঘাত করতেন। কয়েক বিঘে ভূ-সম্পত্তির মালিক আমার নেহাত সাদাসিধে পিতার পক্ষে পুত্রের নারীবাসনার খরচ যোগানো মুশকিল হত! খোকা নাকি ওর মার কাছে বলত, যে, কলেজে ওর চেনাজানা ছেলেরা ওকে প্রিন্স বলে ডাকে। ওর মা আমাকে বলত। শুনে আমি আরো নিশ্চিত হয়েছি। প্রিন্স নামটি খোকা বেশ ভালোবাসে। বাসুক, খোকা ভালোবাসুক। আমি ভাবতাম।

আজ মনে হয়—এত উগ্র ভোগবাসনার পেছনে একটা খুব কঠিন বিপরীত তাড়া—অস্বীকার করবার তাগিদ ছিল কি? বলিদানের বাজ একটু উচ্চনাদী হয়—নইলে পাঁঠার চিৎকারে গগন ফাটে। খোকা কি এত হৈ-চৈ করে যৌবনের দাবদাহ লাগিয়েছিল—কোনো-একটা আর্তনাদকে চাপা দেবার জন্য। মদ তো খোকা খেতই, থাক, ভালোই। মেয়েদের ব্যাপার-স্যাপারও ছিল—থাক, ভালোই। আমার নিজের অনুমান খোকা ক্লাশের বা কলেজের মেয়েদের সঙ্গে একটু ফষ্টি-নষ্টি করেই ক্ষান্ত হতো না—ও গণিকা-পল্লীতে যাতায়াত করত, এবং শেষদিকে ওটা মোটামুটি নিয়মিত অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কলকাতা থেকে শ্রান্ত খোকা মাঝে-মাঝে ওর মার কাছে আসতো—আমি দেখেছি—তখন ওর সমস্ত তারুণ্যের মধ্যেও একটু বয়স্কতা ছিল। খোকা প্রাণপণ করে এটুকু প্রমাণের জন্য যে উঠে পড়ে লেগেছিল যে ও আমার জ্যেষ্ঠ সন্তান, এই সম্পত্তির অধিকারী। এমন অভ্যাস ও অর্জন করতে চেষ্টা করছিল যাতে এই সম্পত্তির উপর নির্ভরতা অনিবার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু খোকার এত চেষ্টা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত নিজের মুখে থুতু ছিটিয়ে, নিজের বুকে লাথি মেরে, সেই ভোগের দরিয়াতে পাল খাটিয়ে হৈ-হৈ করতে-করতে খোকা উজানে চলে গেল। সেই বিপরীত টানই খোকার জীবনের মৌলিক টান। দ্বিতীয়বার বিয়ে করেও গৌরাঙ্গকে সন্ন্যাস নিতে হয়েছিল।—আবার ঘুরে-ফিরে সেই নিয়তির কথাই আসে। খোকা চেয়েছিল ভোগকে তার জীবনের নিয়তি করতে। খোকা বুঝেছিল নিয়তির দাস তাকে হতেই হবে। হতে যখন হবেই—নিয়তি ভোগের রূপ ধরে আসত। সে সাধনায় যদি খোকা সিদ্ধিলাভ করত তাহলে ভোগ-ই খোকার জীবনে অনিবার্য হয়ে উঠত। সে তো হলোই না, সব কিছুর আড়ালে খোকার নিয়তি অস্ত্র শানাচ্ছিল, হঠাৎ একদিন বেরিয়ে এসে খোকাকে বৈরাগী করে

নিয়ে চলে গেল আর যাওয়ার আগে আমার মুখে থুতু ছিটিয়ে চলে গেল পাপ—পাপ।

খোকা আমাকে পাপী ঠাহরাল কোত্থেকে। শরীরের রক্তপ্রবাহকে পাপের রক্ত মনে করলো কোত্থেকে। নিজের জন্মকে পাপের জন্ম ভাবলো কোত্থেকে।—এত করেও খোকা যখন এই পাপবোধ অস্বীকার করতে পারলো না, এত চেষ্টার পরও যখন এই পাপবোধই খোকার রক্তে আপন প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারলো, অনুকূলস্রোতে কিছুদূর চালনার পর পাপে বোঝাই সেই তরণীটিকে খোকা যখন বিপরীত দিকে বাইতে শুরু করে ঝড় থেকে ঝড়ে, ঘূর্ণি থেকে ঘূর্ণিতেই টেনে নিয়ে গেল—তখন আর সামান্য সন্দেহেরও অবকাশ রইল না যে এই পাপবোধই খোকার মৌলিক প্রাণাবেগ, পাপলগ্নেই খোকার জন্ম, পাপরাশিতেই খোকার চংক্রমণ। কিন্তু খোকার এই পাপবোধের উৎস কোথায়? কোথায় সেই গঙ্গোত্রী যা থেকে শুধুই পাপ, শুধুই পাপ, শুধুই পাপ উৎসারিত হয়ে-হয়ে খোকার জীবনকে পাপময় করে তুলেছে। আমি জানি না। আমি খোকার পিতা, আমার ঔরস খোকার দেহনির্মাণ করেছে, আমার রক্তরচিত দেহরসসঞ্জাত খোকার দেহ ও দেহস্থিত আত্মা, অথচ, ঈশ্বর, আমি জানি না খোকার মৌলিক প্রাণাবেগ এই পাপবোধের উৎস কোথায়?

যেদিন এ-বাড়ি ছেড়ে চলে গেল, সেদিন এত উত্তেজনার মধ্যেও, এত ঘটনার পরও, নেহাত অপ্রাসঙ্গিকভাবেই খোকা ঠাকুরঘরে ঢুকেছিল। ঠাকুরঘরের দরজার কাছে খুকুই না কি কে দাঁড়িয়েছিল, তাকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে ভিতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে মিনিট পাঁচ-সাতের মধ্যেই আবার বেরিয়ে এসে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে হনহন করে সিঁড়ির মুখে গিয়ে শেষবারের মতো ফিরে দাঁড়িয়ে, তার বাহুতে বাঁধা একগাদা সোনার-রূপার তাগাতাবিজ দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে আর আঙুলে যে-কয়েকটা আংটি ছিল, খুলে, সবগুলো একে-একে ঢিলের মতো করে সমস্ত জোর দিয়ে আমাদের দিকে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে মেরেছিল। আমাদের এতগুলো লোকের সঙ্গে একলা পেরে না উঠে খোকা ঐগুলি ছুঁড়ে আমাদের আহত করতে চেয়েছিল। সম্ভবত আমাকেই মারতে চেয়েছিল। পরে ঠাকুরঘরে ঢুকে দেখেছিলাম সিংহাসন থেকে ঠাকুর উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। খোকা যে সমস্ত সিংহাসনটাতেই লাথি মেরেছিল—এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

আজ খোকার পাপবোধের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে মাঝেমাঝেই এই ঘটনাটা আমার মনে আসে কেন? অত ঝগড়া-মারামারির পর ঠাকুরঘরে ঢোকা আর বিশেষত সব তাগাতাবিজ আর রত্নআংটি ছুঁড়ে দেয়া—এ-দুটির পেছনে যেন অনেকদিনের চিন্তাভাবনা আছে মনে হয়। যেন খোকা তার প্রধানতম শত্রুকে আক্রমণ করে, তবে এ-বাড়ি ছেড়ে গেছে। পুজো-আচ্চার আবহাওয়ায় খোকা প্রায় আবাল্য লালিত। দৈববিশ্বাস আমার পারিবারিক আবহাওয়ায়। ঠিক এই দুটোকে বেছে-বেছে খোকা আক্রমণ করলো কেন। খোকা কি গঙ্গাজলের গৈরিকে খুন লোপাটের রক্তচিহ্ন আবিষ্কার করেছিল? নিত্যপূজার ফুলের গন্ধে আর চন্দনের সুবাসে আর ধূপের ধোঁয়ায় ভারি দেবগৃহে যেন কোনো আত্মগোপনতা আবিষ্কার করেছিল। হে আমার ঈশ্বর, তোমার স্তোত্রেই কি খোকা আমার কণ্ঠস্বরে অপরাধীর স্বীকারোক্তি আবিষ্কার করেছিল। তবে কি ঈশ্বর, তুমিই সেই পাপবোধের উৎস, তুমিই কি খোকার রক্তে নিয়ত-প্রবাহিত পাপকণিকা, খোকার মৌলিক পাপাবেগ, প্রাণাবেগ?

জানি না। বুঝি না। শুধু জানি আযৌবন যে-ঈশ্বরকে বন্দনা করে এসেছি, যে-দৈবকে কররেখা আর জন্মকুণ্ডলীর অঙ্কে অনুমানে ধরে রত্ন-কবচে বন্দী করতে চেয়েছি—এই বার্ধক্যে সেই ঈশ্বর আর দৈব আমার কাছ থেকে খোকা কেড়ে নিয়ে গেল, যাওয়ার সময় লাথি মেরে আমার দেবতাকে সিংহাসনচ্যুত করে গেল। হে ঈশ্বর, তুমিই পাপ? হে দৈব, তুমিই পাপ?

খোকা, কোথায় তুই এই বার্ধক্যে পিতার আশ্রয় হবি, না, নিজেও আশ্রয়ছাড়া হলি, আমাকেও আশ্রয়শূন্যতার বেদনায় ভরিয়ে রেখে গেলি। এই চারতলা বাড়ি, এই এত বড়ো কোম্পানি আর এত নগদ টাকা— এত সব সত্ত্বেও বার বার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে আমার বাড়ির বাগানে খোকার হাতে বোনা ছায়াচ্ছন্ন স্থলপদ্ম—রঙ যার বদলায় না। ঊর্ধ্বরক্তচাপের ভার স্নায়ুতে বহন করে, শেষ রাত্রিতে, এলাচের অবসিত গন্ধলীনা প্রৌঢ়া স্ত্রীর পাশে চোখ খুলে তাকিয়ে দেখি, জানালায়, বাইরের অর্ধ-অন্ধকারে আমার সাধের পাম ছায়াচ্ছন্ন দাঁড়িয়ে অনিবার্য বজ্রপতনের অপেক্ষায়। মশারির নেট তারায় ভরা আকাশকে কলঙ্কিত করে। ছাতের উপর জলের ড্রামে উষালগ্নে গঙ্গা আসেন কলনাদে। বাইরেব শেষ অন্ধকারে খোকার

গোপাল হালদার

রূপনারানের কূলে

(পূর্বানুবৃত্তি)

কলিকাতার কোলাহলে

কলেজে এলাম—নোয়াখালি থেকে এলাম কলকাতা (১৯১৮)। কলকাতা কিন্তু আমার কাছে তেমন আজব শহর ঠেকল না। কলকাতা তখন পর্যন্ত আবর্জনার শহর নয়। মিছিলের শহরও নয়,—মরতে-বসা শহরও নয়। কলকাতার তখনো রূপ ছিল, আর সে রূপ মনেও লেগেছিল। কিন্তু চোখে রঙ লাগে নি। তখনো না এখনো না। কলকাতারও মোহ আছে—তা কি আর আমার অজানা? কিন্তু সে বিস্ময়ের মোহ নয়। অপরিচয়ের রোমান্টিক রস বরং অনেক পরে বোম্বাইতে পেয়েছি—সত্যই বোম্বাই শুধু 'বোম্বেটে' ফিল্মের স্থান নয়। সে মুম্বই—মোহিনী। প্রথম দর্শনেও তার প্রেমে পড়া যায়—হয়তো বেশি পরিচয়ে সে প্রেম উবে যেতে পারে, কে জানে? কিন্তু কলকাতাকে সুন্দরী বলা তখনো দুঃসাধ্য ছিল। মোহিনী তো নয়ই। তার রূপ যা তা একটু-একটু করে আবিষ্কার করতে হয়। হয়তো ছাদে দাঁড়িয়ে আকাশে-মেলানো বাড়ির সঙ্গে আকাশের আর সূর্যালোকের খেলা দেখতে দেখতে, হয়তো আউটরাম ঘাটে বসে বসে, বা ইডেন গার্ডেন্‌স ছাড়িয়ে আরও দক্ষিণে সূর্যাস্তের গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে;—কিংবা সদর স্ট্রিটের মতো আরো কতখানে, তা এখানে নাই-বা বললাম। প্রেসিডেন্সি জেলের গরাদের ফাঁকে দেখা-ক্লাউএর মাথায় পূর্ণিমার চাঁদ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কলকাতা, অথবা থানার লক্ আপের মধ্যে আবদ্ধ বসে শোনা—গর্জমান ট্রাফিকের আর্তনাদের অন্তরালে সেই শত দিনের শোনা ফেরিওয়ালার ক্লান্ত ডাকে বিষণ্ণ কলকাতাই কি কম সুন্দরী। আসলে কলকাতা সুন্দরী হয় পরিচয়ে—দিনের পর দিন তার রূপ যেন মনের মধ্যে আরও খুলতে থাকে। তখন ক্রমে আড্ডায় আসরে স্বচ্ছন্দ হয়ে ওঠে আলাপ-আলোচনা। মনের মধ্যে জমে বসে কলকাতার আরেক রূপ—সে কলকাতা 'ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল্ বিউটি।' তাকে দেখলে

চলে না, অনুভব করতে হয়। প্রথম দর্শনে আমার কলকাতাকে অদ্ভুত কিছু মনে হয় নি—এখনো না। গ্রামের মানুষের চোখ নিয়ে দু-চোখ বিস্ফারিত করে শহর-দেখা আমার পক্ষে সেই প্রথম দিনও অসম্ভব ছিল। কোলাহলে চমকে উঠি নি। উৎকর্ণ হয়েছি।

অন্য আরও কারণ ছিল। মফঃস্বল থেকে শহরে, স্কুল থেকে কলেজে—সত্যই দৃশ্যান্তর। আর দৃশ্যান্তরের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের পর্বান্তরও। নিজে নিজেই বুঝলাম—কলেজ তো আমার সেই স্কুল নয়। কলকাতাও নোয়াখালি নয়। আমার দুরন্তপনা, সেই ডাব চুরি, সেই অশান্ত কৈশোরের দুষ্টোমি, পাকামি, তারুণ্যের স্বতঃউৎসারিত অদম্য উৎসাহ, দুর্দান্ত আচরণ—সব কিছুই সেখানে তাদের এক অশান্ত ছেলের দস্যিপনা। সস্নেহ শাসনে তা সেখানে মার্জনীয়। এখানে আমার বিচার হবে নিঃসম্পর্কিতের স্নেহহীন চক্ষে। এই বোধের ফল ফলল। যে-ছেলে চঞ্চল দুরন্ত, আলাপ আচরণে অকুণ্ঠিত, চলা-ফেরায় স্বচ্ছন্দ,—এবার একই দিনে সে হয়ে পড়ল দেখা-সাক্ষাতে 'ভীতু', আলাপ-পরিচয়ে সংকুচিত, বেমানানো রকমের shy বা অস্বচ্ছন্দ। অবশ্য পরিচিত বন্ধুগোষ্ঠী ফিরে পেলে আবার দ্বিগুণ উৎসাহে মাতে গল্পে-উৎসাহে, আড্ডায়-আলোচনায়। কিন্তু নতুনের দেউড়ীটা সহজে পার হতে আর পারে না। এ পরিবর্তনটা বয়সেরও গুণ হতে পারে—যখন কৈশোর-যৌবন দুই মিলে গেল, সেই তারুণ্যের ধর্ম। দৃশ্যান্তর হয়তো তার বাইরের কারণ। কিংবা, আরও গোড়ার কারণও থাকতে পারে—সেই 'তিন থেকে সাতের' মধ্যেকার ব্যক্তিত্ব-নিয়ামক পরিস্থিতি, দেহ মনে নিজের উপর আস্থা যাতে দৃঢ় হতে পারে নি। অথবা, হয়তো সব কয়টাই তার কারণ। মোটের উপর এসে গেল একটা অস্বচ্ছন্দ সচেতনতা (uneasy self consciousness)। নিজেকে বাইরে থেকে কুণ্ঠিত করাই তার লক্ষণ। একটা পর্বান্তর হল।

শুধু আমাকে নিয়েই 'আমি' নয়। দেশ ও কালও তো আছে। তখন ১৯১৮ সালের মধ্যভাগ—মহাযুদ্ধ শেষ হয় নি। রুশ বিপ্লব অবশ্য কয়েক মাস আগেই ঘটেছে। বুঝতে চাইলেও তার স্বরূপ বুঝতে পারছি না। রুশিয়ায় জারের পতনে খুশী হলাম। ধনী দরিদ্রে সাম্য স্থাপিত হচ্ছে,—আরও খুশী হয়েছি তা পড়ে। দেখতে না দেখতে জার সাম্রাজ্যের মতো জার্মান সাম্রাজ্য ও অষ্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান্ সাম্রাজ্যও ভেঙে পড়ল। খুশীর আরও কারণ তা। তারপরে ভার্সেইতে গড়া চলল একদিকে 'লীগ অব নেশনস্' (রবীন্দ্রনাথ যাকে বললেন 'ক্লিক্ অব্

রবার্স') আর অন্ত দিকে ফরাসী-ইংরেজে পৃথিবী গ্রাসের ষড়যন্ত্র। পশ্চিমের সমুদ্র-মন্থনে বিষ ও অমৃত দুই উঠছিল। প্রাচ্যের ভাগ্যেও জুটছিল। তবে অমৃতের থেকে বিষের ভাগটাই বেশি। আমাদের দেশে যুদ্ধের মধ্যেই এসেছিল 'যুদ্ধজ্বর' বা ইনফ্লুয়েঞ্জা। যুদ্ধশেষে পাঞ্জাবের অত্যাচার ও জালিয়ানাবাগ, ডায়ার, ও' ডায়ারের তাণ্ডবলীলা। দেখতে না দেখতে স্বরাজ সমস্ত ভারতের সাধনা হল। তার পিছনেই দেখা দিল হিন্দু-মুসলমানের অমীমাংসিত সমস্যা।

ইতিহাসে যে-কালান্তর আরম্ভ হয়েছিল, এসবের মধ্য দিয়ে তা প্রতিদিনই দুর্বার হয়ে উঠল; তা থেকে কি কারও নিষ্কৃতি আছে? আমি না হয় পালাতে পারলেই বাঁচি। কিন্তু পালাবই বা কতক্ষণ? এক-একবার চঞ্চল হয়ে উঠতে হত দেশ ও কালের ঘাত-প্রতিঘাতে। আবার ফিরে আসতাম নিজের কোটরে, সেখানে বন্ধুগোষ্ঠীতে অসংকোচে বসতাম জমে। সেখান থেকেও বসে দেখতাম দেশে কালে চলেছে আবর্তন। কালান্তরের পরীক্ষায় বেরিয়ে আসে দেশের মধ্যে নতুন মানুষ। কালের পটে দেখা দেয় জীবনের নতুন স্বপ্ন।

কলেজে

স্কটিশ চার্চেস কলেজে ভরতি হলাম—বাবা ও দাদাও ছিলেন ও-কলেজের ছাত্র। তার থেকেও বেশি সে কলেজের ওগিলভী হস্টেলের আকর্ষণ। হস্টেলটা তখনো নতুন। সেখানেই দাদা আগে থাকতেন (১৯১৫-১৬ সালে?); তাঁর মতে অমন হস্টেল আর নেই। কথাটা সত্য। মাত্র বাহান্নটি ছাত্রের জন্ত এই ছাত্রাবাস—প্রায় প্রত্যেকেরই এক-একটি স্বতন্ত্র ঘর। খেলাধুলা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সকল দিক দিয়েই চমৎকার ব্যবস্থা। এ সবের দাম বুঝতাম। তাই যখন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ভরতির মনোনয়ন-পত্র পেলাম তখন কলেজ বদলাতে পারলাম না। কারণ তাতে হস্টেল বদলাতে হবে। সম্পূর্ণ সুবুদ্ধির কাজ হয়েছিল বলে মনে হয় না। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রেরা যে সুযোগ-সুবিধা লাভ করে, অন্ত কলেজের ছাত্রদের ভাগ্যে তা দুর্লভ। যোগ্যতাও কিছুটা পরিবেশ-যোগেই জন্মে। অন্তত সুযোগ না পেলে যোগ্যেরও চলে না। আমার অবশ্ত প্রেসিডেন্সি কলেজের সে সময়কার অনেক ছাত্রের সঙ্গে পরিচয় ও সৌহার্দ্য ঘটেছিল। বন্ধু উপেন সেন ছিল সে-কলেজের ও হিন্দু হস্টেলের ছাত্র। তার বন্ধু বলে তাঁরা কেউ-কেউ আমাকেও বন্ধুরূপে গণ্য

করতেন। পরে এম-এ ক্লাশে আরও কারও কারও সঙ্গে পরিচয় হয়, সৌহার্দ্যও গড়ে ওঠে। বন্ধুচক্র ক্রমেই বৃহত্তর হয়।

কলেজের সহপাঠী অপেক্ষাও হস্টেলের প্রতিবাসীদের সঙ্গেই আলাপ-পরিচয় প্রথমে হল। কিন্তু তা জমবার আগেই পুজার ছুটি এসে যায়। সেবার সেই ছুটি দীর্ঘতর হয় দেশব্যাপী ইনফ্লুয়েঞ্জায়। ১৯২১-এর সেন্সসে দেখা গেল—ইনফ্লুয়েঞ্জায় সে বছরে লাখ পঞ্চাশ লোক মারা গিয়েছে—চার বৎসরের যুদ্ধেও য়ুরোপে তার অর্ধেক মরে নি। জ্ঞানী-গুণী মানুষও ইনফ্লুয়েঞ্জায় আমাদের দেশ তখন অনেক হারায়। কলকাতার কলেজ খুলল তাই একেবারে বড়ো দিনের পর। ততদিন আমরা ছিলাম বাড়ি বসে। কাজেই প্রথম দিকে কলকাতায় আমার প্রধান সঙ্গী ছিল নোয়াখালির বন্ধুরা আর দাদা রবীন হালদার।

(ক্রমশ)

নিমাইসাধন বসু

কড়ি কাহিনী

আট বছর আগেকার কথা। ১৯৫৭ সাল। ট্রামে, বাসে, হাটে বাজারে মুদির দোকানে, মিষ্টির দোকানে সর্বত্র তর্ক-বিতর্ক, হট্টগোল এমনকি হাতাহাতি। অফিস, বাড়ি, স্কুলে হাসি-ঠাট্টা। নামতা পাল্টে গেল। এত হৈ চৈ-এর কারণ নয়া পয়সা। দশমিক মুদ্রার প্রবর্তন। এখন আর কোনো অসুবিধে নেই। নয়া পয়সা পুরনো হয়ে গেছে।

ভাবি আমাদের দেশে প্রথম যখন মুদ্রার প্রচলন হয়—প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে, তখন লোকে কি ভেবেছিল। বিনিময় প্রথার বদলে মুদ্রার প্রচলনও তো বিরাট পরিবর্তন। আদি যুগে ধন বা wealth বলতে বোঝাতো 'গো'ধন। দ্রব্যাদির মূল্য নির্ণয় ও বেচাকেনার প্রধান পণ্য ছিল গবাদি পশু। কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য গবাদি পশু medium-এর কাজ করলেও দৈনন্দিন জীবনের কেনাকাটায় তা সম্ভব ছিল না। তাই অল্প মূল্যের লেনদেন-এর জন্য কড়ি, শামুক, ছুরি ইত্যাদির প্রচলন ছিল। ছুরির প্রচলন আজকের দিনে একটু অবাক করে। দর কষাকষি করতে গিয়ে যদি মন কষাকষি হয় তাহলে চিন্তার কারণ নয় কি? তবে সর্বনিম্ন মূল্যের মুদ্রারূপে কড়ির প্রচলন ছিল সর্বাধিক। শত শত বৎসর ধরে ভারতীয় জীবন ও অর্থনীতিতে কড়ির স্থান সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল। সোনা, রূপা, তামা প্রভৃতি ধাতুর আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রা ব্যবস্থার সূচনা হলেও সর্বনিম্ন মূল্যের মুদ্রার স্থান দখল করে থাকে কড়ি। গত শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত 'সংবাদ-চন্দ্রিকা' কাগজে কড়ির অবলুপ্তির জন্যে দুঃখ প্রকাশ করতে দেখি। সম্পাদকীয়তে দুঃখ প্রকাশ করে বলা হয় "এইক্ষণে পয়সার বাহুল্যতে কড়ি একেবারে অদৃশ্য হইয়াছে। যদ্যপিও বণিকেরা কিঞ্চিত কড়ি রাখিয়া থাকে তাহা প্রায় দেওয়া নেওয়া হয় না। বাজারে দ্রব্যের মূল্য এক পয়সা আধ পয়সার ন্যূন কোনো দ্রব্য পাওয়া যায় না এবং বিক্রয়কারীদের কোন দ্রব্যের মূল্য ইহার ন্যূন করিলে তাহা গ্রাহ্য করে না।"

কড়ির মূল্য কম হলেও তার জাতি ও গোত্র ভেদ আছে। ভারতীয় মতে কড়ি পাঁচ প্রকার—সিংহী, ব্যাঘ্রী, মৃগী, হংসী ও বিদণ্ডা। প্রাণীতত্ত্ববিদগণের মতে কড়ি জাতি তিনশ্রেণীতে বিভক্ত—সাইপ্রিয়া, আরিসিয়া, নেরিয়া। ভারতের বাজারে দ্রব্যাদির মূল্যরূপে যে-কড়ি প্রচলিত ছিল তার বৈজ্ঞানিক নাম সাইপ্রিয়া মোনেটা। আগে আফ্রিকাতেও কড়ি মুদ্রারূপে প্রচলিত ছিল।

প্রাচীনকালে ২০ কড়িতে হত এক কাকিনী ও ৪ কাকিনীতে ১ পণ। মৌর্যপূর্ব ও মৌর্যোত্তর যুগে কাকিনী ছিল ক্ষুদ্র তামার মুদ্রা। প্রাত্যহিক জীবনে বেচাকেনার সুবিধার্থে অল্প মূল্যের মুদ্রার প্রচলন হয়। ভারতের প্রাচীনতম মুদ্রা হল 'Punch mark' মুদ্রা। এই মুদ্রা প্রধানত রুপোর হলেও এই শ্রেণীর তামার মুদ্রাও পাওয়া গিয়েছে। মৌর্য ও মৌর্য সাম্রাজ্যের পরবর্তী যুগে বহু রাজ্য ও রাজবংশ অল্পমূল্যের মুদ্রার প্রবর্তন করে। সোনা রুপোর মুদ্রা রাষ্ট্রাধীন থাকলেও অল্পমূল্যের মুদ্রার প্রবর্তন তখনও সম্পূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্ত হয় নি। ইংলণ্ডে উনিশ শতক পর্যন্ত ব্যবসায়ীরা তামার প্রতীক মুদ্রা বা token money ছাপতো। দক্ষিণ ভারতীয় প্রাচীন অন্ধ্র বংশীয় রাজারা অল্পমূল্যের সীসার মুদ্রা প্রচলন করেন। কুষাণ রাজ কণিষ্ক ও হুবিষ্কের অসংখ্য তামার মুদ্রায় বিভিন্ন গ্রীক, হিন্দু, ইরানীয়ান দেবতা এবং বুদ্ধের মূর্তি অঙ্কিত থাকত। বিশাল কুষাণ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনসাধারণের সন্তুষ্টিসাধন ছিল এই মুদ্রার এক উদ্দেশ্য। গুপ্তযুগেও অল্পমূল্যের তামার মুদ্রা প্রচলিত ছিল। কড়ির ব্যাপক প্রচলন ছিল। চৈনিক পর্যটক ফা হিয়েন পণ্যের মূল্যরূপে কড়ির ব্যবহারের উল্লেখ করেছেন।

দক্ষিণ ভারতের স্বর্ণমুদ্রা ছিল হান, প্যাগোডা ও ফানাম। অল্পমূল্যের তামার মুদ্রার নাম ছিল কাশু। কাশুর ইংরেজি অপভ্রংশ হল ক্যাশ। গুপ্তোত্তর যুগে সমগ্র ভারতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পরিণতিরূপে অল্পমূল্যের ধাতুর মুদ্রার প্রচলন বাড়ে। সুলতানি আমলেও অল্পমূল্যের মুদ্রার বহুল প্রচার ছিল। রাজপুতানার কোনো-কোনো অঞ্চলে 'গাড়িয়া পয়সা' নামে একপ্রকার মুদ্রার প্রচলন হয়।

বর্তমান টাকা বা রুপির জনক হলেন শের শা। তাঁর প্রবর্তিত তাম্রমুদ্রা হল 'দাম'। সুবিবেচক, দূরদর্শী শের শা সাধারণ মানুষের জীবনে অল্পমূল্যের মুদ্রার প্রয়োজন উপলব্ধি করে অর্ধদাম বা 'নিসফী', এক চতুর্থাংশ 'দাম' বা

'দামড়া' এবং এক অষ্টমাংশ বা 'দামড়ী'র প্রচলন করেন। 'টঙ্কা'র ব্যাপক প্রচলন করেন আকবর। দশমিক মুদ্রারও প্রথম প্রবর্তক আকবর। তিনি 'টঙ্কা'কে দশভাগে ভাগ করেন। দশ 'টঙ্কি'তে হত এক 'টঙ্কা'।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর সারা ভারতে অসংখ্য টাঁকশাল গজিয়ে ওঠে। উনিশ শতকের প্রথমদিকে ভারতে প্রায় ৯৯৪ রকমের মুদ্রা চালু ছিল। ১৬৭১ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বোম্বাই থেকে প্রথম মুদ্রা প্রবর্তন করে। প্রথমদিকে ইংরাজ কুঠিগুলি মুঘল রুপি ছাপতে থাকে। কলকাতায় টাঁকশাল স্থাপিত হয় ১৭৫৭ সালে। ক্রমে ক্রমে কোম্পানির শাসনাধীন সমস্ত অঞ্চলের টাঁকশাল কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে বাংলাদেশের জন্য তাম্রমুদ্রা বার্মিংহামের শিল্পপতি ম্যাথিউ বোল্টনের কারখানা থেকে তৈরি হয়ে আসত। ১৭৮৬ সালে বোল্টন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে ১০০ টন তামার মুদ্রা প্রস্তুতের অর্ডার পেয়েছিলেন। ১৮৩৫ সালে কোম্পানির শাসনাধীন সকল অঞ্চলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের কারেন্সী প্রবর্তিত হয়। রুপি বা টাকা একমাত্র legal tender বা বিহিত অর্থের মর্যাদা লাভ করে। পরবর্তী যুগে ভারতে Gold Standard বা স্বর্ণমান প্রবর্তন নিয়ে বহু বাক্‌বিতণ্ডা হলেও সাধারণ মানুষের তাতে কোনো আগ্রহ ছিল না। পাই, আধপয়সা, পয়সা নিয়েই তাদের দিন কাটত। মোহর নিয়ে তাদের চিন্তা ছিল না। অল্পমূল্যের মুদ্রা বা রেজকির অভাবে তৎকালীন জনসাধারণের অসুবিধের কথা উল্লেখ করে ১৮১৯ সনে 'সংবাদ-চন্দ্রিকা' মন্তব্য করে: "পয়সার অপ্রাপ্যতা প্রযুক্ত দীন-দুঃখীরদিগের অতিশয় ক্ষতি হয় অর্থাৎ একটাকায় প্রায় তিন পয়সা বাটা যায়।

এই দুঃখ নিবারণ হেতুক শুনা যাইতেছে যে গবরনর আজ্ঞায় নূতন পয়সা বাহির হইবে। শুনা গিয়াছে যে এ পয়সা রাজেতে নির্ম্মিত হইবে এবং কড়ি ও পয়সার পরিবর্ত্তে এই পয়সা চলিবে।" ১৮৩০ সালে রেজকির অভাব প্রসঙ্গে 'সংবাদ-চন্দ্রিকা' লেখে: "আমারদিগের মতে পয়সার রেজকি অর্থাৎ এমত কোন ধাতু দস্তা বা সীসা ইত্যাদির আধপাই সিকিপাই প্রস্তুত করিয়া লেনদেন করেন তাহা হইলে লোকের মহোপকার হইবেক। এ বিষয় শুনিতে অতি সামান্য বটে কিন্তু দুঃখী লোকের পক্ষে সামান্য নহে।" ১৮৩৩ সালে বাংলা দেশে কতরকমের পয়সা চলিত ছিল তার একটি

বিবরণ পাওয়া যায় বেঙ্গল হরকরা কাগজের অনেক পত্রপ্রেরকের পত্রে। বাংলাদেশে এই সময়ে মোট নয় রকমের পয়সা চলিত ছিল : যথা, পুরানো সিক্কা পাই পয়সা, নূতন সিক্কা পাই পয়সা বা বিচ্, ত্রিশূলি ছোট ত্রিশূলি বা গুটলি, পাটনাই পয়সা, কমারিয়া ত্রিশূলি পয়সা ইত্যাদি। কিন্তু ১৮৩৫ সালের পর ব্যবসা বাণিজ্যের স্বার্থে মুদ্রার সমরূপতা প্রবর্তিত হয়। কানাকড়ি কোনোদিন মুদ্রারূপে গ্রাহ্য না হলেও সপ্তম এডোয়ার্ডের রাজত্বকালে ফুটো পয়সা চালু হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালেও ফুটো পয়সা আবার চালু হয়। এখনও পথেঘাটে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের অলংকাররূপে ফুটো পয়সা শোভাবর্ধন করছে নজরে পড়ে।

শত শত বৎসর ধরে ভারতীয় সভ্যতা ও অর্থনীতির বিবর্তন ঘটলেও কড়ির প্রচলন বন্ধ হয়নি। গত শতাব্দী পর্যন্ত সাধারণ মানুষের, বিশেষত গ্রামীণ অর্থনীতিতে কড়ি ছিল অপরিহার্য। বিভিন্ন যুগের সাহিত্যে যথা চর্যাপদ, পদ্মপুরাণ, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল ও ভারতচন্দ্রের রচনায় পণ্যের মূল্যরূপে কড়ির উল্লেখ রয়েছে। চাঁদ সদাগরের সপ্তডিঙা মধুকর ডুবে গেলে এক ব্রাহ্মণ দয়াপরবশ হয়ে তাঁকে চারপণ কড়ি দিলে চাঁদ সদাগর সেই কড়ি কি ভাবে খরচ করবে মনে মনে তার এক হিসেব করে।

"একপণ কড়ি দিয়া ক্ষৌর শুদ্ধি হব
আর একপণ কড়ি দিয়া চিবা কলা খাব॥
আর একপণ কড়ি দিয়া নটী বাড়ী যাব
আর একপণ কড়ি নিয়া সোনেকারে দিব॥"

চারপণ কড়িতে একসঙ্গে ক্ষৌরকার্য সমাধান, চিঁড়াকলা ভোগ, নটীর বাড়ি আমোদপ্রমোদ এবং স্ত্রীকে দান করা কম কথা নয়। চাঁদ সদাগর পাকা হিসেবী ছিলেন। ভাস্করাচার্যের লীলাবতী ও রঘুনন্দনের প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বে কড়ির মূল্যের উল্লেখ আছে। শুদ্ধিতত্ত্বে যজ্ঞের দক্ষিণারূপে সামর্থ্যানুসারে ফল পুষ্পাদি বা কড়িদানের বিধান আছে। ১৮৪০ সালে কড়ির বিনিময় হার ছিল এক টাকায় ২৪০০ কড়ি। এরপর কড়ির দর হ্রাস পেতে থাকে। উনিশ শতকের শেষভাগে দর হয় ১ টাকায় ৬০০০ কড়ি। বিংশ শতকে মুদ্রারূপে কড়ি অপ্রচলিত হলেও কড়ির ঐ দর বৃদ্ধি পেয়েছে বলেই মনে হয়। কোনো সমুদ্রসৈকতে এক টাকায় ৬০০০ কড়ি পাওয়া যায় বলে শোনা যায় না। কড়ির আর্থিক মূল্য যাই হোক না কেন ভারতীয় বিশেষ করে বাঙালির শুভ কাজে, পূজা-অর্চনায় কড়ি অপরিহার্য। আধুনিক সভ্যতা ও অর্থনীতির চাপে কড়ি হাট-বাজার ছেড়ে এলেও শুভবিবাহ, নামকরণ ও বিশেষ করে লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে কড়ির আসন অটল।

পুস্তক-পরিচয়

গানের ভিতর দিয়ে

সুরের আগুন। গোলাম কুদ্দুস। মুকুল পাবলিশার্স। ৪·৭৫

তিন বৎসর পূর্বে প্রকাশিত এই আশ্চর্য পুস্তকখানার পরিচয় বিলম্বেও মূল্য কিছুমাত্র কমে না—সন্তুতনকে ছাড়িয়ে ওঠবার মতো দাবি তার আছে। যথাকালে তা আলোচনা না করবার অপরাধ তাতে বেড়েছে। গ্রন্থকার ও পাঠক দুয়ের কাছেই তাই মার্জনা ভিক্ষা করছি।

'সুরের আগুন' উপন্যাস কিনা জানি না। নিশ্চয়ই জীবনী—প্রসিদ্ধ সংগীতশিল্পী 'কে. মল্লিক'-এর জীবনী। জন্মগত নাম যাঁর মুন্সি মহম্মদ কাসেম, আর শিল্পিকুলে পরিচয় যাঁর প্রধানত 'কে. মল্লিক' নামে, কিছুটা কাসেম নামে, আর কিছুটা 'শঙ্কর মিশ্র' নামেও, বর্ধমানের কুসুম গ্রামে বাংলা ১২৯৫-এর ১২ই জ্যৈষ্ঠ তাঁর জন্ম। পিতা মুন্সি ইব্রাহিম ইস্‌মাইল। বাড়ির ডাক নাম 'মান্থ'। দারিদ্র্যের দায়ে চামড়ার যাচনদারের কাছে বাল্যেই ছয় টাকা মাইনের কাজ নিয়ে সুরের আগুনে সংশুদ্ধ হয়ে 'কে. মল্লিক' রূপে জীবনারম্ভ, তারপর সুরের জীবনেই তাঁর জীবন। কিন্তু সংসারটায় সুরে-বেসুরে মিলে সেই জীবনকে কেমনভাবে এগিয়ে দিয়েছে, বেঁধেছে, মুক্তি দিয়েছে, জ্বালিয়েছে, পুড়িয়েছে, আবার এগিয়ে দিয়েছে—সেই আশ্চর্য কাহিনী নিয়েই এই গ্রন্থ। যতদূর জানি—গোলাম কুদ্দুস তথ্য কিছুমাত্র অবহেলা করেন নি—জীবনী জীবনীই। যতদূর বুঝেছি—গোলাম কুদ্দুস তথ্যের তুচ্ছতা ছাড়িয়ে তথ্যকে সত্য করে তুলতে পেরেছেন, বস্তুর ভারকে আন্তর সত্যে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন বাস্তব রূপ। তাই জীবনী শুধু তথ্যের চড়ায় আটকে পড়ে নি, প্রাণময়তায় রূপায়িত হয়েছে, জীবন-রসের নিঃসেকে জীবন হয়ে উঠেছে—শ্রেষ্ঠ সাহিত্যেরও যা প্রার্থিত।

কুদ্দুস উপন্যাস লিখতে চান নি—যে-উপন্যাস কাল্পনিক সাহিত্য। কারণ, তিনি জানেন, "জীবন্ত রক্তমাংসের চেয়ে বিস্ময়ের কি আছে ত্রিভুবনে।" সে বিস্ময় শিল্পিজীবনে সহজভাবেই অনেক সময়ে অজস্র হয়ে ওঠে। কিন্তু নানা উপসর্গে তার অর্থান্তর ঘটে, মূল অর্থ চাপা পড়ে যায়।

সেই অর্থটিকে সমস্ত অসম্পূর্ণতার মধ্য থেকে টেনে বার করতে হলে চাই বিশেষ ধরনের সত্যদৃষ্টি—একদিকে শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টি, অন্যদিকে সহৃদয় মানব-প্রীতি। এই দুই জিনিসের অনায়াস মিশ্রণে গোলাম কুদ্দুসের হাতে কে. মল্লিকের এই জীবনী উপন্যাসের মতোই বিস্ময়কর এবং জীবনের মতো সত্যানুপ্রাণিত হয়ে উঠেছে।

শিল্পিজীবনে উপন্যাসের উপযোগী উপকরণ জোটে। কে. মল্লিকের জীবনেও তা যথেষ্ট পাওয়া যায়। কানপুরের হাসিনার কাহিনী থেকে কলকাতা-বর্ধমানের বিজলী পর্যন্ত যে-রোমান্সের উপকরণ কে. মল্লিকের জীবনে জমা হয়েছিল, তাতে উপন্যাস লেখা চলত। বা লেখাই সহজ। লেখকের ক্ষমতানুযায়ী তা হত ভালো, মন্দ বা মামুলী। কুদ্দুস এই উপকরণকে শুধু ঔপন্যাসিক মূল্য না দিয়ে জীবনের সমগ্রতার মধ্যে তাকে স্থান দিয়েছেন—সুরশিল্পীর প্রাণময় আত্মপ্রকাশের মধ্যে দিয়েছেন এ-সব কাহিনীর মর্যাদা। কেউ খাটো হয় নি—কোনো মানুষ নয়, তাদের প্রেমও নয়। কিন্তু মহিমা পেয়েছে জীবন, তার অন্তর্নিহিত শুভ্র চেতনা, সত্যবোধ।

সুরের আগুনে সত্যই উপন্যাসেরও সরসতা ও ধর্ম আছে—আকৃতি অপেক্ষা প্রকৃতিতে। মানুষ চরিত্র হতে বাধা পায় নি। চরিত্র হিসাবে বিজলী কাসেমের অপেক্ষাও সত্য, বেশি মানবীয় উপাদানে গঠিত। আশায়, আকাঙ্খায়, ব্যর্থতায় আর আত্ম-নির্মাণের তপস্যায় সে আলোড়িত। কাসেমের দোষ নেই। তার অবকাশ কতকটা সীমাবদ্ধ। সুরের জীবনেই তার জীবন। তবে সে-সুর জীবনবিরোধী নয়, সহজ মানবিকতায় তা উৎসারিত—সে-মানবিকতাতেই আবদুল হাইকেও সে দোষ দেয় না। সে-মানবিকতায় যে-কোনো আসরে প্রাণ খুলে আপন ভুলে গাইতে সে খুশি। মানুষ হিসাবেই মানুষ তার কাছে মূল্যবান। যে সত্যটা তাঁর উপলব্ধিতে প্রত্যক্ষ তা হচ্ছে—এই পৃথিবীময় সুরের আনন্দপ্লাবন। তাতে মানুষ সহজেই অবগাহন করতে আমন্ত্রিত। তবু নানা বিষয়ে সে বঞ্চিত। এই বাধার মধ্যে ধর্মের আচার নিয়মের বাধা আছে, সম্পত্তির লোভ-মাৎসর্যের বাধা বোধহয় আরও বিপুলতর। তা বরিয়ার রাজাকে স্বস্তি দেয় না—কাসেমের কৃষক পরিবারেও ঘনিয়ে তোলে বিরোধ-বিপাক। নানা সূত্রে শিল্পীর জীবন-ধারা থেকে এই সত্যটাই বেরিয়ে আসে—মানুষে মানুষ সম্পর্কটা স্বচ্ছন্দ হবার

জন্ত যেন কালের মুখ চেয়ে আছে। সুরের আগুনও যেন চায় সেই পবিত্র বেদী।

এ-ধরনের জীবন কথা পড়তে পড়তে স্বভাবতই কোনো-কোনো পাশ্চাত্ত্য জীবনশিল্প-ব্যাখ্যাতাদের কথা মনে পড়ে। কিন্তু লিটন্ স্ট্রাচি বা আঁন্দ্রে মরোয়ার ('এরিয়েল'-এর স্রষ্টা) থেকে গোলাম কুদ্দুস সম্পূর্ণ অন্ত জাতের। পাশ্চাত্ত্য সেই শিল্পীদের বৈদগ্ধ্য ও সূক্ষ্মতা কুদ্দুসের অস্ত্র নয়। আমি তাতে দুঃখিত নই, গোলাম কুদ্দুসের কাজে সেই সূক্ষ্ম কারুকর্ম নেই। তাঁর যা আছে সে আরও মৌলিক অর্থাৎ ফান্ডামেন্টাল। অদ্ভুত অকৃত্রিমতা ও সারল্য, অনায়াস কাব্য-সুষমা, আর সর্বোপরি জনসাধারণের জন্ত স্বাভাবিক প্রেম। হয়তো এই প্রেমই কুদ্দুসের স্বধর্ম—তাঁর সাহিত্য-সাধনারও প্রধান পাথেয়। এই প্রেমই দিয়েছে তাঁর সাহিত্যশৈলীতে সারল্য, তাঁর সংবেদনশীল প্রাণে কাব্যস্পর্শ। আর, তাই এই গ্রন্থে আমরা পাই শুধু উপন্তাসের সরসতা নয়, মানবতার প্রাণময় স্পর্শ।

গোপাল হালদার

মোগল ভারতের কৃষিব্যবস্থা

The Agrarian System of Mughal India. Irfan Habib. Asia Publishing House. 1963.

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে মোরল্যাণ্ডের ভারত-ইতিহাসের ক্ষেত্রে স্মরণীয় ইতিহাসকর্ম মুসলমান ভারতের কৃষিব্যবস্থা বা এ্যাগ্রারিয়ান সিস্টেম অব্ মোসলেম ইণ্ডিয়া প্রকাশিত হয়। এবং সেই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেন যে সম্ভবত ভারতবর্ষে এখনও বহু উপাদান বর্তমান, যা আবিষ্কৃত ও সংগৃহীত হলে সেই সব বিষয়ের উপর অতিরিক্ত আলোকপাত করবে, যেসব ক্ষেত্রে তিনি উপাদান-স্বল্পতা তীব্রভাবে অনুভব করেছেন। শুধু তাই নয়, যথার্থ পণ্ডিতের বিনয়েই তিনি আরও জানিয়েছিলেন যে, ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত বহু দলিল-দস্তাবেজ আছে যার প্রকাশ তাঁর বহু ভুলত্রুটি দূর করবে, তাঁর রচিত এই essayটিকে ছিন্নিতে পরিণত করবে। বলা বাহুল্য, মোরল্যাণ্ডের এই আশা ফলবতী হতে

সময় লেগেছে—মাঝখানে ডঃ পি. সরণ-এর মোগল আমলের প্রাদেশিক সরকার প্রসঙ্গে শাসনতান্ত্রিক গ্রন্থটিতে ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত মন্তব্য ছাড়া (যেখানে তিনি মোগল যুগে কৃষকরাই জমির মালিক ছিল এই মত সজোরে সমর্থন করেছেন), ইরফান হাবিবের মোগল ভারতের কৃষিব্যবস্থা গ্রন্থটিই এ-ব্যাপারে একমাত্র সামগ্রিক প্রচেষ্টা। মোরল্যাণ্ড সারা মুসলমান যুগকেই তাঁর গ্রন্থের বিষয়বস্তু করেছেন, শ্রীযুক্ত ইরফান হাবিব শুধু মোগল ভারতবর্ষ—মোটামুটিভাবে ১৫৫৬ থেকে ১৭০৭—তাঁর আলোচনার বিষয়।

বলাই বাহুল্য, অনেক ক্ষেত্রেই ইরফান হাবিব মোরল্যাণ্ডের সঙ্গে ঐক্যমতে পৌঁছতে পারেন নি। না পৌঁছনই স্বাভাবিক—কারণ ১৯২৯ ও ১৯৬৩-তে অনেক প্রভেদ। অনেক নতুন তথ্য সূর্যের আলোয় এসেছে—তা ছাড়া ভাষাগত দিক থেকেও শ্রীযুক্ত হাবিব মোরল্যাণ্ড-এর থেকে অনেক সুবিধাজনক অবস্থায় আছেন। মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ইতিহাসচর্চায় যে-ভাষার গুরুত্ব সর্বাধিক অর্থাৎ ফার্সী তার সঙ্গে শ্রীযুক্ত হাবিবের পরিচয় প্রত্যক্ষ এবং এক্ষেত্রে টার্মিনোলজি নিয়ে স্বাধ্যভাবেই চিন্তিত মোরল্যাণ্ডকে, ব্লকম্যান, জ্যারেট, ডসন-এর প্রচেষ্টায় সীমাবদ্ধতা জেনেও, তাঁদের উপরেই নির্ভর করতে হয়েছে, এবং তিনি স্বীকার করেছেন উপরি-উক্ত পণ্ডিতবৃন্দ টার্মিনোলজির ক্ষেত্র আধুনিক ভারতবর্ষ অথবা মধ্যযুগীয় ইয়োরোপের প্রচলিত শব্দাবলী থেকেই ধার করেছেন—যার সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই মূলের সম্পর্ক নেই। অথচ শব্দের, টেবলের একটু হেরফেরে কত পরিবর্তন ঘটে যায় তার প্রমাণ ইরফান হাবিবের জমিদারদের উপর মৌলিক চিন্তাপূর্ণ অধ্যায়টি।

ইরফান হাবিব তাঁর গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদের আরম্ভেই বলেছেন: "The search after the "owner of the soil" in India before the British conquest has exercised the ingenuity of modern writers." ইয়োরোপীয় পর্যটকগণ সকলেই ঘোষণা করেছেন যে মোগলযুগের জমির মালিকানা রাজার উপরই ন্যস্ত ছিল। এবং আবুল ফজল জানিয়েছেন বণিক ও কৃষকদের দেয় খাজনা "remuneration of sovereignty"—রাজা যে তাদের আশ্রয় ও সুবিচার দিচ্ছেন তার পরিবর্তেই এটা নেওয়া হয়। অন্যদিকে শহর অঞ্চলে, there seems to have existed a definite nation of private property in land. ইয়োরোপীয় পর্যটকদের উপরিউক্ত মতের কারণস্বরূপ হাবিব বলেন যে, তাঁরা এ দেশ সম্পর্কে অনভিজ্ঞতা

ছাড়াও জায়গীরদারদের মধ্যে ইয়োরোপের ভূম্যধিকারী অভিজাতদেরই দেখেছেন। এবং যেহেতু সম্রাট তাঁর খুশিমতো জায়গীর একজন থেকে আর একজনকে দিতে পারতেন, সেহেতু তাঁরা বুঝেছিলেন জায়গীরদারদের ভূম্যাধিকারীর ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করেছেন। ফলে জমির অধিকারী হিসাবে ধরা যায় আর দুজনকে—রাজা ও কৃষক। স্বভাবত তাঁরা রাজাকেই জমির অধিকারী ভেবেছেন। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে ইয়োরোপীয় পর্যটকদের সিদ্ধান্ত কি ঠিক? শ্রীযুক্ত হাবিব প্রমাণ দেখিয়ে স্পষ্টই বলেছেন: There was a general recognition of the peasant's title to permanent and hereditary occupancy of the land he tilled. শুধু তাই নয় এই অকুপ্যান্সি রাইটস ছিল অলঙ্ঘনীয়। কিন্তু ইরফান হাবিবের ভাষায় there was no question of really free alienation. অথচ অধিকারস্বত্বের সার কথাই এটা। সেইজন্য গ্রন্থকার এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, এক অর্থে ভূমি যেমন কৃষকদের ছিল অন্যদিকে কৃষকরা ভূমিতেই বাঁধা পড়ে গিয়েছিল। স্মরণীয়, সে যুগে কৃষকের জমিতে অকুপ্যান্সি রাইটস মেনে নেওয়া ও তাদের জমিতে আটকে রাখায় কর্তৃপক্ষের অন্যতম কারণ জমির প্রাচুর্য ও কৃষকের স্বল্পতা। সে কারণেই অত্যাচার বা দুর্ভিক্ষের প্রতিবাদস্বরূপ কৃষকেরা জমি ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেত। এই সূত্রেই ধরা পড়ে মোগলযুগের কৃষকদের অবস্থার সঙ্গে বৃটিশ আমলের আধুনিক জমিদারীর অধীনে কৃষকদের অবস্থা। কারণ প্রথম যুগের জমির প্রাচুর্য ও কৃষকের স্বল্পতা দ্বিতীয় যুগে নেই। বরঞ্চ নানা কারণে উল্টোটাই ঘটেছে। ফলে মোগলযুগে কৃষকরা যে-অধিকার ভোগ করত, সেটা বৃটিশযুগে বিশেষ আইন করে প্রবর্তন করতে হল। যাই হোক, এই স্বল্প আলোচনায় যে-প্রমাণ ইরফান হাবিব দেখিয়েছেন যে রাজা ও কৃষক কেউ ভূমির মালিক ছিল না। এর অপর অর্থ রায়তওয়ারী অঞ্চলে অন্তত একজন মালিককে স্থির করা মুশকিল। জমি ও তার উৎপাদনদ্রব্যের বিভিন্ন ধরনের অধিকার ছিল। জমিতে মালিকানাস্বত্ব মোগলযুগের একটা জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা—ইরফান হাবিব সে সম্পর্কে নতুন আলোকপাত করলেন।

একই পরিচ্ছেদে ভিলেজ কম্যুনিটি সম্পর্কে যে-আলোচনা তিনি করেন তাও যথেষ্ট চিন্তা-উদ্দীপক। প্রথমেই জানান যে গ্রামীন উৎপাদনের একটা বড় অংশ শহরের বাজারে বিক্রীত হলেও, শহর থেকে গ্রাম

কিন্তু তার পরিবর্তে প্রায় কিছুই পেত না।[১] সুতরাং বাজারের জন্য গ্রামকে দ্রব্য উৎপাদন করতে হোত, আবার গ্রামের নানা প্রয়োজন গ্রামের ভিতর থেকেই মেটাতে হত। ফলে, conditions of money economy and self-sufficiency, therefore, existed side by side. একদিকে কৃষিতে ব্যক্তিগত উৎপাদন-পদ্ধতি অন্যদিকে ভিলেজ কম্যুনিটি বা গ্রাম সমাজ— এই সামাজিক বিরোধের কারণ বোধহয় এটাই। বলাই বাহুল্য, দ্রব্য উৎপাদন এবং এর সঙ্গেই ব্যক্তিগতভাবে জমির মালিকানা গ্রামের ভিতর কোনোরকমে সাম্যকেই বরদাস্ত করে নি। এর সঙ্গেই স্মরণীয়, যদিও ইরফান হাবিব মনে করেন না বর্তমানের বিশাল গ্রাম্য সর্বহারা বা রুর্যাল প্রোলেটারিয়েট মোগলযুগের উত্তরাধিকার, তথাপি সেযুগে যে ভূমিহীন মজুরের অস্তিত্ব ছিল এ কথা নিশ্চিত। প্রথমত জমির প্রাচুর্যহেতু একজন কৃষকের অনেক জমি ছিল আমাদের তুলনায়। ফলে কাজের জন্য অস্থায়ী লোকের দরকার হত, বিশেষত শস্য তোলার সময়। এই অস্থায়ী সাহায্যকারীরা আসত গ্রামের অকৃষক সম্প্রদায় থেকে অর্থাৎ যাদের বৃত্তি ছিল অন্য। দ্বিতীয়ত, ভূমিহীন মজুররা আসত ইরফান হাবিব-এর ভাষায় depressed castes থেকে: The caste system seems to have worked in its inexorable way to create a fixed labour reserve force for agricultural production. বর্ণ বা জাতিবিভাগ কৃষক ও ভূমিহীন মজুরের উত্তরাধিকারী বিভেদের সৃষ্টি করেছে। মার্কস ভারতীয় গ্রামসমাজের গঠনে যে unalterable division of labour-এর কথা বলেছেন, তারই একটি উদাহরণ। এবং গ্রামের স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রয়োজনের জন্য, যা মেটানো যেত বংশানুক্রমিক শ্রমবিভাগের দ্বারা এবং কৃষকদের বর্ণ বা জাতির ঐক্যর (caste cohesion) ভিত্তিতেই গ্রামসমাজ গড়ে উঠেছিল। কিন্তু ভূমির সমষ্টিগত অধিকার বা জমির পর্যায়ক্রমিক বণ্টন-পুনর্বণ্টন—এসবের কোনো প্রমাণই নেই। ভূমিতে কৃষকের অধিকার সর্বদাই ব্যক্তিগত অধিকার ছিল। অবশ্যই এই গ্রামসমাজের প্রয়োজন সেকালে ছিল।

দি জমিনদারস শীর্ষক অধ্যায়ে ইরফান হাবিব যে-আলোচনা করেন তা

১ থর্নার-দম্পতির লেখা ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড লেবর ইন ইন্ডিয়া-তে একই সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়: Economically the cities had a one-way relation with the countryside, taking food stuffs as tribute but supplying virtually no goods in return.

আমাদের একটি বড় ভ্রান্তির অবসান ঘটায়। আধুনিক ভারতীয় অর্থে জমিদার একজন ল্যাণ্ডলর্ড। এবং এ-প্রশ্ন বার বারই উঠেছে এই শ্রেণী কি বৃটিশ শাসনেরই সৃষ্টি? শুধু তাই নয়, এ প্রশ্নও উঠেছে মোগলযুগে ব্যবহৃত জমিদার শব্দটি আধুনিক অর্থ বহন করে কি না। সাধারণমান্য সিদ্ধান্ত হল মুঘলযুগে জমিদার অর্থে সামন্তরাজা বা স্থ্যাশাল চীফসই বোঝাত। এই সামান্তরাজাদের ক্ষেত্রে জমিদার শব্দটি যে ব্যবহৃত হোত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই শব্দটির সমগ্র অর্থ কি এইটুকুই? এবং সাধারণমান্য সিদ্ধান্তটিকে খণ্ডন করা চলে, যদি দেখানো যায় নিয়মিত শাসিত অঞ্চলেই জমিদারদের অস্তিত্ব ছিল, শুধু করদরাজ্য নয়। শ্রীযুক্ত হাবিবের মতে শুধুমাত্র আইন থেকেই এই জিনিসটি দেখানো চলে। এতদিন যে দেখানো যায় নি তার কারণ ব্লকম্যানের আইনের অনুবাদে একটি ভুল যার ফলে পরিসংখ্যানগত তথ্যের গুরুতর ভ্রান্তি দেখা গেছে। ব্লকম্যান-এর সংস্করণে, অ্যাকাউন্ট অব দি টুয়েলভ প্রভিন্সেস-এর অন্তর্গত পরিসংখ্যান মূলানুযায়ী নয়। শুধু তাই নয়, ব্লকম্যান, হাবিবের ভাষায়, but also dropped without any explanation column-headings. ফলে তাঁর পাঠক একথা কোনোক্রমেই জানতে পারছে না, the names of castes entered against each pargana in these tables, belong really to a column headed 'Zamindar' or occasionally, 'bum' in the manuscripts. এই ভুল ধরার পর, শ্রীযুক্ত হাবিব সম্রাট-শাসিত অঞ্চলে জমিদারদের সম্পর্কে যে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন তা মৌলিক এবং তৎকালীন সমাজ সম্পর্কে আমাদের ধারণারও অনেক পরিবর্তন ঘটায়।

এই দীর্ঘ আলোচনার সম্যক পরিচয় এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। তবু শ্রীযুক্ত হাবিবের কয়েকটি সাধারণ সিদ্ধান্ত বলা বাঞ্ছনীয়: প্রথমত শ্রেণী হিসাবে জমিদাররা শোষকশ্রেণী ছিল—কারণ তারা কৃষকের উৎপাদনের উদ্বৃত্ত অংশে ভাগ বসাত। কিন্তু যদিও এই ভাগবসানোর অংশে স্থানে স্থানে পার্থক্য ছিল, তথাপি রাষ্ট্রের রাজস্ব বা অন্যান্য দাবির তুলনায়, হাবিবের ভাষায়, এটা ছিল subordinate share. দ্বিতীয়ত, নানা উপায়ে এদের মধ্যে যে ক্ষমতা বা স্বেচ্ছাচারের উপাদান ছিল তা বিভক্তভাবে স্থানীয়। তাদের কোনো বিশেষ জমির উপর অধিকার বংশানুক্রমিক, যদিও ক্ল্যান মুভমেন্টস বা সেলস তাদের অধিকারভোগে ব্যাহত করত, তবুও

স্বাভাবিক ভাবি জমির সঙ্গে তাদের পরিচিতি ছিল নিবিড়। ফলে তাদের জমির উৎপাদনক্ষমতা জানার বা সেখানকার অধিবাসীদের রীতি-নীতি-ঐতিহ্য বোঝার বড় সুবিধা তার ছিল। এদের দৃষ্টিভঙ্গিও কদাচ তাদের বর্ণ বা জাতি, এমনকি পরিবারের, উর্ধ্বে উঠতে পারত না। অনেক ক্ষেত্রেই জমিদারেরা শ্রেণী হিসাবে বিভিন্ন বর্ণ বা জাতির ভিত্তিতেই গঠিত যারা, "had for long been uprooting and subjugating each other. The social heterogeneity of their class must have increased still further with the sale and purchase of Zamindaris" এই সামাজিক পার্থক্য ছাড়াও, ভৌগোলিক পার্থক্যও ছিল। এই জমিদার শ্রেণীর শক্তি ও দুর্বলতা তাদের সমস্ত শক্তির উপরও নির্ভরশীল। অশ্বারোহী বাহিনীর দিক থেকে তারা দুর্বল ছিল, যদিও পদাতিকের থেকে নয়। তবে তারা এত পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকত যে সম্রাটের শক্তির মোকাবেলা করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। জমিদারদের মধ্যে এই বিভেদ, এই সংকীর্ণ বর্ণ বা জাতিবদ্ধতা, এই বদ্ধ স্থানিকতা তাদের ঐক্যবদ্ধ শাসকশ্রেণীতে পরিণত হওয়ায়, সাম্রাজ্যগঠনে বাধা দিয়েছে। ভারতবর্ষ যে বার বার বিদেশী শক্তির অধীনে এসেছে তার অন্যতম কারণ তাদের এই ব্যর্থতাই।

মোগল কেন্দ্রীয় সরকার অর্থাৎ ইম্পেরিয়াল গভর্নমেন্ট মোটামুটিভাবে জমিদারির অধিকারকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির পবিত্রতা দিয়েছিল। কিন্তু এর সঙ্গে আরও দুটো বৈশিষ্ট্য যুক্ত ছিল। প্রথমত এটা আশা করা হোত জমিদাররা ভূমিরাজস্ব সংগ্রহ ও প্রেরণের ভার গ্রহণ করবে, তাদের এই অধিকারকে খিদমৎ বলা হোত। যদি এই কাজ সে ঠিকমতো না করত তাহলে তাকে পদচ্যুত করে অন্যকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হোত। দ্বিতীয়ত জমিদারদের নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনী থাকত—ফলে তাদের বিদ্রোহ করার সুযোগও ছিল। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহদমনের সাহায্যেও তাদের সহায়তা প্রয়োজনীয়। রাজদ্রোহী জমিদার তার সব অধিকার হারাত। বিশ্বাসী একজন তার পরিবর্তে আসত। এই হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা থেকেই এই তত্ত্বের উদ্ভব যে the imperial government could resume or confer any Zamindari at its will. তবে একথা সর্বদা স্মরণীয় জমিদারী অধিকারের উৎপত্তি তৎকালীন বর্তমান ইম্পেরিয়াল শক্তি-নিরপেক্ষভাবেই।

জমিদারের সঙ্গে অটোনোমাস চীফস-এর পার্থক্য শুধুমাত্র did not lie in the superiority that the chiefs enjoyed over ordinary Zamindars in military power and territory. A distinction was made between the two by custom also, which prescribed different principles of succession in respect of their possessions. তবে পার্থক্যটা প্রকট ছিল উভয়ের সঙ্গে কেন্দ্রীয় শক্তির সম্পর্কের ক্ষেত্রে—চীফসদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ছিল, কিন্তু সাধারণ জমিদাররা সম্রাটের প্রজামাত্রই ছিল। এবং এই চীফসদের সঙ্গে মুঘল সরকারের সম্পর্ক সবক্ষেত্রে একরকম ছিল না।

ইরফান হাবিব তাঁর গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে মোগলশাসনের শেষের দিকে ক্রমে ক্রমে কিভাবে কৃষিগত সংকট ঘনিয়ে উঠল—তার চিত্র এঁকেছেন। একশ পঞ্চাশ বছর ধরে মোগলশক্তি প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষকে একটি কেন্দ্রীকৃত শাসন-ব্যবস্থায় বেঁধে রেখেছিল। এর মূল শক্তি নিহিত ছিল—এসাইনমেন্ট সিস্টেমে। মোগলশাসকশ্রেণীর ঐক্য ও সংযোগের মূর্তরূপ সম্রাটের পরম ক্ষমতা। এবং সাম্রাজ্যের রাজস্বনীতি তৈরি হয়েছিল দুটো জিনিসের উপর নির্ভর করে—প্রথমত জায়গীরের রাজস্ব থেকে যেহেতু মনসবদারদের তাদের জন্য নির্দিষ্ট সৈন্যের ভরণপোষণ চালাতে হোত, সেহেতু রাজস্বের দাবিটাকে সাম্রাজ্যে সামরিক শক্তিকে বলীয়ান করার জন্য উচ্চতম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার প্রবণতা ছিল। কিন্তু, দ্বিতীয়ত, এই চিন্তাও এর সঙ্গে ছিল যে, এই দাবি যদি এমন পর্যায়ে যায় যে কৃষকদের মাত্র জীবনধারণও অসম্ভব হয়ে পড়ে, তাহলে রাজস্ব আদায় প্রায় হবেই না। এইজন্যই সর্বক্ষণই কৃষকদের মাত্র জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অংশটুকু ছেড়ে দিয়ে, উদ্বৃত্ত উৎপাদনের দিকে বেশি নজর দেওয়া হোত। এই উদ্বৃত্ত উৎপাদনের আত্মসাতেই মোগল শাসকশ্রেণীর ধনস্ফীতি ঘটে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই রাজস্ব আদায়ের ঊর্ধ্বগত প্রবণতা দেখা গেল। ক্রমে ক্রমে এটা চরম অত্যাচারের রূপই গ্রহণ করল—বলা চলে। এ ব্যাপারে জায়গীরদারদের ভূমিকাই মুখ্য ছিল—যেহেতু জয়গীরদারদের ইচ্ছা বা স্বেচ্ছাচারিতার উপর অনেক কিছুই ছেড়ে দিতে হয়েছিল। সম্রাটের ফরমানও তাদের বাধা দেওয়ায় সক্ষম হয় নি। ফলত, কৃষকদের রাজস্বের দাবি মেটাতে তাদের স্ত্রী, পুত্র—সবই বিক্রয় করে দিতে হোত। বিদেশী পর্যটকবৃন্দ এই অত্যাচারের করুণ ও জীবন্ত বর্ণনা

দিয়ে গেছেন। জাহাঙ্গীরের সময় এই নিষ্ঠুর অত্যাচার প্রায় চরমে উঠল এবং এই অত্যাচার থেকেই স্পষ্ট, কেন কৃষকদের পলায়ন তখন একটি সাধারণ ঘটনা ছিল। দিন যত যেতে লাগল—এই স্বাভাবিক ঘটনাও অস্বাভাবিক-ভাবে বাড়তে লাগল। এই পলায়ন শুধু দুর্ভিক্ষের জন্য নয়, ইরফান হাবিব-এর স্পষ্ট ভাষায় এটা ছিল মানুষেরই তৈরি এবং একথাও তিনি জানান, কৃষকদের অনাহারে মৃত্যু ও সশস্ত্র প্রতিরোধ ছাড়া তৃতীয় কোনো পথ ছিল না। প্রতিরোধ কিভাবে কৃষকদের দ্বারা ঘটত তার এক মূল্যবান পরিচয় দিয়েছেন শ্রীযুক্ত হাবিব তাঁর গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদে। তাদের প্রথম উপায় ছিল, ভূমিরাজস্ব না দেওয়া। কিন্তু জমিদারদের কোনো অত্যাচারী কার্যও তাদের বিদ্রোহে উত্তেজিত করে তুলত। সারাগ্রামই ঐক্যবদ্ধ হোত এবং যখন তারা পরাজিত, তাদের জন্য অপেক্ষা করত ভয়ংকর পরিণতি। অবশ্যই কৃষকদের শাসককে অস্বীকার করা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল—অত্যাচারের গভীরতা বিভিন্ন গ্রামে ছিল বিভিন্ন রকম। এবং দুটো সামাজিক শক্তিই কৃষকদের বিদ্রোহের পিছনে কাজ করত। প্রথমত বর্ণ বা জাতি। দ্বিতীয়ত, আরও গুরুত্বপূর্ণ, পঞ্চদশ শতকের শেষের দিকে আরম্ভ-হওয়া ধর্মীয় আন্দোলন—অবশ্যই এটা জাতিবিভাগের বিপক্ষে অর্থাৎ প্রথম কারণের বিরোধী। কারণ কবীর, হরিদাস প্রভৃতি জাতির বেড়া ভাঙতেই চেয়েছিলেন। সন্ন্যাসী ও শিখবিদ্রোহ এই দ্বিতীয় প্রেরণা থেকেই উদ্ভূত। এখানে মূল ব্যাপার জমিদারদের নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য হস্তক্ষেপ। কৃষকদের বিদ্রোহ এক স্তরে না এক স্তরে জমিদারদের নেতৃত্বের অধীনে চলে যেত। অথবা জমিদারদের বিদ্রোহেই কৃষকরা সাহায্য করত। অর্থাৎ দুই অত্যাচারী শ্রেণীর লড়াইয়ের সঙ্গে অত্যাচারিতের বিদ্রোহ পড়ত জড়িয়ে এবং সরকারী নথিপত্র থেকেই জানা যায় জমিদারদের প্রতি সরকারের মনোভাব বন্ধুভাবাপন্ন ছিল না। এই দুই শক্তির মধ্যে সমস্ত বিরোধ তৎকালীন রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই প্রতিযোগিতা নিঃসন্দেহেই ছিল অসমান—সেকারণে জমিদারদের মাঝে মাঝেই সমর্থন লাভের আশায় কৃষকদের প্রতি, শ্রীযুক্ত হাবিবের ভাষায়, কন্‌সিলিয়েটারি এ্যাটিচুড নিতে হোত। তা ছাড়া স্থানীয় লোক হওয়াতেও কৃষকদের অবস্থা ও রীতি-নীতি জানার সুযোগ তাদের বেশি ছিল। শুধু তাই নয়, ইম্পেরিয়াল এ্যাডমিনিস্ট্রেসনের প্রত্যক্ষ আওতায় থাকা কৃষকদের

জমিদাররা প্রায়ই আকর্ষণ করত। স্বভাবতই জমিদার ও কৃষকরা সরকারের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হোত। এবং সেই যুগের কৃষকবিদ্রোহের মোটামুটি সুষ্ঠু চিত্র ইরফান হাবিব এঁকেছেন। জাট, সন্ন্যাসী, শিখ এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি ছাড়া আর দুটোতেই ধর্ম মূল শক্তি ছিল। এ-প্রসঙ্গে অবশ্যই মারাঠাদের কথা সব থেকে উল্লেখযোগ্য। এ-ব্যাপারে ভীমসেনের জীবনীকে শ্রীযুক্ত হাবিব কাজে লাগিয়েছেন। জমিদাররা মারাঠাদের সঙ্গে যোগদান করেছিল। এবং মারাঠা শক্তির উত্থান ও কৃষকদের উপর সরকারী এলাকায় অত্যাচারের সম্পর্ক আছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মারাঠা pseudo chiefs-দের অত্যাচার। আওরঙ্গজেব যখন দ্বিতীয়বার দাক্ষিণাত্যে ভাইসরয়ালটি করতে গেলেন তখন কৃষকেরা পলায়মান। শিবাজীকে কৃষকরা সাহায্য করলেও, ইরফান হাবিব যথার্থ বলেছেন: there will be no greater mistake than to consider Shivaji and the Maratha Chiefs as conscious leaders of a peasant uprising. শুধু তাই নয়, একথা মনে করারও কোনো কারণ নেই যে মারাঠা রাজ্যে কৃষকরা অত্যাচারমুক্ত ছিল। শিবাজী তাদের সঙ্গে কি ব্যবহার করেছিলেন তার বর্ণনা আছে ফ্রায়ার-এর লেখায়। আগেকার তুলনায় দ্বিগুণ রাজস্ব দাবি তিনি করেছিলেন। এবং কানাড়ায় তিন-চতুর্থাংশ জমি চাষহীন অবস্থায় পড়ে রইল শিবাজীর স্বেচ্ছাচারে। শিবাজীর কাছে কৃষকেরা ছিল "naked starved rascals."—যারা তাঁর সৈন্যগঠনে সহায়তা করত। এবং They had to live by plunder only, for Shivaji's maxim was: No Plunder, no pay." মারাঠাদের সৈন্যদলের গতিবিধি কৃষকদের পক্ষে মোটেই সুখকর ছিল না। ইরফান হাবিব শিবাজী প্রসঙ্গে সত্যচিত্র দেখিয়ে সৎ ঐতিহাসিক কর্তব্যই করলেন—উগ্র জাতীয়তার ঝোঁকে আমরা যাই ভেবে থাকি না কেন।

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

বিপ্লবের সন্ধানে নাট্যকার : লিট্‌ল্ থিয়েটারের 'কল্লোল'

ঝিরিঝির আবহাওয়ায় ইংরেজি নাটকের চার দেয়ালের সংকীর্ণতার বাইরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে শ্রীউৎপল দত্ত হঠাৎ একদিন বাংলাদেশের মেহনতি মানুষকে আবিষ্কার করলেন। গণনাট্য আন্দোলনের মঞ্চে দাঁড়িয়ে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের অভিনন্দনে নতুন স্বাদের রসে নেশা লেগে গেল। শুরু হল বিপ্লবের সন্ধান। মাঠে ময়দানে খোলা মঞ্চে, পথসভার পোস্টার নাটিকার ভিতর দিয়ে চলল এই সন্ধান। কিন্তু যা খুঁজছিলেন, তা বোধ হয় উন্মুক্ত আকাশের নিচে তিনি পেলেন না, তাই গিয়ে উঠলেন পেশাদারী মঞ্চের আশ্রয়ে। নতুন ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হল। পেশাদারী মঞ্চের মুনাফার অমোঘ দাবি, জনতার চাহিদা আর বিপ্লবের নতুন ভাবের সংমিশ্রণের প্রচেষ্টায় দেখা দিল চমক লাগানো আলোর খেলা, মঞ্চসজ্জা, অতিনাটকীয়তা, ও কিছু নিচুদরের রসিকতা। বিপ্লবের সন্ধান কিন্তু ব্যাহত হল না। শ্রীদত্তের এই সন্ধানী মনের চরম প্রকাশ তাঁর অধুনা-মঞ্চস্থ নাটক 'কল্লোল'-এ। এই নাট্যকের মাধ্যমে অতি স্পষ্ট ও সোচ্চার কণ্ঠে তিনি তাঁর বিপ্লবের ধারণার স্বরূপ প্রকাশ করেছেন। সেইজন্য 'কল্লোল' নাটক সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন।

নৌবিদ্রোহ আমাদের মুক্তি সংগ্রামের একটি গৌরবময় অধ্যায়, আবার একটি অতি উপেক্ষিত ঘটনাও বটে। কংগ্রেসী নেতারা এ বিষয়ে বিশেষ কিছু বলতে চান না, কারণ তাঁদের রক্তপাতহীন বিপ্লবের সযত্নে গড়ে তোলা সৌধ তাহলে ধ্বংস হয়ে যায়। নৌবিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত 'কল্লোল' সেই জন্যই দর্শক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। শ্রীউৎপল দত্তের তীক্ষ্ণ ব্যবসা-বুদ্ধি ও রাজনৈতিক চেতনার বিচিত্র সংমিশ্রণেই 'কল্লোল' নাটকের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। এই নাটক রচনার পেছনে অনেক গভীর চিন্তা ও গভীর অধ্যয়নের প্রমাণ রয়েছে। নৌবিদ্রোহের ঘটনার সঙ্গে একটি ব্যক্তিগত সমস্যা নাট্যকার অতি সার্থকভাবে মিলিয়েছেন। যুদ্ধের বা বিপ্লবের কালের অতি পরিচিত এই অভিজ্ঞতা বিদেশের সাহিত্যে বহুবার এসেছে, কিন্তু ভারতে বোধ হয় এই প্রথম, অন্তত থিয়েটারে।

নাটকের নায়ক শার্দুল সিং যুদ্ধের পর দেশে ফিরে এসে দেখে যে তার স্ত্রী

লক্ষ্মীবাঈ আহত নাবিক সুভাষ দেশাইকে বিবাহ করতে উদ্যত। যুদ্ধে শার্দুল নিখোঁজ হয়েছিল। সরকার থেকে তার পরিবারকে ভাতা দেওয়া বন্ধ করা হয়েছিল। সেই দুর্দিনে সুভাষ বাঁচিয়ে রেখেছিল এই পরিবারটিকে। সবাই ধরে নিয়েছিল যে, শার্দুল মৃত। কৃতজ্ঞতাবশে তাই লক্ষ্মী সুভাষের ভালোবাসাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে নি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটা বড় নাটক গড়ে উঠতে পারত। শ্রীদত্ত কিন্তু সেদিক দিয়ে একেবারেই যান নি। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থেকে এক মুহূর্তের জন্যও বিচ্যুত না হয়ে কঠিন সংযমের সঙ্গে তিনি এই ঘটনাকে ব্যবহার করেছেন তাঁর নাটকের নায়ক শার্দুলের চরিত্র উদ্‌ঘাটিত করার জন্য—শার্দুলের জীবনে আপসের কোনো স্থান নেই।

নাটকীয় চরিত্র সৃষ্টিতে শ্রীদত্তের দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে কৃষ্ণাবাঈয়ের মধ্যে। এই জীবন্ত চরিত্রটি অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন শোভা সেন। বিচিত্র তার দ্বন্দ্ব, কঠিন তার জীবনের দাবি। শার্দুলজননীর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিদেশী শাসকশ্রেণীর প্রতি তীব্র ঘৃণা, অপত্যস্নেহ, পুত্রবধূর সমস্যার প্রতি অসীম দরদ ও উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা। শোভা সেন তাঁর চলায়, বলায় এই নানা ভাবনার টানাপোড়েন অত্যন্ত গভীরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। একমাত্র তিনিই নাটকের মধ্যে আবেগময় মুহূর্ত সৃষ্টি করেছেন বারেবারে।

একজন নাবিককে শ্রীদত্ত সূত্রধার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তার প্রস্তাবনা দিয়েই নাটকের শুরু। তারপরে মাঝে মাঝেই তার আবির্ভাব। ঐতিহাসিক ঘটনার বিশ্লেষণ ও তার রাজনৈতিক শিক্ষা সূত্রধারের ভাষণের মাধ্যমেই শ্রীদত্ত প্রকাশ করেছেন। 'কল্লোল' একটি রাজনৈতিক নাটক। অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় কিছুটা সোচ্চারকণ্ঠে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ এই নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপের সব নাটকেই মঞ্চব্যবস্থা নিয়ে নানারকম পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা দেখা যায়। তাপস সেন এতকাল আলোকসম্পাতের সাহায্যে মোহ সৃষ্টি করে এসেছেন। এবার তিনি মঞ্চ-পরিকল্পনায় তাঁর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর পরিকল্পনাকে সুন্দরভাবে রূপ দিয়েছেন সুরেশ দত্ত। মঞ্চটিকে মাঝামাঝি লম্বালম্বিভাবে কেটে দু'ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে স্থান পেয়েছে খাইবার জাহাজের অভ্যন্তর, তার ডেক, রিয়ার অ্যাড্‌মিরাল র‍্যাট্‌ট্রের জাহাজ ও ওয়াটার ফ্রন্ট্ বস্তি যেখানে বাস করে নাবিকদের আত্মীয়স্বজন।

এই বোধ হয় প্রথম লিট্‌ল্ থিয়েটারের মিনার্ভা মঞ্চের প্রযোজনায় মঞ্চসজ্জা ও আলোকসম্পাত অতিনাটকীয়তার পর্যায়ে পৌঁছয় নি, প্রয়োজনের মাত্রাকে ছাড়িয়ে যায় নি, বরং সহজ ও বাস্তবানুগ হয়েছে, সেইজন্যই দর্শকমনে তার প্রভাব এত গভীর।

শ্রীউৎপল দত্তের পরিচালনায় যে-গুণাবলী স্বভাবতই আশা করা যায় তার কিছু কিছু 'কল্লোল'-এও বর্তমান। ঘটনার গতি দ্রুত। মঞ্চ পরিবর্তন নাটকের গতিকে ব্যাহত করে না। যৌথ অভিনয় ভালো। কিন্তু একক অভিনয় বড়ই দুর্বল। শার্দুল সিংয়ের ভূমিকায় শেখর চট্টোপাধ্যায় মনে দাগ রাখেন, ততটা অভিনয়ের গুণে নয়, যতটা তাঁর চেহারার জন্যে। গীতা সেনের উপর ভার পড়েছে লক্ষ্মীবাঈয়ের দুরূহ চরিত্রটির। স্বামীর প্রতি প্রেম ও উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতার যোটানার দ্বন্দ্বকে তিনি সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারেন নি। মনে হয় যেন চরিত্রের গভীরে তিনি পৌঁছতে পারেন নি। অবশ্য এই দুর্বলতার দায়িত্ব হয়ত অনেকটাই নাট্যকার পরিচালক শ্রীদত্তেরই। লক্ষ্মীবাঈয়ের সংকট অন্য সংকটে এমনই নিমজ্জিত যে, তা যেন দানা বেঁধে উঠতে পারে নি।

মণয় মুখোপাধ্যায়ের সুভাষ অতি দুর্বল চরিত্রায়ণ। একমাত্র ইংরেজ ফৌজের হামলার সম্মুখে যখন তিনি বোকা সাজেন, তখনই তাঁর অভিনয়-ক্ষমতার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। কেন্দ্রীয় ধর্মঘট কমিটির মুখপাত্র সাকসেনা চরিত্রটি নাট্যকার যেভাবে ছকে ফেলে সৃষ্টি করেছেন, তা শান্তনু ঘোষের পক্ষে তাঁর মানসিক দ্বন্দ্ব স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ করার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইন্দ্রজিৎ সেনগুপ্ত কংগ্রেস নেতা সর্দার মগনলালের চরিত্রটি নাট্যকারের পরিকল্পনা-অনুযায়ী রূপ দিতে সমর্থ হয়েছেন। র‍্যাট্‌ক্লিফ-র ভূমিকায় শ্রীদত্ত এই চরিত্র সম্পর্কে তাঁর নিজের ধারণার সীমার মধ্যে ভালো অভিনয় করেছেন।

'কল্লোল'-এর সংগীত সৃষ্টি করেছেন লোকসংগীত পারদর্শী হেমাঙ্গ বিশ্বাস। তিনিও বোধ হয় নাট্যকারের স্থিরীকৃত কতকগুলি বাধানিষেধের চৌহদ্দির বাইরে যাবার সুযোগ পান নি। তাঁর পরিচিত বহু ভারতীয় বিপ্লবী সংগীতের ব্যবহার না করার আর কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এ রকম অনেক সংগীতই নৌবিদ্রোহীদের কণ্ঠে বিদ্রোহের সময় শোনা গিয়েছিল। তার বদলে রুশ ও জর্মন নৌবিদ্রোহীদের ইতিহাসবিখ্যাত কয়েকটি গান

'কল্লোল'-এর কাহিনীতে তিনি যোজনা করেছেন, এর সঙ্গে ব্যবহার করেছেন আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের গান "আন্তর্জাতিক" রুশ ভাষায়। ভারতীয় নৌবিদ্রোহকে অন্য দেশের নৌবিদ্রোহের সমপর্যায়ে স্থান দেবার জন্যও কমিউনিস্ট প্রভাবের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যই বোধহয় এই গানগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। মহারাষ্ট্রের দুটি লোকসংগীতের সুরও শ্রীবিশ্বাস, কিছুটা স্থানীয় আবহাওয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন। দুঃখের বিষয়, সংগীতের ব্যবহার বিশেষ সফল হয় নি। তার প্রধান কারণ, ধ্বনিগ্রহণ ও প্রক্ষেপণ অতি কর্কশ। তাই সংগীতের বদলে শোনা গেল কর্ণবিদারক কিছু কর্কশ ধ্বনি। হয়ত শ্রীদত্ত এইটেই চেয়েছিলেন তাঁর নাটকের রূঢ় বাস্তবতাকে সঠিক ভাবে প্রকাশ করার জন্য।

কাহিনী মোটামুটি নৌবিদ্রোহের মূল ঘটনাবলী কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। ঘটনা বিস্তারের বিবরণে ঐতিহাসিক তথ্য থেকে শ্রীদত্ত অবশ্য অনেক দূরে সরে এসেছেন। এ কথা সত্য যে ঐতিহাসিক নাটক সৃষ্টি করতে গিয়ে সব সময় সব ঘটনাকেই হুবহু নাটকের মধ্যে স্থান দেওয়া সম্ভব নয়। নাটকের খাতিরে কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন প্রয়োজন। শ্রীদত্ত কিন্তু এই অতি প্রয়োজনীয় পরিবর্তন বা পরিবর্ধনেই ক্ষান্ত হন নি। ঘটনাকে তিনি ব্যবহার করেছেন তাঁর নিজের ইতিহাস-ব্যাখ্যার প্রয়োজনে। তাই পরিবর্তন ও পরিবর্ধন পরিণত হয়েছে সত্যের অপলাপে, ঘটনার বিকৃতিতে।

'কল্লোল' নাটকের ঘটনা সাজানো হয়েছে এমনভাবে, যাতে মনে হয় যে, 'খাইবার' জাহাজেই নৌবিদ্রোহের শুরু এবং তা সংগঠিত হয় কমিউনিস্ট নেতৃত্বে। বিদ্রোহ শুরু হবার পর যখন খাইবারে তিনটি পতাকা উত্তোলিত হয়, তখন কংগ্রেস ও লীগের পতাকা প্রায় দেখাই যায় না; আলোয় ধরা পড়ে একমাত্র রক্তপতাকা।

নৌবিদ্রোহ শুরু হয়েছিল বোম্বাই শহরে অখাদ্য আহার্যের বিরুদ্ধে 'তলোয়ার' নৌ-ঘাঁটিতে ধর্মঘটের ভিতর দিয়ে। এর পিছনে ছিল নাবিকদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতনের বহুদিনের ইতিহাস ও দেশের তদানীন্তন গণবিক্ষোভ। 'পাঞ্জাব' জাহাজ থেকেই প্রথম এই আন্দোলনকে একটা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দেবার চেষ্টা করা হয়। তার কারণ, এই জাহাজে কিছু কমিউনিস্ট ছিলেন। কিন্তু এ কথাও অনস্বীকার্য যে কমিউনিস্ট পার্টি সহ কোনো রাজনৈতিক দলই নৌবিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। অবশ্য

এঁদের নেতৃস্থানীয় অনেকেই সামরিক বাহিনীর ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। তবু কেবল কমিউনিস্ট ও সোশালিস্টরাই এই পরিস্থিতিতে দ্রুত বিদ্রোহীদের সাহায্যে এগিয়ে এসে যতটা সম্ভব রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিতে চেষ্টা করে। 'কল্লোল' নাটকে এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি একেবারেই স্থান পায় নি।

নৌবিদ্রোহের মধ্য দিয়ে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক সত্য প্রতিফলিত হয়—তা হ'ল বৈপ্লবিক সম্ভাবনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা। কমিউনিস্ট পার্টির ডাকে শ্রমিকশ্রেণী রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘটে অভূতপূর্ব সাড়া দেয়। শুধু তা-ই নয়। বোম্বাই শহরের রাস্তায় ব্যারিকেড তুলে তারা ব্রিটিশ ফৌজী হামলার প্রতিরোধ করে। এই পরিস্থিতিতে নৌবিদ্রোহীরা ব্যারিকেডের পিছনে সংগ্রামী শ্রমিকদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র পৌছে দেবার কথাও চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু বিপ্লবের এই দুই ধারার মিলন সেদিন সম্ভব হয় নি। তার কারণ বিপ্লবী পরিস্থিতির জন্য মানসিকভাবে ও সাংগঠনিক ভাবে প্রস্তুত দৃঢ়সঙ্কল্প রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাব।

এই ক্ষেত্রে সঠিকভাবেই শ্রীদত্ত ঐতিহাসিক সত্যকে ছাড়িয়ে গেছেন। তিনি মঞ্চে উপস্থিত করেছেন সাধারণ মানুষের সশস্ত্র সংগ্রাম। সংগ্রামী জনতার হাতে অস্ত্র তুলে দিল খাইবারের বিদ্রোহী নাবিক। এখানে কিন্তু একটা বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সশস্ত্র সংগ্রামে আমরা শ্রমিকশ্রেণীকে দেখতে পেলাম না; দেখলাম নৌবিদ্রোহীদের আত্মীয়-স্বজনকে। নৌবিদ্রোহীদের অনেকেই যে শ্রমিকের ঘরের ছেলে, তাই দিয়েই কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী ভূমিকা প্রতিফলিত হয় না।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে নৌবিদ্রোহের ফলে কেবল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরাই নয়, কংগ্রেস ও লীগের অনেক নেতাই অত্যন্ত ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। এই পরিস্থিতি 'কল্লোল'-এ কী ভাবে প্রকাশ পেয়েছে? স্থানীয় কংগ্রেস নেতা সর্দার মগনলালকে একটি ঘৃণ্য চরিত্ররূপে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে কুচক্রী। নানা চক্রান্তের সাহায্যে সে 'খাইবার'-এর বিদ্রোহীদের শেষ পর্যন্ত ধরিয়ে দেয়। অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি অ্যাডমিরাল র‍্যাটক্লিফকে একটি হাস্যাস্পদ চরিত্ররূপে দেখানো হয়েছে; ফলে দর্শকের ক্রোধ গিয়ে পড়ে একমাত্র কংগ্রেসের উপর, আসল শত্রু ব্রিটিশের উপর নয়। এ নাটকে অবশ্য মুস্লিম লীগের কোনো স্থান নেই। এই সূত্রে কিছুতেই

ভুলে গেলে চলে না যে, শত দ্বিধা সত্ত্বেও জওয়াহরলাল বলেছিলেন, "আর, আই, এন্-এর ঘটনা ভারতীয় সামরিক বাহিনীর ইতিহাসে একেবারে নতুন এক অধ্যায় রচনা করেছে।"

আমাদের মুক্তিসংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে নৌবিদ্রোহের যে-গুরুত্ব, তাকেও ছোট করে দেখা হয়েছে। নৌবিদ্রোহ শুরু হয় ১৮ই ফেব্রুয়ারি। ঠিক তার পরদিনই অ্যাট্‌লী ভারতে ক্যাবিনেট মিশন পাঠাবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের আলাপ-আলোচনা শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পিছনে নৌবিদ্রোহকে খুব বেশি গুরুত্ব না দিলেও ঘটনা-পরম্পরাকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে অ্যাট্‌লীর এই ঘোষণাকে নাটকে প্রায় কোনো গুরুত্বই দেওয়া হয় নি। সর্দার মগনলালের মুখে একবার কথাটি উচ্চারিত হয় মাত্র।

বোম্বাই শহরের সাধারণ মানুষের বিপ্লবী চেতনা ও নৌবিদ্রোহীদের সাহায্যদানে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকাকেও ছোট করে দেখানো হয়েছে। সূত্রধার ঘোষণা করে যে, রাত্রের অন্ধকারে শহরের মানুষ নৌবিদ্রোহীদের খাদ্য সরবরাহ করে। কথাটা শুনতে খুব রোমাঞ্চকর। কিন্তু যা ঘটেছিল তা আরও বীরত্বপূর্ণ। দিনের আলোয় বোম্বাই শহরের সাধারণ মানুষ গেটওয়ে অফ্ ইণ্ডিয়ার সামনে সমবেত হয়ে দলে দলে নৌবিদ্রোহীদের জন্য খাদ্য সরবরাহ করেন। ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর অত্যাচারের ভয়কে উপেক্ষা করেই তাঁরা বিদ্রোহীদের সাহায্যে সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে যদি নাটক-বর্ণিত 'খাইবার' জাহাজীদের একক সংগ্রাম বিচার করা যায়, তা হলে এই ঘটনাটির প্রকৃত তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে। সত্যিই এ রকম কোনো ঘটনাই ঘটে নি। কেন্দ্রীয় ধর্মঘট কমিটির শেষ সভায় 'খাইবার'-এর প্রতিনিধিরা ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন। কিন্তু তাঁরা বিপ্লবী নিয়মানুবর্তিতা থেকে এক মুহূর্তের জন্যও বিচ্যুত হন নি। সংখ্যাগরিষ্ঠদের মত তাঁরাও মেনে নেন। একক সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে আপসহীন সংগ্রামের এক জলন্ত উদাহরণ রেখে যাবার কোনো চেষ্টাই তাঁরা করেন নি। নাটকটি কিন্তু গড়ে উঠেছে এই একক সংগ্রামকেই কেন্দ্র করে; আপসহীন সংগ্রামের জলন্ত উদাহরণের কথা অতি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। বাস্তবে বিদ্রোহ চালিয়ে যাবার সপক্ষে খাইবার-এর নাবিকেরা একটি যুক্তি উপস্থিত করেছিলেন। তাঁদের মতে দেশে তখন একটা বৈপ্লবিক

পরিস্থিতির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘট ও সামরিক বাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ, বিপ্লবের এই দুই ধারার মিলন ঘটানো তখন সম্ভব ছিল। প্রকৃত বৈপ্লবিক পরিস্থিতির তৃতীয় ধারা—কৃষক বিপ্লব—কিন্তু ১৯৪২ সালের ব্যর্থ সংগ্রামের মধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছে। সে-অভ্যুত্থানের অবস্থা তখন আর নেই। এই অবস্থায় একক সংগ্রামকে মধ্যবিত্ত-সুলভ অতিবিপ্লবী হঠকারিতা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। 'কল্লোল'-এর ইতিহাসবিকৃতি এই পন্থার দিকেই নির্দেশ করে। বিপ্লবী ও মার্কসবাদী নাট্যকার শ্রীদত্ত যদি অবশ্য এই মধ্যবিত্তসুলভ অতিবিপ্লবী হঠকারিতাই প্রচার করতে চান, তা হলে কিছু বলার নেই।

এই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীদত্তের আরেকটি বিশেষ দাবি বিচার করা প্রয়োজন। হোকৃথ্ রচিত 'প্রতিনিধি' নাটকের উল্লেখ করে শ্রীদত্ত তাঁর নাটকের প্রোগ্রামে 'ঐতিহাসিক পটভূমিকা'য় বলেছেন, "'কল্লোল' নাটক হখুথের নাট্যাদর্শে রচিত।" অনেক চিন্তা করে 'কল্লোল' নাটকের মাত্র দুটি জায়গায় হোকুথের অনন্যসাধারণ নাটকের সামান্য ছায়া মাত্র আবিষ্কার করতে পেরেছি। 'কল্লোল'-এর প্রথম দৃশ্যের আলোছায়ার খেলা ও শব্দক্ষেপণ 'প্রতিনিধি'-র বিখ্যাত এককভাষণ বা মনোলগ দৃশ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 'কল্লোল'-এ এক ভারতীয় সামরিক অফিসার শার্জেন্টের জীবন বাঁচাতে চেষ্টা করে ও তার স্ত্রীকে ইংরেজদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করে। 'প্রতিনিধি'-তেও এমনি একটি ঘটনা আছে। রোমে জার্মান নাৎসি সৈন্যদের হাত থেকে একটি ইহুদী শিশুকে ইতালীয় সৈন্যেরা রক্ষা করে। হোকুথের নাট্যাদর্শের বৈশিষ্ট্য কিন্তু অন্য জায়গায় খুঁজতে হয়। তিনি সাম্প্রতিককালের ঘটনা নিয়ে নাটক লিখতে গিয়ে ঐতিহাসিক চরিত্রসমূহকে মঞ্চের উপর নিয়ে এসে দর্শকদের সম্মুখে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে দ্বিধা করেন নি। তাই 'প্রতিনিধি' নাটকে আমরা তদানীন্তন পোপকে দেখতে পাই ; সে চরিত্রায়ণে কোথাও কোনো আপস নেই। শ্রীদত্ত কিন্তু সর্দার প্যাটেলকে মঞ্চের উপর নিয়ে আসতে সাহস পান নি। অথচ এই সর্দার প্যাটেল ও জনাব জিন্নার আশ্বাস বাণীর উপর নির্ভর করেই নৌবিদ্রোহীরা শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করেন। এই নেতৃদ্বয় কিন্তু কোনো সময়েই নৌবিদ্রোহীদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন নি। 'কল্লোল'-এ একমাত্র ঐতিহাসিক চরিত্র অ্যাড্‌মিরাল র‍্যাট্রেকেও সঠিকভাবে চিত্রিত করা হয় নি। কেন্দ্রীয় ধর্মঘট কমিটির

সম্ভাপতি খানের পরিবর্তে সাক্সেনাকে নাটকে নিয়ে আসা হয়েছে। কিন্তু সেও খানের অতি দুর্বল রূপায়ণ।

হোকৃথের নাটকের শেষে Sidelights on History বলে একটি টীকা আছে। তাতে তিনি ইতিহাসের ঘটনাবলী আলোচনা করে দেখিয়েছেন কী গভীর নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে তিনি ইতিহাসকে ব্যবহার করেছেন। মূল ঘটনাবলী ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রগুলি অবিকৃত। সংক্ষেপের ব্যাপারেও ইতিহাসের সত্যকে তিনি কোথাও বিকৃত করেন নি। এই সত্যনির্ভরতার জন্যই তাঁর সমালোচনা এত তীক্ষ্ণ ও এত সার্থক হয়েছে।

হোকৃথের নাট্যাদর্শের অনুকরণে শ্রীদত্তও তাঁর নাটকের সঙ্গে একটি টীকা সংযোজন করেছেন—"নৌবিদ্রোহের ঐতিহাসিক পটভূমিকা"। কিন্তু ঐ উচ্চাদর্শ বিস্মৃত হয়ে শ্রীদত্ত ইতিহাসের সেই সব ঘটনাই উল্লেখ করেছেন যা তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন করে। হোকৃথের নাট্যাদর্শের উল্লেখ করে শ্রীদত্ত নিজেকে বাস্তবিক হাস্যাস্পদ করেছেন।

'কল্লোল' নাটকে সূত্রধারের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। এই সূত্রে এ বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন। শ্রীদত্ত দাবি করে থাকেন যে তিনি ব্রেখ্‌ট্‌-এর নাট্যাদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত। ব্রেখট্‌-এর alienation বা বিচ্ছিন্নতার তত্ত্বের প্রয়োগ হিসাবেই বোধ হয় সূত্রধারের বিচার করা দরকার। আসলে কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। যখন মঞ্চের ঘটনাবলী দর্শকের মনকে নাটকের সঙ্গে একাত্মতায় বাঁধতে অক্ষম হচ্ছে, তখনই সূত্রধার গরম গরম বক্তৃতার জোরে কৃত্রিমভাবে সেই একাত্মবোধ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে। তাব মেঠো বক্তৃতার সাহায্যে শ্রীদত্ত তাঁর রাজনৈতিক বক্তব্যকেই প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছেন।

নাটকের শুরুতে যখন সূত্রধার বলে যে মঞ্চে বর্ণিত ঘটনা যেন থিয়েটারের চার দেয়ালের বাইরে দর্শকেরা বলে না বেড়ান, কারণ তাহলে নাকি ডি. আই. আর-এর আঘাতে 'কল্লোল' নাটকের অভিনয় বন্ধ হয়ে যেতে পারে, তখন সত্যি হাসি পায়, শ্রীদত্তের জন্য দুঃখও হয়। সরকার তাঁর নাটকীয় ভাব-ভঙ্গীকে খুব গুরুত্ব দিচ্ছেন না ; তিনি এত চেষ্টা করছেন, অথচ তাঁর নাটককে বন্ধ করে দিয়ে তাঁকে শহীদ হবার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না! ফ্যাশিস্ট সরকারের এই ব্যবহার সত্যিই অমার্জনীয়!

মনে হতে পারে শ্রীউৎপল দত্তের উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত পাগলামি ছাড়া এসব

আর কিছুই না। আসলে কিন্তু এই পাগলামির পিছনে কিছুটা মতলব আছে মনে হয়। তাঁর নাটকের বক্তব্য সম্পর্কে যা-কিছু রাজনৈতিক সমালোচনা হতে পারে, তা আগে থেকেই ভেবে নিয়ে শ্রীদত্ত তাঁর নাটকের মধ্যেই তার জবাব তৈরি করে রেখেছেন, হোকুখের কথা সেইজন্যই বলেছেন, ব্রেখট্‌-এর alienation বা বিচ্ছিন্নতার তত্ত্ব তাঁর পালাবার আরেকটি পথ। এ ছাড়াও আরও জবাব খুঁজে পাওয়া যাবে।

আপসহীন বিপ্লবী মনোভাবটিকে নাটকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে শার্দুল সিংয়ের চরিত্রের মাধ্যমে। শ্রীদত্ত প্রতিপন্ন করেছেন যে, শার্দুল তার ব্যক্তিগত জীবনেও আপস করতে রাজী নয়, তার স্ত্রী ও সুভাষকে সে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারে না। এই ঘটনার সাহায্যে শ্রীদত্ত প্রমাণ করতে পারেন যে, আপসহীনতার যে চূড়ান্ত উদাহরণ নাটকে পাওয়া যায় তার সত্যিই কোনো রাজনৈতিক গুরুত্ব নেই, আসলে এটা একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার।

শ্রীদত্ত যে মধ্যবিত্তসুলভ নৈরাজ্যবাদের প্রবক্তা এবং বিপ্লবী শৃঙ্খলাবোধকে অস্বীকার করেন, এ কথাই বা কেমন করে বলা যায়? শার্দুলের সহকর্মীরা যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে তার পরিবারকে বাঁচাবার জন্য তারা আলোচনায় বসবে, তখন শার্দুল তাদের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়াতে এক মুহূর্তের জন্যও দ্বিধা করে নি। অবশ্য এরপর শার্দুল যে ইংরেজদের হাতে মরে প্রমাণ করে দিল যে তার আপসহীন সংগ্রামের নীতিই সঠিক, সেটাকে বোধ হয় বেশি গুরুত্ব না দিলেও চলে! শ্রীদত্ত বলতে পারেন যে, কংগ্রেস ও লীগ নেতৃত্বের আশ্বাসবাণী সত্ত্বেও যে শেষ পর্যন্ত নৌবিদ্রোহীদের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল, শার্দুলের মৃত্যু সেই ঘটনারই নাটকীয় রূপ মাত্র, আর কিছুই নয়।

স্থানীয় কংগ্রেসনেতাকে একটি জঘন্য, মতলববাজ, ঘৃণ্য চরিত্র হিসাবে দেখিয়ে শ্রীদত্ত যে কংগ্রেসের প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি করেছেন, এ কথা বলাও কি ঠিক? মগনলাল তো রিয়ার অ্যাডমিরাল র‍্যাট্রের সঙ্গে খুব কড়া করেই কথা বলেন, এমন কি সাহেবের সামনে একেবারে খাঁটি ভারতীয় কায়দায় চেয়ারের উপর পা তুলে বসেন। হোকুখ ও ব্রেখট্‌-এর ভারতীয় সংমিশ্রণের পর সাম্প্রতিক কালের ঘটনার নাট্যরূপে এর চেয়ে বেশি আর কী আশা করা যেতে পারে?

সাক্‌সেনার প্রতিও শ্রীদত্ত খুবই সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন। অবশ্য যে কেন্দ্রীয় ধর্মঘট কমিটির প্রতিনিধি এই সাক্‌সেনা, তাকে প্রথম থেকেই

'খাইবার'-এর নাবিকেরা অবজ্ঞা করে এসেছেন। 'ভাড়াটে' যোদ্ধা ভারতীয় অফিসারটির প্রতিও শ্রীদত্ত সহানুভূতিশীল। ইংরেজ অফিসারের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠে কথা বলার সাহস তার আছে। অবশ্য ঘটনার আবর্তে এই দুই চরিত্রই শেষ পর্যন্ত বাস্তবক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতক প্রতিপন্ন হয়, কারণ তারা তাদের নিজেদের চরিত্রের স্ব-বিরোধের জালে জড়িয়ে পড়েছিল। এই পিছল পথের একমাত্র এই পরিণতিই তো সম্ভব! শ্রীদত্ত কি করবেন? শত সহানুভূতি থাকলেও হোকুথ ও ব্রেখট্-এর নাট্যাদর্শে অনুপ্রাণিত নাট্যকার হয়ে তিনি এই চরিত্র দুটিকে ইতিহাসের নির্মম বিচারের হাত থেকে কি করে রক্ষা করতে পারেন? তা হলে যে ইতিহাসের সত্যকে উপেক্ষা করা হয়। এত বড় পাপ তো শ্রীদত্তের পক্ষে সম্ভব নয়!

শ্রীদত্তের ঐতিহাসিক সত্যের প্রতি আনুগত্যের এই রকম আরো তথ্য নাটকের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও নাটকের মধ্য থেকে একটা স্পষ্ট রাজনৈতিক বক্তব্য ফুটে উঠেছে। শ্রীদত্তের মতে বিপ্লবী সংগ্রামের মধ্যে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কোনো স্থান নেই; বস্তুত তারা শ্রেণী-শত্রুর হাতিয়ার হিসেবেই কাজ করে থাকে। তাঁর মতে, পথ একটিমাত্র—মুষ্টিমেয় বিদ্রোহীর নির্মম, তীব্র আপসহীন সংগ্রাম।

এটি একটি অত্যন্ত মারাত্মক রাজনৈতিক মতবাদের প্রকাশ। শ্রীদত্তের বিপ্লব-চিন্তায় শ্রমিকশ্রেণীর কোনো ভূমিকা নেই; তারা কেবল মুষ্টিমেয় সংগ্রামী বীর বিপ্লবীর প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে ধর্মঘট করতে পারে। শ্রীদত্তের মতে বিপ্লবী গণসংগ্রামের চেয়ে মুষ্টিমেয় কিছু বীর বিপ্লবীর শহীদ হওয়া ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বিপ্লবী রাজনৈতিক পার্টির নেতৃত্বের কোনো প্রয়োজন নেই; বিপ্লবী পরিস্থিতির কোনো প্রয়োজন নেই; কেবলমাত্র কিছু বিপ্লবীর দ্বারাই যেন বিপ্লব সম্ভব। তাঁর বিচারে প্রয়োজন আসলে elite বা বাছাই করা কিছু ব্যক্তির।

বিপ্লবের এই মধ্যবিত্তসুলভ চিন্তাধারা বহুকাল আগেই ইতিহাসের আবর্জনা-স্তূপে স্থান পেয়েছে। আজ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ধারণা ইতিহাসের পাতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে, সারা পৃথিবী দ্রুত সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে অনেক সময়ই শ্রেণী-শত্রুর গুপ্ত দালালেরা এইরূপ সচেতনভাবে প্রয়োচনা সৃষ্টি করে; গণবিপ্লবকে ব্যাহত করার উদ্দেশ্যে অসময়ে সংগ্রামের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বিপ্লবকে সাময়িকভাবে ছত্রভঙ্গ করে দেয়,

দুর্বল করে দেয়। মধ্যবিত্তসুলভ বিপ্লববাদের রঙিন চোখ-ঝলসানো পোশাক পরেই এরা নিজেদের কার্যসিদ্ধি করে। সেইজন্যই আজকের ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে মধ্যবিত্তসুলভ নৈরাজ্যবাদ ফ্যাসিবাদের সচেতন সহায়। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দুর্বলতার কারণে ভারতবর্ষে ফ্যাসিবাদ নানা ক্ষেত্রে উর্বর জমি খুঁজে পাচ্ছে। এই অবস্থায় মধ্যবিত্তসুলভ নৈরাজ্যবাদের এই প্রকাশকে কেবল ছেলেমানুষি বা অপরিণত বুদ্ধির প্রলাপ বা অরসিকের বিকার বলে উপেক্ষা করা যায় না।

শেষ পর্যন্ত একটা প্রশ্নের অবশ্য মীমাংসা হল না। শ্রীউৎপল দত্ত কি সচেতনভাবে প্রতিক্রিয়ার এই বিপজ্জনক খেলায় যোগ দিয়েছেন, না, এটা তাঁর ইয়াগো-সুলভ 'motiveless malignity' বা উদ্দেশ্যহীন বিদ্বেষের প্রকাশ?

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমার বাণী কখনো শুনি, কখনো শুনি না-যে

'মায়ার খেলা' রবীন্দ্রনাথের সাতাশ বছর বয়সের রচনা, যখন "গানের রসেই সমস্ত মন অভিষিক্ত হইয়াছিল"। গীতমুখ্য এই রচনা পুরনোকালে সংগীত-রসাগ্রাহীদের কাছে তাই যথেষ্ট আকর্ষক ছিল। ইন্দিরাদেবী চৌধুরানীর বিশেষ পক্ষপাত ছিল 'মায়ার খেলা'র প্রতি, আর, 'ঘরোয়া'তে অবনীন্দ্রনাথ বলছেন: "মায়ার খেলার মতো অপেরা আর হয় নি।···ওতে তাঁর নিজের কথার সঙ্গে সুরের পরিণয় অদ্ভুত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ওখানে একেবারে তাঁর নিজস্ব সুর। অপেরা-জগতে ওটি একটি অমূল্য জিনিস।" 'মায়ার খেলা' মূলত ছিল গীতিনাট্য; ১৩৪৫ সালে শান্তিনিকেতনের ছাত্রীদের জন্য এটি নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত হয়। কলকাতায় এই নৃত্যনাট্য-রূপটিই বহুল অভিনীত। ১৩৬৩ সালে 'মায়ার খেলা'র গীতিনাট্য-রূপ সম্ভবত শেষবারের মতো মঞ্চস্থ হয়। বহুকাল পরে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ এই গীতিনাট্য-রূপ নিবেদন করলেন। তাঁদের এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য; সেই সঙ্গে এই সাহসিক প্রয়াস অনিন্দনীয় হলে এই প্রযোজনা স্মরণীয় হয়ে থাকত।

সমগ্র গীতিনাট্যটি, আশ্রমিক সংঘের প্রযোজনায়, অযৌক্তিকভাবে খণ্ডিত হয়েছে, যেজন্য তার কিছু আশ্চর্য গান বাদ পড়েছে শুধু নয়, নাট্যরসও ক্ষুণ্ণ

হয়েছে। অমর ও শান্তার প্রতি যতটা মূল্য আরোপিত হয়েছে, কুমার ও অশোক ততটাই নেপথ্যে পড়েছে এবং একটি স্বচ্ছতোয়া প্রেমে প্রমদা মাঝখানে কিছু বাধাসৃষ্টি করবার অপপ্রয়াস পেয়েছে—'মায়ার খেলা' দেখে এই ধারণা প্রশ্রয় পেল। বস্তুত, 'মায়ার খেলা' শুধু দুজনের নয়, আরও কিছু তরুণহৃদয়ের প্রেমবিলাস এর উপজীব্য। যারা 'সুখের লাগি চাহে প্রেম' তাদের প্রতি তির্যক ধিক্কারই ছিল 'মানসী'-'মহুয়া'র লেখকের উদ্দেশ্য—আশ্রমিক সংঘের পরিচালনা সে-উদ্দেশ্য রূপায়িত করতে পারে নি।

গানের ব্যাপারে পরিচালনার অভাব চোখে পড়েছে, বিশেষ, অশোকের গানে এবং মায়াকুমারী ও সখীদের সম্মেলক সংগীতে। অভিনেতারা মঞ্চের উপর এসে স্বকণ্ঠে গান গেয়েছেন, এটুকুই সাধুবাদযোগ্য—বাস্তবক্ষেত্রে সেটি ব্যর্থ। আজকের খ্যাতনামা সংগীতশিল্পীদের কণ্ঠও ক্রুত পরিমাণে মাইক-নির্ভর—এ-নাটকে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। মাইকের ব্যবস্থা ছিল খারাপ, আর শুধু মাইকের নীরবতা অভিনেতাদের মূকাভিনয়ের নামান্তরমাত্র নয়—স্বর-প্রক্ষেপ বা স্পষ্ট উচ্চারণ তাঁদের সংগীতচর্চায় অবহেলিত। মায়াকুমারী এবং সখীদের নেপথ্য মাইকসহযোগে সংগীত যতটা কর্ণবিদারী হয়েছে—তারই পাশে মঞ্চের উপর একক সংগীতগুলি সে-পরিমাণে ম্লান এবং ক্ষীণ মনে হয়েছে।

অমরের ভূমিকাভিনেতা অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগীত অভিব্যক্তিতে অস্পষ্ট, তাঁর প্রবেশ ও প্রস্থান অবাস্তরভাবে দ্রুত ও দৃষ্টিকটু। নীলিমা সেনের সংগীত ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে অনন্য, কিন্তু প্রমদার রূপসজ্জায় তাঁর অভিনয় বিড়ম্বনামাত্র। উপরন্তু, তাঁর ভ্রূকুঞ্চন বা অনাবশ্যক গ্রীবা-বক্রিমা মনে করিয়ে দিয়েছে অভিনয় অপেক্ষা স্বরলিপির শুদ্ধতারক্ষায় তিনি বেশি সজাগ। যদিও শেষাংশে তাঁর গান ('আর কেন, আর কেন') যেটুকু শোনা গিয়েছিল, হৃদয়গ্রাহী মনে হয়েছিল—কিন্তু প্রথমাংশে প্রমদার লীলাচাপল্য তাঁর ভঙ্গিমায় অনুপস্থিত দেখে আমাদেরই বলতে লোভ হয়েছিল : 'এ কি প্রমদা! এ কি প্রমদার ছায়া!' প্রথম দুটি গানে আড়ষ্ট হলেও বরং শান্তার ভূমিকায় সুপূর্ণা চৌধুরীর অভিনয় ও সংগীত অনেকাংশে সু -দৃশ্য এবং -শ্রাব্য। প্রমদার প্রথম সখীর নৃত্যাভিনয় সর্বোত্তম। রূপসজ্জায় শান্তিনিকেতন-শৈলী অক্ষুণ্ণ থেকেছে, মঞ্চসজ্জার পরিকল্পনা সংযমগুণে অনবদ্য।

'বাল্মীকিপ্রতিভা' রচনায় রবীন্দ্রনাথ স্পেন্সরের সংগীত-বিষয়ক মতবাদকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন ; এবং আদিকবির আখ্যান অপেক্ষা বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল'-এর আরম্ভ-অংশ তাঁকে বেশি প্রেরণা দিয়েছিল।[১] এই গীতিনাট্য সমকালীন বিদ্বজ্জনের সমাদর পেয়েছিল শুধু নয়, একাধিক প্রবীণ সাহিত্যরথীর লেখনীকেও উৎসাহিত করেছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার বাল্মীকির ভূমিকায় নেমেছেন।

শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ-প্রযোজিত 'বাল্মীকিপ্রতিভা' তুলনামূলকভাবে উত্তম। সমগ্র প্রযোজনায় একটি সুঠাম পরিচ্ছন্ন শিল্পরীতি দুর্লক্ষ্য নয়। এখানে বাল্মীকি সেজেছিলেন অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় ; এই ভূমিকায় তাঁর যেমন দরাজ কণ্ঠের পরিচয় পাওয়া যায় (বিশেষত, 'রাঙা পদপদ্মযুগে', 'কী বলিনু আমি', 'শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা') আবার স্বর-প্রক্ষেপণ বা যথাযথ শ্বাসচালনার অভাবও ধরা পড়ে (যেমন, 'গহনে গহনে যা রে তোরা')। ব্যাধ রত্নাকরের চেয়ে কাব্যরসাস্বাদী বাল্মীকির অভিনয়ে তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য বেশি ; অথচ এই দুই রূপের একটা সুষম রূপায়ণ আমরা দেখতে চেয়েছিলাম। দস্যুদলের সম্মিলিত নৃত্যগীতের মধ্যে চর্চা এবং পরিচালনার অভাব পীড়াদায়ক ; অনেক জায়গায় নেপথ্য যন্ত্রসংগীতের সুর এসে পৌঁছেছে প্রেক্ষাগৃহে, কিন্তু কথা অস্পষ্ট থেকেছে। 'এত রঙ্গ শিখেছ কোথা' এই গানটি পরিবেশন-অপেক্ষা অসম পদচালনায় এত বেশি ঝোঁক পড়েছে যে, সম্পূর্ণ গানটি মাঠে মারা গেছে। মনে রাখা দরকার, হ্বাগনারের মতোই রবীন্দ্রনাথ অপেরায় সুর ও নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে কথার উপরও সমান জোর দিয়েছেন ; 'বাল্মীকিপ্রতিভা'-রচনাও এই পরীক্ষাতেই। সুতরাং, হ্বাগনারের কথা এ-প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দিতে চাই : "In the wedding of the arts, Poetry is the Man, Music the Woman ; Poetry must lead, Music must follow."

দস্যুদলের মধ্যে দু-তিনজনের হ্যুজপৃষ্ঠ নৃত্য অত্যন্ত দৃষ্টিকটু, এবং প্রথম দস্যুর কণ্ঠ সতেজ হলেও অভিনয় অতিনাটকীয়দোষদুষ্ট। বালিকার ভূমিকায় চিত্রলেখা চৌধুরী ব্যর্থ—অন্তত কণ্ঠসংগীতে মডিউলেশনের অভাব রয়েছে। লক্ষ্মীর ভূমিকায় সুপূর্ণা চৌধুরীর প্রস্থানদৃশ্য ত্রুটিপূর্ণ ;

১. দ্র. গ্রন্থপরিচয়, জীবনস্মৃতি।

সরস্বতীর ভূমিকায় প্রতিমা রায়চৌধুরীর আবৃত্তি সুশ্রাব্য। নেপথ্যে যন্ত্রসংগীত-ক্ষেত্রে এস্রাজের সুর বহুদিন মনে থাকবে। মঞ্চসজ্জা যথাযথ, রূপসজ্জা প্রশংসনীয়।

অপ্রতিম বসু

শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ প্রযোজিত: মায়ার খেলা। নিউ এম্পায়ার। ১১ জুন, ১৯৬৫। বাল্মীকিপ্রতিভা। নিউ এম্পায়ার। ১৬ জুন, ১৯৬৫।

কলকাতায় এম্‌লিন্ উইলিয়ম্‌স্

১৯৬২ সালে রিচার্ড সাদার্ন বিশ্ব থিয়েটারের 'সপ্তযুগ' নিয়ে তাঁর প্রামাণ্য ইতিহাস-আলোচনা শেষ করেছিলেন এম্‌লিন্ উইলিয়ম্‌স্-এর কথা দিয়ে: "সব কথার শেষে ঐ এক কথাই কিন্তু রয়ে গেল···থিয়েটারের ইতিহাস তার বিচিত্র বিন্যাসরীতির ইতিহাস নয়, ঐ রীতির প্রয়োগে অভিনেতা মানুষকে কতটা নাড়া দেন, তারই ইতিহাস। অভিনেতা থিয়েটারের প্রাণবিন্দু, বাহনও বটে—একা অভিনেতাই, অতীতেও যেমন, আজও তেমনিই।···তাই আজও দেখা যাবে এম্‌লিন্ উইলিয়ম্‌স্-এর মতো একটি মানুষকে, শুধু বই আর নকল শ্মশ্রু সহায়, মূর্ত ডিকেন্‌স্-এর মায়ায় দুটো ঘণ্টা ধরে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখবেন।···শুরুতেও যেমন, সব শেষেও তেমনিই একা একটি মানুষের এই থিয়েটার আজও অপরিবর্তিত।"

সেই এম্‌লিন্ উইলিয়ম্‌স্ গত ১৫ই ও ১৬ই মে কলকাতায় হিন্দী হাই স্কুলের নাট্যগৃহে ডিকেন্‌স্-এর রূপসজ্জায় ডিকেন্‌স্-এর স্বরচিত উপন্যাসপাঠের অভিনয় পরিবেশন করে গেলেন। ডিকেন্‌স্ পাঠকালে যে-টেবিলটি ব্যবহার করতেন, তারই এক হুবহু নকল মঞ্চের একমাত্র উপকরণ। রূপসজ্জা আশ্চর্য আদল আনে, চালচলনেও সমকালীনদের বিবরণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাযুজ্য। কিন্তু শুধুই স্বরপ্রক্ষেপণের অসাধারণ শক্তিতে বিভিন্ন রচনা থেকে আহৃত আটটি দৃশ্যে উইলিয়ম্‌স্ বিচিত্র নরনারীর ও তাদের সম্পর্ক-সংঘর্ষ-সংলাপ জড়িয়ে আটটি নাটকীয় এপিসোড্ রচনা করেন। কণ্ঠস্বরের মডিউলেশন ও সামান্যতম কায়িক অভিনয়ে মিস্টার ও মিসেস্ ভেনীয়ারিং-এর 'সোসাইটি' জীবনের প্রতি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ, কিংবা ক্ষীণপ্রাণ পল ডম্বির মৃত্যু,

ফরাসী বিপ্লবের আসন্ন ছায়ায়, আভাসে, কিংবা নার্স-এর কঠিন কণ্ঠে সেই ভয়ংকর ঘুমপাড়ানী গল্প, এক-একটি বিচ্ছিন্ন নাটক হয়ে ওঠে; প্রতিটি পদক্ষেপ যেন চাক্ষুষ কল্পনা করা যায়। কেবল কণ্ঠস্বরের বিপুল সঞ্চরণক্ষমতা ও সুসংযত নিয়ন্ত্রণের শক্তিতে মঞ্চমায়া রচনার এই দৃষ্টান্ত থিয়েটারের একটি বিশিষ্ট প্রদেশের চরিত্র সম্পর্কে আমাদের যেন আরো সচেতন করে তুলল।

স্কুলপাঠ্য ক্ল্যাসিকের চলতি ধারণা থেকে ডিকেন্‌স্‌কে উদ্ধার করার চেষ্টাও অংশনির্বাচনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভিক্টোরিয় যুগের পরিবর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে সেদিন যাঁরা সমাজচিন্তাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন, ডিকেন্‌স্‌ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। রূপকথার অস্পষ্ট অনুষঙ্গ, প্রতীক ও থিয়েট্রিকাল অতিশয়োক্তির সুচিন্তিত প্রয়োগে যে দুরূহ আঙ্গিক ডিকেন্‌স্‌ সৃষ্টি করেছিলেন, তার মর্মভেদ সহজ নয় বলেই আজও এ দেশে ডিকেন্‌স্‌ জনমনোরঞ্জনে নিযুক্ত শিশুপাঠ্য এন্টারটেনার রয়ে গেলেন। এম্‌লিন্‌ উইলিয়ম্‌স্‌ চেষ্টা করেছেন গভীরতর গভীরতর সেই অন্য ডিকেন্‌স্‌কে ফিরিয়ে আনার।

এই অনুষ্ঠানের জন্য ব্রিটিশ কাউন্‌সিল্‌-এর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই অনুযোগ থাকবে, ডিলান টমাসের ভূমিকায় এম্‌লিন্‌ উইলিয়ম্‌স্‌-এর অনুরূপ অভিনয় দেখার সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হলাম কেন? কবি-সমালোচক জি. এস্‌. ফ্রেজারের লেখা থেকে ধারণা হয়, ডিলান্‌ টমাসের ভূমিকাভিনয় উইলিয়ম্‌স্‌-এর মহত্তর কীর্তি—যাঁরা টমাস্‌কে চিনতেন, তাঁরাও উইলিয়ম্‌স্‌-এর অভিনয়ে আপাত-সাদৃশ্যসন্ধানে ব্যর্থ তথা বিচলিত হয়েও মানতে বাধ্য হন যে, টমাস্‌ স্বয়ং যে পানশালার পরিহাসরসিকের পাব্‌লিক্‌ ইমেজ্‌ রচনা করেছিলেন, উইলিয়ম্‌স্‌-এর অভিনয়ে সেই মূর্তিই প্রাণময় হয়ে ওঠে।

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

কাপুরুষ ও মহাপুরুষ

চলচ্চিত্র সমালোচনা করার মুস্কিল এই যে একবার মাত্র চোখের সামনে নদীর স্রোতের মতন তর্‌তর্‌ করে বয়ে যায় যেসব ঘটনা ও দৃশ্য তার সমগ্র রূপ মনে ধারণ করা প্রায় অসম্ভব। সাময়িকপত্রে যেসব বইয়ের সমালোচনা হয় তা-ও খুব তাড়াতাড়ি পড়া, অন্তত বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই, অনেক ক্ষেত্রে হয়ত না-পড়া। কিন্তু বইয়ের পাতা সম্মুখে ও পিছনে দুই দিকেই উল্টানো যায়, তাই যা ফেলে আসা যায় মাঝে মাঝে ফিরে গিয়ে তা আবার কুড়িয়ে নেওয়া চলে; কিন্তু চলচ্চিত্রের বেলায় তা তো সম্ভব নয়। তাই কোনো ভালো চলচ্চিত্র, অর্থাৎ প্রথম দেখে যা ভালো লাগে, তা এক বা দুই বা ততোধিকবার না দেখলে দর্শকের (এবং অবশ্য শ্রোতার) মনে তার রূপ জমে না। 'চারুলতা' চতুর্থবার দেখে আমি তাতে নতুন রস পেয়েছি, এবং সে-রস প্রধানত সাংগীতিক। তাই এক-এক সময়ে তার স্বাদ নিবিড় করে পাবার জন্ত আমাকে চোখ বুজতে হয়েছে। অবশ্য চারুলতা যাঁরা পছন্দ করেন নি শুধু এই কারণে যে তা মূল কাহিনী থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে তাঁদের সঙ্গে আমার কোনো বিরোধ নেই, অবশ্য মিলও নেই, কেননা তাঁদের দেখা ও শোনা একেবারে অন্ত জাতের।

চারুলতার কথাই যখন উঠল, তখন এখান থেকেই শুরু করা যাক বর্তমান প্রসঙ্গ।

চারুলতায় সত্যজিৎ রায় তাঁর ছবিকে যে ত্রিভুজবন্ধনে বেঁধেছিলেন 'কাপুরুষ'-এও দেখলাম তারই পুনরাবৃত্তি। কিন্তু রকমফেরে ফুটেছে কাপুরুষ-এর বিশিষ্ট রূপ। 'চারুলতা' হল গাঢ় রঙে ও জটিল পদ্ধতিতে আঁকা বেশ প্রমাণ আকারের তৈলচিত্র; তার পাশে কাপুরুষ-কে মনে হয় একটি পেন্সিল স্কেচ্। ছোটখাটো ব্যাপার সন্দেহ নেই, কিন্তু রেখায় রেখায় ফুটেছে ওস্তাদের হাতের ছাপ।

তফাৎ আরো আছে। চারুলতায় ঘটনার আবর্তে তিনটি ভুজই জড়িত হয়েছে পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে, আর, এই অবিচ্ছেদ্যতার মধ্যে বিচ্ছেদ মর্মান্তিক হয়ে উঠেছে। কিন্তু কাপুরুষ-এ একটি পুরুষ ঘটনাচক্রে শুধু হয়েছেন যোগসূত্র, যদিও মাঝে-মাঝে তাঁর টিপ্পনীতে বেশ একটু 'ড্রামাটিক আয়রনি'র

সৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়া এই ব্যক্তিটি অর্থাৎ নায়িকার স্বামী প্রায়-নির্বিকার, নির্বোধ ত বটেই। এর পর পাঠকেরা যদি আশা করেন আমি পুরো গল্পটি শোনাব, তাহলে আমি নাচার, কেননা এই চিত্র এত একান্তভাবে চলচ্চিত্র যে, প্লটের পুনরাবৃত্তি করে তার পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। মোট কথা এই যে, নায়ক ও নায়িকা একদা পরস্পরের অতি কাছাকাছি এসেও দূরে সরে গিয়েছিল যেভাবে তার মধ্যে মূল গল্পের লেখক ও চলচ্চিত্র-স্রষ্টা দুজনেই দেখেছেন নায়কের পৌরুষের অভাব। এখানে তাঁদের সঙ্গে আমার মতের মিল নেই, কেননা ছবিটির বিষয়বস্তু নীতি নয়—নিয়তি, যা অপৌরুষেয়।

দ্বিতীয়বার এই দুটি প্রাণীর যখন সাক্ষাৎ হল তখন বিচ্ছেদের বেদনা চলচ্চিত্রকার তীব্রতর করে ফোটালেন ফ্ল্যাশব্যাকে নায়কের পূর্বস্মৃতির পটে। নায়িকার মনের কোনো ফ্ল্যাশব্যাক ছবিতে নেই। বোঝা গেল তা দেবতাদের অগোচর, তার তল খুঁজতে পরিচালকের সাহসে কুলোয়নি। কিন্তু এই মন যে অতলস্পর্শ তার পরিচয় পাওয়া যায় সামান্য দু-চারটি কথায় আর ভাবে-ভঙ্গিতে—বিশেষ করে রেলস্টেশনে দুজনের শেষবার সাক্ষাতের সময়ে। মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের একটিগানের কলি: 'তুমি কিছু নিয়ে যাও বেদনা হতে বেদনে'। এই বেদনা-বিনিময়ের দৃশ্য যেভাবে ফুটেছে ছবিটির চরম পর্যায়ে সামান্য এক শিশি ঘুমের বড়ি দেওয়া-নেওয়ার মধ্য দিয়ে, তাতে মনে হয় যে শিল্পকলার চরম কৌশল—বাহুল্যবর্জন—সত্যজিৎ রায় আয়ত্ত করেছেন মুখস্থ মন্ত্রের মতন।

কাপুরুষ-এর স্বল্পভাষিণী নায়িকার সোহাগ ও কাতরতায় ভরা শেষ দুটি কথা, 'লক্ষীটি, দাও না' আর-একবার সৃষ্টি করল এই দুটি প্রাণীর জীবনে এক অমরাবতীর। নিমেষে তা হল ধূলিসাৎ। যবনিকার অন্তরালে বিস্তৃত হল একটি বিরাট বিচ্ছেদের সমুদ্র। একেবারে 'পথের পাঁচালী' থেকে সত্যজিৎ রায় পাড়ি দিতে শুরু করেছেন এই সমুদ্রে। কেননা চলচ্চিত্র-পথে তাঁর যাত্রা 'বেদনা হতে বেদনে'। এই বেদনার গভীরতম ও ব্যাপকতম প্রকাশ 'অপরাজিত' ছবির শেষ দৃশ্যে যেখানে নায়ক সম্পূর্ণ পরাজিত, কেননা তার অতীত অবলুপ্ত ও ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। আমাদের বর্তমান জীবনের রূপক সত্যজিতের আর-কোনো ছবিতে এমন মর্মস্পর্শীভাবে ফুটে ওঠে নি—যদিও সত্যজিৎ এ বিষয়ে সচেতন কিনা জানি না। না হলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কেননা সার্থকতম শিল্পের উৎস শিল্পীর অবচেতনলোকে।

অথ 'মহাপুরুষ'। শুধু পুরুষ কথাটির সূত্রে সত্যজিৎ দুটি ছবিকে বেঁধেছেন, যেমন 'তিন কন্যা'কে বেঁধেছিলেন একটি কথার সূত্রে। কিন্তু হয়তো এই সূত্রটি যত ক্ষীণ মনে হয় আসলে তত নয়, কেননা ছবিটির আসল মহাপুরুষ হল শেষদৃশ্যে যে উদ্‌ভ্রান্ত যুবক একটি বিমূঢ়া বালিকাকে ভণ্ড মহাপুরুষের কবল থেকে রক্ষা করেন—নিঃসন্দেহে তিনি। মনে হয় সত্যজিৎ এই ছবিতে হাত দিয়েছিলেন বেদনার ভার থেকে মুক্তি পাবার জন্য, যে-বেদনা সৃষ্টি করে চলেছেন তিনি নিজে—এমনকি 'পরশপাথর'-এও। চেনাশোনা লোকের মুখে শুনেছি ছবিটি নাকি তেমন উত্‌রোয় নি, এ কথার মানে আমি বুঝি না, যদিও কথাটি খুব গূঢ় নয়। কিন্তু খবরের কাগজে গূঢ় কথার কারবারিরা কেউ-কেউ লিখেছেন যে এই ছবিটির বিষয়বস্তু হল ভণ্ডামির প্রতি তীব্র বিদ্রূপ। আমার কিন্তু ঠিক তা মনে হয় না। বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে মজা সৃষ্টি করা যায়, আবার মজার মধ্য দিয়ে বিদ্রূপ। মূল গল্প বা ছবি—এই দুটোতেই বিদ্রূপ যেটুকু আছে তা উপকরণমাত্র। তাও খুব বড় উপকরণ নয়। দুই ক্ষেত্রেই আসল লক্ষ্য বেশ একটু মজার অবতারণা। এই লক্ষ্য দুই ক্ষেত্রেই সিদ্ধ হয়েছে। তবে যাঁরা সত্যজিৎ রায়ের কাছে সব সময়ে একটা বড় কিছু প্রত্যাশা করেন তাঁদের এই ছবি দেখে নিরাশ হবারই কথা। আমি যদিও নিরাশ হই নি, কিন্তু তবু মনে হয়েছে, একেবারে শেষের অংশে যখন ভেজাল মহাপুরুষের অন্তর্ধানপটে প্রকট হলেন আসল মহাপুরুষ বুচকি নাম্নী একটি বোচকার বাহনরূপে—একটু যেন চটপট ফুরিয়ে গেল। সত্যজিৎ রায় রাজশেখর বসুকে নিয়ে আর-একটু নাড়াচাড়া করলে মন্দ হত না।

আরেকটি কথা। অতি সাধারণভাবে বলতে গেলে আমি চলচ্চিত্রে অভিনয় ব্যাপারটিকে বড় স্থান দিই না। আমার একটা ধারণা এই যে, আমরা অভিনয় বলে যা মনে করি তার বেশির ভাগই পরিচালকের সৃষ্টি। তাই প্রফেসর ননীর ভূমিকায় বাহুল্যদোষ যা ঘটেছে বলে মনে হয় তার দায়িত্ব পরিচালকের। কিন্তু মহাপুরুষের ভূমিকায় চারুপ্রকাশ ঘোষ যে অসাধারণ দক্ষ অভিনয় করেছেন এ-সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয়; এর পাশে অন্যদের অভিনয় স্বভাবতই একটু নিষ্প্রভ মনে হয়। ছবিটির যদি কোনো ত্রুটি থাকে তা এইখানে, কেননা যে-চলচ্চিত্রে অভিনয়নৈপুণ্য দর্শক ও শ্রোতার মনকে আচ্ছন্ন করে, চলচ্চিত্রের কুলীনকুলের পংক্তিভোজে তার আসন পাবার অধিকার আছে কিনা তা বিবেচ্য। অবশ্য আরও বেশি বিবেচ্য একবার দেখে একটি ছবি সম্বন্ধে রায় দেবার অধিকার কারও আছে কি না।

হিরণকুমার সান্যাল

মেক্সিকোর প্রতিকৃতি

ইউরোপ বিশেষত ফরাসীদেশ ও মার্কিন ভূখণ্ডের সংস্কৃতির মোহে যখন আধুনিক শিল্পে অনুন্নত (অথচ প্রাচীন কলায় অগ্রসর) অপরাপর রাষ্ট্রগুলি শিল্পের ক্ষেত্রে জাতিগত সীমান্তরেখা দূরীকরণের পক্ষপাতী, তখন একান্তভাবে ঐতিহ্য-আশ্রিত আধুনিক মেক্সিকোর সুবিশাল সভ্যতা ও শিল্পকীর্তি পৃথিবীর একটি পরম বিস্ময়। ওরোস্কো, সিকেরস্ ও রিভেরা—মেক্সিকোর রাষ্ট্রবিপ্লবের ফল এই তিনটি মহাশিল্পী প্রাচীর-চিত্রের মধ্য দিয়ে আধুনিক শিল্পে যে-নবযুগ এনেছিলেন, মেক্সিকোর দেড় হাজার বছরের অতীত ছিল যেমন তার উৎস, তেমনি বর্তমানের চাহিদাই ছিল তার প্রেরণা। ঐতিহ্য-পুনরুজ্জীবনের এই মূলমন্ত্রটি মেক্সিকোর শিল্পীদের অজানা ছিল না যে বর্তমানের দাবি থেকেই অতীত-আবিষ্কারের প্রয়োজন ঘটে এবং শিল্পের ক্ষেত্রে নিছক অতীতপ্রীতি থেকে বর্তমানে উত্তীর্ণ হবার সরল পরিচিত পথটি ভুল পথ : 'The creative artist does not see tradition as something impersonal and linear. He experiences it more concentrically, from the starting-point of his own creative will the formative will of the present, our own age. The line of vision is thus reversed; from the present to the past' (J. P. Hodin : *The Dilemma of Being Modern*).

নবীন ও সনাতনের সমন্বয়ের এই সত্যটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল গত জুনে অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস-এ অনুষ্ঠিত 'মেক্সিকোর প্রতিকৃতি' নামিত বিশাল প্রদর্শনীতে। টল্‌টেক্, অ্যাৎস্‌টেক্ ও মায়া সভ্যতার ভাস্কর্যের নিদর্শন বর্ষার দেবতা Tlatoc, পবনদেব Ehecatl ও বহু-আলোচিত The Plumed Serpent যেমন স্বচক্ষে দেখবার দুর্লভ সুযোগ ঘটেছিল, তেমনি নূতন শিল্প-মাধ্যম proxeline-এ অঙ্কিত সিকেরসের দুখানি অতিকায় চিত্র *The Partisan* ও *Revolution, Give Us Culture Back* দর্শকমাত্রকেই বিস্ময় ও আনন্দে রোমাঞ্চিত করেছে। একদিকে সপ্তদশ শতকে নির্মিত

দেবদূত মাইকেলের প্রস্তরমূর্তি, অপরদিকে Francisco Zuniga-র দোলনায় শায়িত আলস্যে মুদিতানয়না নারীমূর্তি কিংবা Onyx-এ তৈরি সূক্ষ্ম অথচ বৃহৎকায় ঈগল ও Carlos Bracho-র স্বচ্ছ ও সবুজ 'ভারতীয় নারীর মস্তক'—এ সকলের মধ্যেই ঈগলমূর্তিটির নামের সার্থকতা লক্ষণীয়: 'Mexico in Transformation and Still Unalterable'—রূপান্তরের পথে অথচ অপরিবর্তনীয় মেক্সিকো।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত মেক্সিকোর প্রাচীনতম চিত্রকৃতি বোনামপাকের প্রাচীর-চিত্রাবলীর (Bonampak কথাটি 'মায়া' অর্থে চিত্রিত প্রাচীর) একটি বিশালাকৃতি প্রতিলিপি মূলের থেকে শতগুণে নিকৃষ্ট হলেও বিষয়ের বাস্তবতা, পার্সপেক্টিভ ও আলোছায়ার (chiaroscuro) অনুপস্থিতি প্রাচীন মেক্সিকোর চিত্র-ঐতিহ্যের দ্বারা চিহ্নিত। সমতল শিল্যুয়েটে বলিষ্ঠ অথচ পরিমিত রেখায় অঙ্কিত দেহগুলি এবং শিল্পীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে উজ্জ্বল দৃশ্যরাজি—যেমন ধর্মীয় নৃত্য, সস্ত্রীক দলপতি, গায়ক ও নর্তকবৃন্দ, কখনো বা বন্দীর লাঞ্ছনা ও নরবলি—সকলই fresco-র মতো সীমিত ও দুরূহ মাধ্যমে রঙ ও ছায়ার বৈচিত্র্য উপস্থাপনের সার্থক প্রচেষ্টার পরিচয় দেয়।

এই দুর্লভ প্রদর্শনীতে সবচেয়ে মনোরম হয়ে উঠেছিল খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতকে নির্মিত ক্ষুদ্রাকৃতি টেরাকোটা মূর্তি ও লোকশিল্পের সমারোহ। একটি প্রাচীন প্রাণবান জাতির হৃদয়ের ঐশ্বর্য ও সজীবতার এমন চাক্ষুস নিদর্শন আর কখনো মেলেনি। লোকশিল্পের কক্ষে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই Metepee থেকে আনা অ্যাডাম-ইভ্‌, নোয়ার জাহাজ প্রভৃতি বাইবেলের কাহিনী-সংবলিত রঙিন মাটির কাজের নমুনায় দর্শকমাত্রেরই চক্ষু আকৃষ্ট হবে, শুক তৃণে নির্মিত সৈনিক ও বাজির পুতুলের মধ্যে যেন উৎসবের স্বাদ মিশে আছে। দীর্ঘ চঞ্চুবিশিষ্ট পাখি, প্যাঁচা, পারাবত, সিংহ, কচ্ছপ প্রভৃতি মৃৎশিল্পকর্মের বলিষ্ঠ curve ও প্রাথমিক রঙসমূহের প্রয়োগ সকল দেশের লোকশিল্পের মধ্যে সাদৃশ্য সূচিত করে, নানা রঙে চিত্রিত কয়েকটি বিশাল নর-করোটি মেক্সিকো জাতির মৃত্যুভাবনার চিহ্ন।

মেক্সিকোর অতি আধুনিক চিত্রকলায় ক্ষেত্রেও তার শিল্প ঐতিহ্যের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর আছে; একটি স্তব্ধ, গাঢ় বিষণ্ণতার সঙ্গে একটি তীক্ষ্ণ কাঠিন্য মানব-দেহাবয়ব ও প্রকৃতি-চিত্র সকলের মধ্যেই বিদ্যমান। Ricards Martinez অঙ্কিত 'ভার' ও 'বিস্ময়' যেমন ভাস্কর্যের দ্বারা প্রভাবিত, তেমনি Alfredo

Talce-র 'নিসর্গদৃশ্য' ও 'উদ্যানে ছায়া' রঙ-প্রয়োগে ফরাসী Fauvist ধারায় চিহ্নিত হয়েও মেক্সিকোর শিল্প-চারিত্র্য রক্ষা করেছে। Olga Mendez-এর 'মায়া ব্যাঘ্র' রক্তবর্ণে রঞ্জিত একটি প্রদীপ্ত চিত্র, ব্যাঘ্রের সবুজ চক্ষু দুটি শিল্পীর সুগভীর বর্ণজ্ঞানের পরিচায়ক। Francisco Corzas অঙ্কিত 'স্রষ্টা' ও 'ক্রুশচিহ্ন' এবং Rafael Coronel-এর 'হাস্যরত বৃদ্ধ' ও 'পুতুল' প্রভৃতি চিত্রগুলির অতিপ্রাকৃত গুণ এক অচেনা (exotic) জগতের রহস্য সঞ্চার করে। Luis Nishizawa-র 'বর্ষার বন' ও 'শিশুরা', Pedro Coronel-এর 'সূর্য' এবং Waldemar Sjalander অঙ্কিত 'দার্শনিক নিসর্গদৃশ্য' জাতিগত বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও প্রতিবেশী মার্কিন দেশের ছায়া বহন করছে।

মণি জানা

ব্যক্তি-স্বাধীনতা

মাঝে-মাঝে হঠাৎ যখন চোরাকারবার আর সরকারী-বেসরকারী লুণ্ঠনের জালায় আমরা ত্রাহি-ত্রাহি ডাক ছাড়ি তখনি যেন বেশি শুনতে পাই 'পাকিস্তানী আক্রমণ' আর 'চীনের চক্রান্ত', ব্যাপারটা রুটিন-বাঁধা হয়ে উঠছে। পাকিস্তানে যেমন শাসকদের কৌশল হচ্ছে অসুবিধা দেখলেই 'ভারতী' আক্রমণের ধুয়ো তোলা ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে আরেক দফা জেহাদ ঘোষণা—আমাদের সন্দেহ হচ্ছে আমাদের শাসকশ্রেণী এখন সেই কৌশল বা অপকৌশলই গ্রহণ করছেন কিনা। হাজার-হাজার মাইল যাদের সীমান্ত—আর অনেকস্থলে সে সীমান্ত সুচিহ্নিত নয় এবং প্রতিবাসীরাও আবার বিশেষ বন্ধু নয়, সুবোধ সুশীলও নয়—তখন তাদের সীমান্তে গোলোযোগ নানাখানেই সম্ভব, আর সেই সীমান্ত-রক্ষার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থাও প্রয়োজন। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে এখন একটা একঘেয়েমী এসে যাচ্ছে। প্রায়ই শোনা যায় ওখানে 'পাকিস্তানী চর', আর এখানে 'চীনাপন্থী-চক্রান্ত'। সত্যসত্যই চর ও চক্রান্ত থাকা অসম্ভব নয়। তাতেও যে সন্দেহ জাগে তার কারণ সেই সঙ্গেই দেখি—আর কিছু নয়, সরকার-বিরোধী দলগুলির প্রতি দমননীতির প্রয়োগ, অত্যন্ত দায়িত্বহীন অপবাদ-প্রচার। সদাচারী নন্দ মহারাজের এদিকের কীর্তি আমরা ভুলতে পারি না। তিনি কোন বিষয়ে সদাচার চান, জানি না। অন্তত কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কথায় বিশেষ সদাচারী তিনি নিজেও নন, তা তাঁর সংসদীয় বক্তৃতা ও প্রচারিত পুস্তিকা থেকে দেখেছি। মাঝে-মাঝে তাই তাঁর সদাচারে অনুপ্রাণিত সংবাদপত্রের বিশেষ সংবাদদাতারা যে কেরল থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত সর্বত্রই 'চীনাপন্থী' কমিউনিস্টদের 'গুপ্ত নির্দেশপত্র' আবিষ্কার করবেন, তাতে আমরা বিস্মিত হই না। এ আচার বর্তমান সময়ে সংবাদপত্রের ঐতিহ্যসম্মত, আর শাসকদের চক্ষেও সদাচারসম্মত। সম্প্রতি কিন্তু তাতেও আশ্চর্য হবার একটু কারণ ঘটেছে—দার্জিলিং-এ না কোথায় নাকি, একেবারে লিখিত প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে—'বামপন্থী' কমিউনিস্টরা গেরিলা যুদ্ধের জন্য সদস্যদের নির্দেশ দিয়েছে। আশ্চর্য বলছি এজন্য যে, এবার চীনের উল্লেখ নেই। শুধুই স্বদেশীয়

বামপন্থী কমিউনিস্টদের চক্রান্তের কথা আছে। অবশ্য ফলাফলে তফাৎ হয় নি। নতুন করে কিছু লোক বিনা-বিচারে বন্দী হয়েছেন। আসল উদ্দেশ্য এইটাই—দেশে যখন অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছে তখন বিরোধী পক্ষের লোকদের অবরুদ্ধ করা। হয়তো আরও একটু কারণ থাকতে পারে—ঠিক এ সময়ে বোম্বাইতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার স্বপক্ষে আইনজ্ঞ ও নেতাদের একটা বড় সম্মেলন হয়। তাতে উদার মতাবলম্বী বহু মনস্বী ও নেতারা সরকারের এই নীতির ও পদ্ধতির বিরুদ্ধে তীব্র বিরোধিতা জানান। এরূপ ক্ষেত্রে একটা কিছু নতুন চক্রান্ত আবিষ্কার সরকার পক্ষ থেকে প্রয়োজন হয়—ব্রিটিশ আমল থেকে তা আমরা দেখে আসছি। এ আমলেও অন্যথা হয় না দেখছি। ব্রিটিশ শাসকদের না সরালে যেমন ব্যক্তি-স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হত না—এই শাসকদেরও না সরালে সম্ভবত সেই ব্যক্তি-স্বাধীনতা উদ্ধার সম্ভব হচ্ছে না। সম্ভবত ভারতীয় সংবিধানে জনসাধারণকে যেটুকু ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, তাও বাঁচানো যাবে না। জনসাধারণের তাই উপলব্ধি করা দরকার—অন্নবস্ত্র থেকে ব্যক্তি-স্বাধীনতা পর্যন্ত সব কিছুই তাদের আজ যেতে বসেছে। তা রক্ষা করতে হবে জনসাধারণকেই নিজেদের চেষ্টার দ্বারা। 'সীমান্ত বিপন্ন' বা 'চীনা আক্রমণ প্রত্যাসন্ন' এসব প্রচার যতটাই সত্য হোক বা যতটাই মিথ্যা হোক—বিপন্ন কিন্তু সত্যই দেশের মানুষ—খাওয়ায়-পরায়, ওঠায়-বসায়, সমস্ত অধিকারে ও ব্যবস্থায়। বাঁচতেও হবে তাঁদের নিজেদের চেষ্টাতেই।

গোপাল হালদার

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি-প্রসারণ সম্মেলন

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি-প্রসারণ সমিতির বয়স এক বছরের কিছু বেশি। গত বছরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অল্প কিছুদিন পরেই এর প্রতিষ্ঠা। নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী। তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন কয়েকজন হিন্দু-মুসলমান বুদ্ধিজীবী ও সামাজিক কর্মী। তাঁরা এসেছিলেন ব্যথিত হৃদয়ে এই ভ্রাতৃ-ঘাতী আবহাওয়ার পরিবর্তনের জন্তে কিছু করার তাগিদে।

কলকাতা শহরে গত ২২শে মে থেকে ২৪শে মে এই সমিতির যে-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল, তার উদ্দেশ্য ছিল, এক বছরের কাজের মূল্যায়ন ও

পরবর্তী কর্মপন্থার নির্ধারণ। আমাদের দেশের পশ্চিম সীমান্তে পাকিস্তানের আক্রমণ সম্মেলনকে একটা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিল। দেশের নিরাপত্তারক্ষার দায়িত্ব আজকের দিনে শুধু সামরিক বাহিনীর উপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। তার পিছনে দরকার ঐক্যবদ্ধ সচেতন সাধারণ মানুষ। পাকিস্তানের আক্রমণাত্মক ভাবধারার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ জনশক্তি গড়তে হলে প্রথমেই প্রয়োজন হিন্দু-মুসলমান ঐক্য। কলকাতার মানুষের বিভিন্ন অংশের ভিতর যে ঐক্য-চেতনা দানা বেঁধে উঠছে তা এই সম্মেলনে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

সম্মেলনের সংগঠকদের আশার অতিরিক্ত লোকসমাগম হয়েছিল প্রতিদিনের সভাতে। তাঁদের মধ্যে মুসলমান, বিশেষ করে মুসলিম ছাত্র-সমাজ এবং অল্পসংখ্যক মুসলমান মহিলার উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তা ছাড়া এসেছিলেন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রী, কংগ্রেসী ও বিরোধীদলের লোকসভার সদস্য, মহিলা নেত্রী, সর্বোদয় নেতা ও কর্মী, অধ্যাপক, ছাত্র, সাহিত্যিক, শিল্পী, কংগ্রেসী ও বামপন্থী কিছু নেতা ও কর্মী আর আইনব্যবসায়ী। এঁদের মধ্যে অনেকে প্রত্যক্ষভাবে সম্মেলনের কাজে যোগ দিয়েছেন, আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন।

যেমন নানা মতের ও সমাজের নানা স্তরের মানুষকে দেখা গেল সম্মেলনে তেমনই আলোচনার ধারাতেও নানা চিন্তাধারা প্রকাশ পেল। নিছক মানবিক আবেদনের দিক থেকে আলোচনা অল্পই হয়েছে। ফাঁকা নীতিবাক্যের গালভরা প্রচারবাণীর পরিবর্তে দেখা গেল বিভিন্ন দিক থেকে সাম্প্রদায়িক সমস্যার উপর আলোকপাত করার চেষ্টা।

যে আলোচনার ব্যবস্থা হয়েছিল, তাতে ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, মনস্তাত্বিক, আইনগত ও সমাজকর্মীর দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যার বিচার করার চেষ্টা হয়। প্রত্যেকেরই বক্তব্য তথ্যসমৃদ্ধ ও যুক্তিপূর্ণ। দুটি মূল সুর পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে। কেউ কেউ মনে করেন যে, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক মিলনের মধ্য দিয়ে, ও যুক্তভাবে নানারূপ সমাজসংস্কারমূলক কাজের ভিতর দিয়েই সাম্প্রদায়িক মনোভাবের অবসান সম্ভব। এ হল সমাজসেবীদের মত। অন্যদিকে রাজনৈতিক কর্মীরা মনে করেন যে দেশের সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিতর দিয়েই সাম্প্রদায়িক ঐক্য গড়ে উঠতে পারে; আজকের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের মধ্যেই আছে সাম্প্রদায়িক মনোভাব অবসানের পথ।

এই দুটো মতের ভিতর কিছুটা সত্য থাকলেও সরলীকরণের ঝোঁকটা যে প্রবল, তার প্রমাণ পাওয়া গেল অন্য বক্তাদের বক্তব্যে। শুধু যে মনের অন্ধকারে সাম্প্রদায়িকতার বিষ লুকিয়ে থাকে তা নয়। আমাদের শিক্ষার মধ্যে, ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে রয়েছে ঘটনার সাম্প্রদায়িক বিকৃতি। রাজনৈতিক দলের নানা কর্মপন্থার মধ্যে বিরাজ করছে সাম্প্রদায়িক বিভেদের বীজ। মনস্তত্ত্ববিদ্ দেখালেন নানাভাবে সাম্প্রদায়িক মনোভাব আমাদের চিন্তাধারার উপরে কী করে প্রভাব বিস্তার করে। নানাদিক থেকে যে-আলোচনা হল, তাতে এটাই প্রমাণিত হল যে এই সমস্যার সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা আরও পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। অনেক বিষয়ে আমাদের অজ্ঞানতা আছে, যার উপরে এখনও আলোকপাত করা সম্ভব হয় নি। অনেক জটিল প্রশ্ন আছে যার পরিষ্কার জবাব প্রয়োজন।

সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তিতে কিছু গবেষণা পরিচালনা করার কথা ওঠে। আলোচনার মাধ্যমে পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে কোনো বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যার বিচার করলে সমাধান সহজ হবে না। সরকারের উপর নির্ভর করে কেবলমাত্র আইন ও শৃঙ্খলারক্ষার উপর ছেড়ে দিলে চলবে না। আমাদের সকলেরই দায়িত্ব আছে এই ব্যাপারে। এই সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ, আমাদের দেশের মধ্যে গণতন্ত্রের প্রসার।

নানা মত নানা আলোচনার মধ্যে যেমন প্রকাশ পেল সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে গভীর অনুসন্ধিৎসা, তেমনই সুস্পষ্টভাবে একটি চিন্তাধারা প্রকট হল যে সমাধানের পথ একটিমাত্র নয়; বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্নভাবে চেষ্টা করতে হবে। সরকারকে যেমন কতকগুলো দায়িত্ব পালন করতে হবে, সাধারণ মানুষকেও এগিয়ে আসতে হবে এই কাজে। শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন, আইনের দ্বারা সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা, সমাজসেবার মাধ্যমে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে আরও কাছাকাছি নিয়ে আসা, রাজনৈতিক কর্মপন্থার ভিতর থেকে সচেতনভাবে সাম্প্রদায়িক চেতনা দূরীকরণ, সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক চেতনাকে শক্তিশালী করা—নানারকম কর্মপন্থার মাধ্যমেই সাম্প্রদায়িক সমস্যা-সমাধানের পথে এগিয়ে যেতে হবে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি-প্রসারণ সমিতির দায়িত্ব অনেক। এক বছরের কাজের মূল্যায়ন এই সম্মেলনের ভিতরই হয়েছে। কেবল মানবিক আবেদনের গণ্ডী ভেঙে বেরিয়ে এসে এই সমিতি আন্দোলনের পথে পা

বাড়িয়েছে। কলকাতার বুকে যে আন্দোলনের জন্ম তা আজ আশপাশের প্রদেশেও প্রভাব বিস্তার করছে। তাই আসাম থেকে মন্ত্রী এসেছিলেন; বিহার থেকে ভ্রাতৃত্বমূলক প্রতিনিধি এসেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার এই আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন, তাই এসেছিলেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, তথ্যমন্ত্রী হিসাবে যাঁর দায়িত্ব দেশের মানুষের চিন্তাধারাকে জাতীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা। সম্মেলনের সাফল্যে যেমন সমিতির কর্মীরা উৎসাহিত বোধ করেছেন, তেমনই দেশের প্রত্যেকটি সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আনন্দিত হয়েছেন এই ভেবে, যে, দেশে নানা বিভেদ ও বিভ্রান্তির মধ্যে সৎ আদর্শকে সাধ্যমতো তুলে ধরার চেতনা ও আন্তরিক প্রচেষ্টা আজও বেঁচে আছে।

পক্ষান্তরে, বিপরীত প্রশ্নও কিছু কিছু উঠেছে—সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে, বক্তানির্বাচন সম্পর্কে, অনুষ্ঠানের সময়োপযোগিতা সম্পর্কে। সম্মেলনের মঞ্চ থেকে প্রশ্নগুলির জবাবও দেওয়া হয়েছে স্পষ্ট ভাষায়। যাঁরা আলোচনা-সভাগুলিতে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের কাছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি-সম্প্রসারণের গুরুত্ব যে কত গভীর তা নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়ে গেছে। বিভিন্ন বক্তার সমস্ত ব্যক্তিগত মতের সঙ্গে সকলের মিল না থাকলেও সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে তাঁদের সঙ্গে চিন্তাবিনিময়ে সকলেই উপকৃত হয়েছেন। বিশেষ করে পাকিস্তানের আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরনের সম্মেলন বিশেষ সময়োপযোগী যে হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তা ছাড়া কলকাতা শহরে যে আন্দোলনের জন্ম, তার প্রথম সম্মেলন কলকাতায় হওয়াই স্বাভাবিক। বিরূপ সমালোচনা যাঁরা করেছেন তাঁরা বোধহয় এই সহজ সত্যটা বুঝতে পারেন নি যে অপ্রিয় সত্যকে চেপে রাখলেই তা মিথ্যা হয়ে যায় না। আমাদের মধ্যে যদি কিছু অসুস্থ চিন্তাধারা থাকে, তাকে স্বীকার করে, তার বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম চালিয়েই তার দূর করতে হয়। এতেই প্রকাশ পায় জাতির চারিত্রিক শক্তি।

সাধারণভাবে দেশের মানুষের মধ্যে এই শুভচিন্তার যে স্বীকৃতি আছে তা আর-একবার প্রমাণিত হল এই সম্মেলনের মাধ্যমে। গত বছরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় কলকাতায় কিছু কিছু সংবাদপত্রে যে দুর্বলতা ও অসুস্থ মনোভাব দেখা গিয়েছিল, তার সম্পূর্ণ অবসান না ঘটলেও অবস্থার বেশ কিছুটা পরিবর্তন দেখা গেল। প্রত্যেক সংবাদপত্র সম্মেলনের খবর ভালোভাবেই

প্রকাশ করেছেন, যদিও দু-একটি সংবাদপত্র কিছুটা বিরূপ সমালোচনা করেছেন। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। আশার কথা এই যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি-প্রসারণের বার্তা প্রচুর নতুন মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে এই সম্মেলনের মাধ্যমে। অনেক নতুন উৎসাহী কর্মী এগিয়ে আসছেন। মুষ্টিমেয় কয়েকজনের প্রচেষ্টায় যে-কাজ শুরু হয়েছিল, তাকে দেশব্যাপী আন্দোলনে পরিণত করার প্রথম পদক্ষেপ এই সম্মেলন।

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

নিরক্ষরতা নিরোধে ছাত্র-অভিযান

'নিজে হাতে সই করতে পারি নে'-র দুর্বিসহ অভিশাপ বহু যুগ থেকে সমগ্র জাতির কলঙ্কস্বরূপ। সম্প্রতি জনসাধারণের সবচেয়ে সংবেদনশীল অংশরূপে আমরা যাদের শত দুর্বলতা ও শিথিলতা সত্ত্বেও গ্রহণ করে এসেছি সেই ছাত্রদের একাংশ এই গ্লানি থেকে মুক্তির পথ সন্ধানে সচেতন হয়ে উঠেছে। সে প্রয়াস কতদূর সার্থক হয়ে উঠবে তা সম্পূর্ণভাবেই ভবিষ্যতের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু এ মুহূর্তে তাদের ক্ষুদ্র সামর্থ্যানুযায়ী এই অসাধারণ প্রয়াস অবশ্যই অভিনন্দনের দাবি রাখে।

এ বছরের গোড়ায় ফেব্রুয়ারি মাসের ২২শে ও ২৩শে তারিখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-সংসদের উদ্যোগে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী এবং কলকাতা তথা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়-এর উপাচার্যগণসহ বহু বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী থেকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্র-সংসদের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে একটি ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল: নিরক্ষরতা দূরীকরণের দায়িত্বে ছাত্র প্রয়াসের সার্থকতা। সুদীর্ঘ আলোচনার পর সম্মেলন 'পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ ছাত্র-সমিতি' নামে একটি শক্তিশালী কর্মপরিষদ গঠন করে নিরক্ষরতা-নিরোধে একটি বিস্তৃত কর্মসূচী তৈরি করে। এই কর্মসূচী নিম্নরূপ:

(১) ছাত্রছাত্রীদের সমিতির স্বেচ্ছাসেবকভুক্ত হয়ে দু' ধরনের 'বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্র' স্থাপন: (ক) মূলত, শিল্পাঞ্চলে বয়স্ক শিক্ষার্থীদের নিয়মিত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। (খ) দীর্ঘ অবকাশকালীন শিক্ষাকেন্দ্র, যে-শিক্ষাকেন্দ্রে গ্রীষ্মাবকাশ বা পূজাবকাশের ন্যায় দীর্ঘ ছুটির দিনগুলিতে ছাত্ররা পল্লীবাংলায়

বিভিন্ন স্থানে দু-সপ্তাহ বা আরো বেশি সময়ের জন্য গ্রামের নিরক্ষরদের পঠন-পাঠনে সহায়তা করবে। (২) একজন শিক্ষক বা অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে পাঁচজনের বেশি একটি ছাত্রদলের এক-একটি শিক্ষাকেন্দ্রের দায়িত্ব গ্রহণ। কলকাতা-বর্ধমান-কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে উপরিলিখিত যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ ছাত্র-সমিতি গঠিত হয় তার প্রধান উপদেষ্টা শিক্ষামন্ত্রী রবীন্দ্রলাল সিংহ এবং উপদেষ্টামণ্ডলীর সভাপতি উপাচার্য বিধুভূষণ মালিক ছাড়াও উপদেষ্টামণ্ডলীতে আছেন হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ ত্রিগুণাচরণ সেন, বি. কে. গুহ, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, গোপাল হালদার, মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী, নির্মাল্য বাগচী, এ. ডব্লু. মামুদ, মৃণালিনী এমার্সন, প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, সত্যেন মৈত্র, শ্যামল চক্রবর্তী ও চিন্মোহন সেহানবীশ।

এই সম্মেলনে গৃহীত কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রস্তুতিতে সমিতির অন্তর্ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ সর্বপ্রথমে বেঙ্গল সোশ্যাল সার্ভিস লীগের শ্রীসত্যেন মৈত্রের কাছে নিরক্ষরতা দূরীকরণের ট্রেনিং গ্রহণ করে। সদ্যসমাপ্ত গ্রীষ্মাবকাশে এই ট্রেনিঙের ভিত্তিতে ১২৫ জন স্বেচ্ছাসেবকের একটি দল গ্রাম বাংলার বিস্তৃত প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়ে প্রায় ৪৫টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছে। এই স্বেচ্ছাসেবক দলে বাইশ জন ছাত্রীর যোগদান কম উল্লেখযোগ্য নয়। এই স্বেচ্ছাসেবক দলটি বিগত ২৬শে মে হাওড়া, হুগলী, চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর, বীরভূম ও মালদহের বিভিন্ন গ্রামে রওনা হয়ে যায় এবং মেদিনীপুর জেলায় পাঁচরোল, চন্দ্রকোণা, খাপেটাপুর, পাঁশকুড়ো, সুনোদী; বীরভূম জেলায় মুকুন্দপুর, আড়েণ্ডা; হুগলী জেলায় হরিপা, মাধবপুর, বাক্সা; নদীয়া জেলায় কৃষ্ণগঞ্জ; চব্বিশ পরগণা জেলায় হাড়োয়া, দেগঙ্গা, সন্দেশখালী, কুমীরমারী, ছোটমোল্লাখালী এবং হাওড়া জেলায় আমতা থানার অন্তর্গত কতিপয় গ্রামে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করে। এই শিক্ষাকেন্দ্রগুলি যাতে ছাত্রদের অনুপস্থিতিতে আত্মনির্ভর স্থায়ী কাঠামো পরিগ্রহ করতে পারে তার জন্য স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিবৃন্দের অকপট সহযোগিতা এবং ক্ষেত্রবিশেষে গ্রাম পঞ্চায়েত ও ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারের সহায়তা বিশেষ কার্যকর হয়েছে। অবশ্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যে টালবাহানা ছাত্রদের প্রয়াসকে কিছুটা সীমিত করে তুলতে বাধ্য করেছে। কিন্তু গ্রামীন ব্যক্তিদের উৎসাহ সরকারী ব্যর্থতাকে অতিক্রম করতে বহুলাংশে সাহায্য করেছে। অনেক স্থানে গ্রামের অধিবাসীদের কর্মোদ্যোগের সাহায্যে

ছাত্ররা সম্পূর্ণ বেসরকারী প্রচেষ্টায় শিক্ষাকেন্দ্র খুলেছে। এমনি এক দৃষ্টান্ত দেখা গেছে বাপেটাপুর গ্রামে। এখানে শিক্ষাকেন্দ্রের ঘর তৈরি ও স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছেন গ্রামের অধিবাসীরা।

নিরক্ষরতা দূরীকরণ ছাত্র-সমিতির এক মুখপাত্র জানালেন আরো অধিক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর সক্রিয়ভাবে সংগঠনে যোগদানের মধ্যেই এই কর্মপ্রয়াসের সাফল্য নিহিত। সমিতির আগামী কর্মসূচীকে পূজাবকাশে দ্বিতীয় পর্যটন ছাড়াও শহরতলীর অনুন্নত অঞ্চল তথা শিল্পাঞ্চলের বয়স্ক নিরক্ষরদের ছুটির দিনে শিক্ষাদান একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। এ ছাড়া নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন যথেষ্ট সময়োপযোগী বলেই সমিতি ইতোমধ্যেই সেদিকে দৃষ্টিপাত করে গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপনের চিন্তা করছে।

এতকাল ছাত্র আন্দোলনে যে বিক্ষোভাত্মক ধারার বিকাশ লক্ষ করেছি আজ সে ধারাকে নতুন গঠনাত্মক পথে প্রবাহিত করার যে-সংপ্রয়াস ছাত্র-সমাজের একাংশের মধ্যেও পরিলক্ষিত হল তাকে আজকের নবযুগীয় পটভূমিকায় 'দুর্ঘটনা' বলব না, বলব যুগপরিবর্তনের স্বাভাবিক ইঙ্গিত। আর সে কারণেই এই কর্মোদ্যোগের স্থপতিদের জানাই আন্তরিক সাধুবাদ।

সুমিত চক্রবর্তী

কারা-তেপেতে বৌদ্ধ স্তূপের সন্ধান লাভ

সোভিয়েত পুরাতত্ত্ববিদেরা সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্য এশিয় রিপাবলিকে খনন-কার্য চালিয়ে কণিষ্কের সময়ের এক ভারতীয় বৌদ্ধ সভ্যতার সন্ধান পেয়েছেন। পুরাতত্ত্ববিদদের এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্ঘাটন প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে খুবই আকর্ষক হবে।

আমুদরিয়া নদীর অনতিদূরে প্রাচীন তেরেজ শহরে কারা-তেপে অর্থাৎ বিভীষিকার পাহাড় বলে পরিচিত এক বালুকা-পর্বত শিখরে ১৯৩৭ সালে সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা সর্বপ্রথম খননকার্য চালিয়ে কৃত্রিম গুহা এবং দেওয়াল চিত্রের সন্ধান পান। সন্ধানকার্য পরিচালিত হয় লেনিনগ্রাদের পুরাতত্ত্ববিদ্ বি. স্তাভিস্কির নেতৃত্বে ১৯৬১ থেকে ১৯৬৪ সালের মধ্যে। পুরাতত্ত্ববিদেরা উদ্ধার করেছেন বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ, লাল রঙের স্তম্ভসারি এবং প্রধান প্রবেশদ্বারে অবস্থিত বর্ণাঢ্য বহু মানব-প্রতিকৃতি।

এই নতুন আবিষ্কার আলোকপাত করেছে কুষাণ-যুগে কারা-তেপেতে বসবাসকারী মানুষের সংস্কৃতি, শিল্পকলা, লিপিচিত্রের উপর।

বিভিন্ন গুহার দেওয়ালচিত্রগুলি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং আকর্ষক। এই সমস্ত দেওয়ালে খোদিত রয়েছে স্তূপ চিত্র, পদ্মফুল, মানব মুখাবয়ব প্রভৃতি।

কারা-তেপেতে বৌদ্ধ মঠে প্রাপ্ত ব্রাহ্মী এবং খরোষ্ঠী লিপি অবশ্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হিসাবে গণ্য হবে। সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে জানা গেছে যে সম্ভবত এইগুলি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হয়েছিল। প্রাপ্ত মুদ্রাসমূহ বৌদ্ধদের গুহাতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করার প্রবণতার সময় স্থির করার পক্ষে সহায়ক হবে।

এই বৌদ্ধস্তূপ এবং চিত্রকলা, মুদ্রা, স্থাপত্য-শিল্প প্রভৃতি উদ্ঘাটনের ফলে মধ্য এশিয়াতে বৌদ্ধ ধর্মপ্রসারের ইতিহাস সম্পর্কে নতুন তথ্য পাওয়া যাবে।

বি য়ো গ প ঞ্জী

উল্লাসকরের দেহাবসানে

উল্লাসকর দত্তের শেষজীবনটা প্রায় অলক্ষিতেই কেটে গিয়েছে, তবু তাঁর জীবনাবসান আনুষ্ঠানিকভাবেও লক্ষ না করে আমরা অন্যায়ই করেছি। কারণ, সে তো শুধু একটি জীবনের অবসান নয়, ইতিহাসের একটা পর্বেরও স্মারক চিহ্ন। উল্লাসকরের পরে আলিপুর বোমার মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত কেউ জীবিত আছেন কিনা জানি না। তার অর্থ একদিক থেকে সেই বারীন্দ্র-অরবিন্দের পর্বটা আমরা নাকচ করতে শিখে উঠেছি। যুগটাকে প্রথম নাকচ করতে চেয়েছেন স্বয়ং অরবিন্দ ও বারীন্দ্র। নিজেদের জীবনের এই অগ্নিমন্থনের পর্বকে তাঁরা পরে আমল দিতে চান নি। কিন্তু দেশের মানুষ তাঁদের সেই কথাকেই বরং তখন আমল দেয় নি। সেই পর্বটাকে তাঁরা মনে-মনে শ্রদ্ধা করত। স্বাধীনতার ইতিহাসে তা অগ্রাহ্য বা অপ্রয়োজনীয়ও মনে করত না। তারপরে ইতিহাস এগিয়ে গিয়েছে। প্রেরণা নতুন রূপে নতুন পদ্ধতিতে ব্যাপক হয়ে সার্থক হয়ে উঠতে চেয়েছে। না হলে সে প্রেরণারই হত পরাজয়। স্বাধীনতা লাভের পরে কিন্তু এই সত্যটাই নানা কারণে আমরা এখন বিস্মৃত হতে বসেছি। একটা বড় কারণ—এই বিপ্লব-পথের প্রতি গান্ধীজীর নীতিগত বিমুখতা। কিন্তু গান্ধীজীর নীতিও আজ প্রায় পরিত্যক্ত—সর্বোদয়ের জনকয় কর্মীরা ছাড়া এখন কেউ তা মানেন বলে মনে হয় না। বর্তমান শাসকগোষ্ঠী দু-একটা বিষয়ে বিশেষ রকমেই সার্থক হয়েছেন—দেশের শিক্ষিত-অশিক্ষিত সাধারণ মানুষের মনে দেশ সম্বন্ধে একটা হতাশার ও অবিশ্বাসের ভাব জন্মাতে পেরেছেন; এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসটাকেও বিকৃত করতে গিয়ে প্রায় একালের শিক্ষিত মানুষের কাছে বিস্মৃত করে তুলেছেন। তাই উল্লাসকরদের অধ্যায়টা আজ ত্রিশের অনধিক অধিকাংশ বাঙালির নিকট অজ্ঞাত। বিবি, বাঈজী ও গোলামের আজগুবী রোম্যান্স তার চেয়ে আজ এখনকার মানুষের বেশি পরিচিত।

বাংলার বিপ্লবী চেষ্টার ইতিহাস অবশ্য কেউ-কেউ লিখেছেন। দোষত্রুটি থাকতে পারে, তবু তাঁদের চেষ্টা প্রশংসনীয়। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের

বৃহত্তর প্রেক্ষাপট স্মরণে রেখে সেই বিপ্লব-প্রয়াসের একখানা প্রামাণিক ইতিহাস রচিত হওয়ার সময় প্রায় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে—উল্লাসকরের বিদায়ে এই কথাই আমাদের বিশেষ করে মনে পড়ছে। এই শাসক-চক্রান্ত একদিন শেষ হবে। এই আত্মবিস্মৃতিও একদিন অবলুপ্ত হবে—না হলে জাতি ও স্বাধীনতা দুইই বিলুপ্ত হবে। সেই সুদিনের আশা রাখি বলেই চাই সেই ভাবী দিনের গবেষকরা যেন জাতীয় আত্ম-প্রতিষ্ঠার এই প্রেরণার রূপ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তথ্যের অভাব অনুভব না করেন।

ডাঃ বনবিহারী মুখোপাধ্যায়

আশী বৎসর বয়সে ডাঃ বনবিহারী মুখোপাধ্যায় গত সোমবার ৫ই জুলাই (১৯৬৫ ইং) প্রায় সকলের অলক্ষ্যে দেহত্যাগ করেছেন। গত বিশ বৎসর কাল বাংলা সাহিত্যেও তাঁর অজ্ঞাতবাসই গিয়েছে। কিন্তু সেই সাহিত্য বা সেই জীবন কোনোটাই তাঁর নিকট অলক্ষিত ছিল না। এমন তীক্ষ্ণ মননশক্তি ও তীক্ষ্ণ লেখনী কম লোকেরই ভাগ্যে জুটে। ডাঃ বনবিহারী মুখোপাধ্যায় তথাপি তাঁর পরিচয় রেখে গিয়েছেন স্বল্প কয়েকখানি গ্রন্থে ('দশচক্র', 'যোগভ্রষ্ট') ও পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত কিছু লেখায়, গল্পে, প্রবন্ধে, ছবিতে। সেসব এখন দুর্লভ হয়ে উঠছে—তা পুনঃপ্রকাশিত না হলে দুর্লভতর হবে। বিচক্ষণ চিকিৎসক ও চিকিৎসাবিদ্যার শিক্ষাগুরু রূপে সরকারী কাজে তাঁর অনেকটা শক্তি বনবিহারীবাবু ব্যয় করতে বাধ্য হয়েছেন—তাতেও বহু লোক উপকৃত হয়েছে, বহু ছাত্র এই গুরুর সাহচর্যে পেয়েছেন বিদ্যার সঙ্গে তীক্ষ্ণ মননশীলতায় দীক্ষা। বোধহয়, বাংলাসাহিত্য না হলে তাঁর দান আরও বেশি লাভ করত। কিন্তু বাঙালি জীবনে তাঁর দান তা সত্ত্বেও কিছুমাত্র খর্ব হয় নি। জাগ্রত চিত্ত, জিজ্ঞাসু মন—সমাজে ধর্মে জীবনে বিজ্ঞানালোকিত অখণ্ড চেতনা নিয়ে রঙ্গ ও ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ পরিহাসের সঙ্গে সস্নেহ কৌতুকের এমন প্রসন্ন হাস্যচ্ছটা প্রায় মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত যিনি দীর্ঘ জীবনব্যাপী অকাতরে বিলিয়ে গিয়েছেন—বাঙালিকে তিনি চিরদিনের মতো একটি স্মরণীয় ঐতিহ্যই দান করে গিয়েছেন—তাঁর সাহিত্যকীর্তিও তারই একটি অঙ্গ।

গোপাল হালদার

যুব-উৎসব প্রসঙ্গ

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'পরিচয়'-এ 'পশ্চিম বঙ্গ যুব-উৎসবে'র উপর আলোচনাটি পাঠ করে বিহ্বল-হতভম্ব হয়েছি! আমি সাধারণ গৃহস্থ মানুষ, 'দুটি বিবদমান দল', যাদের তির্যক উল্লেখ রচনাটিতে আছে, তাদের কোনোটিরই সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই। কিন্তু বিবেককে ঠেলবো কোথায়, যে-স্মৃতি বেয়াদপ, বিবেককে খোঁচা দিতে থাকে, তাকে পিষে মারবো কী করে?

লেখক মন্তব্য করছেন, 'প্রস্তুতিকালে প্রস্তুতি কমিটি এ বিষয়ে একমত হয়েছিলেন, যে, যুব-উৎসব যেহেতু রাজনৈতিক সম্মেলন নয়, সাংস্কৃতিক উৎসব সেই হেতু ভিয়েতনামের প্রশ্ন আন্তর্জাতিক তাৎপর্য বিবেচনায় উত্থাপিত হবে, কিন্তু বন্দীমুক্তির দাবিতে শ্লোগান উঠবে না' (৬২৪ পৃষ্ঠা)। বোঝা যাচ্ছে কাল অপরগতি, নইলে রাজনীতি-সমাজনীতি বাদ দিয়ে সংস্কৃতির আলোচনা সম্ভব, 'প্রস্তুতি কমিটি' তা ভাবতেও পারতেন না, 'পরিচয়'-এর পৃষ্ঠায় তার সমর্থনও সম্ভব হতো না। আমার মনে পড়ছে ১৯৪৮ সালের কলকাতার যুব সম্মেলনের কথা, বের্লিনে, মস্কোতে, ওয়ারসতে, বুখারেস্টে, ভিয়েনাতে, হেলসিংকিতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব যুব-উৎসবের কথা। এ-সমস্ত যুব উৎসবই কি তাহলে নিছক 'সাংস্কৃতিক সম্মেলন' ছিল, রাজনীতির ভয়ংকর ছোঁওয়া বাঁচিয়ে শৌখিন বিশুদ্ধ 'সংস্কৃতি' আলোচনা করার জন্য? রাজনৈতিক কারণে দেশে-দেশে নিপীড়িত-লাঞ্ছিত-কারারুদ্ধ শ্রমিক-কৃষক-কর্মীদের সম্বন্ধে সামান্য চিন্তা-উদ্বেগ-সহানুভূতিও কি কোনোদিন এসব যুব-উৎসবে উচ্চারিত হয় নি?

ভাবতেও পারি নি 'রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবি করে শ্লোগান' দেওয়ার প্রয়াসকে 'পরিচয়' পত্রিকার পৃষ্ঠায় 'ইতরতা' বলে ঘোষণা করা হবে, সেই 'পরিচয়' যার অন্যতম সম্পাদক একদা 'একদা'-নামে উপন্যাস লিখেছিলেন।

অশোক মিত্র

লেখকের উত্তর

শ্রীঅশোক মিত্রর চিঠি পড়ে "বিস্ময়-হতভম্ব" (আমি শ্রীমিত্রর ভাষা পছন্দ করি; তিনি এমন ভয়ংকর একটা কথা ব্যবহার করলেন কী করে?) হই নি, বিস্মিতও হই নি। ব্যাপারটা তো এখন বেশ চালু হয়ে গেছে—পলেমিক্স্-এর খাতিরে অপরের লেখার অংশমাত্র, অসাবধানে, অযত্নে পাঠ করে অন্য অর্থ আরোপ করে, প্রতিপক্ষ কল্পনা করে তর্কে নেমে পড়া। এটা আমাদের ইন্টেলেক্চুয়াল নৈরাজ্যবাদের (আমরা প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর যার শিকার) লক্ষণাক্রান্ত।

শ্রীঅশোক মিত্র শুরুতেই বলেছেন, উক্ত 'দুটি বিবদমান দলে'র কোনোটির সঙ্গেই তাঁর 'সম্পর্ক নেই'। আমি একটি দলের সদস্য; ঐখানেই বোধহয় আসল বিরোধ। রাজনীতিকে আমরা অনেকটা বেশি গুরুত্ব দিই বলেই মঞ্চে উঠে বিশ্রী মারামারি কিংবা বহুজনমান্য কোনো সাংবাদিককে অহেতুক উচ্চকণ্ঠে অভদ্র ও অশালীন তিরস্কারকে রাজনীতির চেহারা বলে চিনতে পারি নি। আমরা বন্দীমুক্তির দাবি তোলাকে 'ইতরতা' বলিনি, রাজনীতির নামে তথাকথিত 'রক্বাজি'র নিন্দা করেছি। রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে ভাবতে হয় বলেই আমরা অনুভব করেছি যে, নীতি হিসেবে বিনা বিচারে রাজনৈতিক কর্মীদের কারারুদ্ধ করে রাখার পন্থার প্রতিবাদে বহুমতের গণতন্ত্রানুরাগী মানুষের কোনো মিলিত ভূমিকার সম্ভাবনা এই সস্তা জল্পনায় ব্যাহত হয়।

আমরা যাকে ইতরতা বলছি, শ্রীমিত্রর মতে রাজনীতির ঐটেই কি যথার্থ স্বরূপ? আজকের আফ্রিকা (ঐ প্রসঙ্গে শ্রীমিত্রর ভাষণ আমাদের ভালো লেগেছিল) কিংবা জাতীয় সংহতির সমস্যা সম্পর্কে আলোচনাচক্র কি অরাজনৈতিক, ভিয়েতনামের প্রশ্নে স্লোগান কিংবা আফ্রিকা দিবস উদ্‌যাপন কি অরাজনৈতিক? বাংলাদেশের প্রগতিশীল যুব সমাজ যদি জাতীয় সংহতি, আফ্রিকা ও বর্ণবিদ্বেষের সমস্যা, জাতীয় পুনর্গঠনের সমস্যা, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সংকট ইত্যাদি সমূহ রাজনৈতিক প্রশ্নে মতবিনিময়ের মধ্য দিয়ে কোনো আন্দোলনের পরিকল্পনায় পৌছতে পারতেন, তাতে রাজনীতি ও সংস্কৃতি উভয়েরই যুগপৎ লাভ হত। এই বিশ্রী বিভেদে অন্তর্দ্বন্দ্বে কার রাজনৈতিক লাভ হল, জানি না।

পরিশেষে নিবেদন, যুব-উৎসব সম্পর্কে আমার মূল্যায়ন আমারই।

'পরিচয়'গোষ্ঠী ও তার বাইরেও অনেকেই আমার সঙ্গে একমত, অনেকেই আবার অন্যমতাবলম্বী। তাই আমার স্বাক্ষরিত লেখার সমস্ত দায় কী করে আমাদের শ্রদ্ধাভাজন সম্পাদক শ্রীগোপাল হালদারের উপর বর্তায়, বুঝতে অপারগ। অশোকবাবু রাজনীতির যে-ধারণাটি প্রকাশ করেছেন, তার দায়ও কি 'পরিচয়' সম্পাদকমণ্ডলী গ্রহণ করতে পারবেন ?

আরেকটা কথা। বন্দীমুক্তির স্লোগান উঠবে না, এই সিদ্ধান্তের পিছনে যুব-উৎসব প্রস্তুতি কমিটির কি নীতি নিহিত ছিল, তার ব্যাখ্যা যুব-আন্দোলনের নেতারাই দিতে পারেন। আমরা যা দেখলাম, যে বিশেষ আবহাওয়া সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে তা ব্যবহৃত হল, তারই ভিত্তিতে মত প্রকাশ করেছি। ঐ স্লোগানের যৌক্তিকতা ইত্যাদি আমাদের আপাতত এ প্রসঙ্গে বিচার্য নয়।

অগ্নিবিষ্ণু ভট্টাচার্য

সম্পাদকের বক্তব্য

শ্রীঅশোক মিত্র সম্পাদককে টেনেছেন বলেই তাঁর আত্মপ্রকাশের প্রয়োজন ঘটল—নইলে তার প্রয়োজন ছিল না ; কারণ আগেও অনেকবার বলা হয়েছে, স্বাক্ষরিত প্রত্যেকটি রচনার মতামতের দায়-দায়িত্ব লেখকেরই, সম্পাদকের সম্পূর্ণ নয়। সুতরাং পরিচয়-এর কোনো রচনারই পক্ষে বা বিপক্ষে সম্পাদক কলম ধরার প্রয়োজন বোধ করেন না, যদিও মত তাঁদের আছে এবং সে মতামত ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা প্রকাশও করেন। পরিচয় মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে—শ্রীঅগ্নিবিষ্ণু ভট্টাচার্যের বক্তব্য তাই অবিকৃতভাবে প্রকাশিত হয়েছে, যেমন প্রকাশিত হল শ্রীমিত্রের বক্তব্য। আর, বন্দীমুক্তি বিষয়ে সম্পাদকের বক্তব্য সুবিদিত, এই সংখ্যায়ও অন্যত্র তা প্রকাশিত হয়েছে—শ্রীমিত্রের দৃষ্টি তার প্রতি আকর্ষণ করছি। দেখতে পাবেন, এ-ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে সম্পাদকের কোনো মতানৈক্য নেই।

সম্পাদক পরিচয়

সবিনয় নিবেদন,

পরিচয় বৈশাখ সংখ্যাটির জন্ত ধন্তবাদ।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই-র আধুনিক সাহিত্যের উপর আলোচনাটি খুবই আকর্ষক—অপ্রিয় চোরকাঁটার মত ক্ষুদ্র অথচ তীক্ষ্ণবিদ্ধ হয়েছে।

'শুনহ মানুষ ভাই'র আমল থেকে আধুনিক সাম্যবাদের স্তর পর্যন্ত আমাদের সাহিত্যের বক্তব্য প্রায় এক, দর্শনের ভাবনাও নেই—ফর্ম ও ফর্মালিটির অভাবও নেই বা ফসলের অপ্রাচুর্যও দুর্লভ, অথচ এক আশ্চর্য অভিশাপে আমরা এক আজব দেশের বাসিন্দা—সেখানে বাঁধভাঙা যৌবনের ফরাসী সংস্কারশাস্ত্রে ত্রিরঙা পতাকা খোঁজে, সঞ্জীবন ফার্মাসি আরোগ্য নিকেতনে অবস্থান করে বা রাধা ইতিহাস হয়ে দাঁড়ায় উপন্যাসকে দরজায় দাঁড় করিয়ে; নয়নপুরের ভাস্কর দুই নারীর সৃষ্টি করে বা জেকিল-হাইডের ইভিয়টের ভর্জমায় মগ্ন হয়। এ-বিষয়ে বিশদ আলোচনার অতীব প্রয়োজন। নাট্যপ্রসঙ্গেও 'চেরি অ অর্চাডের' প্রামাণ্য আলোচনা হয়েছে, কিন্তু 'মঞ্জরী, আমের মঞ্জরী'র প্রয়োজনার পরিপ্রেক্ষিতটি যেন আলোচনার বাইরেই রয়ে গেছে। সংস্কৃত নাটক থেকে কবি-নাট-যাত্রার পথ ছেড়ে হঠাৎ বাংলা নাটক পাশ্চাত্ত্যের বাঁধা সড়ক ধরেছে। এ দেশীয় নাট্যধারাবিচ্যুত বাংলা নাটকের সেই পথচলা খোঁড়ার পথচলার মতো, সবাই জানে সে খুঁড়িয়ে চলে কিন্তু খোঁড়ার এ ছাড়া নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। এ দেশীয় নাটকের পরিত্যক্ত ধারাটি আজ 'যাত্রা'র পথে মৃতপ্রায়; বাঁধা সড়কে পথবিচ্যুত বাংলা নাটকও আজ মুমূর্ষু। অথচ 'দেহাতি যাত্রায়' তা আশ্চর্য প্রাণবন্ত।

এই দুই ধারার এক বিস্ময়কর সংমিশ্রণ দেখেছিলাম 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্রে'। কিন্তু 'মঞ্জরী, আমের মঞ্জরী'র পরিবেশনার যাথার্থ্য পেলাম না। হঠাৎ প্রায় শ বছর পিছিয়ে সম্রাট ও শ্রেষ্ঠীর আগমন-নির্গমনের পথে ফিরে যাওয়ার সার্থকতা কোথায়? ইতি—

বিধু চক্রবর্তী